নারীবিশ্ব



গাঙচিল

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০০২

প্রকাশক
অনিমা বিশ্বাস
গাঙচিল
'মাটির বাড়ি', ওঙ্কারপার্ক, ঘোলাবাজার
কলকাতা ৭০০ ১১১

পরিবেশক
দোয়েল
শাখা-অফিস ও বিক্রয়কেন্দ্র
৩৩ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

হরফবিন্যাস
রচয়িতা ১০ কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলকাতা ৭০০ ০০১

মুদ্রক
জয়শ্রী প্রেস ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদপট
বিপুল গুহ

সূচিপত্র

পুলক চন্দ শুরুর কথা ৭

সম্পাদনা ও প্রকাশনা বিষয়ক নিবেদন ১৩

এক

সুকুমারী ভট্টাচার্য প্রাচীন ভারতে নারী ১৭
করুণাসিন্ধু দাস 'অর্ধেক মানবী' ১৯
রমাকান্ত চক্রবর্তী মধ্যযুগে বঙ্গনারী ৩২
রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় পদ্মিনীর আখ্যান: ইতিহাসের বিভিন্ন পাঠ ৪৫

দুই

স্বপন বসু বাঙালি সমাজমানসে নারী: উনিশ শতকের বাংলা পত্রিকার দর্পণে ৬৩
মালেকা বেগম বিপন্ন নারী: সতীদাহ থেকে কন্যাভ্রূণ হত্যা ৭২
বিনয়ভূষণ রায় উনবিংশ শতকের স্ত্রীশিক্ষার একটি ধারা: অন্তঃপুর শিক্ষা ৮৯
সীমন্তী সেন উনিশ শতকের বাংলায় নারী-শিক্ষা: প্রগতিবাদ ও তার পরিসীমা ৯৯
প্রদীপ বসু নারী-উন্নতি ও বাঙালি পরিবারে নতুন স্বাস্থ্যবিধি ১১৫
সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশ শতকী টানাপোড়েন: এক অখ্যাত লেখিকার সামাজিক নাটক ১৩১
সেরিনা জাহান ঔপনিবেশিক যুগে আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলার মুসলমান মেয়েরা ১৩৮
ভারতী রায় চারটি পত্রিকা ও নারীপ্রসঙ্গ ১৬২
অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেয়েদের ভাবনা: মেয়েদের সম্পাদিত পত্রিকায় ১৭০
দেবশ্রুতি রায়চৌধুরী বর্গীয় পুরুষতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের আলোকে বঙ্গীয় আদর্শ নারী ১৯২
সুদেষ্ণা চক্রবর্তী বাংলার নারী: অতীত, বর্তমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ: আন্দোলনের রূপরেখা ২১১
শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্ত বাঙালি মেয়ের রাজনীতি-ভাবনা ২২৯
মালিনী ভট্টাচার্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে নারী সৈনিক: কল্পনা-প্রীতিলতাদের কথা ২৩৭
প্রভাতকুমার দাস যাত্রা-থিয়েটারে মেয়েরা ২৪৯
সুধীর চক্রবর্তী প্রান্তবাসিনীদের কথা ২৭০
শুচিব্রত সেন আদিবাসী জীবনে নারী: প্রসঙ্গ সাঁওতাল সমাজ ২৮৮
সৈয়দ তানভীর নাসরীন মুসলমান, বাঙালি ও নারী: সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ ২৯৭

তিন

অভ্র ঘোষ লিঙ্গ-অনপেক্ষ মনুষ্যত্বের চর্চা এবং রবীন্দ্রনাথ ৩২৩
ঈশিতা চক্রবর্তী অন্দর থেকে বাহির, বাহির থেকে অন্দর: আত্মকথনে বাঙালি মেয়েরা ৩৩৪
রুক্মিণী সেন আত্মকথার নীরবতা: বাঙালি মহিলাদের আত্মজীবনী ৩৬০
কেতকী কুশারী ডাইসন মেয়েদের আত্মবিবৃতিদান ৩৭৩
সুমনা দাস সুর অবরোধবাসিনী থেকে সবলা: নারী ঔপন্যাসিকের চোখে নারীর আত্মপরিচয়ের সন্ধান ৩৮৮
সুমিতা চক্রবর্তী জনপ্রিয় উপন্যাস ও নারী-প্রতিমা নির্মাণ ৪২০
যশোধরা রায়চৌধুরী বাংলা আধুনিক কবিতার নারী-উপনিবেশ: অর্ধেক পৃথিবীর দিকে? ৪৩১
মিমি ভট্টাচার্য বাংলা চলচ্চিত্রে নারীচিত্রণে চার দশক ৪৪৮

চার

ঈপ্সিতা চন্দ পণ্য-ঘাতক রহস্য: বিজ্ঞাপন, বিশ্বায়ন ও নারীবাদ ৪৬৯
মুকুল মুখোপাধ্যায় নারী ও প্রান্তিকীকরণ ৪৮১
শাশ্বতী ঘোষ পরিবারের অর্থনীতি ৪৯১
জয়া মিত্র পরিবেশ ও নারী: লাউফুল ও টিকে থাকার সাহস ৫০৮
রুচিরা গোস্বামী আন্তর্জাতিক ও জাতীয় মানবাধিকার আইন ও নারী ৫২১
জবা গুহ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও লিঙ্গসমতা ৫২৭
রাজশ্রী বসু নারী ও উন্নয়ন ৫৩৯

পাঁচ

যশোধরা বাগচী মাতৃত্ব ও পিতৃতান্ত্রিকতা ৫৫১
প্রশান্ত রায় নারীত্বের নির্মাণ ৫৫৯
পরেশ চট্টোপাধ্যায় নারীবাদী মার্কস ও এঙ্গেলস ৫৭২
সলিল বিশ্বাস অধিকারের আন্দোলনে পাশ্চাত্যের নারী: উনিশ শতক ৫৮২
অংশুমান কর বিংশ শতাব্দীর নারীবাদী সাহিত্যসমালোচনা: একটি রূপরেখা ৬০০
রাধাকৃষ্ণ দে প্রসঙ্গ: পিতৃতন্ত্র ৬১৩

শুরুর কথা

'Under Patriarchy, every woman is a victim, past, present and future'– Andrea Dworkin, *Our Blood*, 1976

সময় সময় স্থানকালের সীমানা হঠাৎই ঝাপসা হয়ে পড়ে, অতীত-বর্তমানের ভেদরেখা মুছে যায়। মাত্র কিছুদিন আগে আধ পাতা জোড়া একটি বিজ্ঞাপন— 'কন্যাসন্তান রক্ষা করুন'/'Save the Girl Child' — প্রায় সমস্ত বাংলা-ইংরেজি জাতীয় দৈনিকের পাতায়, এ রকমই এক বিভ্রম তৈরি করে দিল। বিজ্ঞাপনটি ওই বিষয়ে প্রথম জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দপ্তর প্রচারিত (২৮.৪.২০০৮)।

রঙিন সেই বিজ্ঞাপনে নিষ্পাপ দুটি ছোট মেয়ের ছবি। একজনের মুখে শৈশবের উজ্জ্বল, অমলিন হাসি, অন্যজন একটু বড়, বালিকা, যেন এইটুকু বয়সেই সে পরিবারে/সমাজে তার অবাঞ্ছিত অস্তিত্বের বিষয়টি জেনে গেছে— তাই এক মুখ বিষাদ, উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা নিয়ে, হয়তো বা একটু করুণার আশায়, তাকিয়ে। যদিও চারপাশে বিগত দেড় শত বছরের দেশব্যাপী নারী-অগ্রগতির হাজারো, প্রায় অবিশ্বাস্য, সব দৃষ্টান্ত, সাফল্যের অজস্র ঝলমলে পরিসংখ্যান— তা সত্ত্বেও কোথায় যেন সেই উনিশ শতকের সূচনাকালের— সতীদাহ, শিশু (কন্যা) সন্তান বিসর্জন, বাল্যবিধবা-কুলীন কন্যার আর্তনাদ-বিদ্ধ আবহ। মাঝখানের সময়টুকু তাই সত্যি বয়ে গিয়েছে কিনা মনে ধন্দ জাগে।

দেশের মেয়েদের কান্নার আওয়াজ সাগরপারের ইংরেজ শাসকের কানে পৌঁছে দেবার জন্য তখন প্রকাশিত হচ্ছিল *Suttee's Cry to Britain* (১৮২৮) কিংবা *Indian's Cries to British Humanity* (১৮২৯)। 'বঙ্গদেশীয় অঙ্গনাদিগের অবস্থার বর্ণন করিতে বসিলে দারুময়ী লেখনীও রোদন' করছিল সমবেদনায় (*সংবাদ ভাস্কর*, ১০ মে, ১৮৪৯)। আজ, স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের সরকারকেই কন্যাসন্তানের জীবন রক্ষার আবেদন জানিয়ে আয়োজন করতে হচ্ছে 'প্রথম জাতীয় সম্মেলন'। পাশাপাশি, ইউনাইটেড নেশনস চিলড্রেনস ফান্ড পরিবেশন করছে শিহরিত করবার মতন প্রাসঙ্গিক তথ্য: ভারতের মোট জনসংখ্যার ভিতরে প্রায় পাঁচ কোটি নারী ও শিশুকন্যা নাকি ভ্রূণহত্যা, অবহেলা-অনাদরজনিত উচ্চ মৃত্যুহার ইত্যাদির কারণে দেশের মানচিত্র থেকে 'missing'— অর্থাৎ বেমালুম হারিয়ে গেছে। এর সঙ্গে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (NCRB)-র নানা তথ্যও রয়েছে। তার মাত্র একটি বছর (২০০২)-এর কিছু পরিসংখ্যান যোগ করলে ছবিটির ভয়ংকরতা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে: এই এক বছরে গোটা দেশে ধর্ষিতার সংখ্যা ছিল ১৬,৩৭৩ জন, নারী ও বালিকা পাচার হয়েছে ১১,৩৩২ জন, অপহরণ হয়েছে ১৪,৩৭৩ জন, পারিবারিক হিংসার শিকার

৪৯,২৩৭ জন, পণসংক্রান্ত বধূহত্যার বলি ৭,৮৯৫ এবং পণ-অত্যাচারের পরিণতিতে আত্মহত্যায় বাধ্য হয়েছে ২,১৩৪ জন।

অঘোষিত এক সার্বিক 'যুদ্ধে'র এ হল অণুপরিমাণ খতিয়ান। 'যুদ্ধটি' আদতে সর্বব্যাপ্ত, বহুমাত্রিক ও অনেক হাজার বছরের পুরনো। তা যে নিতান্তই একতরফা সন্দেহ নেই, কারণ সেখানে আক্রমণমুখী পক্ষ একটিই— যার নাম পিতৃতন্ত্র, এবং আক্রান্ত, প্রধানত নারীসমাজ— সর্বস্তরের ও সর্বদেশের।

দুই

'Patriarchy requires violence or the subliminal threat of violence in order to maintain itself…' Gloria Steinem, *Revolution from Within,* 1993.

তর্ক যাই থাকুক, শুরুর গল্প কিন্তু গুছিয়ে প্রথম শুনিয়েছিলেন ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস, তাঁর *The Origin of the Family, Private Property and the State* (১৮৮৪) গ্রন্থে। বলেছিলেন, নারীর সেই 'বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়'-এর কথা। একগামিতা, পরিবার ও ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে 'ভুবনের ভার'/'মাতৃঅধিকার' ('mother right') কী ভাবে চলে গিয়েছিল পুরুষের কবজায়। আমরা দেখলাম, বাইরের পৃথিবীর দখলদারি ও কর্মের জগতে পরাজিত নারী, মর্যাদা হারিয়ে পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হল, এবং আষ্টেপৃষ্ঠে আটকে পড়ল চার দেওয়ালের দাসত্বে— সন্তানধারণ-পালন-সেবা-কর্তব্য-অকর্তব্যর বাঁধনে। সমাজের কাছে নারীর এই গৃহশ্রম ও ভূমিকার গুরুত্ব কমে আসার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ল ঘরের বাইরে পুরুষের সমস্ত কাজের গুরুত্ব ও গৌরব। অন্যদিকে, নারীর স্বাধীন ব্যক্তিসত্তাকে স্বীকৃতি দিতে অনিচ্ছুক পিতৃতন্ত্র শুধু তার শরীর তথা গর্ভের দখল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকল না, তার মন ও মানসিকতাকেও সুবিধা মতন ছাঁচে পুরদস্তুর ঢেলে নিতে চাইল। এমন ভাবে, যাতে সে স্বেচ্ছায় নিজের এই অবদমনকেও অনুমোদন জানায়, সহায়ক পর্যন্ত হয়ে ওঠে। তাই, পিতৃতন্ত্র নারীর চারপাশে যে গণ্ডি টেনে দিল তার সমীচীনতা প্রতিপাদনের লক্ষ্যে, ভারতবর্ষীয় সমাজের বাস্তবতায়, তৈরি হল পরিপূরক সাহিত্য, অতিকথা। গজিয়ে উঠল ধর্মশাস্ত্রীয় হাজারো বিধান, আচার অনুষ্ঠান, অনুশাসন, পাপপুণ্যের তত্ত্ব। পদে পদে চেতাবনি— শাস্তিদানের অকৃপণ আয়োজন। প্রাত্যহিক জীবনযাপনের সঙ্গে মিশে এই সব এক সময় নারীর চিন্তাচেতনার গভীরে চারিয়ে গিয়ে তৈরি করল আধিপত্য-আনুগত্যর সুস্পষ্ট বুনট। পুরুষের তো বটেই, নারীর কাছেও তা স্বাভাবিকতায় হয়ে দাঁড়াল কোনও স্বতঃসিদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়মেরই মতন— অলঙ্ঘনীয় ও সর্বজনীন। পুরুষের সামূহিক শ্রেষ্ঠত্ব ও শাসনের অধিকার নিয়ে মনে লেশমাত্র সংশয় থাকল না। নতজানু হয়ে সে স্বীকার করে নিল তার নারীজীবনের তুচ্ছতা, পুরুষের পায়ের নীচে, 'ওই আসন তলে', নিজের অবস্থান। সে বিশ্বাস করল যে, তার মন স্বভাবতই চঞ্চল, দুর্বল, পাপপ্রবণ। পুরুষের আয়োজনের সব কিছু বিপথগামিতা থেকে তাকেই রক্ষা করবার জন্য, তাঁর 'সতীত্ব', 'পবিত্রতা' অক্ষুণ্ণ রেখে, সমাজের মঙ্গলের জন্য। তার বেঁচে থাকাটুকুও নিজের প্রয়োজনে নয়, স্বামী-পুত্র-পরিবারের প্রয়োজনে। তার নারীজন্মের একমাত্র সার্থকতা

এই আত্মসমর্পণে, আত্মবিলোপে। নারীর পক্ষে চরম অবমাননাকর, নিপীড়নমূলক প্রতিটি প্রথা, আচার অনুষ্ঠান— সতীদাহের বর্বরতা পর্যন্ত— বিস্তর শাস্ত্রবচনের সুবাদে এক রকম মাহাত্ম্য অর্জন করে বসল। তারই সঙ্গে ছিল, যাকে উমা চক্রবর্তী বলেছেন 'ব্রাহ্মণ্যবাদী পিতৃতন্ত্রে'র 'ওস্তাদের মার' বা 'masterstroke of genius'— সেই 'স্ত্রীধর্ম' বা 'পতিব্রত ধর্ম'-র সুকৌশলী প্রয়োগ। জাতিভেদ প্রথার আনুকূল্যে সেটাই বাজিমাত করল অনায়াসে। 'স্ত্রীধর্ম' ও পাতিব্রত্যের আদর্শে গভীরভাবে আস্থাশীল উচ্চবর্ণের হিন্দু নারী নিজের যৌনতাকে শাসনে রাখার দায়িত্ব নিজেরই হাতে নিয়ে নিল স্বেচ্ছায়, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে। ফলে, নারীর জৈবিক দিকগুলির উপর বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণের জন্য পিতৃতন্ত্রের নিরন্তর পাহারাদারির প্রয়োজনীয়তা অনেকখানিই কমল। তা ছাড়া, পিতৃতন্ত্রের ভাবাদর্শের এই আত্তীকরণ নারীসমাজের একাংশকে সহযোগী করে নিয়ে তার ভাবমূর্তি কিঞ্চিৎ বাড়াতে ও স্থায়িত্ব লাভে সহায়তা করল। অন্যদিকে, বৃহত্তর নারীসমাজের ভিতরেও তা এনে দিল বিভেদ ও বৈষম্য। এই ভাবে, কয়েক হাজার বছর ধরে, সুবিন্যস্ত ও বহুস্তর ভারতবর্ষীয় সমাজে জাতিভেদ প্রথা, পরিবার কাঠামো ও বিবাহপদ্ধতির শক্ত জমির উপরে এক দুর্মর পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শ পরিপুষ্ট হয়ে উঠল। তার প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া যেমন সম্ভব ছিল না, তেমনি সমাজমানসের কোথাও না কোথাও অনিবার্য ভাবেই উপ্ত হয়ে চলেছিল কিছু না কিছু প্রতিরোধের বীজ।

তিন

'So free am I, so gloriously free'– Mutta, *Therigatha* (B.C 600)

মুক্তির এই গান গেয়েছিলেন মুত্তা-নাম্নী কোনও এক 'থেরি' বা 'প্রৌঢ়া' ভিক্ষুণী। পিতৃতন্ত্রের পরাক্রম বৌদ্ধধর্মে যদিও কিছু কম ছিল না, এবং *জাতক*-এর বিভিন্ন গল্পে তার প্রতিফলনও সুপ্রচুর, তবু সংসারজর্জরিত অনেক অসহায় নারী বৌদ্ধসংঘারামের নিরাপদ আশ্রয়কে— সন্ন্যাসিনী জীবনের ক্লেশ-কৃচ্ছ্রতার ভ্রূকুটি সত্ত্বেও— এক সময় মুক্তির একমাত্র পথ হিসেবে দেখেছিলেন। তারই কিছু উচ্ছ্বাসময় সাক্ষ্য থেকে গেছে কারও কারও আত্মপরিচয়জ্ঞাপক কবিতায়/গানে।

'থেরিগাথা' খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতকে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের মুখে মুখে রচিত গান। ভারতে তো বটেই পৃথিবীর অন্যত্রের বিচারেও সম্ভবত, নারী-সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন। এ যাবৎ সন্ধান পাওয়া ৭৩টি থেরিগাথার ভিতরে ৭১টিই ভিক্ষুণীদের ব্যক্তিগত উচ্চারণ বলে অনুমান করা হয়। ভিক্ষুণী মুত্তার ওই গানে পুনর্জন্ম ও মৃত্যু থেকে মুক্তির প্রসঙ্গ তো ছিলই ('Freed from rebirth and death I am…'), কিন্তু সব কিছুরও আগে এবং ছাপিয়ে ছিল পিতৃতন্ত্রের ত্রিবিধ চিহ্ন তথা নাগপাশ— শিল, নোড়া ও অষ্টাবক্র স্বামী— থেকে মুক্তি লাভের কথা: '…Freed from three petty things—/From mortar, from pestle and from my twisted lord…/And all that has held me down/Is hurled away.'

একই ভাবে সংসারবন্ধনমুক্ত প্রব্রজ্যা জীবনে এসেও বঞ্চনাময়, যন্ত্রণাদগ্ধ অতীতকে ভুলতে পারেননি সুমঙ্গলমাতা বা সুমঙ্গলের মা। মুত্তার মতন সুমঙ্গলমাতাও সংঘজীবনের

প্রথম প্রাপ্তি হিসেবে, রান্নাঘরের একঘেয়ে দাসীবৃত্তি থেকে তাঁর নবলব্ধ অব্যাহতিরই জয়গান করেছেন: 'A woman well set free! How free I am/ How wonderfully free, from kitchen drudgery.' বলেছেন, কী ভাবে নিত্যদিনের ঝুলকালির মলিনতা, ক্ষুধা, 'শূন্য হাঁড়িকড়াই' ও নিষ্ঠুর দারিদ্র্য থেকে রেহাই মিলেছে এখানে। রেহাই মিলেছে নির্দয় বিবেকহীন স্বামীর হাত থেকেও, যার মনে তাঁর জন্য সহানুভূতির লেশমাত্র ছিল না: 'Free from the harsh grip of hunger/And from empty cooking pots/Free too of the unscrupulous man...'। আছে সোনা নামে আর এক ভিক্ষুণীর আত্মবিবৃতি। স্বামীর সন্ন্যাসগ্রহণের পর নিজের পুত্র-পুত্রবধূদের সংসারে তাঁর অশেষ লাঞ্ছনা তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে তিনি অবাঞ্ছিত। আহত আত্মসম্মান নিয়ে তাই তাঁর প্রশ্ন: যে-সংসারে মর্যাদার কোনও আসন তাঁর জন্য নেই, সেখানে থেকে তিনি কী করবেন? ('What have I to do with living in a house/where no regard is shown to me'?)

পিতৃতন্ত্রের শাসন-পীড়িত নিরুপায় সংসারবিরাগী নারীদের একাংশ এই ভাবে তাঁদের ক্ষতবিক্ষত দুর্বহ জীবনে কিছু নিরাময় পেতে চেয়েছিলেন ধর্মের আশ্রয়ে। পিতৃতন্ত্রের 'চরণতলাশ্রয়' থেকে নিজেদের 'ছিন্ন' করার সাহসী সংকল্পের ভিতরে হয়তো ধরা ছিল সে যুগের 'মৃণাল'দের আত্মপরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা, প্রতিবাদ। একই সঙ্গে, ভাবীকালের দোসর হবার প্রতিশ্রুতি ও কিছু স্ফুলিঙ্গ।

চার

'...Oh,/Of all things upon earth that bleed and grow,/A herb most bruised is woman...'— Euripides, *Medea* (B.C. 431)

ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে, দেশ-কাল-সংস্কৃতি ভেদে সর্বত্র, পিতৃতন্ত্রের নিপীড়নমূলক আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা গেছে। সেখানে অবদমিত নারী সমাজের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকে, বিবেকের তাড়নায়, বিচ্ছিন্নভাবে, সরব ও সক্রিয় হয়েছেন পুরুষেরাও। তাঁরা নিজেরা পিতৃতান্ত্রিক 'megapattern' বা 'মহানকশা'র বাইরে নন যদিও, তবু পিতৃতন্ত্রের ভাবাদর্শ তাঁদের দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন ও আবিল করতে পারেনি। তাই তাঁরা চেয়েছেন, নারী তার প্রাপ্য স্বাভাবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হোক, মনুষ্যত্বের যথার্থ স্বীকৃতি অর্জন করুক।

পিতৃতন্ত্রবিরোধী এই রকম কিছু শাণিত উচ্চারণ সাহিত্যের আঙিনায় শোনা গিয়েছিল *থেরিগাথা*-র প্রায় সমসময়ে, মাত্র একশো বছরের ব্যবধানে, অন্য দেশ অন্য এক সংস্কৃতির পটভূমে— খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের গ্রিসে। সেখানে নারীর জবানিতে তার প্রতি পুরুষ আধিপত্যাধীন সমাজের নির্দয়তাকে অনাবৃত করেছিলেন সোফোক্লেস (খ্রি. পূ. ৪৯৬-৪০৬) ও ইউরিপিদিস (খ্রি. পূ. ৪৮৪-৪০৬)।

প্রোক্নির প্রতি তার স্বামী তেরিউস-এর চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রোক্নির প্রতিশোধ গ্রহণের সুপরিচিত পৌরাণিক কাহিনি নিয়ে সোফোক্লেস-এর হারিয়ে যাওয়া বিয়োগান্ত নাটক *তেরিউস* (খ্রি. পূ. ৪১৪)। *তেরিউস*-এর যে-ছিন্নাংশ এ যাবৎ মিলেছে, সেখানে

প্রোক্‌নির মুখে সোফোক্লেস এমন কিছু কথা বলেছেন যা নাটকের সীমিত প্রয়োজন অতিক্রম করে অনায়াসেই হয়ে উঠতে পেরেছে সে যুগের (শুধু সে যুগেরই বা কেন) সমগ্র নারী সমাজের এক সাধারণ প্রতিচ্ছবি। নারীজীবনের তুচ্ছতার কথা মুক্তা বা সুমঙ্গলমাতারই মতন বলেছিল প্রোক্‌নি: 'এখন, পিতৃগৃহের বাইরে আমার কোনও অস্তিত্ব নেই... মেয়েদের অবস্থার কথা আমি অনেকবার এদিক থেকে ভেবে দেখেছি যে, সত্যি কোনওই দাম নেই আমাদের ('...now outside my father's house I am nothing,... often I have looked on women's nature in this regard, that we are nothing')। মেয়েদের জীবনের চিরপরিচিত কিছু ঘটনাক্রম ও নিরাপত্তাহীনতার কথা বলেছে সে, বলেছে তাদের অসহায় আত্মসমর্পণের কথা: '[বিয়ের] প্রথম রাতে স্বামীর সঙ্গে একবার জোয়ালে বাঁধা পড়ার পর সব কিছু হাসি মুখে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় আর আমাদের থাকে না' ('...once the first night has yoked us to our husband, we are forced to praise and to say that all is well')। 'নিজের' কথা বলতে বলতে প্রোক্‌নি 'নিজেদের' কথা বলে— নাট্যকার তাকে দিয়ে বলান— আর ক্ষণকালের জন্য হলেও সে হয়ে ওঠে অত্যাচারিত নারী সমাজের একজন প্রতিনিধি।

এর প্রায় ১৭ বছর আগে ইউরিপিদিসও তাঁর প্রসিদ্ধ নাটক *মেদেয়া* (খ্রি. পূ. ৪৩১)-তে প্রায় একই পদ্ধতিতে মেদেয়াকে নিজের মুখপাত্র, তাঁর নারীবাদী ভাবনার বাহন করে তুলেছিলেন। ইউরিপিদিসের একেবারে প্রথম পর্যায়ের এই নাটকেও সেই পুরুষের বিশ্বাসভঙ্গ ও নারীর প্রতিহিংসা গ্রহণের সুপ্রাচীন কাহিনি। কলচিসের রাজকন্যা মেদেয়া রাজচ্যুত ভাগ্যান্বেষী জেসনকে ভালবেসে, নিজের স্বজনদের বিরুদ্ধে গিয়ে, তাকে রক্ষা করেছিল। নিজের ভাইকে হত্যা করে তার প্রাণ পর্যন্ত বাঁচিয়েছিল, দেশ ছেড়েছিল তার সঙ্গে। তার পথ নিষ্কণ্টক করবার জন্য নতুন করে রক্তপাত ঘটাতেও দ্বিধা করেনি। এত কিছুর প্রতিদানে জেসনের কৃতঘ্নতা শেষ পর্যন্ত মেদেয়ার ভিতরে প্রতিহিংসার ভয়ংকর আগুন জ্বালিয়ে দিল। তার আবেগের এই অগ্ন্যুৎপাতকেই উপলক্ষ করলেন ইউরিপিদিস, করিন্থ-এর সমবেত নারীদের উপস্থিতিতে, মেদেয়ার উচ্চারণে তিনি শোনালেন নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চূড়ান্ত বঞ্চনা, হৃদয়হীনতার সেই কালোত্তীর্ণ, মর্মস্পর্শী বিবরণ। মেদেয়া বলল: পৃথিবীতে সব চাইতে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত প্রাণি এই মেয়েরা। বিয়ের ওই একটি দিনের জন্য সোনাদানা জমিয়ে ভালবাসা কিনতে হয় আমাদের, অথচ জীবনে যে আসে সে আমাদেরই শরীরের মালিক হয়ে দাঁড়ায়! ('We must pay/our store of gold.../to buy us some man's love; and lo, they bring/A master of our flesh!/There comes the sting of the whole shame....')। তারপর, ভালমন্দ যাই ঘটুক, স্বামীর হাত থেকে কোনও নিস্তার নেই, ছেড়ে আসার সব রাস্তা বন্ধ...। ক্ষমাঘেন্না করে স্বামী যদি কিছুটা সহ্য করে বা জোয়ালটা একটু হালকা ভাবে কাঁধে চাপায়, সেটা সাতজন্মের পুণ্য। না হলে, মৃত্যু ছাড়া কিছু তাকে বাঁচাতে পারবে না। দিনের পর দিন এক মুখ দেখে অরুচি ধরলে স্বামী বাইরে, অন্য ফুর্তির জায়গায় মন ভাল করে আসতে পারে। কিন্তু সে তো শিকলে বাঁধা এক জনেরই সঙ্গে, তাকে ঠায় ওই একজনের দিকে তাকিয়েই অপেক্ষা করে যেতে হবে।

বীরত্বের বড়াই করে পুরুষেরা, বলে, যুদ্ধের মুখোমুখি হয় তারাই, আর মেয়েরা সব বিপদ থেকে গা বাঁচিয়ে, নিরাপদ আশ্রয়ে বাড়িতে বসে থাকে। মেদেয়া ঘোষণা করল, তার কাছে একটি সন্তানের জন্ম দেওয়ার চাইতে তিনবার ঢাল হাতে যুদ্ধে যোগ দেওয়া অনেক সহজ কাজ ('...Sooner would I stand/Three times to face their battles, shield in hand/Than bear one child')।

নাটকের অন্য এক তুঙ্গ মুহূর্তে মেদেয়ার মুখে তার আসন্ন জয়ের ঘোষণাও শুনিয়েছিলেন ইউরিপিদিস— এক ব্যঞ্জনাগর্ভ উচ্চারণে— এবং তার অনুরণন পৌঁছে গিয়েছিল সরাসরি বিশ শতকের দোরগোড়ায়।

পাঁচ

'At last the victory dawneth!' Euripides, *Medea*

'নারীর মর্যাদা অর্জনের মুহূর্ত, তার জয়ের লগ্ন আর দূরে নয়'— মেদেয়ার এই প্রবল আশাবাদী উচ্চারণ হয়ে উঠেছিল বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের ইংলন্ডে নারী ভোটাধিকার আন্দোলনের অন্যতম প্রিয় রণধ্বনি। সাফ্রাজেটরা তখন কীভাবে মেদেয়ার 'নারীবাদী ভাষণ' পাঠ করে তাঁদের সভা শুরু করতেন, সে কথা লিখতে ভোলেননি গ্রিক সাহিত্য বিশেষজ্ঞ মোজেস হাডাস, গ্রিক নাটক বিষয়ে তাঁর এক গ্রন্থে।

অন্যদিকে, ওই শতকেরই শেষ দশকে নতুন অনুবাদে, পুনরাবিষ্কৃত *থেরিগাথা*-র মুক্তির গানকেও আমরা হয়ে উঠতে দেখেছি সমকালীন ভারতবর্ষে নারী আন্দোলনের এক সগর্ব উত্তরাধিকার।

এই ভাবেই ইতিহাস সময় সময় পিছন থেকে এসে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, হাতে হাত রাখে। আড়াই হাজার বছরের ব্যবধানও চকিতে মুছে যায়।

'The hour of women's honour draws nigh'— বলেছিল বটে মেদেয়া, কিন্তু আমরা সেই রকম এক আগামীর দিকে এখনও তাকিয়ে, যখন পৃথিবীর আলো দেখার জন্য মাতৃজঠরের অন্ধকারে কোনও কন্যা সন্তানকে আর পিতৃতন্ত্রের করুণাপ্রার্থী হয়ে অপেক্ষায় থাকতে হবে না— এমনই এক প্রকৃত মর্যাদাময় সুপ্রভাত— যার উদ্দেশে আমাদের এই সংকলনের যাবতীয় সম্ভাষণ।

সম্পাদনা ও প্রকাশনা বিষয়ক নিবেদন

সম্পাদনা প্রসঙ্গে

বিয়াল্লিশ জন সুখ্যাত লেখক, ঐতিহাসিক, শিক্ষাবিদ ও গবেষকের রচনায় সমৃদ্ধ এমন এক সংকলনে পাঠক ও লেখকের ভিতরে কোনও সম্পাদকীয় মধ্যস্থতার কি আদৌ প্রয়োজন থাকে? মনে হয়, এ রকম ক্ষেত্রে, সম্পাদকের ভূমিকা বিষয়-নির্বাচন, গ্রন্থনা ও পরিবেশনের দায়িত্ব পালনে আবদ্ধ থাকাই শ্রেয়। যে কারণে, ওই সংক্রান্ত সামান্য কয়েকটি কথার শুধু এখানে অবতারণা:

১. সংকলনের প্রয়োজনে, বিষয়গত কিছু সুনির্দিষ্ট প্রাথমিক পরিকল্পনা সামনে রেখে, আমরা লেখকদের কথা ভেবেছি। যাকে বলে 'অবধারিত পছন্দ'— তেমন কিছু নাম নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু আমরা সাধ্যমতন চেয়েছি এর জন্য উপযুক্ত এক লেখকসূচি তৈরি করে নিতে। বিপরীতটি যে সাধারণভাবে ঘটেনি, পুরোধাস্থানীয় প্রবীণদের পাশে গা ঘেঁষে থাকা অনেক নবীন গবেষকের স্বচ্ছন্দ উপস্থিতিই তার সাক্ষ্য দেবে।

২. সংকলনের প্রস্তুতিতে আমাদের অনতিপ্রচ্ছন্ন অভিপ্রায় ছিল বাংলার নারীসমাজের একটি আনুপূর্বিক ও বহুমাত্রিক ইতিহাসের কিছু উপাদান সংগ্রহ ও কোলাজ নির্মাণ। সূচিপত্রে পাঠক হয়তো লক্ষ করবেন, প্রথম অংশের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষীয় সমাজে নারীর অবস্থান সংক্রান্ত আলোচনার পর্ব অতিক্রম করে (বঙ্গনারীর প্রসঙ্গ যদিও স্বতন্ত্র গুরুত্বে আলোচিত সেখানে), দ্বিতীয় অংশে আমাদের মনোযোগ উনিশ (এবং, সংগতভাবে, বিশেষত উনিশ) ও বিশ শতকের বঙ্গদেশের অণুবিশ্বে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এর ফলে পাঠকের প্রাপ্তি গভীরতায় বাড়বে, এমনতর বিশ্বাস থেকে আমাদের এই স্বেচ্ছাবৃত আঞ্চলিকতা।

৩. অবশ্য সর্বভারতীয় প্রসঙ্গও ইতস্তত, নানা সূত্রে উঠে এসেছে বহুবার, বিভিন্ন জনের লেখায়। বহির্বিশ্বও আলোচনায় কম গুরুত্ব পায়নি। এবং ইতিপূর্বে প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হলেও, পশ্চিমি দুনিয়ায় উদ্ভূত তত্ত্ব ও আন্দোলনের বিবরণ-বিশ্লেষণের গোটাটাই আমরা সরিয়ে রেখেছিলাম শেষতম পর্বের জন্য। তথ্য আগে, পরে তত্ত্ব— সংকলনে প্রবন্ধগুলির ক্ষেত্রে এটাই ছিল আমাদের পরিকল্পিত বিন্যাস।

৪. তথ্যে-বিশ্লেষণে কোনও ফাঁক সাধ্যমতন না রেখেও, অবিশেষজ্ঞ সাধারণ পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছনো অভীষ্ট বলে স্থির করে নিয়েছিলাম আমরা। সেই মর্মে অনুরোধ ছিল লেখকদের কাছে। তাঁরাও অত্যন্ত উদার ভাবে, সরলীকরণের যথেষ্ট ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও, তা স্বীকার করে নিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন।

৫. আন্তরিক ভাবে চাইলেও, অনেকগুলি জরুরি বিষয়ে আমরা লেখা সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি। কেন পারিনি, সে কাহিনি অনুক্ত থাকা ভাল। তবে, এই ধরনের উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রয়াসের ক্ষেত্রে সাধ ও সাধ্যের ইপ্সিত সংযোগ ঘটানো কখনওই যায় না, অতৃপ্তি অনিবার্য। তাই শেষ পর্যন্ত, অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যা অর্জন করা গেল, তার সমাদরযোগ্যতার বিচার পাঠক করবেন।

কলকাতা শহর থেকে একশো কুড়ি কিলোমিটার দূরে, বর্ধমানের দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান শ্যামসুন্দর মহাবিদ্যালয়। আপনার মুখ আপনি দেখবার প্রচলিত ঘরানার বাইরে ঈষৎ ব্যতিক্রমী চরিত্রের এক স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে সে চেয়েছে তার হীরকজয়ন্তী উদ্‌যাপন করতে এবং এইভাবে বৃহত্তর সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতার কিছু স্বাক্ষর রাখতে।

এমত ভাবনার ভিতরে যে দুঃসাহস ও অভিনবত্ব তার জন্য প্রথম মুক্তকণ্ঠ স্বীকৃতি অবশ্যই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ দেবপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায়-এর প্রাপ্য। বস্তুত, তাঁর উদ্যোগ-সহযোগ এবং বর্তমান সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অকুণ্ঠ সমর্থন না থাকলে এই সংকলন কখনওই তৈরি হতে পারত না। বিষয় ও লেখক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সম্পাদকের স্বাধীনতা চূড়ান্ত ছিল বললেও কম বলা হয়।

এমন বড় মাপের একটি কাজ যে বহু মানুষের শুভেচ্ছা-সহায়তার উপর নির্ভর করে তা বলা বাহুল্য। এবং শুরুতেই যে কারণে, কৃতজ্ঞতা জানানো প্রয়োজন সংকলনের সেই বিশিষ্ট লেখকবর্গকে— অপরিসীম কর্মব্যস্ততার ভিতরেও যাঁরা আমাদের অনুরোধকে অবহেলাযোগ্য মনে করেননি। এ ছাড়াও, যাঁদের কাছে স্বতন্ত্রভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সম্পাদকের নৈতিক কর্তব্য তেমন কিছু নামের উল্লেখ এখানে।

শুভার্থী ও সুহৃদজনের ভিতরে আছেন— যশোধরা বাগচী, প্রশান্ত রায়, ভবেশ দাশ, স্বপন বসু, শুচিব্রত সেন, কনককান্তি দে, কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপক গুপ্ত, সুমনা দাস সুর, কুন্তলা ঘোষ, বিপ্লব দাশ, রাখকৃষ্ণ দে, রাধানাথ পাইন, সৈকত সিংহরায় ও নীলা বোস। সাহায্য পেয়েছি শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিতা দাস-এর কাছে।

সম্পাদনার প্রতিটি স্তরে পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য যথারীতি নির্ভর করতে হয়েছে যে বন্ধুদের উপর তাঁরা হলেন প্রভাতকুমার দাস, সলিল বিশ্বাস ও অভ্র ঘোষ। একই কারণে, সহকর্মী ও সুহৃদ বিশ্বজিৎ ব্রহ্মচারীর ভূমিকাও পৃথক উল্লেখের দাবি রাখে।

তা ছাড়া নিয়মিত পরামর্শ দিয়েছেন ও মনোবল জুগিয়েছেন যে সব সহকর্মী তাঁদের মধ্যে আছেন বলরাম ঘোষ, অচিন্ত্য রায়, মহম্মদ আবদুল্লা, আশিস বসু ও গৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহায্য করেছেন ঝর্না বর্মন, শর্মিষ্ঠা সেন, অনিন্দিতা লায়েক, অরিন্দম লাহা, নৌসাদ আলি, সমর মণ্ডল ও ধীরেন মাহাতো। চাঁদু মজুমদার ও সুকুমার দাসের সহযোগিতাও ভুলে যাওয়ার নয়।

এত কিছুর ভিতরেও শেষ পর্যন্ত মনে কিছু আপশোস থেকে গেল তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে। প্রস্তাবিত সংকলনে লেখার বিষয়ে আগ্রহ ছিল তাঁর। রডন স্ট্রিটে তাঁর আবাসে এই মর্মে কথা হয়েছিল সম্পাদকের সঙ্গে। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাক্রম তা অসম্ভব করে তুলল।

অক্ষর বিন্যাসের দায়িত্ব অভ্যস্ত নৈপুণ্যে পালন করেছেন অমল দত্ত। বর্ণশুদ্ধির গুরুভার ছিল হাসির মল্লিকের উপর। খ্যাতিমান শিল্পী বিপুল গুহর প্রচ্ছদ গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

সবশেষে, বৃহদায়তন এই স্মারক গ্রন্থের মুদ্রণ দায়িত্ব সাগ্রহে নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন মানে ও মর্যাদায় ইতিমধ্যেই ব্যতিক্রমী ও বিশিষ্ট হয়ে ওঠা প্রকাশন সংস্থা গাঙচিল। তার জন্য আমরা গাঙচিল-এর কর্ণধার অণিমা ও অধীর বিশ্বাসের কাছে কৃতজ্ঞ।

এক

সুকুমারী ভট্টাচার্য

প্রাচীন ভারতে নারী

চলতি একটা ধারণা আছে প্রাচীন ভারতে নারী নাকি অনেক বেশি স্বাধীন ছিল। অন্তত বৈদিক যুগে। তেমনই আর একটা ধারণা ছিল যে ভারতে মুসলমান (তখন পাঠান) সাম্রাজ্য স্থাপিত হবার আগে ঘোমটা, পর্দার বালাই ছিল না, মেয়েরা ছিল স্বাধীনচারিণী। এসব ক'টি ধারণাই ভ্রান্ত। যখন আর্যরা এ দেশে আসে তখন সম্ভবত তাদের মধ্যে নারীর অবনমন ততটা ঘটেনি। ঋগ্বেদের একটি শ্লোকার্ধে পড়ি: 'স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনে চিৎ'— অর্থাৎ 'নারী জনসমাজে নিজের বন্ধু বেছে নিত'। এ বন্ধু সারা জীবনের সঙ্গী হলে স্বামীই হয়। মানে স্বামীকে পছন্দ করে বিয়ে করার স্বাধীনতা নারীর ছিল। এটা বড় একটা স্বাধীনতা নিশ্চয়ই, কিন্তু সেটা কতদিন ছিল? মুসলমান রাজত্বের আগে পর্যন্ত! কদাপি না। ওই ঋগ্বেদেই নারীর অবনমনের যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে 'পুরুষ খেয়ে এঁটোটা স্ত্রীকে দেবে' ('ভুক্তোচ্ছিষ্টং বধ্বৈ দদ্যাৎ')। অথবা, স্ত্রী ছায়ার মতো স্বামীর অনুগামিনী হবে। এ সব দিয়ে কী বোঝা যায়? সুপ্রাচীন যুগে খানিকটা স্বাধীনচারিণী থাকলেও অচিরেই নারী পুরুষের বশংবদ ও আজ্ঞাবাহিকায় পরিণত হল।

এ চিত্র কিন্তু বিদেশের প্রাচীন সাহিত্যেও দেখা যায়। সেখানেও গত দু'শতক আগেও যথেষ্ট পণ দিতে হত পাত্রীপক্ষকে, এবং সর্বতোভাবে হীন বলে প্রতিপন্ন করা হত নারীকে। ভারতবর্ষও এর ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু এখানে শাস্ত্র সম্পূর্ণ ভাবে নারীর অবনমনের পক্ষে। নারী জন্মগতভাবে পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট; গুণে, জ্ঞানে, শক্তিতে যোগ্যতায়— তাই তাকে পুরুষের এঁটো খেতে হবে। তাই তার নিজের দেহের ওপরে বা অর্থের ওপরে কোনও অধিকার থাকবে না।

ভুলে গেলে চলবে না যে, ভৃ ধাতুতে ন্যৎ প্রত্যয় দিলে স্ত্রীলিঙ্গে হয় ভার্যা; আর সেই ভৃ ধাতুতে ক্যপ প্রত্যয় দিলে পুংলিঙ্গে হয় 'ভৃত্য'; দু'জায়গাতেই মানে হল যাকে ভরণ করা হয়, অর্থাৎ অন্নের জন্য দাসী হল স্ত্রী, ভার্যা; আর অন্ন দিয়ে যাকে পোষণ করা হয় সে ভৃত্য। যেটি অনুচ্চারিত তা হল, উভয় ক্ষেত্রেই অন্নটাও অর্জন করতে হত কায়িক শ্রম দিয়ে। অর্থাৎ স্বামী নিছক প্রেমের বশেই স্ত্রীকে ভরণ করত না, স্ত্রী অন্নের বিনিময়ে নিজের

শ্রম দিত। এবং এ চিত্র অন্য দেশেও প্রাচীনকালে একই রকম ছিল।

কেন? কারণ সমাজটা ছিল পুরুষতান্ত্রিক, অর্থাৎ পুরুষই নিয়ন্ত্রণ করত সমাজের বিধিনিষেধ। ফলে গণতন্ত্রের প্রভাবে যখন নারী ও পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হল, তখন নারী অনেকটাই স্বাধীনতা পেল, নিজের উপার্জিত অর্থ তার নিজেরই রইল। শুধু যেখানে উৎপীড়ক স্বামী শ্বশুর সে অর্থ নিজেরা কেড়ে নিত, যেমন এখনও বিস্তর পরিবারে ঘটে, কারণ পুরুষতান্ত্রিক প্রভাব এখনও সমাজ থেকে মুছে যায়নি।

আর একটি অবশেষ রয়ে গেছে পুরুষতান্ত্রিকতার, তা হল, নারীর হীনতা সম্বন্ধে সমাজ (অর্থাৎ প্রধানত পুরুষ) নিঃসন্দেহ। বেদে আছে, কালো সাপ, শকুনি, বিষ, ক্ষুর ইত্যাদির চেয়েও বিষাক্ত নারী। মুখে স্বীকার না করলেও নারী পুরুষ উভয়েরই অবচেতনে এ বোধ আছে। নারী বলছি এ কারণে যে, যে পরিবারে নারী নির্যাতন হয় সেখানে প্রায় সর্বদাই শাশুড়ি ননদ এতে অংশগ্রহণ করে, যদিও নারী হিসেবে তাদের ভূমিকা অন্য রকম হওয়াই প্রত্যাশিত ছিল।

এ সবেরই উৎপত্তি বেদেই। বেদে কবে নারী সঙ্গী নির্বাচন করত সে সুদূর ধূসর অতীত বহু দিন মিলিয়ে গেছে, তার স্মৃতিও মলিন। বেদের অধিকাংশ জুড়ে নারীর যে অবনমন তারই অনুরণন পরবর্তী সাহিত্যে। তাই নারী রয়ে গেল একটি ভোগ্যবস্তু হিসেবে, যাকে অনায়াসেই পাওয়া যায় বিবাহসূত্রে এবং যাকে যেকোনও অত্যাচার করা যায় শাস্ত্রের অনুমোদনসহ। ইদানীং বিষ, আগুন, কণ্ঠরোধ, ধর্ষণান্তে অগ্নিসংযোগ, গণধর্ষণ ইত্যাদির মধ্যে নারীর সামাজিক অবস্থান ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এখন, যখন এসবের আশু প্রতিকার অবশ্য কর্তব্য, এখনও এ সব বেড়েই চলেছে। ভরসার কথা, কিছু কিছু নারী ও নারী সংস্থা এর বিরুদ্ধে এখন রুখে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু যেপর্যন্ত না পুরুষ এই প্রতিবাদে অগ্রণী অথবা সমান ভূমিকা নেবে সেপর্যন্ত এর কোনও যথার্থ প্রতিকার হবে না। বেদে যে অন্যায়ের বীজ, তা উৎপাটন করার সময় বহুদিন গত হয়েছে। আর দেরি করলে নারীর এবং পুরুষের অক্ষয় কলঙ্ক থেকে যাবে ইতিহাসে।

করুণাসিন্ধু দাস

'অর্ধেক মানবী'

১. নানা নারীং নিষ্ফলা লোকযাত্রা

মহাভারতের বনপর্বে (২০৫-২০৬ অধ্যায়) ঋষি মার্কণ্ডেয়ের মুখে শুনি— অন্য সব গুরুজনেরা যেমন মান্য, একপত্নী স্ত্রীও তেমনি শ্রদ্ধার পাত্র (মান্যা হি গুরবঃ সর্বে একপত্ন্যস্তথা স্ত্রিয়ঃ। বনপর্ব ২০৫/৫)। কেন না, পতিব্রতার কর্তব্য বেশ দুরূহ (পতিব্রতানাং শুশ্রূষা দুষ্করা প্রতিভাতি মে।—তদেব)। গর্ভে সন্তান ধারণ এবং তার লালনপালন তো আছেই (প্রজায়ন্তে সুতান্ নার্যো দুঃখেন মহতা বিভো। পুষ্ণন্তি চাপি মহতা স্নেহেন দ্বিজপুঙ্গব।। বনপর্ব, ২০৫/৬)। তার সঙ্গে আছে ক্রূরকর্মা পতিদেবতা (!) এবং অন্যান্যদের লাঞ্ছনা, অসম্মান, উপদ্রব সহ্য করে নিজের কর্তব্যকর্ম চালানো। (যাশ্চ ক্রূরেষু সত্ত্বেষু বর্তমানা জুগুপ্সিতাঃ/স্বকর্ম কুর্বন্তি সদা দুষ্করং তচ্চ মে মতম্।। বনপর্ব, ২০৫/১৩)। পতি-শুশ্রূষাই স্ত্রীর স্বর্গলাভের পথ (যা তু ভর্তরি শুশ্রূষা তয়া স্বর্গং জয়ত্যুত।। বনপর্ব ২০৫/১৪)। যাগযজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, উপবাস— ওসবে তার অনধিকার (নৈব যজ্ঞক্রিয়াঃ কাশ্চিন্ন শ্রাদ্ধং নোপবাসকম্।—তদেব)। পতিই তার দেবতা (দৈবতং চ পতিং মেনে ভর্তুশ্চিত্তানুসারিণী। কর্মণা মনসা বাচা নান্যচিত্তাভ্যগাৎ পতিম্।। বনপর্ব, ২০৬/১৩)। পতির মন বুঝেই তাকে চলতে হয়। কথায়, কাজে, চিন্তায় পতিই তার লক্ষ্য। আর আছে শ্বশুর, শাশুড়ি, কুটুম্ব, অতিথি, দেবতা, ভৃত্য সকলের হিতসাধন। (সাধ্বাচারা শুচির্দক্ষা কুটুম্বস্য হিতৈষিণী।। বনপর্ব ২০৬/১৪। ভর্তুশ্চাপি হিতং যদ্ যৎ সততং সানুবর্ততে। দৈবতাতিথি—ভৃত্যানাং শ্বশ্রূশ্বশুরয়োস্তথা।। বনপর্ব ২০৬/১৫)। বস্তুত পত্নীকেই গৃহস্থের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, মুখ্য সহযোগী এবং পীড়িতদশায় শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলতে দেখেছি মহাভারতের অন্যত্র। ভাগবতপুরাণে তার প্রতিধ্বনি করে বলা হল— স্ত্রীহীন সংসার যেন বিকল রথ; পত্নীই ভবার্ণবতরণে আসল নৌকা!

> (যদি ন স্যাদ্ গৃহে মাতা পত্নী বা পতিদেবতা।
> ব্যঙ্গে রথ ইব প্রাজ্ঞঃ কো নামাসীত দীনবত্।।
>
> ভাগবত ৪/২৬/১৫

ক্ক বৰ্ততে সা ললনা মজ্জন্তং ব্যসনার্ণবে।
যা মাম্ উদ্ধরতে প্রজ্ঞাং দীপয়ন্তি পদে পদে॥
তদেব ৪/২৬/১৬)

কালিদাসের শকুন্তলা পতিগৃহে যাওয়ার সময় কণ্বমুনির কাছ থেকে উপদেশ হিসেবে এমন একজন পত্নী হয়ে ওঠার নির্দেশিকাই পেয়েছিলেন। গুরুশুশ্রূষা, সপত্নীদের সঙ্গে প্রীতিব্যবহার, স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কদাচ কিছু না করা (ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি মাস্ম প্রতীপং গমঃ/শকুন্তল ৪/১৮) ইত্যাদি বলে স্নেহশীল পিতা অবশেষে সাবধান করতে ভোলেননি— বামা কুলস্যাধয়ঃ অর্থাৎ অন্যথা হলে মেয়েদের সংসারে অবাঞ্ছিত আধিব্যাধি গণ্য করা হয়। অনুকূল পতিব্রতা পত্নী 'গৃহিণী সচিবঃ সখী' হয়ে কতদূর পতির ভালবাসা পেতে পারেন রঘুবংশে অজ ইন্দুমতী দম্পতির কাহিনি, তার প্রমাণ। স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করা চলে না, গর্ভদশায় তার সুরক্ষা বিধেয়— এ কথা বেদের যুগেও মানুষ মেনেছেন (ঐতরেয় ২/১/২)। একাকী পতি কিংবা পত্নী আধখানা শস্যবীজ বই তো নয়! (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১/৪/৩)। মহাভারতের বনপর্বে সত্যভামাকে দ্রৌপদী তাই বলছেন— পত্যাশ্রয়ো হি মে ধর্মঃ...। স দেবঃ সা গতির্নান্যা...। ২৩২/৩৭। হিতোপদেশ যেন একথাটার ব্যাখ্যা করতেই বলেছে—

সা ভার্যা যা পতিপ্রাণা/সা ভার্যা যা পতিব্রতা।
...তুষ্টে ভর্তরি নারীণাং সতুষ্টাঃ সর্বদেবতাঃ॥
(হিত. ১/২০০-২০১)

পতিব্রতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে মেয়েরাই শুধু কর্তব্য করে যাবে, পুরুষ থাকবে নিষ্ক্রিয় দর্শক ও উপভোক্তা, এত বড় নির্লজ্জ পক্ষপাত কে মানবে? মনুস্মৃতি অতএব বলতে ভোলেনি— যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ। যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥ মনু ৩/৫৬)। অর্থাৎ, সংসারে মেয়েদের সম্মান সুনিশ্চিত হলে সেখানে দেবতার অধিষ্ঠান ঘটে। এর অন্যথা হলে, যা কিছু কাজ সবই নিষ্ফল চেষ্টা দাঁড়ায়! মনু এতদূর বললেন— ঘর-গেরস্থালিতে মেয়েদের চোখের জল যেন না-পড়ে! (শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তত্কুলম্। ৩/৫৭) পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের দায়িত্ব এখানে স্পষ্ট। অশন, বসন, ভূষণ কোথাও যেন মেয়েদের মনস্তাপ না-ঘটে (তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ। ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সৎকারেষূৎসবেষু চ॥ মনু ৩/৫৯)। অনাদরে অমর্যাদায় মেয়েরা যেখানে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ঘরসংসারের সমূলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

(জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥ মনু ৩/৫৮)

বিশেষত, সংসারের কল্যাণের জন্য স্বামী-স্ত্রীর সহৃদয় বোঝাপড়া, সানুরাগ সহযোগ আবশ্যক শর্ত। (সন্তুষ্টো ভার্যয়া ভর্তা, ভর্ত্রা ভার্যা তথৈবচ। যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং, কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্॥ মনু ৩/৬০)

গৃহস্থের বাড়িতে স্ত্রী, মা, বোন সবার জন্য ভেবে এমনভাবে সুবিবেচকসুলভ নির্দেশ সমাজশাস্ত্রীরা দিলে মাটির পৃথিবীকে সুখের স্বর্গ ভাবতে অসুবিধা থাকার কথা নয়। কাজকর্মে বুদ্ধিতে নারীসমাজ অগ্রণী হলে তো কথাই নেই। বেদে অপালা, মৈত্রেয়ী, গার্গী বাচক্লবী এমন নারী ঋষিদের দেখেছি। ধ্রুপদী ও পৌরাণিক সাহিত্যে দ্রৌপদী, গান্ধারী, মন্দোদরীর মতো বিচক্ষণ নারীচরিত্র সৃষ্টি করেছেন কবিরা। কল্পিত আদর্শ হিসেবে সে সব যত উন্নতই হোক, বাস্তব অবস্থায় ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান কেমন ছিল তা বুঝতে গেলে সাহিত্যের নিবিড় পাঠ আরও নিবিড় হওয়া চাই। পরস্পরবিরোধী, ভূষণ-দূষণের কারণ সন্ধানের সতর্ক দৃষ্টিও থাকতে হবে।

২. অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্যাঃ অথবা, পূজার ছলে তোমায় ভুলে থাকি

কালিদাসের সাহিত্যে দেখি, অপুত্রক থাকার অর্থ পিতৃপুরুষদের ঋণশোধ বন্ধ হওয়া, তাঁদের পিণ্ডলোপ ও অতৃপ্তি (পয়ঃ পূর্বৈঃ সনিঃশ্বাসৈঃ কবোষ্ণম্ উপভুজ্যতে।। রঘু. ১/৬৭)। সন্তান ইহলোক ও পরলোকে সুখ বিধান করে (সন্ততিঃ শুদ্ধবংশ্যা হি পরত্রেহ চ শর্মণে।। রঘু. ১/৬৯)। সুতরাং অপুত্রক দিলীপকে পুত্রলাভের আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে গুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে সস্ত্রীক ছুটে যেতে হয়। রাজা-প্রজা সকলের ক্ষেত্রেই অপুত্রক থাকার বাস্তব সমস্যাও তো কম নয়! শকুন্তলার ষষ্ঠ অঙ্কে রাজা দুষ্যন্ত গর্ভিণী পত্নীকে প্রত্যাখ্যানের অনুশোচনায় এইসব বাস্তব ও মানবিক ভাবনায় আকুল হয়ে পড়েছিলেন। অপুত্রক প্রজার সঞ্চিত অর্থসম্পদ রাজসরকারে বর্তানোর কথা। সমুদ্রপথে নৌকো নিয়ে ব্যবসা করতে গিয়ে ধনমিত্র নামে জনৈক বণিক মারা গেলে অমাত্য রাজার কাছে নোট পাঠাচ্ছেন— সমুদ্রব্যবহারী সার্থবাহো ধনমিত্রো নাম নৌব্যসনে বিপন্নঃ। অনপত্যশ্চ কিল তপস্বী। রাজগামী তস্যার্থসঞ্চয়ঃ...। রাজা নির্দেশ দিচ্ছেন— এতবড় ধনীব্যক্তির অনেক স্ত্রী থাকা স্বাভাবিক। তাঁদের কেউ যদি গর্ভিণী থাকেন, তবে সেই গর্ভস্থ সন্তান সম্পত্তির অধিকারী হবে (বহুধনত্বাদ্ বহুপত্নীকেন তত্রভবতা ভবিতব্যম্।...যদি কাচিদ্ আপন্নসত্ত্বা...। ননু গর্ভঃ পিত্র্যং রিক্থমর্হতি)।

বহুবিবাহ ধনী অভিজাত সমাজে নানা সামাজিক টেনশনও সৃষ্টি করেছিল, সন্দেহ নেই। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার গোপন বিবাহের আগে সখী অনসূয়া রাজাকে বলতে ভোলেননি— অন্তঃপুরে অনেক স্ত্রীর মধ্যে তাদের সখীর এমন দশা যেন না হয় যাতে তার আত্মীয়বর্গকে দুঃখ পেতে হবে (বহুবল্লভা রাজানঃ শ্রূয়ন্তে। যথা ইয়ং নো প্রিয়সখী বন্ধুজনশোচনীয়া ন ভবতি তথা নির্বর্তয়)। কামার্ত নায়কের চটজলদি আশ্বাস— 'পত্নী অনেক থাকলেও রাজত্ব আর আপনাদের সখী এই দুটি আমার কুলপ্রতিষ্ঠা'! পঞ্চম অঙ্কে হংসপদিকা নামে রানির করুণ বিলাপসংগীত শুনে বুঝতে অসুবিধা হয় না, প্রত্যেক রানির জীবনেই বিয়ের সময় এমন আশ্বাসবাক্য রাজার মুখ থেকে শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল! সতীনভর্তি সংসারে শকুন্তলার জন্য আর পাঁচজনের মতো সাধারণভাবে স্ত্রীর মর্যাদা প্রাপ্তির অতিরিক্ত কিছু আশা করা 'লৌকিকজ্ঞ' কণ্বমুনির পক্ষে সম্ভব হয়নি। (সামান্যপ্রতিপত্তিপূর্বকমিয়ং দারেষু

দৃশ্যা।...শকু. ৪/১৭)। তার বেশি কিছু হলে ভাগ্যের কথা (ভাগ্যায়ত্তমতঃ পরং...)। এটুকুর জন্যেও রাজবংশের দোহাই এবং শকুন্তলার গভীর প্রেমের উল্লেখ করতে হয়েছে কন্যার বৃদ্ধ পালকপিতাকে। কন্যা শকুন্তলাকে তাঁর উপদেশ— সতীনদের সঙ্গে প্রিয়সখীর মতো থাকবে, আর স্বামী বিরুদ্ধ আচরণ করলেও তুমি রাগের বশে তাঁর বিরুদ্ধ আচরণ কোরো না (কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে/ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ। শকু. ৪/১৮)। অন্তঃপুরের রানিদের সামাজিক অবস্থান নিয়ে এরপর আর কথা থাকে না। *মালবিকাগ্নিমিত্র* ও *বিক্রমোর্বশীয়* এই দুটি নাটকেও নতুন প্রেমিকাদের নিয়ে রানিদের সঙ্গে রাজাদের লুকোচুরি, মিথ্যাচার, ভণ্ডামির নিখুঁত ছবি এঁকেছেন কালিদাস। উর্বশীকে নিয়ে পুরূরবার প্রকট আদিখ্যেতার কাছে হার মেনে সমস্ত অভিমান চাপা দিয়ে পাটরানিকে বলতে হয়েছে 'অদ্য প্রভৃতি যাং স্ত্রিয়ম্ আর্যপুত্রঃ প্রার্থয়তে, যা চ আর্যপুত্রস্য সমাগমপ্রণয়িনী, তয়া সহ মম প্রীতিবন্ধেন বর্তিতব্যম্' (বিক্রম. ৩)। রাজা যাকে চান, আর যিনি রাজাকে চান, তাঁকে আত্মীয় বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কী? অতএব 'অহং খলু আত্মনঃ সুখাবসানেন আর্যপুত্রং নির্বৃতশরীরং কর্তুমিচ্ছামি'— নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে স্বামীকে সুখী করার এই প্রত্যাশিত সনাতন দাস্য পতিভক্তির গৌরব নামে বহু বহু কাল নারী জাতির অমর্যাদা করে আসছে। বিদূষক ঠিকই বলেছিলেন— রাজা পুরূরবা চিকিৎসার অসাধ্য প্রেমরোগী (অসাধ্য ইতি বৈদ্যেন আতুর ইব স্বৈরং মুক্তো ভবান্), তাঁর হাল ছেড়ে দিয়েছেন বড়রানি! এ হল অসহায় নারীর উদারতা, যার উপমা বিদূষকের ভাষায় মাছ হাতের বাইরে গেলে তাকে ছেড়ে দিয়ে ধর্মলাভ হল এই মর্মে কোনও জেলের উদারতা (মৎস্যে পলায়িতে নির্বিণ্নো ধীবরো ভণতি ধর্মো মে ভবিষ্যতীতি)! রানির মনের চাপা উত্তাপের মাত্রা বুঝতে দ্বিতীয় অঙ্কে তাঁর মন্তব্যটি লক্ষ করা যেতে পারে যেখানে স্বামীদেবতাকে তিনি তিক্তকণ্ঠে বলছেন— 'তোমার অপরাধ নেই, অপরাধ আমার, কেন না তোমার চোখের বালি হয়েও আমি এখনও তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি' (নাস্তি খলু ভবতোপরাধঃ। অহমেবাত্র অপরাদ্ধা, যা প্রতিকূলদর্শনা ভূত্বা অগ্রতস্তে তিষ্ঠামি। বিক্রম. ২)। *মালবিকাগ্নিমিত্রতে* পাটরানি ধারিণী রাজা অগ্নিমিত্রকে মালবিকার সঙ্গে গোপন সম্পর্ক স্থাপন করতে না-দেওয়ার উদ্দেশ্যে এমনকী মালবিকাকে গুপ্তকক্ষে তালাবন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিদূষকের কারসাজিতে অবশ্য শেষরক্ষা হয়নি। আর এক রানি ইরাবতী ক্ষুব্ধকণ্ঠে রাজাকে প্রবঞ্চক ব্যাধ বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। রাজার ভালোবাসার কথায় বিশ্বাস করা আর ব্যাধের গান শুনে হরিণীর মরণ ফাঁদে পা দেওয়া একই কথা (আত্মনো বঞ্চনাবচনং প্রমাণীকৃত্য আক্ষিপ্তয়া ব্যাধজনগীতগৃহীতচিত্তয়া ইব হরিণ্যা এতন্ন বিজ্ঞাতং ময়া।—মালবিকা. ৩)। পুরুষদের সম্বন্ধে তাঁর হতাশ মন্তব্য— 'অহো অবিশ্বাসনীয়াঃ পুরুষাঃ'। কিন্তু রানি ইরাবতীর দিকে রাজা তাকাবেন কী যুক্তিতে? পদ্মফুল দেখতে পেলে হাতি কি কুমিরের দিকে তাকায় (ন হি কমলিনীং দৃষ্ট্বা গ্রাহম্ অবেক্ষতে মতঙ্গজঃ)? মালবিকা চোখে পড়ার পর প্রাক্তন প্রেমিকার উপমান হিসেবে কুমিরের কথা মনে পড়ল নায়কের। তেজস্বিনী এই অন্তঃপুরবাসিনী ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে, ক্রোধে রাজার দিকে মারবার জন্য হাত তুলতেও পিছপা হননি

(রসনামাদায় রাজানং তাড়য়িতুমিচ্ছতি)। যত জাঁক করেই কণ্বপ্রেরিত ঋষিদের কাছে দুষ্যন্ত নিজের সম্বন্ধে বলুন (প্রথিতং দুষ্যন্তস্য চরিতম্), স্ত্রীজাতি সম্পর্কে তাঁর কটূক্তিগুলি বিস্ময়কর, অশোভন ও অমার্জিত। প্রতিহারী দূর থেকে দেখা শকুন্তলার রূপ নিয়ে যখন রাজার সঙ্গে দিব্যি আলোচনা করছে (ননু দর্শনীয়া পুনরস্য আকৃতিঃ) এবং রাজা তাকে নিষেধ করে বলছেন 'পরস্ত্রী সম্বন্ধে এভাবে বলতে নেই' (অনির্বর্ণনীয়ং পরকলত্রম্), তারপরই শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, গৌতমী সকলের উপস্থিতিতে শকুন্তলাকে মিথ্যাবাদী, কুলত্যাগী, চরিত্রহীন বলতে তাঁর বাধেনি। নিজের কুল মজিয়ে এখন শকুন্তলা নাকি রাজকুলে কলঙ্ক মাখাতে এসেছেন (ব্যপদেশমাবিলয়িতুং সমীহসে, জনমিমং চ পাতয়িতুম্। শক. ৫/২১।

শকুন্তলার আন্তরিক পূর্বপ্রসঙ্গ উত্থাপন ও স্মৃতিচারণা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য— 'কাজ হাসিল করতে এই সব মিষ্টি কথা মেয়েরা বানিয়ে বলে এবং বিষয়ী সাধারণ লোক তার খপ্পরে পড়ে। পরের বাসায় ডিম পেড়ে কোকিল পর্যন্ত কাজ হাসিল করার বুদ্ধি ধরে। বুদ্ধিমতী মেয়েদের কথা তো বলাই বাহুল্য' (স্ত্রীণাম্ অশিক্ষিতপটুত্বম্ অমানুষীষু/সংদৃশ্যতে কিমুত যাঃ প্রতিবোধবত্যঃ/শকু. ৫/২২)। তাপসবৃদ্ধা গৌতমী, সত্যনিষ্ঠ শার্ঙ্গরব কাউকে রাজা ভরসা করলেন না। দুর্বাসার অভিশাপে শকুন্তলাকে বিয়ে করার ঘটনা বিস্মৃত হওয়া না হয় বোঝা গেল, কিন্তু ঋষি কণ্বের পাঠানো বার্তা শোনার পর তপস্বীদের সঙ্গে কথাবার্তায় দুষ্যন্তের এতগুলো কটূক্তি, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে অশ্রদ্ধাসূচক মন্তব্য বিস্ময়কর মনে হয়। রূপের মোহে সেই মুহূর্তে শকুন্তলাকে স্বীকার করছেন না বলে তাঁর সংযমী চরিত্র নিয়ে নিজের গর্ব থাকতে পারে, রাজদ্বারে উপস্থিত হতভাগ্য মেয়েটির আকুল কান্না, ক্ষোভ, অসহায় আকুলতা কিছুই রাজাকে স্পর্শ করল না, নিজের কথাতেই মত্ত থাকলেন তিনি। সেই যে প্রথম অঙ্কে বলেছিলেন— সন্দেহস্থলে তাঁর নিজের অন্তঃকরণবৃত্তিই শেষ কথা, এক্ষেত্রেও তাই দেখা গেল। দুষ্যন্তের প্রজাদের মধ্যেও নাকি চরিত্রদোষ দেখা যায় না বলে রাজা মন্তব্য করছেন, অথচ শকুন্তলার কাতর নিবেদনের মুহূর্তে রাজপ্রতিহারীর স্বগতোক্তি, এহেন রূপসী হাতের কাছে এলে কে বিচার করে দেখে (ঈদৃশং নাম সুখোপনতং রূপং দৃষ্ট্বা কোন্যো বিচারয়তি)? অপমানিত শকুন্তলা রাজার ধর্মধ্বজী আভিজাত্যকে ধর্মকঞ্চুকবেশী তৃণাচ্ছন্ন কূপের তুল্য ভয়ংকর বলেছেন। মুখে মধু হৃদয়ে বিষ নিয়ে, পুরুবংশের অভিজাত রাজপুরুষের পক্ষে নারীর এই লাঞ্ছনায় শকুন্তলার কণ্ঠে অপমানিত সমগ্র নারীসমাজই বুঝি তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েছে (পুরুবংশপ্রত্যয়েন মুখমধোর্হৃদয়বিষস্য হস্তাভ্যাশম্ উপগতা)। সমাজের বৃহৎ পরিবেশে এবং গৃহকোণে নারীর মর্যাদাপূর্ণ স্থানের কোনও ইঙ্গিত এখানে কোথাও দেখি না। অথচ লৌকিকজ্ঞ কণ্বমুনির উপদেশবাক্যে পরিষ্কার— গুরুজনদের সেবাশুশ্রূষা, সতীনদের সঙ্গে সস্নেহ দৃষ্টি সর্বদিক থেকে নীরবে গৃহিণীপনার আদর্শ মেয়েরা রক্ষা করে এসেছেন; প্রচলিত ব্যবস্থায় এতটুকু ব্যতিক্রমও সমাজে নিন্দিত হয়েছে (যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো, বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ।। শকু. ৪/১৮)। বুঝিবা অবস্থাবিপাকে কেউ বহুচারিণী হতে বাধ্য হতেন, অবৈধ সন্তানের পিতৃত্বের প্রয়োজনে মিষ্টি কথায় নতুন কোনও পুরুষকে প্রলুব্ধ করতেন।

কে জানে, শকুন্তলা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে দুষ্যন্তের মুখে এত কঠোর বাক্য উচ্চারিত হল কেন?

মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তার সমস্যাও ছিল বইকী! কণ্বমুনি শুধু শুধু বলেননি যে মেয়ে হল তার বাপের কাছে স্বামীর গচ্ছিত রাখা ধনসম্পদ, স্বামীর ঘরে তাকে পাঠাতে পারলে তবে বাবার উৎকণ্ঠা শেষ হয় (অর্থো হি কন্যা পরকীয় এব...প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা।। শকু. ৪/২২)। বিবাহিত মেয়ে পিতৃকুলে থাকলে পাঁচজনে পাঁচকথা তার চরিত্র সম্বন্ধে বলে, তাই স্বামীর প্রিয় হোক বা অপ্রিয় হোক, মেয়েকে বাপের বাড়ির লোকজন স্বামীর কাছে রাখাই সঙ্গত মনে করেন। শার্ঙ্গরবের বক্তব্য, এই সব বিবেচনাতেই শকুন্তলাকে তাঁরা রাজকুলে পৌঁছে দিতে এসেছেন (সতীমপি জ্ঞাতিকুলৈকসংশ্রয়াং জনো'ন্যথা ভর্তৃমতীং বিশঙ্কতে। অতঃ সমীপে পরিণেতুরিষ্যতে প্রিয়া'প্রিয়া বা প্রমদা স্ববন্ধুভিঃ।। শকু. ৫/১৭)। স্ত্রীকে ঘরে ঠাঁই দেবেন, না, ত্যাগ করবেন, সে বিষয়ে স্বামীর সর্বতোমুখী কর্তৃত্বের কথা কণ্বশিষ্য শারদ্বত রাজসভাতেই দুষ্যন্তকে বলছেন, দেখা যায় (তদেষা ভবতঃ পত্নী ত্যজ বৈনাং গৃহাণ বা/উপপন্না হি দারেষু প্রভুতা সর্বতোমুখী।। শকু. ৫/২৬)। অর্থাৎ পতিগৃহে বাস পত্নীর অধিকার নয়, পতিদেবতার প্রভুসুলভ অনুগ্রহ! স্বামিপ্রত্যাখ্যাত শকুন্তলাকে ফেলে রেখে কণ্বশিষ্যরা চলে যাচ্ছেন, শকুন্তলার মনোবেদনা ও অসহায়তার কথা ভেবে তাপসবৃদ্ধা গৌতমী মর্মে মরে যাচ্ছেন (প্রত্যাদেশপরুষে ভর্তরি কিং বা মে পুত্রিকা করোতু?) এই অবস্থায় ক্রুদ্ধ শার্ঙ্গরব শকুন্তলাকে ধমক দিচ্ছেন— 'রাজার কথা সত্যি হলে কুলটা মেয়েকে নিয়ে বাপ কী করবেন? আর যদি নিজে সাচ্চা হও, স্বামীর ঘরে তোমার দাসীগিরিও ভাল' (...কিং পিতুরুৎকুলয়া ত্বয়া।...পতিকুলে তব দাস্যমপি ক্ষমম্।। শকু. ৫/২৭)। মেয়েদের আজন্মসিদ্ধ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, মিথ্যাচার ইত্যাদির কথা বলে কটাক্ষপাত এবং তাঁদের উপেক্ষা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা বহুযুগলালিত পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থার ঐতিহ্য। মনু যতই বলে থাকুন, যে সমাজে নারীর সম্মান রক্ষিত হয়, সেখানে দেবতার অধিষ্ঠান, বাস্তবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজশৃঙ্খলায় নারী কত অসহায়, আশ্রিত, পদানত ও অসম্মানিত, কালিদাসের কাব্যনাটকে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্তমান। রাজগৃহে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান ও অসম্মানের জন্য ক্রুদ্ধকণ্ঠে শকুন্তলাকে তার অপ্রতিহত চিত্তচাপল্যঘটিত প্রণয়, না-জেনে রাজাকে বিশ্বাস ও গোপন বিবাহের কথা তুলে শার্ঙ্গরব তিরস্কার করছেন। বোঝা যায়, গান্ধর্ববিবাহ সম্বন্ধে সমাজের মনোভাব সর্বথা অনুকূল নয়। না হলে এমন সাধারণভাবে শার্ঙ্গরব বলবেন কেন— 'ইত্থম্ অপ্রতিহতং চাপলং দহতি।...অজ্ঞাতহৃদয়েষেব্বং বৈরীভবতি সৌহৃদম্' (শকু. ৫/২৪)। গান্ধর্ববিবাহের আগে যথোচিত বিচারবিবেচনা করে থাকলে দোষ হয় না— শার্ঙ্গরবের কথায় বুঝি তা পাওয়া যাচ্ছে। শকুন্তলাকে বিবাহপ্রস্তাবে সম্মত করার সময় দুষ্যন্ত অনেক অনেক রাজর্ষিকন্যার গান্ধর্ববিবাহ ও তাতে কন্যার পিতার অনুমোদনপ্রাপ্তির কথা শুনিয়েছিলেন (শকু. ৩/২০)। অগ্নিসাক্ষী রেখে বিয়ে করলেও স্ত্রীলোকদের সামাজিক নিরাপত্তা ও মর্যাদা যে অক্ষুণ্ণ থাকে না, কালিদাসের তিন তিনটি নাটক তার সাক্ষ্য দেবে।

অথচ প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েও নারী আপন মহত্ত্বে গার্হস্থ্যসমাজব্যবস্থা ও কল্যাণের আধার হয়ে আছেন। আর্য গৃহস্থালিতে স্বামী ও পুত্রকে যদি বলা হয় বিধি ও বিত্ত, স্ত্রী সেখানে নিশ্চয় শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা বিত্তং বিধিশ্চেতি ত্রিতয়ং তৎ সমাগতম্।। শকু. ৭/২৯)। প্রত্যাখ্যানের পর ঋষি মারীচের আশ্রমে সন্তান প্রসব করে সাধ্যানুসারে তাকে শকুন্তলা পালন করছিলেন। স্বামী-পরিত্যক্তা এই হতভাগিনীর ধূসর বসন, শুকনো মুখ, একবেণীধরা করুণমূর্তির সামনে বিচলিত বোধ করতে হয় (বসনে পরিধূসরে বসানা নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ। অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা মম বিরহব্রতং বিভর্তি।। শকু. ৭/২১)। এ তাঁর বিরহব্রতপালনের বেশ। দুষ্যন্তের বৃদ্ধা মা রাজবাড়িতে থেকে নির্দিষ্ট তিথিতে পুত্রের কল্যাণে 'পুত্রপিণ্ডপালন' নামে ব্রত ও উপবাস করেন (চতুর্থদিবসে পুত্রপিণ্ডপালনো নাম প্রবৃত্তপারণো মে উপবাসো ভবিষ্যতি)। পুরূরবার প্রণয়চাপল্যে ক্ষুব্ধ হয়েও পাটরানি 'প্রিয়ানুপ্রসাদন' ব্রত অনুষ্ঠান করেন, স্বামীকে গন্ধদ্রব্য, ফুল ইত্যাদি উপহার আর ব্রাহ্মণ বিদূষককে মিষ্টি খাওয়ানো তার অঙ্গ। আশ্রমবালিকা শকুন্তলা অতিথির জন্য 'ফলমিশ্রম্ অর্ঘ্যম্' ও পাদোদকের ব্যবস্থা করেন। শকুন্তলার প্রতিকূল দৈব উপশমের জন্য কণ্বমুনির সোমতীর্থে যাত্রার কথা আমরা প্রথম অঙ্কে পেয়েছি (দৈবমস্যাঃ প্রতিকূলং শময়িতুং সোমতীর্থং গতঃ)।। তিনি বনবাসী বটে, কিন্তু লোকতত্ত্বনিষ্ণাত (বনৌকসোপি সন্তো লৌকিকজ্ঞা বয়ম্)। শকুন্তলা পতিগৃহে যাওয়ার সময় দুই সখিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কন্যা-অন্তঃপ্রাণ হয়েও কণ্ব তাতে সায় দেননি, কেন না অনসূয়া-প্রিয়ংবদাকেও বিয়ে দিতে হবে, তাই তাঁদের রাজধানীতে যাওয়া চলে না (ইমে অপি প্রদেয়ে। ন যুক্তম্ অনয়োস্তত্র গন্তুম্)।

কালিদাস সাহিত্যে বিয়ে, মেয়ের শ্বশুরবাড়ি যাওয়া, সন্তানের জন্ম ও তার লালনপালন, লৌকিক নানা বিষয়ের নিখুঁত ছবি মেলে। *কুমারসম্ভব*-এ দেখি, শিবের সঙ্গে পার্বতীর বিয়ের কথা পাড়তে দেবর্ষিরা পার্বতীর পিতৃভবন ওষধিগ্রস্থে যাচ্ছেন। ঋষিপত্নী অরুন্ধতীও এ কাজে সক্রিয় অংশ নিচ্ছেন, কেন না এ জাতীয় প্রসঙ্গে গিন্নিবান্নী মেয়েদের কথায় কাজ হয় বেশি (প্রায়েণৈবংবিধে কার্যে পুরন্ধ্রীণাং প্রগল্ভতা।। কু. ৬/৩২)। ঋষিরা মন্দাকিনীতে স্নান করে সোনালি বল্কল পরে, জপমালা হাতে কাজে মন দিলেন। স্ত্রীদের সঙ্গে নিতে তাঁরা লজ্জা পাচ্ছিলেন না (জহুঃ পরিগ্রহব্রীড়াং—কু. ৬/৩৪)। অতিথিদের অভ্যর্থনা করে হিমালয়, তাঁর পত্নী ও মেয়ে পার্বতী যে কেউ তাঁদের জন্য কিছু করতে পারলে কৃতার্থ হবেন বলে জানালে (কু. ৬/৬৩) বিয়ের প্রস্তাব করা হয়। মেয়ের বাপ স্বাধীন হয়েও মেয়ের মা'র মুখের দিকে তাকান, কেন না মেয়ের ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ সবচেয়ে মূল্যবান।

ক্বচিৎ কদাচিৎ এমন উদার শ্রদ্ধেয় মনোভাব চোখে পড়লেও ব্যাপকভাবে স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে তদানীন্তন সমাজমানসের সংকীর্ণতাদুষ্ট অনুদার দৃষ্টিকোণ আমাদের পীড়া দেয়। বিশ্বসৃষ্টির ব্যাখ্যায় বিধাতার অর্ধেক পুরুষ, অর্ধেক নারী হয়ে ওঠার কথা বলেন মনু (দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহম্ অর্ধেন পুরুষো'ভবৎ। অর্ধেন নারী—।। মনু. ১/৩২) অথচ তিনিই নারী চরিত্র ব্যাখ্যানে বসে অবলীলায় মন্তব্য করেন— বিদ্বান, অবিদ্বান সব পুরুষকে নির্বিচারে মজানোই নারীর স্বভাবধর্ম (স্বভাব এষ নারীণাং নরাণামিহ দূষণম্। ২/২১৩)। তবু ভালো,

বিদ্বান অবিদ্বান নির্বিশেষে পুরুষের কাম ও ক্রোধের বশবর্তী হওয়ার স্পষ্ট কথাটাও একই সঙ্গে এখানে উচ্চারিত হয়েছে (২/২১৪)। তিনি যৌন কদাচারে পুরুষের অপরাধ ছোট করে দেখেননি। তা সত্ত্বেও নারীকে যৌন আকাঙ্ক্ষার মূর্ত বিগ্রহমাত্র সাব্যস্ত করে স্ত্রীজাতির প্রতি তিনি অবিচার করেছেন বইকী! রূপ নয়, বয়স নয়, পুরুষত্বই নারীর লোভের বস্তু (স্বরূপং বা বিরূপং বা পুমান্ ইত্যেব ভুঞ্জতে।। ৯/১৪)। ব্যভিচার, চিত্তচাঞ্চল্য, স্নেহহীন নির্দয়তা— এ সবই নাকি স্ত্রীস্বভাব (পৌংশ্চল্যাচ্চলচিত্তাচ্চ নৈঃস্নেহাচ্চ স্বভাবতঃ। ৯/১৫)। এই সব নানা কারণে মেয়েদের দাবিয়ে রাখার পরামর্শ দিয়ে মনুর বিধান— অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃকার্যাঃ...সংস্থাপ্যা আত্মনো বশে।। ৯/২)। স্বামীর শুভ গুণের সংস্পর্শে নারীর চারিত্রিক উন্নতি প্রত্যাশা করেছিলেন তিনি (উৎকর্ষং যোষিতঃ প্রাপ্তাঃ স্বৈঃ স্বৈর্ভর্তৃগুণৈঃ শুভৈঃ।। ৯/২৪)। সন্তান প্রসব করার গৌরবেই সমাজে স্ত্রীলোকের বিশেষ গুরুত্ব স্বীকৃত (প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ। ৯/২৬)। নারী গৃহের শোভা তো বটেই, তাকে সংসারযাত্রার মূল হিসেবে উল্লেখ করতেও মনু কুণ্ঠিত হননি। সন্তান প্রসব করা ও তার প্রতিপালন সংসারের দুটি বড় কাজ স্ত্রীলোকের আয়ত্ত (উৎপাদনমপত্যস্য, জাতস্য পরিপালনম্। প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্ ৯/১৭)!

মনু আরও বাড়িয়ে বলেছেন— ধর্মকর্ম, শুশ্রূষা, উত্তম প্রীতি ও পিতৃকুল তথা নিজের স্বর্গ অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন সন্তানধারার মধ্যে অমর হয়ে থাকার ক্ষেত্রে স্ত্রী প্রধান উপায় (৯/২৮)। বংশরক্ষার প্রয়োজনে তদানীন্তন সমাজ কুলস্ত্রীর সঙ্গে পরপুরুষের যৌনসঙ্গম অর্থাৎ নিয়োগ প্রথা মেনে নিয়েছিল (৯/৫৯-৬২), যদিও মনু এই কুপ্রথার নিন্দা করেছেন (পশুধর্মো বিগর্হিতঃ। ৯/৬৬); নিয়োজয়ন্ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ।। ৯/৬৮)। বর্ণভেদে নারীর মর্যাদা যে আলাদা আলাদা হবে (৯/৮৫) সে কথা বলাই বাহুল্য। গুরুর সবর্ণা স্ত্রী ও অসবর্ণা স্ত্রী শিষ্যদের কাছে সমান শ্রদ্ধা ও অভিবাদন পেতেন না (২/২/১০)। সবর্ণা গুরুপত্নী গুরুর মতোই শিষ্যদের হুকুম করতে পারতেন; কিন্তু অসবর্ণ গুরুস্ত্রীকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করাটুকুই শিষ্যদের দস্তুর। সামাজিক ব্যবহারে কেবল শূদ্র ও স্ত্রীলোকের জন্য অন্য রকম অভিবাদন বিধির কথা মনু জানিয়েছেন। রাজার মন্ত্রণাকক্ষের ধারেকাছে স্ত্রীলোকের উপস্থিতি অবাঞ্ছিত গণ্য হয়েছে, কেন না তাঁরা গোপন মন্ত্রণা গোপন রাখতে অপারগ (৭/১৫০)! স্ত্রীলোকদের পরস্পর বিবাদে স্ত্রীলোকই সাক্ষ্য দেয় বটে (স্ত্রীণাং সাক্ষ্যং স্ত্রিয়ঃ কুর্যুঃ ৮/৬৮) কিন্তু শুচিস্বভাব হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীলোক নির্ভরযোগ্য না হতে পারে। কারণ তাঁদের মতিস্থির থাকে না (স্ত্রীবুদ্ধেরস্থিরত্বাত্তু ৮/৭৭)!

নারীসমাজ সম্পর্কে স্বাভাবিক অনাস্থা সত্ত্বেও মনু স্ত্রীকে বিক্রয় ও পরিত্যাগ করা সমর্থন করেননি (ন নিষ্ক্রয়বিসর্গাভ্যাং ভর্তুর্ভার্যা বিমুচ্যতে।। (৯/৪৬)। স্ত্রীর আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে স্বামীর গুরুদায়িত্ব উল্লেখ করেছেন তিনি। যেমন, প্রবাসে গেলে পতিকে তাঁর পত্নীর ভরণ পোষণের সংস্থান করে যেতে বলা হয়েছে (বিধায় বৃত্তিং ভার্যায়াঃ প্রবসেৎ কার্যবান্ নরঃ। (৯/৭৪), অন্যথায় সেই স্ত্রীর বিপথগামিতার অবকাশ থেকে যায়।

ধর্মকর্ম, বিদ্যালাভ বা যশঃপ্রাপ্তি এবং অন্য স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস-এর প্রয়োজনে পতির যথাক্রমে আট, ছয় ও তিন বছর প্রবাস যাপন বিধিসম্মত গণ্য হয়েছে (৯/৭৬)। পতি ভরণপোষণের ব্যবস্থা না-করে বিদেশে গেলে স্ত্রীর পক্ষে সম্মানহানিকর নয়, এমন কোনও শিল্পকর্ম বেছে নিয়ে জীবিকার ব্যবস্থা করা উচিত (জীবেচ্ছিল্পৈরগর্হিতৈঃ। (৯/৭৫)।

মানুষের শুভবুদ্ধি ও সুস্থ জীবনযাপনরীতিতে আস্থা রাখার মতো বাস্তব পরিবেশ কি মনুসংহিতাকারের সামনে ছিল না? বিশেষত যৌন ব্যভিচারের আতঙ্ক বুঝিবা মনুকে আচ্ছন্ন করেছিল। নিয়োগ প্রথার সুযোগে যৌন কদাচার (৯/৬৩), কিংবা পাদবন্দনার ছুতোয় যুবতী গুরুপত্নীর সঙ্গে শিষ্যের যৌনসম্বন্ধ (২/২১২) ইত্যাদির আশঙ্কা থেকে তা স্পষ্ট হয়। গুরুপত্নীগমনকে অন্যতম মহাপাতক বলে চিহ্নিত (১১/৫৪) করে তুল্য অপরাধের তালিকায় তিনি যৌন ব্যভিচার লিপিবদ্ধ করেছেন (১১/৫৮; ১১/১৭০) এবং নানা বিকৃত পাশবিকতার উল্লেখ করেছেন (১১/১৭১, ১৭২, ১৭৩)। বাদ যায়নি সমকামী কন্যা (৮/৩৬৯), সমকামী স্ত্রীলোক (৮/৩৭০) ও চারণপত্নী পণ্যাঙ্গনাদের প্রসঙ্গ (৮/৩৬২)। শেষোক্তদের পতিকূল সম্বন্ধে মনুর কঠোর মন্তব্য—সজ্জয়ন্তি হি তে নারীর্নিগূঢ়াশ্চারয়ন্তি চ (৮/৩৬২), যার ব্যাখ্যা করতে বসে কুল্লুকভট্ট বলছেন— 'চারণা আত্মোপজীবিনশ্চ পরপুরুষান্ আনীয় তৈঃ স্বভার্যাং সংশ্লেষয়ন্তে, স্বয়মাগতাংশ্চ পরপুরুষান্ প্রচ্ছন্না ভূত্বা স্বাজ্ঞানং বিভাবয়ন্তো ব্যবহারয়ন্তি। এই অবস্থায় চারবর্ণের উদ্দেশে আপন স্ত্রীদের রক্ষা করার জন্য মনুর নির্দেশ (৮/৩৫৯) যে চারণ প্রভৃতিদের সম্বন্ধে খাটছে না, তা স্পষ্টাক্ষরে বলতে মনু কুণ্ঠিত হননি। পরপুরুষসঙ্গমের অপরাধে ব্যভিচারিণী নারীর শাস্তি কুকুরের পেটে যাওয়া (৮/৩৭১) আর ব্যভিচারী পুরুষের শাস্তি আগুনে পুড়ে মৃত্যু (৮/৩৭২)। অবশ্য ব্যভিচারে লিপ্ত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বর্ণগত মর্যাদা অনুসারে শাস্তির হেরফের আছে (৮/৩৭৪-৩৭৯, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪)। বিশেষত ব্রাহ্মণের জন্য শাস্তির কঠোরতা নেই বললেই চলে, অন্যদের যেখানে প্রাণদণ্ড, ব্রাহ্মণের সেখানে মাথা ন্যাড়া করলেই নিস্তার (৮/৩৭৯)। অর্থাৎ কি না মাথা মুড়িয়ে দেওয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রাণদণ্ডের তুল্যই হল (মৌণ্ডং প্রাণান্তিকো দণ্ডো ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে। ৮/৩৭৯)। সত্যি সত্যি ব্রাহ্মণবধের কথা এমনকী মনে মনে কল্পনা করতেও রাজাকে নিষেধ করেছেন মনু (তস্মাদস্য বধং রাজা মনসাপি ন চিন্তয়েৎ॥ ৮/৩৮১)। শাস্তির বৈষম্য যাই হোক, অপরাধ প্রবণতা এবং যাবতীয় কদর্য কামাচার যে উচ্চনীচ বর্ণনিরপেক্ষ ভাবে স্ত্রী-পুরুষ উভয় পক্ষকে বাস্তবে নানা ভাবে কলঙ্কিত করেছিল, তাতে সংশয় নেই। হিতোপদেশের কয়েকটি গল্পে দেখি, পরপুরুষের সঙ্গে বণিকপত্নী, গোপপত্নী ও রথকারপত্নীর যৌন ভ্রষ্টাচার নিন্দার বিষয় হয়নি, বরং পতিদেবতাদের সরল আহাম্মকির সুযোগ নিয়ে উপস্থিত বুদ্ধির জোরে হাতেনাতে ধরা পড়বার অবস্থা সামাল দেওয়ার বাহাদুরি বড় হয়ে উঠেছে। জনৈক বৃদ্ধ বণিকের তরুণী ভার্যা উপপতির উপস্থিতিতে পতিকে ঘরে ঢুকতে দেখে দৌড়ে গিয়ে বেহায়া আদর-সোহাগ দিয়ে পতিকে বিচলিত করে উপপতির পালাবার পথ করে দিয়েছিল! গোপপত্নীর আবার কোতোয়াল ও তস্য পুত্র দু'জনেই অনুরাগী। কামিনীর ঘরে

পুত্র প্রবেশ করার পর একই উদ্দেশ্যে শস্ত্রপাণি পিতাঠাকুরও সেখানে যখন হাজির এমন সময় স্বয়ং পতিকে সশরীরে উপস্থিত দেখে ছলনাময়ীর কৈফিয়ত— ছেলে দৌড়ে পালিয়ে এসে তার বাড়িতে ঢুকেছে আত্মগোপন করার জন্য আর বাবা এসেছে অস্ত্রহাতে তার সন্ধানে। রথকারপত্নী উপপতির সঙ্গ-সুখে মগ্ন থাকার সময় ঘরের মধ্যে রথকারের প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি টের পেয়ে হঠাৎ সুর বদলে এমন স্বামীসোহাগের পরাকাষ্ঠা বর্ণনায় মেতে ওঠে যে স্বামী বেচারা উৎফুল্ল হয়ে জারসমেত প্রেয়সীর খাটখানা মাথায় তুলে ধন্য হয়। আর এক বণিক-পত্নী তার কর্মচারীকে চুম্বন করে কর্তার কাছে ধরা পড়তেই বলে ওঠে, প্রতিদিন কর্পূর চুরি হয়ে কোথায় যায় তা পরীক্ষার জন্য সে লোকটির মুখের গন্ধ পরীক্ষা করছিল। স্ত্রীচরিত্রের বেহায়া অশ্রদ্ধেয় ছবি কি স্ত্রীলোক সম্বন্ধে রাজপুত্রদের অশ্রদ্ধা ও অনাগ্রহ উদ্রেকের জন্য আঁকা, নাকি সমাজে উচ্ছৃঙ্খল যৌনজীবনের বাস্তব চিত্র এতে ফুটে উঠেছে কে জানে? জনৈক রাজপুত্রকে দেখি এক বণিকপত্নীকে হস্তগত করার জন্য তার স্বামীকে রাজসরকারের কাছে নিযুক্ত করতে এবং এক মাসব্যাপী গৌরীব্রত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রতি রাত্রে এক একজন কুলীন যুবতীকে আনিয়ে যথাবিহিত মর্যাদায় অভ্যর্থনা ও সম্মান জানিয়ে বিশ্বাসের ফাঁদ পেতে শেষ পর্যন্ত একদিন বণিকপত্নীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হতে। কামুকের বুদ্ধিচাতুর্য ও ছলনার কাছে বেচারা বণিকের কিংকর্তব্যবিমূঢ় আত্মসমর্পণ কীসের ইঙ্গিত? কিশোরপাঠ্য গ্রন্থে এসব ঘটনা তুলে ধরতে যে লেখকের হাত কাঁপছে না রাজপরিবারের নৈতিক আবহাওয়ার কিছুটা হদিশ তা থেকে মেলে।

সেকশুভোদয়া গ্রন্থেও এই রকম ভাবে মেয়েদের যৌনতা নিয়ে কদর্য নিন্দামন্দ চোখে পড়ে; যদিচ লম্পট পুরুষের ভূমিকাও সেখানে প্রকট। বস্তুত মেয়েদের সম্বন্ধে কোনও শ্রদ্ধাবচন এখানে বিরল। বলা হয়েছে, লতা যেমন পাশের জিনিসটা আঁকড়ে ধরে, স্ত্রীলোক আর রাজারা ঠিক তেমনি যাকে কাছে পায় তাকেই অবলম্বন করে (২/৫৮)। যাদের ওপর ভরসা করতে নেই সেই তালিকায় নদী, অস্ত্রধারী লোক, নখ বা শিংওয়ালা জন্তু ও রাজসরকারের সঙ্গে অবলীলায় স্ত্রীলোকের উল্লেখ করতে দেখা যাচ্ছে (১/১৯)! অনুচিত কাজ, আত্মীয়দের সঙ্গে বিবাদ, সবল ব্যক্তির সঙ্গে ঠোকাঠুকি আর স্ত্রীলোককে বিশ্বাস সমান মারাত্মক (২/১৫১)! রাজার প্রিয়জন বলে কেউ থাকে না, আর স্ত্রীলোকের কারণে মন ভাঙেনি এমন লোক থাকতে পারে না (২/১৫৩)! রাজারা প্রায়শ অপাত্রে অনুগ্রহ বিলোয়, আর মেয়েরা যত দুর্জনকে দেয় আশকারা (দুর্জনগম্যা) (২/১৫৬)! শাস্তির ভয়ে মেয়েরা পতির অনুগমন করে (১/২০৬)। বৃহস্পতি আর শুক্রের যা কিছু জ্ঞান, সবটাই মেয়েদের স্বভাবজাত (১/১২১)! অসত্য, দুঃসাহস, ছলনা, মাৎসর্য, অতিলোভ; নির্গুণত্ব, অশুচিতা এসব তাদের স্বাভাবিক দোষ (১/১৯৯)! দূর্বাকীর্ণ ভূমিশয্যায় পরপুরুষ সঙ্গম নাকি তাদের একান্ত প্রীতিকর (যথাহি দূর্বাদিবিকীর্ণভূমৌ প্রয়াতি সৌখ্যং পরকান্তসঙ্গাৎ (২/১১৮)! মেয়েদের আহার দ্বিগুণ, বুদ্ধি চারগুণ, উদ্যোগ ছয়গুণ আর কাম আটগুণ (২/১১৯) এবং আরও কত কী! লজ্জা, সতীত্ব এসব নিয়েও কটাক্ষ করা হচ্ছে। সমাজে

নারীর মর্যাদা কত নীচে গণ্য হলে এমন অশালীন মন্তব্য করা চলে, তা সহজেই অনুমেয়। তবু মন্দের ভালো রাজা, মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, কুলবধূ প্রভৃতির মর্যাদা তারা আপন আপন জায়গায় থাকলে তবেই রক্ষা পায়, একথাটুকু বলা হয়েছে (১/১৭৩), এবং এও স্বীকৃত হয়েছে যে অশ্ব, শস্ত্র, শাস্ত্র, বীণা, বাণী, নর ও নারী যোগ্য লোকের হাতে পড়লে যোগ্য, অন্যথা অযোগ্য (২/৭৫)। তা হলে স্ত্রীলোকের অশ্রদ্ধেয় পরিচয়ের দায়িত্ব সমাজপতিদেরও কম নয়, বলতে হবে। বিশেষত, নারীকে ভোগ্যপণ্যে পরিণত করার কৃতিত্ব পুরুষশাসিত সমাজের কর্তাদেরই প্রাপ্য। নারী না হয় ঘিয়ের কলসিই হল, তাকে তারল্যের কলঙ্কস্রোতে পরিণত করার দায় নিশ্চয় পুরুষশাসিত সমাজে তপ্ত আগুনের তুল্য পুরুষগোষ্ঠীর (১/১১৮)। একথা তো বলাই হয়েছে, পরের বাড়ির যুবতী ললনাদের দিকে লোলুপ দৃষ্টি দেয় না এমন লোক বিরল (২/১৩১)! স্ত্রীলোকের অধঃপাতের কারণ সন্ধান করে জানানো হয়েছে, স্বাধীন চলাফেরা, বাপের বাড়িতে বসবাস, যাত্রা উৎসবে যোগদান, কুলটা ও পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা, একাধিকবার বৃত্তিহানি, স্বামীর বার্ধক্য ইত্যাদি হল সেই সব কারণ যা মেয়েদের কুপথে নিয়ে যায় (১/১১৪)। যেন সমাজের কোনও দায়দায়িত্ব নেই! পতিগৃহের চার দেয়ালের মধ্যে অসূর্যম্পশ্য জীবনযাপনের বাইরে মেয়েদের জন্য এতটুকু নিরাপত্তা, চিত্তবিনোদন, সামাজিকতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবেশ রচনা করতে যে সমাজ অক্ষম আর যাই হোক তাকে সুস্থ বলা চলে না। ঘরে বাইরে পুরুষের উপদ্রব লাঞ্ছনা উপেক্ষার পাত্র হয়ে অসহায় মাতৃজাতির জীবনপাত করার করুণ অকথিত কাহিনি উদ্ধার করতে বেশি পরিশ্রম দরকার হয় না।

কৌতুকনাট্য *উভয়াভিসারিকায়* দেখি চন্দনদাসীর মেয়ে অনঙ্গদত্তা মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন একজনকে মন দিয়েছে, যার আর্থিক অবস্থা এক সময় ভালো ছিল বটে, কিন্তু এখন খারাপ। মায়ের অর্থলোভের বিরুদ্ধে মেয়েটির এই মনোভাব বিটের প্রশংসা লাভ করছে। বিষ্ণুদত্তের মেয়ে মাধবসেনা তো আত্মীয়স্বজনের খপ্পর এড়িয়ে বাঘের ভয়ে পালিয়ে যাওয়া হরিণশিশুর মতো পালিয়ে যাচ্ছে বাজে লোকের শয্যাসঙ্গ এড়ানোর জন্য। শালিবাহ ধনদত্তের ছেলে সমুদ্রদত্তের কাছে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাত্রিবাস করার গ্লানিবোধে সে পীড়িত। তার উদ্দেশে বিটের সহানুভূতিশীল কথা আমাদের অন্তর ছুঁয়ে যায়। বেশ্যাজীবনের সূচনায় বালিকার প্রথম বেদনার্ত প্রতিক্রিয়া ও গ্লানিবোধের চিত্র দণ্ডীর *দশকুমারচরিতে* আছে। *মৃচ্ছকটিকের* বসন্তসেনার কথা আমাদের জানা। সুরুচি ও প্রীতিস্নিগ্ধ সুস্থ জীবনের প্রতীক হয়ে সে পাঠককুলের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছে।

অবশ্য এর বিপরীতে *উভয়াভিসারিকায়* বিলাসকৌণ্ডিনী নামে পরিব্রাজিকার দেখা মেলে, যার চোখেমুখে ভোগের আকাঙ্ক্ষা বিটের দৃষ্টি এড়ায় না এবং বিট বৈশেষিক দর্শনের পারিভাষিক শব্দগুলোর কদর্থ ইঙ্গিত করে তা বুঝিয়ে দিতে ছাড়েনি। দেখা মেলে চরণদাসীর মা রামসেনার, যে আপন প্রণয়ীদের ধনরত্ন শুষে এখন মেয়ের প্রেমিকদের শোষণে ব্যস্ত। সার্থবাহ সার্থকের পুত্র ধনীর দুলাল হলেও এখন তার গায়ে শতচ্ছিন্ন নোংরা কাপড়, ময়লার ছোপধরা শরীর, শুকনো মুখ, অস্বাভাবিক চুল, নখ। রামসেনার মেয়ে রতিসেনাকে

সর্বস্ব দিয়ে দেওয়ার পর চানের ছুতোয় তাকে পুকুরে টেনে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করা হয়। কোনও রকমে খিড়কি দিয়ে পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছে সে।

বীরপুঙ্গবের দল সুযোগ পেলে অবশ্য মেয়েদের ওপর কতদূর বীরত্ব ফলাতে পারে তার নমুনা মিলবে কৃষ্ণমিশ্রের *প্রবোধচন্দ্রোদয়* নাটকে। কৌলীন্য রক্ষার স্বার্থে শ্রীযুক্ত অহংকার সেখানে স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বিদায় করেছেন বলে সগর্বে ঘোষণা করতে শুনি। মাতুলবংশ ততটা কুলীন নয় বলে মশায়ের কত যে কুণ্ঠা!

নাস্মাকং জননী তথোজ্জ্বলকুলা সচ্ছ্রোত্রিয়াণাং পুনঃ
ব্যূঢ়া কাচন কন্যকা খলু ময়া তেনাস্মি তাতাধিকঃ।
অস্মচ্ছ্যালকভাগিনেয়দুহিতা মিথ্যাভিশপ্তা যত—
স্তত্সম্পর্কবশান্ময়া স্বগৃহিণী প্রেয়স্যপি প্রোজ্‌ঝিতা।। (২/৯)

'সেই ট্রাডিশন সমানে চলিতেছে'। ভোল পালটে। ভবভূতি তাঁর *উত্তররামচরিতে* লিখেছিলেন ভাষার দোষ আর মেয়েদের দোষ খোঁজার লোক সর্বত্র বর্তমান (যথা বাচাং তথা স্ত্রীণাং সাধুত্বে দুর্জনো জনঃ)। 'সীতার বনবাস'-এ বিদ্যাসাগরকে দুর্মুখের বয়ানে তাই লিখতে হয়— 'আমাদের গৃহে স্ত্রীলোকদিগের চরিত্রে দোষ ঘটিলে তাহাদের শাসন করা সহজ হইবেক না; শাসন করিতে গেলে, তাহারা রাজমহিষীর উল্লেখ করিয়া আমাদের নিরুত্তর করিবেক'! *ভ্রান্তিবিলাসে* বিলাসিনী এমনি বলেননি: 'পুরুষেরা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ; ...স্ত্রীজাতি নিতান্ত পরাধীন, সুতরাং তাহাদিগকে অনেক সহ্য করিয়া কালহরণ করিতে হয়।' চন্দ্রপ্রভার সোজা মন্তব্য: 'গো গর্দভ ব্যতিরিক্ত কে ওরূপ শৃঙ্খলাবন্ধন সহ্য করিবেক?' স্ত্রীশিক্ষার সুযোগ না রেখে মেয়েদের অল্পবুদ্ধি বলবার কদর্য প্রবণতাকে রামমোহন ধিক্কার দিয়েছিলেন এইজন্য। তাঁর ক্রুদ্ধ প্রশ্ন 'স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কবে লইয়াছেন?'

'অবলা, কেন, মা, এত বলে?' একদিকে অশিক্ষার অন্ধকার, স্বাধীন আত্মবিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা, পুরুষতন্ত্রের অমানবিক দমনপীড়ন উপদ্রবে ক্লান্ত বিধ্বস্ত নারীসমাজ অন্যদিকে প্রেমিকের চটুলপটু চারু অনুনয়বচন মোতাবেক ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্ ইত্যাকার স্তুতিভাজন প্রেমিকা নারী— বিপরীত দুই মেরুপ্রান্ত এবং বাস্তব। অসুরদলনের স্বপ্নদ্রষ্টা মার্কণ্ডেয়পুরাণের কবির দর্শনও মিথ্যা হয়ে যায় না। সব বিদ্যাই তখন এক মাতৃস্বরূপের নানা রূপ হয়ে ওঠে, সব নারী হয়ে যান আরাধ্য মাতৃত্বের প্রতীক— বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ/স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগত্সু। (শ্রীশ্রীচণ্ডী ১১/৬)। নারীকে এমন সব উত্তুঙ্গ মহিমায় দেখতে শেখায় যে দেশের ঐতিহ্য, সেখানে নারীর অপমান আজও তো ঘটছে সমানে? অবশ্যই নজরুল বলবেন— 'জাগো নারী, জাগো বহ্নিশিখা'। 'মা যাহা হইয়াছেন' তা থেকে 'মা যাহা হইবেন' সেই উত্তরণের আশাতেই রাত জেগে বসে আছি।

রমাকান্ত চক্রবর্তী

মধ্যযুগে বঙ্গনারী

মধ্যকালীন বাংলার সমাজচিত্র এখনও স্পষ্ট নয়। সমাজের গঠন যে ঠিক কেমন ছিল, সে বিষয়ে শুধু শাস্ত্রীয় এবং সাহিত্যিক প্রমাণ ছাড়া, অর্থাৎ ঐতিহ্যসম্মত প্রমাণ ছাড়া, ইতিহাসসম্মত প্রমাণের অভাব সর্বক্ষেত্রেই দৃশ্যমান। সামাজিক রীতিনীতি, লোকব্যবহার, সমাজে বিভিন্ন বর্ণজাতির অবস্থান, রমণীদের অবস্থা— এ সব বিষয় সম্বন্ধে সাধারণ বিবরণ প্রধানত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক রচনাবলীতে খণ্ডিত, বিশৃংখল এবং অসম্পূর্ণ। তাই মধ্যযুগে বঙ্গনারী সম্বন্ধে কিছু লেখা, ঠিক পণ্ডশ্রম না হলেও, প্রধানত ঐতিহ্যেরই পুনরাবৃত্তি হয়ে দাঁড়ায়। তবুও অন্তত কিছু তথ্য অবশ্যই দেওয়া যায়।

প্রথমেই মধ্যকালীন স্মার্ত বিচারধারা উল্লেখ্য, কারণ এর একটা আদর্শসম্মত মূল্য আছে। পিতৃতান্ত্রিক হিন্দু সমাজের যে রূপ আমরা স্মৃতিশাস্ত্রে দেখি, তাতে নারীর স্থান বা নারীর অস্তিত্ব, এ কালের বিচারে, প্রায় গুরুত্বহীন মনে হয়। এ কালে যে কন্যারা কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছেন, অবাঙালি পোশাক পরে নাচগান করছেন, তাঁরা মধ্যকালে পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতেন, এবং শেষ পর্যন্ত, কৃষকের কন্যা বা প্রাথমিক উৎপাদকের কন্যা বা বধূ না হলে, প্রচলিত কৌলীন্য-প্রথানুসারে পৈত্রিক কারাগার থেকে পতির কারাগারে নিক্ষিপ্ত হতেন। নারীদের সম্বন্ধে স্মার্ত বিধানাবলির দু'-চারটি নমুনা দিই।

মনু, শাতাতপ প্রভৃতি প্রাচীন স্মার্তগণ এই বিধান দিয়েছিলেন যে, মাতামহের অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা কন্যা এবং পিতার অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা কন্যা দ্বিজাতিগণের দারকর্মে ও মৈথুনক্রিয়াতে বিহিত। দারকর্ম, অর্থাৎ বিবাহ; কিন্তু অন্য কোনও কোনও স্মৃতিতে বিবাহ বিষয়ে কূল, শীল, জাতি প্রভৃতি বিষয় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজে মান্য ছিল। রঘুনন্দনের মতে, বিবাহে বর কর্তা হলেও, এই দুই বিবাহের দুই অর্থ ছিল। কেন না, বিবাহিতা কন্যা 'কর্ম'। বিবাহিত পুত্র 'কর্ত্তা'। বিশ শতকেও দেখা গেছে যে, বাড়ির গৃহিণী স্বামীকে বা শ্বশুরকে 'কর্ত্তা' মনে করেছেন: "কর্ত্তা চাইলে হবে, না চাইলে হবে না"— এমন কথা পারিবারিক ক্ষেত্রে মহিলারা এখনও যে বলেন না, এমন নয়।

'কর্ত্তা' ও 'কর্ম'-এর মধ্যে এই মৌলিক প্রভেদের দুইটি কারণ ছিল। একটি কারণ অবশ্যই পিতৃতান্ত্রিকতা। এই পিতৃতান্ত্রিক পরিবেশ মহিলাদের প্রাতিস্বিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করে না। দ্বিতীয়ত, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, কারণ কর্তাই অর্থোপার্জন করেন। তিনিই সংসারের প্রতিপালক। স্ত্রী স্বাধীন ভাবে অর্থোপার্জন করেন না। কাজেই তিনি মৈথুনক্রিয়ার সহায়িকা যন্ত্র মাত্র, এবং স্তনদায়িনী বধূমাতা। এই হল স্মার্ত-বিধান। আগে স্মার্ত পণ্ডিতরা 'বিবাহ' শব্দটিকে 'দান' মনে করতেন। কিন্তু রঘুনন্দনের মতে 'গ্রহণ' ছাড়া 'দান' নিষ্পন্ন হয় না। 'কন্যাদান' শব্দটি এখনও প্রচলিত; কিন্তু 'গ্রহণ'-এর বিষয়টি 'যৌতুক' শব্দের দ্বারা অন্বিত হওয়ায় অত্যন্ত জটিল এবং অসাম্প্রত মনে হয়।

এখানে আরও বিচার আছে। 'উদ্বাহতত্ত্ব'-এ রঘুনন্দন ব্যাকরণকে টেনে এনে লিখেছেন যে 'অনট্' প্রত্যয় দ্বারা 'দান' শব্দটি সম্প্রদান বাচ্যেই নিষ্পন্ন করা উচিত, কেন না 'অনট্' প্রত্যয় দ্বারা 'দান' শব্দটি ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন করলে বিবাহকর্তা ও দানকর্তা একই ব্যক্তি হয়ে পড়েন। "এ বড় হাসির কথা হাসবে লোকে।" আবার, এই মতও ছিল যে, পাণিগ্রহণ ও বিবাহ একই অর্থ বহন করে না।

তবে বলতেই হয়, প্রায় সব স্মৃতি গ্রন্থেই গৃহিণীকে 'গৃহ' বলা হয়েছে। অর্থাৎ, যে পুরুষ বিবাহ করেন না তিনি স্মার্ত মতে গৃহহীন। তবে গৃহিণীর স্থান প্রধানত অন্দরমহলে। পুরুলিয়া জেলার গ্রামাঞ্চলে 'ভাতের বৌ'-এই কথা প্রচলিত। সম্প্রদানার্থে 'অনট্'-প্রত্যয়সিদ্ধ 'দান'-হিসাবে বিবাহিতা কন্যা গৃহিণী, গৃহ, হলেও আসলে 'ভাতের বৌ' এবং পুত্রোৎপাদনের ও রন্ধনের রক্তমাংস সংবলিত যন্ত্র মাত্র। মৈথিল নিবন্ধকার চণ্ডেশ্বর ঠাকুর তাঁর *গৃহস্থ রত্নাকর* গ্রন্থে অবশ্য লিখেছেন যে, স্ত্রীকে শুধু 'ভাতের বৌ' বললে চলবে না; স্ত্রী-কর্তৃক 'আশ্রমাদি সাধ্যকর্ম' নিষ্পন্ন হয়; অতএব তিনি মাননীয়া। বিবাহিতা কন্যার 'ভার্যাত্ব' রঘুনন্দনের মতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ভার্যার মর্যাদা দুর্লঙ্ঘ।

কিন্তু 'গোত্র' শব্দটিও বিবাহে অত্যন্ত গুরুত্ববহ। স্মার্তমতে দ্বিজের সমগোত্রে বিবাহ বিবাহ নয়, ব্যভিচারমাত্র। 'গোত্র'-শব্দের পারিভাষিক অর্থ বংশপরম্পরাসিদ্ধ ব্রাহ্মণজাতীয় আদি পুরুষ, যেমন জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, কাশ্যপ, বৎস, অত্রি, গৌতম, বশিষ্ঠ, অগস্ত্য ইত্যাদি।

সমানগোত্রার ও সমানপ্রবরা কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ। 'প্রবর' শব্দের অর্থ, যে সকল মুনিগণ গোত্রপ্রবর্তক, যাঁরা তাঁদের ভেদ প্রবর্তন করেন তাঁদের নাম প্রবর। একটা দৃষ্টান্ত এই প্রবন্ধের লেখক আমি, রমাকান্ত চক্রবর্তী, বাৎস্য গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ, এবং আমার পাঁচটি প্রবর, যথা ঔর্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জমদগ্নি, আপ্লুবৎ। আমার মা'র গোত্র এবং প্রবর ভিন্ন। কিন্তু তিনিও বৈদিক ব্রাহ্মণের কন্যা ছিলেন। আমার পিতামহীর বড় ভাই ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত ও হিন্দু ধর্মের প্রচারক শশধর তর্কচূড়ামণি।

এই গোত্রের ও প্রবরের বিভিন্নতা থেকে উৎসারিত হয় কৌলীন্য প্রথা। কৃষ্ণমিশ্র যতি *প্রবোধচন্দ্রোদয়* নামক একটি চমৎকার রূপক-নাটক লিখেছিলেন। তাতে এক রাঢ়ী ব্রাহ্মণ বলছেন (তিনি 'অহংকার' রূপে চিত্রিত):

১. গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী
ভূরিশ্রেষ্ঠকনাম ধাম পরমং তত্রোত্তমো নঃ পিতা।
তৎপুত্রাশ্চ মহাকূলা ন বিদিতাঃ কস্যাত্র তেষামপি
প্রজ্ঞাশীলবিবেক ধৈর্যবিনয়াচারৈরহং চোত্তমঃ ॥ (পৃ. ৫৮)

গৌড় রাষ্ট্রের চেয়ে উত্তম আর কোনও রাষ্ট্র নেই। সেখানেই রাঢ়াপুরী। রাঢ়াপুরীর ভূরিশ্রেষ্ঠ নামক স্থানে আমাদের বাড়ি। সমগ্র ভূরিশ্রেষ্ঠতে আমাদের পিতাই শ্রেষ্ঠ। তাঁর পুত্ররাও মহাকূল [কুলীন]; তাঁরা সর্বত্র অতুলনীয়। তাঁদের মধ্যেও আমি প্রজ্ঞা, শীল, বিবেক, ধৈর্য, বিনয়, সদাচার প্রভৃতি গুণের জন্য সর্বোত্তম।

২. নাস্মাকং জননী তথোজ্জ্বলকূলা সচ্ছোত্রিয়াণাং পুন
র্ব্যূঢ়া কাচন কন্যকা খলুময়া তেনাস্মি তাতাধিকঃ।
অস্মচ্ছালক ভাগিনেয়দুহিতা মিথ্যাভিশপ্তা যত
স্তৎসংপর্কবশাময়া স্বগৃহিণী প্রেয়স্যপি প্রোজ্ঝিতা। (পৃ. ৬০)

আমার মা'র কূল তেমন উজ্জ্বল নয়। আমি সমীচীন শ্রোত্রিয়ের কন্যাকে বিবাহ করেছি। তাই আমি আমার বাপের চেয়েও বড়। কিন্তু আমার শালার ভাগনের মেয়েকে মিথ্যা অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। তাঁরই সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্য প্রেয়সী পত্নীকে আমি পরিত্যাগ করেছি। (*প্রবোধচন্দ্রোদয়*, নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বাই, দ্রষ্টব্য)।

এই তো প্রেয়সী পত্নীর অবস্থা।

রঘুনন্দনের মতে শূদ্রদেরও গোত্র আছে। কিন্তু তাঁদের পক্ষে সগোত্রা ও সমানপ্রবরা ভার্যাগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল না।

রঘুনন্দনের কালে পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। রঘুনন্দন লিখেছিলেন, আটচল্লিশ বৎসর বয়সে স্ত্রীর মৃত্যু হলে 'আশ্রম'-রক্ষার্থে পুরুষের গোত্র-প্রবর মিলিয়ে পুনর্বিবাহ প্রয়োজনীয়। তবে 'সপ্তিগুতা' মেনে চলতে হবে। পিতৃপক্ষ থেকে সপ্তমী, এবং মাতৃপক্ষ থেকে পঞ্চমী কন্যা পরিত্যাগ করে ভার্যা গ্রহণ বিধেয়। এটা না করে বা না মেনে বিবাহ করলে পতিকে প্রায়শ্চিত্ত করার ব্যবস্থা রঘুনন্দন উল্লেখ করেছেন। প্রায়শ্চিত্ত, অর্থাৎ চান্দ্রায়ণ ব্রত। এই চান্দ্রায়ণ ব্রতের কথা রঘুনন্দনের আগে বলেছেন স্মার্ত শূলপাণি। [শূলপাণি, *প্রায়শ্চিত্ত বিবেক*, পৃ. ৩৭৫] যাকে ইওরোপীয় সমাজতত্ত্বে 'Concept of the Holy' বলা হয়েছে, এবং যা ধর্মবিশ্বাসের মৌলিক কথা, বাঙালি স্মার্তরা গোত্র প্রবর ও কুল প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে তারই প্রবর্তন করেছেন। এখন সর্বত্র এই 'Concept of the Holy' মানা হয় না।

রঘুনন্দন ও অন্যান্য স্মার্ত মতে কন্যার রজোদর্শনের পূর্বেই বিবাহ বিধেয়। আট বছরের কন্যা 'গৌরী', নয় বছরের কন্যা 'রোহিণী', দশ বছরের কন্যা 'কন্যকা'। এ সব শিশু-কন্যার বিবাহ স্মৃতিশাস্ত্রে অনুমোদিত। বারো বছর বয়সের আগেই কন্যার বিবাহ না হলে কন্যার পিতার 'ব্রহ্মহত্যা' পাপ হয়। এই পাপের আরও অকথ্য বিবরণ আছে। [দ্রষ্টব্য, রঘুনন্দন,

উদ্বাহতত্ত্ব। পৃ. ৪৬৮)। তবে, রঘুনন্দনের মতে, 'কন্যাশুল্ক' নিষিদ্ধ। অর্থাৎ, বিবাহে যৌতুক দেওয়া পাপ। কিন্তু এই পাপ অদ্যাবধি প্রচলিত। শুধু 'প্রচলিত' নয়, ভয়ংকর ভাবে প্রচলিত। সপ্তপদী গমন হয়নি; এই অবস্থায় কন্যাকে যদি কেউ হরণ করে, তবে হরণকারীর পাপ হয়— এ কথা বলা হয়নি। এই অবস্থায়, যার সঙ্গে কন্যার বিবাহ অপহরণের জন্যই হল না, কন্যার গোত্র সেই বঞ্চিত পতিরই গোত্ররূপে বিবেচিত হবে, অপহারকর্তার গোত্র তার হবে না। এ এক জটিল পরিস্থিতি।

ব্যভিচার তো ছিলই। কিন্তু সমাজে পুরুষের ব্যভিচার নিন্দনীয় ছিল না; রঘুনন্দন অবশ্য উচ্চবর্ণে ব্যভিচার নিন্দনীয় মনে করেছেন। অথচ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার নামক স্মার্ত ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রী-উপভোগ সমর্থন করেছেন। এখানে 'সপিণ্ডতা'-বিষয়ক তত্ত্বাবলি ব্যভিচারের স্রোতে ভেসে গিয়েছে। শূদ্রার সহবাস শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের মতে ব্রাহ্মণের একটি অধিকার। কিন্তু শূদ্র ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সহবাস করলে তার শাস্তি মৃত্যু। আরও দুটি বিষয়ের উল্লেখ করতে হবে: প্রথম বিষয়, সহমরণ; দ্বিতীয় বিষয়, স্ত্রীর উত্তরাধিকার প্রাপ্তি।

সহমরণ সম্বন্ধে রঘুনন্দন লিখেছেন: [দ্রষ্টব্য, রঘুনন্দন, *শুদ্ধিতত্ত্ব*, পৃ. ৩৪৫] অঙ্গিরা ঋষি সকল স্ত্রীর সহমরণই নির্দিষ্ট করেননি; সতীদাহ প্রথা মানতেই হবে— এমন কোনও কথা নেই। অনিচ্ছুক জীবিত স্ত্রীকে মৃত স্বামীর চিতায় স্থাপন করা সাধারণ কৃত্য নয়। শাস্ত্রে বিধবা স্ত্রীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য পালনই কর্তব্য। একথা *বিষ্ণুস্মৃতি*-তেও আছে। লক্ষণীয়, রঘুনন্দনের এই যুক্তি ধরেই রাজা রামমোহন রায় সহমরণের বা সতীদাহের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন: স্বামীর মরণে বিধবার ব্রহ্মচর্য, কিন্তু স্ত্রীর মরণে স্বামীর ব্রহ্মচর্য তো নয়, বরঞ্চ 'আশ্রম' রক্ষার্থে পুনর্বিবাহ। এটা যে যুক্তিহীন, তা পিতৃতান্ত্রিক সমাজে কোনও স্মার্ত-ভট্টাচার্য বুঝেও বোঝেননি। কিন্তু *শুদ্ধিতত্ত্ব*-এ (পৃ. ৩৬১) রঘুনন্দন লিখেছেন যে, বিবাহিতা স্ত্রী যদি অন্য পুরুষের সহবাসে গর্ভবতী হন, তবে তাঁর স্বামী তাঁকে পরিত্যাগ করতে পারেন। অথচ ব্রাহ্মণ শূদ্রার সঙ্গে সঙ্গম করলে যে দোষ হয় না, তা তো শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার বলে দিয়েছেন। শূদ্রদের ও স্ত্রীলোকের বেদমন্ত্র উচ্চারণের অধিকার নেই— *শূদ্রাহ্নিকাচারতত্ত্ব*-এ রঘুনন্দন এই কথা লিখেছেন। এই বিশেষ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণী ও শূদ্র একীকৃত।

স্ত্রী-ধনে স্ত্রীলোকের দান, বিক্রয় প্রভৃতি কর্মে সম্পূর্ণ অধিকার আছে। বলপূর্বক স্ত্রী-ধন ভোগ দণ্ডনীয় অপরাধ। 'স্ত্রী-ধন' একটি প্রযৌক্তিক শব্দ; এর অর্থ পিতৃদত্ত, মাতৃদত্ত, পুত্রদত্ত, ভ্রাতৃদত্ত, যৌতুক, আত্মীয়-দত্ত ধন। স্বামীর দ্বারা দত্ত ধনও 'অন্বাধেয়' স্ত্রী-ধন। বিবাহকালে কন্যার স্বামীর হাতে যা দেওয়া হবে, তা কন্যারই ধন। স্ত্রী যদি শিল্পকর্মাদির দ্বারা কিছু অর্থোপার্জন করেন, তবে তা স্বামী সাংসারিক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারেন। এই অর্থ স্ত্রী-ধন নয়; তাতে স্বামীর স্বত্ব থাকে। স্বামী স্ত্রীকে জমি, বাড়ি দিলে স্ত্রী সেই জমি, বাড়ি দান বা বিক্রয় করতে পারবেন না। এ কথা জিমূতবাহন বলছেন, রঘুনন্দনও বলছেন। [সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালি*, পৃ. ১৮১-১৮২, ১৯০-১৯১]

ফলত এই দাঁড়াল যে, 'গৃহস্বরূপা' গৃহিণী রান্নাঘরেই থাকেন এবং নিয়মিতভাবে স্তনদায়িনী হন। তাঁর বিশেষ কোনও অধিকার নেই। এ বিষয়ে একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ এইরূপ।

উনিশ শতকের মধ্যভাগেও বর্ধমানের মহারানির আদেশে *পতিভক্তিপ্রদায়িনী* নামক পুস্তক প্রকাশিত হয় (১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ)। বর্ধমানের রাজার সভাপণ্ডিত পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য *পতিব্রতোপদেশ* রচনা করেছিলেন। (১৮৬৫) তাতে পতিভক্তির বিবরণ এইরূপ, যথা:

> পতিব্রতা স্ত্রী প্রাতঃকালে নিদ্রান্তে শাড়ি বদলে প্রথমে স্বামীকে প্রণাম করবেন, এবং স্বামীর স্তব পাঠ করবেন। স্নানান্তে শুচিবস্ত্র পরিধান করে সাদা ফুল দিয়ে ভক্তি সহ স্বামীর পূজা করবেন। স্বামী স্নান সেরে ধৌতবস্ত্র পরিধান করে উচ্চাসনে বসবেন। স্ত্রী আহ্লাদপূর্বক তাঁর চরণদুটি ধুয়ে দেবেন, এবং তাঁর কপালে চন্দনের ফোঁটা, গলায় ফুলের মালা, সর্বাঙ্গে সুগন্ধদ্রব্য মাখিয়ে যথাসম্ভব পাদ্য-অর্ঘ উপাচার সহ 'অমৃতোপম' খাদ্য খেতে দেবেন। সামবেদের 'নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্বদেবাশ্রয়ায় নমঃ' এই স্তব পাঠ করে প্রণাম করবেন। অতঃপর ভক্তিভরে পান করবেন স্বামীর পাদোদক।
>
> [আবদুস সামাদ, *বর্ধমান রাজসভাশ্রিত বাংলা সাহিত্য,* ১৯৯১, পৃ. ১৩৩-১৩৪]

এইরূপ পাতিব্রত্যই স্মৃতিশাস্ত্রে সিদ্ধান্তিত। এ বিষয় মন্তব্য করতে গেলে অভব্য কথা লিখতে হয়। তাই মন্তব্য করছি না।

দুই

এখন সাহিত্যিক উপাদান আলোচ্য। তবে বৈষ্ণবীয় সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা একটু পরে আসছে। সাহিত্যিক উপাদান, মঙ্গলকাব্য, মুসলমান-কবিদের রচনা, এবং বিবিধ। বলাবাহুল্য, এই বিশাল সাহিত্যসম্ভার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করা যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য কাজ। দেখি, সে কাজ কতটা করা যায়।

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে উত্তর ভারতে প্রচলিত নায়িকার বিরহের বিবরণমূলক 'বারমাসিয়া' (বারমাস্যা) ও চতুর্মাসিয়া (চারমাস্যা বা চাতুর্মাস্যা) বঙ্গে প্রচলিত ছিল। এ সব গেয় আখ্যায়িকা কাব্য। বিরহের মধ্যে ঋতুবর্ণনা যেমন থাকে, তেমন থাকে সাংসারিক বিবরণ, নানা অভাব-অভিযোগের বিবরণ। আনন্দ কুমারস্বামী, দীনেশচন্দ্র সেন উল্লিখিত 'বারমাস্যা' পড়ে (সম্ভবত অনুবাদ পড়ে) লিখেছিলেন যে, এই কবিতা মধ্যকালীন চিত্রশিল্পেরও বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। 'দরিদ্র গৃহিণী' সংস্কৃত সুভাষিতেও স্থান পেয়েছেন, 'বারমাস্যা' ও 'চাতুর্মাস্যা'-তে চিত্রিত হয়েছেন। এই পুরাতন রীতি মঙ্গলকাব্যতেও প্রাধান্য পেয়েছে। এই একটি ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নারীর প্রাতিস্বিকতা স্বীকৃত। 'বারমাস্যা', 'চাতুর্মাস্যা' একমাত্র মাসের ও ঋতুর পরিবর্তন অনুসারে নারীর মনের কথা এবং বৈষয়িক

অবস্থা প্রকাশ করে। কিন্তু, উত্তর ভারতীয় চিত্রশিল্পে 'বারমাস্যা'র নারী অভিজাত বিরহিণী মাত্র। এই ধরনের গেয় কবিতায় লোকগীতির প্রভাবও ছিল।

'বারমাস্যা', 'চাতুর্মাস্যা' প্রধানত মানবিক কবিতা, ধর্মীয় কবিতা নয়। কিন্তু, বঙ্গে ইসলামের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠার ফলে কাব্য, কবিতা, গান— সবই হয়ে উঠল ধর্মীয় এবং পৌরাণিক। এই কাব্য-সাহিত্যে মানুষ গৌণ, দেবতা মুখ্য। কৃত্তিবাস ওঝা সুমধুর ভাষায় রামায়ণ লিখলেন; তাতে সীতার সতীত্ব সর্বপ্রেক্ষিতেই প্রাধান্য পায়, যদিও লক্ষ্মণ সেনের আমলে বাঙালি কবি গোবর্ধনাচার্য-রচিত 'আর্যাসপ্তশতী'র সাতশ' আর্যাতেই শুধু যে শৃঙ্গাররসের প্রাধান্য দেখি, তাই নয়; ব্রাহ্মণ-শূদ্র অধ্যুষিত গ্রামীণ সমাজে বহু রকমের ব্যভিচারমূলক ঘটনার সুস্পষ্ট উল্লেখও দেখি। ধর্মীয় কাব্যের বহুল প্রচারে সীতা, সাবিত্রী, বেহুলা প্রাধান্য অর্জন করলেন বটে, কিন্তু, অন্তত বঙ্গীয় স্মৃতিতে বহুবিধ ব্যভিচারের উল্লেখ এবং তার জন্য প্রায়শ্চিত্য বিষয়ক প্রস্তাবনার উল্লেখ রয়ে গেল। তবে, বটতলায় (১৮৪৫)-এ মুদ্রিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে অদ্ভুত, কিন্তু স্বাভাবিক এক অবস্থার বিবরণ দেখি:

অপূর্ব খাটেতে শয্যা সুগ্রীব শয়ন
ধূলাতে রামের শয্যা শোকে অচেতন
পরম সুন্দরী লৈয়া সুগ্রীব বিলাস
সীতাকে স্মরিয়া রাম ছাড়েন নিঃশ্বাস॥

এমন যে রাম, তিনিই সীতার অগ্নিপরীক্ষা করলেন!

রামভক্তি, সীতাভক্তি, সাবিত্রীভক্তি, পঞ্চপতি সত্ত্বেও দ্রৌপদীভক্তি, বা কুন্তীভক্তি— এ সমস্তই স্মার্ত, সমস্তই পৌরাণিক। এই অবস্থায় পূর্বে কথিত স্বামীকে ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করা, বা স্বামীর পাদোদক পান উচ্চবর্ণের হিন্দু পরিবারে দুর্নিবার ছিল হয়তো; কিন্তু কৌলীন্য প্রথা অত্যন্ত প্রবল, এবং বাল্যবিবাহ প্রচলিত— এই অবস্থায় সীতা সাবিত্রীর অনুকরণ যে কষ্টসাধ্য ছিল, তা বলা বাহুল্য। 'কুলজী'গুলো পড়লে বোঝা যায়, সংখ্যাতীত পরিবারে স্মার্ত আইনকানুন না মেনে নানা রকমের 'দোষ' ছিল, 'দোষ' অর্থ অসবর্ণ বিবাহ, বা ব্যভিচার। এ সব সমকালীন সাহিত্যে, দু'-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, বৈধ বিবাহ দেখা যায় না। তবে এই সব 'সন্দেহজনক' বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, মধ্যকালেও পুরুষশাসিত 'শুদ্ধান্তঃপুর'-এ স্ত্রীলোকরা সর্বদা পতির পাদোদক পান করেননি। এ বিষয়টি কৃষ্ণমিশ্র যতি-রচিত পূর্বে উল্লিখিত চমৎকার শ্লোকেও 'ভাগিনেয়-দুহিতা'-র প্রসঙ্গে ভদ্র ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। 'বারমাস্যা' ও 'চাতুর্মাস্যা'-য় বর্ণিত বিরহের কখনও কখনও একটি মাত্রা দারিদ্র্য; পতি 'পথিক'; পথঘাট বিপদসঙ্কুল, উপার্জন অনিশ্চিত, গৃহে যুবতী স্ত্রী। হয়তো তিনি পরিবারেই আছেন, কিন্তু স্বামীর বিদেশে গমনে তাঁর নিঃসঙ্গতা অসহনীয়। এই হল এই ধরনের গেয় পদের মূল সুর। সতীত্ব না থাকলে বিরহ আসে না; কাজেই সতীত্বও এ সব গানের মূল সুর।

এরপর শুরু হল বাংলা-অহমিয়া রামায়ণের যুগ, কৃত্তিবাস-মাধব কন্দলীর যুগ। এ যুগে বঙ্গনারীর আদর্শ সীতা, একটু পরে বেহুলা।

রাম পত্নী-প্রেমিক; কিন্তু পত্নীর অগ্নি-পরীক্ষাও তিনি করেন, কারণ সীতা রাবণের দ্বারা স্পৃষ্ট। অর্থাৎ স্ত্রীর প্রতি পতির প্রেম যে কী হয়ে দাঁড়াবে তা বলা যায় না। রামের উপাসনা হয়, সীতার নয়। রামমূর্তির পূজা উত্তর ভারত থেকে বঙ্গে এসেছিল।

বহু বিবাহের ফল যে ভাল হয়নি, তার অনেক প্রমাণ আছে। একটি প্রমাণ, সন্দেহজনক 'কুলজী' সাহিত্য, যা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। আর একটি প্রমাণ, মঙ্গলকাব্য সমূহে সামগ্রিক ভাবে সতীত্বের ওপরে গুরুত্ব আরোপ। গৃহদেবতাগণের 'চরিত্র' অনেক ক্ষেত্রে সন্দেহজনক হলেও, গৃহের আভ্যন্তর পবিত্রতা রক্ষার আদর্শ বেহুলা, ফুল্লরা। সীতা, সাবিত্রী তো ছিলেনই। কিন্তু কৌলীন্যপ্রথা প্রচলিত থাকায় তথাকথিত 'শুদ্ধান্তঃপুর'-এর বিশুদ্ধি যে থাকত না— তা সহজেই অনুমেয়। কৌলীন্যের ১১৭-টি 'সমীকরণ' লক্ষ্মণ সেনের আমলেই প্রচলিত হয়। কুলীন স্বামী শিবের দুই পত্নী দুর্গার ও গঙ্গার কোন্দল সাহিত্যিক ঐতিহ্যসম্মত। তা ছাড়াও, 'শিবায়ন'-এর শিব কোচ-যুবতীদের সঙ্গেও বিহার করতেন; এইরূপ বিহারজাত শিবপুত্র গ্রামে গ্রামে 'পঞ্চানন্দ' নামে অদ্যাবধি পরিচিত। কুলীন স্বামীর ব্যবসাই ছিল বিভিন্ন শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে তোলা আদায় করা, তার কদাচিৎ দৃষ্ট পত্নীর গর্ভসঞ্চার করে তাঁর আর খোঁজখবর না নেওয়া।

এই সব দেখে রামমোহন রায় তাঁর *Brief Remarks Regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females According to Hindu Law of Inheritance* নামক বিখ্যাত নিবন্ধে মন্তব্য করেন: Polygamy is a frequent source of the great misery in native females.

কিন্তু এই বিষয়টি কখনও কখনও বহু পত্নীর স্বামীর গৃহে দুই পত্নীর কোন্দলের ও হিংসার বিবরণ কোনও কোনও মঙ্গলকাব্যে থাকলেও, কৌলীন্য প্রথারূপ জঘন্য ব্যবস্থার নিন্দা নেই।

তার একটা প্রধান কারণ বোধ হয় এই ছিল যে, সপ্তদশ শতকের আগে সাধারণত পরিবারের আয়তন ছিল ছোট; যেমন বৈষ্ণব-ভক্তি প্রচারক চৈতন্যের পরিবার। এখানে পিতা, মাতা, দুই পুত্র, বিশ্বরূপ ও নিমাই। কিন্তু সপ্তদশ শতক থেকে শুরু করে গ্রামীণ উৎপাদন-ব্যবস্থা যেমন বিস্তৃত হয়, চিনি, চাউল, কাপড় ও হস্তশিল্পের বাজার দাক্ষিণাত্যে, গুজরাটে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে, মধ্য ও নিকট প্রাচ্যে, এবং চিন দেশে বিস্তৃত হয়, তেমনই পরিবার 'একান্নবর্তী' হতে থাকে, এবং কৌলীন্য প্রথার ফলে অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদের ও সন্তানসন্ততির সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে।

কিন্তু ফলত সতীনে সতীনে স্বামীর ভালবাসা নিয়ে কলহ শুরু হয়। মুকুন্দের *চণ্ডীমঙ্গল*-এ ফুল্লনা-লহনার দ্বন্দ্ব তার একটি প্রমাণ। দুষ্টচরিত্রা দাসী ভাবে:

যেই ঘরে দু সতীনে না বাজে কোন্দল
সেই ঘরে রহে দাসী সে বড় পাগল।

কথা চালাচালি করাই দাসীর কাজ; ঝগড়া বাধানোই দাসীর কাজ। স্বামীকে বশে রাখার জন্য তুকতাক জড়িবড়ির ব্যবহারেরও উল্লেখ করেন কবি মুকুন্দ। শেষ পর্যন্ত লহনার চক্রান্তে খুল্লনা মাঠে ছাগল চড়াতে যায়।

একদিন একটি ছাগল হারিয়ে গেল। মঙ্গলচণ্ডীর দয়ায় সে যাত্রায় খুল্লনা উদ্ধার পেলেন।

সতীত্ব সাধ্বীত্ব অবশ্যই আদর্শ। কিন্তু ঘনরামের *ধর্মমঙ্গল*-এ এক অসতীর ভয়ংকর বিবরণ আছে। এই অসতী রমণী 'তিন ছেলের মা মাগী' ['জামতি পালা' দ্রষ্টব্য] এই অসতী রমণীর ছলাকলার বিবরণ অভব্য বললে কম বলা হয়। ঘনরাম 'পতিনিন্দা'র বিষয়টিও দিয়েছেন। যাঁরা পতিনিন্দা করেন, পতির সংসারে থেকেও তাঁরা 'কুলটা'। তবে, এ বিষয়টি অতি পুরাতন। বিদ্যাপতির কবিতায় দেখি, কৌলীন্য-প্রথা অনুসারে যুবতীর পতি শিশু; সেই যুবতী পথিককেই যৌন-সহবাসের জন্য অর্থপূর্ণ ভাষায় আমন্ত্রণ জানায়। সে পথিককে বলে:

পিয়ামোর বালক হম্ তরুণী
কোন তপ চুকলোহঁ ভেলোহঁ জননী॥

আমার প্রিয়তম বালক; আমি তরুণী। কোন তপোভ্রষ্ট হয়েছি যে, পত্নী হয়েও জননী হলাম। [খগেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমানবিহারী মজুমদার, *বিদ্যাপতির পদাবলী* পদ ৫৯১, পৃ. ৩৭৫]। ঘনরাম লেখেন:

বামাবামী রটে স্বামী যুবা বটে
কিন্তু সে জীয়ন্তে মরা॥

লক্ষণীয়, মঙ্গল-সাহিত্যে নারীগণের পতিনিন্দার স্থান পুকুরের বা দিঘির ঘাট। কখনও কখনও বিয়ের বাসর। সেখানে তাদের আলোচনায় যৌন-বঞ্চনার বিষয়টি যে ভাষায় ব্যক্ত হয়, তা ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে, বা খোলাখুলি অশ্লীল। বিশেষ ভাবে ভারতচন্দ্রের *বিদ্যাসুন্দর*-এ এই আলোচনা, ভারতচন্দ্রের ভাষা ও ছন্দের উপরে অসামান্য দখলের জন্যই, কখনও কখনও হাস্যরসাত্মক। আদিরস ও হাস্যরসের এমন অদ্ভুত সংমিশ্রণ আর নেই। ভারতচন্দ্র লিখলেন:

আর জন কয় এই মহাশয় (অর্থাৎ সুন্দর)
চাঁপাফুলময় খোঁপায় রাখি।
হলদী জিনিয়া তনু চিকনিয়া
স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি।

[ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ,
বঙ্গাব্দ ১৩৬৯, পৃ. ১৭৩]

সুন্দরের সৌন্দর্যদর্শনে বর্ধমানে দিঘির ধারে নারীদের কামাবেগের একটি বড় কারণ তাদের পতিদের সঙ্গমে অক্ষমতা, বার্ধক্য।

ঘরে গিয়া আর দেখিব কি ছার
মিছার সংসার ভাতার জরা
সতিনী বাঘিনী শাশুড়ী রাগিনী
ননদী নাগিনী বিষের ভরা॥

[তদেব, পৃ. ১৭৩]

এই সিদ্ধান্তই দুর্নিবার যে, সীতা সাবিত্রী খুল্লনার সতীত্ব বহু ক্ষেত্রেই মানা হয়নি, মেনে চলা সম্ভব ছিল না। মঙ্গলকাব্যের কবিরা তা জানতেন এবং তা উল্লেখ করতেও তাঁরা দ্বিধাবোধ করেননি। বিশেষভাবে ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দরের প্রেম বর্ণনায় এই দেখালেন যে, অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারেও কৌমারহর পুরুষের চৌর্য-রতি, অবাঞ্ছিত হলেও, ছিল এবং তা নিবারণ করার উপায় ছিল না। সুন্দরের সহায়িকা সাক্ষাৎ ভগবতী, অর্থাৎ পরমেশ্বরীর কৃপায় বিদ্যাসুন্দরের কাম, শুধু স্বাভাবিক নয়, সিদ্ধ [legitimized]।

শুন শ্বশুর ঠাকুর শুন শ্বশুর ঠাকুর।
আমার বাপের নাম বিদ্যার শ্বশুর॥

এই ধরনের কথা সুন্দর কালীর কৃপাতেই বলেন, বলতে পারেন।

বাঙালি মুসলমান কবিরা ধর্মের বাইরে এসে বহু রোমান্টিক কাহিনি লিখেছিলেন, যেমন, সাবিরিদ খান 'পঞ্চালিকা' রূপে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনি লিখেছিলেন। লৌকিক কাহিনি লিখেছিলেন দৌলত কাজী, তার নাম *সতী ময়না* বা *লোর চন্দ্রানী*। আলাওল লিখেছিলেন *পদ্মাবতী পাঞ্চালী*, যা ছিল জায়সীর *পদুমাবতী*-র স্বাধীন অনুবাদ এবং এখানে গানও আছে। অনির্দেশ্য কবি লিখেছিলেন *কোরেশী মাগন*। সৈয়দ সুলতান লিখেছিলেন *জ্ঞানপ্রদীপ*, যেখানে ফকিরদের ধর্মমত ব্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু, এই ধরনের বঙ্গীয় ইসলামি সাহিত্যে প্রণয় বা সুফীমতবাদ যেমন প্রাধান্য পেয়েছে, কবি মুকুন্দের *চণ্ডীমঙ্গল*-এর মতো সাংসারিক বিবরণ তেমনটা নেই। তবে ধর্মবহির্ভূত প্রণয়কাহিনির সূত্রপাত হয়েছিল— এটা বলা যায়।

তিন

বৈষ্ণবীয় ভক্তির সুপ্রসিদ্ধ প্রচারক শ্রীচৈতন্যের জীবনী লিখেছিলেন মুরারি গুপ্ত, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, লোচন দাস এবং কবি কর্ণপূর। তাতে এই দেখা যায় যে, চৈতন্য নবদ্বীপের স্মার্ত-সংস্কৃতির বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি কোনও সামাজিক বিপ্লবের আদর্শ প্রচার করেননি। কিন্তু, তাঁর দ্বারা প্রচারিত ভক্তির ভাবাবেগে স্মার্তসংস্কার শিথিল হয়ে যায়। বৈষ্ণবরা ভক্তির ক্ষেত্রে জাতিভেদের এবং স্ত্রীলোকদের সীমাবদ্ধতা মানেননি।

লক্ষণীয়, চৈতন্যের অনুগামী বৃন্দাবনের বিখ্যাত ষড়্-গোস্বামী যে ধর্মতত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, তাতে রাধার ও গোপিনীদের খুব বেশি গুরুত্ব ছিল। তাঁদের তত্ত্বে, রাধা অন্য পুরুষের পত্নী হলেও, কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। কৃষ্ণ শক্তিমান। রাধা শক্তি। কৃষ্ণ বিশেষ্য। রাধা বিশেষণ। কিন্তু রাধা কৃষ্ণের পত্নী নন। এই রকম ধারণা স্মৃতিশাস্ত্রের বিরোধী; কিন্তু ভক্তিতেই, বা ভক্তিতত্ত্বেই, যা *ভাগবতপুরাণ*-এ কথিত— এটা সম্ভব। ভক্তিতে, এবং বামাচারী তন্ত্রমতে, পাতিব্রত্য গুরুত্ববহ নয়। কৃষ্ণই পতি, এবং বামাচারী তন্ত্রে, বিবাহিত পতি নয়, গুরুদেবই পতি। *ভাগবতপুরাণ* অনুসারে 'বনচরী' ও 'ব্যভিচারিণী' গোপীরা কৃষ্ণকে ভালবেসে সর্ববিধ পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। অথচ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থে লিখেছিলেন যে, কৃষ্ণপ্রেমে গোপীদের শুধু 'প্রেম'-ই ছিল, 'কাম' ছিল না। কারণ, 'কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্মল ভাস্কর'। আবার এমন ব্যাখ্যাও আছে যে কৃষ্ণ রাধা সহ গোপীদের সঙ্গে সঙ্গম করে যে আনন্দ পান, তার জন্যই তাঁদের অবৈধ সঙ্গম 'পবিত্র'। কিন্তু এই তত্ত্বও রূপ গোস্বামী লেখেন যে, এইরূপ যৌনতার কোনও পার্থিব তাৎপর্য নেই। কৃষ্ণের প্রেমিকাদের স্বামীরা ছিলেন ছায়া মাত্র; তাঁদের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেমিকাদের কোনও দৈহিক সম্পর্ক ছিল না। অথচ, বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ রতিক্ষমতাহীন পতির তরুণী পত্নী রাধা যথাসাধ্য চেষ্টা করেও কৃষ্ণের গুণ্ডামি ও লাম্পট্য থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এর কৃষ্ণচরিত্র সর্বদা লাম্পট্যলাঞ্ছিত। কামই এ কীর্তনের মূল সুর। ভবানন্দ নামক কবি-রচিত *হরিবংশ* নামক কাব্যে কৃষ্ণ একই সঙ্গে মাতুলানী রাধা এবং তরুণী মাসিকে উপভোগ করেন। কাজেই, ষড়্ গোস্বামী-প্রচারিত তত্ত্ব অজাচারকে ঢেকে রাখতে পারল না। এইরূপ অজাচার জীব গোস্বামীর মতে 'বিদ্বদনুভব' রূপে প্রামাণিক।

সম্ভবত এইরূপ ঘটনা যাতে না ঘটে, তার জন্য ভক্তির তত্ত্বে 'সদাচার'-কে খুব প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। সদাচারই ভক্তির প্রাণবস্তু। সদাচার থেকেই কৃষ্ণভক্তের সন্ন্যাস উৎসারিত হয়। কিন্তু নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের সঙ্গ বর্জন করেও বৃন্দাবনের বনে বনে কৃষ্ণের সঙ্গমলীলার স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন করেন। বিষয়টি সত্য সত্যই 'অচিন্ত্য।' বর্ধমানের শ্রীখণ্ড গ্রামের নরহরি সরকার, এক প্রভাবশালী বৈষ্ণব, এমন মতও প্রচার করেন যে, চৈতন্য কোনও রমণীর দিকে না তাকালেও নবদ্বীপের সর্ব বয়সের রমণী তাঁকে তাঁদের 'নাগর' ভাবতেন। একে 'গৌরাঙ্গনাগরবাদ' বলা হয়। এই তত্ত্বে স্মার্ত মতকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। 'গৌরনাগরবাদী' এমন সব গান আছে, যা ছাপার যোগ্য নয়। তবে এই মতবাদ সমস্ত গৌরভক্ত গ্রহণ করেননি।

মধ্যকালে রচিত তান্ত্রিক সাহিত্যে স্ত্রীলোকের স্থান বেশ উঁচুতেই দেখা যায়। বামাচার ভৈরবীর সাহায্য ছাড়া নিষ্পন্ন হয় না। অঘোর পন্থাতেও ভৈরবীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই সব ভৈরবীর সামাজিক জীবনে একটি অংশ লৌকিক, অপরটি গোপনীয়। কোনও কোনও তন্ত্রে সাধনার নামে অপ্রতিহত অজাচারও পারিভাষিক শব্দে বর্ণিত হয়েছে। স্মার্ত মতে ব্রাহ্মণ মদ্য স্পর্শ করেন না। কিন্তু তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মে ব্রাহ্মণের আকণ্ঠ মদ্যপানে এবং নির্বিচার সঙ্গমে দোষ হয় না।

প্রসঙ্গত চণ্ডীদাস-রচিত 'পদাবলী' উল্লেখ্য। প্রেম ও বিরহ-বিষয়ক যে সব পদাবলি তিনি রচনা করেছিলেন, তাদের বিশিষ্টতা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। তাঁর পদাবলির রাধা প্রায়শ নিজের কথাই বলেন। তাঁর কথা প্রধানত দুঃখের কথা। কবি তাঁর কথার শেষে সুগভীর অর্থবহ মন্তব্য করেন। চণ্ডীদাসের পদসমূহে কৃষ্ণের দেবত্ব সম্বন্ধে বাগ্‌বিস্তার নেই। রাধা সখী-পরিবৃত নন। পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম করা যে পাপ, এই চিন্তা রাধার মন ভারাক্রান্ত করে না। তাঁর 'কালিয়া বঁধু' ঈশ্বরও হতে পারেন, মানুষও হতে পারেন। তবে কালিয়া বঁধু যে বহু বিবাহিত পুরুষের মতো বহু রমণীর প্রণয়াসক্ত, তা তিনি জানেন। চণ্ডীদাসের রাধা নিজের কথা বলে বিস্ময়কর ভাবে জীবন্ত। একজন ব্যক্তিরূপে তিনি সর্বদা এই বোধ করেন যে, তাঁর কোনও স্বাতন্ত্র্য নেই; সর্বাবস্থায় পরাধীনতাই তাঁর স্থায়ী অবস্থা:

ধিক্ রঁহু জীবনে যে পরাধীনী জীয়ে।
তাহার অধিক ধিক্ পরবশ হয়ে

[*চণ্ডীদাসের পদাবলী*, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ,
পৃ. ১২৬, পদ ১১০]

এখানে 'পরবশ' শব্দটিতে পরপুরুষ কালার সঙ্গে পিরিতের সম্পর্কও রাধার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। 'রাধা' নামক পরপুরুষাসক্তা যুবতীর মুখ দিয়ে নারীর প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আশা, আকাঙ্ক্ষা, মর্মবেদনা যে ভাবে চণ্ডীদাস ব্যক্ত করেছেন, তাঁর কালে তার কোনও সমান্তর ছিল না। রাধার মহিমা, চণ্ডীদাসের কবিতায়, তাঁর প্রাতিস্বিকতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। লক্ষণীয়, চণ্ডীদাস-সৃষ্ট রাধার প্রেমে দৈহিক মিলন তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু মনে সেই পিরিতি থাকলে দোষ কোথায়? সেই অধিকার থেকে বিরহিনী রাধাকে কে বঞ্চিত করবে? তবে, এটাও সত্য:

চণ্ডীদাস কহে শুনলো সুন্দরী সুখ-দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরিতি দুখ যায় তার ঠাঁই।।

বৈষ্ণবরা স্ত্রীলোকদের মধ্যে স্বাক্ষরতা, শিক্ষা প্রসারিত করেছিলেন। ফলত ষোড়শ শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে বহু স্ত্রী-গুরুর আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকেই গঠনমূলক কাজ করে খ্যাতিলাভ করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সন্ত-জীবনী সমূহে তেরো জন বিখ্যাত স্ত্রী-গুরুর নাম পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন নিত্যানন্দের দ্বিতীয়া পত্নী জাহ্নবাদেবী এবং শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরানী। এমনকী লক্ষহীরা কৃষ্ণদাসী প্রথমে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করলেও পরে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিতা হয়ে সদাচার সম্পন্না স্ত্রী-গুরু হয়ে যান। অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতাদেবীও প্রভাবশালী স্ত্রী-গুরু ছিলেন। তাঁরই জীবনীগ্রন্থ, *সীতাচরিত্র*, *সীতাগুণকদম্ব*। মধ্যযুগে একজন বিশিষ্ট উচ্চশিক্ষিত বাঙালি মহিলার জীবনীগ্রন্থ

রচনা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন বৈষ্ণবগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে জাহ্নবাদেবী অগ্রণী ছিলেন। তিনি 'ঈশ্বরী' উপাধি অর্জন করে সর্বত্র খ্যাতিলাভ করেন।

কিন্তু সমাজ-সংসার পুরুষ-শাসিত। তার ফলে স্ত্রী-গুরু-বৈষ্ণবীদের প্রভাব ক্রমশ কমে যায়; *বংশীশিক্ষা* নামক গ্রন্থের রচয়িতা অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে লিখলেন:

> কার উপদেশ প্রভু গ্রাহ্য যোগ্য নয়
> স্ত্রী-শূদ্র-পতিত ব্রাহ্মণের বেদে কয়
> স্ত্রী-জাতির উপদেশে কি বা অনর্থ হয়
> ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ভক্তি আদি ক্ষয়॥
>
> [*বংশীশিক্ষা*, পৃ. ১২৫]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে 'সিমলার মা-গোঁসাই' মধুমতীদেবী ছিলেন নিত্যানন্দবংশীয়া; অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্না এই মা-গোঁসাই 'পতিত' ও বেশ্যাদের মধ্যে হরির নাম প্রচার করে খ্যাতি অর্জন করেন।

এমনও শোনা যায় যে, অনেক বামাচারী ভৈরবী যথেষ্ট শিক্ষিত এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। বেশ কিছু সহজিয়া স্ত্রী-গুরু শিক্ষিত ছিলেন। কিন্তু মঙ্গলকাব্য সমূহে বেহুলা খুল্লনা এবং 'বিদ্যাসুন্দর'-এর বিদ্যা ছাড়া আর সব মহিলাই ধর্মাচ্ছন্ন, সাধারণ, এবং প্রায় দাসী। তাঁদের মন্ত্রোচ্চারণের অধিকার নেই; তাই তাঁরা মন থেকে উপাস্য দেবতার 'ব্রতকথা' নির্মাণ করেন; পরে পুরুষ-লেখকগণও তাঁদের জন্য ব্রতকথা লেখেন।

কবি মুকুন্দ-কথিত 'বুলান মণ্ডল'-জাতীয় মানুষদের পরিবারে স্ত্রীলোকদের স্থান কীরূপ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, সন্তানের জন্মদান, এবং রান্নাঘর চালানোই তাদের প্রধান কাজ। তাঁরা অশিক্ষিত, সংস্কারাচ্ছন্ন এবং ব্যক্তিত্বহীন। ব্রাহ্মণদের কৌলীন্য প্রথায় তাঁরা নির্যাতিত, পরিত্যক্ত এবং যৌনতাগ্রস্ত হলে ব্যভিচারপরায়ণ। বিধবা হলে, স্বামীর বহ্নিমান চিতায় নিক্ষিপ্ত হন।

এই অবস্থার ব্যতিক্রম খুঁজে পাওয়া একটা কঠিন গবেষণা।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে বঙ্গদেশে সাধারণ নারীর অবস্থা কেমন ছিল? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ব্রিটিশ লেখক লুক্ স্ক্র্যাফ্টন। তিনি লিখেছিলেন:

> The women are married in their infancy, and it is common to see a woman of 12 with a child in her arms… yet they bear but few children for at 18 they… are on the decline, and at 26 they are strongly marked with age.
>
> [Luke Scrafton, *Reflexions on the Government of Hindostan*, London, 1770, pp. 10-11]

শুধু যে এই অবস্থা, তাই নয়; "ভরার মেয়ের বারোমাসী" নামক দুঃখজনক গান প্রচলিত ছিল। এই গানের সংগ্রহকারী গবেষক ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক লিখেছেন: কৌলীন্য

প্রথা প্রচলিত থাকার জন্য অষ্টাদশ শতকে 'বিবাহ ব্যবসায়ী' ঘটকরা পূর্ববঙ্গের নদী খালে নৌকায় উঠিয়ে 'ভরা' (বা বজরা)-র মেয়ে সস্তায় বিক্রয় করত। মৌলিক লিখেছেন:

> কুলীন ঘরে যে সব কন্যার বিবাহ দেওয়া অভিভাবকদের আর্থিক সামর্থ্যে কুলাইত না, এবং যে সব কন্যা বিবাহের রাত্রে সাতপাক ঘুরিয়া কুলীন বরের নাকের ডগা এক ঝলক দেখিয়াছে মাত্র, তাহাদের নিরুপায় অভিভাবক ঘটকের নির্দেশ মতো ভরা [নৌকা] ঘাট ছাড়িয়া যাইবার রাত্রে মেয়েগুলিকে আনিয়া ভরায় তুলিয়া দিতেন... রাতের অন্ধকারে মেয়ে ভরায় তুলিয়া দিয়া বাপ, মা অথবা অভিভাবক ঘটকের হাতে তামা তুলসী গঙ্গাজল দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইতেন, মেয়েটিকে যেন স্বজাতির ঘরে বিবাহ দেওয়া হয়...
>
> ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, *প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা*, চতুর্থ খণ্ড, (১৯৭২) পৃ. ১৯৭-২০৬

কিছু মেয়ের বিয়ে হত; অনেকেই হত বৈষ্ণব-মহান্তদের সেবাদাসী বা বোষ্টমী; অনেকেই পতিতালয়ে স্থান পেত।

এ সব তথ্য পড়লে বড় দুঃখ হয়।

রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়

পদ্মিনীর আখ্যান: ইতিহাসের বিভিন্ন পাঠ

প্রবাসী-র ১৩৩৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় কালিকারঞ্জন কানুনগো 'পদ্মিনী উপাখ্যান ও তাহার ঐতিহাসিকতা' নামে প্রবন্ধ লেখার পরই ১৩৩৮ সালের চৈত্র সংখ্যায় নিখিলনাথ রায়ের 'পদ্মাবতী একখানা ঐতিহাসিক কাব্য' প্রকাশিত হয়।[১] বেঁধে যায় তুমুল বিতর্ক। সাহিত্যকে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা যায় কিনা? স্থান, কাল, পাত্র-পাত্রী কীভাবে নির্ধারণ করে ঐতিহাসিক ঘটনার গুরুত্ব? এই সমস্যা আজও সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকদের বয়ানে বর্তমান। কালিকারঞ্জনের মতে নিতান্ত সমসাময়িক না হলে কোনও কাব্যকে ঐতিহাসিক বলে গ্রহণ করা বিপজ্জনক। মারাঠী *শিবভারত*, সংস্কৃত *রামচরিতম, পৃথ্বীরাজ দিগ্বিজয়ম*, হিন্দি *সুজান চরিত* ইত্যাদি ঐতিহাসিক কাব্য— কেন না এগুলি দরবারি কবিরা রাজাদের আদেশে রচনা করতেন। চাটুকারিতাটুকু বাদ দিলে, এগুলি থেকে সত্য ইতিহাস অনুধাবন করা যায়। প্রমাণস্বরূপ কালিকারঞ্জন দাঁড় করিয়েছেন আমির খসরুকে, যিনি আলাউদ্দিনের চিতোর জয়ের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা। তিনি রত্নসেন, পদ্মিনী, গোরা, বাদল কারুর নাম করেননি। স্ত্রীলোক সংক্রান্ত কোনও ব্যাপার নিয়ে যে এই যুদ্ধ তাও তিনি লেখেননি। প্রায় সমসাময়িক আর এক বিখ্যাত ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারণী *তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী*-তে আলাউদ্দিনের রাজত্বকালের কিছু ঘটনা উল্লেখ করেন, যা তিনি তাঁর পিতৃব্য আলাওল মূল্‌ক, যিনি আলাউদ্দিনের সময় দিল্লির কোতয়াল ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে শোনেন। তিনিও পদ্মিনীর নাম করেননি।[২]

মেবারের ইতিহাস, *এক লিঙ্গ মাহাত্মম* গ্রন্থের বর্ণনা থেকে কালিকারঞ্জন কানুনগো সিদ্ধান্তে আসেন যে রতন সিংহের পিতা সমর সিংহ সম্বৎ ১৩৫৮ বিক্রম শতাব্দীর মাঘ মাস পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ১৩৫৯ মাঘ মাসের তারিখযুক্ত রত্নসিংহের একখানি শিলালিপি উদ্ধৃত করে তিনি আরও জানান যে, ছ' মাস অবরোধ করার পর (১১ মহরম ৭০৩ হিঃ বি সং ১৩৬০ ভাদ্র শুক্লা চতুর্দশী ২৬ আগস্ট, ১৩০৩ খ্রি.) আলাউদ্দিন চিতোর অধিকার করেন। রাবল রতন সিংহ মাত্র এক বৎসর কয়েক মাস রাজত্ব করেছিলেন। এই পাথুরে প্রমাণের ভিত্তিতে কালিকারঞ্জন নাকচ করে দেন রতন সিংহের সিংহল যাত্রা, আলাউদ্দিনের

সঙ্গে যুদ্ধ, কারাবাস, মুক্তি— অর্থাৎ পদ্মিনী আখ্যানের সামগ্রিক তথ্য ও যুক্তি।

অন্যদিকে নিখিলনাথ রায় প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর হন যে, শুধুমাত্র পদ্মিনী নন— গোরা, বাদল, ডুলী বেহারা, আলাউদ্দিনের কারাগার— সবই ঐতিহাসিক। ফিরিস্তার লিখিত ইতিহাস যা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রচিত, তাই নিখিলনাথ রায়ের বিশেষ অবলম্বন। অবশ্যই জায়সী-র *পদ্মাবৎ* কাব্য ও তার অবলম্বনে আলাওলের রচনা নিখিলনাথ রায়ের 'পদ্মাবতী একখানা ঐতিহাসিক কাব্য' প্রবন্ধের প্রধান যুক্তি।[৩] পদ্মিনীকে ইতিহাসে স্থান করে দেবার মূল সূত্রগুলি হল জায়সীর *পদ্মাবৎ* কাব্য যা ঘটনার প্রায় দেড়শো বছর বাদে রচিত। রাজস্থানে ভাটরা এই কাহিনি সংগ্রহ করেন জায়সির কাব্য থেকে এবং লোকস্মৃতিতে পদ্মিনীর চিরকালের মতো স্থান করে দেন। এইভাবে পদ্মিনী জীবন্ত হয়ে ওঠেন, মধ্যযুগের এক নায়িকা হিসাবে।

ঐতিহাসিকের কাছে উপাদান অনেক সময় তথ্যের চেয়ে মূল্যবান হয়ে ওঠে। মধ্যযুগের ইতিহাসের ক্ষেত্রে আকর গ্রন্থগুলি শাসক শ্রেণির মতাদর্শকেই প্রচার করে। 'এখানে শুধুমাত্র প্রশস্তিকে বাদ দিলেই বাস্তব ইতিহাসকে ধরা যাবে', কালিকারঞ্জনের এই ধারণাও গড়ে উঠেছিল তাঁর সমকালীন ঐতিহাসিকদের ইতিহাস চর্চার পরিপ্রেক্ষিতে। এখানে মধ্যযুগের লেখকের মতাদর্শ, উপাদান রচনার প্রেক্ষিত ও আঙ্গিক মূল্যায়ন থেকে বাদ পড়ে যায়। মনে রাখতে হবে পাথুরে প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করলে ইতিহাসে পদ্মিনী নেই, কিন্তু পদ্মিনীর একটি ইতিহাস আছে। বাঙালিদের কাছে পদ্মিনীর আবির্ভাব বিশেষ ভাবে অর্থবহ। এই আলোচনায় পদ্মিনীর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিকে খতিয়ে দেখা হয়েছে বাংলার সেই অপঠিত ইতিহাসের প্রেক্ষায়।

দুই

পদ্মিনী আখ্যানের পটভূমি ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যযুগ: আলাউদ্দিন খিলজির শাসনকাল (১২৯৬-১৩১৪ খ্রি.)। ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি চিতোর আক্রমণ করেন। সেই সময় চিতোরের রাণা ছিলেন রত্নসেন। যুদ্ধে রত্নসেনের পরাজয় হয় ও চিতোর দুর্গ বেশ কিছু দিনের মতো আলাউদ্দিনের কবলে থাকে। আলাউদ্দিন খিলজি নিঃসন্দেহে একজন ঐতিহাসিক চরিত্র, সব তারিখ মেলালে তাঁর চিতোর অধিগ্রহণ প্রমাণ করা কঠিন নয়। রাজ্য জয়, কর আদায়, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সরলরেখায় চিহ্নিত এই ইতিহাসের মধ্যে পদ্মিনীর আবির্ভাব রোমান্সের ছোঁওয়া আনে, আবার সমস্যার সৃষ্টিও করে। দূর সিংহল থেকে এক রাজকন্যা পৌঁছে গেলেন রাজস্থানে চিতোরের কেল্লায়, এটা কি সম্ভব ছিল মধ্যযুগে? সত্যি কি আলাউদ্দিন খিলজির মতো অত বড় দুঁদে শাসক, এক সুন্দরী নারীর জন্য যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন দিনের পর দিন?

আলাউদ্দিন-পদ্মাবতীর উপাখ্যান সাহিত্যে প্রথম অবতারণা করেন মালিক মুহম্মদ জায়সি। তাঁর জন্ম জায়স নগরে ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে। কবি নিজের যে পরিচয় দেন তাতে জানা যায় তিনি সুফি সম্প্রদায়ের চিস্তি শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর গুরু ছিলেন

শেখ মুহিউদ্দিন। একাধিক কাব্যের লেখক জায়সির দ্বিতীয় কাব্য ছিল *পদ্মাবৎ*। কবির লেখায় শের শাহের প্রশস্তি থাকায় ধরে নেওয়া হয় কাব্যটির রচনার আরম্ভ ১৫৪০ সাল। শেষ জীবনে জায়সি আমেথির রাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং এখানেই কাব্যটি শেষ হয়।[৪]

জায়সির কাব্য মূলত তাত্ত্বিক-রূপক খচিত একটি প্রেম কাহিনি। লেখক কোথাও দাবি করেননি যে এটি একটি ইতিহাস-ভিত্তিক রচনা। কাব্যটির দুই ভাগ। প্রথম অংশ রত্নসেন-নাগমতি-পদ্মাবতীর কাহিনি— এখানে প্রেম, রোমাঞ্চ, মিলন একটি পারম্পর্যের সূত্রে গাঁথা। সিংহলের রাজকন্যা পদ্মাবতীর রূপ গুণের কথা প্রিয় শুক পাখির মুখে জানতে পেরে চিতোরের রাজা রত্নসেন তাঁর স্ত্রী নাগমতির অজান্তে যোগীর ছদ্মবেশে সিংহলে পৌঁছান। এখানে পদ্মাবতীর অনুগত শুক পাখি হিরামনের সাহায্যে দু'জনের দেখা হয়। প্রাথমিক বাধাবিপত্তির পর অবশেষে হরগৌরীর বরে পদ্মাবতীকে নিয়ে রত্নসেন চিতোরে ফিরে আসেন। সেখানে রাজার প্রথমা স্ত্রী নাগমতি দুঃখে দিন কাটাচ্ছিলেন। এই অংশে নাগমতির একটি বারোমাস্যা আছে, যার কাব্যগুণে মুগ্ধ হয়ে আমেথির রাজা জায়সিকে আশ্রয় দেন। খণ্ডটি শেষ হয় দাম্পত্য জীবনের বর্ণনায়— নাগমতির গর্ভে নাগসেন ও পদ্মাবতীর গর্ভে কমলসেন নামে রত্নসেনের দুই পুত্র লাভে। এই প্রথম খণ্ডে রূপকথার আমেজ সৃষ্টি হয় শুক পাখির দৌত্যে, নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনায়, তাঁদের প্রেম ও ঈর্ষার বিভিন্ন রসালাপে।[৫]

দ্বিতীয় অংশটি বেশির ভাগই, আলাউদ্দিনের পদ্মিনীলাভের জন্য চিতোর অভিযান। রত্নসেনের পাঠান সৈন্যদের হাতে বন্দিত্ব, গোরা বাদলের বীরত্ব। পরে কুম্ভলমীরের রাজা দেবসেনের সঙ্গে রত্নসেনের যুদ্ধ এবং রত্নসেনের মৃত্যুতে নাগমতি ও পদ্মাবতীর সহমরণ। শেষ পর্যন্ত আলাউদ্দিন চিতোর অধিকার করলেন কিন্তু পদ্মাবতীকে লাভ করার বদলে পেলেন কিছু চিতাভস্ম। একই সঙ্গে সংস্কৃত কাব্যের বীর ও করুণ রসের প্রয়োগ জায়সির রচনায় স্পষ্ট।

পদ্মাবৎ কাব্যের মূল ঝোঁক ছিল আধ্যাত্মিক। এখানে সুফি সাধনা ও তাত্ত্বিক গুরুত্বই প্রাধান্য পেয়েছে। ইসলামে 'ইমান' বা বিশ্বাসের একটা বড় জায়গা আছে। সুফি সাধকদের এক অংশ মানতেন যে মানুষের দেহেই সমগ্র ভুবন বর্তমান। যেমন বৈষ্ণবরা মানতেন বৃন্দাবন উপস্থিত বৈষ্ণবের চেতনায়, যেখানে রাধাকৃষ্ণ নিত্য লীলা করছেন।

> "মৈঁ এহি অরথ পণ্ডিতহ্ন সুঝা
> কহা কি হম্হ কিছু ঔর ন বুঝা॥
> চৌদহ ভুবন জো তো উপরাহীঁ
> তে সব মানুষ কে ঘট মাহীঁ॥"

(আমি এর অর্থ পণ্ডিতদের শুধিয়েছি। তাঁরা বলেছেন এর বেশি আমরা কিছু বুঝিনি। উর্ধ্বে এবং নিম্নে যে চোদ্দো ভুবন বর্তমান, সে সবই আছে মানুষের দেহের ভিতরে)।[৬]

এর পর— "দেহ হল চিতোর মনকে করেছি রাজা (রত্নসেন) হৃদয় হল সিংহল দেশ এবং বুদ্ধিকে জেনেছি পদ্মিনী। গুরু হলেন পথপ্রদর্শক শুক। শুক বিনা এ জগতে কে পাবে নির্গুণ (ঈশ্বর)কে। নাগমতি হল মর্ত্যাশক্তি। এতে যার মন ধরা পড়বে তার মুক্তি নেই। দূত রাঘব (চেতন) হল শয়তান। আর সুলতান আলাউদ্দিন হল মায়া। এই ভাবে এই প্রেম কাহিনির বিচার কর— যে বুঝতে সমর্থ সে বুঝে নাও।"[৭]

জায়সির মূল বক্তব্য তাঁর কাব্য রচনার যুক্তিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে: "আমি এই জেনে এই গান রচনা করলাম, তা যেন এই জগতে কীর্তি চিহ্ন হয়ে বর্তমান থাকে। এখন কোথায় সেই রাজা রত্নসেন, এমন বুদ্ধিমান শুক পাখিই বা কোথায়? কোথায় সুলতান আলাউদ্দিন? কোথায় রাঘব চেতন যে পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা করেছিল? কোথায় সুরূপা রানি পদ্মাবতী? কেউ নেই শুধু তাদের কাহিনি আছে। যার যশ এবং কীর্তি থাকে সেই ধন্য। ফুল মরে কিন্তু তার গন্ধ মরে না।"[৮]

আলাউদ্দিনের শাসনকালের আড়াইশো বছর পরে জায়সি যখন অবধি-হিন্দি ভাষায় *পদ্মাবৎ* লেখেন, তখন এই ধরনের প্রণয়কাব্য যা সুফি ও ভক্তির তাত্ত্বিক প্রভাবে রচিত তার একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— যিনি জায়সির কাব্যকে বাংলায় অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন, ভূমিকায় লেখেন যে, সমকালীন সাহিত্যে মোল্লা দাউদের *চন্দায়ন*, কুতুবনের *মৃগাবতী*, মনঝনের *মধুমালতী* ও জায়সির *পদ্মাবৎ* বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যার মধ্যে জায়সি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ।

প্রতিটি কাব্যের বৈশিষ্ট্য, সূচনায় মহম্মদ ও চার খলিফার গুণকীর্তন, পীরের যশোগান ও সমকালীন সুলতানদের উদ্দেশে স্তুতি নিবেদন করে প্রেম কাহিনির পরিবেশন। প্রায় সব রচনার ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে ফারসির সঙ্গে সংস্কৃত কাব্যের আঙ্গিকের মিশ্রণ ঘটেছে, আবার এর সঙ্গে মিশে গেছে লোকগাথা। *চন্দায়ন*-এ যেমন লোকগাথা প্রাধান্য পেয়েছিল, মনঝনের *মধুমালতি*-তে রূপকথা, জায়সি তাঁর কাব্যে রূপক ও সমকালীন বাস্তবতার একটি মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন যা তখনকার সাহিত্যে বিরল। ইতিহাসের তথ্য তার কাহিনিতে গতি সঞ্চার করেছিল, কাব্যকে ভারাক্রান্ত করেনি।

পদ্মাবৎ কাব্যের একাধিক পুঁথি পাওয়া যায়। হিন্দি সাহিত্যের পণ্ডিত মাতাপ্রসাদ গুপ্তর *পদ্মাবৎ* কাব্য পাঁচটি পুঁথি থেকে সঙ্কলিত। এর মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন পুঁথিটি সপ্তদশ শতাব্দীর। ফারসি অক্ষরে লিখিত এই পুঁথিটিতে আরবি শব্দের সঠিক উচ্চারণের জন্য চিহ্ন দেওয়া আছে। ১৬৭৫ সালে পুঁথিটির লিপিকার ছিলেন মোহাম্মদ শাকির নামে এক লিপিকার, যিনি আব্দুল কাদির জিলানির শিষ্য ছিলেন বলে জানা গেছে। এ ছাড়া একাধিক পুঁথি পাওয়া গেছে যা কায়স্থ লিপিকারদের দ্বারা লিখিত। মুঘল যুগে এই কায়স্থরা ছিলেন সরকারি করণিক। কিছু কিছু পুঁথির লিপিতে অযত্নের ছাপ আছে। কোথাও কোথাও আবার কিছু নতুন স্তবক যোগ করা হয়েছে। এর থেকে আধুনিক গবেষকরা মনে করেন যে কিছু পুঁথি ব্যবহার করা হত আবৃত্তি ও কথকতার জন্য। এই সময় অধিকাংশ কাব্য লিখিত হলেও, সুফি সাধকদের মুখে মুখে প্রচারিত হত। এই ভাবে কাহিনির বিস্তার ঘটত। *পদ্মাবৎ*

কাব্যের পরিচিতির ক্ষেত্রগুলি বিচার করলে দেখা যায়, একই সঙ্গে কাহিনিটি গৃহীত হয় রাজসভায়, নাগরিক সমাজে ও সুফি সাধকদের সম্মেলনে। এইখানেই জায়সির *পদ্মাবৎ*-এর গুরুত্ব। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের কল্পনার জগতে বিচরণ *পদ্মাবৎ*-কে করে তুলেছিল মার্গি ও লোক সংস্কৃতির মিলনের ক্ষেত্র।[৯]

পঞ্চদশ শতক থেকেই রাজস্থানে রাজপুত রাণাদের দরবারে যে বীরগাথাগুলি লেখা হয়, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজকীয় ক্ষমতার বৈধকরণ। ১৪৫৩ খ্রি. পদ্মনাভ নামক এক নাগরি ব্রাহ্মণ রচনা করেন *কানহাডন্তে প্রবন্ধ*। কাব্যটি লেখা হয় কানহাডন্তের বংশধর অক্ষয় রাজের অনুরোধে। তিনি ছিলেন জালোরের রাজা ও পদ্মনাভের পৃষ্ঠপোষক। কাব্যটি চার খণ্ডে বিভক্ত। কাহিনির মূল আখ্যান গড়ে উঠেছে দেশপ্রেম, বীরত্ব ও বংশের সম্মানকে কেন্দ্র করে। এই সম্মান রক্ষার্থে রাজপুত পুরুষদের যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন ও নারীদের জহর ব্রত উদ্‌যাপন কাহিনির প্রধান উপজীব্য।

পঞ্চদশ শতকে রাজপুত রাণাদের এই সব বীরগাথার সূত্র নিহিত আছে তাদের বংশাবলীতে। আদি মধ্যযুগ থেকেই (সপ্তম থেকে দশম শতক) রাজপুতদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করবার জন্য এই রচনাগুলির সৃষ্টি। চতুর্বর্ণ হিন্দু সমাজকে রক্ষা করার জন্য রাজপুতরা কী কী দায়িত্ব পালন করেছিলেন— দেশ, ধর্ম ও জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাঁদের আত্মত্যাগ, শুধু সাহিত্যে নয়, শিলালিপিতে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, শিল্পে খোদিত হয়।[১০] কিছু জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক এর থেকে সিদ্ধান্তে আসেন যে রাজপুতরাই আর্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, মহাভারত ও রামায়ণে বর্ণিত সূর্য ও চন্দ্র বংশের বংশধর। তাঁদের লেখায় আলাউদ্দিনকে চিহ্নিত করা হয়েছে সেই 'শত্রু' হিসাবে যিনি রাজ্যগ্রাসী, ক্ষমতালোভী ও হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষায় প্রধান বাধা। এর ফলে জাতীয়তাবাদী রচনায় *পদ্মাবৎ*-এর বিশ্লেষণ হয়ে দাঁড়ায় এক রেখায় আঁকা রাজপুত বীরত্ব ও মুসলমান রাজশক্তির দ্বন্দ্বের কাহিনি। বীরত্বের যে-কাহিনিতে দেশপ্রেম ও ধর্মরক্ষা প্রধান কর্তব্য, তাতে যোগ হয় নারীকে রক্ষার ও মাতৃভূমিকে মুক্ত রাখার দায়িত্ব। যে শত্রু, তার চরিত্রেও রূপান্তর ঘটে। এই ভাবে আলাউদ্দিন যিনি প্রথমে চিহ্নিত হয়েছিলেন রাজ্যলোভী, অনৈতিক শাসক হিসাবে, তিনি হয়ে উঠলেন আরও নীচ, কামুক। সমসাময়িক *চিতাই বার্তা* বা *কানহাডন্তে প্রবন্ধে* যে-পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে পদ্মাবতী-আলাউদ্দিন উপাখ্যান পরবর্তী কিছু ঐতিহাসিকের সাম্প্রদায়িক চিন্তাকে উজ্জীবিত করে।[১১] ফলে অধিকাংশ রচনায় রাজপুত বীরত্বের কাহিনির কেন্দ্রে থাকে সতী নারী ও তাকে অপহরণে ইচ্ছুক মুসলমান রাজা— সেই 'অপর', যাকে ছাড়া কাহিনি হয়ে উঠবে অচল। ব্রাহ্মণ্য ও পিতৃতান্ত্রিক আদর্শ একত্রে নিয়ন্ত্রণ করে নায়ক-নায়িকার জীবন। এই জন্যই ইতিহাসে যা সম্ভব হয় না, তা সম্পন্ন হয় সাহিত্যে। জায়সির কাব্য এই ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর আধ্যাত্মিক যুক্তি হিন্দু-মুসলমানকে সমান ভাবে স্পর্শ করে। সেখানে আমরা দেখি, আলাউদ্দিন যখন চিতোরে প্রবেশ করলেন, তখন সবাই মৃত। "সুলতান এসে যখন সব বিবরণ শুনলেন, উজ্জ্বল দিনের আলোয় যেন রাত্রি ঘনিয়ে এল। তিনি চিতার এক মুঠো ছাই নিয়ে (বাতাসে) উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এ জগৎ মিথ্যা'।"[১২]

তিন

সপ্তদশ শতকে বাংলায় পদ্মিনীর কাহিনিকে অনুবাদ করেন আলাওল। ফাতোয়ারা বা ফরিদপুরের অন্তর্গত জালালপুরে কবি আলাওলের জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন জালালপুরের অধিপতি মজলিশ কুতুবের অমাত্য। মজলিশ কুতুব ১৫৭৬ থেকে ১৬১১ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। ধরে নেওয়া হয় আলাওলের জন্ম এর পরে নয়। পিতার সঙ্গে জলপথে পর্যটনকালে তাঁরা জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হন। তাঁর পিতা মারা যান এবং আলাওল আরাকান বা রোসাঙ্গে এসে পৌঁছান। এখানে তিনি প্রথমে রাজ অশ্বারোহী দলে যোগদান করেন, পরে রোসাঙ্গরাজের মুখ্য পাটেশ্বরী যশস্বিনীর অমাত্য মাগন ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করেন। সময়টি ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ। *পদ্মাবতী* আলাওলের প্রথম রচনা। এই কাব্যে আত্মপরিচয় অংশে কবি নিজের পরিচয় দেন—

> "মুলুক ফতেহাবাজ গৌড়েতে প্রধান।
> তথাতে জালানপুর পুণ্যবন্ত স্থান।।
> বহুগুণবন্ত বৈসে খলিফা ওলমা
> কথেক কহিব সেই দেশের মহিমা।।
> মজিলিষ কুত্তুপজান তাত অধিপতি
> মুই হিন দিন তান আমথ্য সন্ততি।"[১৩]

এই আত্মপরিচয় অংশে তাঁর জীবনের প্রথম দিনটুকুই ধরা পড়ে। জন্ম স্থান, বাল্যকাল ও জলদস্যুদের কবলে পড়া।

> "কর্মগতি জাইতে পন্তে বিধির ঘটন।
> হার্মাদের নৌকা সঙ্গে হৈল দরশন
> বহু যুদ্ধ আছিল শহিদ হৈল তাত।
> রণক্ষাতে ভোগ জোগে আইল এথাত।"

ব্রহ্মদেশের উত্তর পশ্চিমে চট্টগ্রামের কাছে আরাকান রাজ্য। প্রাচীনকালে এই রাজ্যেরই নাম ছিল রোসাঙ্গ। এখানকার অধিবাসী মগেরা ছিলেন বৌদ্ধ। রাজারাও ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। যদিও অধিকাংশই ইসলামের প্রভাব জোরদার হওয়াতে একটি করে মুসলমান নামও গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, পঞ্চদশ শতকের শেষ থেকেই বাংলা, আরাকান ও ত্রিপুরার মধ্যে লড়াই চলছিল। তার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল চট্টগ্রামের দখল। পর্তুগিজ বারোসের মতে হুসেন শাহের সময় আরাকান রাজা বাংলার সুলতানের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন। এই কারণেই বাকলা অঞ্চলে হুসেন শাহের খাস জমি ছিল। এ ছাড়া বেশ কিছু রাজ কর্মচারী বাকলা থেকে আরাকান রাজসভায় যোগ দেন। ফলে আরাকান ও বাংলার মধ্যে একটা আদানপ্রদান গড়ে ওঠে।[১৪]

এ দিকে রিচার্ড ইটন দেখিয়েছেন কীভাবে পরবর্তীকালে বাংলার যে সব প্রদেশগুলিতে মুসলমানরা বসতি স্থাপন করেছিলেন (বাকলা অঞ্চলটি তার অন্যতম) সেখানে পর্তুগিজ জলদস্যুরা আরাকানদের সঙ্গে মিশে এই সব মানুষদের ধরে নিয়ে গিয়ে দাস হিসাবে বিক্রয় করতেন। ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ের ১৬৫৫ সালে এই অঞ্চলে ছিলেন, তাঁর বিবরণের সঙ্গে আলাওলের বর্ণনা মিলে যায়। জলদস্যুদের অত্যাচারের প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবেও আলাওলের বিবরণ তাই যথেষ্ট মূল্যবান।[১৫]

আলাওলের পাণ্ডিত্য, সংগীত নৈপুণ্য এবং আরও গুণের জন্য কবিকে মাগন ঠাকুর সমাদর করে অমাত্য সভায় নিয়ে আসেন। এই সব রাজসভাসদদের গুণগ্রাহিতার জন্যই হয়তো আলাওলের মতো কবিদের কাব্য বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। মাগন ঠাকুরের নির্দেশেই আলাওল জায়সির *পদ্মাবৎ*-এর অনুবাদ শুরু করেন।

"এহি পদ্মাবতী রসে রচ রস কথা
হিন্দুস্থানী ভাষে শেখে রচিয়াছে পোথা॥
রোসাঙ্গেত অনেকে না বুঝে এই ভাষা
পয়ার রচিলে পুরে সভানের আশা।"[১৬]

অনুমান করা হয় রাজা থাদো মিনতোর রাজত্বকালের মধ্যেই (১৬৪৫-৫২ খ্রি.) কোনও এক সময়ে এই গ্রন্থ শেষ হয়। এর পরে আলাওল ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পৃষ্ঠপোষকের আদেশে দৌলত কাজীর অসম্পূর্ণ কাব্য *সতী ময়না* ও *লোর চন্দ্রাণী* সমাপ্ত করেন। ১৬৬০ সালে আরাকানরাজের সেনাপতি সৈয়দ মুহম্মদের পৃষ্ঠপোষকতায় নিজামীর ফারসি কাব্য *হপ্তপয়বারের* অনুবাদ শেষ হয়। এই গ্রন্থে শাহজাদা সুজার আরাকানরাজের আশ্রয় গ্রহণের উল্লেখ আছে। ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে ভাগ্যহীন শাহ সুজা খিজিয়ার যুদ্ধের পর আরাকানরাজের বিরাগভাজন হলে সপরিবারে নিহত হন। আলাওলকে তাঁর এক শত্রু শাহ সুজার অন্তরঙ্গ বলে রাজসভায় ধরিয়ে দিলে আলাওলকে পঞ্চদশ দিন কারাবাস করতে হয়। তিনি মুক্তিলাভ করেন, কিন্তু তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই দারিদ্রের মধ্যেই তিনি ১৬৬৩-৬৪ খ্রি. ইসলামি স্মৃতি শাস্ত্র *তেহফা* গ্রন্থের অনুবাদ করেন ও *সয়ফুলমুলুক বদিওজ্জমালের* শেষ অংশ রচনা করেন। ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দে মজলিশের অনুগ্রহে সুদিন দেখা দিলে কবি নিজামীর বৃহৎ ফারসি গ্রন্থ *ইস্কন্দরনামার* অনুবাদ করেন। আনুমানিক ১৬৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দে আলাওলের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের অবসান ঘটে।[১৭]

সুলতানি আমল থেকেই বাংলা ভাষা একটি স্বকীয় রূপ নেয়। তার সঙ্গে আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিকাশ বিশেষভাবে জড়িত। একদিকে বাংলার ভক্তি আন্দোলন ও চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবসাহিত্যের প্রসার, অন্যদিকে সুফিবাদ ও লৌকিক ইসলাম বাংলা সাহিত্যচর্চাকে সমৃদ্ধ করে। আলাওল যদিও আরাকানে বাস করতেন তবু তাঁর লেখায় এই দুই ধারাই বর্তমান।[১৮]

বিষয়গত ভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, ইসলামীয় বাংলা সাহিত্যে সাধারণ নরনারীর প্রেম নিয়ে রচিত এক ধরনের গাথাকাব্য প্রাধান্য পায়। ষোড়শ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে

বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য মহম্মদ সগীর (যাঁর সন তারিখ পাওয়া যায়নি। কিন্তু তাঁর ভাষা থেকে গবেষকেরা সিদ্ধান্ত করেন যে, কবি ষোড়শ শতকেই বর্তমান ছিলেন)। তাঁর রচনা *ইউসুফ জুলেখা* যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়। *পদ্মাবতী*-র মতো এই কাব্যেও প্রেমই চালিকা শক্তি। দৈনন্দিন জীবনে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বাস্তবতার টানাপোড়েন সাহিত্যে কিছুটা দ্বান্দ্বিক পরিবেশ গড়ে তোলে। তাতে বৈচিত্র্যের স্বাদও থাকে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের বাঙালি কবিরা এই নানা ধরনের কাব্যের নিদর্শন নিজেদের ভাষায় আনতে চেষ্টা করেন:

> "মনোহর মালতীর আকুল পিরীত
> গাহিব সকল লোক মন হরষিত
> এহি সে সুন্দর কিচ্ছা হিন্দিতে আছিল
> দেশি ভাষায় মুঞি পাঞ্চালি ভনিল।"

একই ভাব ফুটে ওঠে আলাওলের লেখায়:

> "রসনা সরস হেন প্রেমের বচনে
> প্রেম পুঁথি পদ্মাবতী রচিতে আশা এ"[১৯]

আলাওলের *পদ্মাবতী* তাই নিছক অনুবাদ নয়। জায়সির কাব্যের সঙ্গে কিছু প্রভেদও আছে। আলাওল *পদ্মাবতী*-র শেষাংশে এসে সম্পূর্ণ ভিন্ন কাহিনির অবতারণা করেছেন। আলাওলের রচিত কাহিনির ঝোঁক শুধুমাত্র প্রেম বা আধ্যাত্মিকতা নয়। এখানে এক ধরনের রাজনৈতিক মতাদর্শর কথা বলা হয়েছে— যা আদর্শ শাসকের একটি ভাবমূর্তি গঠন করে। আলাওলের আলাউদ্দিন সেই আদর্শ রাজা। কাহিনি তাই শেষাংশে একটি বিশেষ মোড় নেয়। দেবপাল রাজপুত রাজা হওয়া সত্ত্বেও, রত্নসেনের প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়ান। দেবপালকে তাই যুদ্ধে নিহত করেন রত্নসেন। আহত অবস্থায় ফিরে এলেও আরও বেশ কিছু দিন তিনি বাঁচেন ও পদ্মাবতীর গর্ভে তাঁর দুই পুত্র হয় চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন। পূর্ব আঘাতের বিষক্রিয়ায় রত্নসেনের মৃত্যু হলে তাঁর দুই স্ত্রী নাগমতি ও চন্দ্রাবতী একই সঙ্গে সহমরণ করেন। এই যে জহরব্রত থেকে সহমরণ, যেখানে ব্যক্তিগত শোক গোষ্ঠীগত ক্রিয়া থেকে পৃথক সেখানেই কাহিনির পার্থক্য ও আলাওলের স্বকীয়তা লক্ষণীয়। রাজস্থানে রাজাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে যুদ্ধ, নারীর সতীত্ব প্রমাণে জহরব্রত মধ্যযুগের ইতিহাসে বিশেষ সময়ে, বিশেষ ভাবে দেখা হয়েছে। আলাউদ্দিনের চিতোর অভিযান যে রাজনৈতিক কারণে সংগঠিত হয়, তা আলাওলের বর্ণনায় স্পষ্ট। তাঁর সমসাময়িক বারণির লেখায় যে-আদর্শ রাজার চিত্র জনমানসে প্রতিষ্ঠা করা হয়, তা মুঘল আমলে আবুল ফজলের রচনায় পরিণত হয় আকবরের রূপায়ণে। মুঘল আমলে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য আকবর তাঁর হিন্দু প্রজাদের অভিজাত শ্রেণিতে স্থান করে দেন। নিজে চিতোর অধিগ্রহণ করলেও, রাজপুত রাণাদের প্রতিষ্ঠা করেন তাঁদের নিজেদের দেশে। ওয়াতন জায়গিরধারী এই সব রাজপুত সর্দাররা মুঘল সম্রাটের সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রজা হয়ে

ওঠেন। আলাওল যেহেতু মুঘল শাসনব্যবস্থার ভাল দিকটা লক্ষ করেন, তিনি শুধু আদর্শ রাজা নয়, আদর্শ প্রজার চিত্রটাও তাঁর লেখায় ফুটিয়ে তোলেন।[২০]

মুমূর্ষু রত্নসেনের মৃত্যুর পূর্বেকার নির্দেশ অনুযায়ী রাজপুত বীর বাদল রত্নসেনের পুত্রদের নিয়ে দিল্লিতে সুলতানের কাছে গিয়ে রাজার মৃত্যুসংবাদ জানান। এতে দুঃখিত হয়ে সুলতান আলাউদ্দিন অনাথ ছেলে দুটিকে সান্ত্বনা জানিয়ে চান্দেরি ও মাড়োয়া রাজ্য দান করেন। বাদলকেও কিছু রাজ্য দান করা হয়। আলাওলের বর্ণনায় সামন্ততান্ত্রিক অনুষ্ঠান স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

> "মৃত্যুকালে বাপ মোরে তোমার চরণ।
> ভূমি চুম্বি সমর্পিল করিয়া যতন।।"...

এর উত্তরে আলাউদ্দিন বলেন:

> "যে পুনি মরিয়া গেল না কর শোচন।
> নিয়মিত রাজ্য ভোগ যাবত জীবন
> চান্দেরী মারোয়া রাজ্য তোমা বশ কৈলুঁ।"[২১]

এই অংশের টীকাতে সম্পাদক দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: "রত্নসেনের মৃত্যু সংক্রান্ত আনুপূর্বিক কাহিনি শুনে সুলতানের শোক এবং সমস্ত বিবাদের স্মৃতি মুছে ফেলে পদ্মাবতীর অনাথ পুত্রদ্বয়কে সমাদরসহ অভ্যর্থনার যে চিত্র এখানে আছে তাতে মূল কাহিনির ট্র্যাজেডি অনুবাদে ট্র্যাজিকমেডিতে পরিণত। পদ্মিনীকে না পাওয়ার ব্যর্থতা ভুলে আলাউদ্দিন যে ভাবে পদ্মিনীর পুত্রদের আহ্বান করে পাশে বসিয়ে পিতৃশোকের সান্ত্বনা দিয়েছেন, তাতে সুলতানের প্রেমভাব প্রকাশ পেলেও কাহিনির পরিণাম যতদূর সম্ভব মেলোড্রামাটিক হয়েছে।"[২২] এই উক্তিতে ফুটে উঠেছে *পদ্মাবৎ* কাব্যপাঠের দুটি মূল সমস্যা। প্রথমত, আলাওল ও জায়সি একই কাহিনি অবলম্বন করলেও তাঁদের বাস ছিল ইতিহাসের দুটি ভিন্ন অধ্যায়ে। দু'জনেই মুসলমান, দু'জনেই সুফি, কিন্তু জায়সির মধ্যে সুফি মতাদর্শ যে-প্রভাব বিস্তার করেছিল, আলাওলের ক্ষেত্রে তা অন্যভাবে প্রতিফলিত হয়। ত্রয়োদশ শতক থেকে ভারতে সুফিদের আগমন ঘটে। এক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ইসলামের পাশাপাশি সুফিদের আবেদন বিকল্প আধ্যাত্মিক শক্তি হিসাবে দেখা দেয়। সুফিদের সঙ্গে কবি ও শিল্পীদের যোগাযোগ অভিন্ন ছিল। চিস্তি শেখদের জনপ্রিয়তা এই কারণেই এতটা বিস্তার লাভ করে। জায়সি রাজশক্তির চেয়ে এই আধ্যাত্মিক ক্ষমতার প্রতি বেশি অনুগত ছিলেন। অন্য দিকে, আলাওল মুঘল রাজত্বের বাইরে বাস করলেও রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে ব্যক্তিজীবন কীভাবে প্রভাবিত হয়, তাকে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর কাব্যে। আলাউদ্দিনকে আলাওল ও জায়সি দু'জনেই পুনর্নির্মাণ করেছেন তাঁদের নিজস্ব প্রেক্ষায়।

চার

বাংলায় পদ্মিনী ও আলাউদ্দিনের উপাখ্যান, উনবিংশ শতকে নতুন করে উজ্জীবিত করেন জেমস টড। তাঁর রচিত *অ্যানালস অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিস অব রাজস্থান* দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৮২৯ ও ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে।[২৩] ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ষোলো বছর বয়সে টড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্থ সামরিক কলেজের ছাত্র হিসাবে যোগদান করেন। তিনি ভারতবর্ষে থাকেন ২৪ বছর। এর মধ্যে ১৭ বছর অতিবাহিত করেন মধ্য ভারত ও রাজপুতানায়। এই সময় তিনি বিভিন্ন ভাবে রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করেন। চারণ কবিদের রচনা, গাথা, মহাকাব্যগুলি ছিল তার প্রধান উৎস। এছাড়া টডের উপর ওরিয়েন্টালিস্ট উইলিয়াম জোন্স প্রভৃতির প্রভাব পড়ে। এ দেশে অবস্থানকালে এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। অবশ্য রাজস্থানের সঙ্গে তাঁর পরিচিতির সূত্র ছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন।[২৪]

১৭৯০ সাল থেকেই কোম্পানির অধিকর্তারা রাজস্থানের উপর নজর রাখতেন। মারাঠা-রাজপুত দ্বন্দ্বের ফলে এই অঞ্চল তখন গোলযোগের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। ১৭৮২-তে সালবাই-সন্ধির ফলে কোম্পানির শাসকরা স্থির করেন যে তাঁরা আর মারাঠাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না। কিন্তু দেখা গেল ১৮০৯ সালে মেবারের রাণার অনুরোধে ব্রিটিশরা রাজপুতদের সাহায্য করতে সম্মত হয়েছেন। ১৮১০ সালে পাঠান সর্দার আমির খান যখন যোধপুর, উদয়পুর, জয়পুর থেকে টাকা আদায় করতে থাকেন, তখনও ব্রিটিশদের কাছে রাণা অনুরোধ করেন পাঠানদের প্রতিহত করতে। এই সময় অর্থাৎ ১৮১১ থেকে ব্রিটিশরা মনে করেন যে, যদি একটি রাজপুত রাণাদের সংগঠন গড়ে তোলা যায় ব্রিটিশ নেতৃত্বে, তবে তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থ অনেকটাই সফল হবে। টড-এর রাজস্থানের প্রতি উৎসাহ অনেকটাই সমসাময়িক অবস্থার প্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছিল।[২৫]

আরও বহু ওরিয়েন্টালিস্টের মতো টড তাঁর শিক্ষা ও ইতিহাসচিন্তা গড়ে তুলেছিলেন তাঁর সময়কার রোমান্টিক ধারণাগুলির প্রেক্ষিতে। জাতি ও তার বাসভূমি তাঁর চিন্তায় ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই তিনি মনে করতেন রাজস্থানে রাজপুতদের বাসের অধিকার আছে, মারাঠাদের নয়। এই সময় থেকেই ভারতবর্ষের ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব চর্চার সূত্রপাত হয়। এই প্রেক্ষায় টডের রচনার গুরুত্ব অপরিসীম। উনিশ শতক থেকেই ব্রিটিশ সরকারি নথিপত্রে রাজপুতদের অভিহিত করা হতে থাকে যোদ্ধৃ জাতি (martial race) বলে। তুলনায় বাঙালিদের বলা হত মেয়েলি, দুর্বল, গৃহমুখী (effeminate Bengali)। হয়তো এরই প্রতিক্রিয়ায় বাংলা সাহিত্যে রাজপুত নায়ক নায়িকার এত প্রাধান্য। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন রাণা প্রতাপ (যাঁর ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই), আর নায়িকা ছিলেন রানি পদ্মিনী (যাঁর উৎস কাব্যে)। এই ভাবে ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয়দের সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুলতে তথ্য ও কল্পনার একাত্মকরণ প্রায়শই কাজ করে।[২৬]

টডের লেখায় এই দুটি ধারা খুব স্পষ্ট। এক দিকে ইতিহাসের অনুসন্ধান তথ্যের আহরণে। অন্যদিকে জনশ্রুতি, কিংবদন্তি ও প্রাচীন গাথার মধ্যে খোঁজা ইতিহাসের উপাদান। পদ্মিনীর কাহিনি রচনায় টড একবার রাজপুতদের লিখিত ইতিহাস, বংশাবলী, পুরাতাত্ত্বিক উপাদান ব্যবহার করেছেন, আবার নির্ভর করছেন চারণদের গান ও আবৃত্তিতে। এর সঙ্গে মিশে গেছে ইউরোপীয়দের সঙ্গে রাজপুতদের নৃতাত্ত্বিক মিল খোঁজার চেষ্টা।

টড আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের কাহিনি মূলত *খোমান রাসো* (মেওয়ার রাজবংশের গাথা) থেকে সংগ্রহ করেন। এই গাথাগুলিতে রাণা ও রাজপুত সর্দারদের সম্পর্ক বিশেষ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কীভাবে জ্ঞাতি সম্পর্ক ও ভূমির অধিকার— ভাইবন্তের আদর্শের মধ্যে কাজ করত তা ব্যাখ্যা করা আছে টডের লেখায়। টডের বর্ণনায় লক্ষ্মণসিংহ চিতোরের রাণা হন ১২৭৫ খ্রিস্টাব্দে, তাঁর শৈশবে তাঁর কাকা ভিমসিংহ ছিলেন রাণার অভিভাবক এবং ভিমসিংহের স্ত্রী ছিলেন পদ্মিনী।[২৭]

উনবিংশ শতকে ইউরোপে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এক ধরনের রোমান্টিক জাতীয়তাবাদের প্রাদুর্ভাব ঘটে। টড যে এই ধরনের যুক্তিতে বিশ্বাস করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর রাজপুত জাতীয়তার ব্যাখ্যায়। সুলতান আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে রাজপুত প্রতিরোধ এই জাতীয়তাবাদী আদর্শের পরিচয়। একই জাতীয়তাবাদী চেতনা কাজ করে মুঘলদের বিরুদ্ধে রাজপুতদের যুদ্ধে। পরবর্তীকালে (১৮১৭-১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে) টড যখন রাজপুত রাজাদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের চুক্তি করছিলেন, তার একটা শর্ত ছিল রাজস্থান থেকে সমস্ত বিদেশিদের বহিষ্কার করা হবে। এই বহিরাগতরা ছিলেন পিণ্ডারি ও মারাঠা। কিন্তু টড যে-ইতিহাসের প্রেক্ষায় রাজস্থানের প্রাচীন গাথাগুলি লিপিবদ্ধ করেন, সেখানে বহিরাগত ও শত্রু মাত্রেই ছিল মুসলমান রাজশক্তি। টডের ঐতিহাসিক যুক্তি বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করে বাঙালি জাতীয়তাবাদী লেখকদের।

পাঁচ

১৮৫৮ সাল ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ— ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ও ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। একই সালে প্রকাশিত হয় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মিনী উপাখ্যান* (রাজস্থানীয় ইতিহাস বিশেষ)। এই সময় থেকে ভারতীয়রা মুক্ত হলেন এক জটিল আনুগত্যের সমস্যা থেকে। এতদিন পর্যন্ত তাঁরা ছিলেন আইনত মুঘল সম্রাটের, যদিও প্রায় সারা দেশেই সামাজিক-উদ্বৃত্ত কর হিসাবে গ্রাস করছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। মতাদর্শগত ভাবেও একদিকে সেকালের বিধান, অন্যদিকে ওরিয়েন্টালিস্ট জ্ঞানচর্চার প্রভাবে নতুন করে আত্মসমীক্ষা শিক্ষিত বাঙালিদের কাছে কয়েকটি সমস্যার সৃষ্টি করে। রঙ্গলালের *পদ্মিনী উপাখ্যান*-এর ভূমিকায় এই চিন্তাগুলির কিছু নিশানা পাওয়া যায়: "এই অভিনব কাব্যের প্রণয়ন ও প্রকটন সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিদ্বক্তব্য আছে। ১২৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে একদা বীটন সমাজের নিয়মিত অধিবেশনে কোন কোন সভ্য বাঙ্গলা কবিতার অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। কোন মহাশয় সাহসপূর্বক এরূপও বলিয়াছিলেন

যে, 'বাঙ্গালীরা বহুকাল পর্যন্ত পরাধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই জন্মগ্রহণ করে নাই।' প্রত্যুত স্বাধীনতা-সুখবিহীনতায় মানসিক স্বাচ্ছন্দ-বিরহ *হয়, সুতরাং পরিপীড়িত পরাধীন জাতির মধ্যে যথার্থ কবি কোনরূপেই কেহ হইতে পারেন না। আমি উক্ত মহাশয়দিগের অযুক্তি নিরসন নিমিত্ত ঐ সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করি..."।*[২৮]

রঙ্গলাল কেন *পদ্মিনী উপাখ্যান* লেখেন সে সম্পর্কে তাঁর নিজের বক্তব্যই সবচেয়ে প্রমাণ্য: "...এ দেশের পূর্ব্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের যা কিছু ভগ্নাবশেষ, তাহা রাজপুতানা দেশেই ছিল। বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্ম্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদগুণালঙ্কারে রাজপুতেরা যেরূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, সুধীত্ব এবং সাহসিকত্বগুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্য পাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বনপূর্ব্বক রচিত করিলাম।"[২৯]

রঙ্গলালকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেছিলেন কুন্তীর জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী। তাঁর অনুরোধেই টডের রাজস্থান থেকে কাহিনি নির্বাচন করে *পদ্মিনী উপাখ্যান* শুরু হয়। তৎকালীন বাংলা কাব্যের প্রধান আকর্ষণ ছিল আদিরসাত্মক কাব্য। বিদ্যাসুন্দরের অক্ষম অনুকরণ সারা দেশ ছেয়ে গিয়েছিল, সেখানে রঙ্গলাল সাহিত্যে এক নতুন দিক নির্ণয় করেন।[৩০]

রঙ্গলাল দীর্ঘকাল ১৮৭০-১৮৮২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত রাজকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। সরকারি কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের পর তাঁর স্বাস্থ্যহানি ঘটে ও পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকায় ১৮৮৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। এই সময়কার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যায় যে, ১৮৭০-৮০-র দশক থেকে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির চেতনায় বিজিত জাতির আত্মমোক্ষণের প্রচেষ্টার প্রথম পর্ব শুরু হয়। বলেন্দ্রনাথ প্রভৃতি লেখকরা পাশ্চাত্য দেশ থেকে আসা বিপ্লবের তরঙ্গকে স্বাগত জানান। এর ফলে একদিকে ইতিহাসের নতুন পাঠ, অন্যদিকে বিদেশি রোমান্টিক সাহিত্যের আকর্ষণে বাংলায় যে-কাব্য রচনা হতে থাকে, *পদ্মিনী উপাখ্যান* তার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।[৩১]

রঙ্গলালের পৃষ্ঠপোষকরা এই ধারণা নিয়েই এগিয়েছিলেন যে তৎকালীন শিক্ষণ সম্পূর্ণভাবে পরাধীনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এই জন্যই রঙ্গলালের উপাখ্যান টড থেকে গৃহীত, আলাওল থেকে নয়। যদিও অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত আলাওলের *পদ্মাবতী* পুঁথি আকারে প্রচলিত ছিল, তখনও তার অনুলিখন চলত, বিভিন্ন অভিজাতদের পুঁথিখানায় তা সংরক্ষিত ছিল, যার খোঁজ আজও পাওয়া যায়। ১৭৭০ সালের পর থেকে নবাবি কর্মচারীরা মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ছেড়ে জড়ো হতে থাকে কলকাতায়। ১৮৩০ সাল পর্যন্ত নবাবি স্কুলগুলিতে ফারসি পড়ানো হত, *লায়না মজনু*, *ইউসুফ-জুলেখা* শিক্ষিত বাঙালির কাছে যথেষ্ট আদর পেত। এই সময় পর্যন্ত *পদ্মাবতীরও* আদর ছিল শিক্ষিত বাঙালির কাছে। যার ধারা অনুসরণ করেন নিখিলনাথ রায়। ১৮৩৭ সালে ফারসি ভাষা অপসারিত হয় দরবারি ভাষা হিসাবে। ইংরেজি চালু হয় সরকারি ভাষা হিসাবে। যখন ১৮৫৮ সালে রঙ্গলাল *পদ্মিনী উপাখ্যান* লেখেন তখন আলাওলের নাম মুছে গেছে বাঙালির স্মৃতিপটে।

১৮২০ থেকেই টডের *রাজস্থান*-এর অনুবাদ লক্ষ করা যায় বাংলায়। এই বছর থেকে কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার টডের *রাজস্থান* অনুবাদে উদ্যোগী হন, যদিও তিনি নিজের নাম ব্যবহার করেননি। তাঁর *রাজস্থানের ইতিবৃত্ত* পাঁচটি খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৮৭২-৭৩ সালে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে গোপাল মুখোপাধ্যায় টডের *রাজস্থান* অনুবাদ করেন— এই অনুবাদ *পবিত্র রাজস্থান* নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। *চারুবার্তার* ভূতপূর্ব সম্পাদক যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত এবং অঘোরনাথ বরাট কর্তৃক প্রকাশিত *রাজস্থান* নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১২৯০ বঙ্গাব্দে। এর ভূমিকায় প্রকাশক টডের ভূয়সী প্রশংসা করে লেখেন যে টডের মতো পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে ভারতের অতীত গৌরব সম্পর্কে জানা গেছে।[৩২]

রঙ্গলাল নিজেকে স্বাধীনতার পুরোহিত ও টডের মন্ত্রশিষ্য হিসেবে দেখেছেন যে, অতীত সঞ্চারী পাঠক চিতোর দুর্গ দর্শন মাত্রেই ভারতের অতীত গৌরবের কথা মনে করেন—

"মানসে করেন চিন্তা কোথায় সে দিন?
যে দিনে ভারতভূমি ছিলেন স্বাধীন॥"[৩৩]

যে-নতুন রূপক এই কাব্যে সৃষ্টি হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে টডের অনুসারী। এখানে প্রণয়গাথা অত্যন্ত স্বল্প। আলাউদ্দিন বিধর্মী রাজা, যার মূল উদ্দেশ্য হিন্দু নিধন ও হিন্দু নারীর সতীত্ব নাশ। এক ধরনের উগ্র হিন্দুত্ব এই আখ্যানে গড়ে উঠেছে, যার প্রধান নায়ক টডের জাতীয়তাবাদী (nationalist) রাজপুত। রঙ্গলালের কিছু পঙ্‌ক্তি স্বদেশি আন্দোলনের মন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল:

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।...
সার্থক জীবন আর বাহু-বল তার হে,
বাহু-বল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে
দেশের উদ্ধার॥..."[৩৪]

এই রূপকল্পে একমাত্র 'আত্মনাশে' সম্ভব দেশপ্রেমিকের কর্তব্য সাধন। কিন্তু তাও এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। এখানেই পদ্মিনীর জহরব্রত, রাজপুত বীরত্বের চেয়েও বেশি গুরুত্ব পায়। পদ্মাবতী রানি থেকে পদ্মিনী ও মহাসতীতে উত্তীর্ণ হন। সমগ্র কাহিনি তাঁকে ঘিরেই আবর্তিত হতে থাকে।

"সতীত্ব সকল ধর্ম-সার,
যার নাহি পর আর।
যুগে যুগে ক্ষত্রিয়ের এই ব্যবহার।"[৩৫]

বাঙালির অবচেতনে নারীর সতীত্ব ও জাতীয় সম্মান উনবিংশ শতক থেকেই ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তাই ইতিহাসকে নির্মাণ করা হয় পুরাকাহিনির আদলে। ভারতীয় পরম্পরার সন্ধানে ব্যাপৃত সাহিত্যিক ও শিল্পীদের কাছে যে-রূপকল্প প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায় তা দেশকে শুধু মাতৃকারূপে নয়, একই সঙ্গে সতী ও দেবী হিসাবে চিহ্নিত করে। এই রূপকল্পের প্রধান শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ। তাঁর লেখা কিশোরপাঠ্য ইতিহাস *রাজকাহিনি*, টডের সার্থক অনুবাদ— এখানেই পদ্মিনী দেবীত্বে অভিষিক্ত হন:

"...যখন দ্বিপ্রহরের স্তব্ধ রাজপুরে হাজার হাজার রাজপুত বীরের চোখের সম্মুখে আবার সেই দেবী মূর্তি 'ম্যায় ভুখা হুঁ' বলে প্রকাশ হলেন, তখন আর কারো মনে কোনো সন্দেহ রইল না... কেবল রাণা ভীম সিংহ যেন সেই দেবীমূর্তির ভিতরে পদ্মিনীকে দেখে মনে মনে তোলপাড় করতে লাগলেন— এ কি দেবী, না পদ্মিনী? পদ্মিনী না দেবী? তারপর, মহাবলির উদ্‌যোগ হল।"[৩৬]

সমগ্র বর্ণনার মধ্যে দিয়ে হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের যে-রূপ ফুটে ওঠে তা একদিকে ভয়ংকর, অন্যদিকে স্বদেশি মতাদর্শের বিশেষ প্রকাশ। পরে অবনীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ দু'জনেই স্বদেশিয়ানার এই উগ্র হিন্দুত্বকে পরিহার করেন, কিন্তু তাঁদের উত্তরসূরিদের মধ্যে এর প্রভাব থেকে যায়। আর ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে আলাউদ্দিনকে করে তোলা হয় সব মুসলমান রাজার প্রতীক, যে একই সঙ্গে প্রকৃত অধিবাসীদের থেকে ছিনিয়ে নিতে চায় তাদের দেশভূমি আর তার সঙ্গে তার লালসা গ্রাস করে শুধু নারীকে নয়, সব কিছু যা সুন্দর, যা পবিত্র—

"বারো হাজার রাজপুতনীর সঙ্গে রানী পদ্মিনী অগ্নি-কুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন— চিতোরের সমস্ত ঘরের সমস্ত সোনামুখ, মিষ্টি কথা আর মধুর হাসি নিয়ে এক-নিমেষে চিতার আগুনে ছাই হয়ে গেল।"[৩৭]

যা রয়ে গেল তা প্রতিহিংসার ইচ্ছা। আর সাম্প্রদায়িক ইতিহাস রচনার কয়েকটি সূত্র। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, পাঠ ইতিহাসকে বিকৃত বা বিভ্রান্ত করে না, বরং ইতিহাসকে সৃষ্টি করে তা হলে মানুষের তৈরি ইতিহাসের পাঠে মানুষই সবচেয়ে বড় রূপকার। সেখানে যে-নৈতিকতার প্রয়োজন হয়, তাতে শুধুমাত্র সমকালীন ইতিহাস রচয়িতার মতাদর্শ নয়, সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা উচিত, আমাদের নিজেদের মতাদর্শগত অবস্থান। তা হলে হয়তো বোঝা যাবে অতীত-বর্তমানের যোগসূত্র। পদ্মিনীর সঙ্গে রূপ কানোয়ারের।

দুই

স্বপন বসু

বাঙালি সমাজমানসে নারী: উনিশ শতকের বাংলা পত্রিকার দর্পণে

ভারতীয় শাস্ত্রকার এবং কবি-সাহিত্যিকদের একটা বড় অংশ যুগ যুগ ধরে মেয়েদের হীন প্রতিপন্ন করার কাজটি নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছেন। 'মনু সংহিতা'য় স্ত্রী-নিন্দাবাচক যে সব শ্লোক আছে তা উদ্ধৃত করতে 'লজ্জা ও কষ্টবোধ' করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'ভগবান' মনুর মতে 'শয্যা, আসন, অলংকার, কাম-ক্রোধ, কুটিলতা পরহিংসা ও কুৎসিত আচার স্ত্রীলোক হইতে হয়' ('হিন্দু বিবাহ', *ভারতী ও বালক*, আশ্বিন ১২৯৪)। নারীজাতির নিন্দায় মহাভারতকার কেমন দক্ষ ছিলেন, তার সামান্য কিছু নমুনা অনুশাসনপর্বের অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়ে স্ত্রীচরিত্র সম্পর্কে ভীষ্ম-যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন থেকে রবীন্দ্রনাথ ওই প্রবন্ধে উদ্ধার করেছেন—

> কামিনীগণ সৎকুলসম্ভূত রূপসম্পন্ন ও সধবা হইলেও স্বধর্ম পরিত্যাগ করে। উহাদের অপেক্ষা পাপপরায়ণ আর কেহই নাই, উহারা সকল দোষের আকর। উহাদের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ধর্মভয় নাই।

মেয়েদের সম্পর্কে ভারতীয় সমাজে প্রচলিত কুৎসিত এইসব ধারণা বাঙালি সমাজেও সঞ্চারিত হয়েছিল। তা ছাড়া উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর তেমন ভূমিকা না থাকায়, পুরুষশাসিত সমাজে তাঁরা পরিণত হয়েছিলেন লালসা মেটানোর ও সন্তান প্রজননের যন্ত্রে। তাঁকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিতে, তাঁর ভাল লাগা, মন্দ লাগা নিয়ে মাথা ঘামাতে সমাজ প্রস্তুত ছিল না। এই কারণেই কন্যার চেয়ে পুত্র সন্তান ছিল অনেক কাঙ্ক্ষিত— পুত্রকে মনে করা হত পরিবারের সম্পদ, আর কন্যাকে দায়। পুত্র সন্তান প্রসব করে বংশধারা অব্যাহত রাখা ছাড়া স্বতন্ত্র কোনও মূল্য নারীর আছে বলে অধিকাংশ বাঙালিই বিশ্বাস করতেন না। এই সব কারণেই মেয়েকে লেখাপড়া শেখানোর, পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার দানের, তার শারীরিক প্রবৃত্তিকে স্বীকৃতি জানানোর, সামাজিক ক্রিয়াকর্মের অংশীদার করার কোনও দায় বহু দিন পর্যন্ত বাঙালি-সমাজ অনুভব করেনি।

এইভাবেই চলছিল সমাজজীবন। কিন্তু উনিশ শতকে একদল মানুষ মেয়েদের চাওয়া-পাওয়া, কামনা-বাসনা নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু করলেন। নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ এই সব মানুষের চিন্তাভাবনার স্রোত যে এক ধারায় এগোয়নি, তা বলাই বাহুল্য। কারও চিন্তাচেতনার জগৎ আলোকিত হয়েছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির স্পর্শে, কারও আবার ইচ্ছা হয়েছিল, শাস্ত্রে মেয়েদের পালনীয় বিধি-বিধান সম্পর্কে ঠিক কী আছে, তা যাচাই করে দেখতে। বিভিন্ন বিষয়ে শাস্ত্রকারদের মতভেদও তাঁদের চোখে পড়েছিল। এই ধরনের মানুষের সংখ্যা খুব যে বেশি ছিল তা কিন্তু নয়। অধিকাংশেরই মনে গেঁথে গিয়েছিল মেয়েদের সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা ধ্যান-ধারণা।

মেয়েদের নিয়ে বাঙালিসমাজে নতুন-পুরনো চিন্তাভাবনার সংঘাত যখন শুরু হচ্ছে, সেই সময়ই বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের জন্ম। যত দিন গেছে, তত বেড়েছে সংবাদ-সাময়িকপত্রের সংখ্যা। এই সব পত্র-পত্রিকার বেশির ভাগ লুপ্ত হয়ে গেলেও, যেগুলি আছে সেগুলিতে সময়ের ছাপটা রয়েই গেছে। মেয়েদের নিয়ে উনিশ শতকের বাঙালির উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, করুণা-ভালবাসা, ঘৃণা-অবিশ্বাসের চিহ্ন থেকে গেছে এই সব পত্রিকায়— যা থেকে এই কালের বাঙালি সমাজমানসিকতার অস্পষ্ট একটা আভাস মিললেও মিলতে পারে।

উনিশ শতকের সচেতন বাঙালিরা মেয়েদের নিয়ে অনেক ভেবেছিলেন, তাঁদের দুঃখ দূর করার জন্য একের পর এক আন্দোলনেও সামিল হয়েছিলেন— যার কোনও কোনওটি গ্রাম-গঞ্জের মানুষকে পর্যন্ত আলোড়িত করেছিল। পরিবর্তমান এই সময়েও সমাজের এক অংশ মেয়েদের সম্পর্কে পুরনো দিনের চিন্তাভাবনায় কতখানি বুঁদ হয়েছিলেন, তার সামান্য কিছু নমুনা দেখা যাক।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য বাঙালিসমাজের একাংশ যখন উদ্‌গ্রীব, কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে দলমত নির্বিশেষে পত্রিকাগুলি যখন সচেষ্ট, তখন কলকাতা থেকে প্রকাশিত *বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা* (প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৮৫৫) নামে একটি মাসিক পত্রিকায় 'নারী চরিত্র' নামে যে লেখাটি বেরোয় সেটি এই রকম—

> নারী চরিত্র অতি দুর্জ্ঞেয়, দেবতারাও তাহা বুঝিতে পারেন না, রমণীদিগের অন্তর গরলপূর্ণ অথচ মুখে মধুবর্ষণ করে, তাহারদিগের প্রিয়াপ্রিয় নাই, গোসকল যেমন বনে যাইয়া নব নব তৃণান্বেষণ করে তদ্রূপ রমণীরা সর্ব্বদা নূতন ২ পুরুষ প্রার্থনা করিয়া থাকে, মুখে প্রণয় প্রার্থনা করে কিন্তু মনে শঠতা পূর্ণ, রমণী হইতে পিতাপুত্রে ও ভাইভাই বিচ্ছেদ হয়,... রমণীরা দান, মান, সরলতা, সেবা, শীলতা, শাস্ত্র, শস্ত্র কিছুতেই বশ্যা হয় না, তাহারদের রমণাকাঙ্ক্ষা কোন মতে তৃপ্ত হয় না, নারীদেহে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কাম বিরাজমান থাকে, পুরুষাপেক্ষা তাহারদের কামভাগ অষ্ট গুণ অধিক, তাহারদের স্বাভাবিক ক্ষীণতা কিছুতেই দূর হয় না, নারীদিগের চিত্ত অতিশয় চঞ্চল, অতি সামান্য বিষয়ে তাহারদিগের রুষ্টি তুষ্টি জন্মে অকারণে কলহবিবাদে প্রবৃত্ত হয়,

পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া পরের চাটুবাক্যে ভুলিয়া যায় এবং পিতৃ মাতৃ ও স্বামীকুলে কালী দিয়া কুলটা হয়, উপপতির মনরক্ষার্থে অনায়াসে পতিপ্রাণ নাশ করে, লৌহসিন্দুকে পূরিয়া রাখিলেও ভ্রষ্টাচারিণী হয়...।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মানুষ *বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা*-র সম্পাদক নবীনচন্দ্র আঢ্য। মনুবাক্যে অগাধ আস্থা তাঁর। 'স্ত্রীদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য' বলে তিনি মনে করতেন। মনুর মতের পুনরাবৃত্তি করে ১২৬৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা *বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা*-য় তিনি বলেন, "নারীরা বাল্যকালে পিতা কর্তৃক রক্ষিতা হয়, যুবাকালে ভর্ত্তার শাসনাধীনে থাকে এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রাদির পরতন্ত্রী হইয়া জীবন শেষ করে। কোন কালে তাহারদিগের স্বাধীনতা নাই।"

শুধু *বঙ্গবিদ্যাপ্রকাশিকা*-র সম্পাদকই নন, স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাংলার অনেক সম্পাদকই মনুর দোহাই দিয়েছেন। সেকালের বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা *সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়* মনু ও অন্যান্য শাস্ত্রকারদের উল্লেখ করে বারবার মেয়েদের স্বাধীনতা দানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে "যদি স্ত্রীলোকের স্বাধীনতায় অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা না থাকিত তবে মনু কেন তাহা নিষেধ করিবেন। আর স্ত্রীলোক অন্তঃপুরবাসী না হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে পুরুষদের ন্যায় যত্রতত্র গমনা গমন ও যে কোনও পুরুষের সহিত সম্ভাষণ করিলে মহা ২ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে এই নিমিত্ত মনু লিখিয়াছেন— মাতা, ভগিনী, কন্যা ইহাদের সহিতও একান্তে একত্র থাকিবেন না" (*সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়*, ২৩.৫.১৮৫১)।

মনু ও অন্যান্যদের সামনে রেখে মেয়েদের অন্তঃপুরের চার দেওয়ালের মধ্যে ধরে রাখার এই চেষ্টা কতটা প্রবল ছিল তা বোঝা যায়, শতাব্দীর শেষ প্রান্তে *বেদব্যাস*-সম্পাদক ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য থেকে—

ভগবান মনু লিখিয়াছেন স্ত্রীজাতিকে কখন স্বাধীনতা দিবে না, তিনি স্ত্রীদিগের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অনেক শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল শ্লোকের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে স্ত্রীদিগকে স্বাধীনতা দিলে তাহাতে সন্তান উৎপাদন, সন্তান প্রতিপালন, গৃহকার্য্য ও পবিত্রতা নষ্ট হইতে পারে।

শুধু স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধিতা করার সময়ই নয়, বাল্যবিবাহের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়েও অনেক সম্পাদক শাস্ত্রবাক্যের কথা উচ্চারণ করেছেন। অন্যদের কথা বাদই দেওয়া যাক, *অনুসন্ধান*-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি পত্রিকা— যাঁর প্রাণপুরুষ ছিলেন দুর্গাদাস লাহিড়ির মতো বিদগ্ধজন, অক্লেশে লিখতে পেরেছিল—

বর্ত্তমান সময়ে তোমরা যে বালিকাবিবাহ সম্বন্ধে কেবল তর্ক করিতেছ, ইহা তোমাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। বালিকাবিবাহে সন্তানের কি সমাজের কোন অনিষ্টই হইতেছে না, এবং বালিকাবিবাহে হিন্দুসমাজ অনেক পরিমাণ পবিত্রভাব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিবাহ ও সহবাস এবং পুরুষের নিতান্ত অল্প বয়সে বিবাহ ইত্যাদি সম্বন্ধে আর্য্য

ঋষিগণ যে সকল ব্যবস্থা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্যকরূপে প্রতিপালন না করাতেই সমাজের নানা প্রকার অনিষ্ট হইতেছে।

(*অনুসন্ধান* ২৯ পৌষ, ১২৯৭)

বাল্যবিবাহের ফলে মেয়েদের প্রায়ই নিতান্ত কম বয়সে স্বামীর লালসার শিকার হতে হত। এর হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করার জন্য ১৮৯০-এ সরকার যখন সহবাস সম্মতির বয়স ১০ থেকে বাড়িয়ে ১২ করার প্রস্তাব করে, তখন সমাজে সৃষ্টি হয় তুমুল আলোড়ন। বারো বছরের কমবয়সি কোনও মেয়ে ঋতুদর্শন করলেও স্বামী তার সঙ্গে সহবাস করতে পারবে না— এ কথা মেনে নিতে পারলেন না অনেক সম্পাদকই। শাস্ত্র-অবমাননার আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন তাঁরা। কী ভয়ংকর ব্যাপার এর ফলে ঘটতে চলেছে সবাইকে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের *ধর্মপ্রচারক* লিখল—

যদি 'সমাগম সম্মতিকাল' ১২শ বর্ষ স্থির হয়, আর কুলবধূ যদি তৎপূর্ব্বেই রজস্বলা হয়েন, তবে গর্ভাধান সংস্কার হইতেই পারিবে না। বৈধ সংস্কার না হইলে গর্ভে যে পুত্রাদি উৎপন্ন হয়, সে শাস্ত্রানুসারে বর্ণাশ্রম ধর্মের, পিণ্ডদান তর্পণাদির উপযুক্ত অধিকারী হয় না।

(*ধর্মপ্রচারক*, পৌষ ১২৯৭)

বিষয়টির আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে *বেদব্যাস* সম্পাদক লিখলেন—

শাস্ত্রে বিহিত ১০টি সংস্কারের প্রথম সংস্কারই গর্ভাধান, এই গর্ভাধান স্ত্রীর প্রথম রজোদর্শনেই করিতে হয়, না করিলে এই সংস্কার মিথ্যা হইল। আর গর্ভাধান না হইলে অন্য অন্য সংস্কারের সকলটি নিস্ফল। শাস্ত্রের এই আদেশ। শাস্ত্র আরও বিধান করিয়াছেন যে রজোদর্শনে অভিগমন না করিলে নরকবাস করিতে হইবে। অতএব শাস্ত্র শুনিয়া চলিলে গর্ভাধান যথাসময়ে করিতেই হইবে। কিন্তু প্রথম রজোদর্শনের কোনই নির্দ্দিষ্ট কাল নাই। শারীরিক অবস্থা অনুসারে তাহা ঘটিয়া থাকে। আমাদের দেশে বিশেষ বাঙ্গালী অনেক স্ত্রীর একাদশ বৎসরেই ঋতু হয়। সুতরাং তখনই গর্ভাধান করিতে হইবে।

(*বেদব্যাস*, মাঘ ১২৯৭)

শাস্ত্রে পরম আস্থাবান এইসব সম্পাদকরা ক্ষেত্রবিশেষে আবার শাস্ত্রবাক্যকে তেমন গুরুত্ব দেননি। স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন কোনও কোনও হিন্দু শাস্ত্রে আছে বলে শুনেছি। শিক্ষার সুযোগ পেলে মেয়েরা সচেতন হয়ে উঠবেন। সমাজের কাছে প্রাপ্য মর্যাদা দাবি করবেন— এই আশঙ্কায় আতঙ্কিত অনেক মানুষই বিভিন্ন পত্রিকায় স্ত্রীশিক্ষার বিরোধিতায় নামেন। হিন্দু শাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত নন্দকুমার কবিরত্ন স্ত্রীশিক্ষার পরিণামের কথা চিন্তা করে শিউরে ওঠেন। নিজের পত্রিকায় সবাইকে সাবধান করে দিয়ে তিনি লেখেন—

স্ত্রীলোকের বুদ্ধি কদর্য্যা, তাহাতে বিদ্যাচাতুর্য্য প্রকাশ হইলে স্বাধীনা হইবে, তাহা হইলে পুরুষমাত্রকে তৃণতুল্যজ্ঞানে অনিষ্ট কর্ম্মকরণের অপেক্ষা রাখিবেক না।... স্ত্রীলোকের বিদ্যাপ্রদান বিষয়ে দোষ দেখিয়া শুনিয়া অতঃপর নিরস্ত হওয়াই কল্যাণ...।

(নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা, ৩০ কার্তিক ১২৫৯)

নন্দকুমারের চেষ্টায় তেমন ফল ফলল না। সমস্ত সামাজিক প্রতিবন্ধতাকে উপেক্ষা করে শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েরা এগিয়ে চললেন। প্রাথমিক শিক্ষার পর উচ্চশিক্ষার, এমনকী বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজাও তাঁদের সামনে খুলে গেল। তাঁদের এই অগ্রগমনকে রুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন সম্পাদক বিভিন্ন ভাবে সচেষ্ট হলেন। *সমাজদীপিকা* সম্পাদক অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ বললেন 'স্ত্রী শিক্ষা অস্বাভাবিক' ও 'ঈশ্বরের অনভিপ্রেত'! দেশহিতৈষী মানুষদের এই কাছে বৃথা সময় নষ্ট না করে 'যাহাতে দেশের প্রকৃত হিত সাধিত' হয় সে জন্য সচেষ্ট হতে তিনি অনুরোধ জানালেন। (*সমাজদীপিকা* ১৫ ভাদ্র, ১২৯২)

কেন স্ত্রীশিক্ষা 'অস্বাভাবিক', তা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব নিলেন *বেদব্যাস* সম্পাদক। বৈশাখ ১২৯৬-এ নারীজীবনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তিনি জানালেন—

পুত্র প্রসব ও পুত্র প্রতিপালন নারীজীবনের উদ্দেশ্য।... বিদ্যাশিক্ষাও নারীর পক্ষে অমঙ্গলের কারণ। কেন না, ইহা দ্বারা নারীর পুত্র প্রসবোপযোগিনী শক্তিগুলির হ্রাস হয়। বিদুষী নারীগণের বক্ষদেশ সমতল হইয়া যায়, এবং তাঁহাদের স্তনে প্রায়ই স্তন্যের সঞ্চার হয় না। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের জরায়ু প্রভৃতি বিকৃত হইয়া যায়।... অতএব বিদ্যাশিক্ষা নারী-জীবনের মূল উদ্দেশ্যের অন্তরায়। বিদ্যা নানা রূপে আমাদের মঙ্গলের কারণ হইলেও নারীগণের পরম শত্রু।

এই একই কথার প্রতিধ্বনি বছর দুয়েক পরে শোনা গেল অন্য একটি পত্রিকায়—

বিদ্যা নানারূপে আমাদের মঙ্গলের কারণ হইলেও নারীগণের পরম শত্রু। কঠোর শারীরিক পরিশ্রম বা গুরুতর মানসিক চিন্তা এ সমস্তও নারীর পক্ষে বর্জনীয়। কেননা ঐ সমস্ত কার্য্যদ্বারা নারীজীবনের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান (সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালন) উদ্দেশ্য সম্পাদিত হইতে পারে না।

(*অনুসন্ধান*, ১৫ বৈশাখ ১২৯৮)

শাস্ত্র দেখিয়ে বা যুগ যুগ ধরে চলে আসা মেয়েদের সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে যেমন কিছু সম্পাদক সমাজের গতিকে থামিয়ে রাখতে চেয়েছেন, পাশাপাশি বেশ কিছু মানুষ কিন্তু কলম ধরেছিলেন মেয়েদের বিভিন্ন কামনা-বাসনাকে স্বীকৃতি জানাতে। বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত অথবা নয়— এ নিয়ে বহু তর্ক হয়েছে। শাস্ত্র নিয়ে বাদানুবাদের ফাঁকে আর একটি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে সমাজকে। বিধবা হলেই তো মেয়েদের শারীরিক কামনা-বাসনা উবে যায় না। তা হলে?

উত্তরটা শোনা যাক *রসরাজ* সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের কাছ থেকে—

> বিজ্ঞ লোকেরা বিধবাদিগের বিবাহের জন্য বারম্বার উপদেশ প্রদান করিতেছেন। বিশেষত শাস্ত্রে আছে বিধবারা বিবাহ করিতে পারেন, তথাপি একগুঁয়া হিন্দুরা শাস্ত্রের অভিপ্রায় গ্রহণ করিবেন না। যুবতী বিধবাদিগকে অমনি রাখিয়া দিবেন, বিধবাদিগের শরীর কি শরীর নয়, তাহারা কি মহাবল ইন্দ্রিয়দলকে হাত বুলাইয়া শান্ত রাখিবে...
>
> (*সম্বাদ রসরাজ*, ১৫.৫.১৮৪৯)

বিধবা হলে প্রবৃত্তির তাড়না থেকে নিষ্কৃতি যে মেলে না, তা একালের মানুষরা বুঝেও যেন বুঝতেন না। তাঁদেরকে ধিক্কার জানিয়ে বিধবাবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের উপসংহারে বিদ্যাসাগর লিখলেন—

> তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছে।

কয়েক বছর পরে প্রায় এই একই কথার প্রতিধ্বনি আমরা শুনলাম দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের কণ্ঠে। ১৮৬৭-র ২৪ জুন-এর *সোমপ্রকাশ*-এ তিনি লিখলেন, "যে রিপু আমরা আপনারা এককালে দমন করিতে পারি না, বিধবারা তাহা করিবে এই ভ্রম অদ্যাপিও গেল না।"

প্রবৃত্তির তাড়না শুধু যে বিধবাদেরই পীড়িত করত তা নয়, কুলীন মেয়েদেরও অনুভব করতে হত এর ভয়ংকর যন্ত্রণা। এ সম্পর্কে উদাসীন মনোভাবের জন্য *গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা* সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার ক্ষোভের সঙ্গে লেখেন—

> সহস্র সহস্র বিধবা ও অনূঢ়া ভগ্নীর আর্ত্তনাদ ও কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া আমরা এখনও স্থির অন্তঃকরণে রহিয়াছি, অতএব যদি আমরা পাষাণ-হৃদয় না হই, তবে আর কে হইবে? ধিক আমাদের জীবনধারণ, ধিক আমাদের বিবিধ শাস্ত্রধ্যায়ন, ধিক আমাদের সভাস্থাপন, ধিক আমাদের লেখনী সঞ্চালন!!

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের *এডুকেশন গেজেট*-ও কুলীন মেয়েরা যে প্রবৃত্তির তাড়নাতেই কেউ ব্যভিচারিণী হয়, কেউ বেশ্যার ভবনে আশ্রয় নেয়, 'অনেক অবিবাহিতা কুলকন্যা রিপুশমতা করিতে না পারিয়া পিতৃদ্রোহিণী' হয়ে অতি অপাত্রেও আত্মসমর্পণ করে তা স্বীকার করেন। (*এডুকেশন গেজেট* ৯.৮.১৮৭২)

মেয়েদের শারীরিক প্রবৃত্তিকে স্বীকৃতিদানের পাশাপাশি সংসারে তাঁরা যে অবাঞ্ছনীয় নয়, এই কথাও এই কালের অনেক সম্পাদকই উচ্চারণ করেছেন। মেয়ে যে কত আদরের সবাইকে তা স্মরণ করিয়ে দিতে ১২৭৮-এর ৩ শ্রাবণ *সুলভ সমাচার*-এ কেশবচন্দ্র সেন লেখেন—

> কন্যার মত স্নেহের সামগ্রী অতি অল্পই আছে কন্যার হৃদয় স্বভাবতঃ পিতামাতার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত, পিতামাতা তাহাকে অতিশয় স্নেহ না করিয়া থাকিতে পারেন না। কন্যার প্রতি স্নেহ সেই দিন ভাল করিয়া বুঝা যায়, যেদিন তাহাকে রত্ন অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া জামাতাকে অর্পণ করা যায় এবং জামাতা তাহাকে আপন গৃহে লইয়া যান। যাঁহার হৃদয় অতিশয় কঠিন তিনিও সেদিন চক্ষের জল না ফেলিয়া থাকিতে পারেন না।

'প্রাণসমা প্রিয়তমা কন্যাগণের' 'শোচনীয় দশা' দেখে ব্যথিত হয়ে *ভারত সুহৃদ* দেশবাসীকে এর প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হতে আহ্বান জানিয়েছেন (*ভারত সুহৃদ*, আষাঢ় ১২৮৩)।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কিছু সচেতন মানুষ যখন মেয়েদের অন্দর থেকে সদরে আনতে চাইলেন, তখন স্থিতাবস্থার পক্ষপাতীরা বিচলিত হয়ে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সে পথ কীভাবে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, তার কিছু পরিচয় দিয়ে এসেছি। কিন্তু অন্তঃপুরের মধ্যে এভাবে মেয়েদের বন্দি করে রাখাটা যে ঠিক নয়, সে বিষয়ে বাংলা পত্রিকাগুলি মুখ খোলে। ১২৮০ বঙ্গাব্দে কেশবচন্দ্র সেন ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই দুই বিখ্যাত মানুষ বিষয়টি সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। *সুলভ সমাচার*-এ কেশবচন্দ্র লিখলেন—

> বিবাহিতা স্ত্রী পিঞ্জরের পাখীর সমান। বেশ্যার সঙ্গে স্বাধীনভাবে প্রকাশ্য রাজপথে গাড়ি চড়িয়া বেড়ান হইবে অথচ ধর্মপত্নীকে একটু সূর্য্যের আলোক কিম্বা বাহিরের পরিষ্কার বায়ু সেবন করাইতে লজ্জায় মরিবেন।
>
> (*সুলভ সমাচার* ৪ আষাঢ় ১২৮০)

এই সময়েই *বঙ্গদর্শন*-এ প্রকাশিত 'সাম্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এই ব্যবস্থাকে ধিক্কার জানিয়ে লিখলেন—

> স্ত্রীপুরুষে যত প্রকার বৈষম্য আছে, তন্মধ্যে... স্ত্রীগণকে গৃহমধ্যে বন্য পশুর ন্যায় বদ্ধ রাখার অপেক্ষা নিষ্ঠুর, জঘন্য অধর্ম্মপ্রসূত বৈষম্য আর কিছুই নাই। আমরা চাতকের ন্যায় স্বর্গমর্ত্ত্য বিচরণ করিব কিন্তু ইহারা দেড় কাঠা ভূমির মধ্যে, পিঞ্জরে রক্ষিতার ন্যায় বদ্ধ থাকিবে। পৃথিবীর আনন্দ, ভোগ, শিক্ষা, কৌতুক, যাহা কিছু জগতে ভাল আছে, তাহার অধিকাংশে বঞ্চিত থাকিবে। কেন? হুকুম পুরুষের।
>
> এই প্রথার ন্যায় বিরুদ্ধতা এবং অনিষ্টকারিতা অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তিই এক্ষণে স্বীকার করেন, কিন্তু স্বীকার করিয়াও তাহা লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত নন। ইহার কারণ, অমর্যাদা, ভয়। আমার স্ত্রী, আমার কন্যাকে, অন্যে চর্মচক্ষে দেখিবে। কি অপমান! কি লজ্জা! আর তোমার স্ত্রী, তোমার কন্যাকে যে পশুর ন্যায় পশুশালে বদ্ধ রাখ, তাহাতে কিছু অপমান নাই? লজ্জা নাই?

কয়েক বছর পরে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে উচ্চারিত হল একই ধরনের কথা—

পুরুষেরা বাইরের সমস্ত আমোদ প্রমোদে লিপ্ত রয়েছে আর মেয়েরা তাদের নিজস্ব সম্পত্তি একটা পোষা প্রাণীর মতো অন্তঃপুরের দেয়ালে শৃঙ্খলে বাঁধা আছে।... এ সকল যদি পাপ না হয় তবে নরহত্যা করাও পাপ নয়; সমাজের অর্ধেক মানুষকে পশু করে ফেলা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলে প্রচার কর, তাহলে তাঁর নামের অপমান করা হয়।

(য়োরোপযাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র, *ভারতী*, অগ্রহায়ণ ১২৮৬)

পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় নারীর বিষয়াধিকার স্বীকৃতি পায়নি। পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার ছিল না বললেই হয়। বিধবার বিষয়াধিকারের বিষয়টিও ছিল রীতিমতো জটিল। ১৮৫৬-য় বিধবাবিবাহ আইন পাশ হয়। পুনর্বিবাহের পর বিধবা পূর্ব স্বামীর সম্পত্তিচ্যুত হবেন— এ কথা বিধবাবিবাহ আইনে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়। কিন্তু বিধবা যদি অন্য কারও প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন ত্য হলে? অপুত্রক বিধবাকে ব্যভিচারিণী অপবাদ দিয়ে সম্পত্তির অধিকারচ্যুত করার মামলা হতে লাগল একের পর এক। মামলার রায় বিধবার পক্ষে যাওয়ায়, সমাজপতিরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ১৮৬৯-এ এই রকম একটি মামলার রায় পর্যালোচনা করতে গিয়ে একটি পত্রিকা লেখে—

জয়কালীর মোকদ্দমায় প্রধানতন বিচারালয়, জয়কালী দেব্যার সাপক্ষ নিষ্পত্তি করাতে আমাদের সহযোগীমধ্যে কেহ ২ হিন্দুদিগের ব্যবস্থাশাস্ত্রের বিপরীতে ব্যাভিচারিণীকে স্বামীর ত্যজ্য ধনে অধিকারী করায় ব্যভিচার দোষে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। ...এই ব্যভিচার দোষ পুরুষের পক্ষে কি শাস্ত্র কর্ত্তারা বৈধ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন? এমত নহে। যখন পিতা বর্ত্তমানে পুত্রেরা হিন্দু ধর্ম্ম ও চিরন্তন দেশাচারের বহির্ভূত অশেষবিধ অসংখ্য অপকর্ম্ম করিয়াও পিতৃ ও পিতামহ, মাতামহ প্রভৃতির বিত্তে অধিকারী হইতেছেন, তখন এক ব্যভিচারমাত্র দোষে দুষিতা অনাথা অবলা জাতিকে নিরাশ করা কি সহযোগীদিগের মতে যুক্তিযুক্ত বোধ হয়।

(*রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ* ২৯.৪.১৮৬৯)

এর বছর চারেক পরে অসতী বিধবার বিষয়াধিকার সম্পর্কে অন্য একটি মামলার রায় বিধবার পক্ষে গেলে, সমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। এই রায়ের বিরুদ্ধে বিলেতে আপিল করার জন্য চাঁদা তোলা শুরু হয়। সেই সময়ই *বঙ্গদর্শন*-এ বেরোয় বঙ্কিমচন্দ্রের সেই বিখ্যাত রচনা 'সাম্য'। তাতে তিনি লেখেন—

স্বীকার করি, অসতী স্ত্রী বিষয়ে বঞ্চিত হওয়াই বিধেয়, তাহা হইলে অসতীত্ব পাপ বড় শাসিত থাকে; কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি বিধান হইলে ভাল হয় না, যে লম্পট পুরুষ অথবা যে পুরুষ পত্নী ভিন্ন অন্য নারীর সংসর্গ করিয়াছে, সেও বিষয়াধিকারে অক্ষম হইবে। বিষয়ে বঞ্চিত রাখিবার ভয় দেখাইয়া স্ত্রীদিগের সতী করিতে চাও— সেই ভয় দেখাইয়া পুরুষগণকে সৎপথে রাখিতে চাও না কেন? ধর্ম্মভ্রষ্ট স্ত্রী বিষয়

পাইবে না; ধর্ম্মভ্রষ্ট পুরুষে বিষয় পাইবে কেন? ধর্ম্মভ্রষ্ট পুরুষ— যে লম্পট, যে চোর, যে মিথ্যাবাদী, যে মদ্যপায়ী, যে কৃতঘ্ন, সে সকলেই বিষয় পাইবে; কেন না সে পুরুষ, কেবল অসতী বিষয় পাইবে না, কেন না সে স্ত্রী! ইহা যদি ধর্ম্মশাস্ত্র, তবে অধর্ম্মশাস্ত্র কি?

মেয়েদের সম্পর্কে যুগ যুগ ধরে চলে আসা সব ধারণা যে ঠিক নয়, শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে মানবিক সমস্ত অধিকার থেকে তাঁদের বঞ্চিত রাখাটা যে অন্যায়, অধর্ম— একথা বাঙালি সমাজের কিছু মানুষ উনিশ শতকে ভাবতে শুরু করেছেন। শাস্ত্রকারদের কুযুক্তির দায় কেন একালের মেয়েদের বহন করতে হবে, কেন পুরুষের সাত খুন মাফ হবে, এসব প্রশ্নের মুখোমুখি সমাজকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন খ্যাত-অখ্যাত কিছু সম্পাদক। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী ধ্যান-ধারণা অনেকের মনে অনেক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। ইংরেজ মেয়েদের সঙ্গে বাঙালি নারীর পার্থক্যটা ভীষণ রকম প্রকট হয়ে উঠেছে। বাঙালির এইসব ভাবনার বেশ কিছু চিহ্ন রয়ে গেছে সমকালীন পত্র-পত্রিকায়। সমাজে নারীর স্থান, তাঁদের অধিকার নিয়ে যে সব পত্রিকা প্রশ্ন তুলেছে, তার মধ্যে *বঙ্গদর্শন*, *ভারতী*-র মতো বিখ্যাত পত্রিকার পাশে *রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ*, *ঢাকা দর্পণ*-এর মতো প্রায় অপরিচিত পত্রিকাও আছে। *বঙ্গদর্শন*, *ভারতী*-র সম্পাদক তো বিখ্যাত লোক, কিন্তু *ঢাকা দর্পণ* সম্পাদকের নামটুকুও তো আমরা জানি না।

মেয়েদের সম্পর্কে একদিকে পুরোনো কালের ধ্যান-ধারণাকে আঁকড়ে ধরার প্রাণপণ চেষ্টা, অন্য দিকে নতুন ভাবে নারীকে দেখার মানসিকতা— উনিশ শতকের বাঙালিমানসের দ্বন্দ্বসংঘাতময় এই রূপ সংবাদপত্রের দর্পণে কিছুটা হলেও ফুটে উঠেছে।

মালেকা বেগম

বিপন্ন নারী: সতীদাহ থেকে কন্যাভ্রূণ হত্যা

পৃথিবী, প্রকৃতি, পরিবেশ, মানুষ এবং মানবসভ্যতা আজ বিপন্ন। পশু, পাখি, গাছ, জমি, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য সব কিছুই আজ বিপন্ন। এসব বিপন্নতার কারণ প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সন্ত্রাস, যুদ্ধ ইত্যাদি। কিন্তু নারী যখন বিপন্ন হয় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তখন বিশ্লেষণে জানা যায়, 'নারী' বলেই সে বিপন্ন। নারী-নিপীড়ন নানা ধরনের, কিন্তু এর একটিই কারণ: 'লিঙ্গ' পরিচয়ে সে নারী, তাই সে নির্যাতিত। প্রচলিত সামাজিক বিশ্বাস ও কুসংস্কার নারীকে 'লিঙ্গ'-র গণ্ডিতে আবদ্ধ রেখে প্রমাণ করতে চায়, নারী 'মানুষ' হিসেবে অসম্পূর্ণ। জন্মগত, শারীরিক 'লিঙ্গ' পরিবর্তন সম্ভব নয় (চিকিৎসাবিজ্ঞানে সেটাও করা যায় বলে প্রমাণিত হয়েছে)। কিন্তু নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা 'লিঙ্গ'-গত হলেও পুরোপুরি সমাজ-আরোপিত— যা সমাজের আমূল সংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তন করা সম্ভব।

উনিশ শতকে বাংলার নব জাগৃতির পথিকৃৎ রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) বাংলার সমাজসংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন সতীদাহ প্রথায় বিপন্ন নারীর সমর্থনে পদক্ষেপ দিয়ে। তথ্য সহযোগে তিনি জানালেন, সতীদাহ প্রথারও আগে থেকে পরিবারে-সমাজে নারী নির্যাতিত হয়ে আসছে। তাঁর মতে, সংসারে একজন নারী একাধারে রাঁধুনি, শয্যাসঙ্গিনী এবং বিশ্বস্ত গৃহরক্ষী মাত্র। তাঁর ভাষায়, "...বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধঅঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন,... স্বামীর গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্যবৃত্তি করে..."।[১] সেই সঙ্গে তিনি নারীর প্রতি সহিংসতার মূল চিত্রটি তুলে ধরে বললেন, অর্থনৈতিকভাবে অন্যের ওপর নির্ভরশীল বলেই নারী সমাজে অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকছে। তাঁর মতে, স্বাবলম্বী হওয়ার মধ্য দিয়েই নারী বিপন্নতা থেকে মুক্ত হতে পারবে।

কিন্তু, বাস্তবে তা ঘটেনি, স্ব-নির্ভর নারীও বিপন্ন এই পৃথিবীতে, শুধুমাত্র নারী বলেই। আমরা এখানে দৃষ্টি দেব বাঙালি নারীর অবস্থা ও অবস্থানের দিকে। বাঙালি নারী (বাংলাদেশে-ভারতে, দেশে ও প্রবাসে) একদিকে আকাশচারী, মহাশূন্যচারী, ক্ষমতায়িত,

রাজনীতিজ্ঞ, রাষ্ট্রশাসক, অর্থনীতিবিদ, প্রশাসক, ব্যবসায়ী, অধ্যাপক, শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিক, সংস্কৃতি-শিল্পী, লেখক, গবেষক, ডাক্তার, প্রযুক্তিবিদ ইত্যাদি আরও বহু পরিচয়ে সম্মানিত, অন্যদিকে জানা-অজানা হাজার রকমের নিপীড়নে তারা ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত এবং বিপন্ন। নারী নির্যাতনের এই ভয়াবহ সহিংসতা আজ মানবাধিকারের সামনে এক প্রবল হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই, ইতিবাচক এবং সফল নারীদের বিষয়ে লেখার জন্য কলম যখন তৈরি, তখনই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল সহমরণের চিতায় নিহত নারী থেকে শুরু করে এই দুই শতক ধরে নির্যাতিত-নিপীড়িত-বিপন্ন নারী ও মেয়ে শিশুরা। বাঙালি নারীর সাফল্যের ইতিহাসে শোনা যাচ্ছে উৎপীড়িত নারীদের আর্ত কণ্ঠ। দৃষ্টি সেদিকেই ঘুরে গেল। কলম ভরে উঠল তাদেরই রক্তের কালিতে।

দুই

প্রথমেই উনিশ শতকের চিহ্নিত নারী-নিপীড়ন তথা 'সতীদাহ'র প্রসঙ্গ। একটা সময় ছিল যখন বাঙালি হিন্দু নারী স্বামীর চিতায় সহমরণে বাধ্য হত। তবে বাল্যবিবাহ যেহেতু হত বয়োবৃদ্ধ পুরুষের সঙ্গে, তাই এদের নারী নয় বালিকা বলাই শ্রেয়। ঐতিহাসিক গবেষকেরা বলেন, খুব প্রাচীনকালে ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায় আর্য জাতির মধ্যে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং সম্ভবত অনার্যদের কাছ থেকেই এই প্রথা আর্য সমাজে এসেছিল। পঞ্চনদ প্রদেশের তক্ষশিলা অঞ্চলে গ্রিকদের প্রভাবের প্রমাণ আছে। খ্রিস্টের তিন-চারশো বছর আগে সে সব জায়গায় সতীদাহ বেশি হত বলে জানা যায়। এবং ইতিহাসের প্রাচীনতম নথীভুক্ত সতীদাহর ঘটনাটি ৩১৬ খ্রিস্টাব্দের, আলেকজান্ডারের ভারত-অভিযানের সময়কার।[২] এরপর, প্রধানত আঠারো শতকে হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সতীর স্বর্গলাভের কথা বলে, স্বর্গলাভের প্রলোভন দেখিয়ে সমাজে এই প্রথা চালু হয়। ইহলোক-পরলোকে পতিই নারীর সব— ধর্মের এ ধারণাও এই প্রথা প্রচলনের জন্য কার্যকর ছিল। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের প্রবল চাপের মধ্যে অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক নিপীড়ন সহ্য করার শক্তি ও ক্ষমতা ছিল না বালবিধবাদের। ফলে পরের সিদ্ধান্তেই এদের সহমৃতা হতে হত।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ১৮২৯ পর্যন্ত প্রায় ৭০ হাজার সতীদাহ হয়েছে। সে সময়ের সরকারি হিসাবে জানা যায়, ১৮১৫ থেকে ১৮১৮-র মধ্যে কম পক্ষে ২৩৬৫ জন বিধবাকে স্বামীর চিতায় জীবন্ত দাহ করা হয়েছে। কলকাতা ও আশপাশের এলাকাগুলিতে এই সতীদাহের সংখ্যা ছিল ১৫২৮টি। ১৮১৫-২৩ সালের মধ্যে সতীদাহের ঘটনায় ৫১২৮ জন বালক-বালিকা পিতৃহীন মাতৃহীন হয়েছিল। বাংলাদেশে সে সময় যত সতীদাহ হয়েছিল তার সাত ভাগের এক ভাগই হয়েছিল হুগলিতে।[৩] ১৮২০-র আগে ঢাকায় (বর্তমানে বাংলাদেশের রাজধানী) সতীদাহ হয়েছে অনেক। গরিব শ্রেণির বিধবারাই সহমরণে যেতেন বেশি।[৪] আবার, সে সময়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলাতে সহমরণ হয়েছে সর্বাধিক।[৫]

হিন্দু ধর্মের সতীদাহ প্রথা ও অন্যান্য সামাজিক ধর্মীয় অনুশাসনের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য পাঠান ও মুঘল শাসনকালে বহু নারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। মুঘল শাসন আমলে সতীদাহ নিবারণের কিছু কিছু চেষ্টাও হয়।[৬] উনিশ শতকের শুরু থেকেই সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সমাজে তীব্র আলোড়ন দেখা দেয় এবং আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরি হিন্দু শাস্ত্রের সহমরণ বিরোধী অংশগুলো ব্রিটিশ শাসকদের কাছে তুলে ধরেন ১৮০৫ সালে। ১৮১৩-তে হাউস অব কমন্স-এ সতীদাহ সমস্যা নিয়ে প্রথম আলোচনা শুরু হয়।

সমাচার দর্পণ পত্রিকায় ১৮১৮, ১৮১৯, ১৮২৩ ও ১৮২৭ সালে কয়েকটি নৃশংস সতীদাহ-র ঘটনা প্রকাশিত হয়। একটি খবর এখানে উল্লেখ করা যায়: "...সহমৃতা স্ত্রী যতবার চিতা হইতে উঠিয়া পালাইতে যায় ততবার সিপাহী তাহাকে ধরিয়া চিতায় ফেলিয়া দেয়। তখন তিন-চারিজন সাহেব লোক বিবেচনা করিল যে এই স্ত্রীর নিতান্ত সহমরণ যাইতে বাসনা নাই, কেবল ওই সিপাহী তাহাকে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই বিবেচনা করিয়া এক সাহেব ওই সিপাহীকে ধাক্কা মারিয়া দূরে ফেলিল ও আপনার অন্য সিপাহীরা সকল সে-স্ত্রীকে ঘেরিয়া অন্যত্র লইয়া তাহাকে বাঁচাইল" (*সমাচার দর্পণ*, ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৮১৯)।

এই নির্দয় প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন রায় তিনটি বই লেখেন: ১. *সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ* (১৮১৮), ২. *সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ—দ্বিতীয় সম্বাদ* (১৮১৯), ৩. *সহমরণ বিষয়* (১৮২৯)। সতীদাহ প্রথাকে রামমোহন রায় বলেছেন 'স্ত্রী-বধ প্রথা'। তাঁর ভাষায়, "সহগমন না করিলে তাহারা [স্ত্রীলোকেরা]-ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্ট হইবেক, এই ভয়প্রযুক্ত স্বর্গের প্রলোভন দেখাইয়া স্বামীর সহিত তাহারদের আয়ুঃশেষ" করা হয়। সংসারে নারীর 'দাস্যবৃত্তি'র হৃদয়বিদারক বিবরণ দেবার পর রামমোহন এই বর্বর প্রথার 'প্রবর্ত্তক'দের উদ্দেশে লেখেন, "...দুঃখ এই, যে এই পর্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।"[৭]... ইয়ং বেঙ্গল-এর নেতা হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। 'সতীদাহ নিবারণ আইন' প্রণীত হয় ১৮২৯ সালে। সতীদাহ বন্ধের আইন পাশ বাংলার নারীমুক্তির ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ডিরোজিও এই ঘটনারই পরিপ্রেক্ষিতে লর্ড বেন্টিঙ্ক এবং রামমোহন রায়কে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ১৮২৯ সনে On the Abolition of Suttee শিরোনামে একটি কবিতা লেখেন। সতীদাহ নিবারণ আইনের জন্য তাঁর আনন্দ প্রকাশ করেছেন ডিরোজিও: "...Hark! heard ye not? the widow's wail is over;/No more the flames from impious pyres ascend,/See Mercy, now primeval peace restore"...[৮]

তিন

সতীদাহ নিবারণ আইন হল, তো শুরু হয়ে গেল বিধবা নির্যাতন। যদিও সতীদাহ প্রথাই ছিল মূলত বিধবা-দাহ! তবু সতীদাহ থেকে বেঁচে যাওয়ার পর আশা ছিল বিধবা মেয়েটি হয়তো নির্যাতন থেকে বাঁচবে, বিপন্ন হবে না। কিন্তু বাস্তবে সেটা হল না। কুলীনদের মধ্যে সতীর (অর্থাৎ সতীদাহ প্রথার শিকার) সংখ্যা হুগলি জেলায় বেশি ছিল। হুগলির গুড়াপের 'সটীদাহ' গ্রাম-নাম তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। সতীদাহ নিবারণ আইন-পরবর্তী বিপন্ন বিধবাদের সংকটও সেই হুগলি জেলাতেই উনিশ শতকে মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিয়েছিল।

বস্তুত, বিধবা-নির্যাতন, বাল্য বিবাহ, কৌলীন্য, বহু বিবাহ, পণপ্রথা ক্রমান্বয়ে এবং পরস্পর যুক্ত হয়েই বিপন্ন করেছিল নারীকে। ১৭ শতকে এখানে শুরু এবং ১৮-১৯ শতকে মহামারি রূপে তার বিস্তার ঘটতে থাকে। একুশ শতকেও এর বিনাশ ঘটেনি বাংলাদেশ ও ভারতের বাঙালি মুসলিম-হিন্দু সমাজে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক গবেষণা গ্রন্থে সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "সংবাদপত্রে প্রকাশিত এমন চিঠিও দেখা গেছে যাতে কোনও বিধবা এই বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েও জীবনের অশেষ দুর্ভোগের কথা বলে 'সতীদাহ'কেই কামনা করে বসেন। এখনও বৈধব্য অভিশাপ, এখনও বিধবা বিবাহকে ভাল চোখে দেখা হয় না সমাজে। এখনও গর্বের সঙ্গে বলতে পারি না সতীর মতো বর্বর অমানবিকতাকে ধুয়ে মুছে দিয়েছি আমরা সমাজ থেকে।"[৯]

হিন্দু বিধবাদের বিয়ের সমর্থনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫০ সালে *সর্বশুভকরী* পত্রিকায় 'বাল্যবিবাহের দোষ' প্রবন্ধে লিখেছিলেন: "বিধবার জীবন কেবল দুঃখের ভার। এবং বিচিত্র সংসার তাহার পক্ষে জনশূন্য অরণ্যাকার।... পতিবিয়োগ দুঃখেরসহ সকল দুঃসহ দুঃখের সমাগম হয়।"[১০] কৈলাসবাসিনী দেবী *হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা* বইয়ে (১৮৬৩ সালে প্রকাশিত) লিখেছেন, "আহা যখন নিদাঘকালে বিষম একাদশী দিবসে ইহারা দুঃসহ পিপাসায় আকুল হইয়া চাতকীর ন্যায় চঞ্চল হয়েন তখন ইহাদিগকে দর্শন করিলে অতি কঠোর হৃদয় ব্যক্তিরও দয়ার সঞ্চার হয়।" ১৮৭০ সনে *বামাবোধিনী* পত্রিকার এক সম্পাদকীয়তে 'হিন্দু বিবাহ' বিষয়ে লেখা হয়: " 'দরিদ্র দেখিয়া যদি দয়া হয় মনে/বিধবার সম আর নাহি ত্রিভুবনে'— আমাদিগের বিধবাগণের একটি নামই দুর্ভাগা, সুতরাং তাহাদের ভাগ্য যে দুর্ভাগ্যপূর্ণ তাহা বলা বাহুল্য।"

বিধবা বালিকা থেকে তরুণী ও বয়সি নারীদের জীবন উনিশ শতকে কতখানি বিপন্ন হয়ে উঠেছিল তা জানা যায় সরকারের কাছে পাঠানো বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন আবেদনপত্র এবং *অমৃতবাজার পত্রিকা*-র প্রতিবেদন থেকে। এই সকল আবেদনপত্র ও প্রতিবেদনে বলা হয় যে, বিধবা নারীদের ওপর পরিবারের দুর্বৃত্ত পুরুষের অনাচারের দুর্ভোগ তাদেরকে এতটাই বিপন্ন করেছিল যে, বিধবারা হয় গর্ভপাত করাতে, আত্মহত্যা করতে, না হয় বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। ১৮৫৩ সালে কলকাতার প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটের দেওয়া প্রতিবেদনে জানা যায় যে, সে সময়ে কলকাতায় ১২,৪১৯ জন পতিতার মধ্যে হিন্দু নারী ছিল ১০,০০০ জন।[১১] ১৮৬৭ সনের হিসাবে এই সংখ্যা

হয়েছিল ৩০,০০০-এর বেশি।[১২] ১৮৬৯ সালে *অমৃতবাজার পত্রিকা*-য় প্রকাশিত তথ্যে জানা যায় যে, হিন্দু পতিতা নারীর শতকরা নব্বই ভাগই ছিল বিধবা।[১৩]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সাল থেকেই বিধবা নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বা সামাজিক কদর্য অনাচারের তীব্র প্রতিবাদে বলেছেন, "...যাবৎ এই শুভকরী প্রথা [বিধবা বিবাহ] প্রচলিত না হইতেছে, তাবৎ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণ হত্যা পাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্য যন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাকিবেক...?" (বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, ১৮৫৫)।[১৪] নানা তথ্য থেকে জানা যায় যে, তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগর, বারাসত, কলকাতা, শান্তিপুর, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বর্ধমান এবং তৎকালীন পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও অন্যান্য অঞ্চল থেকেও বিধবা বিবাহের সমর্থনে সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছিল।[১৫] ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় গভর্নর জেনারেল স্বাক্ষর করে বিধবা বিবাহের আইন পাশ করেন।

কিন্তু আইন হলেও বাঙালি হিন্দু সমাজে তা সাদরে গৃহীত হয়নি। বিধবা বিবাহ যাঁরা করতেন ও উৎসাহ দিতেন তাঁরা সামাজিক ভাবে নির্যাতিত হতেন। দুর্গামোহন দাস (১৮৪১-১৮৯৭) ছিলেন সমাজ সংস্কারক, ঢাকা ও বরিশালের সরকারি উকিল। বরিশালে তাঁর চেষ্টায় প্রথম দুটি বিধবা বিবাহ হওয়ার পর তিনি সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত হন।[১৬]

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবা বিবাহ ধর্মসম্মত ও সমাজসম্মত হলেও বালবিধবাদের ওপর সামাজিক নিগ্রহ চলত এবং বিধবার বিয়ে বাস্তবে খুব কমই হত। মুসলিম বিধবাদের বিয়ের পক্ষে পূর্ববঙ্গের যশোহরের সাহিত্যিক মোহাম্মদ মেহেরুল্লা (১৮৬১-১৯০৭) বিশেষ প্রচেষ্টা চালিয়ে বাস্তব পদক্ষেপ নিয়েছেন। *বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ-ভাণ্ডার* (১৮৯৪) এবং *হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা* (১৮৯৮, ২য় সং) বই দুটিতে মুসলিম ও হিন্দু সমাজের নিন্দা করেছেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আইনের (১৮৫৬) প্রশংসা করেছেন। *বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ-ভাণ্ডার* বইয়ের উপক্রমণিকায় তিনি লিখেছেন: "কেবল হিন্দু গৃহেই যে বিধবাদিগের প্রতি নিগ্রহ, এমত নহে। এই বিশাল বঙ্গের নদীয়া, হুগলি, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জেলা সমূহের স্থান বিশেষে হিন্দুগত প্রাণ মুসলমান নামধারী বহুতর মিঞা সাহেবদিগের গৃহে, এখনও অসংখ্য তরুণ বয়স্কা বিধবা রমণী অসহ্য বৈধব্যানলে দগ্ধীভূত হইতেছে। বিধবা বিবাহ না হওয়াতে উক্ত স্থানসমূহে কত ব্যভিচার, গর্ভপাত, নরহত্যা এবং পবিত্র মুসলমান নামে কলঙ্ক-কালিমা প্রলেপিত হইতেছে, কে তাহার সংখ্যা নিরূপণ করিবে?... আমি বিবিধ উপায়ে বিধবা হৃদয়ের বিষাদোক্তিসমূহ যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা সরল, সহজ এবং সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করিতে যথাশক্তি প্রয়াস পাইলাম।"[১৭]

সাম্প্রতিক কালে ভারতের হিন্দু বিধবাদের চরম দুর্দশা ও লাঞ্ছনার বহু তথ্য দিয়ে অমর্ত্য সেন জানিয়েছেন যে, ভারতে প্রায় সাড়ে তিন কোটি বিধবা আছেন— যা দেশের মোট নারী জনসংখ্যার আট শতাংশ। তিনি আরও তথ্য দিয়েছেন যে, বিধবাদের এই সংখ্যা

ভারতের মোট শ্রমিক সংখ্যার প্রায় সমান। উনিশ শতকে 'বিধবা বিবাহে'র উদ্যোগ ছিল সে যুগের বিধবাদের বালিকা ও তরুণী বয়সের বাস্তব বিপন্নতার সমাধান। একুশ শতকে বিধবারা অধিকাংশ প্রবীণা, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা কম বিপন্ন নন। নারীদের প্রতি লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার তথ্যভিত্তিক সমীক্ষায় অমর্ত্য সেন জানিয়েছেন যে, ভারতের জাতিধর্ম-নির্বিশেষে প্রবীণা বিধবাদের মৃত্যুহার প্রবীণা সধবাদের তুলনায় প্রায় ৮৬ শতাংশ বেশি। অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক নির্যাতনের শিকার হন বিধবা নারীরা। তিনি আক্ষেপ করে লিখেছেন যে, ধর্ষণ বা 'সতীপ্রথা' নিয়ে সাম্প্রতিক কালে সোচ্চার প্রতিবাদ জানানো হলেও যুগ যুগ ধরে চলে আসা বিধবাদের লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ খুবই কম।[১৮] অমর্ত্য সেনের গবেষণাতুল্য সমীক্ষা বাংলাদেশে হয়েছে বলে জানা নেই। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বাজেটে বাংলাদেশের সরকারি উদ্যোগে গত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে 'বার্ধক্য ভাতা'-র ব্যবস্থা চালু রয়েছে। বর্তমান বাজেটে (২০০৭) এই ভাতার অর্থ জন প্রতি ২১০ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। ৭ লক্ষ ভাতা-প্রাপ্ত প্রবীণের মধ্যে বিধবার সংখ্যাই বেশি। তাদের প্রতি দেশ-জাতি এবং পরিবারের সন্তান-পরিজনদের অবহেলা বাংলাদেশেও ধর্মনীতি-নির্বিশেষে বিধবাদের চরম লাঞ্ছনার শিকার করছে।

চার

উনিশ শতকের বাংলায় নারীনিগ্রহের ঘটনাগুলো সতীদাহ, বিধবাগঞ্জনা ও নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, কন্যাবিক্রয়, কন্যাপণ, বরপণ, বহুবিবাহ ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় ঘটত, যার কারণ ছিল হিন্দু সমাজের কৌলীন্যপ্রথা ও মুসলিম সমাজের বংশআভিজাত্য।

ভারতকোষ-এ সংকলিত কৌলীন্যপ্রথার বিবরণী থেকে জানা যায়, প্রধানত হিন্দু ব্রাহ্মণ সমাজের ব্যবস্থা হিসেবে কৌলীন্যপ্রথার সূচনা হয়েছিল। কিন্তু কায়স্থ ও বৈদ্য বাঙালি সমাজেও তা প্রচলিত ছিল। কুলীন অর্থাৎ সমজাতীয় অন্যান্য বংশ ও পরিবার থেকে উঁচু এবং সম্মানিত বংশে ছেলে ও মেয়ে বিয়ে দেওয়ার শর্ত প্রাচীনকালে কৌলীন্যের মানদণ্ড ছিল। অকুলীন মেয়েকে কুলীন ব্রাহ্মণ বিয়ে করার ধর্মীয়-সামাজিক অনুমোদন পেলেও, কুলীন মেয়ের বিয়ে অকুলীন পাত্রের সঙ্গে দেওয়ার অনুমোদন দেয়নি ধর্ম ও সমাজ। এ রকম বিয়ের অপরাধে মেয়ের বাবার কৌলীন্য ভঙ্গ হত। কুলীন মেয়ের কৌলীন্য রক্ষায় বহু বিধিনিষেধ জারি হয়েছিল, যার ফলে একতরফা ভাবে নারীনিগ্রহই ঘটত।[১৯]

কুলীন পাত্রের খোঁজে কুলীন মেয়ের বাবার উদ্বেগ ও হয়রানির ব্যাপক ঘটনা সমাজে, সাহিত্যে, সাময়িক পত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই সংকটের সুযোগে কুলীন ব্রাহ্মণেরা বিয়েতে টাকা দাবি করতে থাকে। অকুলীন ও কুলীন মেয়ে বিয়ে করে টাকা-পণ-যৌতুক পাওয়ার লোভে ব্রাহ্মণদের শিশু, বালিকা-কিশোরী বয়সের একাধিক বা (২০ থেকে ১০০ এবং আরও বেশি সংখ্যক) বহু বিবাহ সামাজিক রীতি হয়ে দাঁড়াল। কুলীন বাবা, ভাই ও অন্য পুরুষ আত্মীয়েরা পুণ্যের লোভে বৃদ্ধ, পঙ্গু, বহু বিবাহিত, অর্থপিশাচ কুলীন পাত্রের সঙ্গে পরিবারের শিশু কন্যা বা বোনদের বিয়ে দিতেও দ্বিধা করত না। বিয়ের পর ঠিকানা

মিলিয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বহু-বিবাহকারীরা নিয়মিত টাকা আদায় করত, যা ছিল তাদের জীবিকা বা পেশা। বিয়ে যেনতেন প্রকারে দিয়ে কুলীন অভিভাবক— বাবা, ভাই ও পরিবারের অন্যরা 'বোঝা' স্বরূপ মেয়েগুলির দায় মিটিয়ে দিত। মেয়েরা লাঞ্ছিত হত, ঝি-গিরি করত কিংবা অন্ধকারে হারিয়ে যেত জীবিকার অন্বেষণে। কুলীন বহুবিবাহের ঐতিহাসিক উপাদান থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নারীনিগ্রহের এ-জাতীয় নানান চিত্র পাওয়া যাবে। সমাজে পুরুষেরই অধিকার ছিল এক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও একাধিক বিয়ে করার। অন্য দিকে, হিন্দু-মুসলিম বাঙালি নারীর ক্ষেত্রে এক বিয়েই শাস্ত্র-ধর্ম-সমাজ ও আইনসম্মত। মুসলিম নারী যদিও স্বামীর মৃত্যুর পর বিয়ে করতে পারত, কিন্তু বিধবার জন্য পুনর্বিবাহ উনিশ শতকের পরও সমাজে মর্যাদা পায়নি। এ প্রসঙ্গে সামাজিক বাস্তবতা হল, একুশ শতকে বাংলাদেশ ও ভারতে বিধবা কিংবা স্বামী পরিত্যক্ত নারীদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ না হলেও সন্তানদের ভবিষ্যৎ-ভাবনা ও তাদের প্রতি ভালবাসার মাতৃত্ববোধ থেকেই প্রধানত নারীরা পুনর্বিবাহ করে না।

বাংলাদেশে সন্তানের অভিভাবকত্ব আইনে বিধবা বা বিচ্ছেদপ্রাপ্ত মুসলিম মায়ের অধিকার শর্তসাপেক্ষে প্রযোজ্য। আইনে আছে যে, কন্যাসন্তান বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত (বিয়ের পর জামাই মেয়ের অভিভাবক) এবং পুত্রসন্তান আট বছর পর্যন্ত মায়ের তত্ত্বাবধানে থাকবে যদি মা পুনর্বিবাহ না করেন। অর্থাৎ মা সন্তানের অভিভাবক নন, 'জিম্মাদার বা তত্ত্বাবধায়ক' মাত্র। এই আইনের শর্তে সন্তান হারানোর আশঙ্কায় বাংলাদেশের মুসলিম বিধবা বা বিচ্ছেদপ্রাপ্ত নারীরা পুনর্বিবাহের কথা ভাবতে দ্বিধা করেন। বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মুসলিম সমাজের এই বিপন্ন নারীদের জন্য পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র বা নারী আন্দোলন বাঁচার কোনও সুরাহা করতে পারছে না, আইনি সংস্কারও করা যাচ্ছে না। সামাজিক-ধর্মীয় অনুশাসন নারীকেই বিপন্ন করছে সব চাইতে বেশি।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হিন্দু নারীদের অধিকারের জন্য তো প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে চলে আসা ঐতিহ্যবাহী শাস্ত্রীয় বিধান ছাড়া কোনও রাষ্ট্রীয় আইন প্রযোজ্য নয়। 'পারিবারিক আদালত ১৯৮৫' আইন অবশ্য ধর্মনির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্যই রয়েছে। কিন্তু ধর্মীয়-সামাজিক অনুশাসনের বেড়াজাল থেকে হিন্দু বা অন্য ধর্মাবলম্বী নারীরা বাংলাদেশের 'পারিবারিক আদালত ১৯৮৫' আইনের দ্বারস্থ হতে সাহসী হন না।

একই ভাবেই বলা যায়, পশ্চিমবাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু নারী আইনি অধিকারের বলে সামাজিক-পারিবারিক বহু বঞ্চনা-নির্যাতন যথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সন্তানের অধিকার না পাওয়া, সম্পত্তিতে অধিকার না পাওয়া, বরপণের অত্যাচার, বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার না থাকা ইত্যাদি থেকে অন্তত আইনি মুক্তির আশ্বাস পেয়েছে। কিন্তু সংখ্যালঘু মুসলিম নারীদের নির্যাতন-বঞ্চনা দূর হয়নি। সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়গত বাধায় রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

এই প্রসঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র আয়োজিত কর্মশালার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য: "...নারী নির্যাতনের পেছনে

বিবাহ-উত্তরাধিকার-সম্পত্তির অধিকারজনিত যে-সব পারিবারিক আইনব্যবস্থা চালু আছে [সেই] আইনগুলি ['ব্যক্তিগত আইন বা 'Personal Laws'] বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর কুক্ষিগত— এই অর্থে এগুলি 'ব্যক্তিগত', অর্থাৎ ফৌজদারী আইনের মতো গোষ্ঠী ধর্ম নির্বিশেষে সব নাগরিকের প্রতি প্রযোজ্য নয়।... যে ধর্মীয় গোষ্ঠীতে তার জন্ম হয়েছে, সেটিই মোটামুটি নিয়ন্ত্রণ করে তার পাওয়া এবং বঞ্চনার টানাপোড়েন।... মুসলিম পারিবারিক যে আইন ভারতবর্ষে চালু আছে, কয়েকটি ক্ষেত্রে তা অন্যান্য ব্যক্তিগত আইনের তুলনায় নারীদের পক্ষে সুবিধাজনক হলেও, তার কোনও কোনও বিধানে এখানকার মুসলিম মেয়েরা মোটেও সন্তুষ্ট নন।... আইন ব্যবস্থার মধ্যেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ টিকে থাকে।"[২০] একই চিত্র পাওয়া যাচ্ছে বাংলাদেশেও।[২১]

অবশ্য, দুই দেশের ভোটের রাজনীতিও নারীর অধিকার খর্ব করছে সবিশেষ। আগেই বলা হয়েছে, প্রতিবেশী ও 'সার্ক'-সদস্যভুক্ত বাংলাদেশ-ভারতের দুই ভূখণ্ডে বাঙালি মুসলিম ও হিন্দু নারীর অধিকার অভিন্ন নয়। অর্থাৎ, ভারতের হিন্দু নারীর জন্য ধর্মীয় অনুশাসনের যে সব প্রগতিমূলক সংস্কার হয়েছে, সে সব সংস্কার বাংলাদেশের হিন্দু নারীর ক্ষেত্রে হচ্ছে না। হিন্দু ধর্মের বিধান দুই দেশে দুই রকম অনুশাসন চালাচ্ছে শুধুমাত্র সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু নাগরিকের রাজনৈতিক পরিচয়ের সুবাদে। একই ভাবে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম নারীরা ধর্মীয় অনুশাসনের উন্নত সংস্কারের ফলে যে সকল প্রগতির অধিকার পাচ্ছে তেমন অধিকার ভারতের বাঙালি মুসলিম নারীদের জন্য সেখানকার পরিবার-সমাজ-ধর্মীয় নেতারা এবং রাষ্ট্র দিতে অসম্মত। ফলে, সীমান্তের দুই ধারে বাঙালি মুসলিম ও হিন্দু নারী একই ভাবে সুবিধাবাদী রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার কারণে বিপন্ন হচ্ছে।

অন্য দিকে এটাও সত্য যে, আইনি অধিকার লাভ করলেও নারীর এই বিপন্নতা ভারত, বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে অব্যাহত। তবু, আইনি অধিকার নারীর ন্যায়বিচার পাওয়ার একটি হাতিয়ার। নারীর প্রতি সহিংসতা যে অন্যায়, অপরাধ— সেই স্বীকৃতি ঘোষিত হয় নারীর আইনি অধিকারে। সে জন্য আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বহু বাধা সত্ত্বেও নারীর আইনি অধিকারের দাবি এবং বাস্তবায়নের আন্দোলন সক্রিয় রয়েছে উনিশ শতকের সতীদাহ প্রথার যুগ থেকে একুশ শতকের কন্যাভ্রূণ-হত্যার যুগ পর্যন্ত।

নারীর বিপন্নতা-সৃষ্টিকারী যে-সমস্ত সামাজিক অনুশাসন, বিধিবিধান, সামাজিক-ধর্মীয় প্রথা উনিশ শতকে প্রকট সহিংস রূপ নিয়েছিল সেগুলোর কোনও কোনওটার হিংস্রতা সময়ের সঙ্গে কমে আসে। কোনওটা আবার অন্যরূপে নারীর জীবনকে নিপীড়িত করে তুলল, নারীর জীবনধ্বংসী চেহারায় নতুন ভাবে আত্মপ্রকাশ করল বিশ শতকে। একুশ শতকেও তার দাবানলে নারী পুড়ে মরছে বাংলা জুড়ে— বাংলাদেশে এবং পশ্চিমবাংলায়— দুই স্বাধীন দেশের ভূখণ্ডে।

বস্তুত, ১৭-১৮-১৯ শতকের নারী নিপীড়নের বিবিধ সুপরিচিত অনুষঙ্গের কোনও একটিও কি বিশ শতকে এবং এই একুশ শতকের সাম্প্রতিক সময়ে নেই বলে নিশ্চিত হওয়া যায়? না, তেমন কোনও সুখবর পাওয়া যাচ্ছে না। সতীদাহ প্রাচীন রূপে নেই,

স্বামীর চিতায় বাঙালি সতীর সহমরণের ঘটনা এখন ঘটছে না, কিন্তু স্বামী-শ্বশুরবাড়ির পণের দাবিতে বধূ অত্যাচার এবং আগুনে, অ্যাসিডে, বিষ খাইয়ে বধূহত্যার ঘটনা তো এখন প্রতিনিয়ত ঘটছে, যা সতীদাহের চাইতে কম নিষ্ঠুর, কম বর্বর, কম নৃশংস নয়। নাম বদল হয়ে সতীদাহ হয়েছে বধূহত্যা। মুসলিম নারীর সতীদাহ (কিছু বিছিন্ন ঘটনার নজির বাদ দিলে) হত না, কিন্তু পণের দাবিতে মুসলিম নারীকেও একই ভাবে নিহত হতে হচ্ছে নানান দাহ্যপদার্থের অনলে। কৌলীন্যপ্রথার কুফল হিসেবে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ সেই কোন যুগে বাংলার নারীর জীবনকে দুর্বিষহ করা শুরু করেছিল, আজও তার বিনাশ ঘটেনি।

পাঁচ

বহুবিবাহ (এক স্ত্রী থাকা অবস্থায় আরও বিয়ে) হিন্দু সমাজে কীভাবে ভিত্তি গড়ে নিয়েছিল তা কৌলীন্যপ্রথা, বরপণপ্রথা ইত্যাদির ইতিহাস থেকে জানা যায়। হিন্দুধর্মীয় বংশকৌলীন্য সংকট থেকে উৎসারিত বহুবিবাহের কদর্যরূপ হিন্দু নারীর জীবন বিপন্ন করেছে যতদিন না ভারতের নারী বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার পেয়েছে বিশ শতকে। কিন্তু বাংলাদেশের হিন্দু নারীর এই অধিকার নেই। তাই স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সেখানে পুরুষের বহুবিবাহের নিপীড়ন সহ্য করতে হয় অসহায় গরিব নিরক্ষরই শুধু নয়, শিক্ষিত নারীকেও।

বাংলাদেশের এবং ভারতের মুসলিম পুরুষের বহুবিবাহ শর্তসাপেক্ষে আইনি অনুমোদিত। সকল স্ত্রীর সঙ্গে সমান মর্যাদা, ভালবাসা ও ব্যবহারের শর্তে একের অধিক বহুবিবাহের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের 'পারিবারিক আইন ১৯৬১'-তে শর্ত আছে যে, প্রথম স্ত্রী সম্মতি দিলে স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে এবং এভাবেই পরপর স্ত্রীদের অনুমতি নিয়ে চার বিয়ে পর্যন্ত 'বহুবিবাহ' করতে পারবে। এই আইন স্বামীর স্বার্থরক্ষা করছে। শতকরা ৯০ ভাগ বিপন্ন-পরনির্ভর বিবাহিত নারী সন্তান, সম্মান (বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে সমাজ-পরিবারের চোখে তাদের সম্মানহানি ঘটে), নিরাপত্তা (নির্যাতিত হলেও ঘরের আশ্রয়ই তখন নিরাপত্তার বলয়)— এ সবের কথা ভেবে স্বামীর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বিয়ের অনুমতি দিতে বাধ্য হয়। যারা প্রতিবাদ করে, তাদের হত্যা করা হয়, নির্যাতন করে অনুমতি নেওয়া হয় অথবা স্ত্রীর অনুমতি ছাড়াই স্বামী বহুবিবাহ করে। পারিবারিক সংস্কৃতিতে গত বিশ শতকের সত্তরের দশক পর্যন্ত সতীন নিয়ে ঘর করা, সতীনদের বোন বলে মেনে নেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে মুসলিম নারী অভ্যস্ত ছিলেন। বাংলাদেশের মুসলিম পরিবারে 'চার বিয়ে' এখন তেমন হয় না, কিন্তু তা সত্ত্বেও চলতি আইনটি স্বীকৃতি দিচ্ছে যে পুরুষের বহুবিবাহ চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। শিক্ষিত, স্বনির্ভর নারী বাংলাদেশের মুসলিম 'পারিবারিক আইন ১৯৬১'-র বিধানের ফলে একুশ শতকেও চরম বিপন্ন। হিন্দু ধর্মাবলম্বী নারীরাও নিজ নিজ ধর্মীয়-সামাজিক বিধানের ফলে (যেহেতু বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিবাহ বা পারিবারিক আইন নেই) একই ভাবে বহুবিবাহের দাবানলে বিপন্ন। বাংলাদেশের অন্যান্য জাতিসত্তার আদিবাসী নারীরাও বিপন্ন, কেন না 'বিয়ে ব্যবস্থা'টাই সামগ্রিক ভাবে নারীবান্ধব নয়।

বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ সমাজের, দেশের, সব মানুষের (পুরুষসহ) জীবনকেই বিপন্ন করে— এ কথা উনিশ শতক থেকে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন লেখায়, ভাষণে, কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বলেছেন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, আবুল ফজল, মোতাহার হোসেন, কাজী নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ নাসিউদ্দিন, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, রাসসুন্দরী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, আশাপূর্ণা দেবী, সুফিয়া কামাল প্রমুখ হাজার হাজার কবি, সাহিত্যিক, সুধীজন, দেশ ও জাতির বরেণ্য ব্যক্তি। তাঁদের রচনাবলী পাঠে যুক্তি-নির্ভর প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নারীসমাজকে নিপীড়িত, নির্যাতিত করে এই প্রথাগুলো শুধু দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীর ক্ষতি করছে না, পুরো জনগোষ্ঠীর জীবনকেই বিপন্ন করছে। যার ফলে অন্যান্য পার্থিব প্রগতির সূচক বাড়লেও মানবিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রগতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ছয়

বাল্যবিবাহ নারীর শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে দেয় না। বালিকা বধূর পক্ষে স্বাস্থ্য ও জীবনহানিকর হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবার পুনর্বিবাহ আন্দোলনের সময় (১৮৫০) থেকেই বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য বহু লেখালেখি ও তর্ক উত্থাপন করেছেন এবং কার্যকরী আইন প্রণয়নের দাবি তুলেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারমূলক প্রথম প্রবন্ধ *বাল্যবিবাহের দোষ* (১৭৭২ শক)। তাঁর আগে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৪২ ও ১৮৪৫ সালে লিখেছেন বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে।

বাল্যবিবাহ সে যুগে ছেলেমেয়ে উভয়েরই হত এবং উভয়েই দাম্পত্য জীবনে অসুখী হত। এমনকী সহবাস-সংকট বালিকা স্ত্রীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাত। কলকাতার হরিমোহন মাইতি তার বালিকা স্ত্রী ফুলমণির সঙ্গে জোরপূর্বক সহবাস করার কারণে স্ত্রীর মৃত্যু হয় (১৮৯৯)। এই ঘটনার ফলে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ৫৫ জন চিকিৎসক তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য মহারানি ভিক্টোরিয়ার কাছে আবেদন করেন। মেয়েদের বিয়ের বয়স ১২, ১৪ বা ১৬ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দাবি উঠতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ প্রগতিশীল ব্যক্তি 'সহবাস-সম্মতি আইন' প্রণয়নের জন্য সামাজিক আন্দোলন শুরু করেন।

অন্য দিকে বালগঙ্গাধর তিলক এ বিষয় নিয়ে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধিতা করতে থাকেন। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকেও বিরোধিতা শুরু হয়।[২২] পূর্ববঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দু মুসলিম প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সহবাস-সম্মতি বিলের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন। ১৮৯০ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এই বিষয়ে প্রথম প্রতিবাদ সভায় জগন্নাথ কলেজের সে সময়ের প্রিন্সিপাল কুঞ্জলাল নাগ এবং দ্বিতীয় সভায় বহু মুসলিম জমিদার, আইনজীবী ভাষণ দেন। তাঁরা বলেছিলেন, প্রস্তাবিত আইনে উল্লিখিত মেয়েদের বয়স-পরীক্ষার সুযোগ নিয়ে ডাক্তার ও পুলিশেরা তাদের সম্মান নষ্ট করবে বলে আশঙ্কা থেকে

যায়। এ বিষয়ে জমিদার সৈয়দ গোলাম মোস্তাফা, কবি কায়কোবাদ, মৌলবি মকবুল আলী, মুন্সী মহিউল্লাহ প্রমুখ বিরোধিতা করলেও নবাব আহসানউল্লাহর নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার মুসলিমদের বৃহত্তর অংশ এই বিলের পক্ষে মত দিয়েছিল।[২৩] পক্ষে বিপক্ষে তর্ক-বিতর্কের পর ১৮৯১ সালের মার্চ মাসে 'সহবাস-সম্মতি-আইন' গৃহীত হল। বাল্যবিবাহ বন্ধের আইন শেষ পর্যন্ত লাগু হয়েছিল ১৯২৯ সালে। পূর্ববঙ্গের মানিকগঞ্জের বউথা গ্রামে বিখ্যাত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রামশংকর সেনের মেয়ে মোহিনীদেবী (১৮৬৩-১৯৫৫) তাঁর শিক্ষক রামতনু লাহিড়ী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের প্রেরণায় বাল্যবিবাহ বন্ধ করার কাজে যোগ দিয়েছিলেন।[২৪]

সাত

অল্প কথায় বলার নয় নারী-নিপীড়নের এই জ্বলন্ত ইতিবৃত্ত। তবু সংক্ষেপে আরও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক তথ্য এখানে উল্লেখ করা যায়:

১. উনিশ শতকের ৩০টির বেশি বাংলা-ইংরেজি পত্র-পত্রিকায় কৌলীন্যপ্রথা এবং তার কুফল, সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, অকাল বৈধব্য, পণপ্রথা বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে জনমত প্রচারিত হয়েছে।[২৫]

২. কুলীন জামাইরা স্ত্রীদের ও সন্তানদের প্রতিপালন করাকে কৌলীন্য-হানিকর মনে করে শ্বশুরের ওপর সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিত। ফল মেয়ের বাবাকে বংশানুক্রমে অর্থ ব্যয় করে মেয়ে-জামাই ও তাদের সন্তানদের প্রতিপালন করতে হত। কৌলীন্য প্রথার জন্য বরপণের দাবি পূরণ করতে গিয়ে মেয়ের বাবা গরিব হয়েছেন।[২৬]

৩. পূর্ব বাংলার *ঢাকা প্রকাশ*-এ ১৮৭০-১৮৮৮ পর্যন্ত প্রকাশিত সংবাদ ও চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে, কৌলীন্য মর্যাদার দাম হিসেবে বিয়েতে প্রচুর পরিমাণে পণ, আনুষঙ্গিক অনেক যৌতুক, বিয়ের যাবতীয় খরচের জন্য নগদ টাকা, শ্বশুরের কাছ থেকে বছর বছর যৌতুকের অর্থ ও দানসামগ্রী পাওয়ার লোভে কুলীন পাত্ররা বহুবিবাহ করত। পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরের 'চন্দ্রকালী নাম্নী কুলীন কন্যার' স্বামী প্যারীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 'বাসনারূপ অর্থ' না পাওয়ায় বিয়ের পর কখনও শ্বশুরবাড়ি যাননি ও স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেননি।[২৭]

৪. পূর্ববঙ্গের সিলেট অঞ্চলে বহুবিবাহের বেনামে দাসী ক্রয় প্রথা চালু ছিল। ধনবান লোকেরা পণ দিয়ে গরিব কুলীন বা অকুলীন মেয়েদের বিয়ে করে বা কিনে এনে বাড়ির দাসীবৃত্তিতে লাগিয়েছেন, স্ত্রীর মর্যাদা দেননি। অনেকে ৫, ১০, ১৫ জনকে কন্যাপণ দিয়ে বিয়ে করে কিনে এনে 'পালুয়া জামাই' সংগ্রহ করে নিজের স্ত্রীদের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন।[২৮]

৫. ভদ্র, শিক্ষিত অকুলীন পরিবারেও কন্যাদায়-সংকট তীব্র রূপ নেয়। এম এ, বি এ, এল এ পাশ পাত্রদের ভিন্ন ভিন্ন বাজারদর ছিল। 'পাশ' করার কৃতিত্ব 'কুলীন' মর্যাদা পেত।[২৯]

৬. ১৮৯২ সালে *ইসলাম প্রচারক* পত্রিকায় 'সমাজ ও কালিমা' শীর্ষক রচনার বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, মুসলিম সমাজেও শরাফতি অর্থাৎ কৌলীন্যের সূত্রে পাত্রপক্ষ বরপণ দাবি করতে শুরু করেছে। পূর্ববাংলার বরিশাল জেলার মুসলিম শরীফ সমাজের "হীনচেতা

শরীফ মহোদয়গণ কৌলীন্য মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য, নীচ শ্রেণির মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে বা কৃষক শ্রেণির লোকের কন্যা গ্রহণ করিবার সময় 'বিবাহের পণ' দাবি করিয়া বসেন।... ত্রিশ চল্লিশ টাকা হইতে দুশো-পাঁচশো বা হাজার টাকা পর্যন্ত একটি মেয়ে বা ছেলের দর হইয়া থাকে। এই রূপ ব্যবসায় মুসলমান ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।"[৩০]

৭. বিশ শতকে আরও উগ্রতার সঙ্গে বরপণের চাহিদা বাড়তে থাকে। যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে বিশ শতকের প্রথম প্রতিবাদী বাঙালি শহিদ স্নেহলতা (১৯০০-১৯১৪)। অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কীর্তিনাশা নদীর তীর ঘেঁষা গ্রাম দক্ষিণ বালিচাড়া ছিল স্নেহলতাদের আদি নিবাস। ১৯১১ সালের পর তাঁর বাবা হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলকাতা থেকে ছেলেদের পড়ানো ও মেয়ের বিয়ের খোঁজ করছিলেন। পাত্রপক্ষের দাবি ৮০০ টাকা নগদ ও ১২০০ টাকার অলংকারের ব্যবস্থার জন্য বসতবাড়ি বন্ধক রাখতে চাওয়ায় বাবা ও ভাইদের আশ্রয়হীন না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে স্নেহলতা নিজে শাড়িতে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করে ১৯১৪ সালে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯১ সনে *দেনাপাওনা* গল্পে পণলাঞ্ছিত নিরুপমার অকালমৃত্যু দেখিয়েছেন। স্নেহলতা কি সেই গল্প পড়েছিল? জানা নেই। তবে 'স্নেহলতা'র আত্মাহুতির খবর পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। *স্ত্রীর পত্র* (১৯১৪) গল্পে পণলাঞ্ছিত বিন্দুর (পাগলের সঙ্গে বিয়ে হয় পণ না দিতে পারা বিন্দুর) আত্মাহুতির ঘটনায় স্নেহলতার ছায়া পড়েছে। স্নেহলতার আত্মাহুতি সারা বাংলার বুদ্ধিজীবী, প্রগতিকামী, চিন্তাবিদ পুরুষদেরও তীব্রভাবে নাড়া দিয়ে ভাবতে বাধ্য করেছে বিপন্ন নারীদের জন্য আন্দোলন বিষয়ে।[৩১]

আট

সন্দেহ নেই, সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ কিংবা পণপ্রথা রদের বিবিধ আইন একদিকে নারী জীবনের বিপন্নতা মোচনে সামাজিক-রাষ্ট্রিক পদক্ষেপের সীমিত সাফল্য প্রমাণ করেছে। পাশাপাশি, এত সব আইনকানুন হওয়ার পরও, হরেক কিশিমের নারীনির্যাতন, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বধূহত্যা ইত্যাদির পরাক্রম এই একুশ শতকেও কিছু মাত্র কমেনি। বরং তা সাক্ষ্য দিচ্ছে, নারীসমাজের বিপন্নতার মূল কারণ পিতৃতান্ত্রিক-পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই গভীরে, এবং একটি দুটি বিচ্ছিন্ন আইনি অধিকারে তা দূর হতে পারে না। কার্যত— বৈষম্যমূলক, শোষণমূলক ও নিপীড়নমূলক যে-সমস্ত আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, বিধান, সংস্কার, আইন, নিষেধাজ্ঞা ও ফতোয়া নিরন্তর চাপিয়ে চলেছে সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র, প্রশাসন, প্রচার মাধ্যম, ধর্মজীবী সম্প্রদায় এবং ব্যক্তি— তাদের মূলোৎপাটন ছাড়া নারীর বিপন্নতা আদৌ ঘুচবার নয়।

পরিবার, সমাজ, ব্যক্তি, প্রশাসন ও রাষ্ট্র যেন এক অচলায়তনের মতো নারীজীবনের বিকাশ, আনন্দ, প্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ, শিক্ষা ও জীবিকার ক্ষেত্রে, সংস্কৃতিচর্চায়, স্বনির্ভরতা অর্জনে, সম অধিকার প্রতিষ্ঠায়, জাতীয়-আন্তর্জাতিক বৈষম্য দূরীকরণে কিংবা মানবাধিকার আন্দোলনে সম-অংশগ্রহণে প্রগতিবাদীদের এ যাবৎ সাফল্য বিস্তর। কিন্তু তাতেও আশানুরূপ কমছে না চিরন্তন লিঙ্গ-বৈষম্য ও নিপীড়ন।

ঘরে বাইরের সেই হাজার এক ধরনের নারীনিপীড়নের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা ভারত ও বাংলাদেশ থেকে এখানে দেওয়া যায়। তবে, বলাই বাহুল্য, তালিকার একটিতে উল্লিখিত কোনও নিপীড়ন অন্যটিতেও অনায়াসে সংযোজিত হতে পারে।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর রিসার্চ ২০০২-এর প্রতিবেদনে এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশনের প্রকাশনায় (২০০৬) নারী ও শিশু কন্যা নির্যাতনের সাম্প্রতিক চেহারাটি এই রকম: • ব্যভিচারিণী বলে গৃহবধূকে প্রতিবেশীরাও অত্যাচার করে • ডাইনি আখ্যা দেওয়া হয় • পরিবারের অমতে বা অন্য ধর্মে বা বংশে বিয়ে করলে মেয়েটিকে হত্যা করা হয় • পণ-অত্যাচার বাড়ছেই • মেয়েদের পথে-ঘাটে উত্ত্যক্ত করা হয় • ফতোয়া, হিল্লা বিয়ে চলছে • কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি ঘটে • পরিবারের মধ্যে শিশুকন্যা থেকে বয়স্ক নারী যৌন হেনস্থার শিকার হয় • কন্যাভ্রূণ বা নবজাতিকা হত্যা 'সমাজে মেয়ে অবাঞ্ছিত'—এটা প্রমাণ করছে।[৩২]

অন্য দিকে, বাংলাদেশের সিডও (CEDAW/Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) ও বেইজিং কর্মপরিকল্পনা (Beijing Platform for Action 1995) সংক্রান্ত এনজিও কোয়ালিশনের (এন সি বি পি) প্রতিবেদন (২০০৬)-এও আছে নারীনিপীড়নের আরও কিছু বর্বর ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ: পারিবারিক নির্যাতন অর্থাৎ পরিবারের ঘনিষ্ঠ সদস্য কর্তৃক শারীরিক, মানসিক, যৌন নির্যাতন, যৌতুকের জন্য স্ত্রীকে মারধর ও অত্যাচার, হত্যা, স্ত্রী-ধর্ষণ, অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ, বিপজ্জনক গর্ভপাত ইত্যাদি • জনসমক্ষে নির্যাতন যথা রাস্তাঘাটে কটূক্তি, পর্নোগ্রাফি বাণিজ্য, অ্যাসিড নিক্ষেপ, নারী পাচার, ফতোয়া-নির্যাতন, গণধর্ষণ, নারী হত্যা, মোবাইল ফোনে ফটো তোলা ও লাঞ্ছনা • আদিবাসী বা কোনও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাদের নারীদের ওপর নির্যাতন • পুলিশের নিরাপদ হেফাজতে ধর্ষণ • গার্মেন্টস কারখানায়, অফিস-আদালতে জীবিকার স্থায়িত্বের লোভ দেখিয়ে যৌন হয়রানি • পুরুষের প্রেম নিবেদন নাকচ করলে নারীর ওপর অত্যাচার, শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের পর পুরুষ বিয়ে করতে অসম্মত হলে বিপন্ন মেয়েটির আত্মহত্যা ইত্যাদি।

উপরন্তু, নতুন নতুন জবাবদিহিতার প্রশ্নেও নারীর জীবন আজ জর্জরিত ও ক্ষতবিক্ষত:

• তুমি কেন কালো হলে • পাত্র কেন পছন্দ করে না • অরক্ষণীয়া হয়ে কেন বাবা-মায়ের পরিবারের বোঝা হচ্ছ • তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে টাকা খরচ করেছি, আবার বিয়েতেও যৌতুক দিতে হবে কেন • বিয়ের পর স্বামী কেন আনন্দ খুঁজতে পর নারীতে আকৃষ্ট হয় • *শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদ-পরিজনদের মন জুগিয়ে চল না কেন* • সন্তান হয় না কেন • ছেলের মা হতে পারছ না কেন • কন্যাভ্রূণ হত্যা করতে চাচ্ছ না কেন • চাকরি পাচ্ছ না কেন • পথে-ঘাটে নিরাপত্তার জন্য তোমার সঙ্গে পাহারাদার লাগে কেন • শালীন পোশাক পর না কেন • তোমাকে উত্ত্যক্ত করে কেন ছেলেরা • পথে-ঘাটে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, অফিস-আদালতে, ট্রেনে-ট্রামে-বাসে-লঞ্চে-বিমানে আলাদা টয়লেট, আসন, বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থাদি করতে হয় কেন • অন্তঃসত্ত্বাকালীন বিশেষ কয়েক মাস ছুটি সবেতন দিতে হয় কেন

• কর্মক্ষেত্রে সন্তান রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে হবে কেন • শ্রমজীবী-পেশাজীবী-কর্মজীবী যদি হলেই, তবে পুরুষের তুলনায় অন্য বিশেষ ব্যবস্থা কেন দিতে হবে • নাজুক শক্তি-মেধা-বুদ্ধি সত্ত্বেও পুরুষের সমান বেতন-মজুরি চাও কেন • বাইরে কাজ করছ— রোজগার করছ, তাই ঘরের কাজ একা করবে না বা স্বামীর ৫০ ভাগ কাজ দাবি কর কেন • সংসারে, পেশায়, রাষ্ট্রীয় নীতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে ভূমিকা রাখতে চাও কোন সাহসে • পারিবারিক আইনে স্বামীর সমান অধিকার চাও কেন • লিঙ্গ বৈশিষ্ট্যই নারীকে ধর্ষিত-লাঞ্ছিত-ভোগ্যপণ্য করেছে— সেক্ষেত্রে লিঙ্গ-বৈষম্য বা জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশান বলে সোচ্চার হচ্ছ কেন • একচেটিয়া ভাবে রাজনীতি-অর্থনীতি-শাসন ব্যবস্থায়-প্রচার মাধ্যমের মালিকানায়-পরিচালনায়, পার্লামেন্টে, প্রশাসনিক উঁচু পদে, সংসারের কর্তৃত্বে, ধর্ম-সংস্কৃতির পুরোধা হিসেবে লেখক-সাংবাদিক-সমালোচক পরিচয়ে, পুরুষ এবং পুরুষতান্ত্রিকতার ক্ষমতার রাজত্বে তোমরা কেন সমান অংশীদারিত্ব চাইছ • পুরুষ নও অথচ বাবার সম্পত্তির অংশ ভাইয়ের সমান দাবি করছ কেন • বৈধব্য বা বার্ধক্যের সময় পরিবারের সন্তানেরা বিমুখ হলে রাষ্ট্রের ওপর দায়িত্ব দাও কেন • নাগরিক তৈরি করছ এটা কোনও রাষ্ট্রীয় কাজ হবে কেন • জন্ম শাসন করছ না কেন ইত্যাদি।

প্রতিনিয়ত এই রকম আরও যত প্রশ্ন নারীকে বিপন্ন করছে তা শুধু লিখলেই হাজার পাতার বই হয়ে যাবে। তা ছাড়াও, সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র, আইন-আদালত, প্রতিষ্ঠান, সালিশি সভা ইত্যাকার বহু স্থানেও নারীকে নানা ভাবে 'কাঠগড়ায়' দাঁড়াতে হয়, সাক্ষ্য দিতে হয়। ধর্ষণের মামলায় (যে-ঘটনায় ধর্ষিতা নারীই একমাত্র সাক্ষী) সাক্ষী আনার জন্য তাকেই বলা হয়, পারিবারিক নির্যাতনের বিষয়েও সাক্ষী আনতে বলা হয় তাকে (অথচ শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতিত বধূ সাক্ষী পাবে কোথায়?)। বৈষম্য ও শোষণের জাঁতাকলে বিপন্ন নারীকে প্রতিনিয়তই হারিয়ে যেতে হচ্ছে পরিবার থেকে, সমাজ থেকে, রাষ্ট্রীয় তথ্য থেকে।

অমর্ত্য সেন এই জ্বলন্ত সামাজিক সমস্যাটিকেই বলেছেন 'gender inequality' বা 'লিঙ্গ ভিত্তিক অসাম্য'। *মিসিং উইমেন* শীর্ষক এক গবেষণাপত্রে (ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল, ১৯৯২, মার্চ) তিনি দেখিয়েছেন যে, মহিলারা নিখোঁজ, কারণ পক্ষপাতদুষ্ট লিঙ্গ-বিচারের জন্য তারা স্বাস্থ্য পরিষেবার যত্ন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা থেকে বঞ্চিত।[৩৩]

একুশ শতকে এই নিখোঁজ নারীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে 'কন্যাভ্রূণ হত্যা'র মধ্যে। আলট্রাসোনোগ্রাফ পরীক্ষা করে সন্তানসম্ভবা নারীর ভ্রূণের লিঙ্গনির্ধারণ এবং 'মেয়ে' চিহ্নিত হলে তা নষ্ট (অ্যাবর্শন) করার ঘটনা ভারতে আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে বলে তথ্য মিলছে। 'মেয়ে জন্মই পাপ'— এই সামাজিক ধ্যানধারণা নারীর বিপন্নতা বাড়িয়ে দিচ্ছে 'ভ্রূণ' হত্যার মাধ্যমে। মেয়েকে শিক্ষা দেব না, স্বনির্ভর করব না, মেয়ের জন্য খরচ করব না (কেন না, মেয়ে তো বিয়ের পরে পরের ঘরে যাবে), মেয়েকে পৈতৃক সম্পত্তি দেব না (কেননা, যৌতুক দিতেই নিঃস্ব হতে হবে) এ-জাতীয় সামাজিক মানসিকতা থেকে বাংলাদেশেও 'মেয়েসন্তান জন্ম' দেওয়া নারীর মাতৃত্বের অপরাধ হিসাবে গণ্য হয়। তবে বাংলাদেশে ভ্রূণ চিহ্নিত করা ও হত্যা (অ্যাবর্শন) করা রাষ্ট্রীয় ভাবে নিষিদ্ধ। চিকিৎসকদের

নৈতিক সচেতনতাও এখানে যথেষ্ট। ভারতেও আইনত ভ্রূণ চিহ্নিত-করণ এবং 'মেয়ে ভ্রূণ' হত্যা দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু অনৈতিকতা ও দুর্নীতির পথে 'কন্যাভ্রূণ হত্যা' অহরহই ঘটে চলেছে। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন বাংলার 'কন্যা বিসর্জন' প্রথার নৃশংসতার কথা মনে পড়ে যায়।

নয়

জাতিসংঘ আয়োজিত 'বিশ্ব নারী সম্মেলন'-এর দীর্ঘ তিন দশকের ইতিহাসে, নানান ঘোষণা পত্রে নারীর অধিকার, মুক্তি ও মর্যাদার প্রশ্নে কিছু বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেগুলি হল— শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, অর্থনীতির বাস্তবায়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধ, মানবাধিকার, পরিবেশ, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় (পরিবার-সমাজ-প্রশাসন-রাষ্ট্র পরিচালনায়) নারী ও পুরুষের সমতা, প্রচারমাধ্যম-তথ্য প্রযুক্তি, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য রাষ্ট্রীয় আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ। একই সঙ্গে অত্যন্ত জরুরি বিবেচিত হয়েছে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক সংগঠনের একতাবদ্ধ পদক্ষেপ।[৩৪]

বোঝাই যাচ্ছে, এই একুশ শতকের নারী শুধু নারী বলেই সর্বত্র নিপীড়িত। তবে এ কথাও স্বীকার করে নেওয়া দরকার যে, নারীসমাজের অবস্থান পুরুষসমাজের নীচে কিংবা নারীর নির্যাতক ও নিপীড়কের চেহারাটা পুরুষের হলেও ব্যক্তিপুরুষ বা পুরুষসমাজ নয়, বিশ্বব্যাপী রক্ষণশীল, পুরুষ-আধিপত্যপূর্ণ, পিতৃতান্ত্রিক বা পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, সমাজ কাঠামো, রাষ্ট্রব্যবস্থা, আইন, সংবিধান, দৃষ্টিভঙ্গি— এ সবই নারীর বিপন্নতার মূলে। পুরুষ এবং নারী উভয়েই ব্যক্তি হিসেবে এই পুরুষতান্ত্রিকতার অভিঘাতে জর্জরিত। পুরুষ ও নারীর মিলিত শক্তিই এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে পারে।

গত শতকের গোড়ায় রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) বলেছিলেন, "আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কি রূপে? কোনও ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কত দূর চলিবে? পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে— একই। জগতের যে সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহারা উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতে চলিয়াছেন। আমাদের উচিত যে, তাহাদের সংসারের এক গুরুতর বোঝা বিশেষ না হইয়া আমরা সহচরী সহধর্মিণী ইত্যাদি হইয়া তাহাদের সহায়তা করি।..."[৩৫] এবং ওই শতকেরই শেষ দশকে অমর্ত্য সেন লিখেছেন: "কিছু দিন আগে পর্যন্ত... প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল স্ত্রীজাতির প্রতি উন্নততর ব্যবহার ও যথার্থ আদান-প্রদান।... নারীরা এখন আর পরোক্ষ-কল্যাণবৃদ্ধিকর সাহায্য গ্রহণ করে না। পরিবর্তে পুরুষ এবং নারী উভয়ই স্ত্রী জাতির পরিবর্তনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত আর এভাবেই এক গতিশীল সামাজিক বিবর্তনের দ্বারা নারী এবং পুরুষ উভয়েরই জীবনে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে।"[৩৬]

সুতরাং, নারী আজও বিপন্ন। তার প্রতি সহিংসতা এই একুশ শতকেও প্রবলভাবে বিরাজ করছে। সেটা যেমন নিষ্ঠুর সত্য, তেমনি বাস্তব সত্য এটাও যে এ থেকে মুক্তির জন্য জরুরি রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রক্রিয়ায় নারীর যুক্ত হওয়া, নেতৃত্ব দেওয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি সেই লক্ষ্যে নারী ও পুরুষের সচেতন, সমন্বিত এবং আন্তরিক প্রয়াস।

বিনয়ভূষণ রায়

ঊনবিংশ শতকের স্ত্রীশিক্ষার একটি ধারা: অন্তঃপুর শিক্ষা

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশে মেয়েদের সামাজিক অবস্থান ছিল নিতান্তই হীন। 'মেয়ের নাম ফেলী/পরে নিলেও গেলি/যমে নিলেও গেলি'— এ রকমের অসংখ্য বাংলা প্রবচনের মধ্যে মেয়েদের প্রতি সমাজের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত। মেয়েদের কোনও বৌদ্ধিক গুণাবলী নেই এবং তারা লেখাপড়া শেখার অযোগ্য এই ধারণাই ছিল সর্বজনগ্রাহ্য।

পাশ্চাত্য প্রভাবেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণির মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটায়। পাশ্চাত্য উদারনীতিবাদ ও যুক্তিবাদের আলোয় সামাজিক মূল্যবোধগুলির পুনর্মূল্যায়নের সূত্রেই মেয়েদের সামাজিক অবস্থানের উন্নয়ন এবং সেই উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হিসাবে স্ত্রীশিক্ষার বিষয়টি উনিশ শতকীয় সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে মান্যতা পায়।

স্ত্রীশিক্ষাকে প্রথম থেকেই পুরুষদের শিক্ষা থেকে পৃথক করে দেখার জন্য স্ত্রীশিক্ষার বিষয়টি নিয়ে সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র সহ বিভিন্ন মুদ্রিত গণমাধ্যমে, বিভিন্ন সভা-সমিতিতে প্রবল বিতর্ক শুরু হয়। মূলত তিনটি প্রশ্নকে ঘিরে বিতর্ক আবর্তিত হয়েছিল— (ক) স্ত্রীশিক্ষার আদৌ কোনও প্রয়োজন আছে কি না? (খ) যদি প্রয়োজন থাকে তা হলে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অনুসৃত হবে? (গ) স্ত্রীশিক্ষার বিষয়বস্তু কী হওয়া উচিত?

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে রক্ষণশীল বঙ্গসমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আপত্তির কারণগুলির চমৎকার তালিকা রয়েছে *সর্বশুভকরী* পত্রিকায় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'স্ত্রী-শিক্ষা' প্রবন্ধে।[১] সেগুলি হল—

(ক) 'শিক্ষা কর্ম্মের উপযোগিনী যে সকল মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির আবশ্যক স্ত্রী জাতির তাহা নাই।'

(খ) 'স্ত্রী জাতির বিদ্যাশিক্ষার ব্যবহার এদেশে কখনও নাই... অতএব লোকাচার বিরুদ্ধ...।'

(গ) 'স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষা করিলে দুর্ভাগ্য দুঃখ ও পতিবিয়োগ দুঃখে চিরকাল... জীবনযাপন করিবে।'

(ঘ) 'স্ত্রী জাতি বিদ্যাবতী হইলে স্বেচ্ছাচারিণী ও মুখরা হইবেক।'

(ঙ) 'বিদ্যার অহঙ্কারে মত্ত হইয়া গুরুজনকে অবজ্ঞা করিবেক।'

(চ) 'পরিশেষে স্বয়ং পতিত হইবেক।'

'অতএব স্ত্রী জাতিকে সর্ব্বথা অজ্ঞানান্ধকূপে নিক্ষিপ্ত রাখাই উচিত।'

সমাজের মানসিকতা বদলে এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রগুলির ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে (বাংলা ১ মাঘ, ১২৬৩) *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায় 'স্ত্রীশিক্ষা তথা বিধবাবিবাহ' সম্পর্কে একটি রচনা প্রকাশিত হয়। *সমাচার চন্দ্রিকা*-র বিরোধী যুক্তিকে খণ্ডন করে ১৮৪৯ সালের মে মাসে *সংবাদ প্রভাকর* যে সংবাদ প্রকাশ করে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

"বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলে ব্যভিচার সংঘটনের শঙ্কা আছে, ...ঠাকুর দাদার মনে এমত শঙ্কা কেন হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, রক্ষকেরা ভক্ষক হইলে অতিশয় ভয়ের বিষয় বটে, কিন্তু তাহার স্থল আছে, পাত্র আছে। পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া ভয়ই কেন করেন; তবে তাঁহার 'মনের ভাব, পেটের কথা' ইহাতে ভয়ের কারণ থাকিলে করিতে পারেন, তাঁহার সেই কারণের কার্য্য বারণের বাধ্য হইবেক না। ...দাদা মহাশয় যে ভয় করেন তাহা মিথ্যা, অতএব বার্ধক্যকালে সৎকর্ম সাধনে কেন আর বাধা দেন, স্থির রূপে বিবেচনা করিলে ইহাতে অনেক উপকার দেখিতে পাইবেন, এবং যদি না পান, তবে বলুন, আমরা চক্ষে ধরিয়া দেখাইব।"[২]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা-য় ১৭৯৮ শক, জ্যৈষ্ঠ ৩৯৪ সংখ্যায় রাধাকান্ত দেবের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' সম্পর্কে প্রকাশিত আলোচনায় একদিকে যেমন রামায়ণ ও মহাভারতের নীতিশিক্ষার উল্লেখ করা হয়, অন্যদিকে তেমনি বলা হয় যে, "গৃহস্থ রমণীদিগের পাক বিদ্যা যেমন জানা কর্ত্তব্য তেমনি গার্হস্থ্য চিকিৎসাবিদ্যা জানা কর্ত্তব্য।"

'স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রী বিদ্যালয়ে স্ত্রী নিবাস' প্রবন্ধে (ফাল্গুন, ১৮০২ শক, ৪৫১ সংখ্যা) বলা হয়, "অহোরাত্রি বিদ্যালয়ে থাকিয়া অবাধে বিদ্যাচর্চা। আমরা এইটুকুরও বিরোধী। কারণ বালিকাদিগের পিতামাতার নিকট থাকাতেই বিশেষ উপকার। ইহারা গৃহে থাকিয়া যে সমস্ত শিক্ষা পায় বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর অধীনে কখনই তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে না।"

চৈত্র ১৮০২ শক ৪৫২ সংখ্যায় প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে বলা হয়, "প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য স্ত্রী-হৃদয়ের কোমল ও মহৎ বৃত্তি সকলের পরিচালনা, উৎকর্ষ ও পরিপুষ্টি সাধন। ...স্ত্রী-হৃদয়ের উন্নতি সংসাধন ও সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি করাই প্রকৃত স্ত্রী-শিক্ষা-প্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে।"[৩]

ঢাকা প্রকাশ পত্রিকাতে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে বলা হয় "কলিকাতা ঢাকা প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান স্থান ভিন্ন আজিও অনেক স্থলের অধিকাংশ লোকই স্ত্রীশিক্ষার ঘোরতর বিদ্বেষী দৃষ্ট হইল... প্রাচীনদিগের মনে এই একটি কুসংস্কার বদ্ধমূল রহিয়াছে, স্ত্রীলোকেরা কিন্তু পুরুষের ন্যায় চাকুরী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবে না, সুতরাং তাহাদিগের লেখাপড়া শিখাইয়া কাজ কি?"

'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা ও খৃষ্টানগণ' সম্পর্কে *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় বলা হয়— "নানা প্রকার অন্যায়করণে মিশনারীরা কলঙ্কিত হইতেছেন। তাহাদের প্রতি লোকের বিশ্বাস নাই... অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষাদি বিষয়ে তাঁহাদের দ্বারা যে কিছু উপকারের সম্ভাবনা ছিল তাহারা সে পথে কন্টক নিক্ষেপ করিতেছেন। তাহাদের দুর্ব্ব্যবহারে এ দেশের লোক অনেক চটিয়াছেন।"[৪]

কানপুর থেকে কোনও একজন মহিলা *সোমপ্রকাশ*-এর সম্পাদকের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে লিখিত পত্রে অভিমত জ্ঞাপন করেন, "এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের যেরূপ অবস্থা তজ্জন্য তাহাদিগকে বাল্যাবস্থায় শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কেননা দশম বর্ষ উত্তীর্ণ হইলেই তাহাদের বিবাহ হয় তদবধি তাহারা গৃহিণী হইয়া গৃহধর্মে নিযুক্ত হয় এবং তৎকালে তাহাদের সুবিধা ও অবকাশ দুইয়ের সম্পূর্ণরূপে অভাব হইয়া উঠে।"[৫]

সোমপ্রকাশ-এর মতে নিম্নলিখিত কারণগুলিই স্ত্রীশিক্ষার প্রধান অন্তরায়। যেমন—

(ক) "এদেশের পুরুষেরাও অদ্যাপিও ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। সুতরাং যাঁহারা এদেশীয় অবলাগণের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ও তাঁহারা যখন স্বয়ং সিদ্ধ হইতে পারিলেন না, তখন অন্যকে কেমন করিয়া সিদ্ধ করিবেন?"

(খ) "বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকাতে বালিকারা অধিক দিন বিদ্যালয়ে থাকিয়া শিক্ষা পায় না। সুতরাং অল্পবিদ্যা বিশেষ ফলোপধায়িণী হয় না।"

(গ) "অল্প বেতনের লোকদ্বারা শিক্ষাকার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় না, দুর্ভাগা বালিকাগণের অদৃষ্টে প্রায় তাহাই ঘটিয়া উঠে। ইহা সামান্য প্রতিবন্ধক নয়।"

(ঘ) "অল্পমাত্র শিখিতে ২ বালিকাদিগকে শ্বশুরালয়ে গমন করিতে হয়। সেখানে গিয়া গৃহকার্য্যে এমন ব্যাপৃত থাকিতে হয় যে পূর্ব্বে যে কিছু শিক্ষালাভ হয় তাহা বিস্মৃতিসাগরে মগ্ন হইয়া যায়। বিশেষতঃ এদেশে জাত্যভিমান ও বিবাহ প্রণালীগত দোষ থাকাতে প্রায় অনেকেই উপযুক্ত পাত্রের হস্তগত হয় না, সুতরাং তৎকালে আলোচনার অভাবে তাহার বিবাহের পূর্ব্বে যে যৎকিঞ্চিত শিক্ষা হয়, তাহা বৃথা হইয়া যায়।"

(ঙ) "অনেকে ইউরোপীয় স্ত্রীগণকে বিদ্যাবতী দেখিয়া এদেশীয় স্ত্রীগণের প্রতি ঘৃণা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাদিগের ইহা মনে করা উচিত ইউরোপে আমাদিগের দেশের ন্যায় প্রত্যেক বাটীতে পাকশাকের ব্যাপার নাই। তথাকার লোক প্রায় সকলেই হোটেল হইতে খাদ্য আনাইয়া আহার করে। সমাজের গুণে অনেক বিষয়ে সুবিধা আছে। এখানে সে সকল সুবিধা নাই, জাত্যভিমান প্রবল থাকাতে সে সকল সুবিধা হইবারও অনেক বিলম্ব আছে।"[৬]

বামাবোধিনী পত্রিকার মতে স্ত্রীশিক্ষার প্রধান অন্তরায় হল:

(ক) বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য বিষয়ে ভ্রম। (খ) বাল্যবিবাহ। (গ) স্ত্রী-শিক্ষকের অভাব। (ঘ) আন্তরিক যত্নের শিথিলতা।

বামাবোধিনী-র মতে, "বিদ্যাশিক্ষার অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশ্য নহে। বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য মহৎ। ঈশ্বর প্রদত্ত মনোবৃত্তি সকল উজ্জ্বল ও উন্নত করা এবং তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারা বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য।" বাল্যবিবাহ সম্পর্কে *বামাবোধিনী*-র অভিমত হল "বাল্যকালে বিবাহ

হইয়া অনেকেই শীঘ্রই পুত্রবতী হইয়া পড়েন। সুতরাং বিদ্যাশিক্ষা আরও প্রতিবন্ধক হইয়া উঠে। রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা না করিয়া অল্প পরিমাণে শিক্ষা লাভ করিলে যেরূপ অশুভ ফল লাভ হয় ইহাদিগের দ্বারাও সেইরূপ হইয়া থাকে।" *বামাবোধিনী*-র বিবেচনায় 'স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য স্ত্রীশিক্ষকই আবশ্যক।' কারণ 'স্ত্রীশিক্ষক না হইলে স্বজাতীয় অভাব অনুসারে আর কেহ শিক্ষা দিতে পারেন না।' একমাত্র 'স্ত্রীশিক্ষক দ্বারা অনেক প্রকারে উন্নতি হইতে পারে।' স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য দেশীয় ব্যক্তিবর্গের আন্তরিক যত্ন ও প্রয়াসের দাবিও *বামাবোধিনী* ব্যক্ত করে।[৭]

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধীয় বিতর্কে অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। বাল্যবিবাহের কারণে প্রকাশ্যভাবে বিদ্যালয়ে বেশি দিন লেখাপড়ার সুযোগ মেয়েদের ছিল না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য অন্তঃপুর শিক্ষার আশু প্রয়োজন অনুভূত হয়। এ ব্যাপারে খ্রিস্টান মিশনারি সোসাইটিগুলি প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের মিসেস হানা মার্শমান-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য যিনি গোপালচন্দ্র মল্লিকের মতো স্থানীয় মানুষদের সহযোগিতায় শ্রীরামপুর অঞ্চলে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ মিশনারিদের স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টাকে সন্দেহের দৃষ্টিতেই দেখত। ফলে তাদের 'জেনানা মিশন' সফল হয়নি।

তবে মিশনারীদের জেনানা মিশনের কর্মকাণ্ডে আকৃষ্ট হয়ে ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ থেকে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার কাজ শুরু হয়। এ ব্যাপরে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। ১৮৭০ সালের ১৩ মে ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার অন্তরায়গুলি নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। ভারতবর্ষের স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য ইংল্যান্ডে একটি সভা স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। মেরি কার্পেন্টার তাঁর এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। ১৮৭০-এর ২৪ মে অন্য আর একটি সভায় ভারতের প্রতি ইংল্যান্ডের কর্তব্য বিষয়ে কেশবচন্দ্রের আলোচনায় কেবলমাত্র পুরুষদের শিক্ষা দেবার সরকারি নীতি কীভাবে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পাথর্ক্যের সৃষ্টি করে সুখী পরিবারের কল্পনা অবাস্তব করে তুলেছে সেই বিষয়টি উঠে আসে। ১৫ জুন বাত শহরের একটি সভায় তিনি বলেন যে ভারতীয় মা ও স্ত্রীদের শিক্ষা দিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সামাজিক কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্তি পাবে।[৮] এই সভায় তিনি আরও বলেন যে স্ত্রীলোকদের শিক্ষা দিতে একমাত্র শিক্ষিকারাই সক্ষম। সুতরাং দেশীয় মহিলাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে এই কাজের জন্য গড়ে তুলতে হবে। যেহেতু মহিলাদের সম্পর্কে পুরুষদের কোনও ধারণা নেই, সেহেতু পুরুষদের হাতে স্ত্রীশিক্ষার দায়িত্ব দিলে সাফল্যের সম্ভাবনা কম। শুধুমাত্র ইংল্যান্ডেই নয়, বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের একটি সভায় তিনি বক্তৃতা দেন যেটি পরবর্তীকালে 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব' নামে *বামাবোধিনী* পত্রিকায় (ফাল্গুন, ১২৭৭) প্রকাশিত হয়।

ইতিপূর্বে ইংল্যান্ড যাওয়ার আগেই ১৮৬৩-তে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মবন্ধু সভা স্থাপন করেন যার তিনটি বিভাগের মধ্যে একটি বিভাগ ছিল স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক।[৯] এই বিভাগ অন্তঃপুর শিক্ষার ব্যবস্থা করে। এই পদ্ধতি অনুসারে মেয়েদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হত না। বাড়িতে শিক্ষকদের কাছে পড়াশোনার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যই এই পদ্ধতির প্রয়োজন। লেখাপড়ার অগ্রগতি সম্পর্কে বছরে চার বার রিপোর্ট পাঠানোর ও বছরে দু' বার পরীক্ষা গ্রহণ করে উপযুক্ত মহিলাদের পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। বামাবোধিনী সভার পক্ষ থেকে অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। *তত্ত্ববোধিনী*-র পক্ষ থেকে প্রচারিত একটি আবেদনে বলা হয়, "বঙ্গদেশের যে যে স্থানে ব্রাহ্ম সমাজ আছে তথায় উপরোক্ত প্রণালী অনুযায়িক স্ত্রীশিক্ষা অবিলম্বে আরম্ভ হয় এই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা...।"

কলকাতার অনুকরণে বাংলার বিভিন্ন স্থানে ব্রাহ্মদের দ্বারা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হয়। প্রাণকুমার দাস ও নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় ঢাকায় 'ঢাকা অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা' স্থাপিত হয় (১৮৭০)। ঢাকাতেই কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় একটি শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপন করেন (১২৭১ সন)। 'উত্তরপাড়া হিতকারী সভা'র আদর্শে ১৮৭২-এ ময়মনসিংহে একটি অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্ম সমাজের বাইরে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয়, বরিশাল ফিমেল এডুকেশন সোসাইটি, স্ত্রীশিক্ষা বিধায়িনী (কোরহাটী), মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলনী, গৈলা ছাত্র সম্মিলনী সভা, উত্তরপাড়া হিতকারী সভা (১৮৬৩)।

হিন্দুদের তুলনায় দেরিতে হলেও এ সময় বাংলার মুসলমান সমাজেও স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন শুরু হয়। স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন করে শেখ আবদুস সামাদ মন্তব্য করেন যে, যেহেতু পিতা অপেক্ষা অল্প বয়স্ক বালক-বালিকাদের উপর মায়ের প্রভাব বেশি, সেহেতু মা যদি শিক্ষিত না হয় তা হলে তার কুসংস্কার ছেলেমেয়েদের প্রভাবিত করবে। মৌলবী ইম্‌দাদুল হক বলেন যে, মেয়েরাই মানবকুলের মাতা এবং তাদের উপরেই সমাজের উন্নতি অথবা অবনতি নির্ভরশীল।[১০] গাজী সৈয়দ আফেন্দী শাহ্ আবু মোহম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী'র মতে, পাশবিক শক্তির দ্বারা পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের শিক্ষা ও স্বাধীনতা বন্ধ করে দেওয়ায় বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভার দিক থেকে তারা পিছিয়ে আছে। মেয়েরা সুশিক্ষিত হলে পুরুষের মতো জ্ঞান, বিদ্যা, প্রতিভা ও বীরত্ব দেখাতে সমর্থ হবে এবং তাতে সমাজ উন্নত হবে। ঢাকা, শ্রীহট্ট ও অন্যান্য স্থানের শিক্ষিত মুসলমান যুবকেরা মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৮৮৩-র ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী স্থাপিত হয়। কলকাতায় বসবাসকারী শ্রীহট্টবাসী যুবকদের নিয়ে ১৮৭৬-এ কলকাতায় শ্রীহট্ট সম্মিলনী গড়ে ওঠে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েদের শিক্ষার জন্য সম্মিলনীর প্রচেষ্টায় সমগ্র সিলেট শহরে কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে অন্তঃপুরের মহিলারাও পরীক্ষা দিতে পারতেন।

সামগ্রিকভাবে স্ত্রীশিক্ষা, বিশেষত অন্তঃপুর শিক্ষার প্রসারে একটি প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল উপযুক্ত শিক্ষিকার অভাব। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে আগ্রহী জনের মধ্যে প্রচলিত ধারণা ছিল এই যে, সুগৃহিণী ও আদর্শ মা হওয়ার উপযুক্ত শিক্ষা একমাত্র মহিলারাই মহিলাদের দিতে পারেন। অথচ বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান বিবাহিতা ও বয়স্কা মহিলাদের অপরিচিত পুরুষের কাছে বিদ্যাশিক্ষায় সামাজিক বিধিনিষেধ ছিল। ব্রাহ্ম মহিলাদের মধ্যে এ ধরনের বিধিনিষেধ না থাকলেও সংখ্যার বিচারে এঁরা ছিলেন অত্যল্প। বৈরাগী সম্প্রদায়ের মহিলারা সামাজিক বিধিনিষেধের এক্তিয়ারের বাইরে থাকলেও বাংলার সর্বত্র ভদ্র সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা একই রকমের ছিল না।

স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে উপযুক্ত শিক্ষিকা গড়ে তোলার উদ্যোগ খ্রিস্টান মিশনারিরাই প্রথম গ্রহণ করেন। ১৮৫২ সালে মিসেস জে. জে. ম্যাকেঞ্জির প্রচেষ্টায় টালিগঞ্জে 'দি ক্যালকাটা ফিমেল নর্মাল স্কুল' স্থাপিত হয়। স্কুলটি পরে মধ্য কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। ১৮৫৪ সালে এই প্রতিষ্ঠানে ২০ জনেরও বেশি ছাত্রী ছিল।[১১] সরকারি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ১৮৬১-তে ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় সম্প্রদায়ের ১০ জন মহিলা সেখানে শিক্ষাদান প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতেন। শিক্ষাগ্রহণের পর কমপক্ষে তিন বছর শিক্ষকতা করবেন, ভর্তির সময় এই মর্মে তাঁদের মুচলেখা দিতে হত। এখানকার শিক্ষিকারা ৮টি হিন্দু পরিবারের অন্তঃপুর শিক্ষা দিতেন।[১২] ১৮৯০-৯১-এ স্কুলটির ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪ জন। একই সময়ে সেন্ট্রাল স্কুলের সঙ্গে দেশীয় মহিলাদের জন্য আর একটি শিক্ষিকা শিক্ষণের স্কুল খোলা হয়। নর্মাল স্কুলটির ছাত্রী সংখ্যা কম হওয়ায় পরের বছর উভয় প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করা হয়।

অন্তঃপুরের মহিলাদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৫৩ সালে মিসেস লঙ প্রতিষ্ঠিত 'ফ্রি চার্চ ফিমেল ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড অর্ফান হোম'-এর পক্ষ থেকে একটি নর্মাল ক্লাস স্থাপিত হয়। পরে এই নর্মাল ক্লাসের উন্নতি লক্ষ করে কর্তৃপক্ষ এর আসন সংখ্যা ১২ থেকে ২০ অথবা ৩০ করার সিদ্ধান্ত নেন।[১৩] অন্তঃপুরের মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে প্রয়োজনবোধে উচ্চশিক্ষিত, পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং অর্থাভাব দূর করার উদ্দেশ্যে বদান্যতার সঙ্গে অর্থ সাহায্যের আবেদন এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়। ১৮৯০-৯১ থেকে ফ্রি চার্চ নর্মাল স্কুলকে সরকার উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের পর্যায়ভুক্ত করে। সেই সময় থেকে এখানকার শিক্ষার্থীদের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার পাঠ দেওয়া হত।

দেশীয় মহিলাদের শিক্ষার জন্য শিক্ষিকার অভাব মেটাতে মিসেস মেরি কার্পেন্টার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শিক্ষিত দেশীয় ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তিনি এই বিষয়ে বেথুন সোসাইটির একটি সভায় বক্তৃতা দেন। উপস্থিত বিশিষ্টজনের মধ্যে বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র মন্তব্য করেন 'প্রথমদিকে অন্তঃপুর শিক্ষার প্রয়োজন থাকলেও উহার কোনও প্রাণ নেই।' সাময়িকভাবে উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। বাবু কেশবচন্দ্র সেন মন্তব্য করেন যে মেয়েদের স্কুল ও জেনানা গভর্নেসদের শিক্ষার জন্য একটি নর্মাল স্কুল স্থাপন করা অতি প্রয়োজন।[১৪] ১৮৬৬-র ১২ ডিসেম্বর ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেলের

কাছে মেরি কার্পেন্টার এই সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রতিবেদন পেশ করেন।[১৫] মতামতের জন্য ভারত সরকার প্রতিবেদনটি বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেন। তৎকালীন বাংলা সরকার এই প্রস্তাবে গুরুত্ব না দিলেও ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের সম্মতি অনুসারে বেথুন স্কুলে শিক্ষিকা শিক্ষণের জন্য একটি নর্মাল স্কুল স্থাপন করতে সরকার বাধ্য হয়। পরীক্ষামূলক ভাবে তিন বছরের জন্য মিসেস ব্রিয়েটথেক ১৮৬৯-এ এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭৬ সালের ৩০ আগস্ট ভারত সচিব স্যার স্ট্যাফোর্ড নর্থকোটের কাছে পাঠানো প্রতিবেদনে মিসেস কার্পেন্টার মন্তব্য করেন যে, শিক্ষিকা হিসাবে প্রধানত হিন্দু মহিলাদের তৈরি করার ইচ্ছা থাকলেও ইচ্ছুক হিন্দু মহিলা একেবারে নেই বললেই চলে। সুতরাং শিক্ষিকার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রথম দিকে ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। সরকারি নীতি অনুযায়ী ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ না করে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে অন্তঃপুর শিক্ষায় ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় শিক্ষিকাদের নিয়োগে দেশীয় ব্যক্তিবর্গ আপত্তি তুলবেন না।

অন্তঃপুরের মহিলাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১৮৬৯-এ ব্যাপটিস্ট জেনানা মিশনের পক্ষ থেকে একটি ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়, যদিও ছাত্রীর অভাবে তিন বছর পর প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দিতে হয়। কলকাতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ঢাকাতেও একটি ফিমেল নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৬-তে এখানকার ছাত্রী সংখ্যা ছিল ২৫। ছাত্রীদের অধিকাংশই বৈরাগী সম্প্রদায়ের। তবে কয়েকজন খ্রিস্টান মহিলাও ছিলেন।[১৬] এই সময় শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের জন্য আরও কিছু প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল। ওয়েসলিয়ন মিশনের পক্ষ থেকে দমদম ও বাঁকুড়ায়, রোমান ক্যাথলিকদের পক্ষ থেকে কৃষ্ণনগরে, চার্চ অব ইংল্যান্ড জেনানা মিশনের পক্ষ থেকে ব্যারাকপুরে শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় খোলা হয়। শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু মহিলাদের জন্য বরানগরে একটি শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ভারত সংস্কার সভার উদ্যোগে অন্তঃপুরের স্ত্রীশিক্ষাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ১৮৭১-র ১ ফেব্রুয়ারি একটি স্বতন্ত্র শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। ১৭ জন ছাত্রী নিয়ে ওই বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয়। ১৮৭২-এর জুলাই মাসে সরকার ওই বিদ্যালয়ের জন্য ২ হাজার টাকা অনুদান দেন। এই বিদ্যালয়ে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বাংলা ও কেশবচন্দ্র সেন বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন।[১৭] ১৮৭৩-এর ৩ এপ্রিল এই বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বাৎসরিক পরীক্ষার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে গভর্নর জেনারেল নর্থব্রুক ও শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা অ্যাটকিনসন উপস্থিত ছিলেন। ১৮৭৯-র পরে সরকারি অনুদান বন্ধ হয়ে যাওয়া ও অন্যান্য অসুবিধার কারণে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায়। পরে অ্যালবার্ট হলের কাছাকাছি মেট্রোপলিটান ফিমেল স্কুল নামে তা পুনরায় শুরু হয়।

স্ত্রীশিক্ষার উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনায় শ্রীরামপুর মিশন ও কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জেনানা মিশনের প্রধান উদ্দেশ্য যেহেতু ছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচার, সেইহেতু তাদের কাছে খ্রিস্টান স্কুল বুক সোসাইটি, কলিকাতা খ্রিস্টান ট্র্যাক্ট ও বুক সোসাইটি প্রকাশিত পুস্তকের কদর বেশি ছিল। ধর্ম নিরপেক্ষ পাঠ্যপুস্তক রচনায় ১৮৫১-তে প্রতিষ্ঠিত

ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটির অবদানও উল্লেখযোগ্য। অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষার জন্য ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ থেকে যে পাঠ্যতালিকা নির্ধারিত হয়েছিল তার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কীয় পুস্তকের সঙ্গে সাহিত্য, ব্যাকরণ, অঙ্ক, ভূগোল, বিজ্ঞানও ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং অক্ষয়কুমার দত্তের লেখা পুস্তকগুলি অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার কাজে ব্যবহৃত হতে থাকে। বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে উর্দু ও বাংলা দুই ভাষাতেই অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা শুরু হয়। উর্দুতে লেখা বইগুলি ইসলাম ধর্মবিষয়ক হলেও বাংলা ভাষায় লিখিত বইগুলি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ।

বামাবোধিনী সভা পরিচালিত অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার পাঠ্যতালিকায় (১২৭৭ সন) নীচের বই ও বিষয়গুলির নাম পাওয়া যায়:

১ম বৎসর

সাহিত্য: বোধোদয়। অঙ্ক, ব্যাকরণ, সঙ্কলন, নামতা ২০০ পর্যন্ত।

২য় বৎসর

সাহিত্য: আখ্যানমঞ্জরী ২য় ভাগ, পদ্য পাঠ ১ম ভাগ ১৮ পৃষ্ঠা (সুবর্ণ ও লৌহের বিবাদ) ব্যাকরণ স্বরসন্ধি পর্যন্ত (ব্যাকরণসেতু বা কোনও সহজ ব্যাকরণ)।

ভূগোল: ভূগোল পরিচয় আসিয়া (সমাপ্ত) ১৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

অঙ্ক: গুণন ও ভাগাহার।

ধারাপাত: নামতা ৪০০ পর্যন্ত। কড়া ও গণ্ডা।

৩য় বৎসর

সাহিত্য: চারুপাঠ ১ম ভাগ (বিদ্যাশিক্ষা, দয়া বৃক্ষলতাদির উৎপত্তির নিয়ম, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন ও জলস্তম্ভ)।

নারীশিক্ষার নারীচরিত ১ম ভাগ ১০ থেকে ৫৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। পদ্যপাঠ ২য় ভাগ ২৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত

ব্যাকরণ: সন্ধি এবং ণত্ব ও ষত্ব বিধান সমাপ্ত।

ভূগোল: ভূগোল পরিচয় (আসিয়া ও ইউরোপ সমাপ্ত। বাদ ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ)।

ইতিহাস: ২য় ভাগ বাংলার ইতিহাস প্রশ্নোত্তরমালা (বসন্তকুমার দত্ত প্রণীত) বস্তুবিচার।

পাটীগণিত: লঘুকরণ, মিশ্র সঙ্কলন ও ব্যবকলন, ধারাপাত, পণ, কাঠা ও সের।

৪র্থ বৎসর

সাহিত্য: সীতার বনবাস ২য় পরিচ্ছেদ পর্যন্ত। পদ্যপাঠ ৩য় ভাগ ১৭ পৃষ্ঠা (বাদ চকোর ও চাতক)। ৩৭ পৃষ্ঠা মুমূর্ষু সময়ে ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তির প্রতি উক্তি। ৫০ পৃষ্ঠা দশরথের প্রতি কৈকেয়ী। ৫৫ পৃষ্ঠা পুষ্প পর্যন্ত।

ব্যাকরণ: স্ত্রীপ্রত্যয়, কারক ও সমাস (লোহারামের ব্যাকরণ)।

ভূগোল: ভূগোল পরিচয়— চার মহাদেশের সাধারণ জ্ঞান। বাদ ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ।

নারীশিক্ষা: ২য় ভাগের ভূগোল।

ইতিহাস: ইংল্যান্ডের ইতিহাস (রামকমল কৃত)।

বিজ্ঞান: ২য় ভাগ নারীশিক্ষার বিজ্ঞান (৭০ থেকে ১১০ পৃষ্ঠা)।

পাটীগণিত: মিশ্র গুণন ও ভাগাহার। শুভঙ্করের হিসাব (শিশুবোধক থেকে), মনকষা, সেরকষা, বৎসর মাহিনা ও মাস মাহিনা।

৫ম বৎসর

সাহিত্য: টেলিমেক্স প্রথম তৃতীয় সর্গ। সাবিত্রী চরিত কাব্য ৪র্থ সর্গ (সাবিত্রীর বিবাহ পর্যন্ত)।

ব্যাকরণ: তদ্ধিৎ ও ছন্দ বিষয় (লোহারাম কৃত)।

ভূগোল: ভূগোল পরিচয় সম্পূর্ণ, প্রত্যেক মহাদেশের, ভারতবর্ষে ও ইংল্যান্ডের মানচিত্র।

খগোল: ২য় ভাগ নারীশিক্ষা খগোল।

বিজ্ঞান: ২য় ভাগ নারীশিক্ষা বিষয়ক কথোপকথন (১১০ হইতে ১৫৯ পৃষ্ঠা)।

ইতিহাস: ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত), বাদ ৩য় ও ৯ম অধ্যায়।

পাটীগণিত: ত্রৈরাশিক ও বহুরাশিক, শুভঙ্করের হিসাব সম্পূর্ণ।

৬ষ্ঠ বৎসরের বিশেষ পরীক্ষা

সাহিত্য: নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব, সীতার বনবাস, টেলিমেক্স, চারুপাঠ ৩য় ভাগ, শকুন্তলা, সাবিত্রীচরিত কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য, পদ্মিনীর উপাখ্যান।

ব্যাকরণ: অলংকার। প্রবন্ধ রচনা।

ইতিহাস: ভারতবর্ষ, ইংল্যান্ড, রোম ও গ্রীসের ইতিহাস।

গণিত: সম্পূর্ণ পাটীগণিত। ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রথম অধ্যায়।

বীজগণিত: সমানুপাত পর্যন্ত।

বিজ্ঞান: ধাত্রীবিদ্যা, শিশুপালন, পদার্থের গুণ, প্রাকৃত ভূগোল ও খগোল, বামাবোধিনীর বিজ্ঞান বিষয়ক সমস্ত প্রস্তাব।[১৮]

উৎসাহ নিয়ে শুরু হলেও অন্তঃপুর শিক্ষার অগ্রগতি ও পরিণতি আশাব্যঞ্জক ছিল না। উচ্চ ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির গণ্ডি অতিক্রম করে অন্তঃপুর শিক্ষা সমাজের নিম্নস্তরে প্রসারিত হতে পারেনি। সামাজিক বাধা, অর্থাভাব, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন বিষয়ে দেশীয় সমাজের নিস্পৃহতা, সরকারি সাহায্যের অপ্রতুলতা ও অনিশ্চয়তা, উপযুক্ত শিক্ষিকার অভাব ইত্যাদি নানা কারণে অন্তঃপুর শিক্ষা কাঙ্ক্ষিত ফললাভে ব্যর্থ হলেও বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে অন্তঃপুর শিক্ষার বিশিষ্ট ভূমিকাটি বিস্মৃত হলে চলবে না।

তথ্যসূত্র:

১. বিনয় ঘোষ (সম্পাদিত), সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪২।

২. ঐ, ১ম খণ্ড, সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার রচনা সংকলন, পৃ. ৩১০-১২।

সীমন্তী সেন

উনিশ শতকের বাংলায় নারীশিক্ষা: প্রগতিবাদ ও তার পরিসীমা

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী,
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে।...
পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা—
অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।
(মানসী, *চৈতালি*, ২৪ চৈত্র ১৩০২)

'নারীর কল্পনা' পুরুষকে চিরকালই জুগিয়েছে তার আত্মতুষ্টি, আধিপত্যবোধ, নৈতিক এবং নান্দনিক চেতনার রসদ। ইতিহাসের বিবর্তনে, মূল্যবোধের পরিবর্তনে রূপকার যেমন বদলিয়েছে, তেমনই বদলিয়েছে রূপকল্প; কেবল অটুট থেকেছে মূল আধিপত্যবোধ। বর্তমান প্রবন্ধে, এক বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণে— অর্থাৎ 'ঐতিহ্য' থেকে 'আধুনিকতায়' উত্তরণের মুহূর্তে— নারীকে ঘিরে বাঙালি পুরুষের কল্পনার এই বিন্যাসকে আমরা বুঝতে চেষ্টা করব।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সমাজসংস্কার আন্দোলন এবং পরে জাতীয়তাবাদের সৃজন— এই দুই সামাজিক প্রকরণেরই অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল 'নতুন নারী'র নির্মাণ। আর এই নির্মাণের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ ছিল শিক্ষা। এই বিষয়টি বহুচর্চিত এবং নারীশিক্ষার কালানুক্রমিক আখ্যানটিও সুপ্রতিষ্ঠিত। মিশনারি শিক্ষা থেকে বেথুন সাহেবের স্কুল, কুন্দবালা ভুবনমালাদের নতুন জীবনে পদক্ষেপ, বিদ্যাসাগরের অবদান, 'রক্ষণশীল'দের প্রতিরোধ, ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ এবং এ সবের মধ্য দিয়ে নারীশিক্ষার ক্রমশ সামাজিক স্বীকৃতিলাভ— এ গল্প, উনিশ শতকের বাংলার সমাজজীবন নিয়ে যাদের আগ্রহ তাদের, সকলেরই প্রায় পুরোটাই জানা; এ বিষয়ে আমার আর নতুন সংযোজনের উপায় নেই। তাই এই আখ্যানের পুনরাবৃত্তি না করে বিষয়টিকে ঘিরে সমকালে যে সব বিতর্কের অবতারণা হয়েছিল তার

মূল প্রবণতাগুলোকে চিহ্নিত করবার চেষ্টা করব। নারীশিক্ষা বিষয়ের এ দিকটির আলোচনা হয়তো এখনও কিছুটা প্রাসঙ্গিক।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলার নারীশিক্ষার শুরু। এখানে 'নারী' ও 'শিক্ষা' দুটি শব্দেরই ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সাধারণভাবে উনিশ শতকের নারী সংক্রান্ত আলোচনার (এবং এই প্রবন্ধেও) 'নারী' বলতে মূলত বোঝানো হয় 'ভদ্র' ঘরের মেয়েদের, এবং 'শিক্ষা' বলতে নাগরিক প্রাতিষ্ঠানিক (Metropolitan institutional) শিক্ষাকে। এর আগে আমাদের দেশে মেয়েরা সকলেই অক্ষরপরিচয়হীন, শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিলেন এমন নয়। অবশ্যই কোনও অর্থেই তাৎপর্যপূর্ণ না হলেও দেশজ শিক্ষার ধারায় অন্তত কিছু মেয়ে যে শিক্ষালাভ করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এটা ভাবা অবাস্তব যে সমস্ত গ্রামবাংলা জুড়ে যত পাঠশালা ছিল সেখানে মেয়েদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল। বস্তুত তৎকালীন গল্প, উপন্যাস, আত্মজীবনীতে এর বিরুদ্ধ নিদর্শন যথেষ্ট পাওয়া যায়। প্রাক্-প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আগে বৈষ্ণবী শিক্ষার ধারাও যে মেয়েদের জ্ঞানজগতের সঙ্গে সংযোগের মাধ্যম হয়েছে সে আলোচনা সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী করেছেন।[১] লিখতে পড়তে জানা মেয়েরা বিরল হলেও অবশ্যই অস্তিত্বহীন ছিল না। তবে নগর জীবন গড়ে উঠতে উঠতে এই শিক্ষার ধারা অনেকাংশেই স্তব্ধ হয়ে যায়। কলকাতা নগরীর অভিনব বাতাবরণ, ভিন্ন জাতি-বর্গ-ধর্মের মানুষের সহাবস্থান, প্রোথিত জীবনবোধের আলোড়িত ভীত শহরবাসী মানুষকে বহির্জগৎ সম্পর্কে সন্দিগ্ধ, ত্রস্ত করে তুলেছিল। আর এই ভীতি-ত্রাসের সব থেকে বড় শিকার ছিলেন মেয়েরা কারণ বাইরের জগতে যদি স্পর্শদোষের ভয় থাকে তা হলে সেই স্পর্শদোষ থেকে মেয়েদের বাঁচানোর তাগিদ ছিল অনেক বেশি। কারণ তাঁদের 'অক্ষুণ্ণতার' উপরেই নির্ভরশীল ছিল গৃহের, সমাজের অন্তরের সংরক্ষণ, স্থিতিশীলতা। এমন দাবি করা চলে যে উনিশ শতকে নগরায়ণ এবং মেয়েদের 'বন্দিত্ব' অনেকটাই কার্যকারণ সম্পৃক্ত।

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে উনিশ শতক বলতে যে ছবিটা আমাদের চোখের সামনে উঠে আসে তা মূলত কলকাতা নগরীর ছবি। গোটা বাংলার এক জড়ীভূত নাগরিক চিত্রকল্পে হামেশাই হারিয়ে যায় অজস্র আঞ্চলিক বৈচিত্র্য, নিয়মরীতির রকমফের, জীবনের তরলতা। যাই হোক, তত্ত্বায়নের এই সমস্যা মেনে নিলেও এ কথা বলতে অসুবিধে নেই যে 'বলার মতো' কোনও শিক্ষা মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না এবং তৎকালীন 'সংস্কৃতায়ন'-এর (Sanskritistation-এর) প্রবণতায় মেয়েদের 'বন্দিত্ব' প্রায় এক সার্বিক চেহারা নিচ্ছিল।

সেকালের নগরকেন্দ্রিক, শিক্ষিত সম্প্রদায়কে (পশ্চিমি উদারনীতিতে বিশেষত যাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন নবজীবনের অভিজ্ঞান) 'মেয়েদের সমস্যা' স্বভাবতই বিচলিত করেছিল। আর সাহেব শাসকরাও সমাজের এই দুর্বলতাকে তাঁদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে কোনও কসুর করেননি। তনিকা সরকার যথার্থই বলেছেন যে, 'অধীনতা' শব্দটি তৎকালীন বাঙালি পুরুষের কাছে ছিল দ্ব্যর্থব্যঞ্জক— প্রথম অর্থে তা ছিল গ্লানি, অর্থাৎ বহির্জীবনে

প্রতিনিয়ত অধীনতাবোধের গ্লানি, এবং দ্বিতীয় অর্থে তা ছিল অপরাধবোধ, অর্থাৎ ঘরের ভেতর নিয়মের অনুশাসনে মেয়েদের বন্দি রাখার অপরাধের উপলব্ধি।[২] অনেক পুরুষ আবার এই দুই-এর কার্যকারণ-যোগও খুঁজে পেয়েছেন। ঘরের মেয়েদের প্রতি পুরুষেরা যে পাশবিক আচরণ করেন তা যেন তাদের বহির্জীবনে এই পাশবিকতার শিকার হওয়ারই প্রতিশোধ— এরকমই ছিল প্রসাদদাস গোস্বামীর বিশ্বাস।[৩] ঠিক এক ভাবে ব্যাখ্যা না করলেও এই অপরাধবোধ যে অনেক পুরুষকেই তাড়িত করেছিল তার অজস্র উদাহরণ মেলে। বিলেতে মেয়েদের অগ্রগতি দেখে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় আত্মসমালোচনায় উদ্বুদ্ধ হন—

> With all the meekness and modesty of the Indian woman, her kindly and affectionate disposition, her religious fervour, her strong love of virtue, her sense of self-respect and all the good qualities with which nature had endowed her, it is very ungrateful on our part to entertain the notion that she cannot be trusted unless she is kept under lock and key.[8]

য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারিতে রবীন্দ্রনাথের স্বজাতির প্রতি ধিক্কার অনেক তীব্র—

> স্বভাবদুর্বল সুকুমার স্ত্রীলোকদের সর্বপ্রকার আরামসাধন এবং কষ্টলাঘবের প্রতি সযত্ন মনোযোগ যে কঠিনকায় বলিষ্ঠ পুরুষদের একটি স্বভাবসিদ্ধ গুণ হওয়া উচিত এ তারা কল্পনা করতে পারে না— তারা কেবল এইটুকু মাত্র জানে শাসনভীতা স্নেহশালিনী রমণী তাদের চরণে তৈল লেপন করবে, তাদের বদনে অন্ন জুগিয়ে দেবে, তাদের তপ্ত কলেবরে পাখার ব্যজন করবে, তাদের আলস্যচর্চার আয়োজন করে দেবে, পঙ্কিল পথে পায়ে জুতো দেবে না, শীতের সময় গায়ে কাপড় দেবে না, রৌদ্রের সময় মাথায় ছাতা দেবে না, ক্ষুধার সময় কম করে খাবে, আমোদের সময় যবনিকার আড়ালে থাকবে এবং এই বৃহৎ মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে যে আলোক আনন্দ, সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য আছে তার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকবে। স্বার্থপরতা পৃথিবীর সর্বত্রই আছে কিন্তু নির্লজ্জ নিঃসংকোচ স্বার্থপরতা কেবল সেই দেশেই আছে যে দেশে পুরুষেরা ষোল-আনা পুরুষ নয়।[৫]

বহুদিন ধরেই বাঙালি পুরুষমনে যে এধরনের পাপবোধ সঞ্চারিত হচ্ছিল তার প্রমাণ উনিশ শতক জুড়ে সংস্কারের চেষ্টা। চার দশকের আন্দোলনের ভেতর দিয়ে সতীদাহ রদ হল এবং বিধবা বিবাহের অন্তত আইনি স্বীকৃতি মিলল। তবু, প্রাচ্য সমাজের 'beastly practices'-এর কিছু প্রতিকার হলেও মেয়েদের অধীনতার প্রশ্নটি তখনও গভীর অস্বস্তির, সমাধান তখনও বহু দূরে।

পশ্চিম থেকে আধুনিকতার যে বার্তা এ দেশে পৌঁছেছিল তার কেন্দ্রে ছিল শিক্ষার ধারণা। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে 'সভ্য ইংরেজ'দের যে অভিযোগগুলো ছিল— যেমন যুক্তিহীনতা, সংস্কারাচ্ছন্নতা, অবৈজ্ঞানিকতা ইত্যাদি— সব ক'টিই সরাসরিভাবে যুক্ত ছিল

শিক্ষার অভাবের সঙ্গে। পশ্চিমি উন্নতি, উৎকর্ষের গুণগ্রাহী ভারতীয় মনে এই বিশ্বাস প্রায় বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল যে তার পরাধীনতা কোনও আকস্মিক রাজনৈতিক ঘটনাসাপেক্ষ নয়, তা যেন তার স্বভাবসিদ্ধ, চিরন্তন। তবে সময়টা যেহেতু ছিল জাতীয়তাবাদী চেতনারও, সেহেতু কোনও দুর্বলতা বা অভাবকেই স্বাভাবিক বা অনিবার্য মেনে নেওয়ার উপায় ছিল না। জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রাক্-শর্তই ছিল এর পরিবর্তনীয়তা প্রমাণের। অতএব মুক্তির সাধনার প্রথম ধাপ ছিল 'শিক্ষার সাধনা'। কিছুদিনের মধ্যে আরও একটি জিনিস পরিষ্কার হল যে হিন্দু কলেজের শিক্ষিতদের মধ্যে শেক্সপিয়র, মিল্টন, শেলি, কীটস, বেন কিম্বা স্পেনসর বিদ্যানেশার যে জোয়ারই আনুক না কেন, সমাজের অন্তর অর্থাৎ মেয়েরা যদি অশিক্ষার অন্ধকারে থেকে যায় তা হলে মুক্তির চেহারা হবে নিতান্তই খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ। ফলে, আয়োজন শুরু হল নারীশিক্ষার।

বিদ্যালয় শিক্ষার গোড়াপত্তনের কিছু কথা

মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শুরু উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। ১৮১৩ সালে চার্টার আইন ভারতে খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রবেশ অবাধ করে দিলে তাদের তোড়জোড়েই নারীশিক্ষার সূচনা। কলকাতা ব্যাপটিস্ট মিশন সোসাইটির উদ্যোগে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি উত্তর কলকাতার গৌরীবাড়িতে ১৮১৯ সালে প্রথম মেয়েদের জন্য স্কুল খোলে। পরের বছর Mrs. Gogerby লন্ডন মিশনারি সোসাইটির সহযোগিতায় আরও একটি মেয়ে স্কুলের উদ্বোধন করেন। প্রাথমিক ভূগোল, বাইবেল ও সেলাই ছিল এর মূল শিক্ষাসূচি। পড়ুয়া ছিল দরিদ্রশ্রেণির কিছু অল্পবয়সি মেয়ে ও কয়েকজন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা। এর বছর খানেকের মধ্যে ব্রিটিশ অ্যান্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি Mary Ann-Cookeকে ভারতে পাঠায় নারীশিক্ষার দায়িত্বভার দিয়ে। *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*-এ শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেন যে Mary Ann-Cooke-এর উদ্যোগে গঠিত দশটি স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল অন্তত ২৭৭। মিশনারিদের উদ্যোগে, উৎসাহে স্কুলের সংখ্যা ক্রমশ বাড়লেও 'ভদ্রলোকে'রা এই ধরনের স্কুলে তাঁদের বাড়ির মেয়েদের পাঠাতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। সেকালে সমাজসংস্কারে সব থেকে উৎসাহী দল, ব্রাহ্মযুবকেরা, এই সমস্যার সমাধান হিসেবে চালু করলেন অন্তঃপুর শিক্ষা। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এই শিক্ষার অসম্পূর্ণতা তাদের অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠতে থাকে। আমরা দেখি ১৮৩০ সাল নাগাদ হিন্দু কলেজের কিছু প্রাক্তন ছাত্র যেমন রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ যথাযথ Public Institution-এ মেয়েদের পড়ানোর কথা ভাবতে শুরু করেছেন। ১৮৪৭ সালে প্যারীচরণ সরকার বারাসতে মেয়েদের জন্য একটি ফ্রি স্কুল খোলেন। পরবর্তীকালে এর নামকরণ হয় কালিকৃষ্ণ হাইস্কুল। তবে তথাকথিত ভদ্রবাড়ির মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার যথার্থ সম্ভাবনা তৈরি হয় বেথুন সাহেবের ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল (পরে বেথুন স্কুল) প্রতিষ্ঠার পর। কেবল জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনেরই নয়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নামও এই স্কুলের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে বেথুনের মত ছিল যে বাংলা মূল ভিত্তি হলেও

ইংরেজি ভাষার শ্রেষ্ঠতার কারণে শিক্ষামাধ্যম ইংরেজিই হওয়া উচিত। আর তাঁর শিক্ষার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল— 'Your children would learn the means of adorning their own homes and of supplying themselves with harmless and elegant employment'.

বেথুনের উৎসাহের ছোঁওয়া সরকারি মহলেও লাগে। ১৮৫০ সালে এডুকেশন ডেসপ্যাচ মেয়েদের শিক্ষা খাতে অনুদান ধার্য করে।

পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দুই কন্যা কুন্দবালা ও ভুবনমালা ছিল এই বিদ্যালয়ের প্রথম দুই পড়ুয়া। ১৮৫০এ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্কুলের সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হন এবং তাঁর প্রভাবে বেশ কিছু 'ভদ্রলোক' নিজেদের বাড়ির মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে শুরু করেন। তবে ঠিক তার পরের বছর বেথুনের আকস্মিক মৃত্যু সরকারি মহলকে স্কুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় ফেলে। লর্ড ডালহৌসির তৎপরতায় স্কুলের নতুন বোর্ড গঠিত হয় এবং Cecil Beadon কে প্রেসিডেন্ট এবং বিদ্যাসাগরকে আবারও সেক্রেটারি পদে বহাল করা হয়। এ সব আনুষ্ঠানিক উদ্যম সত্ত্বেও দেখা যায় যে পড়ুয়ার সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বাড়ছে না, আর যে ক'জন ছাত্রী তারা অধিকাংশই ব্রাহ্মঘরের মেয়ে। ছাত্রীসংখ্যা না বাড়ার পেছনে অবশ্যই অন্যতম কারণ ছিল অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়া, তবে এ ছাড়াও মেয়েদের বাইরে পড়তে পাঠানোর কিছু প্রায়োগিক অসুবিধে ছিল। তখনও পর্যন্ত মেয়েদের বাইরে বেরনোর মতো উপযুক্ত পোশাকের ব্যবস্থা ছিল না। (১৮৭০ নাগাদ সুনীতিদেবী, জ্ঞানদানন্দিনীর ব্রাহ্মিকা শাড়ির প্রবর্তন এ সমস্যাকে অনেকটাই দূর করে।) আবার ১৮৬৬ সালে এক টাকা মাসিক বেতন চালু হলে অনেকেই মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে আগ্রহ হারান। সরকারি মহল এতে কিছুটা হতোদ্যম হলেও বিদ্যাসাগরের উৎসাহ, সংকল্প টলেনি। তাঁর পরিকল্পনা মতো এবার মফস্‌সলেও মেয়ে স্কুল খোলার ব্যবস্থা হয়। ১৮৭০-এর পর থেকে অবস্থার মোড় ফেরে। এতদিনের টানাপোড়েন কাটিয়ে বেথুন স্কুল কিছুটা স্থিতাবস্থা লাভ করে, আর ছাত্রীর সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ক্রমশ নারীশিক্ষার বিষয়টি পায়ের নীচে জমি পায়।

১৮৭৩ সালে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু হয়— Annette Akroyd-এর 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়'। মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারটা সমাজ কিছুটা মেনে নিলেও, গোলমাল বাঁধল শিক্ষার বিষয়সূচি নিয়ে। এই নিয়ে বিতর্ক সব থেকে জোরদার হয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে। 'স্ত্রীসুলভ' শিক্ষার প্রবক্তা কেশব সেনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন প্রগতিবাদী ব্রাহ্মযুবকেরা। নারীপুরুষের শিক্ষা বিষয়ের ভেদাভেদ মানতে নারাজ ছিলেন এই দ্বিতীয় দল। এঁদের সঙ্গে একজোট হয়ে Annette গড়ে তোলেন 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়', ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রেখে পাঠ্যসূচি তৈরি হয়। গণিত, ভূগোল, ভৌতবিজ্ঞানের সঙ্গে গৃহকর্মের পাঠ দিতেও সযত্ন হন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সাফল্য আসছিল অত্যন্ত ধীরগতিতে। দু'বছরের অক্লান্ত চেষ্টার পর Annette মাত্র চোদ্দোজন পড়ুয়া জোগাড় করতে পারেন। অনুদান দিতে অবশ্য আগ্রহী মানুষের অভাব ছিল না। দুর্গামোহন ও আনন্দমোহন বসু এবং

Henry Beveridge এর নাম ছিল এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। Annette প্রতিদিনের শিক্ষাব্যবস্থা পরিদর্শনের ভার নিজের হাতেই তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল কেবল পুঁথি শিক্ষাতেই নয়, বিলিতি আচার ব্যবহারেও ছাত্রীদের দক্ষ করে তোলা। মনমোহন ও স্বর্ণলতা ঘোষ নিজেদের মেয়েদের এই স্কুলে দাখিল করেন। আর যেখানে মনমোহন মেয়েদের পাঠাতে পারেন সেখানে আরও অনেক ভদ্রলোকই নিজেদের মেয়েদের পড়ানোর ব্যাপারে দ্বিধাহীন হন। অতএব হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে এসে জড়ো হয় চণ্ডীচরণ সেন বা রামতনু লাহিড়ীর বাড়ির মেয়েরাও।

সত্তরের দশকের শেষ থেকে ক্রমশ পটপরিবর্তন হতে থাকে। জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের বাতাবরণে নারীশিক্ষা অন্তত তাত্ত্বিক স্বীকৃতি পেয়ে যায়। এ সময়ই কাদম্বিনী গাঙ্গুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন এবং তাঁর সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে বেথুন কলেজ এফ. এ, এবং স্নাতক বিভাগ চালু করে। ১৮৭৯ সালে চন্দ্রমুখি বসু ও কাদম্বিনী এই কলেজের প্রথম দুই স্নাতক হিসেবে সম্মানিত হন। মনে রাখতে হবে যে, কেবল বাংলাদেশে বা ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেই এঁরা ছিলেন প্রথম মহিলা স্নাতক। কেবলমাত্র এক বছর আগে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ব্রিটেনের মেয়েদের স্নাতক স্তরে পড়াশোনার অধিকার মেনে নিয়েছিল। এরপর কাদম্বিনী কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসা শাস্ত্র পড়তে শুরু করেন এবং ১৮৬৬ সালে GBMC (অর্থাৎ Graduate of Bengal Medical College) ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর কর্মজগতে প্রবেশ করলেও কাদম্বিনীর উচ্চতর শিক্ষা থেমে থাকেনি। কিছু বছর পর স্বামী দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির উৎসাহে, সহযোগিতায় তিনি বিদেশ যান এবং এডিনবরা, গ্লাসগো এবং ডাবলিন থেকেও ডিগ্রি লাভ করেন। কেবল কাদম্বিনীই নন, অবলা বসুও ১৮৮১ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে কলকাতায় সুযোগ না পেয়ে মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজ থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন।[৬]

অতএব শতকের মোড় ঘুরতে ঘুরতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মেয়েদের শিক্ষাই শুধু গ্রাহ্য হয়েছে এমন নয়, 'স্ত্রীজনচিত' শিক্ষার সীমা পেরিয়ে মেয়েরা তথাকথিত 'পুরুষক্ষেত্রে'ও বিচরণ শুরু করেছে। দেখতে পাচ্ছি, যে শিক্ষার আখ্যান শুরু হয়েছিল সহৃদয়, অপরাধবোধ পীড়িত পুরুষদের আনুকূল্যে, সেই আখ্যানকে এগিয়ে নেওয়ার কাজে মেয়েরাও সক্রিয় অংশীদার হচ্ছে। শুনতে পাচ্ছি, *বামাবোধিনী, বঙ্গমহিলা, ভারত মহিলা, অন্তঃপুর, সাধারণীর* পাতায় পাতায় নারীকণ্ঠধ্বনি। এই স্বর অনেকাংশেই পুরুষ কণ্ঠের প্রতিধ্বনি হলেও, নারীর নিজস্ব বিদ্ধৃতি, বিস্তারে তা এক নতুন মাত্রা নিচ্ছে, এমনকী কখনও কখনও প্রতিবাদীও হয়ে উঠছে। রাসসুন্দরী থেকে শিক্ষাপথে যে যাত্রার শুরু সে যাত্রা পাচ্ছে এক নতুন উদ্যম, নতুন লক্ষ্য। বস্তুত, উনিশ শতকে শিক্ষার প্রকল্পে নারীর অংশগ্রহণ এক সম্পূর্ণ পৃথক প্রবন্ধের বিষয়। এই আলোচনায় আমার উদ্দেশ্য সামাজিক নির্মাণের লক্ষণগুলো চিহ্নিত করা, বাঙালি নারীর স্বপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস পর্যালোচনা নয়।

এতক্ষণ আমার লেখার ধাঁচে এমন মনে হতে পারে যে, বাংলাদেশে নারীশিক্ষার পথটি ছিল সরল, মসৃণ এবং ক্রমউন্নতির। যেন উনিশ শতকে কিছু সহৃদয় প্রগতিবাদী মানুষ মেয়েদের 'বন্দিত্ব' ঘোচাতে নারীশিক্ষার সূচনা করেন। সামাজিক কিছু অস্বস্তি এবং প্রতিরোধ ছিল, কিন্তু সহজেই তাকে উত্তরণ করে শিক্ষার অগ্রগতি অবাধ হয়ে ওঠে এবং বিগত শতকের অন্তঃপুরবাসিনীরা শতাব্দীর মোড় ঘুরতে না ঘুরতেই স্বাধীন স্বমহিমায় পুরুষের সমকক্ষ হিসেবে মর্যাদা পেয়ে যান। বলা বাহুল্য, গল্পটা এমন ছিল না। সমস্ত উনিশ শতক জুড়ে নারীশিক্ষার উদ্যোগী যত মানুষ ছিলেন তার থেকে অনেক বেশি মানুষ সোচ্চার হয়েছিলেন বিরোধিতায়। আর বিশ শতকের গোড়ায় যে সব মেয়েরা শিক্ষিত হন সংখ্যার দিক থেকে তাঁরা ছিলেন নিতান্তই মুষ্টিমেয়। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে 'সেনেট' পরীক্ষাসংক্রান্ত নিয়মের পরিবর্তন করে ঠিক করেন যে, পরীক্ষার্থী মহিলারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবেন। কিন্তু আইন বাস্তব পরিস্থিতির ঠিক কতটা পরিবর্তন করল? ১৮৮৭ সালে উপাচার্য হান্টারের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিগত বছর এন্ট্রান্স পাশ করেন তেইশ জন ছাত্রী, এফ.এ পাশ করেন চারজন আর স্নাতক উপাধি লাভ করেন মোটে তিনজন।[৭] আর যাঁরা পাশ করেন তাঁদের মধ্যে স্বাধীন জীবিকা গ্রহণ করেন ক'জন? হয়তো বা একজনও নন। এই সূত্রে আমরা এসে পড়ি একটি অন্য প্রসঙ্গে— নারীপ্রগতি বা শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং সীমা। বস্তুত বাংলাদেশে (সারা ভারতেই) 'নারীমুক্তি' প্রকল্পের উপায় এবং লক্ষ্য দুটোই ছিল 'শিক্ষা'। শিক্ষিত অশিক্ষিত সব মেয়ের জন্য একটি জীবনজীবিকাই নির্ধারিত ছিল— তা হল গৃহিণীর। আমার বক্তব্য শিক্ষা ও উৎপাদনের এই বিযুক্তি শিক্ষা প্রসারের এই মন্থরতার অন্যতম কারণ ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীশিক্ষা সংক্রান্ত তত্ত্বায়নের দিকে যদি আমরা তাকাই তা হলে প্রায় সত্তর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত লেখাপত্রে যে ছকটি পাওয়া যায় তা হল সংস্কারক এবং প্রগতিবাদী বনাম তথাকথিত প্রথানুসারী এবং রক্ষণশীলদের লড়াইয়ের। একদিকে প্রগতিবাদীরা (সিংহভাগ ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী) নারীশিক্ষার প্রসার ঘটাতে বদ্ধপরিকর, অন্যদিকে রক্ষণশীলদের মধ্যে যায় যায় রব। মার্কসবাদী সমালোচকরা কম বেশি এই ছকেই শামিল, তাঁরা 'নারীমুক্তি' প্রকল্পের সীমাবদ্ধতাকে দেখেছেন মূলত ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সীমাবদ্ধতার অঙ্গ হিসেবেই। সত্তর দশকের শেষ থেকে তত্ত্বায়নের মোড় ঘুরতে থাকে এবং এই পর্বের তত্ত্বায়ন অনেক জটিল। এখানে প্রগতিবাদ ও রক্ষণশীলতার বৈপরীত্য প্রশ্নাধীন এবং নয়া পিতৃতন্ত্র, বিকল্প আধুনিকতা ইত্যাদি ধারণার নির্মাণ। আমি এই দ্বিতীয় পর্যায়ের তাত্ত্বিক কাঠামোর সূত্র ধরেই আলোচনাটিকে বিস্তৃত করব। অবশ্যই এই আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গ।

জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্স গড়ে উঠেছিল অনেকগুলো বৈপরীত্যকে অবলম্বন করে— যেমন private/public, ঐতিহ্য/আধুনিকতা, ঘর/বাহির, পুরুষ/নারী ইত্যাদি। পার্থ চট্টোপাধ্যায় বিশদভাবে দেখিয়েছেন যে, জাতীয়তাবাদ কীভাবে এই বৈপরীত্যগুলোকে inner

এবং outer domain-এর এক বৃহত্তর বৈপরীত্যের ছকে সমন্বিত করে।[৮] Outer domain ছিল রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদির পরিসর যেখানে শাসকের সঙ্গে নিয়ত চলত বিনিময়, বোঝাপড়া এবং সংঘাত। এই outer domain-এ পশ্চিমি আধুনিকতার আত্মীকরণ নিয়ে বিশেষ কোনও সমস্যা ছিল না। এখানে পশ্চিমি শাসকের সঙ্গে সংঘাতের মুহূর্তেও দেশজ মানুষ পশ্চিমের খেলার নিয়মেই পশ্চিমকে মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ outer domain-এ পশ্চিমের সঙ্গে সংঘাতেও ছিল পশ্চিমি আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ। তবে এমন নয় যে, এই পরিসরে দেশজ মানুষ কেবলই অন্ধ অনুকরণ করেছেন, কখনওই সৃষ্টিশীল হননি; কিন্তু সৃজনের এবং বঙ্গজ আধুনিকতাকে তার বিশিষ্ট আত্মপরিচয় দেওয়ার জায়গা ছিল, যাকে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, inner domain। এই inner domain-এর নির্মাণ অনেক জটিল, অনেক বেশি বর্ণময় এবং পশ্চিমি আধুনিকতার আদর্শের সঙ্গে অনেক বেশি সংঘাতপূর্ণ। এটিই ছিল জাতীয়তাবাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার, জাতীয় পরিচিতি-সংজ্ঞা নির্মাণের ক্ষেত্র। এখানে পশ্চিমি আধুনিকতার আত্মীকরণ যেমন ছিল, তেমনই ছিল আধুনিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। এই পরিসরে এক ত্রিমাত্রিক ছকে সমন্বিত হয় জাতি বা nation-এর নান্দনিক ভাবনা, গৃহের ধারণা এবং ‘নতুন নারী’র নির্মিতি। বহির্দুনিয়ায় প্রতিনিয়ত পরাজয়ের গ্লানিকে লাঘব করার একমাত্র উপায় ছিল ‘অন্তর দুনিয়া’কে ঔপনিবেশিক বোঝাপড়া থেকে সরিয়ে তার এক স্বকীয় এবং স্বতন্ত্র নির্মাণ। পশ্চিমি জীবনাদর্শকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না, তাই চেষ্টা ছিল এর থেকে দূরত্ব সৃষ্টির। জাতি-ভাবনার যে হার্দিক আবেদন ছিল তাতে নির্বিশেষে মিশে ছিল গৃহ ও তার কেন্দ্রে ‘নতুন নারী’র রূপকল্প। এমন এক নারীরূপ সৃজনের প্রয়োজন ছিল যা হবে ‘প্রাচীনা’ থেকে পৃথক আবার বিদেশিয়ানা থেকে দূরে। এই নারীর নান্দনিক আবেদন হবে স্বদেশি সমাজের আত্মাভিমানের মূল ভিত্তি। এই তাত্ত্বিক দিশায় যদি আমরা নারীশিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়টিকে পর্যালোচনা করি, তা হলে হয়তো প্রকল্পটির দিশা, লক্ষ্য, অনেক বেশি অর্থবহ হয়ে উঠবে।

বিরোধিতা

উনিশ শতকের প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে, প্রহসনে নারীশিক্ষার বিরোধিতা এক মস্ত বিষয়। সে সমস্ত যুক্তি, তর্ক, ঠাট্টা, বিদ্রুপের উদাহরণ যদি তুলে ধরতে শুরু করি, তবে পাঠকের কাছে আলোচনাটি অত্যন্ত উপাদেয় হয়ে উঠবে সন্দেহ নেই। বস্তুত এই বিষয়ে তাত্ত্বিক গবেষণাপত্রও কেবল উদ্ধৃতির জোরে রসসাহিত্যের মেজাজ পেয়ে যায়। তবে আমি পাঠকদের আশাহত করব। নীরস তত্ত্ব আমার লেখার মূল উপজীব্য, যে দু’-একটা উদ্ধৃতি দেব তাও নিতান্ত তত্ত্বেরই প্রয়োজনে।

উনিশ শতকের বাংলায় নারীশিক্ষার বিরোধিতার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া খুব কঠিন নয়। যে কোনও প্রথাগত সমাজই প্রবর্তন এবং পরিবর্তন সম্পর্কে সন্দিহান হয়। আর যে-সময়ের বাংলার কথা বলছি সেখানে সন্দেহ, অনীহা, বিরূপতা সবই ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক। একে বিদেশি শাসক, তায় প্রবর্তনের ঝড়। আইন, আদালত, কোর্ট, কাছারি,

অ্যাক্ট, ল, ডেসপ্যাচের চাপে যখন নাভিশ্বাস উঠছে তখন ঘরের শান্তিটুকুই একমাত্র অবলম্বন। আর সেই শান্তিদায়িনী নারীকেই যদি বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়, তা হলে শেষ আশ্রয়টুকুও গেল। এর উপর আবার আধুনিক বিদ্যালয়ের ধরনটাও বড় একটা স্বস্তিদায়ক ছিল না, বরং নব্য শিক্ষিত ডিরোজিওপন্থীদের কল্যাণে বিদ্যালয়গুলো বস্তুত ত্রাসের বিষয় হয়ে উঠেছিল। আর এইসব 'আচার বিচার জ্ঞানশূন্য', শেলি, কীটস-এর বঙ্গীয় অনুরাগীরাই যখন স্ত্রীশিক্ষার কাণ্ডারি হতে চলেছিল তখন বিষয়টি শুধু সন্দেহজনক নয়, পুরোপুরি বর্জনীয় মনে হওয়া অনেকের কাছেই খুব অস্বাভাবিক ছিল না।

নারীশিক্ষা সম্পর্কে সমকালীন বিরোধিতার যুক্তিগুলোর প্রতি যদি আমরা মনোযোগী হই, তা হলে এই ভীতি, সন্দেহের সম্যক চরিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁর 'স্ত্রীশিক্ষা' প্রবন্ধে 'রক্ষণশীল'দের যুক্তিগুলো একত্রিত করেছিলেন। প্রধান আপত্তিগুলো ছিল এই রকম— (১) মেয়েদের মানসিক শক্তি ও বুদ্ধির অভাব; (২) স্ত্রী শিক্ষা শাস্ত্র ও লোকাচার সম্মত নয়; (৩) লেখাপড়া করলে মেয়েরা বিধবা হয়; (৪) বিদ্যাবতী মেয়েরা স্বেচ্ছাচারিণী ও দুর্মুখ হয় এবং (৫) মেয়েরা যখন ধনোপার্জন করবে না তখন তাদের শিক্ষা দেওয়া অর্থহীন।[৯]

আমরা এই আপত্তিগুলোর মধ্যে প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম আপত্তির প্রতি নজর দেব, কারণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় আপত্তি জোরদার হলেও বেশিদিন ধোপে টেকা সম্ভব ছিল না। শাস্ত্র দিয়েই শাস্ত্রকে খণ্ডন করা যেত আর বিধবা হওয়া বিষয়টি ছিল প্রমাণসাপেক্ষ। তবে এ আপত্তিগুলো যে যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল তা বলা বাহুল্য।

তৎকালীন phrenology সংক্রান্ত গবেষণা মেয়েদের মানসিক শক্তি ও বুদ্ধির অভাবের যুক্তিকে জোরদার করেছিল। নীলকণ্ঠ মজুমদারের মতো লোকেরা যে কেবল এ দেশে বসেই বলছিলেন যে '...এক্ষণে নারীর মস্তিষ্ক, বক্ষ ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যক্ষ আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, পুত্র প্রসব ও পুত্র প্রতিপালন করাই নারীজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য' এমন নয়।[১০] ১৯৩৩ সালে সমাজতাত্ত্বিক Emile Durkheim তাঁর *The Division of Labour in Society* গ্রন্থে স্পষ্ট জানাচ্ছেন যে 'only by robbing their reproductive organs of essential resources of energy could they continue serious study'[১১]। এই বক্তব্য দাঁড়িয়েছিল নারী ও পুরুষের করোটির আকার, আয়তন ও বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য সংক্রান্ত গবেষণার উপর।

অবশ্যই নারীশিক্ষার সব সমালোচক স্তন, জরায়ু বা মস্তিষ্কের গঠনের প্রসঙ্গ টানেননি আর সবাই ঘরে বসে Emile Durkheim-ও পড়ছিলেন না। তবে সকলেই প্রায় একটা জিনিস আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন— এক আবহমানকালীন নারীচরিত্র যা তার স্তন বা জরায়ুর মতোই আবশ্যিক ও নিশ্চিত। 'শিক্ষা' এই 'নিশ্চিন্ত নিশ্চিতে' ভাঙন ধরাবে— ভয় ছিল এখানেই।

এবার দেখা যাক শিক্ষিত নারী স্বেচ্ছাচারী হলে তার চেহারাটা কেমন দাঁড়াবে। একটা গানের উদ্ধৃতি দেওয়া যাক—

ষষ্ঠী মাকাল আর মানে না,
সেঁজুতির ঘর আর আঁকে না,
আরসিতে মুখ আর দেখে না
এখন কেবল ফটোগ্রাফ চায়।
এখন গাউন পরে, ঘোড়ায় চড়ে,
গঙ্গাস্নান ত দেছে ছেড়ে,
গোসলখানায় খানসামাতে
টাউয়েল দিয়ে গা মোছায়।[১২]

আরও দু'-একটি উদ্ধৃতি দিয়ে মূল আলোচনায় ফিরব। রাধাবিনোদ হালদারের *পাশ করা মাগ* প্রহসনে কিরণশশী গান গায়—

হাজব্যান্ডে করে ডিস্‌মিস্ হয়েছি প্রাণ নিউ মিস,
দিব আমি সুইট কিস্, ফ্রি লভ নেভার ফিয়ার।[১৩]

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের *প্রলয়* প্রহসন প্রলয়ের স্বরূপ ব্যক্ত করে:

আমরা বেরিয়েছি সব হাওয়া খেতে
চুরুট মুখে ছড়ি হাতে।
বেড়াব, হোটেলে যাব সুপার খাব
ফিরব আবার রাতে-রাতে।[১৪]

অমৃতলাল বসু *তাজ্জব ব্যাপার* প্রহসনে হাস্যোদ্রেকের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত উপায় অবলম্বন করেন— ভূমিকার পরিবর্তন বা role reversal। বিয়ের আসর— বরকর্তা মেয়েরা, ছেলেরা করছেন এয়োর কাজ।

আবার মূল ভীতির প্রসঙ্গে ফিরে আসি। উদ্ধৃতিগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়লে ভীতির লক্ষণগুলো চিহ্নিত করতে অসুবিধে হয় না— মেয়েদের পুরুষোচিত ব্যবহার এবং মেমসাহেবি; এবং এই দুয়ের ফলে মেয়েদের ঘিরে যে নান্দনিকবোধ তা তছনছ হয়ে যাওয়া।

আগেই বলেছি, যে সব বৈপরীত্যকে অবলম্বন করে জাতীয়তাবাদী ডিসকোর্স গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিল নারী-পুরুষের বিভাজন। সমাজ সংগঠনের আদর্শ খুব স্পষ্টভাবে নারী-পুরুষের আচরণবিধি ও বিচরণপরিসরকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করেছিল। এটা বাংলাদেশের কোনও অভিনব উদ্ভাবন নয়। পশ্চিমেও এই বিভাজন যথেষ্ট বহাল ছিল। তবে বৈদেশিক শাসনাধীন বাঙালি পুরুষের কাছে (যাকে যুঝতে হচ্ছিল ক্লীবত্ব, শক্তিহীনতা এবং নারীসুলভ দুর্বলতার অভিযোগের বিরুদ্ধে) এই বিভাজন ছিল অনেক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। গৃহ ও নারীর অভিন্নতা সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়েছিল তার সমাজ এবং 'স্ব' চেতনা। আর 'শিক্ষা' ছিল এই পরিসরের উল্লঙ্ঘনের এবং তার ফলে

মেয়ের পুরুষ বনে যাওয়ার সম্ভাবনাসূচক। নারী-পুরুষের পৃথক শিক্ষাসূচির প্রস্তাবও এই ভয়কে নিরসন করেনি। হেঁসেল, উঠোন, ঠাকুরঘরের বাইরে পুরুষশাসিত public sphere-এর একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মেয়েদের সংযোগের ধারণাটাই বহু মানুষের নিতান্ত অনভিপ্রেত ঠেকেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, ১৮৫০ সালে *সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছিল যে অনেক ভদ্রলোকই স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক, কিন্তু 'প্রকাশ্য স্থানে বালিকা প্রেরণ করিতে অসম্মত আছেন এবং তাহা ভদ্র পরিবারের যোগ্য এমন জ্ঞান করে না।'[১৫]

পুরুষ বনে যাওয়ার ভয় যেমন ছিল তেমনই ছিল মেমসাহেবির ভয়। ব্রতপার্বণ পালনে, 'সেঁজুতির ঘর আঁকা'য় যে দেশজতার ঘ্রাণ তা হারিয়ে গেলে টলে যাবে প্রতিস্পর্ধী 'স্ব' চেতনার ভিতটাই। অতএব মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার ঝুঁকি নিতে অনেকেই ছিলেন নারাজ।

বিরোধিতার বিরোধিতা

কী ধরনের চেতনা, আবেগ নারীশিক্ষার প্রবক্তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল সে আলোচনা শুরু করেছিলাম 'অপরাধবোধে'র প্রসঙ্গ দিয়ে। সমাজের যে আদর্শ সঞ্চারিত হয়েছিল তথাকথিত রক্ষণশীলদের মধ্যে সেই আদর্শই প্রেরণা ছিল 'প্রগতিবাদী'দেরও। এ বিষয়ে তাদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ ছিল না। তবে কিছু মানুষ ক্রমশই বুঝতে পারছিলেন যে গৃহের সংরক্ষণ এবং গৃহ ও নারীর অভিন্নতা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন কিছু পরিবর্তন মেনে নিতেই হবে সার্বিক অর্থে এক নতুন সমাজ গড়তে গেলে। মূল আদর্শকে অটুট রেখে যেমন গৃহকেও দিতে হবে নতুন গড়নপেটন তেমন নারীর রূপকল্পেও দিতে হবে নতুন রং, নতুন ব্যঞ্জনা। অন্য ভাবে বললে, বিজাতীয় স্পর্শদোষ থেকে গৃহকে বাঁচাতে তৎকালীন মানুষ যতই তৎপর হন না কেন পরিবর্তিত বাস্তবতার প্রেক্ষিতে অনেকেই অনুভব করছিলেন যে 'প্রথা' বা 'ঐতিহ্যে'র কোনও নিশ্চল অক্ষুণ্ণতা বজায় রাখা সম্ভব নয়; বিজাতীয় স্পর্শকে মেনে নিয়েই প্রথা বা ঐতিহ্যের নতুন নির্মাণ করতে হবে। পুরনো শাস্ত্র যদি এই পরিবর্তনে সম্মতি না দেয় তা হলে লিখতে হবে আধুনিকতার নতুন শাস্ত্র।

পরিবর্তনের এই চেতনার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়েছিল নতুন রোমান্টিক প্রেমের ধারণা ও দাম্পত্য ভাবনা। এ কথা বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের ক্ষেত্রে যাঁরা পশ্চিমি কাব্য সাহিত্যে খুঁজে পেতে শুরু করেছিলেন এক নতুন বৌদ্ধিক, নৈতিক ও নান্দনিক চেতনার অভিজ্ঞান। এ ছাড়া গ্রামজীবন থেকে শহুরে জীবনচর্যার অনেক পার্থক্য ছিল। জীবিকার প্রয়োজনে বাড়ি থেকে দূরে বসবাসের প্রয়োজন তৈরি হচ্ছিল— অর্থাৎ পরিবার পরিজনের আবেষ্টনীর বাইরে কেবল স্বামী-স্ত্রীর নিবিড় বসবাস। যেমন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বোম্বাই প্রবাসকালে জ্ঞানদানন্দিনী ও তাঁর জীবন এই নতুন দাম্পত্যেরই সূচনা। আবার সাহেবি অফিস দপ্তরে কর্মসূত্রে অনেক বাঙালি পুরুষই পশ্চিমি সামাজিকতার ধরনধারণের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিলেন। বহু লেখাতেই পড়া যায় যে স্বামী-স্ত্রী একত্রে সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদানের সাহেবি প্রথা তাদের মনে নিজেদের দাম্পত্যজীবন

সম্পর্কে এক অভাববোধ সৃষ্টি করছিল। আর এই অভাববোধকে বাড়িয়ে তোলে রোমান্টিক প্রেমের ধারণা। স্ত্রী হবে স্বামীর নিত্য সহচরী, তাঁর সুখদুঃখের সাথী, ভ্রমণে যথার্থ সঙ্গিনী আর *গৃহসৌন্দর্যস্রষ্টা— অর্থাৎ যথার্থ অর্ধাঙ্গিনী*, 'অশিক্ষিত', 'জড়ভরত', 'গ্রাম্যতা দোষযুক্ত' 'প্রাচীনা' এই দাম্পত্যের স্বপ্নে নিতান্তই বেমানান। "স্বামী যখন পৃথিবী থেকে সূর্য ও নক্ষত্রের দূরত্য (তদেব) মাপেন, স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থ... মাপেন। স্বামী যখন কল্পনা(র) সাহায্যে আকাশে গ্রহনক্ষত্রবেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন, স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, এবং রাধুণীর (তদেব) গতি নির্ণয় করেন"[১৬]— নতুন স্বপ্নের দুনিয়ায় এ গার্হস্থ্য ছিল নিতান্তই অচল।

স্ত্রীকে হতে হবে 'helpmeet of man'— এই ভিক্টোরীয় আদর্শ যে তৎকালীন বহু বাঙালিকেই প্রভাবিত করেছিল তার যথেষ্ট নজির আছে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে নিজেদের সমাজ জীবনে তাঁরা ভিক্টোরীয় আদর্শের অন্ধ অনুকরণ করতে চেয়েছিলেন। 'ঐতিহ্য' ও আধুনিকতার নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে তাঁরা রূপ দিতে চেয়েছিলেন এমন এক নতুন মেয়ের যে দেশজ কিন্তু প্রাচীনা নয়, শিক্ষিতা কিন্তু স্বেচ্ছাচারী বা মেমসাহেব নয়।

> "পরন্তু তুমি (স্ত্রী) তাঁহার (স্বামীর) সন্তানের জননী, গৃহের গৃহিণী, ক্ষুধা তৃষ্ণায় তৃপ্তিদায়িনী, সুখালাপে পরিতোষিণী, মর্য্যাদাপালনে কুটুম্বিনী, উপদেশে অন্তেবাসিনী, সেবায় আজ্ঞাকারিণী, বিষয়কর্মে মন্ত্রিণী, সৎকর্মে সহকারিণী, উৎপথগমনে বন্ধনী, বিপদতরঙ্গে তরণী, শোক ব্যথায় সন্তাপহারিণী, রোগশয্যায় স্বাস্থ্যরক্ষিণী, ক্লেশ পরম্পরায় শান্তিবিধায়িনী, গুরু-পিতৃ-মহাজন-সমীপে ঋণশোধিনী, দেবগৃহে শুভাথিনী এবং সমস্ত জীবনপথে সহায়িনী।[১৭]

নতুন গৃহিণীর কাছ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বসুর দাবি যে জব্বর ছিল সে বিষয়ে সকলেই একমত হবে। সেকালের গৃহধর্মের অন্যান্য উপদেষ্টারা কমবেশি এরকমই 'আদত' দাবি করেছেন গৃহিণীদের কাছ থেকে। যাই হোক একটা বিষয় স্পষ্ট যে, ভিক্টোরীয় আদর্শ পেছনে থাকলেও নতুন গৃহিণীকে একটি দেশজ মোড়ক দেওয়ার বেশ সুবন্দোবস্ত হয়েছিল। তবে অবশ্যই এত গুণ যাঁর থাকবে তাকে শিক্ষিত তো হতে হবেই।

অতএব নতুন নারীর আদর্শে গৃহ ও নারীর অভিন্নতার ধারণা বরং আরওই জোরদার হয়েছে। তথাকথিত রক্ষণশীলরা যখন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে শিক্ষা নারীকে তার স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করবে, তাকে 'মেমসাহেব' বানিয়ে দেবে, তখন 'প্রগতিশীল'দের উত্তর অনেকটা কৈফিয়তের মতো শোনায়। হাজার উদাহরণ দর্শিয়ে তাঁরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে শিক্ষা নারীর সুকুমার প্রবৃত্তিকেই উন্নততর করবে, তাকে কখনওই গৃহবিমুখ করবে না। যাঁরা সেকালে বিলেত গিয়েছিলেন তাঁরা প্রত্যক্ষ দর্শকের কর্তৃত্ব নিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন যে, মেমসাহেবির ভীতি অমূলক; বরং বিলিতি সমাজের মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা ঠিক সে সমস্ত গুণেরই অধিকারিণী যা ভারতীয়রা তাঁদের মেয়েদের কাছ থেকে আশা করেন। *য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রে* রবীন্দ্রনাথের ইংরেজ মেয়েদের প্রশংসা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিরক্ত করে

এবং তিনি তাদের 'অলসতা' ও 'ফ্যাশনসর্বস্বতা'র প্রতি কটাক্ষ করে প্রতিবাদ লেখেন। এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনোভাব আর একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন—

> "ফ্যাশনী মেয়ে ছাড়া বিলেতে আরো অনেক রকম মেয়ে আছে, নইলে সংসার চলত না। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মেয়েদের অনেকটা মেহনত করতে হয়, বাবুয়ানা করলে চলে না। সকালে উঠে একবার রান্নাঘর তদারক করতে হয়, সে ঘর পরিষ্কার আছে কিনা, জিনিসপত্র যথাপরিমিত আনা হয়েছে কিনা, যথাস্থানে রাখা হয়েছে কিনা ইত্যাদি দেখাশুনো করা; রান্না ও খাবার জিনিস আনতে হুকুম দেওয়া, পয়সা বাঁচাবার জন্য গিন্নিপনার চাতুরী খেলা... এই রকম নানা গৃহিণীপনা। তারপর ছেলেদের জন্য মোজা কাপড়-চোপড়, এমনকী, নিজেরও অনেক কাপড় নিজে তৈরি করেন।"[১৮]

অতএব 'মেমসাহেবিয়ানা' যদি প্রকৃত মেমসাহেবদের মধ্যেই না থাকে তা হলে বাঙালি মেয়েদের নিয়ে ভয় কি? বিবেকানন্দ বিলেতে মধ্যবিত্ত মেয়েদের দেখে এতই মুগ্ধ হন যে তাদের সম্পর্কে আদ্যন্ত দেশজ 'গৃহলক্ষ্মী'র উপমা ব্যবহার করতেও পিছপা হলেন না।[১৯] একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, জাতীয়তাবাদ যে মাতৃকার 'শক্তিরূপিণী' কল্পচিত্র গড়েছিল তা নিতান্তই এক বিমূর্ত ভাবনা। রক্তমাংসের মাতৃকাদের জন্য তোলা ছিল 'লক্ষ্মী' কিংবা অন্নদাত্রী 'অন্নপূর্ণা'র রূপকল্প। ভারত সাহিত্যের পঞ্চকন্যা— দ্রৌপদী, তারা, অহল্যা, কুন্তি এবং মন্দোদরী— বহু গুণান্বিতা হওয়া সত্ত্বেও সকলেই কোনও না কোনও ভাবে অনুশাসনের সীমা লঙ্ঘন করেছিলেন। তাই বাঙালি মেয়ের চিত্রণে এঁদের কোনও অংশীদারিত্ব নেই। এঁদের তুলনায় অনেক বেশি সন্তোষজনক ছিলেন সীতা, সাবিত্রী কিংবা লক্ষ্মী।

আবার পুরনো প্রসঙ্গে ফেরা যাক। আমরা দেখতে পাচ্ছি নবীনা প্রাচীনার থেকে আলাদা হলেন, কিন্তু বদলাল না তার সামাজিক পরিসর। নারীশিক্ষার ধারণা যে নারীর স্বাধীন জীবিকা গ্রহণের ধারণা থেকে বিযুক্ত ছিল তাই নয়, সামাজিক ভাবে এর পক্ষে যুক্তিও খাড়া করা হয়। এ প্রসঙ্গে *সাহিত্য* (১৮৯১) পত্রিকায় প্রকাশিত 'শিক্ষিতা নারী' প্রবন্ধটির বিরুদ্ধে *সাধনা* পত্রিকায় অস্বাক্ষরিত প্রতিবাদ (রচনাশৈলী থেকে প্রায় নিশ্চিত হওয়া যায় যে লেখক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'শিক্ষিতা নারী' প্রবন্ধে কৃষ্ণভাবিনী দাস ইউরোপ ও আমেরিকায় নারীশিক্ষার অগ্রগতি ও নারীদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার সপ্রশংস বিবরণ দেন। তিনি জানান যে, ওয়াশিংটনে মহিলা আইনজীবীরা অনেকেই পুরুষ আইনজীবীদের থেকে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং সেখানকার অত্যন্ত কৃতবিদ্য ডাক্তারদের মধ্যে Susan Stackhouse এবং Clara Marshall এর মতো মেয়েরা জায়গা করে নিয়েছেন। এই সপ্রশংস বিবরণে বাঙালিদের মধ্যে মেয়েদের চাকরি করা নিয়ে বিরূপতার প্রতি প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ ছিল।[২০] *সাধনা* পত্রিকায় সেই বছরই এক অস্বাক্ষরিত প্রতিবাদ প্রবন্ধ বের হয়। লেখক নারীশিক্ষার গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়ে বলেন যে, স্বাধীন জীবিকা গ্রহণ মেয়েদের প্রকৃতির অনুসারী নয়। বাইরের নিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার জগতে যেখানে পুরুষ তার 'সাবভৌম, স্বার্থপর' নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে রেখেছে সেখানে

মেয়েদের স্বাভাবিক, সুকোমলবৃত্তির বিকাশ ঘটা অসম্ভব। তিনি আরও বলেন যে, প্রকৃতি যাঁদের জননী হিসেবে গড়েছেন তাঁরা শিক্ষা আহরণ করবেন বিতরণের জন্য, 'দোকানদারির' জন্য নয়। অতএব ইংল্যান্ড বা আমেরিকায় যা ঘটছে তা ভারতেরও উন্নতির পথ হবে এমন ভাবা ঠিক নয়।[২১]

কেন দুনিয়ার 'দোকানদারি' মেয়েদের জন্য নয় তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে নারী-পুরুষের আদর্শ সম্পর্কের বিবরণে।

> "সমুদায় কঠিন গুণে মনুষ্য সুসজ্জিত, সমুদায় কোমলভাবে বামাগণ ভূষিত, ইহাদের পরস্পরকে বৃক্ষ ও লতার ন্যায় তুলনা করা যায়। পুরুষেরা দৃঢ়কায় বৃক্ষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরা তাহার শোভা পুষ্পিত লতাস্বরূপ। যখন লতা বৃক্ষকে আবেষ্টন করিয়া থাকে তখনই সে সরল হইয়া উঠিতে পারে এবং মনোহর কুসুমধারণ করিয়া সব দিক উজ্জ্বল করে, বৃক্ষ লতার সহযোগে পরম মনোহর হয়।[২২]

উনিশ শতকীয় নারী আদর্শের এই বিস্তারে নিরসন হয় প্রাচীনা নবীনার দ্বন্দ্ব, নিরসন হয় রক্ষণশীলতা বনাম প্রগতিবাদের লড়াই।

একটি বিষয় পরিষ্কার করা দরকার। এই পুরো আলোচনা পুরুষের প্রসঙ্গে করার মানে এই নয় যে সেকালের মেয়েরা এই আদর্শ গঠনের প্রক্রিয়ার অংশভাগী ছিলেন না। কোনও প্রভুত্বদায়ী মতাদর্শই সার্বিক সামাজিক স্বীকৃতি ছাড়া গড়ে উঠতে বা টিকে থাকতে পারে না। অভ্যন্তরীণ সমালোচনা অবশ্যই ছিল, (যা নারী এবং পুরুষ উভয়কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছিল) তবে অন্তত বিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত তা একেবারেই জোড়দার হয়নি।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে উনিশ শতকের 'গার্হস্থ্যকরণ' বা domesticisation এর আদর্শ বাংলাদেশের বা ভারতে কোনও অভিনব চিন্তা নয়, গোটা শতক জুড়ে নতুন গার্হস্থ্যের অনুশাসন সংক্রান্ত যে সব উপদেশমূলক গ্রন্থ প্রকাশিত এই দেশে তার সঙ্গে আশ্চর্য মিল পাওয়া যায় ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি বা ইতালি থেকে বেরোন domestic manual গুলোর। উনিশ শতকীয় এই প্রবণতাকে প্রায় global domesticity-র আদর্শ হিসেবে অভিহিত করা চলে। তবে এই আদর্শের আড়ালে পশ্চিম এবং ভারতের বাস্তবতা বলা বাহুল্য নিতান্তই আলাদা ছিল, নারীশিক্ষার বিষয়সূচি নিয়ে বাংলাদেশে যখন বিতর্ক চলছিল, ইংল্যান্ডেও তখন সেই বিতর্ক জোরদার। সে সময় ইংলন্ডে যত মেয়ে বিদ্যালয়ের স্তর অতিক্রান্ত করেছিল তার তুলনায় সেই স্তরের শিক্ষিত বাঙালি মেয়ে সংখ্যার দিক দিয়ে প্রায় চোখে না পড়ারই মতো। তবে আশ্চর্য এই যে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি যে সালে মেয়েদের Tripos স্তরে শিক্ষার অধিকার দিয়েছিল তার এক বছর আগেই কাদম্বিনী গাঙ্গুলি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। মনে রাখতে হবে যে, বাংলার নারীশিক্ষার প্রচেষ্টার বয়স তখন খুব জোর চার দশক। একেই বোধহয় অর্থনীতিবিদদের ভাষায় বলে uneven and combined development। কাদম্বিনী যখন বি.এ. ডিগ্রি পেয়েছেন তখনও বাংলাদেশের মেয়েদের মধ্যে সাহেবদের চোখে 'বিস্ময়কর' অশিক্ষার জের চলছে। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার আনুষ্ঠানিক

সম্মতি পেয়ে গেলেও নারীশিক্ষার গতি এখানে তখনও ইউরোপের থেকে অনেক পিছিয়ে। তাই 'গার্হস্থ্যকরণের' ভারতীয়রূপ যে ইউরোপের থেকে অনেক আলাদা হবে তাতে বিশেষ কিছু আশ্চর্যের ছিল না। তা ছাড়া এ কথাও মনে রাখতে হবে যে শিল্পায়নজনিত 'গার্হস্থ্যকরণে'র আদর্শ ইংল্যান্ডে যতই জোরদার হোক না কেন, অনেক দিন ধরেই নারীশিক্ষার সঙ্গে উৎপাদন সংযোগ সেখানে মেনে নেওয়া হয়েছিল। কুইনস্ কলেজ (১৮৪৮) বা বেডফোর্ড কলেজের (১৮৪৯) মতো প্রথম দিকের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো খোলাই হয়েছিল মেয়েদের কর্মোপলক্ষ্যে। এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গৃহশিক্ষিকা বা শিক্ষিকার শংসাপত্র প্রদান করা। অতএব ইংল্যান্ডের বাস্তবতা 'চাপিয়ে দেওয়া গার্হস্থ্যের আদর্শ'কে প্রতিপদে প্রশ্ন করেছে, বিরোধিতা করেছে এবং অতিক্রম করেছে। কিন্তু বাংলাদেশে এমনটা হওয়া সম্ভব ছিল না। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে যে রাজনৈতিক উতরোল শুরু হয় তাতে অনেক মেয়েই 'শাশ্বত মেয়েলি পরিসরে'র সীমা উল্লঙ্ঘন করেছিলেন, এসে পড়েছিলেন 'পুরুষালি রাজনীতি'র চত্বরে। কিন্তু এই সীমা লঙ্ঘনের সঙ্গে নতুন আদর্শ গঠনের বিশেষ কোনও যোগ ছিল না। এ দেশে মেয়েরা যখন সত্যিই চাকরি করতে শুরু করেন তা নিতান্তই অবস্থার চাপে। ১৯৪৭-এর দেশভাগ এবং বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীর আগমনের পর থেকেই এই পরিবর্তন চোখে পড়তে শুরু করে। পূর্ববাংলায় নারীশিক্ষার প্রক্রিয়া যথেষ্ট জোরদার হলেও দেশভাগ না হলে এত মেয়ে চাকরি করতে বেরোতেন বলে কখনওই মনে হয় না।

ক্রমশ, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে 'গার্হস্থ্যকরণে'র আদর্শও সামাজিক জোর হারাতে থাকে। স্বাধীনতার দুই দশকের মধ্যে বোঝা যেতে থাকে যে, নারীর যে-কল্পনা কবি তথা আধুনিক বাঙালি পুরুষ করেছিলেন তা ক্রমশ বর্ণহীন হয়ে আসছে। কিছুটা অবস্থার চাপে আর কিছুটা নারীর স্বতন্ত্র স্বকীয়তায় গড়ে উঠছে আর এক 'মানবী' যার জন্ম মানবী মনেই।

প্রদীপ বসু

নারী-উন্নতি ও বাঙালি পরিবারে নতুন স্বাস্থ্যবিধি

বাংলায় নারীদের ইতিহাস রচনায় সাধারণভাবে একটি বাঁধা ছক দেখা যায়। যে উপাদানের মাধ্যমে বাংলায় নারী-উন্নতির বিবরণ রচিত হয়েছে তার মধ্যে আছে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, অবরোধ প্রথার ভাঙন, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি প্রথার বিরোধিতা, নতুন দাম্পত্য সম্পর্ক; এক অর্থে ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাস। পরবর্তী শতাব্দীর নারীর অবস্থা জানতে এর সঙ্গে যোগ হয়েছে বাংলার অর্থনীতিতে নারীদের যোগদানের বিষয় এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ। বস্তুত ঊনবিংশ শতকে নারীদের পরিবর্তনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ছিল পরিবার-সম্পর্কিত ধ্যানধারণার পরিবর্তন। পরিবারের ডিসকোর্স সৃষ্টি হয় নারী-পুরুষ-শিশুর নতুন সম্পর্ক নিরূপণের মাধ্যমে এবং নানাবিধ জ্ঞানকে পরিবারের চৌহদ্দির মধ্যে এনে পরিবার-পরিচালনার সঙ্গে জ্ঞানগুলিকে যুক্ত করে। সাধারণভাবে নারীর ইতিহাস আলোচনায় ঘর-গৃহস্থালি, সন্তানপালন, রন্ধন ও পরিবেশন ইত্যাদি যে আলোচিত হয়নি তা নয়, কিন্তু তা হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে, পরিবর্তনের বিভিন্ন উপাদানের যেন একটা ক্যাটালগ প্রস্তুত করা হচ্ছে, অনেকটা সেই ভাবে। এই প্রবন্ধে আমি একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলার নারী-উন্নতির বিষয়টি দেখতে চাইছি। বাঙালি নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির ইতিহাসে আমরা এই বিষয়টির উপর খুব একটা গুরুত্ব আরোপ করিনি। বিষয়টি হল পরিবারে স্বাস্থ্যবিধির প্রচলন। পরিবারে স্বাস্থ্যবিধি প্রচলনের ফলে কীভাবে নারীদের অধিকারের এলাকা বিস্তৃত হল, কীভাবে নারী-উন্নতিকামীদের নতুন নারীর সমর্থনে এগিয়ে আসতে সাহায্য করল সেটাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

চিকিৎসাবিদ্যা বোধহয় প্রথম পজিটিভ জ্ঞান যা বিশেষজ্ঞদের বিদ্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই বিদ্যার মাধ্যমে মানুষকে শুধুমাত্র জানা হয় না, তাকে এক পূর্ব-নির্ধারিত সংশোধন ও সংস্কার ব্যবস্থার অধীন করাও সম্ভব হয়। বস্তুত আজকের চিকিৎসাবিদ্যার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ, তার বাজার, চাহিদা ও জোগানের সম্পর্ক বুঝতে হলে প্রথমে পরিবারের মধ্যে এর অনুপ্রবেশের সূত্রগুলি বুঝতে হবে। উনিশ শতকের বাংলা পত্র-পত্রিকার একটা বড় অংশ

জুড়ে আছে পরিবারে এই স্বাস্থ্যবিধি প্রচলনের কথা। এই পারিবারিক স্বাস্থ্যসচেতনতার লক্ষ্যবস্তু প্রায় সকলেই, কিন্তু এইসব লেখাপত্রে বিশেষ করে শিশু ও নারীদের নিয়ে অনেক বেশি মনোযোগ চোখে পড়ে। এর সঙ্গে সম্পর্কিত আরও যে-সব বিষয়গুলি বারবার উল্লিখিত হয়েছে সেগুলি হল, পরিবারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বাসগৃহের দেখভাল, রোগ পরিচর্যা, পথ্য প্রস্তুতপ্রণালী এইসব। পরিবারে ক্রমশই চিকিৎসাবিদ্যার এই অনুপ্রবেশ এবং পরিবারকে চিকিৎসাবিদ্যা ও তার বিশেষজ্ঞদের অধীন করে তোলার প্রক্রিয়াকে বর্ণনা করার জন্য একটি ইংরেজি শব্দ আছে, মেডিকালাইজেশন। এর কোনও বাংলা প্রতিশব্দ আমি খুঁজে পাইনি। এই প্রক্রিয়াকে আমরা পরিবারের মেডিকালাইজেশন বলতে পারি। এক কথায় বহু মানবিক সমস্যা, নন-মেডিকাল সমস্যা, যখন চিকিৎসাবিদ্যার অন্তর্গত হয়ে পড়ে, তাকেই আমরা মেডিকালাইজেশনের প্রক্রিয়া বলতে পারি। এই প্রক্রিয়ায় দৈনন্দিন জীবন, আচরণ, চিকিৎসাবিধির আধিপত্য, প্রভাব ও নজরদারির অধীনে চলে যায়। এই সব আচরণ, শারীরিক ও মানবিক অবস্থা ইত্যাদির চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কিত সংজ্ঞা সৃষ্টি হয় এবং চিকিৎসকই তার সমাধান করতে পারেন এমন ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবারে প্রথম যাঁরা এই চিকিৎসাবিধির আওতায় আসেন, তাঁরা হলেন শিশু ও নারী। এখানে চিকিৎসাবিধি বলতে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানই প্রধান, কিন্তু পরিবর্তিত ও কিছুটা আধুনিকীকৃত দেশীয় চিকিৎসাবিধিও আছে। এই প্রক্রিয়ার যদি সংজ্ঞা দিতে হয়, তা হলে বলতে হবে এখানে সমস্যার সংজ্ঞা স্থির হয় চিকিৎসাবিধির অনুসারে, ওই বিধির ভাষা ব্যবহার করে, চিকিৎসাবিধির কাঠামোর মধ্যে ও মেডিকেল হস্তক্ষেপের দ্বারা তার নিরাময় করা হয়। আগেই বলেছি এই প্রক্রিয়ায় গবেষকদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে কারণ যা আগে নন-মেডিকেল সমস্যা হিসেবে গণ্য হত, তা ক্রমশই চিকিৎসাবিধির সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। যা ছিল প্রাকৃতিক জীবন প্রণালীর অন্তর্গত যেমন যৌনতা, সন্তানপ্রসব, বার্ধক্য, মৃত্যু সব কিছুই এই প্রক্রিয়ার অধীন হয়ে গেছে।

এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দিই। ভূদেব মুখোপাধ্যায় পরিবার নিয়ে যেমন লিখেছেন, দৈনন্দিন আচার নিয়েও তেমন লিখেছেন *আচার-প্রবন্ধ* (১৮৯৪)। সেখানে সন্তান উৎপাদন বা গর্ভাধান বিষয়ে লিখেছেন: "আর্য্যশাস্ত্র বেদমূল হইতে অর্থাৎ গভীরতম জ্ঞানমূল হইতে, অবধারণ করিলেন যে, পিতৃমাতৃ শরীরে দোষ থাকিলে তাহা সন্তানে সংক্রামিত হয়। এই প্রকৃত তথ্যের অবধারণ করিয়া গর্ভাধান এবং গর্ভগ্রহণযোগ্যতা এবং তদুপযোগী কাল নির্ণয় পূর্বক সন্তান জনন সময়েও পিতামাতার মন যাহাতে একান্ত পশুভাবে ইন্দ্রিয়পরবশ না হইয়া পবিত্র সাত্ত্বিকভাবে প্রণোদিত হয়, আর্য্যশাস্ত্র তজ্জন্য গর্ভাধান সংস্কার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গর্ভাধানকালে পতি পত্নীকে কয়েকটি মন্ত্রার্থ জ্ঞাপন করিবেন। গর্ভাবস্থার দ্বিতীয় সংস্কারের নাম পুংসবন...পুংসবন শব্দের অর্থ পুত্রসন্তানের জনন। গর্ভাশয়স্থিত ভ্রূণ পুত্র হইবে কি কন্যা হইবে, তাহা চতুর্থ মাস পর্যন্ত নিশ্চয়ই হয় না— সামান্যত চতুর্থ মাসের পূর্বে স্ত্রী পুং চিহ্ন জন্মে না। অতএব স্ত্রী পুং চিহ্ন প্রকাশ পাইবার পূর্বেই পুংসবন সংস্কার করিবার বিধি।"[১] বস্তুত সন্তান উৎপাদনের এই যে পদ্ধতি, যেখানে মানুষ মন্ত্র, কাল,

ইত্যাদি ধর্মীয় অনুশাসনের অধীন হয়ে নিজেকে নিযুক্ত করে এবং চিকিৎসাবিধির যে অনুশাসন, এর মধ্যে যে অনেক পার্থক্য একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। অনেকেই এই প্রক্রিয়াকে এক সেকুলার প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করেছেন, যেখানে চিকিৎসাবিধি ধর্মীয় অনুশাসনের স্থানপূরণ করছে, যে ধর্ম এতদিন অবধি সবচেয়ে প্রভাবশালী নৈতিক ভাবাদর্শ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রতিষ্ঠান ছিল। ফলে যা ছিল পাপ, তা পরিবর্তিত হয়েছে অসুস্থতা বা ব্যাধিতে। এই যুক্তি অনুযায়ী চিকিৎসাবিধির এই সেকুলার প্রক্রিয়া যুক্তিবাদের প্রাধান্য সূচিত করে। এ বিষয়ে অন্য একটা মতও আছে। তা হল, আধুনিক চিকিৎসাবিধি বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের জন্য এক ধরনের আত্মসংযমব্রতের কথা বলে, যেমন যৌনরোগ, হৃদরোগ, মানসিক চাপ, ইত্যাদি, তাই এক অর্থে হিতকারী জীবনের ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শ আজকে স্থানান্তরিত হয়ে চিকিৎসা ও শরীরবিধির উপর বর্তেছে। তাই এও এক ধরনের নিরবচ্ছিন্ন ধারা। যাই হোক আপাতত আমরা এই বিতর্কে না গিয়ে পরিবারে চিকিৎসাবিধির প্রয়োগের কথা আলোচনা করি।

স্বাস্থ্যবিধির মূল কথা হল, শরীর রক্ষা, দীর্ঘজীবন লাভ, সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ থাকা, দেহের পূর্ণ বিকাশ লাভ, দেহকল ঠিক রাখা ইত্যাদি। পরিবারের আলোচনায় এই ব্যাপারে পরিবারের নারীদের সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বস্তুত পরিবারের মহিলাদের সঙ্গেই প্রথম সমঝোতা হয় চিকিৎসাশাস্ত্রের। পুরনো দিনে নানাবিধ দেশজ চিকিৎসাপ্রণালী সম্পর্কে বাড়ির মহিলাদের সাধারণ জ্ঞান থাকত, অনেক সময় দাসদাসীও নানাবিধ টোটকায় পারদর্শী হতেন। পরিবার ও চিকিৎসাশাস্ত্রের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের ফলে, অন্যান্য শিক্ষা জগৎ যা দাসদাসী, ঠাকুমা দিদিমার আয়ত্তে ছিল, তার অনুপ্রবেশের দ্বার ক্রমশই রুদ্ধ হয়ে পড়ে। পরিবারে চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে মাতার বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত মৈত্রীর ফলে পরিবারে নারীকে শিক্ষিকা হিসেবে গড়ে তোলার সম্পর্কে সচেতনতা লক্ষ করা যায়। পরিবারে মাতার এই উপযোগী ভূমিকার ফলে তাঁর অধিকারের এলাকাও বিস্তৃত হয়। এই নতুন অধিকার পরিবারে নারীর মর্যাদাও কিছুটা বৃদ্ধি করে। পরিবারে নারীকে মাতা, শিক্ষিকা এবং চিকিৎসকের সহযোগী হিসেবে উন্নীত করাই মূলত নারী-উন্নতিকামীদের পরিবারে নতুন নারীর সমর্থনে প্রধান যুক্তি হয়ে দাঁড়ায়। তবে বারবার বলা হয়, এ কাজ মোটেও সহজ নয়, অন্যান্য বিষয়ের মতো এই ব্যাপারেও তাঁকে শিখতে হবে অনেক। *স্বাস্থ্য* পত্রিকার একটি লেখায় বলা হয়েছে, মেয়েরা নানাবিধ পরীক্ষা পাশ করছেন এটা নিশ্চয়ই আনন্দের কথা কিন্তু "তাহাদিগকে ব্যক্তিগত শারীরিক স্বাস্থ্য ও গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষিতা করিতে না পারিলে স্ত্রী-শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গহানি থাকিয়া যায়। আমাদের বর্তমান নারীসমাজ এ বিষয়ে তাঁহাদের অত্যতিবৃদ্ধা ঠানদিদিদের অপেক্ষা অনেক নীচে নামিয়া পড়িয়াছেন, এ কথা বোধহয় কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।"[২] এ বিষয়ে তা হলে শিক্ষণীয় কী? "আমাদের বিবেচনায় প্রাণিবিদ্যা, শরীর সংস্থান সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান, শুশ্রূষা, আঘাত প্রভৃতি দৈব দুর্ঘটনার সময়ে কর্তব্যতা, গৃহের পরিচ্ছন্নতা ও বায়ু সমাগমতা, খাদ্য-আহার ব্যবহার, রন্ধনপ্রণালী, বিশুদ্ধ বায়ু, সুখাদ্য, পরিচ্ছন্নতা, উপযুক্ত ব্যয়াম, বিশ্রাম ও পরিচ্ছদ বিষয়ক পরিপাট্য এই গুলিই স্ত্রী শিক্ষার

অন্তর্ভুক্ত হওয়া নিত্য আবশ্যক।"[৩] এরও অনেক আগে *বামাবোধিনী পত্রিকা*-য় লেখা হয়: "স্ত্রীলোকদিগের অন্যান্য শিক্ষার ন্যায় চিকিৎসার প্রকরণও কিছু কিছু শিক্ষা করা আবশ্যক। যে সে পীড়ায় ডাক্তার ডাকা সহজ ও উপকারক নয়। তাঁহাদিগের আপনাদের এবং ছেলে মেয়ের এমন পীড়া সকল হইয়া থাকে তাহাতে ডাক্তার ডাকার গোল করিতে গেলে প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা, অনেক সময় তাহাতে কেবল মিছামিছি অর্থ ব্যয় করা হয় মাত্র, এবং কোন কোন সময় তাহাতে উপকার না হইয়া অপকারও হইয়া থাকে।"[৪] পরিবারে নারীকে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয় এবং সব ক্ষেত্রেই এই জ্ঞান তাঁর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়: "সাধারণত স্ত্রী রূপেই বল, পত্নী রূপেই বল, গৃহস্বামিনী রূপেই বল, ধাত্রী রূপেই বল, শিক্ষয়িত্রী রূপেই বল আর সাধারণ ভাবেই বল, স্ত্রীজাতির মধ্যে এই জ্ঞান যত অধিক বিস্তৃত হইবে সমাজের ততই মঙ্গল সাধিত হইবে।"[৫] এই উদ্যোগের একটি প্রধান ইতিবাচক দিক হল এখানে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে নারীকেও তার নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ দিতে বলা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদের নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অত্যন্ত অবহেলা করতে দেখা যায়। সহজে কেউ নিয়মে শয়ন, ভোজন, ব্যায়াম করতে চান না। কিন্তু যিনি জননী, পত্নী, গৃহিণী, তাঁর নিজের স্বাস্থ্য ঠিক না থাকলে পরিবারের সামূহিক বিপদ। এর ফলে সন্তান ঠিকমতো মানুষ হবে না এবং দেশ ও সমাজের অকল্যাণ হবে। এই ছিল মোটামুটি যুক্তি। শরীর সুস্থ ও কার্যক্ষম থাকলে পরিবারের মানুষ যে নিজেদের এবং সমাজের উপকারে আসতে পারে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এ ব্যাপারে নারীকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। নারীদের ক্ষেত্রে এই মেডিকালাইজেশন দু' ভাবে তার প্রভাব ফেলেছে: প্রথম হল, নারীর শরীর ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসাবিধির নজরদারিতে চলে এসেছে এবং দ্বিতীয় হল, নারী নিজে এই চিকিৎসাবিধির সহযোগীতে পরিণত হয়েছেন। আগেই বলেছি পরিবারে স্বাস্থ্যবিধির জন্য ওকালতি ও তার প্রচলনের একটি প্রধান পরিণাম হল নারীকে এই বিধির সহযোগী গড়ে তোলা। এই প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে: "এইরূপ শিক্ষা পাইলে তাহারা হাতুড়ে হইয়া সমাজের অনিষ্ট করিবে এ কথা মনে করা অসঙ্গত এবং তাহাদের দ্বারা ডাক্তারগণ বিশেষ সাহায্যই পাইতে পারেন, এই জ্ঞান থাকিলেই তাহারা ডাক্তারের উপদেশের সারবত্তা বুঝিতে পারে এবং তদনুসারে কার্য করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং রমণী সমাজে এই জ্ঞান বিদ্যমান থাকিলে সমাজের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।"[৬] স্বাস্থ্যবিধির ব্যাপারে পরিবারে নারীর ভূমিকা বহুবিধ। পত্নী হিসেবে তাঁকে স্বামীর স্বাস্থ্য কীভাবে বজায় থাকে সেদিকে নজর রাখতে হবে, গৃহিণী হিসেবে তাঁকে গৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, রন্ধন ঠিকমতো পরিচালনা করতে হবে, খাদ্য-অখাদ্যের পার্থক্য জানতে হবে, এ ছাড়া রোগীর শুশ্রূষা, ওষুধ সেবন পদ্ধতি, এই সব জ্ঞানও থাকতে হবে, জননী হিসেবে তাঁকে শিশুপালন, সন্তানের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জানতে হবে। বলা হয়েছে, আমাদের দেশে শিশুর অকালমৃত্যুর হার যে খুব বেশি তার কারণ হল মাতা স্বাস্থ্যজ্ঞানসম্পন্না নন। "জননীর স্বাস্থ্যজ্ঞান থাকা আরও আবশ্যক।

তাঁহার সন্তান-সন্ততির রোগিতা আরোগিতা, সবলতা দুর্বলতা, বিকলাঙ্গতা, অঙ্গসৌষ্ঠবতা, অকালমৃত্যু বা দীর্ঘজীবন, তাহাদের ভাবী শুভাশুভ, সমস্তই মাতার স্বাস্থ্যজ্ঞানের উপর নির্ভর করে।"[৭] এই প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে মেয়েরা তাঁদের পাঠক্রমে ইতিহাস, ভূগোলের বহু কিছু 'অপ্রয়োজনীয়' বিষয় শিক্ষা করে, কিন্তু শিশুর প্রাথমিক চিকিৎসা, পুষ্টিকর খাদ্য বা সংক্রামক রোগের সময় কী করতে হয়, কীভাবে বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়, কতক্ষণ পরিশ্রম করতে হয় আর কতক্ষণই বা বিশ্রাম করতে হয়, এইসব অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে কিছুই তাদের জানবার অবকাশ হয় না।

পত্র-পত্রিকায় এ বিষয় যে লেখা প্রকাশিত হতে দেখা যায় তার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষামূলক, পরিবারের নারীর এই বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি করা। এই বিষয়ে একটি অভিযোগ প্রায়ই দেখা যায় তা হল, আগেকার দিনে নারীরা অনেক কিছু জানতেন, কিন্তু এখন তাঁদের এসব বিষয়ে কোনও জ্ঞানই নেই। যেমন লেখা হয়েছে: "আমাদের সেকেলে স্ত্রীলোকেরা যে সকল টোটকা, গাছগাছড়া ব্যবহার করিয়া আমাদিগকে অনেক পীড়া হইতে আরোগ্য করিয়াছেন, অধুনাতন স্ত্রীলোকদিগকে আপনাদিগের এবং সন্তানগণের অনুরোধে যত্নপূর্বক সে সকল শিক্ষা করা উচিত।"[৮] *বামাবোধিনী পত্রিকা*-য় অন্য একটি রচনায় লেখা হয়েছে: "অতি অল্পদিবস পূর্বে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের সকলেই নানা প্রকার পীড়ার কিছু কিছু ঔষধ জানিতেন। এটা তাঁহাদের সাংসারিক অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় একটা শিক্ষণীয় কার্য্য ছিল। বাটীর মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে প্রথমে চিকিৎসকের সাহায্য না লইয়া গৃহিণীরা তাহাদের শিক্ষিত ঔষধ দ্বারা পীড়া শান্তির চেষ্টা করিতেন এবং অনেক স্থলে তাহার সুফলও দেখা গিয়াছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে বালিকারা বিদ্যালয়ে গিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে, তাহারা এই সকল বিষয়ে কিছুই শিক্ষালাভ করিতেছে না।"[৯] আসলে এই জ্ঞান আর ফিরে আসবার নয়। কারণ যা ছিল সাধারণ জ্ঞান, মোটামুটি সকলের আয়ত্তের মধ্যে, তাই এখন বিশেষজ্ঞের চৌহদ্দিতে প্রবেশ করেছে। তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা, বুদ্ধি প্রয়োজন। আগে যে-জ্ঞান শুধু বাড়ির গৃহিণীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, দাসদাসী, পরিবারে অধীনস্থ নিম্নবর্গের মানুষরাও অনেক সময় এ ব্যাপারে সাহায্যকারী ভূমিকা পালন করতে পারতেন, সেই জ্ঞানের চরিত্র কিন্তু ক্রমশই পালটে যেতে থাকল। এ এক নতুন বিশেষণীকরণ, যা জন্ম দিয়েছে এক নতুন এক্সপার্টদের। মজার কথা হল যাঁরা লিখছেন পুরনো বিদ্যা ভুললে চলবে না, তাঁরা যখন পরিবারে যথাযথ ভূমিকা পালনের জন্য নারীকে কী কী শিখতে হবে তার তালিকা উপস্থিত করেছেন তখন দেখা যাচ্ছে তাঁরা আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার কাঠামোর মধ্যে থেকেই তা করছেন। যে লেখা থেকে একটু আগেই উদ্ধৃতি দিয়েছি, সেই লেখায় একটু পরেই বলা হয়েছে: "স্ত্রীলোকেরা যখন রোগীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হয়েন, তখন নাড়ীজ্ঞান ও ঔষধাদির গুণাগুণ তাঁহাদের জ্ঞাত থাকা বিশেষ আবশ্যক, কারণ রোগীর নাড়ীর অবস্থা ও রোগের অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা তিনি জানিতে পারিলে সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারেন।"[১০] সবচেয়ে বড় কথা হল বেশ কিছু মানসিক গুণের অধিকারী হলেই এই কাজের জন্য উপযুক্ত হওয়া যাবে: "শুশ্রূষাকারিণী স্ত্রীলোকদের যে যে গুণ থাকিলে তাঁহারা রীতিমত

রোগীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়া নিজের দায়িত্বসম্পন্ন করিতে পারেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে। শুশ্রূষাকারিণী স্ত্রীলোকের বিবেচনা, প্রফুল্লতা, ধৈর্য্য, প্রাত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং আত্মসংযম গুণ থাকা আবশ্যক।"[১১] বিবেচনা এই জন্য যে তিনি রোগীর মনের ভাব বুঝতে পারবেন, রোগী কখন বিরক্ত হয়, কখন রোগীর সঙ্গে কথা বলতে হবে, রোগী কাকে দেখতে চান, কখন সাক্ষাৎকারীকে বিদায় করবেন, এইসব কাজ ঠিক ঠিক করতে পারবেন। প্রফুল্লতা থাকলে, 'তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেই বোধ হইবে যেন গৃহ আলোকময় হইল', ধৈর্য থাকলে রোগীর কাছে ধীরস্থির ভাবে থাকতে পারবেন, তাঁর অসংলগ্ন ব্যবহার অম্লান বদনে সহ্য করতে পারবেন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকলে রোগীর অবস্থা পরিবর্তনে ভীত হবেন না, চিকিৎসককে ঠিক কীভাবে সাহায্য করতে হবে জানা থাকবে এবং 'মুখে সর্বদা সাহস বিরাজ করিবে।' আত্মসংযম থাকলে মনের ভাব গোপন করার ক্ষমতা থাকবে, যেমন রোগীর জীবনের আশা নাই, 'তখনও আশাপূর্ণ বাক্যে কথা কহিতে হইবে।' কাঁদা বন্ধ করার শক্তি থাকবে, রোগীকে স্থির ভাবে উত্তর দেবার জোর থাকবে।[১২] সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি জ্ঞানের নতুন তন্ত্র সেলফ বা আত্মনের নতুন প্রযুক্তি হিসেবে ক্রিয়াশীল। বস্তুত এই বিশেষ জ্ঞান দাবি করছে যে যাঁরা একে ব্যবহার করবেন তাঁদের নিজেদেরও পরিবর্তন করতে হবে। যে যে গুণ এই বিদ্যা পরিবারের সদস্য থেকে দাবি করে সে সব গুণ পরিবারকেও সমৃদ্ধ করে।

দুই

পরিবারে চিকিৎসাবিধির প্রচলন এবং পরিবারকে ক্রমশ চিকিৎসাবিধির অধিক্ষেত্রে পরিণত করার ফল হল যা কিছু 'স্বাস্থ্য' বা 'পীড়া'র সঙ্গে যুক্ত তাই এর নজরদারির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। পরিবারে চিকিৎসাবিধির অন্তর্ভুক্তি এক সামাজিক নিয়ন্ত্রণও বটে, কারণ এই বিধিই ঠিক করে দেয় সঠিক আচরণ, খাদ্যাভ্যাস এবং সম্পর্ক। অন্য ভাবে দেখলে এই বিদ্যা পরিবারে এক নৈতিক ব্যবহারবিধি নির্দিষ্ট করে দেয় যেখানে ঠিক ভুল, উচিত অনুচিত, সংগত অসংগত, এই সব কিছুর সীমারেখা খুব স্পষ্ট। এই সামাজিক নিয়ন্ত্রণ যেমন চিকিৎসাবিধির ভাবাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত, তেমনি তা সম্পর্কিত চিকিৎসকের এক বিশেষ ভূমিকার সঙ্গে যেখানে তিনি সহযোগী, বিশেষজ্ঞ ও তথ্য সরবরাহকারী। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল চিকিৎসাবিধির নজরদারি, সেখানে কিছু বিশেষ আচরণ বা অবস্থা চিকিৎসাশাস্ত্রের 'কড়া নজরে' চলে আসে। মেডিকালাইজেশনের এই প্রক্রিয়া কিন্তু একতরফা, উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয় বরং এই বিদ্যা ও পরিবারের মানুষদের পারস্পরিক সহযোগিতার উপর নির্ভর। মনে রাখতে হবে কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিধির কর্তৃত্ব যেমন সম্পূর্ণ, তেমনি কিছু ক্ষেত্রে এই কর্তৃত্ব আংশিক। সর্বপ্রথম যে অবস্থাগুলি বা ক্ষেত্রগুলি এই বিধির আয়ত্তে আসে তা হল প্রসূতি, সন্তান প্রসব, শিশুপালন, যৌনতা ইত্যাদি। আজকে আমরা দেখতে পাই নারীর প্রজনন-সংক্রান্ত সব কিছুই চিকিৎসাবিধির অন্তর্গত, যেমন, সন্তানপ্রসব, জন্মনিয়ন্ত্রণ, বন্ধ্যাত্ব, গর্ভপাত, আর্তবক্ষয় বা ঋতুনিবৃত্তিকাল,

ইত্যাদি। এর সঙ্গে অবশ্যই যোগ করা যায় মেদবাহুল্য, অ্যানোরেক্সিয়া প্রভৃতি সমস্যাগুলি। এটা পরিষ্কার যে নানাবিধ জটিল কারণে নারীর প্রাকৃতিক জীবনপ্রক্রিয়া এবং বিশেষ করে প্রজনন-সংক্রান্ত বিষয়গুলি চিকিৎসাবিধির আয়ত্ত ও নজরদারিতে অনেক দ্রুত এসে পড়েছে। চিকিৎসাবিধির এই প্রক্রিয়া বুঝতে তাই লিঙ্গভেদ একটা গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড নিশ্চয়ই। যাই হোক, পরিবারের এই নতুন ডিসকোর্সের আরম্ভ থেকে চিকিৎসাবিধির কর্তৃত্বের প্রসারের ফলে আমরা দেখব কীভাবে মাতার আচার-আচরণ, পারিবারিক কাজকর্ম, আহার বিশ্রাম, এই সব কিছুর ভালমন্দ নির্ধারিত হচ্ছে। যেমন যে-জননী গর্ভবতী তাঁকে কীভাবে নিজের ও শিশুর খেয়াল রাখতে হবে এ কথা বলতে গিয়ে এক লেখক বলেছেন: "এখন দেহরক্ষার নিয়ম সকল তাঁহাকে অকাট্য রূপে পালন করিতে হইবে। স্নান, আহার, ব্যায়াম, বিশ্রাম বিশেষ নিয়ম সহকারে সম্পাদন করিতে হইবে। প্রতিদিন ঠিক সময়ে তাঁহার স্নান আহার করা নিতান্ত কর্তব্য। এ সম্বন্ধে একটু অবহেলা হইলে তাঁহার নিজের অধিক না হউক, গর্ভস্থ শিশুর কিন্তু নূতন দেহের অতিশয় অনিষ্ট হয়।"[১৩] আজকের দিনে এই নির্দেশে কোনও নতুনত্ব নেই, এই ধরনের উপদেশ দেবার প্রয়োজনও হয় না, কারণ এই ব্যবহারবিধি আমরা অন্তস্থ করে নিয়েছি। কিন্তু এই অন্তস্থীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয় এই রকম খুঁটিনাটি নির্দেশের মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গেই পূর্ববর্তী লেখক আরও বলেছেন যে, নবজাত শিশুরা যে চিররুগ্ণ হয় এবং প্রায়ই যকৃৎ, প্লীহা ইত্যাদি রোগে অকালে প্রাণত্যাগ করে, তার প্রধান কারণ হল জননীর স্বাস্থ্যরক্ষার অনিয়ম: "মাতার পক্ষে যাহা সামান্য অনিয়ম, শিশুর পক্ষে তাহাই ভীষণ কাল। অতএব মাতা যেন এ বিষয়ে সতর্ক হন।"[১৪]

পরিবারে শিশুর এই গুরুত্বের নানাবিধ কারণ আছে, একটি প্রধান কারণ স্বাস্থ্যের রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। উপনিবেশতন্ত্রে 'পপুলেশন' বা জনসাধারণ তার জন্মমৃত্যুর হার বা অন্যান্য নানাবিধ আঞ্চলিক ও কালিক বৈশিষ্ট্যসহ শুধুমাত্র সমস্যা হিসেবে প্রতিভাত হয়নি, নজরদারি, বিশ্লেষণ, হস্তক্ষেপ ও রূপান্তরের বিষয়বস্তুও হয়ে ওঠে। এই সময়েই আমাদের দেশে জনসংখ্যার প্রযুক্তির সূত্রপাত, যা ইউরোপে শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে বিশ্লেষিত হতে থাকে জনসংখ্যার জন্ম, মৃত্যু, রোগ, ইত্যাদির পরিসংখ্যান, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ধন উৎপাদনের সম্পর্ক, বিবাহ ও বংশবৃদ্ধি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এই সব সমস্যার মধ্যেই অবস্থান করছে 'শরীর'-এর এক নতুন পরিচয়। এই শরীর ব্যক্তিরও আবার জনসংখ্যারও। নতুন জমানায় এই শরীরও বেশ কিছু পরিবর্তমান নতুন বৈশিষ্ট্যের বাহক হয়ে ওঠে। এই পরিবর্তমানতা শুধুমাত্র আর ধনী দরিদ্র, সবল দুর্বল, স্বাস্থ্যবান অসুস্থ, এই সব বিভাজনের উপর নির্ভর নয়, এর সঙ্গে যুক্ত হয় কারা বেশি উপযোগী, কাদের বেশি বা কম বেঁচে থাকা, রোগ বা মৃত্যুর সম্ভাবনা, কারা বেশি বা কম প্রশিক্ষণ পাবার উপযুক্ত। এক কথায় জনসংখ্যার জৈব প্রলক্ষণগুলি অর্থনীতির পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে এবং তার ফলে এমন এক কাঠামো নির্মাণ আবশ্যক হয়ে পড়ে যেখানে জনসংখ্যার অধীনতাই শুধু সুনিশ্চত হবে না, তার উপযোগিতাও বৃদ্ধি পাবে। এই কারণেই পরিবারের মেডিকালাইজেশনেও শিশুর উপর গুরুত্ব।

নতুন এই পরিবারের ধারণায় 'শিশুর' সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'শৈশবের' সমস্যা। অর্থাৎ শিশুর জন্মহার, ব্যাধি, মৃত্যুহার ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও কিছু বিষয়, যেমন: সে সাবালকত্ব অর্জন করতে পারবে কি না, এর জন্য কী কী ধরনের শারীরিক ও অর্থনৈতিক শর্তাবলী পালন করতে হবে, তাকে উপযোগী করে তোলার জন্য কী ধরনের বিনিয়োগ প্রয়োজন, এই সব। এক কথায় শিশুকে বড় করার সঠিক প্রকৌশল। ঠিক এই জন্যই শিশুপালন নিয়ে এত লেখা, শিশু ও বড়দের সম্পর্কে এক নতুন ও বিশদ নিয়মকানুনের ক্রমপ্রতিষ্ঠা চোখে পড়ে। বাংলা পত্র-পত্রিকায় শিশুপালন নিয়ে লেখাগুলি দেখলেই এ বিষয়ে বেশ পরিষ্কার ধারণা হয়। শিশুকে কত মাস অবধি ঠিক কতবার দুধ পান করাতে হবে, গাধার দুধ, গোরুর দুধ, ছাগলের দুধের তুলনামূলক উপযোগিতা, মাতৃদুগ্ধ কতদিন পান করা উচিত, স্তনপান বিধি ঠিক কী রকম হবে, শিশুর বিভিন্ন পীড়ায় কী কী কর্তব্য, শিশুর রোগের কী কী ধরনের উপসর্গ, শিশুর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, উপযুক্ত পোশাক-পরিচ্ছদ, এই সব বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ এই সব লেখায় পাওয়া যাবে।[১৫] যেটা লক্ষণীয় সেটা হল এই নতুন সম্পর্কে পিতামাতার উপর নানাবিধ নতুন দায়দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, এই কর্তব্যবন্ধন অনেকটাই শিশুর শরীরপালনবিধি সম্পর্কিত, যেমন, যত্ন, সংস্পর্শ, সংযোগ, পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধির প্রয়োগ, মায়ের দ্বারা শিশুর স্তন্যপান, উপযুক্ত ব্যায়াম, পোশাক-পরিচ্ছদ, ইত্যাদি যার মাধ্যমে শিশুর সঠিক বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করা যায়। এই হল শিশু ও বয়স্কের মধ্যে স্থায়ী ও যথার্থ শারীরিক সম্পর্ক। সুতরাং পরিবার এখন শুধুমাত্র সম্পর্কের বিন্যাস রইল না, শুধুমাত্র জ্ঞাতি-সম্পর্কের তন্ত্র বা সম্পত্তি হস্তান্তরের প্রতিষ্ঠানও নয়। এই নতুন দায়দায়িত্ব, সম্পর্ক, কর্তব্যবন্ধনের ফলে পরিবার হয়ে উঠবে এক নিবিড়, পরিপৃক্ত, স্থায়ী, অবিচ্ছিন্ন ভৌত পরিমণ্ডল যেখানে শিশুর শরীর আবরিত ও সুরক্ষিত থাকবে, প্রতিপালিত ও বিকশিত হবে। সুতরাং পরিবার এখানে এক বস্তুগত ফিগারের রূপ পায়, পরিবার নিজেকে সংগঠিত করে শিশুর অব্যবহিত পরিমণ্ডল হিসেবে এবং ক্রমশই তার জীবনধারণ ও বিকাশের এক মৌল কাঠামো হয়ে উঠতে থাকে। এর ফলে মাতাপিতা ও সন্তানের পরিবারও আরও দৃঢ়সংবদ্ধ হয়, একই সঙ্গে কিছু অক্ষেরও অন্তরাবর্তন হয়, যেমন দাম্পত্য সম্পর্ক এখন আর শুধু দুই বংশের যোগাযোগস্থল নয়, বরং হয়ে ওঠে শিশুকে বড় করে তোলার এক কাঠামো। এই নতুন 'দাম্পত্য' এখন অবস্থান করে পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্কের মধ্যে। প্রথাগত ব্যবস্থায় পরিবার ছিল দুই বংশের বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে কুটুম্বিতার এক পরিসর, এই কুটুম্বিতার সম্পর্কের অভ্যন্তরে নতুন পরিবার নিজেকে শিক্ষণপ্রণালীর এক যন্ত্র হিসেবে সংহত করে। একই সঙ্গে স্বাস্থ্য এবং বিশেষ করে শিশুদের স্বাস্থ্য, পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হয়ে ওঠে। এই সময় থেকেই সুস্থ, পরিচ্ছন্ন শরীর, পরিশুদ্ধ, বাতান্বিত গৃহের পরিসর এবং যত্ন, দায়িত্ব, সেবা, পরিবারের এক অপরিহার্য উপাদান হিসেবে গণ্য হতে থাকে। আর পরিবারও চিকিৎসাবিধি প্রয়োগের এক স্থায়ী এজেন্ট হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে যায়। শিশুদের টিকাদানের যে ক্যাম্পেন শুরু হয়, তাও সংঘটিত হয় শিশুর পরিবারের উপর দায়িত্ব এবং খরচ চাপিয়েই।

তিন

একটু আগেই বলেছি নতুন স্বাস্থ্যবিধির আদর্শ হল পরিবারকে এক হাইজিনিক মেশিনে পরিণত করা। অবশ্যই বাস্তবে এটা সম্পূর্ণভাবে কোনও দিনই সম্ভব হবে না। কিন্তু গৃহের স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত নানাবিধ লেখাপত্রে আমরা দেখি বিস্তারিত নির্দেশাবলী, পরামর্শ ইত্যাদি। যেমন বাসগৃহ নির্মাণ করতে হলে এই বঙ্গদেশে ঠিক কী কী করতে হবে তার বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন, "বাঙ্গলা দেশে সাধারণ পূর্ব ও দক্ষিণ দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। সুতরাং বাড়ির সেই দুইটি দিক খোলা হওয়া প্রয়োজন। সেই দুই দিক চাপা হইলে বাড়ি অস্বাস্থ্যকর হয়। পায়খানা বাড়ির পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে কখনও হওয়া উচিত নয়। কারণ সেই দুই দিক হইতেই হাওয়া আইসে। যদি সেই দুই দিকে পায়খানা থাকে, তবে পায়খানার ভিতর দিয়া হাওয়া আসিতে দূষিত হইয়া আইসে।"[১৬] সুস্থ পরিবারের জন্য ঘর কেমন হবে, কী ভাবে ঘরে আলো বাতাস আসবে, শয়নগৃহ কেমন হবে, মেঝে কী রকম হবে, বাসগৃহের জন্য কীভাবে ভূমি নির্বাচন করতে হবে এবং সেই জন্য কী কী বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে এই সব কিছুরই বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। *স্বাস্থ্য* পত্রিকায় লেখা হয়েছে, "বাসগৃহের সহিত আমাদের প্রায় ২৪ ঘণ্টার সম্বন্ধ। এই বাসগৃহের নির্মাণ বিপর্যয়েই আমাদিগকে অধিক পরিমাণে রোগগ্রস্ত হইতে হয়।"[১৭] বসবাসের জন্য ঘরের সঙ্গে স্বাস্থ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা পরিবারের স্বাস্থ্যবিধির অঙ্গ হিসেবে এবং বিশেষ করে মহিলাদের শিক্ষিত করে তোলার প্রয়াসে উনিশ শতক থেকে আলোচিত হতে থাকে। একটু বড় উদ্ধৃতি *মহিলা* পত্রিকা থেকে উল্লেখ করছি: "রাত্রিতে শয়নকালে ঘরের দরজা একেবারে বন্ধ করা উচিত নয়। খড়খড়ি সকল এমনভাবে খুলিয়া রাখা উচিত যেন বায়ু ঘরের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়, অথচ গায়ে প্রবল বেগে আসিয়া না লাগে। কড়িকাঠের নিকট দেওয়ালে ফুকর থাকা উচিত। তাহা হইলে নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা যে বায়ু গরম হয় তাহা সেই ফুকর দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারিবে। ঘরে কার্নিস থাকা ভাল নয়, কারণ তাহাতে বড় ধূলি জমিয়া থাকে। ঘরের কোণগুলি গোল হওয়া প্রয়োজন। ঘরের কোণ গোল হইলে কোণে ধূলি জমিতে পায় না। যে ঘরে সূর্যের কিরণ কিংবা বায়ু আসিতে পারে না, তাহা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর, ফিনাইল কিংবা দুর্গন্ধ দূরকারী পদার্থ অপেক্ষাও সূর্যের কিরণ অধিক উপকারী।"[১৮] মনে রাখতে হবে যে সামাজিক শরীরের স্বাস্থ্যের কারণে যেমন গৃহ, বসবাসের স্থানগুলির পরিকল্পিত নির্মাণ প্রয়োজন, সেই রকমই পাবলিক স্পেসও পরিকল্পিত হতে হবে। এই পরিসরের পুনর্নির্মাণ করতে হবে তার অন্ধকার, পূতিগন্ধময় এলাকাগুলিকে আলো, বাতাস ও নাগরিক চেতনার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করে। তাই গৃহ সম্পর্কিত লেখাপত্রে এই জনস্বাস্থ্যের প্রসঙ্গও এসেছে। এবং এই সমস্যার একটি প্রধান কারণ হল গৃহের পয়ঃপ্রণালী যার দোষে নানাবিধ রোগ ছড়াতে থাকে, "যে সকল শহরে অধিবাসীদের মলমূত্র বা আবর্জনাদি শীঘ্র দূরীকৃত না হয়, সেই সকল শহরের মৃত্যু সংখ্যা অধিক, ইহা তালিকা দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে।"[১৯] সেই জন্য কলকাতাবাসীদের লেখক মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, বাড়ি ভাড়া নেওয়ার আগে তার ড্রেন ভালভাবে পরীক্ষা করা

উচিত এবং এর জন্য যদি কিছু অর্থব্যয় হয় তাও স্বীকার করে নেওয়া উচিত, "কারণ তদ্দ্বারা অনেক প্রকার রোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। বাড়িটি দেখিতে ভাল কি না তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু বাড়ির ড্রেন ঠিক আছে কি না সে জ্ঞান এখনও অনেকের সহজলভ্য নয়। ডাক্তার যেমন রোগ পরীক্ষা করিতে হইলে রোগীর বিশেষ বিশেষ অঙ্গ পরীক্ষা করেন, বাড়ির স্বাস্থ্য কুশল কি না তাহা পরীক্ষা করিতে হইলে বাড়ির এই অঙ্গটি অর্থাৎ ড্রেন বিশেষ দ্রষ্টব্য।"[২০] একশো বছর পরেও এই শহর অবশ্য এ ব্যাপারে কোনও কুশলতাই অর্জন করতে পারেনি, এই ক্ষেত্রে আদৌ কোনও উন্নতি করেছে কি না তাও তর্কসাপেক্ষ, কিন্তু সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

পরিবারের এই নতুন ডিসকোর্সে এবং বিধি অনুযায়ী যত্ন, সেবা, শুশ্রূষা, পরিচর্যা, অন্তরঙ্গতা পারিবারিক সম্পর্কের এক আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। যিনি যত্ন নেবেন ও যাঁরা যত্ন বা সেবা পাবে এঁদের পারস্পরিক আন্তক্রিয়ার প্রতিরূপতা পরিবারের এক অপরিহার্য বিষয়ে পরিণত হয়। আগেই বলেছি এই যত্নের মধ্যে শিশুর লালনপালন, তত্ত্বাবধান অবশ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিশুপালনের মধ্যে যেমন স্তন্যপান বিধি, শিশুর আহার নিদ্রা, অঙ্গসঞ্চালন, ব্যায়াম ইত্যাদি আছে, তেমনি মাতাকেও এর জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে তুলতে হবে, তাঁকেও আহারেবিহারে স্বেচ্ছাচারিণী হলে চলবে না, তাঁকে নিজের আহারবিহার সম্বন্ধে নির্দিষ্ট বিধিব্যবস্থা পালন করতে হবে।[২১] শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের এই যে সাহিত্য আমরা দেখি তার মূল কথা হল প্রথাগত শিশুর তত্ত্বাবধানের সমালোচনা, ধাত্রী দ্বারা শিশুপালনের অপকারিতা ও মাতৃস্তন্যপানের উপকারিতা। "যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে কি উপায়ে শিশু সন্তানকে নানা প্রকার রোগ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে আমাদের পরামর্শ এই যে মাতৃস্তন্য ভিন্ন শিশুকে আর কোনও আহার দিবেন না।"[২২] এর কারণ হল: "(১) মাতৃস্তন্য-পালিত শিশুর রোগ অন্য শিশু অপেক্ষা অনেকাংশে কম। (২) এরূপ শিশু সর্বদা সন্তুষ্ট ও স্বচ্ছন্দ থাকে।"[২৩] একই সঙ্গে অন্য যে ক্যাম্পেন শুরু হয়, বিশেষত উচ্চবিত্ত বা অবস্থাপন্ন পরিবারকে লক্ষ করে, তা হল, ধাত্রী দ্বারা শিশুপালনের ক্ষতিকর প্রভাব। "স্তনপান করাইবার জন্য ধাত্রীর অনাবশ্যকতা— সন্তান ধাত্রীর হস্তে প্রতিপালিত হইলে, উহার স্তন পান করিয়া বালক ধাত্রীর পৈতৃক রোগ প্রবণতা ও কিয়দংশ তাহার স্বভাব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ইহা অন্যায় ও নিতান্ত দোষাবহ। অনেক সময় এরূপও দেখা গিয়াছে যে ধাইয়ের দোষে সন্তানের শরীরে নানা প্রকার জঘন্য রোগ জন্মে। এতদ্ভিন্ন এ দেশের ধাত্রী মাত্রেই প্রায় নীচ কুলোদ্ভব। ইহাদের দ্বারা সুকুমার বালকের হৃদয়ে যে কত প্রকার অসৎ প্রবৃত্তির বীজ সংরোপিত হয় তাহা বলা যায় না। এই সমস্ত বিষয় সন্তানের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। মিথ্যা কথন, চৌর্য্যবৃত্তি ও অপরাপর অন্যায়াচরণ আমরা অনেক সময় এই ধাত্রী হইতেই শিক্ষা করি। শৈশবে এই সকল দোষ একবার বদ্ধমূল হইলে আমরা আজীবন উহাতেই লিপ্ত থাকি। এইরূপ জানিয়া শুনিয়া... কোন নরাধম, সন্তানের এই সমস্ত অপ্রতিকার্য দোষ ঘটিবে জানিয়া তাহাকে সহস্তে নরকস্বরূপা ধাত্রীর ক্রোড়ে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।"[২৪] অন্য ভাবে বলতে গেলে সমালোচনা ছিল

শরীরের সংগঠন নিয়ে, যে শরীর, বিশেষ করে মাতার, কোনও উপযোগী কাজে লাগছে না, তা যেন ভোগবাসনার চরিতার্থতার জন্য। এখানে যে অভাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, তা হল শরীরের যথাযথ সংগঠন। ধাত্রী বিষয়ক এই চিন্তাভাবনার অনেকটাই পশ্চিম থেকে নেওয়া। কিন্তু পশ্চিমের লেখাপত্রে ধনী শ্রেণির জন্য সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র শ্রেণির ক্ষেত্রে সন্তান কীভাবে প্রতিপালিত হবে সে চিন্তাও চোখে পড়ে। এই প্রসঙ্গেই সেখানে পাবলিক হাসপাতাল, সমাজসেবা, ফিলানথ্রপি, ইত্যাদির প্রসঙ্গ এসেছে। আমাদের লেখাপত্রে দরিদ্র শ্রেণি ঠিক কীভাবে সন্তানপালন করবে, বা তাদের সন্তানরা ঠিক কী ভাবে বড় হয়ে উঠবে এই বিষয়ে কোনও চিন্তাভাবনা পাওয়া যায় না। পরিবারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধির প্রচলন শুধু বাঙালি ভদ্রসন্তানের জন্য। এর অবশ্য পরিণামও তাই খুব একটা ভাল হয়নি।

পরিবারে যত্নের অন্য দিক হল রোগীর শুশ্রূষা। এই সেবাযত্ন অবশ্য শিক্ষণীয় এবং এই শিক্ষা প্রায় পুরোপুরি নতুন। এই বিষয়ে যেমন একটি লেখায় বলা হয়েছে যে রোগীর শুশ্রূষা তিন ভাবে বিভক্ত, প্রথম হল রোগীর সাধারণ বন্দোবস্ত করা, ঘর, বিছানা ইত্যাদি পরিষ্কার করা, তার অন্য অভাব দূর করা, দ্বিতীয় হল, রোগীর অবস্থা লিখে রাখা ও তা চিকিৎসককে জানানো এবং তৃতীয় হল রোগীকে ঔষধ সেবন করানো। এর জন্য সেবনের সময়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে, ঔষধ প্রয়োগপ্রণালী এবং তার পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।[২৫] এর জন্য ওষুধের পরিমাণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে, গ্রেন, ড্রাম, আউন্স, পাউন্ড এই সব মাপ জানতে হবে, আবার তরল ওষুধের জন্য মিনিম গ্লাস ব্যবহার করতে হবে, ফ্লুইড ড্রাম, আউন্স এই সবের তফাত জানতে হবে। এরপর শিখতে হবে ওষুধ প্রয়োগপ্রণালী, ছোট ছেলে এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে এই প্রয়োগপ্রণালী আলাদা, রোগীর মনস্তত্ত্বও জানতে হবে। এক কথায় রোগীর যত্ন করতে গেলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিতে হবে। "অনেকে মনে করেন, অসুস্থ লোকের নিকট বসিয়া পাখা নাড়িলেই রোগীর সেবা করা হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। যে বালিকা পরিবারের কোনও পীড়িত লোকের সেবা করিতে ইচ্ছুক, ডাক্তারের উপদেশ, ঔষধ ও পথ্য দিবার সময় ও রীতি উত্তমরূপে বুঝা তাহার প্রথম কর্তব্য। তাহার পর রোগীর যখন যাহা আবশ্যক তাহা বুঝিয়া তাহাকে সর্বদা শান্ত, প্রফুল্ল ও আরামে রাখিলে তাহার যন্ত্রণার অনেক উপশম হইবার সম্ভাবনা এবং ওই বিষয়ে দক্ষ হওয়াও সেবিকার প্রধান কর্তব্য।"[২৬] পরিবারে পীড়িত মানুষের সেবা ও যত্নের কাজে ক্লেশ ও ক্লান্তি আছে কিন্তু যিনি সেবা করছেন তিনি ওই ক্লেশ আত্মীয়স্বজনের প্রেম ও যত্নে ভুলে যাবেন। "আর ওই সংসাধনা দ্বারা অল্প বয়স হইতেই সে আত্মত্যাগে অভ্যস্ত হইবে।"[২৭] পরিবারের অন্যান্য দায়িত্বের মতো এ কাজও ঠিকমতো শিখতে হবে। "রোগীর শুশ্রূষা অতি গুরুতর কার্য, রোগীর পরিচারক বা পরিচারিকাদিগের কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক। ইউরোপে এই জন্য রোগীর পরিচর্যা শিখানো হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের দেশে সে রীতি নাই। সুতরাং পরিচর্য্যার দোষে অনেক সময় অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে।"[২৮] যেহেতু আমাদের দেশে যথাযথ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা নেই, সেই জন্য সেবাশুশ্রূষা নিয়ে এত

পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ। মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে শুধু স্নেহ, দয়া, মমতা থাকলেই রোগীর যত্ন নেওয়া যায় না, অনেক সময় স্নেহের অনুরোধে রোগীর আবদার সহ্য করে কুপথ্য দিয়ে রোগীর অপকারই করা হয়। তাই এর জন্য উপযুক্ত লোক হল: "যে ব্যক্তি প্রফুল্ল স্বভাব, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং শান্তভাবাপন্ন; যে অধিক কথা না কহে, যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান ও সতর্ক, যাহার বধিরতা, ক্ষীণ দৃষ্টি প্রভৃতি শারীরিক দোষ নাই এবং যাহার রোগী পরিচর্যার বহুদর্শিতা আছে"[২৯] এমন মানুষ। ব্যক্তির যত্নের জন্য আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজন এবং সামাজিক শরীরের সুস্বাস্থ্য এই দুইয়ের মধ্যে পরিবার এক সংযোগস্থাপনকারীর ভূমিকা পালন করে।

আগেই বলেছি পরিবারের এই নতুন ডিসকোর্স শিশুকে এক অন্য গুরুত্ব দেয়। এর ফলে পরিবার পরিচালনার শিক্ষণপ্রণালীতে নতুন নতুন বিষয় যোগ হতে থাকে। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পরিবারে স্বাস্থ্যবিধির প্রবর্তন। এর ফলে সাধারণ ভাবে শিশু, নারীর ক্ষেত্রে, বিশেষত তাদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তাভাবনায় নতুন কিছু মাত্রা যোগ হয়। এই স্বাস্থ্যবিধি, আমরা দেখেছি, মূলত নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কেন্দ্র করে। এখানে জননী বা নারীকে প্রশিক্ষিত সেবিকা করে তোলারও এক প্রজেক্টও চোখে পড়ে, এই নারী বুঝদার, সহানুভূতিশীল, বিচারবুদ্ধিযুক্ত কিন্তু সবচেয়ে বেশি বোঝেন অসুস্থ, পীড়িতদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। এক্ষেত্রে অবশ্য ডাক্তারের ভূমিকা ও পরিবারে নারীর/জননীর ভূমিকা সব সময়ই আলাদা থাকবে। একজন অন্য জনের কাজ সহজ করে দেবে, প্রকৃতপক্ষে একে অন্যের সম্পূরক। ডাক্তার বিধান দেবেন, জননী সেটা সম্পাদন করবেন। পরিবারের সঙ্গে ডাক্তারের এই মৈত্রীর ফলে পারিবারিক জীবনের পুনর্গঠন হয়, অন্তত তিনটি বিভিন্ন দিক থেকে: প্রথম হল, পুরনো চিকিৎসাবিধি এবং রোগসম্পর্কিত জ্ঞান, যা দাসদাসী বা পরিবারের প্রান্তবাসীদের দখলে ছিল, তাদের এই জ্ঞান বা ভূমিকা 'নেতিবাচক' একটা তাৎপর্য গ্রহণ করে। শিশুদের ক্ষেত্রে দাসদাসীদের সংস্পর্শ আর বাঞ্ছনীয় বা কাম্য রইল না। দ্বিতীয় হল, জননীর সঙ্গে ডাক্তারের এই বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত মৈত্রীর ফলে শিক্ষাদাত্রী হিসেবে নারীর ভূমিকা স্বীকৃতি পেল এবং নারী-উন্নতিকামীদের কাছে অন্তত একটি পথ উন্মুক্ত হল। তৃতীয় হল, ডাক্তার পুরনো শিক্ষার প্রথা বাতিল করে পরিবারকে তার কাজে ব্যবহার করতে উদ্যোগী হলেন। নতুন স্বাস্থ্যবিধির প্রবর্তনের আগে শিশু বা নারীর স্বাস্থ্য নিয়ে আলাদা কোনও আগ্রহ দেখা যেত না। নারীর ভূমিকা ছিল সন্তানের উৎপাদক হিসেবে, তাঁদের নিজস্ব ওষুধপত্রও ছিল। প্রসব, শিশুর রোগ ইত্যাদি দাইয়ের দায়িত্বে থাকত। দাইয়ের সামাজিক অবস্থান দাসদাসীদের খুব উপরে ছিল না। বহু ক্ষেত্রে ধাত্রীরাই শিশুদের স্তন্যপান, পরিচর্যা করাতেন, তার বিরুদ্ধে যে প্রচার শুরু হল তার দৃষ্টান্ত আমরা এই প্রবন্ধে দিয়েছি। এর ফলে প্রাচীন প্রথা অনেকটাই বিনষ্ট হল, কিন্তু সম্পূর্ণ যে হয়নি এ কথা আমরা আজকের দিনেও বুঝতে পারি। শিশুর স্বাস্থ্য নিয়ে এই যে দুই ধারার মধ্যে বিরোধ, তা আবার উন্মুক্ত করে দেয় আরও নানাবিধ বিরোধিতার ক্ষেত্র, যেমন শিশুদের খেলনা ও খেলাধুলো, যেখানে শিক্ষামূলক খেলনার কথা আলোচিত ও পুনরাবৃত্ত হতে থাকে, শিশুদের জন্য গল্প, তাদের দৈনন্দিন রুটিন, শিশুদের জন্য আলাদা পরিসর সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা, শিশুর উপর

নজরদারি ইত্যাদি। আদর্শগত ভাবে এর উদ্দেশ্য ছিল শিশুকে যতটা সম্ভব নানাবিধ বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করা, যাতে সে স্বাধীনভাবে চলেফিরে বেড়াতে পারে, তার শারীরিক ক্ষমতাসমূহের ব্যবহার যাতে যথাযথ হয় এবং এর ফলে যাতে তার ঠিকমতো শারীরিক বিকাশ হয়। একই সঙ্গে প্রয়োজন হয় শিশুকে এমন কিছু সংস্পর্শ থেকে রক্ষা করা যা তার ক্ষতি করবে। এই ক্ষতি রোগ, ব্যাধিজনিত শারীরিক ক্ষতিও হতে পারে আবার নৈতিক ক্ষতিও হতে পারে। এই শারীরিক বা নৈতিক ক্ষতি তাকে তার বিকাশের সরলরেখা থেকে বিক্ষিপ্ত করবে। সেই জন্যই দাসদাসীদের উপর এত সন্দেহ, তাদের তত্ত্বাবধানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এত কথা। এই কারণেই গৃহ ও পরিবার এই ডিসকোর্সে বাইরের প্রভাব থেকে নিজেকে আলাদা রাখতে আগ্রহী। যদি শিশুকে তার শারীরিক বা নৈতিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে হয়, এবং এ ব্যাপারে যদি দাসদাসীর উপর নির্ভর না করা যায়, তা হলে ডাক্তারের প্রয়োজন এক নির্ভরযোগ্য সহযোগী হিসেবে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় মায়েরই এই ক্ষমতা আছে, যিনি দাসদাসীদের প্রভাব থেকে সন্তানকে মুক্ত রাখতে পারেন আবার নিজের ইচ্ছাশক্তি সন্তানের উপর প্রয়োগও করতে পারেন।

এই মৈত্রীর ফলে দু'জনেই লাভবান হয়। চিকিৎসকের টোটকা, জড়িবুটি, মাদুলি, কবচ, তাবিজ বা নানাবিধ পপুলার চিকিৎসাপদ্ধতির বিরুদ্ধে কাজ করতে সুবিধা হয়, জননীর কাজকর্মের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়াতে পরিবারে সে এক নতুন ক্ষমতা পায়। জননীর কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করে চিকিৎসক তাঁর সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি করেন। এক ভাবে দেখলে নারীর এই যে প্রোমোশন, জননীরূপে, চিকিৎসকের সহযোগীরূপে এবং শিক্ষয়িত্রীরূপে, উনিশ শতকে নারীবাদী ধারার ভিত্তিভূমি তৈরি করে। আবার মনে করিয়ে দিই এই সব উক্তি প্রযোজ্য সেই সব পরিবারে যারা স্বচ্ছল, যেখানে স্ত্রী পারিবারিক কাজকর্মে মন দিতে পারেন, যে পরিবার শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে এবং যে পরিবারে এই সব রচনা পড়ার মতো শিক্ষা আছে। দরিদ্র শ্রেণির জন্য এই সব রচনার কোনও কার্যকর ভূমিকা ছিল না, সেখানে পরিবার ও চিকিৎসাবিধির মৈত্রীসাধনেরও কোনও অবকাশ ছিল না।

চার

আগেই বলেছি পরিবারই সামাজিক শরীরের স্বাস্থ্য এবং মানুষের যত্নের জন্য আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এক মধ্যস্থকারীর ভূমিকা পালন করে। এর ফলেই সুস্বাস্থ্যের এক প্রাইভেট এথিকের প্রবর্তন দেখতে পাই যেখানে শিশু ও বয়স্কদের পারস্পরিক কর্তব্য, আচরণ ইত্যাদি ব্যক্ত হয় স্বাস্থ্যবিধি ও বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের মাধ্যমে। এই বিধি তৈরি করেছেন পেশাদারেরা, রাষ্ট্র একে উপযুক্ত মনে করে এবং এই বিধি ব্যক্তি ও পরিবারের প্রাপ্তিসাধ্য। পরিবারের মেডিকালাইজেশনের প্রক্রিয়া আরও নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির নিজের ও অন্যের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পর্কিত অধিকার ও কর্তব্য, চিকিৎসক ও রোগীর সম্পর্কের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ এবং স্বাস্থ্যের বাজার, যা চিকিৎসার জোগান ও চাহিদার সংযোগবিন্দু, এই সব কিছুই সঠিক ভাবে বোঝা সম্ভব নয়, যদি না আমরা পরিবারের এই স্বাস্থ্যবিধির অধীনতার প্রক্রিয়া

মনে রাখি। বস্তুত এই প্রক্রিয়া হল হাসপাতালের এক গার্হস্থ্যকরণ, যেন প্রত্যেক পরিবার যদি উপযুক্ত নির্দেশ উপদেশ পালন করে, রোগীর চাহিদা পূরণ করতে পারে তা হলে পরিবার এক ছোট, সাময়িক, সুলভ হাসপাতালেও পরিণত হতে পারে। এই হল রাষ্ট্রের পরিকল্পনা, এই পরিকল্পনায় রাষ্ট্রের বিনিয়োগও তুলনামূলক ভাবে অনেক কম। এই স্বাস্থ্যবিধির পারিবারিকীকরণের ইতিহাস কিন্তু একমাত্রিক নয়, এর কোনও সাধারণ ইতিহাসও হতে পারে না। এই বিষয়ে প্রকাশিত উনিশ শতক থেকে যে-লেখাগুলি আমরা পাই সেখানে দেখি চিকিৎসাবিধির ভিন্নতা, ভিন্ন মূল্যবোধ ও বিধি, আর আছে চিকিৎসার ভিন্ন ভিন্ন ভাষা। অর্থাৎ বলতে চাই যে এই জটিল ব্যবস্থার কোনও এসেন্স নেই, সে জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করি বা রাজনৈতিক দিক থেকে। আসলে এই প্রক্রিয়া ঠিক কীভাবে তার শিকড় বিস্তার করল তার পরিচয় আমাদের পরিবারের ব্যবস্থার ইতিহাসে রয়েছে। চিকিৎসাবিধির এই প্রক্রিয়া অবশ্যই পরিবারকে নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণের আওতায় এনে ফেলেছে। পরিবারের স্বাস্থ্যবিধির প্রবর্তনের এই নির্দেশাবলীর লক্ষ্যবস্তু প্রথমে ছিলেন শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত পরিবারবর্গ এবং এখানে পদ্ধতি ছিল জননীর সঙ্গে চিকিৎসকের মৈত্রী। পরবর্তী সময়ে নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণির ক্ষেত্রে এই স্বাস্থ্যবিধি কিন্তু প্রসারিত হয় ভিন্ন উপায়ে, অনেক সময়ে দমনমূলক আইনকানুনের মাধ্যমেও। আসল কথা হল পরিবারে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিষ্ঠার এই ক্যাম্পেন পরিবারকে প্রাইভেট পরিসরের পরাকাষ্ঠা হিসেবে নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করলেও একই সঙ্গে এটা সুনিশ্চিত করতে চেয়েছে যে পরিবার সমাজের স্বাস্থ্যবিধির পাবলিক দায়িত্বও পালন করুক।

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে ভূদেব মুখোপাধ্যায় যখন *পারিবারিক প্রবন্ধ* লিখেছিলেন তখন যে-সব পারিবারিক বিষয়গুলি নিয়ে তিনি আলোচনা করেছিলেন তার মধ্যে ছিল, 'পরিচ্ছন্নতা', 'ডাক্তার দেখান', 'রোগীর সেবা'— এই সব প্রসঙ্গগুলি। চিকিৎসকের সঙ্গে পরিবারের সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন: "আমার বাটিতে যখন যে ডাক্তার দেখিতেন, সকলেই অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত পরামর্শপূর্বক ঔষধাদি ব্যবস্থা করিতেন। এইরূপ হইবার মূল কারণ এই যে, বাটীর সকলের স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত যত্ন করা আমি আপনার কর্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতাম এবং ডাক্তারকে আপনারই প্রতিনিধি বলিয়া জানিতাম। এরূপ মনে করিয়া চলাতে, বাটীর কাহার পীড়া হইলে আপনাকে স্বচক্ষে তাহার শরীরের অবস্থা দর্শন করিতে হইত, স্বহস্তে তাহার কতকটা সেবা শুশ্রূষা করিতে হইত, সুতরাং পীড়ার ভাবগতিক নিবিষ্ট মনে বুঝিবার প্রয়োজন এবং সুযোগ হইত। ডাক্তারেরাও ক্রমে ক্রমে বুঝিয়াছিলেন যে, আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া পীড়ার প্রকৃত লক্ষণাদি, তাঁহারা অল্পায়াসে জানিতে পারেন। এই জন্য আমার বাটীর চিকিৎসক ডাক্তারেরা আমার সহিত পরামর্শ করা উচিত বলিয়াই মনে করিতেন।"[৩০] এই হল পরিবারে প্রকৃত চিকিৎসকের সহযোগী। আমরা দেখেছি পরিবারের ডিসকোর্সে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নারী ও জননীকে। কারণ এই সহযোগীর ভূমিকায় যুক্ত হয়েছে রোগীর সেবা ও পরিচর্যা। পেশাদারি চিকিৎসক ও চিকিৎসার বাজার সৃষ্টি হয় পরিবারের মধ্যে চিকিৎসাবিদ্যার

অনুপ্রবেশের মাধ্যমে। চিকিৎসা ও এই সংক্রান্ত পরিষেবার চাহিদা ও জোগান, বা এক কথায় স্বাস্থ্যের বাজার, প্রাথমিকভাবে গড়ে উঠেছিল পরিবারকে স্বাস্থ্যবিধির অধীনে নিয়ে আসাকে জড়িয়েই। আজ এতদিন পরে তা এক জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়ে এক নিদারুণ অসাম্যের জন্ম দিয়ে চলেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র মানুষ এই পরিষেবার কোনও নাগালই পান না। অন্য দিকে মধ্যবিত্ত বাঙালি, যাঁদের হাত ধরে এই চিকিৎসাবিধির শুরু, তাঁরাই আজকে অপ্রয়োজনীয় ওষুধের সবচেয়ে বড় খরিদ্দার, এঁরাই নিজের পরিবারকে গড়ে তুলেছেন ছোটখাটো ওষুধের ডিপো হিসেবে। এই পশ্চিমবাংলায় ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি ওষুধের দোকান। এই হয়েছে বাঙালি পরিবারে চিকিৎসাবিধি প্রয়োগের পরিণতি।

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

উনিশ শতকী টানাপোড়েন: এক অখ্যাত লেখিকার সামাজিক নাটক

ভূমিকা

সাম্প্রতিক কালে, উৎসাহী গবেষকদের কল্যাণে ও নারীবাদী আন্দোলনের যোগসূত্রে, উনিশ শতকের কিছু বাঙালি মহিলার রচনা অতীতের হস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত পুস্তকের ধ্বংসাবশেষ থেকে পুনরুদ্ধার করা গেছে ও আধুনিক চিন্তাধারার আলোকে তাদের পুনর্মূল্যায়ন করা হচ্ছে। রাসসুন্দরী দেবীর *আমার জীবন*, কৈলাসবাসিনী দেবীর *হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা*, সুকুমারী দত্তের (গোলাপ) *অপূর্ব সতী* ও মানকুমারী বসু-কামিনী রায় প্রমুখ একাধিক কবির সাহিত্যকর্মে আত্মজীবনী, কথাশিল্প, প্রবন্ধ, নাটকের মতো নানা আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি সমসাময়িক সামাজিক সমস্যার ক্ষুরধার বিশ্লেষণের সন্ধান পাচ্ছি আমরা। উল্লেখযোগ্য যে এই সব রচয়িতারা কেবলমাত্র কলকাতার উদীয়মান নাগরিক সভ্যতার উপজাত ছিলেন না। আশেপাশের শহর, এমনকী দূর গ্রামাঞ্চল থেকেও এঁরা সাহিত্যচর্চা চালিয়ে গিয়েছিলেন। কেউ কেউ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন, কেউ কেউ অন্তঃপুরে বসে, পরিবারের কোনও সহানুভূতিশীল পুরুষের সাহায্যে ও নিজেদের অসাধারণ অধ্যবসায়ের গুণে বিদ্যার্জন করেন।

উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার ও স্ত্রীশিক্ষার কেন্দ্রস্থল কলকাতা ছিল বলে, আমরা অনেক সময়-ই ভুলে যাই পূর্ববঙ্গের সমাজসেবী ও নারীমুক্তি আন্দোলনের পুরোধা এবং তৎকালীন ওই অঞ্চলবাসী লেখিকাদের কথা। অবশ্য, ইদানীংকালে বাংলাদেশি ঐতিহাসিকদের গবেষণায় আমরা জানতে পাচ্ছি কুমিল্লার জমিদার পরিবারের ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, বরিশালের বসন্তকুমারী চৌধুরানী ও ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য মনোরমা মজুমদার, ঢাকার বিধুমুখী— এঁদের দুঃসাহসিক সাহিত্যিক ও সামাজিক পর্যবেক্ষণের কথা।

আসলে কলকাতার পাশাপাশি, ঢাকা শহর পূর্ববঙ্গের সামাজিক আন্দোলন ও সাহিত্যিক অগ্রগতির কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই। দুটো কারণে। প্রথম, ১৮৬০ সালে ঢাকায় বাংলা ছাপাখানা তৈরি হয়, এবং এর ফলে ব্যাপক সাহিত্যচর্চা ও সংবাদপত্র প্রকাশের সুযোগ খুলে দেয়। দ্বিতীয়, ১৮৪৬ সালে ঢাকায় স্থাপিত ব্রাহ্ম সমাজ ছিল কলকাতার বাইরে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ব্রাহ্ম সংগঠন। কিছু উদ্যমী ও সাহসী যুবক ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন ও হিন্দু রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অবিচলিত লড়াই চালিয়ে

যান বিধবা বিবাহ, জাতিভেদ প্রথা এবং বিশেষ করে স্ত্রী-শিক্ষার বিষয়ে। ১৮৭০-এর দশকে ব্রাহ্ম সমাজের নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য কয়েকজনের উদ্যোগে 'ঢাকা অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষা সভা' স্থাপিত হয় এবং এর ছত্রছায়াতে বেশ কয়েক বছর ধরে বহু বাঙালি মেয়ে লেখাপড়া শিখে, নিজেরাই লিখতে শুরু করেন। এই সভা প্রতি বছর, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীদের লেখা *স্ত্রীলোকের রচনাবলী* নামে প্রকাশ করতেন। ঢাকার চকবাজারের কেতাবপট্টিতে (যে-অঞ্চলটা আমাদের কলকাতার বটতলার প্রতিমূর্তি ছিল সে-সময়ে) 'ঢাকা-গিরিশ যন্ত্র' ছাপাখানার দৌলতে এঁদের এই সব ছাত্রীদের রচনার মুদ্রিত সংস্করণ পাঠক-পাঠিকা মহলে ছড়িয়ে পড়ে।

ঢাকার 'অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষা সভা'র বাৎসরিক বিবরণীগুলিতে চিন্তার খোরাক পাওয়া যায়। বাঙালি শিক্ষিত পরিবারে মেয়েদের বিদ্যার্জনের বিরুদ্ধে কী প্রবল আপত্তি ছিল উনিশ শতকের শেষ পর্বেও, তা আন্দাজ করা যায়। সভার ১৮৭১ সালের বিবরণী থেকে জানতে পাই যে প্রতিষ্ঠানটি আট মাস হল স্থাপিত হয়েছে। সভার উদ্দেশ্য— "ঢাকা জিলার অন্তঃপুরস্থা মহিলাদিগের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি সংসাধন করা...।" উদ্যোক্তারা (মূলত কিছু ব্রাহ্ম যুবক) প্রতি বছর সদ্য-শিক্ষিতা মহিলাদের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করতেন। প্রথম বছর ৪৬ জন মহিলা পরীক্ষা দেন, যাঁদের মধ্যে ৩৪ জন উত্তীর্ণ হন। এই বার্ষিক পরীক্ষায় 'যে কয়েকটি মহিলা উৎকৃষ্ট রচনা লিখিয়াছেন, তাহা একত্র করিয়া পুস্তকাকারে' প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেন ওই সভার কর্মীরা। পূর্বে উল্লেখিত *স্ত্রীলোকের রচনাবলী* নামাঙ্কিত ওই পুস্তিকাটিতে কিছু রচয়িতার নাম ও তাঁদের রচনার হদিশ পাওয়া যায়— যেমন প্রসন্নতারা গুপ্তের 'স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা', সারদাসুন্দরী সোমের 'গৃহকর্ম্ম', শশীকলা সেনের 'স্ত্রীর প্রতি উপদেশ'। এই মহিলারা নিঃসন্দেহে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। কারণ, ওই পুস্তিকার ভূমিকায়, সভার উদ্যোক্তারা জানাচ্ছেন— "...শিক্ষার্থিণীদের মধ্যে কেহ ২ (অর্থাৎ কেহ কেহ) তাঁহাদিগের নাম সাধারণ্যে প্রকাশিত না হয় এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে আমরা পাঠকবর্গকে তাঁহাদিগের নম্বর জানাইতে পারিলাম না।"

'অন্তঃপুর স্ত্রী শিক্ষা সভা'-র পরবর্তী বিবরণী থেকে দেখতে পাই যে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ মেয়েদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনেক বেশি দমনমূলক হয়ে উঠছে। ১৮৭৫-এর বিবরণীতে, সভার প্রতিষ্ঠাতারা স্বীকার করেছেন যে গত চার বছরে তাঁদের স্ত্রী-শিক্ষার সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়েছে বহুল পরিমাণে ছাত্রীদের পরিবারের ঔদাসীন্য বা সীমিত স্বার্থ, বা সরাসরি বাধাদানের জন্য। অনেক অনুসন্ধান করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে আসছেন— "...ঢাকা জিলাস্থ লোকের স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে পূর্ব্বের ন্যায় আর উৎসাহ নাই...আপন ২ (অর্থাৎ আপন আপন) পরিবারস্থ মহিলাগণ শিক্ষা করিতেছেন কি না তৎপ্রতি দৃকপাতও নাই..."।

এই আক্ষেপের পর ওঁরা জানাচ্ছেন যে, যাঁরা লেখাপড়া শিখছেন, তাঁদের "লেখাপড়া কেবলমাত্র পতি, ভ্রাতা কিম্বা অন্যান্য আত্মীয়ের নিকট পত্র লিখিবার জন্য।" আর একটা কারণ— '...উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ দিবার আশায়ও অনেকে বালিকাদিগকে কিছু ২ (কিছু

কিছু) লেখাপড়া শিক্ষা দিতেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় বিবাহের পরে আর তাহা থাকে না।" এর পরের মন্তব্যটি সে যুগের বিয়ের বাজারে চাহিদার পরিচায়ক— "যুবক স্বামীরা স্ত্রীদের মুখে পুস্তকের দুই একটী কথা অথবা দুই চারিখানা বড় ২ (বড় বড়) নাম শ্রবণ করিয়াই মুগ্ধ হইয়া যান। আর অধিক শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেন না।..." এ ছাড়াও, মেয়েদের শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বাধাদানেরও নজির পাওয়া যাচ্ছে এই সভার বিবরণী থেকে। আমরা জানতে পারছি যে ১৮৭৩ সালে "মাণিকগঞ্জ হইতে ৮/১০টী ভদ্র পরিবারস্থ মহিলা পরীক্ষা দিবার জন্য নাম প্রেরণ করেন এবং আমরাও (অর্থাৎ সভার পারিষদ) তদনুসারে প্রশ্নগুলি প্রেরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে প্রশ্নগুলি বাড়ীর কর্ত্তার হস্তগত হয়, বাড়ীর কর্ত্তা একজন বৃদ্ধ লোক সুতরাং পরীক্ষা দেওয়া নিতান্ত অন্যায় মনে করিয়া প্রশ্নের কাগজগুলি তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেন এবং পরিবারস্থ মহিলাগণকে যৎপরনাস্তি তিরস্কার করেন।" আর একজন মহিলা সভার পারিষদদের লিখছেন— "আমার পরীক্ষার বিষয় আমার আত্মীয়েরা জানিতে পারিয়া নিতান্ত রাগান্বিত হইয়া আমাকে তিরস্কার করিয়াছেন এবং পরীক্ষা দিতে দিবেন না বলিয়াছেন, সুতরাং আমি পরীক্ষা প্রদান করিতে পারি না।"

এ প্রসঙ্গে ঢাকা-গিরিশচন্দ্র ছাপাখানার (যেখান থেকে 'অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষা সভা'র ছাত্রীদের রচনা ও বাৎসরিক বিবরণী মুদ্রিত হত) বিষয়ে কিছু বলতে হয়। সংস্কারধর্মী সাহিত্য প্রচারে এর একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। বর্তমান বাংলাদেশের স্বনামধন্য গবেষক মুনতাসীর মামুনের লেখা থেকে জানতে পারছি ছাপাখানাটি প্রথমে স্থাপিত করেছিলেন গিরিশচন্দ্র রায় ১৮৬৯ সালে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বই বহু বছর ধরে এই যন্ত্রালয়টি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল (দ্রষ্টব্য: *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র*, চতুর্থ খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ ৫৬৯-৭০)। এই মুদ্রণালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন ওই সময়কার ঢাকার এক কবি-সাংবাদিক হরিশচন্দ্র মিত্র। বন্ধু কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে একত্রে বার করেছিলেন ঢাকার প্রথম সাময়িকপত্র *কবিতাকুসুমাবলী*। ১৮৭৪ সালে আর একজন কবি-সাংবাদিক ও বিখ্যাত ব্রাহ্মসমাজ প্রচারক কালীপ্রসন্ন ঘোষ ছাপাখানাটি কিনে নেন এবং সে যুগের বহুল-প্রচারিত *বান্ধব* পত্রিকা ওখান থেকে ছাপাতে শুরু করেন। অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষা সভা-র বিবরণী ছাড়াও, ওই ছাপাখানা থেকে বার হয়েছিল ১৮৭৬ সালে *লক্ষ্মীমণি-চরিত* নামে এক বারবনিতা-কন্যার বিদ্যার্জন ও পারিপার্শ্বিক পাঁক থেকে মুক্তিলাভের দুঃসাহসিক কাহিনি। ওই বছর-ই ওখান থেকে প্রকাশিত হয় ফয়জান্নেসা চৌধুরানীর সুবৃহৎ উপাখ্যান *রূপজালাল*।

আমরা আপাতত গিরিশ যন্ত্র-মুদ্রিত যে-বইটি নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত, সেটি ওই সময়ের এক অখ্যাতনাম্নী লেখিকার প্রণীত। ১৮৭২-এর ২৩ ডিসেম্বর ওখান থেকে প্রকাশিত হয় শ্রীমতী নিতম্বিনী নামে এক মহিলা রচিত *অনূঢ়া যুবতী নাটক*। রচনাশৈলী খুব উচ্চমানের না হলেও, অন্যান্য নানা দিক থেকে নাটিকাটি তাৎপর্যপূর্ণ। কৌলীন্য প্রথা, বিবাহিত জীবনে পুরুষতান্ত্রিক ব্যভিচার, অন্দরমহলে নারীদের দুঃসহ জীবনযাপন, স্ত্রী-শিক্ষা— এই সমস্ত সামাজিক সমস্যা এর ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে লেখিকা তুলে ধরেন।

সেকালের বটতলা-চকবাজারের প্রচলিত ৫″×৮″ আয়তনে মুদ্রিত ৩৩ পৃষ্ঠার এই বইটি মূলত দুই সখির কথোপকথনের আকারে রচিত। মাঝখানে দুটি ক্ষুদ্র অনুকাহিনি নাট্যাকারে উপস্থাপিত— প্রথমটি সমসাময়িক সামাজিক প্রহসনের আদলে রচিত, দ্বিতীয়টি এক আধা-ঐতিহাসিক-আধা কাল্পনিক কাহিনি অবলম্বনে লেখা।

লেখিকা নিতম্বিনী (ছদ্মনাম?) স্বয়ং নায়িকার ভূমিকায় হাজির। এই কুলীন কন্যা, যার বিয়ে হচ্ছে না উপযুক্ত মেলের পাত্র জুটছে না বলে। তার সখি কুমুদিনীর কাছে অনুযোগ করছে— "...এক এক সময় মনে করি কুলকে অকুলে ভাসাই, আবার ভাবি কি কেনে পরকাল্‌টা ডুবাবো,...।' কুমুদিনীর সমস্যা অন্য। যদি-ও বিবাহিত, তার স্বামী তাকে নেয় না, কারণ তার বাবা পাত্রের টাকার দাবি মেটাতে পারেননি। দীর্ঘকাল এই অপমান সহ্য করে, কুমুদিনী শেষে বলে— "...পোড়ার মুখো কুলীনের কপালে খেঙ্গরা মারি!— অত বড় স্বার্থপর কি আর আছে?" প্রথম অঙ্ক শেষ হয় দুই সখির আশাপ্রদ মনস্কামনায়। কুমুদিনী জানায় কুলীন পরিবারের "অনেকেও স্কুলে পড়ে খুব বিদ্বান হচ্ছে, চাকরি করে বেস্ দশ টাকা আন্‌চে। কুলের দাসত্বও অনেক অংশে ছেড়ে দিয়েছে,... এবং মেয়ে ও ভগ্নী ইত্যাদির যথাকালেই বে দিতে মনোযোগী হয় এবং আপন কর্তৃত্বে হলে বিয়ে দিতেও ক্রটি করে না...।" এটা মেনে নিয়েও, নিতম্বিনী তার বন্ধুকে মনে করিয়ে দেয় এই শিক্ষিত সংস্কারবাদী যুব সম্প্রদায়ের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা বিষয়ে— 'নব্য সম্প্রদায়ীরা পৌরাণিক, কুলদাসগুলর জন্যেই কিছু পেরে উঠচে না। এরা এখন পর্য্যন্ত স্বাধীন নয়, স্বীয় মত চালাতে পারে না, এরা স্বাধীন হলে অবশ্য দুঃখ ঘুচবার সম্ভব ছিল।"

এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ক জুড়ে একটা ছোট প্রহসন। কুলীন ব্রাহ্মণ সদাশিব মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী চতুরা স্বামী-পরিত্যক্তা হয়ে বহুদিন জীবনযাপনের পর স্বামীকে ফিরে পাবার জন্য সদাশিবের গ্রামেই বেশ্যার বেশ ধরে সদাশিবকে প্রলোভন দেখিয়ে নিজের বশীভূত করে। সদাশিব তাকে রক্ষিতা রূপে রাখতে চায়, কিন্তু শেষে চতুরা নিজের পরিচয় দিলে সদাশিব ক্ষমা চেয়ে তাকে স্ত্রী রূপে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। চতুর্থ অঙ্কে সদাশিবের স্ত্রীর হাতে প্রতারিত হয়ে শেষে তাকে গ্রহণের কাহিনি শুনে নিতম্বিনী মন্তব্য করে— 'কুলীন ঠাকুররা এম্নি বটে, টাকা দিয়ে বেশ্যার লাথ ঝাঁটা অনেকেই খেয়ে থাকেন, কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রী নিয়ে শুতে হলেই টাকা বই বিছানায় পা দেন না। ধন্যি কুলীন জাত! ধন্যি কুলীনের প্রেম।" এরপর নিতম্বিনী কুমুদিনীকে বলে মেয়েদের লেখাপড়ার প্রয়োজনীয়তা এবং এই প্রসঙ্গে একটি ছোট সংলাপধর্মী বিবরণী পেশ করে যার নায়ক কবি কালিদাস ও নায়িকা কর্ণাটের বিদূষী রাজমহিষী যিনি তাঁর বিদ্যাবলে কালিদাসকে মোহিত করেছিলেন। নাটক শেষ হয় নিতম্বিনীর স্বপ্নে যে, একদিন তার কুলীন পিতা তার পড়াশোনার ইচ্ছা মেনে নিয়ে তার 'বিবাহেও বিশেষ মনোযোগী হবেন।" লেখিকা নাটকটি সমাপ্ত করছেন 'লেখনি ঘুম পেলো' এই কথাগুলি দিয়ে।

শ্রীমতী নিতম্বিনী প্রণীত এই নাটকটি উনিশ শতকের শেষার্ধের বাঙালি সমাজের টানাপোড়েনের কয়েকটি ছবি তুলে ধরে। প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে— ওই শতকের শুরুতে সমাজ সংস্কারকেরা যে কুলীন প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেছিলেন, তা এত বছর পরেও অটুট ছিল, অন্তত পূর্ববঙ্গে। কুলীন সমাজে যে নানান শ্রেণিভেদ ছিল ও বিভিন্ন বৈবাহিক প্রথা চালু ছিল, তার একটানা প্রবহমানতার একটা চমৎকার বিশ্লেষণ বার হয়ে আসে। নিতম্বিনী তার সমাজের মেয়েদের মেল-বন্ধন হেতু নানা সমস্যার এক হাস্যকর বর্ণনা দেয়— "কি ছাই বল্‌বো, বাঁধা ঘরে বিনে তো বে হতেই পারে না, একদিকে মেয়ে বারো বছোরের হয়ে বসেছে ওদিকে ছেলের বাপ্‌ আজ্‌তাকাতি বেও করেননি, তিনি বে কর্‌বেন, তবে ছেলে হবে, তবে এ মেয়ের বে হবে।"

এরপর নিতম্বিনী বর্ণনা করছে আর এক কৌতুকাবহ পরিস্থিতি: "কোন ঘরে ছেলের বয়েস পঁচিশ বৎসর হয়ে রয়েছে, মেয়ের বাপের জন্ম হয়নি, মেয়ের বাপ জন্মিবেন, বে করবেন, মেয়ে হবে, তবে এ ছেলে তাকে বে করবেন।" আরও— "এই নিয়মে নবছোরের ছেলের ঠাঁই আইবয়সী, যাট সত্তর বছোরের কুলীনের মেয়েদের বে হয়, আবার আশী বছোরের বৃদ্ধের সঙ্গে দেড় বছোরের মেয়ের বে হয়, শুধু বুড়ো কেন, কত কালা খোঁড়ার ঠাঁই বে হয়, কুলীনের মেয়ের কপালে কখনই মনের মত ভাতার মেলে না, হয় পাগল, নয় ছাগল, ময় ভাগের ভাতার..."।

আজকের পাঠকের কাছে এগুলি কল্পনা-প্রসূত উদ্ভট কাহিনি মনে হতে পারে। কিন্তু, সমসাময়িক সংবাদপত্রের খবর থেকে জানা যায় যে সত্যি-ই এই ধরনের ঘটনা ঘটত সে যুগে। দু'-একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি। ১৮৩১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি *সংবাদ কৌমুদী*-তে জনৈকা 'শ্রীমতী অমুকী দেবী' (ছদ্মনাম?) এক চিঠিতে লিখছেন তাঁর কুলীন পিতা সম্বন্ধে, যিনি 'কোন শ্বশুর গৃহে চারি পাঁচ বৎসর পরে দুই তিন দিনের নিমিত্ত যাইতেন কোন স্থানে বা দশ বৎসরের মধ্যে এক বার গমনেও মহাত্যক্ত হইতেন..."। পত্র লেখিকার মাতামহ উক্ত কুলীন পাত্রটির সঙ্গে তাঁর 'মাতার' এবং 'আর চারি মাতৃ সহোদরা'র "বিবাহ দিয়াছিলেন।... তাহার পর এ দেশে একবার আগমন করিবাতে মাতার ও দুই মাতৃস্বসার এক ২ (এক এক) কন্যা হইয়াছিল।" জন্মদানের পর জামাইটি আর শ্বশুর বাড়িমুখো হননি। যখন কন্যারা দশ-বারো বছর হয়েছে, তখন কিন্তু তাঁর "মনে এমত শঙ্কা হইল যে আমারদের মাতারা কি জানি স্বাধীনতাতে বিবাহ দেন।" তাই, "তখন পাঁচ ছয়জন যণ্ডামর্ক বিমাতা পুত্র অন্য পক্ষের দুই মাতুল এবং পিতা জ্যেষ্ঠতাতের তুল্যবয়স্ক এক পাত্র সহিত গ্রামে আসিয়া গোপনে রহিলেন এবং পর দিবস প্রায় সন্ধ্যাকালে আমারদিগের মাতার গোপনে ও আমারদিগের অসম্মতিতে লইয়া গিয়া সেই পাত্র সহিত একেবারে এক রাত্রে বিবাহ দিলেন।" এর পরে, পত্র লেখিকার শেষ মন্তব্য— "সেই অবধি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম হইল পতির সহিত দর্শন নাই বর্ত্তমান আছেন কিনা তাহাও জ্ঞাত নহি..." (দ্রষ্টব্য: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত *সংবাদ পত্রে সেকালের কথা*, দ্বিতীয় খণ্ড)

এর থেকে চল্লিশ বছর পরেও অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি। ১৮৭০ সালের ১৭ জুলাই-এর *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় মুদ্রিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, কলকাতার ভবানীপুর নিবাসিনী কৃষ্ণমণি দেবী তাঁর স্বামী লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নামে আদালতে *ভরণপোষণের দাবিতে নালিশ করেন। আদালত ডিক্রি জারি করে লক্ষ্মীনারায়ণকে মাসিক পনেরো টাকা করে তার স্ত্রীকে দিতে হবে। ডিক্রির বিরুদ্ধে সপক্ষ সমর্থন* করতে *গিয়ে* লক্ষ্মীনারায়ণ বিচারপতিকে জানায় যে সে মাসিক ষাট টাকা মাইনের কেরানি এবং প্রার্থনা করে— "ধর্ম্মাবতার। আমি কুলীন ব্রাহ্মণ আমার ছয়টী স্ত্রী, আমি কি প্রকারে স্ত্রীদিগকে প্রতিপালন করি... হিন্দু শাস্ত্রে কুলীনদিগকে ভার্য্যার ভরণপোষণ করিবার বিধান নাই" (দ্রষ্টব্য: মুনতাসীর মামুন সংকলিত *উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র*, তৃতীয় খণ্ড)।

কৌলীন্য প্রথার এই সব অদ্ভুত নিয়মাবলীর আসল ভুক্তভোগী ছিলেন সে যুগের কুলীন পরিবারের মেয়েরা। বাঙালি সমাজ সংস্কারকেরা তাই এর অবসানের জন্য আইনের সাহায্য ছাড়াও আধুনিক চিন্তাধারায় ছেলে-মেয়েদের শিক্ষিত করার পরিকল্পনার ওপর জোর দিয়েছিলেন। নারী শিক্ষা এই পরিকল্পনার একটা বিশেষ অঙ্গ ছিল। *অনূঢ়া যুবতী নাটক*-এ নিতম্বিনী-কুমুদিনী সংলাপে আমরা দেখতে পাই দুজনেই মেয়েদের পড়াশোনার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরছে। নিতম্বিনী তার চিরকালীন অনূঢ়া অবস্থার দুঃখজনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাবার জন্য ভেবেছিল, "উপদেশ ঘটিত পুস্তক পাঠ কল্যে তবু কিছু মনের স্ফূর্ত্তি হয়।" কিন্তু, যখন এই কথা ভেবে সে তার বাবা ও ভাইকে তার লেখাপড়ার ইচ্ছার কথা জানাল, তখন "বাবা বল্লেন ছি অমন কথা মুখেও আনিস নে লোকে কুচ্ছ (কুৎসা) করবে, দাদা অম্নি রেগে বল্লেন, অমন কথা বল্লে তোকে কেটে ফেল্‌বো।'

বাপ-দাদার কাছ থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নিতম্বিনী শেষে তার ভগ্নিপতির কাছ লেখাপড়া শেখে। এ বিষয়ে দুই সখির কথোপকথন বেশ রসাল। নিতম্বিনী বলছে— "আমার লেখাপড়া শিখ্‌বের খুব মন ছিল তাই নুকয়ে চুপে চুপে আমার বুনুই গাঙ্গোলীর নিকট কিছু শিখেছি।" উলটে ওর সখি কুমুদিনী জিজ্ঞেস করছে— '...সে তোমার কেমন বুনুই তাঁর কাছে সকল বিদ্যা তো শিখ নাই...'। জবাবে নিতম্বিনী বলে— "ভাই আমার অনাবশ্যকীয় বিদ্যা শিখ্‌বার প্রয়োজন নাই, তাই শিক্ষে করি নাই।"

অবশ্য মেয়েদের লেখাপড়া ও আত্মাধিকার প্রতিষ্ঠার পুরো স্বাধীনতা সে যুগের প্রগতিশীল সমাজ সংস্কারকেরাও সার্বিক ভাবে মেনে নিতে পারেননি। উভয় ক্ষেত্রেই গণ্ডি বেঁধে দেওয়া ছিল। স্ত্রী-শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য 'উপদেশ ঘটিত পুস্তক *পাঠ*', যা নিতম্বিনী তার ভগ্নিপতির সাহায্যে করতে পেরেছিল। পারিবারিক জীবনে, স্বামীর প্রত্যাখ্যান বা দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ ও প্রতিশোধ গ্রহণের পরেও, সেই বহুগামী কুলীন (অবশ্য অনুতপ্ত) স্বামীর পদতলেই স্ত্রী শেষে আশ্রয় বেছে নেয়। এই নাটকে, সদাশীব-চতুরাকে কেন্দ্র করে যে প্রহসনমূলক উপনাটকটি পরিবেশিত হয়েছে তার উপসংহারটা লক্ষণীয়। চতুরা তার কুলীন স্বামী সদাশীবকে যারপরনাই অপমানিত ও *পর্যুদস্ত করে নিজের পরিচয় দিয়ে শেষে বলে*— "আপনি আমাকে কুলকামিনী জনোচিত বিরুদ্ধ এতাধিক সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্তা দেখে আমার চরিত্রকে

অপবিত্র জ্ঞান না করে নিজ দাসী জ্ঞানে গ্রহণ করুন; আমার এ রূপ নির্লজ্জ হওয়ার উদ্দেশ্য লাভ হয়েছে...।"

অনূঢ়া যুবতী নাটক সমসাময়িক লেখিকাদের রচনার মধ্যে একটা বিশেষ স্থান পাবার যোগ্য। উনিশ শতকে মহিলা লেখিকাদের কৌলীন্য প্রথা বিষয়ক রচনা ও চিঠিপত্রে আমরা প্রধানত কুলীন পরিবারের বিবাহিতা কন্যা ও বিধবাদের অনুযোগ শুনতে পেয়েছি। এই সোচ্চার নারীগোষ্ঠীর আড়ালে যে এক ব্যাপক কুলীন কুমারীর দল নীরবে তাদের যৌবনকে কৌলীন্য প্রথার বেদিতে বলি দিয়েছিল, তার সাক্ষ্য বড় একটা চোখে পড়ে না সে যুগের সাহিত্যে। শ্রীমতী নিতম্বিনীর এই ক্ষুদ্র নাটিকাটি তাই গবেষকদের কাছে মূল্যবান। লেখিকা নিজেও অন্যান্য রচয়িত্রী থেকে তাঁর বিষয়ের ভিন্নতা ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন। সে সময়, বিধবাদের সমস্যার বহুল প্রচারের প্রবণতার দিকে একটু কটাক্ষপাত করে নিতম্বিনী তাঁর নাটকের বিজ্ঞাপনে লেখেন— "আমি বিধবা বঙ্গাঙ্গনার পার্শ্ববর্ত্তিনী হওয়ার বাসনায় প্রকাশ পাইতেছি, ভরসা করি না যে তাঁহার সমীপে আমার স্থান হইবে, কারণ আমি দীনা তিনি জগন্মান্যা হয়ে বসেছেন, বিশেষত তিনি হচ্চেন বিধবা আমি হচ্চি অধবা, তবে তিনি আমি এক মন্ত্র উপাসক বলিয়া তাঁহাকে পরমার্থ-ভগ্নী বলিতে পারি, এগতিকে পার্শ্বে স্থান পেলেও পেতে পারি।..."

'এক মন্ত্র উপাসক' সংজ্ঞাটি গুরুত্বপূর্ণ। সে যুগে, নিজেদের চিন্তাধারার আলোকে (যতো-ই সীমিত হোক), এই মহিলারা স্বাধিকার অর্জন ও প্রতিষ্ঠার 'মন্ত্র' তৈরি করতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। এই মন্ত্রের উপাসিকাদের মধ্যে শ্রীমতী নিতম্বিনীর ভূমিকা কী ছিল? তাঁর পারিবারিক পরিচয়, লেখাপড়ার চর্চা, এই নাটকটি ছাড়া অন্য কোনও কিছু লিখেছিলেন কি না, পরবর্তী জীবন কী ভাবে কেটেছিল— এ সব প্রশ্নের উত্তর বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে। উভয় বাংলার উদ্যমী তরুণ গবেষকরা, আশা করি, লেখিকার বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য খুঁজে বার করতে পারবেন।

সেরিনা জাহান

ঔপনিবেশিক যুগে আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলার মুসলমান মেয়েরা

কথারম্ভ

বাংলার সমাজজীবন নিয়ে যে কোনও আলোচনার শুরুতেই একটা কথা মেনে নেওয়া ভাল। বাঙালি সংস্কৃতি কোনও অখণ্ড বা অভিন্ন সংস্কৃতি নয়। নানা ভাগে বিভক্ত, নানা পরিচয়ে পরিচিত আমাদের এই সমাজ। সে ভাগ ধর্মের, সে পরিচয় অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাসের, সে বৈশিষ্ট্য আবার স্থানগতও— গ্রামীণ ও নাগরিক সমাজে বিন্যস্ত। কাজেই মেয়েদের কথা বলতে গেলেও এই স্বাতন্ত্র্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বর্তমান নিবন্ধে আমরা বাংলার মুসলমান মেয়েদের নিয়ে আলোচনা করব। সেই সব মেয়েদের নিয়ে, যাঁরা অন্তঃপুরের অন্তরালকে অতিক্রম করে অবরোধপ্রথার নিকষ আঁধারকে দু'-হাতে সরিয়ে সূর্যমুখী হওয়ার প্রয়াসী হয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য যে হিন্দু বা ব্রাহ্ম নারীদের শিক্ষা বা আত্মপ্রতিষ্ঠার ধারা যে খাতে প্রবাহিত হয়েছিল, মুসলমান মেয়েরা তার আওতার মধ্যে পড়েননি। মুসলমানদের মধ্যে যেমন ইংরেজি শিক্ষা প্রসার লাভ করেছিল হিন্দুদের তুলনায় প্রায় অর্ধশতক পরে, স্ত্রীশিক্ষার বিকাশও ঘটেছিল তেমনই পঞ্চাশ বা ষাট বছর পিছিয়ে।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান দুই সমাজের মানুষই অন্ধভাবে ধর্ম ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতেন। সতীদাহ বা গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জনের মতো অমানুষিক প্রথাকেও ধর্মাচরণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই অধিকাংশ হিন্দু মেনে নিয়েছিলেন। আর বাংলার গ্রামে গ্রামে সাধারণ মুসলমানরা 'অপূর্ণ দীক্ষা'র ফলে প্রকৃত ইসলামের সঙ্গে সামান্যই পরিচিত ছিলেন। তাঁরা ইসলাম ধর্মের কিছু অনুষ্ঠান পালন করার পাশাপাশি বাংলার লোকাচার, সংস্কারের প্রতিও আংশিক আনুগত্য দেখাতেন।[১] এই পরিস্থিতিতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, ভিন্ন সংস্কৃতির বাহক ইংরেজরা বাংলা শাসনের অধিকারী হলেন। সূচনাপর্বে সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই নতুন এই শাসকদের সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। তবে এক্ষেত্রেও হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গির

একটা পার্থক্য ছিল। পূর্ববর্তী শাসকগোষ্ঠী অর্থাৎ মুসলমানরা হিন্দুদের যেমন সমধর্মী ছিলেন না, তেমনই নতুন এই শাসকগোষ্ঠীও ছিলেন অন্যধর্মী, খ্রিস্টান। এই দিক থেকে খিস্টধর্মী শাসক আসাতে তাঁদের অবস্থানে কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। বরং মুসলমান-শাসন-উচ্ছেদকারী এই ভিনধর্মীদের তাঁরা কেউ কেউ স্বাগতই জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে, মুসলমানদের ক্ষেত্রে ফারাকটা অনুভূত হল বেশ প্রকটভাবে। স্বধর্মী শাসক হওয়ার ফলে যে পৃষ্ঠপোষকতা বা সুযোগ সুবিধা মুসলমান প্রজাদের অনেকেরই করায়ত্ত ছিল, তা থেকে স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা বঞ্চিত হলেন। তা ছাড়া নতুন শাসকরা তাঁদের ধর্মের উপর আঘাত হানতে পারেন এমন আশঙ্কাতেও মুসলমানদের একাংশ ভীত ছিলেন।

শুরুর কথা

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ব্রিটিশরা যখন বাংলার প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা মূলত পরিচালিত হত টোল-মাদ্রাসা-মক্তবের মাধ্যমে। হিন্দু ছাত্ররা পড়তেন পাঠশালা-টোল-চণ্ডীমণ্ডপে। টোলের পাঠক্রমের মধ্যে সাধারণত থাকত ধ্রুপদী সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, দর্শন, জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা ও স্মৃতি। আর মাদ্রাসাতে মুসলমান ছাত্ররা শিখতেন আরবি-ফারসি সাহিত্য (বিশেষত কোরান), ব্যাকরণ, ধর্মশাস্ত্র ও ইসলামি আইন। টোল আর মাদ্রাসাগুলি ছিল ধর্মপ্রাণ অভিজাত শ্রেণির জন্য। ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবী শ্রেণির জন্য ছিল পাঠশালা ও মক্তব। উচ্চ পর্যায়ের সংস্কৃত শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সম্প্রদায়; আর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ধনী ভূস্বামী ও জমিদাররা। এঁদের মধ্যে ছিলেন নাটোরের রানি ভবানী ও নদিয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। প্রসঙ্গত, মাদ্রাসাতে অনেক হিন্দু ছাত্র, বিশেষত কায়স্থ সম্প্রদায়ভুক্ত, পড়াশোনা করতেন। তাঁরা আসতেন ফারসি শিখতে কারণ তখনও আদালত ও রাজস্ব প্রশাসনের ভাষা ছিল ফারসি। ১৮৩৮ সালে বাংলা ও বিহারের পাঁচটি জেলায় উইলিয়াম অ্যাডাম যে সমীক্ষা চালান তাতে দেখা যায় ফারসি শিক্ষার্থী হিন্দু পড়ুয়ার সংখ্যা ২০৯৬ আর সেখানে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ১৫৫৮। অ্যাডামের হিসাব অনুযায়ী ১৮৩৫ সালে বাংলা ও বিহারে পাঠশালার সংখ্যা ছিল ১০ হাজারেরও বেশি।[২] তবে শিক্ষার মান ছিল নিম্নস্তরের। গুরুমশাইরা খুবই কম বেতন পেতেন। অধিকাংশই ছিলেন যথেষ্ট অপেশাদার ও অজ্ঞ। তা ছাড়া মুদ্রিত বইয়ের অভাবও একটা বড় সমস্যা ছিল। বেশির ভাগ পাঠশালার জন্য কোনও আলাদা বাড়ি ছিল না। পড়ানো হত কারও বাড়িতে বা গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে। এক কথায় বলতে গেলে দেশীয় এই শিক্ষাব্যবস্থা ছিল একঘেয়ে, ছকে বাঁধা। গণিতশাস্ত্র, ইতিহাস, রাজনৈতিক দর্শন, অর্থনীতি, ভূগোল বা প্রকৃতি বিজ্ঞানের মতো বিষয়গুলিকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হত না। পশ্চিমি দুনিয়ার দ্রুত অগ্রগতিসম্পন্ন ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানচর্চার সঙ্গে তুলনা করে বলা যায়, ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ছ'শো বছর ধরে একই জায়গায় অনড় হয়ে আটকে ছিল।[৩]

বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা হল কয়েকজন খ্রিস্টান মিশনারি, আলোকপ্রাপ্ত কিছু ইউরোপীয় এবং ভারতীয় সংস্কারক ও সমাজসেবীর হাত ধরে। ব্রিটিশ সরকার শিক্ষার

প্রসারে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী হয় আরও কিছুটা পরে। মিশনারিরা খ্রিস্টধর্ম প্রচারের হাতিয়ার হিসাবে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে শ্রীরামপুর, কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ ও ঢাকাতে ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি; বর্ধমান, কলকাতা, খুলনা, কৃষ্ণনগরে চার্চ মিশনারি সোসাইটি এবং চুঁচুড়াতে লন্ডন মিশনারি সোসাইটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। এর মধ্যে কয়েকটি সরকারি অর্থসাহায্য পেত। আধুনিক শিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি এই স্কুলগুলিতে খ্রিস্টধর্মের মূল নীতিগুলিও শেখানো হত। এবং এই শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা। খ্রিস্টান মিশনারিদের নিজ ধর্মপ্রচারের এই প্রচেষ্টা মুসলমান সমাজকে ভীত করে তোলে এবং ইংরেজি শিক্ষা থেকে তাঁদের দূরে সরিয়ে রাখে।

বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার ইতিহাসে ১৭৮১ সাল একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই বছরই কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতার মুসলমানদের এক প্রতিনিধিদল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার আর্জি জানিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে দেখা করার ফলশ্রুতিতেই ব্রিটিশ সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আরবি-ফারসি-ইসলামি ধর্মতত্ত্ব শেখানো হলেও এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল অভিজাত মুসলমানশ্রেণির সন্তানদের সরকারি অফিসার বা আদালতের অফিসার হিসাবে গড়ে তোলা।

১৭৮২ সালে কলকাতা মাদ্রাসায় আরবি বিভাগ চালু হয়। এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা ছিলেন অভিজাত শ্রেণির মুসলমানরা। ১৮২৯-এ মাদ্রাসাতে চালু হল ইংরেজি বিভাগ। এই বিভাগের পড়ুয়ারা অধিকাংশই ছিলেন তুলনামূলকভাবে অনভিজাত মুসলমানশ্রেণিভুক্ত। ইংরেজি পড়ানোর পাশাপাশি এই বিভাগে বাংলা ক্লাসও হত। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও এই ইংরেজি শিক্ষা উচ্চ শ্রেণির মুসলমানদের উপর কোনও প্রভাবই বিস্তার করতে পারেনি।[৪]

১৮৩৭ সালে ফারসির পরিবর্তে রাজভাষা হিসাবে ইংরেজি স্বীকৃতি লাভ করলে আশরাফ বা অভিজাত শ্রেণির মুসলমানদের প্রভাব একেবারে হ্রাস পেল। এই পরিস্থিতিতে মুসলমান সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব বর্তাল আতরফ বা অনভিজাত মুসলমান শ্রেণির উপর। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করলে ধর্মচ্যুতির আশঙ্কা থেকে তাঁরা পুরোপুরি মুক্ত হতে পারলেন না। ফলে সামগ্রিকভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার্জনের ক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা অনেকটাই পিছনে পড়ে রইলেন।

বাংলার মুসলিম সমাজের সংস্কার আন্দোলন ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়

অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটল ১৮৬০ সালের পরে। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পরে ভারতীয় মুসলমান সমাজ বুঝতে পারল যে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ ও ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা ছাড়া তাঁদের অগ্রগতি অসম্ভব। উত্তর ভারতে প্রথম এই সত্য উপলব্ধি করেন সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৭)। বাংলায় তাঁর আদর্শে প্রভাবিত হলেন আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩), আমির আলি (১৮৪৯-১৯২৮) ও দেলওয়ার হোসেন আহমদ মির্জা (১৮৪০-১৯১৩)। এঁদের নেতৃত্বে শুরু হল বাংলায় মুসলমান সমাজের সংস্কার

আন্দোলন। ১৮৬০ সালের আগে এই আন্দোলন শুরু না হওয়ার কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায় যে ১৭৫৭ সালে সিরাজের পরাজয়কে মুসলমানরা ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেননি— অনেকেই ব্রিটিশদের জবরদখলকারী হিসাবে মনে করতেন। তা ছাড়া ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ক্ষতির পরিমাণ সমান ছিল না। আর শিক্ষাদীক্ষা ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির সহায়তায় হিন্দুরা ওই ক্ষতি পূরণে অনেকটা সক্ষম হয়েছিলেন। উদাহরণ হিসাবে দর্পনারায়ণ ঠাকুর, অক্রুর দত্ত, কেবলরাম প্রমুখের নাম করা যেতে পারে। পরবর্তী যে আঘাতে মুসলমান সমাজ বিপন্ন হল তা ছিল ১৮২৭ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্তকরণ (resumption proceedings)। এরপর ১৮৩৭ সালে ফারসির বদলে ইংরেজি রাজভাষা হিসাবে ঘোষিত হওয়ায় মুসলমানরা তাঁদের অবশিষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তিও হারালেন। অবশেষে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পরে পরিস্থিতির চাপেই মুসলমানরা আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হলেন।

বাংলার মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের জন্য যে চিন্তাবিদরা প্রয়াসী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম হলেন ফরিদপুরের আবদুল লতিফ। তাঁর পিতা কাজী ফকির মুহম্মদ কলকাতায় সরকারি চাকরি করার সুবাদে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। পুত্রকে তিনি তাই কলকাতা মাদ্রাসায় পড়তে পাঠান। এখানে মনে রাখা দরকার যে, হিন্দু কলেজে উচ্চবর্ণের হিন্দু ছাড়া অন্য কারও ভর্তি হওয়ার সুযোগ ছিল না। কলকাতা মাদ্রাসায় আরবি ফারসি হিন্দুস্তানি শেখার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষাতেও দক্ষ হয়ে ওঠেন লতিফ। ইংরেজি জানা ছাত্র হিসাবে তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তেরও নজরে পড়েন। লতিফ তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন অধ্যাপক হিসাবে। পরে তিনি যোগ দেন সিভিল সার্ভিসে। ১৮৮৩ সালে তিনি যখন সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেন তখন ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বোচ্চ পদাধিকারী এবং বেতনও পেতেন সব থেকে বেশি।[৫] পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আবদুল লতিফ উনিশ শতকের বাংলায় সর্বাধিক বিখ্যাত মুসলমান হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন।

এহেন আবদুল লতিফ ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেও পশ্চিমি উদারনৈতিক ভাবধারা সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বাস্তব উপযোগিতার গুরুত্ব বুঝে তিনি তা প্রসারে সচেষ্ট হন। কিন্তু তা গোঁড়া ধর্মীয় অনুশাসন বজায় রেখে। বস্তুত ধর্মীয় গোঁড়ামির গণ্ডি অতিক্রম করার সাহস তিনি দেখাতে পারেননি। সেই জন্যই তিনি ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারের জন্যও জোর সওয়াল করেছিলেন। গবেষক সালাহউদ্দিন আহমেদ মনে করেন মূলত তাঁরই প্রভাবে 'বাংলায় দু-টি সমান্তরাল শিক্ষাব্যবস্থা, একটি সাধারণ ও অন্যটি মাদ্রাসা ব্যবস্থা চিরস্থায়ী রূপ গ্রহণ করে।'[৬] তবে এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে ১৮৬৩ সালে আবদুল লতিফ মহামেডান লিটারারি সোসাইটি নামক যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন তা কলকাতার অভিজাত মুসলমান সমাজের চিন্তার জগতকে উদ্দীপ্ত ও অনুপ্রাণিত করে।

আবদুল লতিফের সমসাময়িক আর একজন প্রথম শ্রেণির বুদ্ধিজীবী ছিলেন সৈয়দ আমির আলি। তাঁর পিতা সৈয়দ সাদত আলি অযোধ্যার উন্নাত্ত অঞ্চলের অধিবাসী হলেও প্রথমে ওড়িশায় এবং পরে হুগলির চুঁচুড়ায় বসতি স্থাপন করেন। ১৮৬৭ সালে আমির আলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ ও পরে বি এল পাশ করেন। অল্প কিছুদিন আইনজীবী হিসাবে কাজ করার পর তিনি ইংলন্ডে গিয়ে ব্যারিস্টারি পাশ করেন। কলকাতায় ফেরেন ১৮৭৩ সালে। তারপর কিছুদিন কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসাবে এবং কিছুদিন হুগলি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। পরে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিও হন (১৮৯০-১৯০৪)। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মানের অধিকারী হন। তিনি ইংলন্ডের প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য শ্রেণিভুক্তও হন। তাঁর আগে আর কোনও ভারতীয় এই সম্মান অর্জন করতে পারেননি।

১৮৭৮ সালে আমির আলি 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমান সমাজের স্বার্থরক্ষা ও সামগ্রিক উন্নতিসাধনই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য। বিভিন্ন প্রদেশে এই অ্যাসোসিয়েশনের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে না নেমে, বরং সরকারের পূর্ণ আস্থা অর্জন করে আমির আলি আইনসঙ্গত ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিজ সমাজের দাবিগুলি এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তুলে ধরতেন। মুসলমানদের বৈষয়িক-আর্থিক-মানসিক উন্নতির জন্য ইংরেজি শিক্ষার অনিবার্যতার কথা তিনি বারংবার সোচ্চারে বলেছেন। ১৮৮২ সালে স্মারকপত্রে এবং ১৮৮৪ সালে গভর্নর জেনারেলের ব্যক্তিগত সচিবকে লেখা একটি চিঠিতে সরকারি চাকরিতে বাংলার মুসলমানদের জন্য অন্তত এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষণের দাবি জানান তিনি।

পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি রাজনৈতিক সচেতনতার প্রসারের লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমির আলি তাঁর অ্যাসোসিয়েশন পরিচালনা করতেন। তিনি মুসলমান সমাজকে স্থবিরত্ব থেকে মুক্ত করে নবজাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই মুসলমান নারীদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারেও তিনি ভেবেছিলেন। ১৮৯৯ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'মহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স'-এ সভাপতির ভাষণে আমির আলি বলেন, মেয়েদের শিক্ষা ছেলেদের শিক্ষার সমান্তরালভাবে চলা উচিত। তাতেই সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে। পুরুষ-নারী একত্রে সমান উন্নতি করতে না পারলে প্রকৃত সুফল পাওয়া যাবে না। বরং এক অংশকে শিক্ষিত ও অন্য অংশকে নিরক্ষর করে রাখলে সামগ্রিক ফল হতাশাব্যঞ্জকই হবে। শিক্ষিত অংশ আনন্দলাভের জন্য অসামাজিক আচরণের দিকে ঝুঁকে পড়বে।[৭] নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এতটা নিঃসংশয় হলেও সেই শিক্ষাকে বাস্তবায়নের জন্য কোন পথে অগ্রসর হওয়া উচিত, তা নিয়ে আমির আলি কিছু বলেননি বা সচেষ্ট হননি।

আবদুল লতিফের একেবারে বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে, আমির আলির থেকেও উদার মনোভাব পোষণ করে, সমস্ত রক্ষণশীলতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরোধিতা করে

বাংলার মুসলমান সমাজের উন্নতিসাধনে প্রয়াসী হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান স্নাতক দেলওয়ার হোসেন আহমদ মির্জা। লতিফের পিতার মতো তাঁরও পিতা কলকাতায় থাকতেন। সেই সুবাদে তিনিও ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ পান ও তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। তিনি কর্মজীবন শুরু করেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে এবং পরে তিনি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন পদাভিষিক্ত হন। লেখক হিসাবেও তিনি স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেন। ইসলাম ধর্মের সংস্কার সম্পর্কে তাঁর যুক্তিপূর্ণ অভিমতকে রীতিমতো বৈপ্লবিক বলা চলে। তিনি মনে করতেন যে ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণেই মুসলমান সমাজ পিছিয়ে পড়ছে। অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান বা আচারাদির পরিবর্তন বা বিলোপসাধন ছাড়া মুসলমান সমাজের উন্নতি যে অসম্ভব সে ব্যাপারেও তিনি দ্ব্যর্থহীন ছিলেন। 'প্রাচীন ও অবাস্তব রীতিনীতি'র পরিবর্তন যে অপরিহার্য তা তিনি স্পষ্টভাবে তাঁর ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত *এসেজ অন মহামেডান সোস্যাল রিফর্ম* নামের দু'খণ্ডের গ্রন্থে ঘোষণা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইসলামে অনুশীলিত সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিবিধান পরিবর্তনযোগ্য। মুসলমানদের প্রতিপত্তি হ্রাসের কারণ হিসাবে তাঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর ধর্মের প্রবল প্রভাবকে তিনি দায়ী করেছিলেন। ইউরোপের তুলনা টেনে তিনি বলেছিলেন যে ধর্মকে রাজনৈতিক ও নাগরিক বিধান থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে বলেই ইউরোপের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। সামগ্রিক ভাবে মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতার কারণগুলি চিহ্নিত করার পাশাপাশি সুরাহার পথও খোঁজার চেষ্টা করেন তিনি। মুসলমান সমাজের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য আশরফ ও আতরাফ শ্রেণির পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন। এর জন্য আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের অনিবার্যতার উপর জোর দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি মুসলমানদের বাংলা ভাষাও শিখতে হবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে তিনি বলেন যে তা হলে মেয়েদেরকে শিক্ষার আওতার মধ্যে আনা সম্ভব হবে। সম্ভবত দেলওয়ার হোসেনই প্রথম চিন্তাবিদ যিনি প্রকাশ্যে মুসলমান পুরুষের পাশাপাশি নারীদের আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করে বাস্তবায়নের পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন ১৮৮৯ সালে, তাঁর রচিত *এসেজ অন মহামেডান সোস্যাল রিফর্ম* গ্রন্থে, আমির আলির নারীশিক্ষা প্রসঙ্গে ভাবণেরও এক দশক আগে তাঁর এই উচ্চারণ। মেয়েদের শিক্ষার কথা বলার পাশাপাশি ওই গ্রন্থে পর্দাপ্রথার বাড়াবাড়ি নিয়েও দেলওয়ার হোসেন অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। মুসলমান সমাজে যে উত্তরাধিকার আইন প্রচলিত ছিল তার পরিবর্তন চেয়েছিলেন তিনি। সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার যাতে যথাযথভাবে স্বীকৃত হয়, সেই দাবিও তোলেন তিনি। বহুবিবাহ যে মুসলমান সমাজের অবনতির অন্যতম কারণ তা স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করতে এতটুকু দ্বিধা তিনি করেননি। নারীশিক্ষার প্রসার, পর্দাপ্রথার অবসান, উত্তরাধিকার আইনের পরিবর্তন ও বহুবিবাহ রদ— এই সোপানগুলি যে মুসলমান নারীকে অর্গলমুক্ত করে মুক্ত পৃথিবীতে পৌঁছতে সাহায্য করবে সে ভাবনাও তো প্রথম দেলওয়ার হোসেনের মাথাতেই এসেছিল।

গোটা উনিশ শতক ধরে বাংলায় যে আন্দোলন চলেছিল তা ছিল নারীদের অবস্থা উন্নত করার আন্দোলন। রামমোহনের সতীদাহ প্রথা নিবারণ দিয়ে এই আন্দোলনের সূচনা হলে তা অব্যাহত থাকে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, কুলীনপ্রথা রদ ইত্যাদির মাধ্যমে। এই সমস্যাগুলি যেহেতু মুসলমান সমাজে ছিল না তাই এই আন্দোলনের কোনও প্রভাব মুসলমান নারীদের উপর পড়েনি। বাংলার মুসলমান মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছিল ভিন্ন ধারায়, অন্য প্রেক্ষিতে, হিন্দু মেয়েদের তুলনায় অনেক ক'টি দশক পিছিয়ে।

আত্মপ্রতিষ্ঠার সন্ধানে মুসলিম মেয়েরা: প্রথম পর্ব

মুসলমান সমাজের জাগরণের লক্ষ্যে কলকাতায় যখন আমির আলি বা দেলওয়ার হোসেনের মতো চিন্তাবিদরা প্রয়াসী হচ্ছেন তখন দূর মফস্‌সলে সমাজের উন্নতির কথা ভেবে একের পর এক সাহসী পদক্ষেপ নিচ্ছেন ফয়জুন্নেসা চৌধুরী (১৮৩৪-১৯০৩)-র মতো ব্যক্তিত্ব।

'বেঙ্গল সোস্যাল অ্যাসোসিয়েশন'-এর এক সভায় ১৮৬৮ সালে আবদুল লতিফ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শিরোনাম ছিল 'মহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল'। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্রও। পাঠশেষে তিনি প্রশ্ন করেন, হিন্দু নারীদের মতো মুসলমান নারীদের শিক্ষার জন্য কোনও পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে কিনা। উত্তর দেন কলকাতা মাদ্রাসার মৌলবি আবদুল হাকিম। তিনি বলেন, নারীশিক্ষার বিষয়টি ইসলামে অজ্ঞাত নয়। ধর্মে নারী-পুরুষ উভয়ের শিক্ষার উপরেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। স্বয়ং হজরত মহম্মদ তাঁর স্ত্রী-কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আরবের খলিফা বা ভারতের বাদশাহরা তাঁদের কন্যাসন্তানদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতেন। শিক্ষিত মা বা স্ত্রী যে সামগ্রিকভাবে সমাজের উন্নতিসাধন করেন তা-ও মুসলমানদের অজানা নয়। এ কথা বললেও আবদুল হাকিম আরও যোগ করেন যে, ধর্মের কারণে মুসলমান মেয়েরা পর্দানশীন। তাই স্কুল কলেজে শিক্ষা অর্জন না করে তারা বাড়িতে জ্ঞানচর্চা করবে।[৮] বনেদি মুসলমান পরিবারগুলিতে এই পদ্ধতিই অনুসৃত হত। পর্দার আড়ালে থেকে মেয়েরা গৃহশিক্ষকের কাছে লেখাপড়া শিখত। সে শিক্ষা আবার আরবি-ফারসির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরেজি বা বাংলা শিক্ষা অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার পায়নি।

এইভাবেই গৃহশিক্ষক তাজউদ্দিনের কাছে লেখাপড়ার সূচনা হয় কুমিল্লার পশ্চিম গাঁ-এর মেয়ে ফয়জুন্নেসার। কঠোর অবরোধপ্রথা তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। অদম্য জেদ আর উৎসাহকে পুঁজি করে ওই অন্তরালে থেকেও আরবি-ফারসির পাশাপাশি তিনি শিখে ফেললেন বাংলা আর সংস্কৃত ভাষা। বাড়িতেই গড়ে তুললেন 'ফয়জন পাঠাগার'। বিদ্যাচর্চা ছাড়া সেখানে কাব্যচর্চাও চলত। গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াশোনা যথেষ্ট নয়, মেয়েরাও যাবে বিদ্যালয়ে। শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, তারা পড়বে অন্যান্য বইও। এই উপলব্ধিকে বাস্তবায়নের জন্য মরিয়া ফয়জুন্নেসা। ১৮৭৩ সালে কুমিল্লায় স্থাপন করলেন ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়। দূর মফস্‌সলে অবরোধবাসিনী এক নারী সম্পূর্ণ নিজের খরচে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করছেন। শুধু তাই নয়, হস্টেলে মেয়েদের মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে তাদের শিক্ষায়

উৎসাহিত করছেন— ফয়জুন্নেসার এই প্রচেষ্টা অভাবনীয় ঠেকে, বিস্ময়ের শেষ থাকে না। এ ছাড়া নিজের গ্রামেও তিনি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বলাই বাহুল্য যে ফয়জুন্নেসার এই 'দুঃসাহসী' প্রচেষ্টা সমাজপতিদের কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়। কিন্তু কোনও কিছুই তাঁকে হতোদ্যম করতে পারেনি।

প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রশ্নের উত্তরে আবদুল হাকিম মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে যা বলেছিলেন তা ছিল সেই সময়ের আলোকপ্রাপ্ত বাঙালি মুসলমান সমাজের অভিমত। আবদুল লতিফের মতো পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, মুসলমান সমাজের উন্নতিকামী অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্বও নারীর অবস্থান সম্পর্কে ওই মতই পোষণ ও সমর্থন করতেন। এই রক্ষণশীল ঘেরাটোপে আবদ্ধ এক মুসলমান নারী স্বয়ং এগিয়ে আসছেন স্বজাতীয় অন্যান্য মেয়েদের আগলমুক্ত করে, জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার আহ্বান কণ্ঠে নিয়ে! শুধু মুসলমান সমাজেই নয়, হিন্দু সমাজেও সেই সময়ে এমন দৃষ্টান্ত কোথায়?

১৮৮৫ সালে মায়ের মৃত্যুর পর ফয়জুন্নেসা জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি স্বয়ং জমিদারি পরিচালনা করতেন। মহারানি ভিক্টোরিয়া তাঁকে 'নওয়াব' উপাধিতে ভূষিত করেন। নারীশিক্ষা প্রসারে একনিষ্ঠতা ছাড়াও তিনি শুধু মেয়েদের চিকিৎসার জন্য ১৮৯৩-তে 'ফয়জুন্নেসা জেনানা হাসপাতাল' স্থাপন করেন। লাকসাম দাতব্য চিকিৎসালয়ও তাঁরই দান করা অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৯-তে কুমিল্লা কলেজ স্থাপনের জন্য তিনি অর্থ সাহায্য করেন। এ ছাড়া রাস্তাঘাট তৈরি বা অন্যান্য জনহিতকর কাজেও দরাজ হাতে অর্থ সাহায্য করতেন এই নওয়াব। এমনকী মক্কায় হজ করতে গিয়ে সেখানেও একটি স্কুল ও বিশ্রামাগার প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। দেশে ফেরার পরে এই প্রতিষ্ঠান দুটির জন্য তিনি অর্থসাহায্য পাঠান। নিজের অনেক সম্পত্তি তিনি ওয়াকফ করে যান যাতে তা থেকে দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্ররা অর্থসাহায্য পেতে পারে। উর্দুভাষী পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও ফয়জুন্নেসা কাব্যচর্চা করেন বাংলায়। ১৮৭৬ সালে *রূপজালাল* নামে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

অশেষ মনোবল ও যুগের তুলনায় অনেকটা এগিয়ে থাকা দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হলেও ফয়জুন্নেসা তাঁর উদার চিন্তাভাবনা কোথাও লিখে রেখে যাননি। কোনও আন্দোলন গড়ে তোলেননি। মুসলমান নারীশিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে যে অগ্রণী ভূমিকা তিনি পালন করেছিলেন তা অভূতপূর্ব হলেও ব্যতিক্রমী ঘটনা হিসাবেই রয়ে যায়।

১৮৯৭ সালের আগে কলকাতার মুসলমান মেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। এই বছরের ১৯ জানুয়ারি মুসলমান মেয়েদের জন্য প্রথম বিদ্যালয়টি আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্‌বোধন করেন লেডি ম্যাকেঞ্জি। নাম হল 'মুসলিম বালিকা মাদ্রাসা'। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হওয়ার পটভূমিকা হিসাবে কাজ করেছিল একটি প্রত্যাখ্যানের ঘটনা। ১৮৯৬ সালের মার্চ মাসে কলকাতার প্রভাবশালী ডাক্তার জহীরুদ্দিন আহমদের কন্যা বেথুন কলেজে ভর্তি হতে চেয়েও পারেনি। কারণ মুসলিম মেয়েদের পড়ার অধিকার ছিল না সেখানে। এই ঘটনা মুসলিমদের মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। মাস দেড়েকের মধ্যে (১০ মে ১৮৯৬) ব্যারিস্টার ই এ খোন্দকারের বাড়িতে একটি সভা হয়। মূল অ্যাজেন্ডা

ছিল মুসলমান মেয়েদের জন্য বড় আকারে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। ওই সভায় ছিলেন প্রিন্স মোহাম্মদ বখতিয়ার শাহ, মোহাম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর, শেখ মোহাম্মদ জিলানি শামসুল উলমা, আবুল সালাম খান বাহাদুর, আবদুল কাদির, আবুল হাসান খান বাহাদুর, ডাক্তার জমিরুদ্দিন আহমদ, আবদুল হামিদ, মির্জা সুজাত আলি বেগ, সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন প্রমুখ বিশিষ্টজন।[৯] বখতিয়ার শাহকে সভাপতি এবং সুজাত আলি বেগ ও ওয়াহেদ হোসেনকে যুগ্ম-সম্পাদক করে ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি সাময়িক কমিটি গঠন করা হয়। সভায় মুর্শিদাবাদের নবাব বেগম শামসি জাহান ফেরদৌস মহলকে পৃষ্ঠপোষকতা করার অনুরোধ জানানো হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুসলিম বালিকা মাদ্রাসা'। স্কুলবাড়ি নির্মাণের খরচ বহন করেন নবাব ফেরদৌস মহল। নবাব আহসানউল্লাহ এক হাজার টাকা দান করেন। সূচনাকালে বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ছিল ২৫ জন। অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায়ের উদ্যোগে কলকাতায় স্থাপিত প্রথম বালিকা বিদ্যালয় সম্পর্কে 'মোসলেম ক্রনিকল'-এ লেখা হয়, এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের প্রাক্কালে সমাজের একাংশ থেকে আপত্তি ওঠে কিন্তু সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেনের অদম্য ইচ্ছা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বিদ্যালয়টি চালু করা সম্ভবপর হয়।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্টজনের সহায়তায় কাউন্সিল অব এডুকেশনের প্রেসিডেন্ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ১৮৪৯ সালের ৭ মে হিন্দু বালিকাদের জন্য কলকাতায় প্রথম বিদ্যালয় 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' (পরে 'হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়' নামে পরিচিত) স্থাপন করেন। এর আগে কলকাতা স্কুল সোসাইটির সম্পাদক রাজা রাধাকান্ত দেবের সহায়তায় ১৮১৯ সালে কলকাতা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য ইংলন্ড থেকে মিস মেরি অ্যান কুককে আনানো হলেও সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এক দিকে পর্দানশীন হওয়ার কারণে মেয়েরা বাড়িতেই পড়াশোনা করবে এবং বাল্যবিবাহের চল— স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে উনিশ শতকের বাংলার হিন্দুসমাজ বারংবার এই দুই বাধার সম্মুখীন হয়ে রুদ্ধগতি হয়েছে। বেথুনের স্কুলের আরও এক সমস্যা ছিল সেখানে বাইবেল পড়ানো হত। ধর্মান্তকরণের আতঙ্কে সমাজের উঁচুতলার হিন্দু অভিভাবকরা কন্যাদের সেখানে পাঠাতে নারাজ ছিলেন। ১৮৫৬ সালে এই স্কুলের প্রসপেকটাস-এ লেখা হয় 'শুধুমাত্র ভদ্রঘরের মেয়েরাই এখানে শিক্ষালাভের অধিকারী।' এর চার দশক পরে কলকাতার প্রভাবশালী ও অভিজাত এক চিকিৎসকের কন্যা বেথুন স্কুলে ভর্তি হওয়ার অনুমতি পেল না। 'ভদ্রঘরের' সংজ্ঞা সেখানে পালটে গিয়ে বড় হয়ে উঠল ধর্মীয় পরিচয়— মেয়েটি মুসলমান! এর আগে আমরা দেখেছি যে উচ্চবর্ণের হিন্দু ছাড়া হিন্দু কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ আর কারও ছিল না। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দূরত্ব ছিল তা প্রতিফলিত হয়েছিল শিক্ষাব্যবস্থাতেও। নিজেদের প্রতিপত্তি বজায় রাখতে ব্রিটিশরাও এই দূরত্ব জিইয়ে রাখতে আগ্রহী ছিল। শুধু উনিশ শতক নয়, বিশ শতকের প্রথম দশক গুলিতেও বাংলার দুই প্রধান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক দু'টি শিক্ষাব্যবস্থা সমান্তরালভাবে চালু ছিল।

মহিলা স্কুল ইন্সপেক্টর মিস ব্রুক মুসলমান নারীশিক্ষা সম্পর্কে ১৯০৫-০৬ সালে একটি রিপোর্ট দেন। তাতে তিনি দু'ধরনের শিক্ষার উল্লেখ করেছেন— মহামেডান স্কুল ও মহামেডান জেনানা লাইফ। দ্বিতীয়টি তিনি অন্তঃপুরের শিক্ষা বা গৃহশিক্ষাকে বুঝিয়েছেন। স্কুলগুলিতে মেয়েরা কিছুটা বড়ো হতে না হতেই যাওয়া বন্ধ করে দিত পর্দাপ্রথার কারণে। আর অন্দরমহলের শিক্ষার মান ছিল অত্যন্ত নিম্নস্তরের কারণ দক্ষ বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের খুব অভাব ছিল। এই পরিস্থিতিতে ব্রুকের মনে হয়েছিল মুসলমান নারীশিক্ষা প্রসারে সাফল্য অর্জন করতে গেলে কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন। মুসলমান সমাজের একটা বড় অংশ নারীশিক্ষার ব্যাপারে সন্দিগ্ধ থাকলেও কয়েকটি পদক্ষেপ গৃহীত হলে 'জেনানা' ও স্কুল উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষাদানে সাফল্য পাওয়া যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন। প্রথমত, পর্দাপ্রথা সংরক্ষণের কারণে স্কুলগুলি থেকে সব ধরনের পুরুষ অফিসারদের প্রত্যাহার করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, অভিজাত শ্রেণির মুসলমান মেয়েদের স্কুলে আনতে হলে যাতায়াত-ভাতা প্রবর্তন করা দরকার। তৃতীয়ত, ভাল পরিবারের মহিলাদের শিক্ষিকা হিসাবে নিয়োগ করতে হবে। বিশেষত অন্দরমহলে শিক্ষাদানের জন্য এটি বিশেষ প্রয়োজন। এই শিক্ষিকারা যেন ভাল উর্দু বলতে পারেন সেদিকে নজর দিতে হবে। আর সর্বশেষে তিনি জোর দেন পাঠক্রম নির্বাচন প্রসঙ্গে। মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এমন পাঠ্যপুস্তক চালু করার কথা বলেন তিনি।[১০]

ব্রুকের এই রিপোর্টেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গোড়া থেকেই মুসলমানদের জন্য ভিন্নধারার শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভাবা হয়েছিল। ভেবেছিল ব্রিটিশ সরকার— অবশ্যই সময় এবং সমাজের দাবি মেনে। ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করে শিক্ষাপ্রসারের কাজে যে বেশি দূর এগোনো যাবে না এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ একেবারে নিশ্চিত ছিল।

এই প্রেক্ষাপটে নারী জাগরণের উদাত্ত আহ্বান নিয়ে আবির্ভূত হলেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন— মেয়েদের 'অকর্মণ্য পুতুল-জীবন' থেকে মুক্ত করে স্বাধীন ও 'পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থায়' উত্তরণের আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব এক প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের দৃঢ়তা ও আপসহীন মানসিকতা নিয়ে।

মুক্তিকামী রোকেয়া ও নারী আন্দোলনের নতুন মাত্রা

রংপুরের পায়রাবন্দের জমিদারবাড়ি সাবের পরিবারে ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। এই পরিবারের ছেলেদের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা বরাদ্দ থাকলেও মেয়েদের জ্ঞানার্জন ধর্মগ্রন্থ পাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাকে ঐতিহ্যের অনুসরণ বলেই বিবেচনা করা হত। তবে এই রীতি পরিবর্তনে সচেষ্ট হলেন কলকাতার পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণকারী রোকেয়ার দুই দাদা ইব্রাহিম সাবের ও খলিল সাবের। নিজের বোনেদের শিক্ষাদানের সংকল্পে স্থির থেকে তাঁরা নিজেদের অজান্তেই বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলনের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচনে সহায়ক হলেন; বাংলার নারী আন্দোলনের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটির পৃষ্ঠপোষকতা করে তাঁকে আধুনিক শিক্ষার মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন।

দিনের আলোয় লেখাপড়ার সুযোগ ছিল না। ভাইবোনের যৌথ অধ্যবসায় চলত রাতের অন্ধকারে, সকলের অনুপস্থিতিতে। দাদা ইব্রাহিম সাবেরের অপরিসীম উৎসাহের কথা রোকেয়া সারা জীবন মনে রেখেছিলেন— "বালিকা বিদ্যালয় বা স্কুল কলেজ গৃহের অভ্যন্তরে আমি কখনও প্রবেশ করি নাই। কেবল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অসীম স্নেহ ও অনুগ্রহে যৎসামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছি। অপর আত্মীয়স্বজনেরা আমার শিক্ষায় উৎসাহ দান করিবেন দূরে থাকুক, বরং নানা প্রকার বিদ্রূপ ও উপহাস করিতেন— কিন্তু তথাপি আমি পশ্চাৎপদ হই নাই। ভ্রাতাও কাহারও বিদ্রূপে ভগ্নোৎসাহ হইয়া আমাকে পড়াইতে ক্ষান্ত হন নাই।"[১১]

সাবের পরিবারের আর এক কন্যা রোকেয়ার দিদি করিমুন্নেসাও (১৮৫৫-১৯২৬) দাদাদের প্রেরণায় বাড়ির উঠোনে দাগ কেটে বাংলা বর্ণমালা লিখতে শিখেছিলেন। সাময়িকভাবে পিতা আবু আলির আনুকূল্যও পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মোল্লা, প্রতিবেশী আর অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের কোপানলে পড়তে হল তাঁকে। অর্থ না বুঝে টিয়াপাখির মতো কোরান আওড়ানো ছাড়া মেয়েদের অন্য কিছু পাঠ ছিল নিষিদ্ধ। অতএব তাঁর 'পড়াই বন্ধ' করে রংপুর থেকে দূরে 'বলিয়াদীতে মাতামহের প্রাসাদে' পাঠিয়ে দেওয়া হল। মাত্র ১৪ বছর বয়সে টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারবাসী বিখ্যাত গজনভি পরিবারে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল। সৌভাগ্যবশত শ্বশুরবাড়ির কয়েকজনের সহায়তায় তিনি বাংলা ভাষা চর্চার সুযোগ নতুন করে পান। এরপর সারা জীবনে তিনি 'লক্ষাধিক সংখ্যক বাংলা পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন।'

করিমুন্নেসা নিজেও লিখতেন। 'সাবের বংশের জনৈক কন্যা' এই নাম স্বাক্ষর করে তাঁর লেখা বেশ কিছু কবিতা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। কবিতা-লেখা বাঁধানো খাতাগুলো তিনি বাক্সের মধ্যে লুকিয়ে রাখতেন। মূলত রোকেয়ার 'পীড়াপীড়ি'তেই কয়েকটি কবিতা ছাপতে পাঠানো হয়। আরও কবিতার জন্য অনুরোধ জানিয়ে পত্রিকার সম্পাদক চিঠি পাঠান রোকেয়ার নামে। করিমুন্নেসা এতটাই প্রচারবিমুখ ছিলেন যে কখনও স্বনামে নিজের লেখা কোথাও প্রকাশ করেননি। 'কালে-ভদ্রে কোনও রচনা বা পুস্তক বে-নামীতে ছাপা হইত।"[১২]

বিয়ের মাত্র ন' বছর পরেই করিমুন্নেসার স্বামী মারা যান। দুই শিশু-পুত্রকে নিয়ে একেবারে অসহায় হয়ে পড়েন তিনি। অকথ্য নির্যাতন ও হীন লোকদের উপদ্রব সহ্য করেও দুই পুত্রের যথাযথ উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করেন তিনি। দেলদুয়ার থেকে পুত্রদের নিয়ে সুদূর কলকাতায় চলে আসেন করিমুন্নেসা। রক্ষণশীল মুসলিম সমাজে তাঁর এই পদক্ষেপ তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়। তাঁকে নিয়ে কুৎসা রটে যেতেও কালবিলম্ব হয় না। করিমুন্নেসাকে নিয়ে লেখা *লুকানো রতন* প্রবন্ধে রোকেয়া লিখেছেন, "...তিনি জ্ঞানলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষার প্রজ্জ্বলিত শিখা অন্দরে ঢাকিয়া রাখিয়া নীরবে দগ্ধ হইয়াছেন। তিনি নিজের শিক্ষালাভের জন্য কষ্ট সহিয়াছেন; পুত্রদ্বয়কে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য লাঞ্ছনা সহিয়াছেন— শেষে আমাকে দু'হরফ বাঙ্গলা পড়াইবার জন্যও নিন্দা ও ভ্রূকুটি সহিয়াছেন। ধন্য সমাজ! তবু তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই।"[১৩]

রোকেয়ার শিক্ষার্জনের ক্ষেত্রে তাঁর দুই দাদার অনমনীয় ইচ্ছা ও প্রেরণার কথা আমরা আগে বলেছি। তাঁর এই দিদির অপার স্নেহ ও উৎসাহ কীভাবে রোকেয়ার গড়ে ওঠার বছরগুলিতে সহায়ক হয়েছিল তা রোকেয়ার অনবদ্য লেখনীতে ধরা আছে। ১৩২৮ সালে প্রকাশিত *মতিচুর* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড রোকেয়া উৎসর্গ করেন তাঁর 'আপাজান' করিমুন্নেসাকে। উৎসর্গ-পত্রে তিনি লেখেন, "আমি শৈশবে তোমারই স্নেহের প্রসাদে বর্ণপরিচয় পড়িতে শিখি। অপর আত্মীয়গণ আমার উর্দু ও পারসী পড়ায় তত আপত্তি না করিলেও বাঙ্গালা পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। একমাত্র তুমিই আমার বাঙ্গালা পড়ার অনুকূলে ছিলে। আমার বিবাহের পর তুমিই আশঙ্কা করিয়াছিলে যে, আমি বাঙ্গালা ভাষা একেবারে ভুলিয়া যাইব। চৌদ্দ বৎসর ভাগলপুরে থাকিয়া বঙ্গভাষায় কথাবার্তা কহিবার একটি লোক না পাইয়াও যে বঙ্গভাষা ভুলি নাই, তাহা কেবল তোমারই আশীর্বাদে।..."[১৪]

শুধু বাংলা শেখার ক্ষেত্রেই নয়, ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারেও সহোদরাকে প্রাণিত করেছিলেন, সমর্থন জুগিয়েছিলেন করিমুন্নেসা। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইব্রাহিম সাবের রোকেয়াকে বলতেন, "বোন, এই ইংরেজি ভাষাটা যদি শিখে নিতে পারিস, তবে পৃথিবীর এক রত্নভাণ্ডারের দ্বার তোর কাছে খুলে যাবে।"[১৫] পরবর্তী জীবনে এই 'রত্নভাণ্ডারের দ্বার' উন্মোচনে রোকেয়ার একান্ত সহায়ক ও শিক্ষক হয়েছিলেন তাঁর উদারমনা শিক্ষানুরাগী স্বামী সাখাওয়াত হোসেন। তবে তাঁর এই ইংরেজি শেখার সূত্রপাত ঘটেছিল করিমুন্নেসার অপার আগ্রহে। ইংরেজিতে রচিত রোকেয়ার একমাত্র পুস্তিকা *Sultana's Dream* প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালে। এটিও তিনি উৎসর্গ করেন করিমুন্নেসাকে। "To my elder sister who was kind enough to help me in my childhood to commence my ABC of English language, this little book is reverently dedicated."

করিমুন্নেসার বিদ্যানুরাগ ও সাহিত্যপ্রেমী মনের সাক্ষ্য বহন করে *আহমদী* পত্রিকাও। পাক্ষিক পত্রিকা *আহমদী* প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১২৯৩-এর শ্রাবণ মাসে (জুলাই ১৮৮৬)। সম্পাদক ছিলেন আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী। দেলদুয়ারের জমিদারপত্নী করিমুন্নেসা খানম চৌধুরানী এই পত্রিকার সাহায্যদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[১৬] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, উদার ও মুক্তচিন্তার অধিকারী গজনভি পরিবারের জমিদারি এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন।

যে সময়ে ভাবা হত মেয়েরা যখন জজ-ম্যজিস্ট্রেট হবে না তখন তাদের লেখাপড়া শেখার দরকারটা কী, তখন সমাজের সব চাপ অগ্রাহ্য করে রোকেয়ার দাদা-দিদি ছোটো বোনকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে এবং পরে সাহিত্যচর্চা করতে যেভাবে উৎসাহ দিয়েছেন তা থেকে মনে হয় রোকেয়ার বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও আপসহীন মনোভাব গড়ে ওঠার পিছনে তাঁর এই ভ্রাতাভগ্নীর বিরাট অবদান।

রোকেয়ার বড় হয়ে ওঠার মুহূর্তগুলিতে মেয়েদের আধুনিক শিক্ষাগ্রহণে বাধা যেমন ছিল, তেমনই কায়েম ছিল কঠোর কঠিন অবরোধপ্রথা। এই নির্মম অবরোধপ্রথার নামে প্রচলিত নিপীড়ন ও নির্যাতন থেকে নেহাত শিশুরাও রেহাই পেত না। রোকেয়া লিখেছেন,

"...সম্ভ্রান্ত মুসলমানের ঘরের বালিকার বয়স আট বৎসর পার হইলেই তাহাদের উচ্চহাস্য করা নিষেধ, উচ্চৈস্বরে কথা বলা নিষেধ, দৌড়ান লাফানো ইত্যাদি সবই নিষেধ। এক কথায় তাহার নড়াচড়াও নিষেধ। সে গৃহকোণে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া কেবল সূচী-কর্ম করিতে থাকিবে— নড়িবে না। এমনকী দ্রুতগতি হাঁটিবেও না।"[১৭]

শুধু অন্দরবাসিনীরাই অবরোধপ্রথা মেনে চলতেন না। যে সব মহিলা বাড়ির বাইরে বেরোতেন, তাঁরাও নিজেদের বোরখা, বিছানার চাদর, এমনকী মশারির আড়ালে আচ্ছাদিত করে বংশের 'সম্ভ্রম', কুলের 'মর্যাদা' বাঁচাতেন! সমাজের বোঝাস্বরূপ এই নারীদের রোকেয়া 'human luggage' বা মানববোঝা নামে চিহ্নিত করেছেন। অবরোধকে প্রাণঘাতক কার্বলিক অ্যাসিডের সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেছিলেন, "অন্তঃপুরবাসিনী নারী এই অবরোধ গ্যাসে বিনা ক্লেশে তিল তিল করিয়া নীরবে মরিতেছে।"

অবরোধ-সম্পর্কিত ৪৭টি পারিবারিক ও সামাজিক মর্মস্পর্শী কাহিনি অত্যন্ত সরস ও শ্লেষাত্মক ভঙ্গিমায় রোকেয়া *অবরোধবাসিনী* নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর আগে এই ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধিটি নিয়ে আর কেউ তেমন কিছু লেখেননি। সব ধরনের সামাজিক গোঁড়ামির বিরুদ্ধেই রোকেয়া লেখনী ধারণ করেছিলেন। বিশ শতকের গোড়া থেকে তাঁর লেখা প্রবন্ধ, রম্যরচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। স্বামীর উৎসাহ ও আনুকূল্যে বিবাহিত জীবনেও পড়াশোনা ও সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। রোকেয়ার ভেতরের আগুনের আঁচ পেয়েছিলেন তাঁর স্বামী সাখাওয়াত হোসেন (১৮৫৮-১৯০৯)। রোকেয়ার জীবনকে সুষমাময় করেছিল স্বামীর আন্তরিক উৎসাহ, সাহায্য ও প্রেরণা। তাঁদের দাম্পত্যজীবন মাত্র চোদ্দো বছরের (১৮৯৬-১৯০৯) হলেও সাখাওয়াতের সংস্কারমুক্ত, আধুনিক ও প্রগতিশীল মনের ছোঁওয়া রোকেয়ার পরবর্তী জীবন ও কর্মকে সমৃদ্ধ করেছিল। স্বামীর সযত্ন প্রচেষ্টায় তিনি উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হয়ে ওঠেন। আর রোকেয়া তাঁর উর্দুভাষী স্বামীকে বাংলা শেখানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সাখাওয়াতের মৃত্যু তাঁদের এই সহযোগিতাপূর্ণ সুন্দর যৌথ জীবনে ছেদ টানে।

স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাস পরে ১৯০৯ সালের ১ অক্টোবর ভাগলপুরের খলিফাবাগে মাত্র পাঁচজন ছাত্রীকে নিয়ে রোকেয়া গড়ে তোলেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়। তবে শ্বশুরবাড়ির কিছু আত্মীয়ের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ রোকেয়া বেশি দিন ভাগলপুরে থাকতে পারলেন না। অগত্যা ১৯১০ সালের ৩ ডিসেম্বর তিনি কলকাতায় চলে আসেন। ১৯১১ সালের ১১ মার্চ (মতান্তরে ১৬ মার্চ) ওয়ালিউল্লাহ লেনের একটি ছোট্ট ভাড়াবাড়িতে দ্বিতীয়বার রোকেয়া শুরু করলেন তাঁর স্কুল। মাত্র দুটো ক্লাস, দু'খানা বেঞ্চ আর আটজন ছাত্রী। বাড়ি বাড়ি গিয়ে অনেক সাধাসাধি করে 'পর্দানশীন' মেয়েদের ডেকে এনে শুরু হল মুসলমান মেয়েদের জন্য রোকেয়ার স্কুল।

মেয়েদের অর্গলমুক্ত করার জন্য শিক্ষাই যে প্রধানতম হাতিয়ার তা রোকেয়া বিশ্বাস করতেন সর্বান্তঃকরণে। তিনি কোরান-হাদিস-শরিয়ত থেকেই খুঁজে বার করেছিলেন স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে যুক্তি— ঠিক যেভাবে হিন্দু সমাজের গোঁড়মি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অস্ত্র

হিন্দু শাস্ত্র থেকে খুঁজে বার করেছিলেন বিদ্যাসাগর বা রামমোহন।[১৮] নিরন্তর সংগ্রামে যাবতীয় অন্ধকার থেকে মুসলমান মেয়েদের টেনে এনে আলোর নীচে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন রোকেয়া। তিনি বলতেন, "ভারতবর্ষে যখন স্ত্রীশিক্ষার বাধ্যতামূলক আইন পাশ হইবে, তখন দেখা যাইবে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, মুসলমান— যাঁহারা স্বীয় পয়গম্বরের নামে (কিম্বা ভগ্ন মসজিদের এক খণ্ড ইস্টকের অবমাননায়) প্রাণ দানে প্রস্তুত হন, তাঁহারা পয়গম্বরের সত্য আদেশ পালনে বিমুখ কেন? গত অন্ধকার যুগে যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা যে ভ্রম করিয়াছেন তাহাও ক্ষমা করা যাইতে পারে; কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে যখন বারংবার স্ত্রী-শিক্ষার দিকে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে যে, কন্যাকে শিক্ষা দেওয়া আমাদের প্রিয় নবী 'ফরয' (অবশ্য পালনীয় কর্তব্য) বলিয়াছেন, তবু কেন তাঁহারা কন্যার শিক্ষায় উদাসীন?"[১৯]

রোকেয়া উদাসীন থাকেননি। থাকতে পারেননি। অভিভাবকদের থাকতে দেননি। সমাজের উদাসীনতা দূর করতে চেয়েছেন বলিষ্ঠ লেখনীর তীব্র আঘাতে, পথে নেমে— বাড়ি বাড়ি ঘুরে তিনি ছাত্রী জোগাড় করতেন। ছাত্রীদের অধিকাংশই তখন পড়ত বিনা বেতনে। তাদের যাতায়াতের গাড়ি ভাড়াও (ঘোড়ার গাড়ি) রোকেয়া মকুব করেছিলেন।

স্কুলের পাঁচটি ক্লাস, ছোটোবড়ো ছাত্রী, দু'টি গাড়ি, দু'জোড়া ঘোড়া, সহিস, কোচম্যান ইত্যাদি সব দিক রোকেয়া একা হাতে সামাল দিতেন। এমনকী, রোজ সন্ধ্যাবেলা সহিসেরা ঘোড়া 'মলে' কিনা তা-ও তাঁকে দেখতে হত। আর তাঁর এই "হাড়ভাঙা খাটুনির পরিবর্তে সমাজ বিস্ফারিত নেত্রে" তাঁর "খুঁটিনাটি ভুলভ্রান্তির ছিদ্র অন্বেষণ করতেই বদ্ধপরিকর" ছিল। তবে তাতে তিনি বিচলিত হতেন না। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, "যদি সমাজের কাজ করিতে চাও, তবে গায়ের চামড়াকে এতখানি পুরু করিয়া লইতে হইবে, যেন নিন্দা গ্লানি উপেক্ষা-অপমান কিছুতে তাহাকে আঘাত করিতে না পারে, মাথার খুলিকে এমন মজবুত করিয়া লইতে হইবে, যেন ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্র বিদ্যুৎ সকলই তাহাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।"[২০]

'পুরু গায়ের চামড়া' আর 'মজবুত মাথা' নিয়ে অবিচল রোকেয়া তাঁর স্কুলটিকে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাঁর স্কুলের দিকে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন নবাব সৈয়দ শামসুল হুদা, বিচারপতি আমিন আহমদ, জি এম কাসেম প্রমুখ। নানা ধরনের পরামর্শ দিয়ে রোকেয়াকে সাহায্য করেন ভূপালের বেগম সুলতান জাহান, সাকিনা চৌধুরি, লেডি চেমসফোর্ড, লেডি কারমাইকেল এবং সরোজিনী নাইডু। রোকেয়ার এই মহৎ প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে হায়দরাবাদ থেকে ১৯১৬ সালে সরোজিনী নাইডু একটি চিঠি পাঠান— "...কয়েক বৎসর হইতে দেখিতেছি, আপনি কি দুঃসাহসের কাজ করিয়া চলিয়াছেন। মুসলমান বালিকাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আপনি যে কাজ হাতে নিয়াছেন এবং তাহার সাফল্যের জন্য দীর্ঘকালব্যাপী যে ত্যাগ সাধনা করিয়া আসিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। আপনার প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতি এবং শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যেই এই চিঠিখানা লিখিলাম। ...আজ সাময়িক

পত্রে (*Indian Ladies Magazine*) আপনার স্কুলের বার্ষিক রিপোর্ট পড়িতেছিলাম। আপনার এই ভগ্নী দূর হইতে বারবার আপনার আদর্শকে এবং আপনার কর্মময় জীবনকে কী রূপ শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়া থাকে, তাহা জানাইবার জন্যই এই চিঠি। মুসলমান নারীদের কল্যাণের জন্য আপনি যে অক্লান্ত সাধনা করিতেছেন, বিধাতা করুন তাহা জয়যুক্ত হউক।"[২১]

শুভার্থীদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা রোকেয়ার মনোবল ও কর্মোদ্যম নিঃসন্দেহেই বৃদ্ধি করতে সহায়ক হত। ১৯২৭ থেকে প্রতি বছর একটি করে ক্লাস বাড়তে থাকে সাখাওয়াত মেমোরিয়ালে। প্রাথমিক পর্যায়ের ক্লাসগুলো যাতে কোনও ভাবেই অবহেলিত না হয় সে জন্য রোকেয়া একটি পৃথক কিন্ডারগার্টেন শাখা চালু রাখলেন। ১৯৩১-এ এই স্কুলের মেয়েরা প্রথমবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। ওই সময়ে উঁচু ক্লাসগুলিতে ছাত্রী ভর্তির বিজ্ঞাপন প্রচারিত হত দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিতে। *দ্য মুসলমান*-এর মতো পত্রিকা এই বিজ্ঞাপন বিনা মূল্যেও প্রকাশ করত।

সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের মাধ্যমে মুসলমান নারীসমাজে আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষার ব্যাপক প্রচারই ছিল রোকেয়ার অন্তরের একান্ত কামনা। তিনি চাইতেন, মুসলমান মেয়েরাও যেন আধুনিক জগতের অন্যান্য জাতির মেয়েদের মতো জীবনের সব ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে পারে। এ প্রসঙ্গে *ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম* প্রবন্ধের এক জায়গায় রোকেয়া লিখেছিলেন, "...একটি আদর্শ মোসলেম বালিকা বিদ্যালয়,— যেখানে আমাদের মেয়েরা আধুনিক জগতের অন্যান্য সম্প্রদায় এবং প্রদেশের লোকের সঙ্গে তাল রেখে চলবার মতো উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে। অন্যান্য সুসভ্য সম্প্রদায়ের এবং এই ভারতবর্ষেরই অন্যান্য প্রদেশের মুসলমান মেয়েরা ডাক্তার, ব্যারিস্টার, কাউন্সিলার এবং গোল-টেবিল বৈঠকের সদস্য হচ্ছেন, আমাদের মেয়েরা কোন পাপে ওই সব সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত থাকবে?"[২২]

এবার দেখা যাক 'শিক্ষা' বলতে রোকেয়া কী বুঝতেন? "শিক্ষা অর্থে আমি প্রকৃত সুশিক্ষার কথাই বলি; গোটা কত পুস্তক পাঠ করিতে বা দু-ছত্র কবিতা লিখিতে পারা শিক্ষা নয়। আমি চাই সেই শিক্ষা— যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে,... শিক্ষা-মানসিক এবং শারীরিক উভয়বিধ হওয়া চাই। তাহাদের জানা উচিত যে, তাহারা ইহজগতে কেবল সুদৃশ্য শাড়ি, ক্লিপ ও বহুমূল্য রত্নালঙ্কার পরিয়া পুতুল সাজিবার জন্য আইসে নাই; বরং তাহারা বিশেষ কর্তব্য সাধনের নিমিত্ত নারীরূপে জন্মলাভ করিয়াছে। তাহাদের জীবন শুধু পতি-দেবতার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত উৎসর্গ হইবার বস্তু নহে। তাহারা যেন অন্নবস্ত্রের জন্য কাহারও গলগ্রহ না হয়।"[২৩]

রোকেয়া চাইতেন শিক্ষাকে হাতিয়ার করে মেয়েদের 'সংসারের এক গুরুতর বোঝা' থেকে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষে রূপান্তরিত করতে। পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে হলে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়া জরুরি, অন্নবস্ত্রের জন্য অন্যের গলগ্রহ হলে চলবে না— বিশ শতকের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকেই রোকেয়ার এই উপলব্ধি বাংলার মুসলমান মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে নিশ্চিতভাবেই অন্য এক মাত্রা দেয়। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার

ছাড়াও মুসলমান মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলেছেন রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণকারী এক নারী, কোনও সমালোচনা, কুৎসার তোয়াক্কা না করে! বাংলার মুসলমান মেয়েদের আলোর পথযাত্রী করে তুলতে রোকেয়া একাই যেন এক আন্দোলনের সমার্থক হয়ে উঠলেন।

আর্থিক স্বাধীনতার কথা তিনি শুধু বললেন না, কাজেও করে দেখালেন। ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' বা 'নিখিল বঙ্গ মুসলিম মহিলা সমিতি'। মুসলিম নারীদের ঐক্যবদ্ধ করে সমাজে তাদের নিজের অধিকার বুঝে নিয়ে তা প্রতিষ্ঠা করতে, দেশ ও জাতি সম্পর্কে সচেতন করতে এই সমিতি সচেষ্ট ছিল। তা ছাড়া বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের নানা ধরনের শিল্পকর্ম ও অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে জীবিকা উপার্জনে সহায়তা করতে। মহিলাদের স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার পাশাপাশি আর্ত পীড়িত দরিদ্রদের সেবা করার কাজও সমিতির সদস্যরা করতেন।

সে সময়ে হিন্দু সমাজে 'সখী সমিতি' (১৮৮৬) 'মহিলা শিল্প সমিতি' (১৯০৭), 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' (১৯১০) প্রভৃতি সংগঠন হিন্দু নারীর জাগরণ ও শিক্ষার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। মুসলমান মেয়েদের এ ধরনের কোনও সংগঠন না থাকার অভাব পূরণ করেছিলেন রোকেয়া তাঁর এই সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

শুধু মেয়েদের জন্যই নয়, সামগ্রিকভাবে মুসলিম সমাজের বিকাশে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম' কী ভূমিকা পালন করেছিল তা সঠিকভাবে বোঝা যাবে রোকেয়া-অনুগামী ও আঞ্জুমানের সক্রিয় কর্মী শামসুন নাহারের কথা থেকে। "...আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম দীর্ঘকালের জীবনে কী কী কাজ করিয়াছে তাহার বিবরণ আলোচনা করিলে দেখা যায়, অতীতে বহু বিধবা নারী ইহার নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পাইয়াছে, বহু বয়ঃপ্রাপ্তা দরিদ্রা কুমারী ইহার সাহায্যে সৎ পাত্রস্থা হইয়াছে, বহু অভাবগ্রস্তা বালিকা ইহার অর্থে শিক্ষালাভ করিয়াছে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজসেবা ও পরোপকারের কথা উল্লেখ করিলে ইহার সম্পর্কে কিছুই বলা হইল না। কলিকাতার মুসলমান নারী সমাজের গত বিশ বৎসরের (১৯১৬-৩৬) ক্রমোন্নতির ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় এই সমিতি দীর্ঘকাল লোকচক্ষুর আড়ালে মুসলমান সমাজকে কতখানি ঋণী করিয়া রাখিয়াছে।"[২৪]

আঞ্জুমানের আলোচনায় আরও একটি প্রসঙ্গ উল্লেখের দাবি রাখে। স্বদেশি ও খেলাফত আন্দোলনের সময় রোকেয়ার নেতৃত্বে এই সমিতি দেশ ও সমাজের কাজ করেছে। সমিতির সদস্যরা বাড়ির বাইরে এসে সক্রিয় ও প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না হলেও মুসলমান মেয়েদের মধ্যে স্বদেশি ভাবধারা প্রচারে তাঁরা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তা ছাড়া রোকেয়ার নেতৃত্বে অঞ্জুমানের মহিলারা চরকা কেটে প্রচুর পরিমাণে সুতো তৈরি করে খদ্দর বুনতে সাহায্য করেন। বিদেশি জিনিস বর্জনে সমিতির কর্মীরা প্রশংসনীয়ভাবে এগিয়ে আসেন।

১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর মাত্র ৫২ বছর বয়সে রোকেয়ার মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর আদর্শ, তাঁর স্বপ্ন, তাঁর আদরের বিদ্যালয় রয়ে যায়। রয়ে যায় বাংলার মেয়েদের নতুন ভাবে ভাবতে শেখাতে, নতুন পরিচয়ে পরিচিত হতে প্রাণিত করতে, রোকেয়ার জীবন-কর্ম-সাহিত্য থেকে বারংবার দিশা-দীক্ষা-মনোবল ও লক্ষ্যে স্থির থেকে এগিয়ে যাওয়ার সাহস সঞ্চয় করার মন্ত্র নিয়ে।

রোকেয়ার উত্তরসূরিরা

রোকেয়ার আদর্শে সামিল হয়ে বাংলার মুসলিম মেয়েদের দুরবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়ার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন অনেকে। তেমনই একজন ছিলেন শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪)। নোয়াখালির এক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। মাত্র ছ' মাস বয়সে পিতা মোহাম্মদ নুরুল্লাহ চৌধুরীকে হারান তিনি। মাতা আসিয়া খাতুন চৌধুরানী তখন তিন বছরের পুত্র হাবিবুল্লাহ বাহার ও ছ' মাসের শিশুকন্যা নাহারকে নিয়ে নোয়াখালি থেকে চট্টগ্রামে পিত্রালয়ে চলে যান। চট্টগ্রামের ড. খাস্তগীর গার্লস স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর সমাজের চাপে নাহারের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। শুরু হয় গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াশোনা। ১৯২৬ সালে চারটে বিষয়ে লেটার সহ শতকরা প্রায় ৮০ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি। এরপর উচ্চশিক্ষিত ও উদারচেতা ডাক্তার ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। স্বামীর সক্রিয় সহযোগিতায় তিনি কলকাতায় এসে ডায়োসেশন কলেজে ভর্তি হন ও ১৯২৮ সালে বিংশতিতম স্থানলাভ করে আই এ পাশ করেন। ১৯৩২ সালে প্রাইভেটে পড়াশোনা করে তিনি ডিস্টিংশনসহ বি এ পাশ করেন। এই বছরের ৯ ডিসেম্বর রোকেয়ার মৃত্যুতে অ্যালবার্ট হলে আয়োজিত শোকসভায় তিনি সুন্দর ও মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন।

বিশেষত মুসলিম মেয়েদের উচ্চশিক্ষার কথা ভেবে ১৯২৯ সালে কলকাতার পার্ক সার্কাসে স্থাপিত হয় লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজ। ওই বছরই শামসুন নাহারকে ব্রাবোর্ন কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। শর্ত থাকে তিন বছরের মধ্যে এম এ পাশ করতে হবে। ১৯৪২ সালে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। দেশভাগের পর তিনি ঢাকার ইডেন কলেজে যোগ দেন।

শুধু উচ্চশিক্ষা লাভ করে শামসুন নাহার তৃপ্ত থাকতে পারেননি। রোকেয়ার পাশাপাশি কাজ করতে গিয়ে তিনি মেয়েদের করুণ সামাজিক অবস্থান সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ধর্মান্ধতা ও পশ্চাৎপদতা থেকে নারীকে মুক্ত করার কাজে তিনিও সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসেন। রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত 'অঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম'-এর সম্পাদিকার দায়িত্বভার অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে তিনি পালন করেন। তা ছাড়া আরও নানান ধরনের সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি নিজেকে যুক্ত করেন। 'নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন'-এর কলকাতা শাখায় তিনি যোগ দেন। ভারতীয় নারীদের পূর্ণাঙ্গ উন্নতির জন্য শিক্ষা, সামাজিক অধিকার, বিভিন্ন সুযোগসুবিধা আদায়, দুঃস্থ ও দুর্গত নারীদের মধ্যে ত্রাণ

বিতরণ ও সাহায্য করার ব্যাপারে এই সম্মেলন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সুবক্তা শামসুন নাহার এই সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বক্তৃতা দিতেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন সংস্কার আইন পাশ করার সময় ভারতীয় নারীর ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলনে তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন। এই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতেই পরবর্তীকালে মেয়েরা ভোটাধিকার অর্জন করেন। তাঁরই উদ্যোগে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কয়েকটি আসন নারীদের জন্য সংক্ষিত হয়। ১৯৩৬ সালে কলকাতায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে তিনি বাংলার মুসলমান মহিলা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল অব উইমেন, ন্যাশনাল কাউন্সিল অব উইমেন ইন ইন্ডিয়া প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক শিক্ষা বোর্ড, প্রাদেশিক টেক্সট বুক বোর্ড, লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ, সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সদস্য হিসাবেও তিনি যুক্ত ছিলেন। শিক্ষা ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৪৪ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে এম বি ই উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। দেশভাগের পর তিনি 'অল পাকিস্তান উইমেনস অ্যাসোসিয়েশন'-এর সহ-সভানেত্রী হন। পরবর্তীকালে তিনি এই সংগঠনের শিশুসাহিত্য শাখার সভানেত্রী পদে আসীন হন। ১৯৬২ সালে তিনি ঢাকা লেডিস ক্লাবের সভানেত্রী হন। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন।

রোকেয়ার এই ভাবশিষ্যা সমাজসেবার পাশাপাশি সাহিত্যসেবাও করেছেন। তাঁর লেখা কবিতা যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র বারো। কাজি নজরুল ইসলাম তাঁকে ও তাঁর দাদা হবিবুল্লাহ বাহারকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ১৯২৭ সালে নজরুল যখন চট্টগ্রামে যান তখন তাঁদের বাড়িতে থাকেন। নজরুল তাঁর কাব্যগ্রন্থ *সিন্ধুহিল্লোল* (১৯২৭) — শামসুন নাহার ও তাঁর দাদা হবিবুল্লাহ বাহারের নামে উৎসর্গ করেন। নজরুলকে নিয়ে তিনি লেখেন *নজরুলকে যেমন দেখেছি* গ্রন্থটি। ছোটদের জন্যও বেশ কয়েকটি বই লেখেন তিনি। রোকেয়ার জীবন ও আদর্শ যাতে আরও অনেককে প্রাণিত করতে পারে তা ভেবে তিনি লেখেন 'রোকেয়া-জীবনী' যা আজও পর্যন্ত রোকেয়া-চর্চার ক্ষেত্রে একটি অবশ্যপাঠ্য প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যও লাভ করেছিলেন শামসুন নাহার। প্রতি বছর শান্তিনিকেতনে বাৎসরিক উৎসবে মহিলা শাখার সভানেতৃত্ব করার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হতেন।[২৫] ১৯৪১ সালে শান্তিনিকেতন গিয়ে তিনি তিন দিনের জন্য উত্তরায়ণের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

শামসুন নাহারের লেখা বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি *নওরোজ* ও *আত্মশক্তি*-র মহিলা বিভাগের সম্পাদনা করেন কৃতিত্বের সঙ্গে। ১৯৩৩ সালে ভ্রাতা বাহারের সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদনায় *বুলবুল* নামে একটি উন্নতমানের পত্রিকা প্রকাশ করেন।[২৬] রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকাকে একটি আশীর্বাণী পাঠান। তাতে লেখেন, "আমাদের দুঃখ আমাদের লজ্জা চরম সীমার দিকে চলেছে, আমরা স্পর্ধা করে আত্মঘাতের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। সর্বনাশের

মদমত্ততায় আত্মবিস্মৃত দেশের উন্মত্ত কোলাহলের মাঝখানে তোমরা শুভবুদ্ধির আহ্বান নির্ভয়ে ঘোষণা করো, ঈশ্বরের প্রসন্নতা তোমাদের উদ্যোগকে গৌরবান্বিত করবে।" অন্নদাশঙ্কর রায় লেখেন, "বুলবুল যদি মিলনদূত হয়ে শান্তির বার্তা শোনায় তবে দেশের এই বেদনার্ত মুহূর্তে তার আবির্ভাব ইতিহাসের অন্তর্গত হবে।"

শিক্ষার্জনের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ, সমাজসচেতন একজন মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের একজন অংশীদার হওয়ার পাশাপাশি সংবেদনশীল এক মনের অধিকারী হওয়া যাতে, অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মতো মানসিকতা থাকে এবং অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন অর্জনের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে সম্পূর্ণ একজন মানুষ হতে পারা— এমন নারীর স্বপ্নই তো রোকেয়া দেখেছিলেন। তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহকারী, তাঁর অনুগামী শামসুন নাহারের জীবনে তাই যেন বাস্তবায়িত হয়েছিল। একেবারে গোড়ার দিকে বাংলার যে মুসলমান মেয়েরা শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সমাজজীবনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শামসুন নাহারের নাম স্বমহিমায় বিরাজমান।

এমনই আরও একটি নাম সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯)। বাংলার মেয়েদের এক নতুন দিশা দেখিয়েছেন তিনি, সংগ্রাম-আন্দোলন-প্রতিবাদের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে নিজেই এক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিলেন।

বরিশাল জেলার সায়েস্তাবাদে ১৯১১-র ২০ জুন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে সুফিয়া কামালের জন্ম। তাঁর বাবা সৈয়দ আবদুল বারি ছিলেন বহুভাষাবিদ পণ্ডিত। কিন্তু সুফিয়া যখন মাত্র সাত মাসের শিশু তখন তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান। পরে তাঁর সন্ধান পাওয়া গেলেও আধ্যাত্মিক জীবনে জড়িয়ে পড়ায় সংসারজীবনে আর ফেরেননি। মা সাবেরা খাতুন শিশুকন্যাকে নিয়ে পিতৃগৃহে চলে যান। পরবর্তী জীবনে সুফিয়ার সাহিত্য ও ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণার সবটা জুড়েই ছিল মামার বাড়ির স্মৃতি।

তখনকার প্রথা মেনে কোনও বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ তিনি পাননি। তবে ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। প্রথামাফিক খুব অল্প বয়সে তাঁর বিবাহও হয়ে যায়। মামাতো ভাই সৈয়দ নেহাল হোসেনের সঙ্গে মাত্র বারো বছর বয়সে। উদার ও প্রগতিশীল নেহাল ছিলেন নারীশিক্ষার একজন দৃঢ় সমর্থক। স্বামীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সুফিয়ার সাহিত্য প্রতিভার স্ফূরণ ঘটে। সমাজসেবার হাতেখড়িও হয় স্বামী উৎসাহে। সুফিয়ার জীবনকে অর্থপূর্ণভাবে বিকশিত করতে নেহাল খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বিয়ের পর তিনি বরিশালে যান। তাঁর প্রথম লেখা *তরুণ* নামে একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় রক্ষণশীল পরিবারে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এরপর স্বামীর সঙ্গে তিনি কলকাতায় আসেন ও রোকেয়া সাখাওয়াতের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান। এই যোগাযোগ তাঁর জীবন ও চিন্তাধারাকে এক অন্য মাত্রা দেয়। রোকেয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলার মুসলমান মেয়েদের অবরোধের বেড়া থেকে মুক্ত করে শিক্ষাদানের পাশাপাশি সমাজের

মূল প্রবাহে সামিল করার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেন। রোকেয়ার সান্নিধ্যেই তিনি বুঝতে পারেন সমাজের অর্ধাংশ অসহায় এই নারীদের পাশে থেকে, হাত ধরে পথ না দেখালে গোটা সমাজের অগ্রগতি ও উন্নতি অসম্ভব।

এর মধ্যে হঠাৎ তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। দিশেহারা সুফিয়া মাত্র ২১ বছর বয়সে কর্পোরেশন স্কুলে চাকরি নিতে বাধ্য হন। এই সময় থেকেই তাঁর সাহিত্যজীবনও ধারাবাহিকতা পায়। এ ক্ষেত্রে সুফিয়াকে নিরন্তর উৎসাহ দেন, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন কাজি নজরুল ইসলাম ও *সওগাত* পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *সাঁঝের মায়া* রবীন্দ্রনাথকে পাঠালে আশীর্বাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে কবিগুরু একটি চিঠি পাঠান। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্রের আদানপ্রদান ছিল। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে এই চিঠিগুলি সংরক্ষিতও আছে। জোড়াসাঁকোর বাড়িতেও সুফিয়া যেতেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বাক্ষর করে তাঁকে বই উপহার দিতেন।

সাহিত্যসাধনার পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক পৃথিবী নিয়েও নিরন্তর ভাবতেন সুফিয়া। উন্নততর মুক্ত দেশ-সমাজের স্বপ্ন দেখতেন। ১৯২৫ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন বরিশালে যান তখন সুফিয়া নিজের হাতে চরকায় সুতো কেটে তাঁকে উপহার দেন। রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম'-এর সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন এবং ১৯৩০-এর দশকে কলকাতার বিভিন্ন বস্তিতে নানান উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নেন।

১৯৩২ সালে তিনি পুনর্বার বিবাহ করেন। দ্বিতীয় স্বামী কামালউদ্দিনও তাঁকে সব সময় উৎসাহ জোগাতেন। ১৯২০ সালে বর্ধমানে তৎকালীন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেত্রী মণিকুন্তলা সেনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে তিনি যোগ দেন। সুফিয়া কামালই ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের প্রথম মুসলমান সদস্য। ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে লেডি ব্রাবোর্ন কলেজের আশ্রয়কেন্দ্র তাঁরই তত্ত্বাবধানে ছিল। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পরে তিনি ঢাকায় চলে যান। সেখানে লীলা রায় (নাগ), আশালতা সেন প্রমুখের সান্নিধ্যে আসেন।

এরপরে ওপার বাংলার সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের শীর্ষে থাকত সুফিয়া কামালের নাম। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের সময় ঢাকার মহিলাদের সংগঠিত করে তিনি মিছিল পরিচালনা করেন। ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন উয়াড়ি মহিলা সমিতি। ১৯৭০ সালে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভানেত্রী নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু ওই পদে বহাল থাকেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাক সেনাদের হাতে নির্যাতিত লাঞ্ছিত ধর্ষিত নারীদের পুনর্বাসনের কাজ গোপনে সুচারুভাবে সংগঠিত করেছেন। সব ধরনের নির্যাতনের ভয় উপেক্ষা করে মুক্তিযোদ্ধাদের অবিরাম সহযোগিতা করা থেকে এক মুহূর্তও বিরত থাকেননি।

রোকেয়ার যোগ্য উত্তরসূরি হিসাবে তিনি সাহিত্যকে তাঁর প্রতিবাদের অন্যতম হাতিয়ার রূপেই দেখেছিলেন। তাঁর জীবনবোধ ও চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর রচনায়। সুফিয়া কামালের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পনেরো। তাঁর প্রথম গল্প সংকলন *কেয়ার কাঁটা* প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে আছে *সাঁঝের মায়া* (কবিতা), *একাত্তরের ডায়েরি*

(স্মৃতিচারণ), *মৃত্তিকার ঘ্রাণ* (কবিতা), *সোভিয়েতের দিনগুলি* (ভ্রমণ), *একালে আমাদের কাল* (আত্মজীবনী), *ইতল বিতল* (শিশুতোষ ছড়া)। বিভিন্ন ভাষায় তাঁর কবিতা অনূদিত হয়েছে।[২৭]

সুফিয়া কামালের আর একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি *বেগম* পত্রিকা। ১৯৪৭ সালের ২০ জুলাই 'মহিলাদের সচিত্র পত্রিকা' হিসাবে *বেগম* কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন *সওগাত* সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন (১৮৮৮-১৯৯৪)। সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন সুফিয়া কামাল। ১ম বর্ষ ১২ সংখ্যা (২ অক্টোবর, ১৯৪৭) থেকে নূরজাহান *বেগম* সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

"বাঙালি মুসলিম নারীর সচিত্র প্রগতির খবর ও লেখা, সাহিত্যচর্চা ও জীবনচর্যা, সংস্কৃতি-ক্রীড়াচর্চা, রাজনীতি ও সংগঠনের কর্মকাণ্ডে বাঙালি মুসলিম নারীর অগ্রযাত্রার কাণ্ডারী হিসেবে ১৯৪৭ সালে যাত্রা শুরু করে অদ্যাবধি প্রায় ৬০ বছর ধরে বেগম সফল পত্রিকা হিসেবে বাংলাদেশের গ্রামে-শহরে পাঠকনন্দিত হয়ে আছে"।[২৮]

বেগম প্রকাশের উদ্দেশ্যই ছিল বাংলার মুসলমান মেয়েদের কাছে মুক্তচিন্তার ফসল পৌঁছে দেওয়া। প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন চেয়েছিলেন প্রগতিশীল, উদার মনোভাবাপন্ন, সমাজসচেতন মানুষদের এক জায়গায় জড়ো করে, তাঁদের শক্তি সংহত করে, পেছনে পড়ে থাকা মুসলমান নারীসমাজের কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান পৌঁছে দিতে। এ কাজে তিনি পাশে পেয়েছিলেন শামসুন নাহার মাহমুদ, সুফিয়া কামাল ছাড়াও মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, হুসনা বানু খানম, নীলিমা ইব্রাহিম প্রমুখের মতো ব্যক্তিত্বকে।

মানবতাবাদী ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি দেশ-বিদেশের প্রায় চল্লিশটি পদকে ভূষিত হন। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল লেনিন স্বর্ণপদক, বাংলা একাডেমী (ঢাকা) সাহিত্য পুরস্কার, নুরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী স্বর্ণপদক, চেকোস্লোভাকিয়ার ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন পুরস্কার ইত্যাদি। বাংলাদেশ-সোভিয়েত মৈত্রী সংঘের সভানেত্রীর পদেও তিনি আজীবন অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৯৯-এর ২০ নভেম্বর ঢাকায় তাঁর জীবনাবসান হয়।

সুফিয়া কামাল সারা জীবন ধরে নিরলসভাবে সমাজের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, প্রচলিত পশ্চাৎপদ ধ্যান-ধারণা, কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে সুস্থ সামাজিক চেতনা, মুক্ত উদার যুক্তিবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। বাংলার নারীজাগরণে রোকেয়ার এই উত্তরসূরির অবদান স্মরণযোগ্য।

বিশ শতকের বাংলার মুসলমান নারীসমাজে আর এক উজ্জ্বল নাম ফজিলতুন্নেসা (১৮৯৯ মতান্তরে ১৯০৫-১৯৭৬)। টাঙ্গাইলের করটিয়ার সাধারণ এক পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। পিতা মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি ছিলেন করটিয়া জমিদার বাড়ির এক সামান্য বেতনের কর্মচারী। মেধাবী ছাত্রী ফজিলতুন্নেসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতশাস্ত্র নিয়ে ভর্তি হন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তিনিই ছিলেন প্রথম মুসলমান ছাত্রী যিনি গণিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। এরপর ১৯২৮ সালে গণিতশাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষার্জনের জন্য তিনি ইংলন্ডে যান। বাংলার মুসলমান মেয়েদের মধ্যে তিনিই প্রথম উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সুযোগ পান।

এখানে আমাদের মনে পড়ে যাবে যে ১৯০৫-০৬ সালে স্কুল ইন্সপেক্টর মিস ব্রুক মুসলমান নারীশিক্ষা নিয়ে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাতে বাংলার মুসলমান মেয়েরা শিক্ষার ক্ষেত্রে কতটা পিছিয়ে ছিল! কঠোর পর্দাপ্রথার অন্ধকারে তাদের বিপন্নতার শেষ ছিল না। এর মাত্র দু'-দশকের মধ্যে বাংলারই এক মুসলমান নারী উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য বিলেত যাত্রা করছেন— এত অল্প সময়ের মধ্যেই নারীদের অবস্থানের এহেন পরিবর্তনকে শুধুমাত্র বিক্ষিপ্ত ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যায় না কারণ তাঁর বিদেশযাত্রার প্রাক্কালে কলকাতার বেকার হস্টেল, সওগাত অফিস এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রসমাজ তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। নারীশিক্ষা সম্পর্কে সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনই এতে প্রতিফলিত হয়।

কৃতিত্বের সঙ্গে বিদেশে শিক্ষা সম্পন্ন করে ফজিলত দেশে ফেরেন। ১৯৩৫ সালে কলকাতার বেথুন কলেজে গণিতের অধ্যাপিকা হিসাবে যোগ দেন। সেই বেথুন কলেজে, যেখানে ১৮৯৬ সালের মার্চ মাসে কলকাতার এক কন্যা শুধুমাত্র মুসলমান ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল! চার দশকের ব্যবধানে সামগ্রিকভাবেই বাংলার হিন্দু-মুসলমান সমাজের ভাবনাচিন্তায় অনেকটা রদবদল যে ঘটেছিল তা ফজিলতের এই অধ্যাপক পদে নিয়োগের ঘটনাই প্রমাণ করে। দেশভাগের পরে ফজিলতুন্নেসা ঢাকায় চলে যান। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত তিনি ঢাকার ইডেন গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেন।

নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তি বিষয়ক তাঁর রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গল্প *শিখা*, *সওগাত* ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ গুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'মুসলিম নারীর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা' (*সওগাত*, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪), 'নারীজীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ' (*শিখা*, ১৩৩৫), 'মুসলিম নারীর মুক্তি' (*সওগাত* ভাদ্র ১৩৩৬) প্রভৃতি। ১৯৭৭ সালে ঢাকায় এই শিক্ষাবিদ ও বিদূষী নারীর জীবনাবসান ঘটে।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমান নারীদের মধ্যে আরও অনেকেই দৃঢ় পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন জাহানারা ইমাম (১৯২৯-১৯৯৪)। মুর্শিদাবাদের সম্ভ্রান্ত পরিবারের এই কন্যা ১৯৪৭ সালে লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ থেকে বি এ পাশ করেন। দেশভাগের পরে ওপার বাংলায় চলে যান ও শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। প্রথমে ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী গার্লস স্কুলে এবং পরে ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা (১৯৫১-৬০) হিসাবে কাজ করেন। তিনি স্কলারশিপ পেয়ে যুক্তরাষ্ট্র যান ও ১৯৬৬ সালে দেশে ফেরেন। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে তিনি নিজের একমাত্র পুত্র ও স্বামীকে হারিয়েও অসীম মনের জোরে মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়ান। নানাভাবে তাদের সাহায্য করে 'শহীদজননী' নামে পরিচিতি লাভ করেন। ১৯৯২ সালে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচিত হন তিনি।

বাংলার মুসলমান মেয়েদের এই উত্তরণের ক্ষেত্রে আরও অনেক নাম দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখের দাবি রাখে। প্রবন্ধের নির্ধারিত সীমার মধ্যে সকলের নাম হয়তো বলা সম্ভব হল

না। শুধু উজ্জ্বল কয়েকজন জ্যোতিষ্ক যাঁরা বাংলার নারী আন্দোলনের গতিপথ নির্ধারণ করেছিলেন তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করা হল মাত্র।

কথাশেষ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মুসলমান সমাজে যে জাগরণের সূত্রপাত ঘটেছিল তার সুফল নারীদের উপরে কতটা বর্তেছিল তা আমরা কিছুটা দেখলাম। মুসলমান নারীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় একটি বিশেষত্ব নজরকাড়ার মতো। বাংলার এই অংশের নারীদের মুক্ত আকাশ উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন কয়েকজন নারী, যাঁরা নিজেরাও ছিলেন অবরোধবাসিনী— সেই অবরোধ ভেঙে তাঁরা বাইরে বেরিয়ে এসেছেন, উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন স্বসমাজের বাকি নারীদের। ফয়জুন্নেসা, রোকেয়া, শামসুন নাহার, সুফিয়া কামাল প্রমুখ যে দৃঢ়তা ও সাহসের সঙ্গে বাংলার মুসলিম নারীদের শিক্ষার ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ দেখিয়েছেন তা নজীরবিহীন ঠেকে। যে পথচলার সূচনা তাঁরা করেছিলেন সেই পথেই বাংলার মেয়েরা এগিয়েছিল। এই মহীয়সীরা তাঁদের পাশে পেয়েছিলেন পরিবারের নিকটাত্মীয় কয়েকজন পুরুষকে— পিতা-ভ্রাতা-স্বামীকে। কিন্তু সমাজের বড় একটা অংশ— অধিকাংশ পুরুষ রক্ষণশীল দৃষ্টিকোণ থেকে তীব্র সমালোচনা-বাণে বিদ্ধ করেছিলেন এঁদের সংস্কার ভাঙার প্রয়াসকে। সেই আক্রমণ, কুৎসা, বিরূপ মনোভাব এই নারীদের মনোবল ভাঙতে পারেনি, লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেনি এঁদের। অন্তঃপুরবাসিনীদের অদম্য মনের জোর আর ইস্পাতকঠিন সংকল্পের জোরে একাকার হয়ে গিয়েছিল ঘরে-বাইরের সীমারেখা, সূর্যালোকের অবাধ প্রবেশাধিকারে হার মেনেছিল নিশ্ছিদ্র আঁধার, দখিনা বাতাসে উড়ে গিয়েছিল পর্দা— 'মানববোঝা' থেকে বাংলার মেয়েরা রূপান্তরিত হল সমাজের সক্রিয় অংশে— আর এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার মূল হোতা হলেন উজ্জ্বল নক্ষত্রসম একদল নারী!

ভারতী রায়

চারটি পত্রিকা ও নারীপ্রসঙ্গ

বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম পর্বে প্রকাশিত নারী-উদ্দিষ্ট পত্রিকা বা 'জার্নাল'। উনিশ শতকের বাংলায় বেশ কয়েকটি এ ধরনের পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। আমি তাদের মধ্যে আলোচনার জন্য নির্বাচিত করেছি মাত্র চারটি, একটি পুরুষ-সম্পাদিত; তিনটির আবির্ভাব নারী-সম্পাদনায়।

উনিশ শতকে যে নারীশিক্ষা প্রচলিত হয়েছিল বহু শতাব্দী ব্যাপী অন্ধকারের পরে, সে কথা সকলের জানা। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মদনমোহনের অবদান এখানে আলোচ্য নয়। এ রচনায় বক্তব্য এই যে, মেয়েরা যখন শিক্ষিত হলেন, তখন কলমও তুলে নিলেন বহুজনে। যে-কতিপয় লেখিকা জনস্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন, যেমন স্বর্ণকুমারী দেবী (জ. ১৮৫৫), শরৎকুমারী চৌধুরানী (জ. ১৮৬৪), অনুরূপা দেবী (জ. ১৮৮২), তাঁরা নামী পত্রিকায় রচনা পাঠাতেন— *ভারতী, প্রবাসী* বা *ভারতবর্ষ*-এ, অথবা নিজ নামে পুস্তক প্রকাশিত করতেন। যাঁরা সাধারণ মধ্যবিত্ত, অনামী গৃহবধূ, নতুন পড়তে বা লিখতে শিখেছেন, তাঁরাই লেখা পাঠাতেন নারী-উদ্দিষ্ট পত্রিকায়। মেয়েরা মেয়েদের জন্য লিখতেন। চলত মত ও মন বিনিময় লেখিকা ও পাঠিকাদের মধ্যে। গড়ে উঠত নারী-বন্ধন বা 'Woman-bonding'। এই পত্রিকাগুলি সাধারণ মধ্যবিত্ত মেয়েদের মনের আয়না। ইতিহাসে এদের অপরিসীম গুরুত্ব।

সেকালে নারী-উদ্দিষ্ট, পুরুষ-সম্পাদিত পত্রিকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল *বঙ্গমহিলা* (১৮৭৫) ও *অবলাবান্ধব* (১৮৭৮), কিন্তু প্রথম ও প্রধান ছিল *বামাবোধিনী পত্রিকা* (১৮৬৩)। ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন-অনুপ্রাণিত 'বামাবোধিনী সভা' পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিল কলকাতার রঘুনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের ১৬নং বাড়ির নিজ কার্যালয় থেকে। মূল্য মাত্র এক আনা, ছাপা ১০০০ কপি, প্রথম সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত এবং প্রথম গ্রাহিকা ভুবনমোহিনী বসু। ষাট বছর বেঁচেছিল *বামাবোধিনী*— কালের নিরিখে কম কৃতিত্ব নয়। চাহিদা নিশ্চয় ছিল। নামেই পত্রিকার উদ্দেশ্য পরিষ্কার। নারীকুলের বোধন বা চেতনা-জাগরণ। প্রধানত অন্তঃপুরবাসী ঘরে শিক্ষিতা নারীদের 'ভ্রম ও কুসংস্কার' দূর করে

'প্রকৃত জ্ঞানের উদয়' এবং 'উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকল'-এর বিকাশ পত্রিকার লক্ষ্য। এই পত্রিকাটি নিয়ে আমি দু'খণ্ড বই প্রকাশ করেছি: *সেকালের নারী শিক্ষা: বামাবোধিনী পত্রিকা* (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৪) এবং *নারী ও পরিবার: বামাবোধিনী পত্রিকা* (আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৪)। প্রথম খণ্ডে সংকলিত করেছি শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত প্রবন্ধ এবং পরিবারে নারীর স্থান ও কর্তব্য বিষয়ে প্রবন্ধাবলী দ্বিতীয় খণ্ডে। কোনও খণ্ডে কবিতা রাখিনি, যদিও প্রতি সংখ্যাতে কাব্য-প্রতিভার বহু নিদর্শন আছে। গল্পও নয়— গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে।

সেকালে 'প্রগতিশীল' পুরুষরা নারীশিক্ষা সম্বন্ধে কী ভাবতেন, কী-ই বা তুলে ধরেছিলেন নারীশিক্ষার আদর্শ হিসেবে, নির্ধারিত করেছিলেন কেমনতর পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যবস্তু, নারীশিক্ষা কতদূর এগোতে দেওয়া উচিত বা অনুচিত— এ সমস্ত ভাবনার ঠিকানা *বামাবোধিনী*। নারী সেদিন ভাবত পুরুষে যা ভাবত তাই-ই। নারী-রচনা, বিশেষ করে নামী লেখিকাদের, যেমন মানকুমারী বসু (জ. ১৮৬৩)-র রচনা পুরুষ-উক্তির প্রতিধ্বনি: শিক্ষিত হও সংসারের কল্যাণসাধনের জন্য, সুপুত্র পালনের জন্য, স্বাস্থ্যসম্পদে পরিবার সমৃদ্ধ করার জন্য। নারীর নিজ বিকাশের জন্য যে শিক্ষার বা পারিবারিক সহযোগিতার প্রয়োজন, এ-যুক্তি *বামাবোধিনী*-তে পুরুষ বা সিংহভাগ নারী প্রয়োগ করেননি। তবে নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য সজোর ওকালতি ছিল। সেটা কম পাওনা নয়।

বামাবোধিনী-তে একটা অংশ ছিল, নাম 'বামা রচনা'। প্রথম লেখিকারা, অর্থাৎ নব্যশিক্ষিতারা, এখানে লিখতেন। এই লেখাগুলোর মধ্যে নারীচেতনার উদ্ভাস হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো ঝিলিক দেয়। কয়েকটি উদাহরণ: খিদিরপুর থেকে এক অনামিকা বক্তব্য রেখেছিলেন, 'স্ত্রীশিক্ষার সীমানা নির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইবেন না' (১৮৮৪)। বরিশাল থেকে নিজ নামে কামিনী গুপ্ত (সাহসিনী!) স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন ১৮৮১-তে (কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়-চন্দ্রমুখী বসুর স্নাতক যে সালে), প্রমাণিত হয়েছে শিক্ষালাভে স্ত্রী পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেন, 'সুতরাং তাহাদিগের সুখ ও সৌভাগ্যে হস্তক্ষেপ করিবার কাহারও অধিকার নাই।' বিশ শতকে পৌঁছে জনৈকা বলেছেন, 'পুরুষের জীবনে যেমন মহৎ উদ্দেশ্য আছে, নারীদের জীবনেও সেই রূপ মহৎ বা তদপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য আছে।' এমন কথা রোকেয়া সাখাওয়াত (জ. ১৮৮০)-ও বলেছিলেন, প্রকারান্তরে। তিনি *মতিচূড়*-এ লিখেছিলেন, পুরুষের সমান হতে চাই— এ কথা বলছেন এই কারণে যে অন্য বৃহত্তর আদর্শ সামনে নেই। অর্থাৎ পুরুষের সমকক্ষতা লাভ-ই শেষ কথা নয়। *বামাবোধিনী*-তে অনেক রচনা আবার গৃহস্থালিতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। পরিবার তো শুধু নারীসমষ্টি নয়। গৃহিণী হিসেবে নারীর যেমন কর্তব্য আছে, গৃহস্বামী হিসেবে পুরুষের কর্তব্য কম নয়। এবং সে জন্য 'সুবিজ্ঞ এবং সাধুজনই গৃহস্বামীর উপযুক্ত'। শুধু পুরুষ অথবা স্ত্রী 'শুদ্ধ' হলে সমাজের অগ্রগতি হয় না। স্ত্রী-পুরুষ 'উভয়ের হস্ত' সংযোগে এবং প্রয়াসে গড়ে ওঠে আদর্শ পরিবার।

বামাবোধিনী-র জীবদ্দশায় নারী-সম্পাদিত নারী-উদ্দিষ্ট পত্রিকাও ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছিল, অন্ধকার রজনীতে উষার অভ্যুদয়ের মতো। ব্রাহ্ম নেতা শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা বনলতা দেবী (১৮৮০-১৯০০)-প্রবর্তিত *অন্তঃপুর* (১৮৯৮) ছিল নরমপন্থী। 'রমণীগণের এবং তাহাদের সুকুমার মতি বালকবালিকাদিগের' শিক্ষার জন্য তার প্রচেষ্টা। সেকালের অনেক পত্রিকায় প্রতি সংখ্যায় বেনামে একটি কবিতার দু'-একটি চরণ উদ্ধৃত থাকত। *অন্তঃপুর* পত্রিকারও প্রথম সংখ্যাতে ছিল:

'সংসার রাজ্যের মাঝে অন্তঃপুর রাজধানী,
পরম মহিমাময়ী রমণী তাহার রানী।
সংসার সুখের হয়, স্বরগেতে পরিণত,
নারী যদি কায়মনে পালেন রমণী ব্রত।'

মতবাদ চিরপুরাতন। তবে সজোর উক্তি এই যে, সংসার জিনিসটি 'সামান্য স্থান' মোটেই নয়। কেন না, গোটা সমাজটাই 'অন্তঃপুরের প্রতিবিম্ব মাত্র'। বলতে গেলে, সমাজে শক্তি ও ধর্ম সঞ্চারিত করার, যথার্থ মানুষ তৈরি করার 'একটি কারখানা' অন্তঃপুর। তবে কিনা, সে কারখানার জন্য নারীধর্ম পালন প্রয়োজন। এবং সে ধর্মের একটি অঙ্গ স্বামীর 'কর্তব্য পালনে সহায়তা'। আর একটি অঙ্গ, সুসন্তান গঠন। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে মাতৃত্বের যে-মহিমাকীর্তন শুরু হয়েছিল, *অন্তঃপুর* পত্রিকায় তার পূর্ণ প্রতিফলন ছিল। মা হলেন 'বিশ্বজননীর প্রতিনিধি'। গৃহ মানুষের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র, এবং জননী প্রথম শিক্ষা গুরু। মনে রাখতে হবে শিশুরা 'অনুকরণপ্রিয়'। মাকে সৎ দৃষ্টান্ত দেখাতে হবে। ধৈর্য চাই, চাই সহনশীলতা, শ্রমশীলতা, সরলতা, পবিত্রতা। নারীশিক্ষার প্রয়োজন আছে বইকী! প্রকৃতপক্ষে মেয়েদের শিক্ষা পুরুষের শিক্ষার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, কেন না মা পুত্রকন্যার চরিত্র গঠন করেন। তবে রমণীকে পুরুষ জাতির শিক্ষায় শিক্ষিত করলে সমাজের সর্ববিধ উন্নতি হবে না। নারীসুলভ গুণগুলির অনুশীলন নারীর কর্তব্য। 'লজ্জাই স্ত্রীলোকের ভূষণ'। এবং ঈশ্বর প্রেম ও ধর্মপালন নারীর বৈশিষ্ট্য।

মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে *অন্তঃপুর* পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যার এই-ই সারমর্ম। তবু নতুন কথা যে একেবারে নেই তা নয়। হেমন্তকুমারী চৌধুরী (জ. ১৮৬২)— যিনি বনলতা দেবীর অকাল মৃত্যুর পর সম্পাদিকার পদ গ্রহণ করেন— লিখেছিলেন, 'আজ নূতন প্রস্তাব করছি', যদিও ভারতবাসী নূতনত্বের বিরোধী। ভদ্রপরিবারের অনাথা মেয়েদের 'শুশ্রুষাকারিণী'র শিক্ষা দিলে তাদের তো সুবিধে হবেই, 'দেশের একটা বড় অভাব মোচন হয়'। অর্থাৎ হেমন্তকুমারী মধ্যবিত্ত মেয়েদের (অবশ্য যাঁদের অর্থের অসাচ্ছন্দ্য আছে) পরনির্ভর হয়ে ঘরে বসে না থেকে বাইরে বেরিয়ে অর্থ উপার্জন করার পরামর্শ দিলেন। লীলাবতী মিত্র (জ. ১৮৬৪) সমস্বরে বললেন, মেয়েদের অর্থকরী শিল্প-শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়া কর্তব্য। তাঁরা ঘরে বসেও যেন উপার্জন করতে সক্ষম হন। লীলাবতীর ওকালতি নারীর কিছু পরিমাণ আর্থিক স্বনির্ভরতার পক্ষে।

আরও একটি বক্তব্য প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবে নারীধর্মপ্রচার পত্রিকা *অন্তঃপুর*-এর অন্তঃস্থল থেকে হঠাৎ উঁকি মারে। প্রচলিত সংসার ব্যবস্থা ও ধ্যানধারণার সমালোচনা। এক অনামিকা (নাম প্রকাশে বোধকরি সাহস পাননি) লিখেছিলেন, 'জামাতা যদি কন্যাকে ভালোবাসেন তাহা হইলে পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন খুব খুশী'। কিন্তু বধূ 'যদি পুত্রের স্নেহাস্পদ হন, তবে কিন্তু সকলে মনে করেন, ছেলেটা মাটি হইল'। শ্বশুর 'সঙ্কুচিত', শাশুড়ি 'ঈর্ষান্বিত' এবং 'আত্মীয়স্বজন নিন্দা করিতে থাকেন'। লেখাটি পড়ে মনে হয়, 'বুক ভরা মধু, বঙ্গের বধূ'রা সম্ভবত ধীরে ধীরে বুক ভরা অভিযোগ সঞ্চিত করতে শুরু করেছিলেন।

অন্তঃপুর পত্রিকায় জাতীয়তাবাদের অনুরণন তেমন করে ধ্বনিত হয়নি। তবে ১৯০৩-০৪ থেকে উঠছিল সমাজের প্রতি নারীর কর্তব্য সম্বন্ধে চেতনার প্রকাশ ও বিস্তার। খবর থাকত শ্রীহট্টে মহিলা সম্মিলনীতে বঙ্গললনারা মিলিত হয়ে স্ত্রীসমাজ সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা করেছেন। প্রশ্ন হত— পাঠিকারা কি দরিদ্রা ও অশিক্ষিতা ভগ্নীদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন না? ১৯০৪-এ গিরিবালা সেনগুপ্ত নাম্নী জনৈকা লিখেছিলেন,

'রমণী জীবন নয় এত তুচ্ছ বোন,
যত তুচ্ছ কর অনুমান।
আমাদেরও আছে কাজ কর্তব্য সাধন
আমাদেরও দেহে আছে প্রাণ।'

সমাজের বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন অভিযোগের সুর আছে কি? নইলে কেনই বা কবিতার শেষে গিরিবালা দেবী বললেন, বিদেশি নারীরা, ইংরেজ, ফরাসি, জাপানি— কেমন এগিয়ে চলেছেন,

'আমাদের মত হেন পশুর মত
অজ্ঞ কোথা রমণী সমাজ?'

তবে কি অন্তঃপুরিকারা কেউ কেউ বহির্বিশ্বে চোখ মেলছিলেন? *অন্তঃপুর*-এ যা ছিল না তা ছিল *সুপ্রভাত* পত্রিকায়। কুমুদিনী মিত্র (জ. ১৮৮২)-সম্পাদিত পত্রিকাটি স্পন্দিত হত রাজনৈতিক চেতনায়। হবেই তো। *সঞ্জীবনী*-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র ও লীলাবতী মিত্র-র কন্যা কুমুদিনী আবাল্য জাতীয়তাবোধ ও সংগ্রামী চেতনায় লালিত। ১৯০৭ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত প্রকাশিত স্বল্পায়ু এই পত্রিকাটির সব ক'টি সংখ্যা অনুধাবন করার সুযোগ পাইনি আমি। কিছু দেখেছি কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে, আর কিছু লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে। যতটুকু পড়েছি, চমৎকৃত হয়েছি। ১৯০৭-এ স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ার এসে গেছে দেশে। *সুপ্রভাত*-এর প্রধান উদ্দেশ্য, এই আন্দোলনে সহায়তা করা। বিভিন্ন প্রবন্ধে, গল্পে ও কবিতায় পাঠিকাদের রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে *সুপ্রভাত*। বলেছে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বদেশি যোদ্ধা ও কর্মীদের অনুপ্রাণিত করতে। আর বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিয়েছে স্বদেশি দ্রব্য বিক্রয়-প্রচারে। স্বদেশি আন্দোলনের যে দুটি অঙ্গ ছিল— বিদেশি দ্রব্য বয়কট ও স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার, তার মধ্যে বয়কট নিয়ে বেশি কিছু বক্তব্য রাখেনি

সুপ্রভাত। শুধু বলেছে, স্বদেশ-জাত দ্রব্য ক্রয় করো, দেশের টাকা দেশে থাকুক। কীসের বিজ্ঞাপন নেই? ছিল 'বিশিষ্ট', 'নব পুষ্পল' নূতন ফ্লোরাল হেয়ার অয়েল (বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর), 'প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধের জন্য কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরাজের আয়ুর্বেদিক ঔষধালয়'; বিজ্ঞাপন থাকত এস. পি. সেন অ্যান্ড কোম্পানির এসেন্স 'সুরমা'-র এবং 'রূপে গুণে মাধুর্য্যে অদ্বিতীয়' কেশরঞ্জন তৈল, ওরিয়েন্টাল সোপ ফ্যাক্টরির 'ওরিয়েন্টাল সোপ', স্বদেশি লেদার শিল্পের উৎকৃষ্ট দেশি জুতা— ইত্যাদির। বলা হত, স্বদেশি বস্ত্রের দোকান থেকে স্বদেশি গেঞ্জি, মোজা, রুমাল, তোয়ালে, মিলের-তাঁতের ধুতি-শাড়ি, 'কুষ্টিয়া ও ময়নামতির চেক' চাদর ক্রয় করলে উৎকৃষ্ট জিনিস মিলবে। তা ছাড়া আছে— কমলালয় স্টোর্স, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ইত্যাদি প্রথম শ্রেণির বিপণির বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন থাকত এমন অনেক। কিন্তু নারীদেহ নিয়ে বিকৃত বাণিজ্য তখন আজকের মতো ব্যাপক ও প্রত্যক্ষ ছিল না। ধনতান্ত্রিকতার প্রভাব দিনে দিনে যত বেড়েছে, নারী শরীরকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করার প্রবণতাও ততই বর্ধিত হয়েছে। সে দিনের বিজ্ঞাপনের পাশে কুন্তল-সমৃদ্ধ রমণীর খাঁটি বাঙালি রূপায়ণ (কেশ তৈল প্রচারে), অথবা 'সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গালী মূলধনে বঙ্গীয় শ্রমশিল্পে প্রস্তুত' বস্তুর ওকালতি ছাড়া অন্য কিছুই চোখে পড়েনি।

সুপ্রভাত-এর আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা প্রয়োজন। কেন না বিশ শতকের গোড়াতে যেমন নারী সম্পাদিত পত্রিকার আবির্ভাব হচ্ছিল, তেমনি দেখা দিচ্ছিল নারী-সংগঠিত নারী সঙ্ঘ। উনিশ শতকে পুরুষের উদ্যোগে কয়েকটি নারী সঙ্ঘ গঠিত হয়েছিল, যেমন ব্রাহ্মিকা সমাজ, বামা হিতৈষিণী সভা, আর্য্য নারী সমাজ, বঙ্গ মহিলা সমাজ। নারী নেতৃত্বে প্রথম নারী-সংস্থা স্বর্ণকুমারী দেবীর 'সখী সমিতি' (১৮৮৮)। সদস্য সংখ্যা স্বল্প, আয়ুষ্কালও। স্বর্ণকুমারীর কন্যা সরলাদেবী চৌধুরানী (জ. ১৮৭২) গড়ে তোলেন 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' (১৯১০), সমগ্র ভারতবর্ষের নারীদের এক সূত্রে গ্রথিত করার অনুপ্রেরণায়। লাহোর কংগ্রেসে মহিলা পরিষদের অধিবেশনকালে যে-বক্তৃতাটি তিনি দেন তার অনুবাদ ছাপা হয়েছিল *সুপ্রভাত*-এ। সেখানে তিনি ডাক দিয়েছিলেন মহামণ্ডলে যোগ দিতে, করেছিলেন নারীর 'অবলা' নামের তীব্র প্রতিবাদ। দৃপ্ত ঘোষণা রণিত হয়েছিল তাঁর ভাষণে— 'প্রকৃত রূপে নারীই সমাজের সৃষ্টি কর্ত্রী, পালন কর্ত্রী এবং ধ্বংসকর্ত্রী, পুরুষ নহে।' অবলা দাসী থেকে একেবারে শক্তিশালী সমাজকর্ত্রী পদে উত্তরণ! এ-স্বপ্ন সেদিন দেখাতে এবং দেখতে সরলাদেবীই পারতেন।

তবে অন্যরাও কম যেতেন না, যদিও তাঁরা সরলার মতো নামী নেত্রী ছিলেন না। চপলাদেবী নামের জনৈকা লেখিকা স্বদেশি পুরুষ নেতাদের বিদ্রূপ করে লিখলেন, 'এ দেশের যে সব সভা সমিতিতে রাজনীতি হইতে ম্যালেরিয়া পর্যন্ত সবেরই আলোচনা বাদ যায় না, তাহার সুদীর্ঘ তালিকা পড়িলে এ দেশে নারী জাতির অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না।' হিন্দু-মুসলমানে বা নরম-গরম রাজনৈতিক দলে বিরোধ বাধলে 'শক্তিক্ষয়ের ভাবনায়' স্বদেশপ্রেমিকদের 'আহার নিদ্রা বন্ধ হয়।' কিন্তু তাঁদের সমান শক্তি যে তাঁদের গৃহকোণে, তাঁদেরই ঔদাসীন্যে অপব্যয়িত হচ্ছে, 'সমগ্র ভারতের কল্যাণ চিন্তার সঙ্গে এ কথা ভাবিবার

অবসর তাঁদের কোথায়?' চপলাদেবী আরও বলেন, 'তাঁহাদের অবসর না থাকুক, আমাদের ত আছে। তাঁহারা জগতের ভাবনায় ব্যস্ত থাকুন, আমাদের অন্ততঃ নিজেদের ভাবনাটা ভাবা উচিত।' চপলার ডাক 'আত্মনির্ভরতা'র জন্য, আত্মোন্নতির জন্য। নারী সংগঠনের মূল সত্যটি প্রতিভাত হয়েছিল তাঁর মননে।

একদিকে আত্মনির্ভরতার ডাক, *সুপ্রভাত*-এ। অন্যদিকে পত্রিকার অপর সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে সুখলতা রাও-অঙ্কিত 'সীতাদেবীর অগ্নিপ্রবেশ'। বৈপরীত্য বোধ করি জীবন ও মননের অঙ্গবিশেষ। *সুপ্রভাত* কেমন করেই বা পৃথক হবে?

সুপ্রভাত-এর আগে জন্ম *ভারত মহিলা*-র— ১৩১২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে (১৯০৫)। চমক লাগানো পত্রিকাটি এক জোরালো কণ্ঠ! হবেই তো! সম্পাদিকা সরযূবালা দত্ত (জ. ১৮৭৯) নিজে ছিলেন বৈপ্লবিক মতবাদে বিশ্বাসী। তাঁর পরিচালনায় *ভারত মহিলা*-তে আন্দোলিত হত দুটি সুর— একটি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের প্রেরণাসূচক, অন্যটি সমাজসংস্কারের প্রয়োজন-দ্যোতক। রাজনৈতিক সংগ্রামে যোগদানের আহ্বান, যাঁরা যোগ দিয়েছেন তাঁদের কাহিনি তো থাকতই। আর থাকত এ-'লগনে' দেশমাতার প্রয়োজনে নিজ রক্ত দানের মহিমা কীর্তন:

'উত্তপ্ত রুধির দিয়া　　　ভালে দিবি কে আঁকিয়া
জননীরে রাজটিকা—অরুণ বরণ?
আজ এ করাল সাঁঝে　　　শ্মশান ভিতর মাঝে
এ কি রে করালী কালী করিবি বোধন!'

ভারত মহিলা-র বেশির ভাগ রচনা অবশ্য সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতির সমালোচনা। 'অবরোধ' প্রথা এবং বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রচুর লেখা আছে। আছে বিধাবাদের দুর্দশা বর্ণনা (যদিও বিধবা বিবাহ সমর্থনে কোনও উক্তি নেই), কয়েকটি হাস্যকর রীতির বিদ্রূপ। 'শাশুড়ীর সঙ্গে নববধূ কথা বলবেন না। মূক বধিরের মতো ইঙ্গিতে কথা বলবেন...শাশুড়ী জামাতার সঙ্গে কথা বলবেন না।' এ সব কী অদ্ভুত নিয়ম এ দেশে? আর কী ভয়ংকর পণ-প্রথা! তারই প্রতিবাদে আত্মাহুতি দিল চোদ্দো বছরের নিষ্পাপ-প্রাণ স্নেহলতা। গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার প্রতি কন্যার উক্তি' উদ্ধৃত হয়েছিল *ভারত মহিলা*-য়, কন্যা ও কন্যার পিতামাতাদের চেতনা-উদ্রেক-অভিপ্রায়ে:

'বাবা, থাকুক আমার বিয়ে
চাই নে আমি এম.এ., বি.এ　　　কিনতে হয় যা টাকা দিয়ে
ছাগল গরুর মত যাদের　　　ছেলের হাটে গিয়ে।
সোনার চেন, সোনার ঘড়ি　　　গর্ব যাদের গলায় পরি,
অমন পশু কিনবো না ক'　　　কানা কড়ি দিয়ে।'

সমাজের অন্যায় প্রথাগুলি বিলোপের ওকালতির পাশাপাশি আছে নারীশিক্ষা প্রসারের আবেদন। এবং শিক্ষিত নারীর ঘরের বাইরে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগের পরামর্শ।

কাননকুমারী দেবী নামে জনৈকা লেখিকা লিখেছিলেন, 'আমরা যে কেবল পরিবারের মধ্যে কর্তব্য-ঋণে ঋণী তাহা নহে। আমাদের অনেক ঋণ আছে। আমরা জননী জন্মভূমির নিকট, জনসমাজের নিকট সহস্র ঋণে ঋণী।' দেশের ও সমাজের ঋণ শোধ করার জন্য 'গৃহ কার্য্য ব্যতীত' দেশ ও সমাজের হিতকর কাজ 'রমণীর কার্য্য'।

তবে নারীর শিক্ষালাভ, অর্থ-উপার্জনের পন্থা— এমনতর প্রবন্ধ *ভারত মহিলা*-তেও নেই। এ-কথা বলার মতো বলেছিলেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (জ. ১৮৮০), তাঁর *মতিচূড়* গ্রন্থে। সেই ১৯০৫ সালে, যখন *ভারত মহিলা* প্রকাশিত হতে শুরু করেছে, রোকেয়ার ভাষায়: "উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, পা নাই, না বুদ্ধি নাই? যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহকার্য্যে করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না?" *ভারত মহিলা* এত তীক্ষ্ণ প্রশ্ন তোলেনি। তবে বারবার বলেছে, শিক্ষিতা মেয়েরা, যাঁরা দুঃস্থা বা বিধবা, তাঁরা ঘরে বসে শিল্পকার্য করে কিছু উপার্জন করুন। এবং একটি ওড়িয়া প্রবন্ধের অনুবাদ প্রকাশ করেছে, যার সারমর্ম এই যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য 'মনুষ্যত্ব লাভ করা এবং স্বাধীন জীবিকা অর্জনের উপযুক্ত হওয়া।'

অবশ্য প্রায় রোকেয়া-কণ্ঠে, রোকেয়া সম একটি বক্তব্য রেখেছে *ভারত মহিলা*। সমাজে নারী ও পুরুষের অসম অবস্থানের প্রসঙ্গে রোকেয়ার মতোই শতদলবাসিনী বিশ্বাস দায়ী করেছেন পুরুষকে। কুমুদিনী মিত্র প্রমুখ কয়েকজন— অবশ্য কয়েকজন মাত্র— অভিযোগ তুলেছেন দেশ নেতাদের বিরুদ্ধে। এক অনামিকা প্রশ্ন করেছিলেন, স্বদেশি আন্দোলনের নেতারা মেয়েদের সাহায্য চেয়েছেন, কিন্তু মেয়েদের জন্য করেন না কিছুই। ললিতা রায় স্ব-নামে লিখলেন, "কর্ম্মমন্দির, দেবমন্দির প্রভৃতি সকল মন্দিরের পরিবর্তন, সংস্কার ও উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু গৃহমন্দির— নারীগণই যাহার পুরোহিত, সে মন্দির সংস্কারের জন্য কেন চেষ্টা হইতেছে না?... নারী যতদিন পুরুষের আজ্ঞাধীন এবং পুরুষ যতদিন নারীর প্রভু থাকিবে, ততদিন দেশ জাগিতে পারে না।" হেমলতাদেবী বললেন, 'পুরুষের জন্ম দেবতার জন্য, নারীর জন্ম পুরুষের জন্য', নীতিশাস্ত্র এই উপদেশ দিয়েছে আমাদের। কুমুদিনী বসুর দৃপ্ত উক্তি, 'শিক্ষা যেমন নারীর উন্নতির মূল, স্ত্রী স্বাধীনতা তেমনই তাহার প্রাণ।' কিন্তু সবচেয়ে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও প্রতিবাদ এসেছে শতদলবাসিনী বিশ্বাসের 'নারী শক্তির অপচয়' নামক ধারাবাহিক কয়েকটি প্রবন্ধে (১৯১০)। তাঁর তিনটি উক্তি উদ্ধার করছি: 'সাধারণত ধনী গৃহে পত্নী বিলাস-সামগ্রী এবং দরিদ্রের ঘরের দাসী ভিন্ন আর কিছুই নহে।' নারীরা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত নিজেদের অবস্থা সম্যক অনুধাবন করতে পারেন না। 'এক হিসাবে নারী জাতির এইরূপ হীনাবস্থা পুরুষের স্বার্থের অনুকূল সন্দেহ নাই, কারণ নারীর জ্ঞান রন্ধন কুটিরে সীমাবদ্ধ থাকা প্রযুক্ত তাহাকে পুরুষের যথেচ্ছাচারিতার অন্তরায় স্বরূপ হইতে হয় না।' এবং 'স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে কর্তব্য তাহা প্রতিপালন করা কেহই আবশ্যক মনে করেন না, কিন্তু স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্যটুকু ষোল আনা আদায় করিতে চাহেন। অথচ 'শিক্ষিতা নারীগণ শুধু স্বামীর অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হইয়া থাকিতে চাহেন না।' এমন সব ভাবনা কেউ কেউ ভাবতে শুরু করেছিলেন'এবং স্বনামে প্রকাশ করতে সাহস করেছিলেন দেখে একবিংশ শতাব্দীতেও আমরা চমকিত হই।

মনে রাখতে হবে, যে-লেখাগুলি আমি উদ্ধৃত করেছি *ভারত মহিলা*-র পাতা থেকে তাদের রচনাকাল ১৯০৫ থেকে ১৯১৪। শতদলবাসিনীর প্রবন্ধগুলি ১৯১০-এর। এই ১৯১০-এ ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল সবে তৈরি হয়েছে। তখনও সর্বভারতীয় বিশাল নারী সংগঠন 'নিখিল ভারত মহিলা পরিষদ' (এ. আই. ডব্লু. সি) অথবা প্রভাবশালী 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি', এমনকী লীলা রায় (জ. ১৯০০) প্রতিষ্ঠিত 'দীপালী সংঘ'-এর আবির্ভাব-সম্ভাবনা স্বপ্নের অগোচর। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন— যাঁকে আধুনিক নারী আন্দোলনের ভাবনাগুলির অন্যতম প্রথম ও প্রধান সৃষ্টিকর্ত্রী গণ্য করা হয়— তিনি তাঁর অনন্য সাধারণ প্রবন্ধ ও পুস্তকগুলি প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন সত্য, কিন্তু আজকের দিনের মতো তাঁর রচনার অজস্র পাঠিকা সেদিন ছিল না। সুতরাং নারী-সম্পাদিত তিন চারটি পত্রিকাতে যে বিশ শতকের গোড়াতেই নারী-আন্দোলনের প্রশ্নগুলি সুঠাম রূপ নিচ্ছিল এমন দাবি করা চলে না। নারীর সামাজিক অধীনতার গোড়ার কথাটি, পিতৃতন্ত্রের মূল সূত্রটি লেখিকারা উপলব্ধি করেছিলেন, এমন বক্তব্য অতিশয়োক্তি হবে। রবীন্দ্রনাথের 'সবলা'র (*মহুয়া*, ১৯২৮) আগমনধ্বনি তখনও শোনা যায়নি। তথাপি, 'সবলা'র দৃপ্ত শঙ্খ নিনাদের অনেক আগে থেকেই জনাকয়েক— অবশ্য মাত্র জনাকয়েক— *অন্তঃপুরি*-কার, *ভারত মহিলা*-র এবং *সুপ্রভাত*-সেবিকার (হয়তো বা দু'-চার জন *বামাবোধিনী*-বোধিতার) নূপুর নিক্কনে এবং কিঙ্কিণীবাদনে বধূবেশ রমণীর মৃদু ঝংকার অতিক্রম করে এক ভিন্ন রোল রণিত হচ্ছিল।

অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মেয়েদের ভাবনা: মেয়েদের সম্পাদিত পত্রিকায় (১৮৭০-১৯৪৭)

আজ একুশ শতকে পা রেখে যখন এ লেখা লিখছি তখন দুশো বছর আগের ছবিটা মনের মধ্যে বারবার উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। যে ছবিতে বাঙালি মেয়েদের জন্য কোনও আলোর দরজা খোলা নেই, পর্দার আড়ালে তাদের জীবন ভারবাহী পশুরই মতো। পুরুষের জন্য সমাজের ব্যবস্থা— অঢেল স্ফূর্তি, স্বেচ্ছাচারিতা। মেয়েদের জন্য কী বিধান তা হলে তৈরি হয়ে আছে শ'য়ে শ'য়ে বছর ধরে? শিক্ষার কোনও অধিকার তাদের নেই, শৈশবের মধুরতা বিদায় নিতে না নিতেই বিয়ে দেওয়া হবে বালিকার, বয়সের ঊর্ধ্বসীমা খুব বেশি হলে দশ বছর। সেই অপরিচিত জীবনে কারও দিকে মুখ তুলে তাকানোর অধিকারটুকুও তার নেই। অনেক সময়েই আছে সতীনের জ্বালা, কৈশোর না পেরোতেই সন্তানের জননী হওয়া, কখনও বৃদ্ধ স্বামীর মৃত্যুর পর একই চিতায় জ্যান্ত পুড়ে মরা— নইলে অকাল বিধবা হয়ে ফিরে আসা বাপের বাড়িতে। প্রাণে বেঁচে থেকেও মৃত্যুর চেয়ে তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করা বাকি দিনগুলি। একাদশীর নির্জলা উপোসের দিনে তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেলেও এক ফোঁটা জল মুখে তোলা বারণ তার। শত শত বারণের বিধান প্রতি মুহূর্তে আহত করে তাকে বালিকা বয়স থেকেই, তার সে জ্বালা বইতে হয় বাকি জীবন জুড়ে।

কিন্তু যুগ যুগ ধরে নারী-জীবনের এই বহমান যন্ত্রণা আর জমে থাকা অন্ধকারকে দূর করার জন্য উনিশ শতকে এগিয়ে এসেছিলেন উদার মনের প্রগতিশীল কিছু মানুষ। সংখ্যায় তাঁরা খুব কম। কিন্তু তাঁরা প্রতিবাদী হলেন, প্রশ্নের আঙুল তুললেন সমাজকর্তাদের দিকে। জীবনপণ করে নিশ্চল পাথরের মতো অন্ধকারের বিপরীতে নামলেন লড়াই-এ। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষগুলির প্রবল আক্রমণে নড়ে উঠল পাথর। সংঘাত লাগল সমাজের সঙ্গে। তাঁরা থামলেন না। মেয়েদের জন্য পথে নেমে তাঁরা এটা বুঝলেন, যাঁদের জন্য এ-লড়াই, প্রথম দরকার তাঁদের সচেতন করা। আর সে সচেতনতার প্রথম সোপান হল শিক্ষা— যা মেয়েদের মনে আলো জ্বালতে পারবে। সে আলোয় পথ চিনে এগিয়ে

যেতে পারবেন তাঁরা, বেরিয়ে আসতে পারবেন অন্ধকারের জাল ছিঁড়ে। প্রথাবদ্ধতা আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁরাও একদিন লড়াইয়ে সামিল হতে পারবেন। শিক্ষাই তাঁদের পথ দেখাবে, আত্মসচেতন করবে, সাহস জোগাবে নিজের কথা নিজে বলার।

সত্যিই তা পথ দেখিয়েছিল। শিক্ষিত মেয়েরা নিজেদের দুঃখ-যন্ত্রণা, অভাব-অভিযোগের কথা বলতে শুরু করলেন। বলার কাজকে সহজ করে তুলল মেয়েদের কাগজগুলি। মেয়েদের কাগজ বলতে— মেয়েদের অভাবঅভিযোগ ব্যর্থতাবেদনাযন্ত্রণার কথা তুলে ধরা বা তাদের সৃজনশীলতাকে প্রকাশের সুযোগ করে দেবার জন্য যে কাগজ তা-ই। এই ধরনের কাগজ প্রকাশে প্রথম পথ দেখাল মুক্তমনা পুরুষরাই। প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের সম্পাদনায় ১৮৫৪-র আগস্টে প্রকাশিত হল *মাসিক পত্রিকা*— যা কিনা 'বিশেষত স্ত্রীলোকের জন্য ছাপা'। এগিয়ে আসেন উমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। গিরিশচন্দ্র সেন, সৈয়দ আব্দুল রহিম-এর মতো আরও কিছু মানুষ। পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরা নিজেদের কথা বলতে শুরু করলেন, তাঁদের প্রতিবাদী স্বরও শোনা যেতে লাগল এক সময় এ সব কাগজের পাতায়। কয়েক বছরের মধ্যে তাঁরা হয়ে উঠলেন আরও একটু সাহসী— নিজেরাই এগিয়ে এলেন সম্পাদনায়। তবে উনিশ শতকে তাঁদের আগমন অনেকটাই কুণ্ঠিত— ঠিক যেন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। কিন্তু ক্রমশ নিজেদের কথা বলার পাশাপাশি আরও মেয়েদের ডেকে নিয়ে এক সঙ্গে পা মিলিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলতেও চেয়েছেন তাঁরা। সময় যত এগিয়েছে, জীবন তত জটিল হয়েছে, সমস্যা হয়ে উঠেছে নানামাত্রিক। মেয়েদের কাগজের সংখ্যাও বেড়েছে ধীরে ধীরে।

আমাদের এই নিবন্ধের আলোচনাকেন্দ্রে থাকবে মেয়েদের সম্পাদিত কাগজগুলি। আমরা এর জন্য ১৮৭০-১৯৪৭ পর্যন্ত কালপর্বটিকে বেছে নিয়েছি। এই সময়ের মধ্যে মেয়েদের সম্পাদনায় প্রকাশিত যে সব কাগজের কথা আমরা জেনেছি বা আমরা দেখতে পেরেছি, তাদের একটি তালিকা আমরা প্রবন্ধের শেষে দিচ্ছি। তবে এর বাইরেও কিছু পত্রিকা থাকতে পারে যা হয়তো আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে।

মেয়েদের সম্পাদিত পত্রিকার মধ্যে কয়েকটির বিষয় মূলত ঘর-গেরস্থালি। কেমন করে সুগৃহিণী ও সুমাতা হওয়া যায় মেয়েদের সে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তাতে। কয়েকটি পত্রিকা মেয়েদের সম্পাদিত হলেও তা কিশোরদের পত্রিকা— যেমন *বালক*, *মুকুল*, *পাপিয়া*। আর কিছু পত্রিকা মেয়েদের নানা সমস্যার কথা বলেছে, তার পক্ষে বিপক্ষে বক্তব্য প্রকাশ করেছে। সে সব পত্রিকার ওপরই মূলত আলোকপাত করে আমরা মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকাগুলির চিন্তাভাবনার বিবর্তনটিকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে দেখানোর চেষ্টা করব।

দুই

উনিশ শতকে মেয়েদের কয়েকটি মাত্র সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা, লেখালেখি আমাদের চোখে পড়েছে। সেগুলি হল— স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, বিধবাবিবাহ, কৌলীন্য ও বাল্যবিবাহের

যন্ত্রণা, বিধবার লাঞ্ছনা ইত্যাদি। বিশ শতকে এই সমস্যাগুলির সঙ্গে দেখা দিচ্ছে মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার প্রসঙ্গ, ব্যক্তিজীবনে এবং সমষ্টিজীবনে সমানাধিকার-এর প্রসঙ্গ, মেয়েদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার যৌক্তিকতা ও সেজন্য আহ্বান। পণপ্রথা ও নারী নির্যাতন উনিশ শতকেও ছিল, বিশ শতকে তার ধরন বদলাচ্ছে।

উনিশ শতকে মহিলাসম্পাদিত সব পত্রিকাই স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কম-বেশি চিন্তাভাবনা করেছে। মেয়েদের সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা *বঙ্গমহিলা* (১২৭৭, ১ বৈশাখ) স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে দুটি বিতর্ক অব্যাহত ছিল সে সময়ে— (১) মেয়েরা ঘরে বসে শিক্ষালাভ করবেন, না শিক্ষার জন্য ঘরের বাইরে বেরোবেন (২) সুগৃহিণী বা সুমাতা হওয়ার জন্য যে শিক্ষা দরকার সেটুকু মেয়েরা পাবেন, না পুরুষের মতো শিক্ষালাভের অধিকারী হবেন তাঁরা। "শিক্ষাভাব এ দেশীয় স্ত্রীলোকদের একটি বিশেষ অভাব ছিল, কিন্তু অধুনা বঙ্গললনাগণের জন্যে সেই শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে।... উচ্চতর শিক্ষালাভ হউক তখন দেখা যাইবে যে তাঁহাদের ন্যায় যথার্থ সভ্য ও স্বাধীনচিত্ত স্ত্রী জগতের আর কোথাও নাই"— প্রথম সংখ্যাতে (১২৭৭, ১ বৈশাখ) *বঙ্গ মহিলা* এ কথা লিখলেও অন্তঃপুর শিক্ষার পক্ষেই তাঁরা ছিলেন। থাকমণি দেবীর সম্পাদনায় প্রথম মাসিক পত্রিকা *অনাথিনী* (১২৮১ শ্রাবণ)-র প্রকাশকে 'স্ত্রী শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের' 'অনল্প আহ্লাদের কারণ' বলে জানায় ওই সময়ের *এডুকেশন গেজেট* (শ্রাবণ, ১২৮২)। এই পত্রিকাও মেয়েদের ঘরে বসে শিক্ষালাভকে সমর্থন করতেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে ভূমিকা ছিল কামিনী শীল সম্পাদিত *খ্রীস্টীয় মহিলা*-র (জানুয়ারি, ১৮৮১)। বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগকে স্বাগত জানায় তারা (স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি, কামিনী শীল, ফেব্রুয়ারি, ১৮৮১)। যে সব মেয়েরা বিদ্যালয়, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পেতে শুরু করেছেন পত্রিকার 'সংবাদ সাজী' অংশে তাঁদের অভিনন্দন জানানো হত উচ্ছ্বাসময় ভাষায়। মার্চ, ১৮৮১-র *খ্রীষ্টীয় মহিলায়* আনন্দের সঙ্গে জানানো হয়— "কুমারী চন্দ্রমুখী বসু মাসিক ২৫ টাকা ও কুমারী কাদম্বিনী বসু মাসিক ২০ টাকা করিয়া দুই বৎসর কাল ছাত্রবৃত্তি পাইবেন।" বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা শ্রেণিতে উত্তীর্ণ মেয়েদের তালিকা প্রকাশ করে পত্রিকাটি জানায়— "এ দেশে মহিলাদের উচ্চশিক্ষার পথ ক্রমশ প্রস্তুত হইতেছে" (এপ্রিল, ১৮৮১)। সেকালে হিন্দু-সমাজের চেয়ে মুসলমান-সমাজের মেয়েদের আরও বেশি করে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করে রাখা হত। ভদ্র মুসলমান পরিবারের মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো ছিল অতি কঠিন। বহু চেষ্টায় বহু বাধা সত্ত্বেও মিস মুলব্নি নামের এক মহিলা "এক বৎসরের মধ্যেই ২০টি পরিবারে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন এবং ২৭টি বিবি সাহেবের শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন"— এই খবর পাঠককে দিয়েছে পত্রিকাটি (জানুয়ারি, ১৮৮২)। মেয়েদের সাহিত্যচর্চাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য *খ্রীষ্টীয় মহিলা*-তে কেবল মেয়েদের লেখাই ছাপা হত। তবে ধর্মীয় পত্রিকা হওয়ার কারণে এদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্ট-ধর্মপ্রচার। মেয়েদের শিক্ষাপ্রসারে যে আগ্রহ ছিল মহিলাসম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র *বঙ্গবাসিনী*-রও (১৮৮৩), তা সমকালে *এডুকেশন গেজেট* (২৮ সেপ্টেম্বর)-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়।

তবে স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন করলেও এ সময়ের অনেক পত্রিকাই মনে করত মেয়েদের তেমন শিক্ষাই দেওয়া দরকার যাতে তাঁরা সুগৃহিণী হতে পারেন, যত্ন করে সন্তান পালন করতে পারেন, সন্তানকে অ-আ, ক-খ পড়াতে লেখাতে পারেন, বাজার খরচের হিসেবনিকেশ রাখতে পারেন, বড়জোর স্বামী দূরে থাকলে তাকে চিঠিপত্র লিখতে পারেন। সতীত্ব, পতিসেবা, দয়া ও ত্যাগই যে মেয়েদের একমাত্র আদর্শ বারবার এ কথা শোনা যেত এ সব পত্রিকার পাতায়। পুরুষদের মতো স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণ বা ডিগ্রি লাভে তীব্র আপত্তি ছিল এদের। এই দলে ছিল ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত *ভারতী* (১২৯১ থেকে মহিলা সম্পাদিত), *পরিচারিকা* (১২৯৪ থেকে মহিলা সম্পাদিত), *পুণ্য* (১৩০৪), *অন্তঃপুর* (১৩০৪)-এর মতো পত্রিকা। *পরিচারিকার* মতে ঘোড়াকে দিয়ে যেমন হাতির কাজ করানো বা নিমগাছে যেমন আম ফলানো যায় না তেমন মেয়েরাও উচ্চশিক্ষিত হয়ে উকিল ব্যারিস্টার হতে পারবে না (স্ত্রীলোকের শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, আশ্বিন ১২৯৫)। বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে মেয়েদের ডিগ্রিলাভ উপলক্ষে পত্রিকাটি লেখে— "যদ্দারা স্ত্রীরা বিধাতাপ্রদত্ত নিজ অধিকার ছাড়িয়া পুরুষের রাজ্য অধিকারে প্রয়াসী হন... তাহা কি কখন জনসমাজকে সুখশান্তি বিধান করিতে পারিবে?" (মাঘ, ১২৯৭)। উনিশ শতকের শেষে নানা কারণে *পরিচারিকা* বন্ধ হয়ে যায়। বিশ শতকে এসে (অগ্রহায়ণ, ১৩২৩) নিরুপমা দেবীর সম্পাদনায় নতুন করে সচিত্র *নবপর্য্যায় পরিচারিকা* প্রকাশ হতে থাকে। ততদিনে বাইরে বেরিয়ে মেয়েদের শিক্ষালাভে উৎসাহ দিলেও স্ত্রীশিক্ষার আসল উদ্দেশ্য যে গৃহধর্ম পালন— এ মত থেকে তারা বিচ্যুত হয়নি দু'-যুগ পরেও। তবে লক্ষণীয়, এই পর্যায়ে এসে তাদের বিরোধী মতের লেখাকেও তারা পত্রিকায় জায়গা দেয়। 'সাহিত্য ও সমাজ' প্রবন্ধের লেখক বলেন যে তিনি সে-দিনের প্রতীক্ষায় রয়েছেন যেদিন শিক্ষার ফলে মেয়েরা "স্বামীর ও সেই সংসারের শুধু দাসীবৃত্তি অবলম্বন না করে... পুরুষের কর্মের সহযোগিনী ও প্রতিযোগিনী হয়ে উঠবে" (১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা ১৩২৭)। বোম্বে প্রেসিডেন্সি বা উত্তর ভারতের মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রসারের প্রশংসা করে বাঙালি মেয়েদের আহ্বান জানানো হয় সে সময়ের *পরিচারিকায়* (বর্তমান ভারতের নারীজাতি, শ্রীমতী সুধাময়ী ঘোষ, আশ্বিন, ১৩২৭)। বিশ শতকে পৌঁছে *অন্তঃপুর*-এর দৃষ্টিভঙ্গি খানিকটা পালটায়। সম্পাদিকা হেমন্তকুমারী চৌধুরানী লোকনিন্দার ভয় না করে শিক্ষার জগতে মেয়েদের এগিয়ে যাবার ডাক দেন (স্ত্রী-শিক্ষার অন্তরায় ও তদ্দূরীকরণের উপায়, বৈশাখ ১৩১১)। এ-বিষয়টিতে বিশ শতকের পত্রিকা সরযূবালা দত্তের *ভারত মহিলা* ছিল অনেকটাই উদার। এ-নিয়ে তর্কবিতর্ক ছাপত তারা। এক ব্যক্তি মেয়েদের পুরুষজনোচিত শিক্ষার বিরোধিতা করে বলেন যে শিক্ষিত হলেই তাঁরা তর্কে উদ্যত হবেন, পুরুষের মতো জ্যামিতি পরিমিতি শেখার তাঁদের কী দরকার? "তাহারা তো আর গৃহনির্মাণ করিতে বা জমি জরীপ করিতে যাইবেন না?" (মাঘ, ১৩১৭)। এ বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে দুটি সংখ্যা পরেই গৌহাটি বালিকা বিদ্যালয়ের শ্রীমতী সুনীতিবালা গুপ্ত লেখেন— "এই জন্যই বুঝি পুরুষ জাতি রমণিগণকে সুশিক্ষা প্রদানে অনিচ্ছুক! ভয়, যদি তাঁহারা (রমণিগণ) কোনও

ন্যায্য বিষয়ের জন্য দাবী করেন, তাঁহাদিগের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহারের প্রতিবাদ করেন, এবং আত্মোন্নতি সাধন মানসে বদ্ধপরিকর হয়েন।... রমণিগণের উপর যে একচেটিয়া প্রভুত্ব ছিল, যাহা তাঁহাদিগকে মূকের ন্যায় নির্ব্বাক এবং পশুর ন্যায় আত্মোন্নতি সাধনের ইচ্ছাবিহীন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা আর থাকিবে না!... আমাদিগের বিবেচনায় বালক বিদ্যালয় হইতেও এ সব পাঠ (জ্যামিতি পরিমিতি) উঠিয়া যাওয়া উচিত। কারণ তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ হয়ত ভবিষ্যৎ জীবনে কেরাণী, উকীল, মুন্সেফ প্রভৃতি হইবেন, এই সকল কার্য্যের সহিত জ্যামিতির কোনও সম্পর্ক নাই।... আর যে সকল রমণীর ভূসম্পত্তি আছে, তাঁহাদিগের পরিমিতি ও জরীপ জানা নিতান্ত প্রয়োজন।" তাঁর মতে 'গৃহে বিদ্যাশিক্ষা করা... শিক্ষার কলঙ্ক মাত্র।' (বৈশাখ, ১৩১৭)। সুনীতিবালার এই প্রতিবাদ আমাদের বুঝিয়ে দেয় শিক্ষিত মেয়েরা ক্রমশ আত্মসচেতন হচ্ছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় তা জানিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করছেন না। কুমুদিনী মিত্রের *সুপ্রভাত* (শ্রাবণ, ১৩১৪) প্রথম থেকেই বিশ্বাস করত পুরুষের মতো করেই স্ত্রীশিক্ষা হওয়া উচিত। তারা বারবারই এ ব্যাপারে তাদের মত প্রকাশ করেছে, মেয়েদের ডাক দিয়েছে এগিয়ে যাবার। সমাজের এত বাধা সত্ত্বেও মেয়েদের শিক্ষা থেমে থাকেনি— ক্রমশ এগিয়ে গেছে সব বিপত্তি সরিয়ে।

তিন

সেকালে বাল্যবিবাহ ছিল মেয়েদের জীবনে অভিশাপ। বিষয়টি নিয়ে উনিশ শতকের সাতের দশক থেকে বিতর্ক শুরু হয়, নতুন মাত্রা পায় আটের দশকে। বাল্যবিবাহের ফলে মেয়েদের ক্ষতির দিকটি সম্পর্কে উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম থেকে সচেতনতা আমাদের চোখে পড়েছে পত্রিকার পাতায়। 'অকাল বিবাহ'-এর ভার বইতে বইতে মেয়েগুলির শরীর ও মনের গঠন যে দুর্বল হয়ে পড়ে, বিশেষত অকাল মাতৃত্বের কারণেই আমাদের মা ও শিশুর মৃত্যুহার যে সবচেয়ে বেশি তার উপযুক্ত তথ্য দিয়ে এ সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর *পুণ্য* (বাল্যবিবাহের অশুভ ফল, বৈশাখ, ১৩১১)। বিশ শতকে এসে *অন্তঃপুর* পত্রিকাও একই কারণে বাল্যবিবাহকে 'জঘন্য কুপ্রথা' বলে অভিহিত করে (কার্তিক, ১৩১১)। একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই *ভারত মহিলা* (নারী সংবাদ, বৈশাখ, ১৩১৭), *মাহিষ্য মহিলা* (বাল্য বিবাহ, আষাঢ়, ১৩১৮), *নবপর্য্যায় পরিচারিকা* (নারীর কথা, ভাদ্র, ১৩২৮) ইত্যাদি পত্রিকায়।

বাল্যবিবাহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল অকাল-বৈধব্যের সমস্যা। উনিশ শতকের মহিলা-সম্পাদিত কাগজগুলি এই সমস্যা নিয়ে বিশেষ কথাবার্তা বলেনি। তার অর্থ এই নয় যে, সমস্যাটি মিটে গিয়েছিল। বাপের বাড়ি এবং শ্বশুরবাড়ি দু'তরফের কাছেই নিঃসন্তান বিধবারা যে বোঝা, তাদের সঙ্গে যে কুকুর বিড়ালের মতো ব্যবহার করা হয় আর দু'মুঠো ভাতের জন্য সারাদিন দাসীর মতো খেটেও এসব লাঞ্ছনা তাদের ভোগ করতে হয় নিয়মিত— এ কথা আমরা বারবার শুনতে পাই বিশ শতকে এসে নানা পত্রিকার পাতায়। *অন্তঃপুর* বলে— "অশিক্ষিতা বিধবাগণ বিধবা হওয়ার পর হইতে আত্মীয়পরিজন বর্গের নিকট

যেরূপ অনাদর উপেক্ষা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য এবং কঠোর ব্যবহার প্রাপ্ত হন তাহাতে হতভাগিনীদের জীবনধারণ করা একরূপ বিষম বিড়ম্বনা হইয়া পড়ে" (বঙ্গবিধবা, নীরদবাসিনী বসু, অগ্রহায়ণ, ১৩১১)। এর ওপর প্রতি মুহূর্তে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে বিধবা হওয়া তাদেরই 'অমার্জ্জনীয় অপরাধ'। নিকট আত্মীয়দের কাছ থেকেই নানা রকম শারীরিক অবমাননার শিকার হত অনেক সময় এই বিধবা মেয়েরা। সমাজের নেতারা যে এসব দেখেও দেখে না, সে ক্ষোভের প্রকাশ আমরা পাই *বঙ্গলক্ষ্মী*-র পাতায় (বাঙালীর মেয়ে, শ্রীজীবনবালা চৌধুরী, ফাল্গুন, ১৩৩২)।

এই বদ্ধজীবন থেকে মেয়েদের মুক্তি দিতে চেয়ে দুটি কথা বারবার উঠে এসেছে পত্রিকাগুলির পাতায়— (১) বিধবাশ্রমের পরিকল্পনা (২) বিধবা মেয়েদের অর্থনৈতিক উপার্জন বাস্তবায়িত করা। বিভিন্ন নারীসমিতিকে এই কাজে এগিয়ে আসার জন্য তারা আহ্বান জানিয়েছে। নারী সমিতিগুলি বিধবাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার জন্য যে কাজকর্ম করছে তার খবরাখবরও দিয়েছে *অন্তঃপুর, ভারত মহিলা, সুপ্রভাত, পরিচারিকা নবপর্যায়* বা *বঙ্গলক্ষ্মী*-র মতো পত্রিকা।

বিধবারাও যে মানুষ, মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে যে শুধু বিধান দিয়ে প্রতিহত করা যায় না, ক্রমশ এ বিষয়েও প্রতিবাদ উঠে এসেছে এ সব পত্রিকার পাতায়। মেয়েরাই এক সময় সমাজের তৈরি করা নিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন— "কত গৃহের ক্ষুদ্র বালিকা বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হইয়া সমাজ নির্য্যাতনের মধ্যে অথবা প্রলোভনের বশবর্তী হইয়া অকালে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে কে তাহার সংখ্যা করিবে?" এর কারণ হিসেবে লেখক স্পষ্টই বলেন— "শাস্ত্রকারগণ কতকগুলি খাদ্যাখাদ্যের বিচার...প্রচার করিয়া তাহাদিগকে ব্রতধারিণীরূপে থাকিতে আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু বাহ্য কয়েকটা আচার প্রণালী অবলম্বন করিলে যদি অন্তরে যোগিনী হওয়া সম্ভব হইত তবে ব্যক্তিমাত্রেই ইচ্ছা করিলে তাহা হইতে পারিত"। (বঙ্গবিধবা, শ্রী বসন্তকুমারী বসু, মাঘ ১৩১১, *অন্তঃপুর*)। দিনের পর দিন জীবনের সব ক'টি জানলা দরজা জোর করে বন্ধ রাখলেও রন্ধ্রপথ দিয়ে আলো আসবেই। মেয়েরা মানবিক প্রবৃত্তির উর্ধ্বে নয়— "চিররুদ্ধ মানবীর সেই রন্ধ্রপথ দিয়া বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখিবার ইচ্ছা কি একেবারেই অস্বাভাবিক?" এই প্রশ্ন সমাজকে ছুড়ে দিয়েছে *বঙ্গলক্ষ্মী*-ও (বঙ্গনারীর বর্তমান অবস্থা, শ্রীউষাময়ী চৌধুরী, ফাল্গুন ১৩৩২)।

এই একই প্রশ্ন সমাজের কাছে রেখেছিলেন উনিশ শতকেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সেখান থেকেই জন্ম নিয়েছিল বিধবাবিবাহের পক্ষে আন্দোলন। ১৮৫৬-তে যখন বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়, তখনও মেয়েদের সম্পাদনায় কোনও প্রকাশিত হয়নি। যে কাগজগুলি মেয়েদের জন্য কথা বলত, বিশেষত *বামাবোধিনী, বঙ্গমহিলা*-র মতো পত্রিকা উনিশ শতকে বিধবা বিবাহের পক্ষে মত জানিয়েছে তাদের পাতায়। উনিশ শতকে মেয়েদের সম্পাদনায় প্রকাশিত কাগজের মধ্যে কোনও কোনওটিতে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিধবাবিবাহের খবর ছাড়া লেখালিখি বিশেষ চোখে পড়ে না (*খ্রীষ্টীয় মহিলা*, জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৮)। উনিশ শতকের শেষে বা বিশ শতকের প্রথমেও বিষয়টি নিয়ে মহিলা-সম্পাদিত পত্রিকার দ্বিধা

পুরো কাটেনি— "যদিও বিবাহ, বিধবা জীবনের একমাত্র লক্ষ্যস্থল হওয়া কর্ত্তব্য নহে কিন্তু অন্যদিকে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য পালনে ব্রতী করাতেও কোনও ফলোদয় হয় না।" (বঙ্গবিধবা, বসন্তকুমারী বসু, মাঘ ১৩১১ *অন্তঃপুর*)— এ ধরনের মতামত আমরা পত্রিকার পাতায় পাই। নগেন্দ্রবালা সরস্বতীর মতো আর একটু সাহসী মহিলা অবশ্য এই পত্রিকাতেই বিধবা বিবাহের সমর্থনে বলতে পেরেছেন— এই বিবাহ 'সমাজের পক্ষে পরম শ্রেয়স্কর' কেন না বহু বাল্যবিধবা পুরুষের লালসার শিকার হচ্ছে, সে অন্যায় দূর করতে হলে বিধবাবিবাহ অবশ্য প্রয়োজন। (বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গ, নগেন্দ্রবালা সরস্বতী, আষাঢ়, ১৩১১, *অন্তঃপুর*)। *নবপর্য্যায় পরিচারিকা*ও বিধবাবিবাহকে সমর্থন করত। মণিপুরে বিধবাবিবাহ অনেক বেশি কারণ সেখানে সাহসী লোকজন আছেন— এ খবর জানিয়ে তারা বলেছে, বাংলায় সাহসী লোকের এখনও অভাব— 'বীর্য্যবান লোকে যখন উপস্থিত হইবেন তখন বিধবা বিবাহের সমস্যা পূর্ণ হইবে' (১৩২৭, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, *পরিচারিকা*)

বাল্যবিবাহ, বৈধব্যযন্ত্রণা-র পাশাপাশি উনিশ শতকে আর একটি ভয়াবহ সমস্যা ছিল 'কৌলীন্য প্রথা'। কুল-রক্ষা করতে এক একজন কুলীন পাত্র অনেকগুলি বিবাহ করতেন। কিন্তু পুরুষের করা এই নিয়মের পাকে এক সময় পড়তেন পুরুষরাই— যখন তিনি পিতা। অসহায় হয়ে নিজের কন্যাটিকে অনেক সময়েই তুলে দিতে হত অন্তর্জলীযাত্রায় শুয়ে থাকা কোনও বৃদ্ধের হাতে। এসব কুলীনেরা একশো কি তারও বেশি বিয়ে করে কন্যার পিতাকে নাকি উদ্ধার করতেন! উনিশ শতকে পুরুষ-সম্পাদিত মেয়েদের কাগজগুলি কৌলীন্য প্রথা নিয়ে যত চিন্তাভাবনা করেছে, মেয়েদের সম্পাদিত পত্রিকায় বিষয়টি নিয়ে লেখালিখি আমাদের সে রকম চোখে পড়েনি। ফরিদপুর জেলার আমগ্রামে ৬০ বছর বয়স্ক এক বন্দ্যোপাধ্যায় কুলীনের সঙ্গে চোদ্দোটি কুমারীর একযোগে বিয়ে দেওয়ার এমনই একটি বর্ণনা আমরা পেয়েছি *পরিচারিকা*-য়। কুমারীদের বয়স ৪/৫ বছর থেকে ২২/২৪ বছর পর্যন্ত। *পরিচারিকা* দুঃখ করে লেখে— "পাপের ভরা এইবার বুঝি পূর্ণ হইল। সময় আসিতেছে যখন এ অসভ্য কুপ্রথা সমূলে বিনষ্ট হইবে" (অগ্রহায়ণ, ১২৯৭, *পরিচারিকা*)। কুৎসিত এই প্রথাটির প্রকোপ বিশ শতকে এসে কমে গিয়েছিল, তাই একালের পত্রিকায় এ নিয়ে লেখালিখি তত থাকছে না।

উপরের সমস্যাগুলির মতোই উনিশ শতকের শেষদিকে মেয়েদের কেন্দ্র করে সমাজে আর যেটি জ্বলন্ত হয়ে উঠেছিল তা 'পণপ্রথা'। শিক্ষিত পাত্রের হাতে মেয়ে দিতে চাইলে সর্বস্ব খুইয়ে তার পিতা ভিখিরি হয়ে যেতেন। দেনা করে, বসতবাড়ি বিক্রি করেও অনেক সময় মেয়ে উদ্ধার হত না। শিক্ষিত পাত্রের বাজারদর ছিল আকাশছোঁয়া। এমনকী 'দোকানে তামাক খাইয়া ও পায়রা উড়াইয়া বেড়ায়' যে ছেলে, তার বিয়েতেও বরের পিতা ১৫০০৲ টাকা পণ দাবি করে— এ খবর আমরা উনিশ শতকের পত্রিকা *পরিচারিকা*-তে পাচ্ছি (শ্রাবণ, ১২৯৩)। এই সমস্যা বাড়তে বাড়তে বিশ শতকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়। গোবিন্দচন্দ্র দাস 'কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার প্রতি বিবাহযোগ্য বালিকার উক্তি' নামে তীব্র শ্লেষপূর্ণ একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটি তার অসহায় পিতার প্রতি একটি মেয়ের দীর্ঘ উক্তি বা ঘোষণা। কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি—

'বাবা থাকুক আমার বিয়া
আমি চাইনে এম.এ, বি.এ কিনতে হয় যা
টাকা দিয়ে
ছাগল গরুর মত যাদের ছেলের হাটে গিয়া

অমন পশু কিনো নাক কানাকড়ি দিয়া।'

কবিতাটি *প্রতিভা* পত্রিকায় পাতায় (শ্রাবণ, ১৩১৮) বেরিয়েছিল। *ভারতী* পত্রিকাতেও পণপ্রথা নিয়ে তর্কবিতর্ক চলছিল (ফাল্গুন, চৈত্র ১৩১৯)। ইতিমধ্যে একটি মেয়ের দিক থেকেই আসে চরমতম প্রতিবাদ। ১৯১৪ সালে কলকাতায় হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এ পাশ পাত্রের সঙ্গে তার চোদ্দো বছরের মেয়ে স্নেহলতার বিয়ের পণ জোগাড় করতে না পেরে বসতবাটি বাঁধা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। স্নেহলতা সে খবর জেনে গায়ে আগুন ঢেলে আত্মহত্যা করে। এই সাংঘাতিক প্রতিবাদে সচেতন হয়ে ওঠে বাঙালি। বক্তৃতায় গরম হয়ে ওঠে সভা-সমিতি, পত্রিকার পাতা ভরে ওঠে নিন্দায়। নারী সম্পাদিত পত্রিকাগুলিও থেমে থাকেনি এই ঘটনায়। *ভারত মহিলা*-র সম্পাদকীয়তে (নারীর বলি, মাঘ, ১৩২০) মেয়েদের এই অবমাননার বিরুদ্ধে ধ্বনিত হয় প্রচণ্ড ঘৃণার সুর। ঘটনাটির বর্ণনা দিয়ে তারা এই প্রথাকে 'বাজারে মাছ কেনা বেচা'র সঙ্গে তুলনা করে, গোবিন্দচন্দ্রের কবিতাটি পত্রিকায় ছাপায়। *ভারতী* (চৈত্র, ৩২০)-র পাতায় নিস্তারিণী দেবী মায়েদের এই প্রতিজ্ঞা করার আবেদন জানান— তাঁরা যেন পণ না দেন নিজের মেয়ের বিয়েতে। স্নেহলতার ঘটনার আগেই ওই কবিতাটি ছাপায় *মাহিষ্য মহিলাও* (আষাঢ়-আশ্বিন, ১৩১৮-১৯)। শ্রীমতী গিরিবালা দেবী ঘটনার পর প্রশ্ন তোলেন— 'অর্থপিশাচ নরগণের চৈতন্য হইবে কি?' (৩য়-৪র্থ খণ্ড *মাহিষ্য মহিলা*, ১৩২০-২১)। পরের বছরই হাওড়ার শিবপুরে একটা ঘটনার জেরে স্নেহলতা নামেরই আর একটি মেয়ে আত্মহত্যা করে। এসবের পরেও সমাজের চৈতন্য হয়নি এবং প্রতিবাদও চলতে থেকেছে। "পুরুষের কোঁচায় আগুন না লাগিয়া মেয়েদের শাড়ীতে লাগে কেন..." তা ভেবে দেখার সময় এসেছে, এ মন্তব্য করেছে *নবপর্যায়, পরিচারিকা* (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭)। 'সেয়ার মার্কেট'-এর দরের মতো ছেলের দর ওঠানামা করাকে ধিক্কার জানায় *বঙ্গলক্ষ্মী* (বাঙ্গালীর মেয়ে, শ্রীজীবনবালা চৌধুরী, ফাল্গুন, ১৩৩২) বিশ শতকে তিনের দশকেও। আজ এই একুশ শতকে পৌঁছেও পণপ্রথা যে রমরমিয়ে চলছে তা আমাদের অজানা নয়।

চার

তবে দিন যত এগিয়েছে তর্কবিতর্ক, সমাজিক ঘাত প্রতিঘাত ও টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে মেয়েদের এগিয়ে চলার পথ একটু একটু করে খুলে গেছে। পত্রিকাগুলিও মেয়েদের স্বাধীনতা নিয়ে ভেবেছে। চারপাশের বাধা ভেঙে এগিয়ে আসার ডাক দিয়েছে। পত্রিকার পাতায় মেয়েরাই এ কথা বলতে পেরেছেন— "সামাজিক ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনের কঠোরতাই

হিন্দু-মহিলা সমাজের উন্নতির প্রধান অন্তরায়''। যে সমাজ মনে করে মেয়েরা ''পুরুষের বিলাসবাসনা পরিতৃপ্তির অন্যতম উপাদান'', ''তাহারা চিরকালই পুরুষের পদানত থাকিয়া স্বীয় অস্তিত্বহীন জীবন নীরবে যাপন করিবে''— সে সমাজের জল ছিঁড়ে না বেরোতে পারলে মেয়েদের মুক্তি নেই (সামাজিক সংঘর্ষে হিন্দু মহিলা সম্প্রদায়— শ্রীমতী সুবাসিনী সেহানবীশ, *অন্তঃপুর*, আষাঢ়, ১৩১১)

সরযূবালা দত্তের *ভারত মহিলা* তুলনায় প্রথম থেকেই সংস্কারমুক্ত। শুধু স্বাধীন হওয়ার ডাকই মেয়েদের দেয়নি তারা, অন্যায়ভাবে পুরুষ যে এত দিন একা স্বাধীনতা ভোগ করে এসেছে, নারীকে পায়ের তলায় রাখার দিন যে শেষ এ কথা বলারও সাহস দেখিয়েছে পত্রিকাটি— ''নারীকে তোমরা তোমাদের পালিত পশুর সঙ্গে একত্রিত করিয়া রাখিয়াছ... শতাব্দীর পর শতাব্দী তোমরা স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিয়াছ— এখন মেয়েদের পালা পড়িয়াছে'' (কার্তিক, ১৩১৭)। *নবপর্য্যায় পরিচারিকা*-র পাতাতেও এক স্বর আমরা শুনেছি (নারীমঙ্গল, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ১৩২৭)। আরও স্পষ্ট করে তারা একথাও বলেছে— সমাজের যে-শক্তিটা নারীজাতির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ সংকুচিত করে ফেলেছে, ব্যক্তিত্বকে লুপ্ত করার জন্য চারিদিক হতে নিয়মের বেড়া তুলে ধরেছে, সে শক্তির উচ্ছেদ-সাধন করতে হবে (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১৩২৭)। মুসলমান সমাজে নারীর অস্তিত্ব ছিল আরও বেশি অস্বীকৃত। এই সমাজের বিরুদ্ধে ফতেমা খানের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ছাপিয়েছে *বঙ্গ লক্ষ্মী* (ভাদ্র, ১৩৩৫)। দু'দশক পরে স্বাধীনতার বছরে *বেগম* পত্রিকার ধারণা এবং মেয়েদের প্রতি আহ্বান আরও জোরালো।

এই প্রথম পত্রিকার পাতায় মেয়েদের মুখে শোনা যাচ্ছে— পুরুষশাসিত সমাজের কাছে করুণ আবেদন নিবেদন নয়, তাদের সঙ্গে কোনও আপস মীমাংসাও নয়, 'স্বাধীনতা' মেয়েদের অধিকার, দাবি। এই অধিকার অর্জনের জন্য দয়াভিক্ষা নয়, চাই আন্দোলন— ''আমাদের এ দাবী পেতে হলে তা আন্দোলনের ভিতর দিয়ে পেতে হবে। আমরা শুধু ঘরের ভিতরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য আসিনি... যাঁরা আমাদের মধ্যে... উচ্চশিক্ষা পেয়েছেন তাঁদের সংখ্যা খুব অল্প এবং আন্দোলন করতে হলে এদেরই সাহায্যে তা করতে হবে'' (শিক্ষিত নারীদের আহ্বান, বেগম দেলারা, ২৩ নভেম্বর, ১৯৪৭)।

ক্রমশ মেয়েরা আরও বুঝেছেন প্রকৃত স্বাধীনতা হল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। নিজেদের পায়ে না দাঁড়ালে, পুরুষের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকলে স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকা যাবে না। ১৮৫৭-তেই মেয়েরা প্রথম চাকরি করতে শুরু করেছিলেন (বর্ধমান-রাজ প্রতিষ্ঠিত এক বিদ্যালয়ে রাজারই অমাত্য রমাপতি মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী-র 'আচার্য্যার পদে' নিযুক্ত হবার সংবাদ ২৪ জুলাই, ১৮৫৭-র *এডুকেশন গেজেটে*), এবং দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের চাকরিতে তাঁদের যুক্ত হওয়ার সংখ্যাও বেড়েছে। এ ব্যাপারে নানা রকম ভূমিকা নিয়েছিল মেয়েদের সম্পাদিত কাগজগুলি। উনিশ শতকের পত্রিকায় এই ধারণা তত স্পষ্টতা পায়নি, শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্বাবলম্বিতার বোধ দানা বেঁধেছে। বিশ শতকের অনেক পত্রিকাতেই তার প্রতিফলন। মেয়েরা যে পুরুষদের মতোই কর্মক্ষেত্রে

পারদর্শিতা দেখাতে পারেন, "যদি পুরুষেরা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাদের পথ ছাড়িয়া দেন"— এ কথা মনে করেছে *ভারত মহিলা*। শিশু ও বালকবালিকাদের স্কুলে পরিদর্শকের কাজে পুরুষদের থেকে মহিলারা বেশি দক্ষ এ কথা জানিয়ে পত্রিকাটি বলেছে— "কি নিয়মে ছেলেদের শিক্ষা প্রদান করা হইবে তাহা নির্ধারণ করিবার তাহারাই যোগ্য পাত্রী" (কার্তিক, ১৩১৭)। মেয়েদের আর্থিক স্বনির্ভরতা বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছে *জয়শ্রী* পত্রিকা। তাদের সচেতন বক্তব্য এই রকম, "পরের অধীনতা ছিন্ন করিতে হইলে এবং নিজের শক্তির উপরে দাঁড়াইতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই আর্থিক স্বাধীনতা আবশ্যক।" "যে স্ত্রীর নিজের অন্নসংস্থানের ক্ষমতা নাই"— তার 'স্বামীর অত্যাচার' মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া কোনও উপায় নেই (বাঙ্গালী মেয়ের আর্থিক স্বাধীনতা, শ্রীকণিকা দেবী, ভাদ্র, ১৩৩৮)। নানা ধরনের জীবিকার পথ মেয়েদের জন্য খুলে দেওয়ার উদ্যোগ যেমন নিয়েছে এ সময়ের পত্রিকাগুলি, মেয়েদের বিচিত্র রকমের কাজে যোগ দেওয়ার খবরও তাদের পাতায় মিলছে। মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার ব্যাপারটি সব সময় খুশি মনে মেনে নিতে পারেননি পুরুষরা। তাঁদের বিরোধিতাকে ধিক্কার জানাতে দ্বিধা করেনি তারা। এমন একটি ঘটনা *ভারত মহিলা*-র পাতায় আমরা পেয়েছি। যোগ্য এক মহিলাকে হাসপাতালের হাউস সার্জনের পদ ছেড়ে দেওয়া হলে কয়েকজন পুরুষ সেই হাসপাতালের কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। পুরুষের সমান 'নৈপুণ্য ও কার্য্যকরী শক্তি' থাকার পরেও ওই মহিলাকে "সম্মান করা অপেক্ষা কর্ম্মত্যাগ তাহাদের বিবেচনায় শ্রেয়স্কর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল" দেখে পত্রিকাটি ঘটনার তীব্র নিন্দা করে (কার্তিক, ১৩১৭)।

একালের বহু পত্রিকাই মেয়েদের স্বনির্ভরতায় সাহায্যের জন্য বিভিন্ন নারী সমিতিকে এগিয়ে আসার ডাক দিয়েছে। ১২৯৩-তে স্বর্ণকুমারীর 'সখী সমিতি'র মাধ্যমে যে কাজের শুরু হয়েছিল, তাকে অব্যাহত রাখার কথা বলেছে। এসব সমিতির উদ্যোগে গরিব অসহায় মেয়েরা যাতে "হস্তদ্বারা ও যন্ত্রাদির সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া জীবিকা অর্জন" করতে পারে সে আবেদন করেছে *নবপর্য্যায় পরিচারিকা* (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ১৩২৭)। কেমন ভাবে বারাসত, বরিশাল, দার্জিলিং বা কলকাতার নারী সমিতিগুলি গ্রামেগঞ্জে গিয়ে মধ্যবিত্ত ও গরিব ঘরের মেয়েবউদের স্বনির্ভর হতে সাহায্য করছে তার হিসেবনিকেশ প্রতি মাসেই *বঙ্গলক্ষ্মী*-র পাতায় থাকত। মহিলা সমিতির সম্পাদকের পাঠানো বক্তব্যগুলি ছাপতেন তাঁরা। অজ পাড়াগাঁয়ে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বনির্ভরতার প্রয়োজন মেয়েদের বোঝাতেন তাঁরা। এক সময় 'যাঁহাদিগকে বেশি ভয়' সেই শাশুড়ি, পিস্‌শাশুড়িরাও বাড়ির বউদের উৎসাহ দিতেন। সাধারণ ঘরের লেখাপড়া জানা, না জানা এবং অত্যন্ত গরিব নিচুতলার 'ডোম বাউরি' মেয়েদের জন্যও এঁরা ভাবতেন। যেসব মেয়েরা সারা বছরে মাত্র দু'বার ধানকাটা ধান পোঁতার সময় ছাড়া কাজ পান না, অস্পৃশ্য বলে ঘরের কাজেও যাঁদের ডাকে না কেউ, বছরের বেশি সময় তাঁদের কাটে অনাহারে। সমবায় পদ্ধতিতে '৫ আনা মজুরি' দিয়ে বছর সাতেক সুতো কাটানোর পর 'ছোট বড় সকল শ্রেণির নারীই স্বাবলম্বী হইবে'— এই আশার কথা নারী সমিতির সম্পাদক জানিয়েছেন *বঙ্গলক্ষ্মী*-র পাতায় (পৌষ, ১৩৩২)।

শিক্ষকতা, ডাক্তারির পাশাপাশি মেয়েরা যে অন্য ধরনের জীবিকাতে কৃতিত্বের সঙ্গে এগিয়ে আসছিলেন সে খবর আমরা বরাবরই পেয়েছি। মেয়েদের মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য হওয়া বা ওকালতির মতো পেশার খবর *বঙ্গলক্ষ্মী* (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫) আমাদের জানিয়েছে। *সহচর* (মাঘ, ১৩২৯) পত্রিকা আমাদের জানিয়েছে— "শুনা যাইতেছে কলিকাতা হইতে শীঘ্রই *বঙ্গনারী* নামে একখানা দৈনিক পত্রিকা বাহির হইবে", এর সম্পাদকই শুধু মহিলা নন— "প্রকাশ যে ইহার মুদ্রাকর ও প্রকাশকও একজন মহিলা হইবেন এবং ইহা মহিলা কম্পোজিটারদের দ্বারাই মুদ্রিত হইবে।...ফলত, *বঙ্গনারী* নারী সমাজের বিশেষত্বজ্ঞাপক একখানা অভিনব ধরনের পত্রিকা হইবে।" সত্যিই মেয়েদের জীবিকার জগতে 'কম্পোজিটার' এক নতুন সংযোজন।

পাঁচ

মুসলমান সমাজের মেয়েরা এত সহজে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারেননি। এই সমাজ ছিল আরও কুসংস্কারে মোড়া, মেয়েদের 'অবরোধ প্রথা' প্রবল ছিল সেখানে। এই প্রথা ভাঙার সপক্ষে কথা বলার মানসিকতা গড়ে ওঠেনি উনিশ শতকের কাগজগুলির। বিশ শতকে, মুসলমান মহিলা সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা *আন্নেসা* 'অবরোধ-প্রথা'কে সমর্থনই করত। এই প্রথার বিরুদ্ধে লেখা শামসুন নাহার-এর 'পর্দ্দাপ্রথা ও স্ত্রী স্বাধীনতা' প্রবন্ধটি ছাপলেও (১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ, ১৩২৮) সম্পাদক এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন— "লেখক যে ইসলামের কঠোর পর্দ্দা প্রথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন" তার সঙ্গে তিনি একমত নন। পর্দায় স্বাস্থ্যহানি হয় এটা স্বীকার করেও তাঁর মতে, "মোসলেম রমণীগণ কিছুতেই পর্দ্দাকে অবহেলা করিতে পারে না"। তাতে তাদের 'সতীত্ব ও কোমলত্ব' নষ্ট হয়। বিশ শতকের অন্য অনেক কাগজ অবশ্য পর্দা-প্রথার নিন্দা করে, এটি উঠে যাওয়ার পক্ষে মুখ খুলেছে। নারীস্বাধীনতার বিরোধী এই প্রথা ভেঙে মেয়েদের বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে *ভারত মহিলা* (অবরোধ প্রথা, শ্রীরাজকুমারী দাস, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪)। মুসলমান মেয়েরাও যে সচেতন হয়ে উঠছেন, প্রথা ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইছেন এ-বিষয়ে একটি আগ্রহোদ্দীপক ঘটনা আমরা পেয়েছি *বঙ্গলক্ষ্মী*-র পাতায়। মিসেস আর. এস. হোসেন, 'কাটা মুণ্ড কথা কয়' (মাঘ ১৩৩২) নামে একটি লেখায় জানান— "পশ্চাৎপদ এবং মৃতপ্রায় নিৰ্জ্জীব মুসলিম নারীও সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সামাজিক কুপ্রথা আমাদের মাথা কাটিয়া রাখিয়াছে,... এখন সেই কাটা মুণ্ড কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে।" ঘটনাটি এই রকম— আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে মুসলিম মেয়েদের জন্য পর্দাপ্রথা বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেন কর্তৃপক্ষ, মণ্ডপে আসা নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু তাঁদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে, পুলিশের লাঠির তোয়াক্কা না করে লেখিকা সহ পঁচিশজন মুসলমান মহিলা মণ্ডপের দিকে এগিয়ে যান। তাঁদের নেত্রী আতিয়া বেগমকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। রাগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি মঞ্চে ওঠেন ও তীব্র ভাষায় এর নিন্দা করেন। সম্মেলনের সেক্রেটারি "প্রফেসর শিরওয়ানী বেগতিক দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন"

করেন। মহিলারা এসব কাপুরুষদের ব্যঙ্গ করে বলেন, পর্দার আড়ালে মেয়েদের না রেখে তাঁরাই বরং 'চুড়ি পরিয়া অন্তঃপুরে বসুন।' *বুলবুল* পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক শামসুন নাহার নিজে অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে উচ্চশিক্ষিত (এম এ) হন, তাঁর পত্রিকাটিও এ বিষয়ে উদার মনোভাবাপন্ন ছিল।

ছয়

বিশ শতকে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পথ ধরেই স্বাধীন ব্যক্তিত্বের বিকাশ ক্রমশ প্রসারিত হতে থাকে। তখনই এসে পড়তে থাকে নারী-পুরুষের সম অধিকার, নারীর আইনি অধিকার, ভোটাধিকার ও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানের মতো প্রসঙ্গ। এগুলি বিশ শতকের সমস্যা— এ নিয়ে তর্কবিতর্ক, আন্দোলন, মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা চলতে থাকে মেয়েদের পক্ষ থেকে। এর ছাপ পড়ে পত্রিকার পাতাতেও। সমানাধিকারের দাবি বার বার উচ্চারিত হতে শুনি— *ভারত মহিলা, সুপ্রভাত, নবপর্য্যায় পরিচারিকা, বঙ্গলক্ষ্মী, জয়শ্রী*-তে। তাদের প্রথম প্রকাশেই *ভারত মহিলা* ঘোষণা করে— "রাজনীতিই হউক আর শিল্পবিজ্ঞানই হউক, পুরুষের পার্শ্বে নারী দণ্ডায়মান না হইলে পুরুষশক্তি কখনও সম্যক বিকশিত হইতে পারে না।... নারীকে উন্নত করিয়া, নারীকে সঙ্গে লইয়া তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। এই সুমহৎ দুষ্কর কর্মে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিবার জন্য *ভারত মহিলা*-র জন্ম"। যুগ যুগ ধরে আইন ছিল পুরুষেরই পক্ষে, সে আইন তৈরি করেছে পুরুষই— 'তাহা পুরুষের জন্য পুরুষের দ্বারাই রচিত হইয়াছে', কাজেই মেয়েদের আইনি অধিকার আদায় করতে হলে তাদের লড়াই করতে হবে। পোর্শিয়ার মতো 'রমণী আইন-ব্যবসায়ী' যাতে মেয়েদের মধ্যে থেকে উঠে আসে, যাঁদের 'তীক্ষ্ণ মেধা সঙ্কটের জটিল জাল' থেকে বেরিয়ে আসার পথ দেখাবে— সে আবেদন মেয়েদের কাছে রেখেছেন এঁরা (কার্তিক, ১৩১৭)। নারীর সম-অধিকার বা আইনগত অধিকারের দুটি দিক (১) ব্যক্তিজীবনে নারীর অধিকার (২) সমষ্টি জীবনে অধিকার।

ব্যক্তিজীবনে, ন্যায্য অধিকার নিয়ে সম্মানের সঙ্গে যাতে মেয়েরা বেঁচে থাকতে পারে সে বিষয়ে মতামত প্রকাশ করেছে *বঙ্গলক্ষ্মী*-ও। বোম্বাই-এর একটি সভায় 'সরকারী নারী কমিটি' তৈরি করে মেয়েদের জন্য যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বাঙালি মেয়েদের জন্যও সেটা হওয়ার দাবি জানিয়ে প্রস্তাবের খসড়াটি তাঁরা ছাপিয়েছেন। তা এইরকম— "(ক) পুরুষগণ এক স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিতে পারিবেন না (খ) পরিত্যক্তা স্ত্রী-র ভরণপোষণে স্বামী বাধ্য থাকিবেন (গ) বিবাহ বিচ্ছেদে নারীর অধিকার থাকিবে (ঘ) পৈতৃক সম্পত্তিতে প্রত্যেক নারীর আইনত দাবি ও অধিকার বর্ত্তিবে" (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫)।

হিন্দু সমাজে নারীর কোনও অধিকারকে স্বীকৃতি না দিয়ে আমরা যে নিজেদের সমাজকে 'শক্তিহীন পঙ্গু করে ফেলেছি' এ কথাও বলেছে *বঙ্গলক্ষ্মী* (হিন্দু আইন ও নারীর অধিকার, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫)।

১৩৫০ বছর আগে ইসলাম ধর্মে যে 'নারী আইনত পিতার পুত্রের ন্যায় পৈতৃক সম্পত্তির অংশীদার' ছিল সে অধিকারকে আধুনিক 'মোল্লা'রা অস্বীকার করছেন। নারীর অধিকারের কথা শুনলেই আজ তাঁরা চেঁচিয়ে উঠছেন— 'হায় হায় সর্বনাশ হল'— *বঙ্গলক্ষ্মী*-র পাতায় এ কথা বলে, মেয়েদের এর প্রতিবাদে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সফিয়া খাতুন (জাগ্রত মুসলীম নারী, আশ্বিন, ১৩৩৫)। নারীর ব্যক্তি-অধিকার নিয়ে সোচ্চার হয়েছে *জয়শ্রী* পত্রিকাও। মেয়েদের জন্য মুসলমান সমাজের ইতিবাচক কয়েকটি নিয়ম হিন্দু সমাজকে গ্রহণ করার কথা বলেছেন এই পত্রিকায় জ্যোতির্ময়ী দেবী (মুসলমানী ঋণ, ভাদ্র, ১৩৩৮) তার মধ্যে প্রধান তিনটি হচ্ছে— (ক) 'মা-বাপের কাছ থেকে...অধিকার হিসেবে' সম্পত্তি পাওয়ার প্রথা (খ) দেনমোহর প্রথা— যেখানে বিয়ের সময় লেখা দলিল অনুযায়ী তালাক দেওয়া স্ত্রীকে বিয়েতে প্রাপ্য যৌতুক ফিরিয়ে দিতে স্বামী বাধ্য থাকবে (গ) 'বিবাহ-বিচ্ছেদ বা তালাক নামা' প্রথা। উল্লেখ্য, সে বছরেই আমাদের দেশে একটি আইনের প্রস্তাব আসে। তা হল— মা-বাবার যদি শুধু কন্যা-সন্তান থাকে তবে সেই কন্যা বা তার সন্তান সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রচুর বাদ-প্রতিবাদ চলে। অবশেষে '৪ঠা ফেব্রুয়ারী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায়' প্রস্তাব করা হয়, আলোচনার পরে 'উহার পক্ষে ২৬ এবং বিপক্ষে ৫৫ ভোট হওয়ায় প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়'— এখবর আমরা *জয়শ্রী*-র পাতাতেই পেয়েছি (ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৩৮), 'স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবার অধিকার' সংক্রান্ত আলোচনায়। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনের পক্ষে বারবারই স্পষ্ট মত দিয়েছে পত্রিকাটি। তাদের মতে অপমানিত হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে নিজের মতো বেঁচে থাকা অনেক ভাল (বিবাহ-বিচ্ছেদ রীতি, শ্রীসুপ্রভা দেবী, কার্তিক, ১৩৩৮)।

ব্যক্তিজীবনে মেয়েদের অধিকার পাবার ব্যাপারে নানা মতবিরোধ হওয়ার মধ্য থেকেই উঠে এসেছে সমষ্টিজীবনে তাদের অধিকারের প্রশ্নটি। সমষ্টি অধিকারের মধ্যে ভোটাধিকারের বিষয়টি বিশ শতকে দুই-এর দশকে গুরুত্ব পেয়েছে খুব বেশি। এ দাবি উনিশ শতকে ওঠার মতো সামাজিক পরিস্থিতি ছিল না। এই শতকে ইংলন্ডে মেয়েদের ভোটাধিকারের দাবিতে সাফ্রাজিস্ট আন্দোলন শুরু হয়। বিশ শতকে এ দেশেও সরোজিনী নাইডু, অ্যানি বেসান্তের মতো মহিলারা মেয়েদের ভোটাধিকারের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁরা ইংলন্ডে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির সামনে এই দাবি জানান ১৯১৯-এ। এর আগেই স্বায়ত্তশাসন (Self Government)-এর মধ্যে মেয়েদের অধিকার রাখার জন্য এ দেশের মহিলা নেত্রীরা সচেষ্ট হন। *নবপর্য্যায় পরিচারিকা* খবরটি জানিয়ে বলে—

> 'সর্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয় এই যে ১৯১৭ সালে ভারতীয় নারী মহাসমিতির সভ্যগণ ভারত-সচিবের নিকট এদেশীয় নারীগণের অধিকার ও শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের দাবী স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন' (আশ্বিন ১৩২৭)।

ভারতে প্রথম ভোটাধিকার পান বোম্বে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মেয়েরা। ১৯২১-এ বাংলার মেয়েদের ভোটাধিকারের জন্য বিল রাখা হয় কিন্তু সে বিল পাশ হয়নি, ভোটে

হেরে যায়। *নবপর্যায় পরিচারিকা* দুঃখ করে লেখে— "বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ বঙ্গনারীকে রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রদান করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বাংলার পুরুষের কলঙ্কমোচনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও বৃথা হইল।" পুরুষশাসিত সমাজের কাছে যে মানুষ হিসেবে মেয়েদের মূল্য নেই, মেয়েরা তাদের কাছে যে ভোগ্যপণ্য— তীব্র ভাষায় তার প্রতিবাদ করে পত্রিকাটি প্রশ্ন করে— "নারী কি মানুষ নহে, তবে তাহাকে জ্ঞানার্জ্জন ও রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের দাবী হইতে বঞ্চিত রাখা হয় কেন?" (নারীর দাবী, *নবপর্য্যায় পরিচারিকা*, ফাল্গুন, ১৩২৮)। অবশেষে ১৯২৩-এ বাংলার মেয়েরা প্রথম কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে ও ১৯২৫-এ বিধানসভায় ভোটাধিকার পায়। *বঙ্গলক্ষ্মী* পত্রিকাতেও প্রথম থেকেই নারীপুরুষের সমানাধিকারের দাবি উঠে এসেছে মেয়েদেরই কলমে (নারী ও পুরুষ, শ্রী মুসাম্মত রেজিয়া খাতুন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩)। রাশিয়ায় জার আমলে মেয়েরা পুরুষের ভোগের সামগ্রী ছিলেন কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবের দশ বছরের মধ্যে সেখানে "সমাজে রাষ্ট্রে শিল্পে বাণিজ্যে সাহিত্যে এমনকী যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত" এ কথা জানিয়ে তারা বাঙালি মেয়েদের দাবি আদায় করার জন্য উৎসাহিত করে (সোভিয়েত গণতন্ত্রে নারীর অধিকার, *বঙ্গলক্ষ্মী*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫)। প্রকাশের সূচনা থেকেই বাঙালি মেয়েদের চিন্তাধারায় সংহতি দৃঢ়তা ও সামঞ্জস্য স্থাপন করতে, 'শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি' সব বিষয়ে মেয়েদের কথা বলার অধিকার করে দিতে এগিয়ে এসেছিল *জয়শ্রী* পত্রিকা। 'বর্তমানের গঠন ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা' এই দুই কাজে পুরুষের পাশাপাশি মেয়েদেরও যে অনেক কিছু করার আছে এ সম্পর্কে তারা সচেতন ছিল।

সাত

বিশ শতকের প্রথম থেকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় রাজনৈতিক আন্দোলন নানা মাত্রা পেতে থাকে। এ বিষয়ে নানা খবরাখবর দিয়ে, সেসব আন্দোলনে তাদের যোগ দিতে উদ্দীপ্ত করেছে বিভিন্ন পত্রিকা। বিশ শতকের প্রথম দিকে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন ও স্বদেশি আন্দোলনে বাংলা যখন উত্তাল, তখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করেছে *ভারত মহিলা*, তাদের প্রথম প্রকাশেই। লর্ড কার্জনের অভিসন্ধিমূলক আচরণ, ব্রিটিশ সরকারের মিউনিসিপ্যাল আইন, বিশ্ববিদ্যালয় আইনের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে পত্রিকাটি। তাদের মতে বিদেশি জিনিসের প্রতি আমাদের অনুরাগ দেশীয় ব্যবসায়ীদের ক্ষতি করছে। লবণ, চিনি, দেশলাই-এর মতো ছোটখাটো বস্তু আমরা ইচ্ছে করলেই বর্জন করতে পারি, আমরা অসহায় নই, এ কথা মনে করে তারা বলেছে— "বাঙ্গালী যদি প্রতিজ্ঞা করে যে আমরা যথা সম্ভব ইংরেজের দ্রব্য বর্জ্জন করিব, তবে আমরা ইংরেজের ব্যবসায়ের ওপর হস্তক্ষেপ করিতে পারি।" এই আন্দোলনে, স্বদেশীদের প্রতিজ্ঞায় মেয়েদের সামিল হতে আহ্বান জানিয়েছে তারা— "স্বদেশের জন্য এই যে আগুন জ্বলিয়াছে তাহার উত্তাপ কি নারীজাতিকে স্পর্শ করিতেছে না? ...এই দুর্দ্দিনে নারীগণ যদি পুরুষের সহিত সম্মিলিত না হন তবে আর আশা কোথায়?" (মাতৃভূমির দুর্দ্দিনে মহিলাগণের কর্ত্তব্য,

কুমুদিনী মিত্র, ভাদ্র, ১৩১২)। স্বাধীনতা পেতে গেলে বাঙালিকে আত্মশক্তিতে জাগতে হবে এবং সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠতে হবে, এই আহ্বানও শোনা গেছে এই পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন স্বদেশি গান (আমার সোনার বাংলা, এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে ও অন্যান্য) ছাপা হয়েছে *ভারত মহিলা*-র বিভিন্ন সংখ্যায়। রাখিবন্ধন ও 'জাতীয় মিশন মন্দির'-এর সার্থকতা সম্পর্কে আলোচনাও করেছে তারা। তবে এই পত্রিকার পাতাতেই নারীর রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে বিরোধী স্বরও শোনা গেছে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন তখন শেষ পর্যায়ে। লোকসভায় মেয়েদের আসন গ্রহণ করার ব্যাপারে যখন মেয়েরাই দাবি জানাচ্ছেন, এ নিয়ে তর্কবিতর্ক চলছে দেশজুড়ে তখন আমোদিনী ঘোষ নামে এক মহিলা লেখেন— এই প্রস্তাবকে তিনি 'হৃদয়ের সহিত ঘৃণা' করেন। "যাঁহারা সর্ব্ববিধ সৌকুমার্য্যের পুরোবর্ত্তিনী তাঁহারা হাউস অব কমন্স-এর উত্তপ্ত বিতণ্ডার ক্ষেত্রে অবতরণ করিলে তাঁহাদের শালীনতা রক্ষা সন্দেহ-স্থল হইয়া উঠে...এতে রমণীর রমণীত্ব বিনষ্ট হয়" (কার্তিক, ১৩১৭, *ভারত মহিলা*)। *সুপ্রভাত* পত্রিকাটি মেয়েদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা জাগানোর চেষ্টা করে গেছে বরাবর। বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ-এর 'কারাকাহিনী' ও কালীমোহন ঘোষ-এর 'বয়কট উৎসব' *সুপ্রভাত*-এর পাতায় ধারাবাহিক ভাবে ছাপা হয়। *নবপর্য্যায় পরিচারিকা* সরোজিনী নাইডুর 'সকল প্রকার রাজনৈতিক ও সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনে' সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা, 'শ্রীমতী গান্ধী'র (মহাত্মা গান্ধীর স্ত্রী) দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনে কারাবাসের খবর, শ্রমতী রমাবাই রাণাডের কাজকর্মের খবর দিয়ে মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে। মহম্মদ আলি ও সৌকত আলির "তেজস্বিনী মাতা যখন অবগুণ্ঠিতা হইয়া কংগ্রেসের মঞ্চে দণ্ডায়মান হইলেন তখন দেশবাসীর প্রশংসাপূর্ণ অভিবাদনে চতুর্দ্দিক ধ্বনিত হইতে লাগিল"— এই উৎসাহব্যঞ্জক খবর আমরা এই পত্রিকাতেই পাই। (বর্তমান ভারতের নারীজাতি, শ্রী সুধাময়ী দেবী, আশ্বিন, ১৩২৭)। *বঙ্গলক্ষ্মী* ও *জয়শ্রী* পত্রিকাও রাজনৈতিক আন্দোলন বিষয়ে মেয়েদের সচেতন করার চেষ্টা করেছে। সরকারি লাঞ্ছনার ফলে *জয়শ্রী* পত্রিকা বারে বারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতার কিছু আগে ফাল্গুন, ১৩৫৩-তে যখন তা নতুন করে প্রকাশ পেল, তখন তার চিন্তাধারা আরও উন্নত, স্পষ্ট। তারা জানাল— "সর্ব্বধ্বংসী পরাধীনতার বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে" *জয়শ্রী* আপসহীন সংগ্রাম করেছে এর আগে, এখন নতুন ভারত-এর নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন তাদের চোখে। নতুন সমাজের "রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রূপ নিয়ে..এ ধারণা ও পরিকল্পনা" তাদের পাতায় প্রকাশ পাবে। "সমাজতন্ত্রবাদী বিচার বিশ্লেষণ ও যুক্তির মধ্য দিয়ে" পত্রিকাটি নিজেদের বক্তব্য উপস্থিত করতে চেষ্টা করবে। ১৩৪৪ সালের *গৃহলক্ষ্মী* ১৩৪৫ (মাঘ)-এ এসে নিজের নাম পরিবর্তন করে রাখে *জাগৃহি*। কারণ এখন থেকে তারা 'প্রগতিশীল নারী আন্দোলনের মুখপত্র' হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা মুক্ত রাজনীতির নানা খবর খুব গুরুত্ব দিয়ে ছেপেছে তাদের প্রায় সব সংখ্যাতেই। পুরুষের পাশাপাশি, স্বাধীনতা আন্দোলনে ক্রমে বহু মহিলা অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের অনেককেই পাঠানো হয় কারাগারের ওপারে। আন্দোলনকারীদের নানা

কাজকর্মের খবর দিনের পর দিন থাকত মুক্ত-র পাতায় খুবই গুরুত্ব সহকারে। গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে একটু নরম হয়ে ইংরেজ সরকার বেশ কিছু বন্দিদের মুক্তি দেয়, তার মধ্যে ছিলেন অনেক মহিলা। এই পত্রিকার পাতাতেই আমরা খবর পাই—

> 'গাণ্টুর হইতে ১০ জন মহিলা সমেত ৩১ জন মুক্ত হইয়াছেন...প্রেসিডেন্সী জেল হইতে ২৭ জন নারীবন্দিনীগণকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।
>
> লাহোর বোরস্ট্যাল জেল হইতে কন্যাগণসহ...শ্রমতী প্রভাতী দেবী প্রভৃতি বহু মহিলা মুক্ত হইয়াছেন।
>
> ফরবেদা জেল হইতে ৬৩ জন মহিলার মুক্তিসংবাদ আসিয়াছে।
>
> মাদ্রাজের বিভিন্ন জেল হইতে বহু মহিলা কারামুক্ত হইয়াছেন।... সবরমতী সেন্ট্রাল জেল হইতে ৪০ জন মুক্তিলাভ করিয়াছেন।...পুরীর শ্রীমতী সোনামণি দেবী মুক্তি পাইয়াছেন (৩০ ফাল্গুন, ১৩৩৭)।

গান্ধীজি থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ, আইন-অমান্য আন্দোলনে বাধা বা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের কথা এরা জানাত পাঠকদের। ব্যারাকপুরে ২৪ পরগনা ইউনিয়ন বোর্ডের সম্মেলনে স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিজয়প্রসাদ সিংহরায় মেয়েদের ওপর পিকেটিং-এর দায়িত্ব দেবার প্রসঙ্গে বলেন— "আমার মতে নারীগণের উপর এই কার্য্যের ভার অর্পিত হইলে দেশের আবহাওয়ার সমধিক উন্নতি হইবে"— এ খবর আমরা মুক্ত-র পাতাতেই পেয়েছি (৭ চৈত্র, ১৩৩৭)। 'চট্টগ্রাম বিভাগীয় মহিলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনী'তে 'রাজনৈতিক আন্দোলনে মহিলাদিগের কার্য্যকলাপ' সম্পর্কে সভানেত্রী লাবণ্যপ্রভা ঘোষের বক্তব্যও জানিয়েছে এই পত্রিকা (১৪ চৈত্র, ১৩৩৭)।

শত্রু যে শুধু সাম্রাজ্যবাদ নয়, সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে এগোতে না পারলে যে দেশ স্বাধীন হওয়ার আশা নেই— এ সম্পর্কে মেয়েরাও তাঁদের স্বাধীন ভাবনা প্রকাশ করতে থাকেন। সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে এসে সুস্থ রাজনীতি করার প্রসঙ্গে সফিয়া খাতুনের মতামত মুক্ত-র পাতায় ছাপা হয়েছিল। (২৮ চৈত্র, ১৩৩৭)। দুটি সম্প্রদায়ের মানুষ যদি পরস্পরের প্রতি সহনশীল না হন, পরস্পরের ধর্ম ও সামাজিক ব্যাপারে শ্রদ্ধাশীল না হন তবে 'হিন্দু মুসলমানের রাজনীতিক একতা কখনই সম্ভবপর হইবে না'— সফিয়া খাতুনের এই সচেতন ভাবনাও প্রকাশ করে মুক্ত (ভারতের সাধনা, ২ আশ্বিন, ১৩৩৮)। বিষয়টি নিয়ে লেখালিখি হয়েছিল *জয়শ্রী*-র পাতাতেও। মি. জিন্নার চোদ্দো দফা দাবি যে "কোন জাতীয়তাবাদী মুসলমান সমর্থন করেন নাই, কেননা জাতির স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে হিন্দু মুসলমানের মিলিত দাবি কার্যকরী হওয়াই স্বাভাবিক। ...কেবলমাত্র 'মুসলমান' হওয়ার সুবিধাটুকু লইয়া, আদুরে খোকার মতো বায়না ধরিলে জগতের সম্মুখে মুসলমান উপহাসাস্পদ হইবে"— এই মন্তব্য ছাপানোর সাহস দেখিয়েছিল *জয়শ্রী* (সাম্প্রদায়িকতা, কুমারী সফিয়া খাতুন, বৈশাখ, ১৩৩৮)। বছর যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়তে থাকে মেয়েদের মধ্যে। ঔপনিবেশিক শক্তি এ-দেশ ছেড়ে

চলে যাবে, অনেক লড়াইয়ের পর স্বাধীনতা আসবে— এটা বোঝা যায় এক সময়। এ-ও জানা যায় স্বাধীনতার পর দেশ দু'টুকরো হবে, ওলটপালট হবে অনেক কিছু। দু'দেশেই সংখ্যালঘুদের সমস্যা হবে সবচেয়ে বেশি। এ নিয়ে ভাবনাচিন্তা আমাদের চোখে পড়েছে নারী-সম্পাদিত পত্রিকার পাতায়। স্বাধীনতার বছরে, ১৯৪৭-এ প্রকাশিত হয় *বেগম* পত্রিকা। সমস্যাটি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে পত্রিকাটি। উভয় রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের অধিকারের ব্যবস্থা করার জন্য একটি যুক্ত কমিটি গঠিত হওয়া উচিত— 'নিখিল ভারত কংগ্রেস' কমিটির সভায় সভাপতি আচার্য কৃপালনীর এই বক্তব্যকে সমর্থন করে *বেগম* (২০ জুলাই, ১৯৪৭)। আরও জানায়— স্বাধীন পাকিস্তানে যে 'পাকিস্তান গণপরিষদ' তৈরি হবে পূর্ববঙ্গ থেকে তার একমাত্র মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন বেগম শাইস্তা সোহারওয়ার্দ্দি একরামুল্লা (২৭ জুলাই ১৯৪৭)।

অবশেষে ১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হয়। হিন্দু-মুসলমান মিলে আলোকমালায় পথঘাট সাজিয়ে উৎসবের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবস পালনও করে (২৪ আগস্ট, ১৯৪৭, *বেগম*)। কিন্তু '৪৬-এর দাঙ্গার দগদগে ক্ষত মিলোয় না মানুষের মন থেকে। তাই হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির আবেদন বারবার করেন মহিলারা পত্রিকার পাতায়। ঈদ উপলক্ষে ১৯৪৭-এর আগস্টে পার্ক সার্কাসে মিসেস মোমীন-এর সভানেতৃত্বে সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রায় তিনশো মহিলার এক সভা হয়। *বেগম* এই খবর দিয়ে বলে— "প্রায় তিনশত মহিলা ঐ সভায় যোগদান করেন। শ্রীযুক্তা মণিকুন্তলা সেন, সুহাসিনী গাঙ্গুলি, রোশনআরা প্রমুখ বিশিষ্টা মহিলাগণ হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বক্তৃতা করেন" (*দেশ-বিদেশের নারী*, ২৪ আগস্ট, ১৯৪৭)। দাঙ্গার ফলে যে সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়ছে, উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে 'মা-বোন'দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে *বেগম*। পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি, বিশ্বাস ও সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে সম্পাদকীয়তে তারা বলে "এক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ...হিন্দু মা বোনরা এ বিষয়ে আগে থেকেই অনেকখানি অগ্রসর", মুসলমান মেয়েদেরও এগিয়ে এসে উদ্যোগ নিতে হবে (আজ এই সন্ধিক্ষণে, ৬ অক্টোবর, ১৯৪৭)। 'মহিলা মুসলিম লীগ ও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র উদ্যোগে প্রীতি সম্মেলন আয়োজনের খবরও বেরোয় *বেগম*-এর পাতায় (১৪ নভেম্বর, ১৯৪৭)।

মেয়েদের অধিকারের জন্য এত লড়াই, তাদের এগিয়ে আসার জন্য এত চেষ্টার পরও তাদের ওপর নির্যাতন কিন্তু বন্ধ হয়নি। উনিশ শতকের নির্যাতন মূলত ছিল চার-দেওয়ালের মধ্যে, বাইরে লাঞ্ছনার খবরও একটু আধটু পাওয়া যায়। বিশ শতকে বাইরের নির্যাতন আরও বেড়েছে, বদলে গেছে তার ধরনও।

উনিশ শতকের পত্রিকা *ভারতী ও বালক* (আশ্বিন, ১২৯৩) গোয়ালন্দের এক ট্রেনের আরোহী পঁচিশ বছরের বিধবা রোহিণীর প্রতি সাহেব গার্ড স্মিলার-এর অশালীন আচরণের ঘটনা জানায়। দোষীকে বাঁচানোর সব রকম চেষ্টাই সরকারের তরফে হয়েছিল। বাড়ির ভিতবে নির্যাতনের খবর পাওয়া যায় একটি বিখ্যাত পরিবারকে কেন্দ্র করে। শোভাবাজার

রাজপরিবারে প্রসন্ননারায়ণ দেবের পুত্রবধূ মানদা তেরো বছর ধরে শাশুড়ির অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন। আদালতে বাড়ির দাসীর বয়ানে অত্যাচারের ঘটনাটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। এ খবর আমরা পেয়েছি *পরিচারিকা*-র পাতায় (অগ্রহায়ণ, ১২৯৮)। বধূ নির্যাতন যে অধিকাংশ গৃহে প্রতিদিনের ব্যাপার ছিল সে কথা অনেক পত্রিকাই আমাদের জানিয়েছে বিশ শতকেও। মেয়েদের কলমেই বেদনা ও ব্যঙ্গের সুর আমরা শুনতে পেয়েছি—

> 'বল দেখি আমরা যে তোমার আজীবন দাসীগিরি করি তাহার কি কোন পুরস্কার নাই? তুমি প্রিয়তম, নয়টার সময়ে অফিস যাইবে, আমি প্রাতে উঠিয়া পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত প্রস্তুত করিয়া দিলাম; তুমি বৈকালে আসিয়া জল খাইবে আমি লুচি মোহনভোগ করিয়া রাখিলাম;...তুমি শীতে নিশীতে গরমজল না হইলে আঁচাইতে পার না, আমি গরমজলের ঘটি হাতে করিয়া তোমার সম্মুখে ধরিলাম। বল দেখি, কে এমন করিয়া...আজীবন এরূপ দাসীগিরি করিতে পারে? এ দাসীর যদি দুই টাকা করিয়াও মাসিক মাহিনা ধর, তবে পঞ্চাশ বৎসরে মায় সুদ অন্তত দেড় হাজার টাকা হইবে'। (রমণীর মর্ম্মকথা, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩২১ *মাহিষ্য মহিলা*)।

দিন গেছে। মেয়েরা একটু একটু করে এগিয়েছেন, কিন্তু তাদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা খুব কমেনি। দেশভাগের পর যখন দলে দলে মানুষ এদেশ ছেড়ে ওদেশে যাচ্ছেন বা ওদেশ ছেড়ে এদেশে আসছেন, তখন মেয়েদের ওপর যে পরিমাণ অত্যাচার হয়েছে তার হিসেবনিকেশ নেই। অত্যাচার জাত ধর্ম মেনে হয় না— হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব ধরনের মেয়েদের ওপর চলেছে অকথ্য অত্যাচার। হাজার হাজার মেয়ে ধর্ষিতা হয়েছেন। দেশভাগের পর ষাট বছর কেটে গেছে— ঘরছাড়া মেয়েরা বহুভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন। অনেক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে পরের প্রজন্ম স্থায়ী ঘরও বেঁধেছেন এক সময়। কিন্তু পথেঘাটে আজও মেয়েরা লাঞ্ছনার শিকার হন— স্বাধীনতা-উত্তর পত্র-পত্রিকার পাতা ওলটালে সে খবর আমরা পাই।

আট

স্বাধীনতা ও দেশভাগকে কেন্দ্র করে নতুন দু-একটি সমস্যা উঠে এসেছে এরপর। লক্ষ লক্ষ মানুষের পায়ের তলায় মাটি নেই তখন। তাদের নতুন নাম 'উদ্বাস্তু'। এই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন তখন তীব্রতম সংকট— দু'দেশেই। মেয়েরাও এই সমস্যা চিন্তাভাবনা করছিলেন, তাঁদের মতামত প্রকাশ করছিলেন পত্রিকায়। এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে যা বলা হচ্ছিল সেগুলি এবং মন্ত্রীদের বক্তব্যের সারাংশ পাঠককে নিয়মিত জানাত নূরজাহান বেগম ও সুফিয়া কামাল-এর *বেগম।* এ ধরনের বহু খবরের মধ্য থেকে একটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী রাজকুমারী অমৃতা কাউর 'বাস্তুহারা স্ত্রীলোক ও শিশুদের পুনর্বসতি'কে গুরুতর সমস্যা বলে চিহ্নিত করেন। হাজার হাজার মেয়েদের এই সমস্যা দূর করার জন্য তিনি প্রস্তাব দেন— "ঐ সকল স্ত্রীলোক ও বালিকাদিগকে ধাত্রী,

নার্স, শিক্ষয়িত্রী প্রভৃতির কাজ শিখাইয়া লইয়া সমাজের লক্ষ লক্ষ লোকের সেবায় নিয়োগ করা যাইতে পারে।" জাতির সবচেয়ে বড় সম্পদ যে শিশু, তাদের শিক্ষার সুযোগ করে দেবার জন্য, 'শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী শিল্পী, মনস্তত্ত্ববিদ'-এর প্রয়োজনের কথা জানায় এই পত্রিকাটি।

১৯৪৭-এ শুধু দেশভাগই হল না, দু'টুকরো করা হল বাংলাকেও। আগেই ঘোষণা হল পুব-বাংলা চলে যাবে পাকিস্তানের অধীনে, নতুন নাম পূর্ব পাকিস্তান আর জাতীয় ভাষা উর্দু। যন্ত্রণায় ক্ষোভে ফেটে পড়ল ওপারের বাঙালি। স্বাধীনতা পাওয়ার আগেই প্রবল বিক্ষোভ শুরু হল ওপার বাংলায়। মেয়েরাও তাদের ক্ষুব্ধ এবং যুক্তিপূর্ণ মতামত প্রকাশ করতে লাগলেন নানা সভা-সমিতিতে, পত্রিকার পাতায়। সমগ্র পাকিস্তানের তিন ভাগের দু'ভাগ অধিবাসী পূর্ব পাকিস্তানে, তাদের মুখের ভাষা বাংলা, তাই রাষ্ট্রভাষার প্রথম দাবি বাংলারই হওয়া উচিত এ-কথা মনে করেছেন মেয়েরা। বিশেষত 'উর্দু রাষ্ট্রভাষা হইলে' ওপারের বাঙালি মেয়েরা আরও পিছিয়ে পড়বেন, তাই এর বিরুদ্ধে "আমাদের নারী সমাজ সর্বত্র আন্দোলন করিবেন"— এই আশা রেখেছেন তাঁরা (পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, মিসেস এম. এ. হক, ২৭ জুলাই, ১৯৪৭, *বেগম*)। স্বাধীনতার পরেও *বেগম*-এর সম্পাদকীয়তে "নারী সমাজ সমগ্রভাবে বাংলা ভাষাকে সমর্থন করবেন" এ আশা করা হয়েছে। অন্যান্য মহিলারাও তাঁদের প্রবন্ধে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন যে— বাংলা তাঁদের প্রাণের ভাষা, সুখদুঃখের ভাষা। বহু শতাব্দী ধরে বাঙালি কবি আলাওল, দৌলত কাজী থেকে নজরুল পর্যন্ত এই ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করে গেছেন। এছাড়া বহুদিনের চেষ্টায় বহু বাধা অতিক্রম করে 'মুসলিম নারীরা সাহিত্য ও রাজনীতি ক্ষেত্রে' যতটা এগিয়েছেন সেখান থেকে আবার পিছিয়ে পড়বেন— "এটা বাংলার মুসলিম নারী সমাজের পক্ষে অপমৃত্যু বই আর কিছুই নয়"। নারী সমাজের পক্ষ থেকেই এই 'অনমনীয় দাবী' জানানো হয়েছে স্বাধীনতার পরে (মোহ্সেনা ইসলাম, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ২৩ আগস্ট, ১৯৪৭, *বেগম*)।

১৯৪৭-এর পরেও *বেগম* পত্রিকা ও অন্যান্য পত্রিকা (নারী-সম্পাদিত) 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা'র দাবিতে বহু লেখালিখি করেছে, উদ্দীপ্ত করেছে মেয়েদেরও। আজ আমরা জানি বাংলা ভাষার জন্য এই দাবি ক্রমশ বৃহত্তর আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল। অনেক তাজা প্রাণের বিনিময়ে, অনেক রক্তের বদলে শেষ পর্যন্ত জিতে গিয়েছিল বাংলা ভাষা। পরে একটি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সে তার অধিকার আদায় করে নিয়েছিল।

স্বাধীনতার পরে এপার বাংলায় এবং ওপার বাংলাতেও মেয়েদের সম্পাদনায় বহু পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, আজও হয়ে চলেছে। যুগের সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা বদলেছে, নতুন সমস্যা এসেছে। ঘোমটা আর পর্দা সরিয়ে যে-মেয়ের চোখ তুলে চাইবার অনুমতি দেয়নি সমাজ, সেই বাঙালি মেয়েরা আজ সব সমস্যার সঙ্গে লড়াই করতে করতে নিজেদের ছড়িয়ে দিয়েছে পৃথিবীর নানা প্রান্তে। স্বাধীনতার পরের ষাট বছরে মেয়েদের সম্পাদিত পত্রিকার সংখ্যা বেড়েছে বহুগুণ। সেগুলি যুগে যুগে সমকালের সমস্যা নিয়ে কথা বলেছে। বাংলা পত্র-পত্রিকার জগতে তাদের স্থান অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। সে-সব কথা পরে কখনও বলার ইচ্ছে রইল।

বাঙালি নারী-সম্পাদিত পত্রিকার তালিকা (১৮৭০-১৯৪৭)

	পত্রিকা	কাল	সম্পাদক
১.	বঙ্গমহিলা	১২৭৭ (১৮৭০)	মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়
২.	অনাথিনী	১২৮২	থাকমণি দেবী
৩.	হিন্দুললনা	১২৮৪	জনৈক হিন্দু মহিলা
৪.	ভারতী	[১২৮৪] ১২৯১ সাল থেকে মহিলা-সম্পাদিত	স্বর্ণকুমারী দেবী
৫.	পরিচারিকা	[১২৮৫] ১২৯৪ সাল থেকে মহিলা-সম্পাদিত	মোহিনী দেবী
৬.	খ্রীষ্টীয় মহিলা	১২৮৭	কামিনী শীল
৭.	বঙ্গবাসিনী	১২৯০	
৮.	সোহাগিনী	১২৯১	কৃষ্ণরঞ্জিনী বসু ও শ্যামাঙ্গিনী দে
৯.	বালক	১২৯২	জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
১০.	মহিলাবান্ধব	১২৯২ (?)	
১১.	বিরহিণী	১২৯৫	সুশীলাবালা দেবী
১২.	পুণ্য	১৩০৪	প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী
১৩.	অন্তঃপুর	১৩০৪	বনলতা দেবী
১৪.	মুকুল	[১৩০২] ১৩০৭ সাল থেকে মহিলা-সম্পাদিত	হেমলতা দেবী
১৫.	ভারত-মহিলা	১৩১২	সরযূবালা দত্ত
১৬.	জাহ্নবী	[১৩১১] ১৩১৪ সাল থেকে মহিলা-সম্পাদিত	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী
১৭.	সুপ্রভাত	১৩১৪	কুমুদিনী মিত্র
১৮.	ভারত লক্ষ্মী	১৩১৭	যোগমায়া মাতাজী তপস্বিনী
১৯.	মাহিষ্য মহিলা	১৩১৮	কৃষ্ণভাবিনী বিশ্বাস
২০.	প্রেম ও জীবন	১৩১৯	হেমলতা দেবী
২১.	আনন্দ-সঙ্গীত পত্রিকা	১৩২০	প্রতিভা দেবী ও ইন্দিরা দেবী
২২.	পরিচারিকা (নবপর্য্যায়)	১৩২৩	নিরুপমা দেবী
২৩.	আন্নেসা	১৩২৮	বেগম সফিয়া খাতুন
২৪.	বাঙ্গালার কথা	১৩২৮	বাসন্তী দেবী

২৫.	নব্যভারত	[১২৯০] ১৩২৮ সাল থেকে মহিলা-সম্পাদিত	ফুল্লনলিনী রায়চৌধুরী
২৬.	শ্রেয়সী	১৩২৯	কিরণবালা সেন
২৭.	সেবা ও সাধনা	১৩৩০	ইন্দুনিভা দাস
২৮.	মাতৃ-মন্দির	১৩৩০	সুরবালা দত্ত
২৯.	বঙ্গনারী	১৩৩০	চিন্ময়ী দেবী
৩০.	শ্রমিক	১৩৩১	সন্তোষকুমারী গুপ্তা
৩১.	ত্রিপুরা হিতৈষী	১৩৩১	উর্মিলা সিংহ
৩২.	বঙ্গলক্ষ্মী	১৩৩২	কুমুদিনী বসু
৩৩.	অর্ঘ্য	১৩৩৪	প্রভাবতী পাইন ও অনিল ধর
৩৪.	পাপিয়া	১৩৩৫	বিভাবতী সেন
৩৫.	তরুণ শক্তি	১৩৩৬	রাজবালা দেবী
৩৬.	আলোক	১৩৩৬	প্রভাতরঞ্জন বিশ্বাস ও আরতি দেবী
৩৭.	মুক্ত	১৩৩৭	তরুবালা সেন
৩৮.	কিশোরী	১৩৩৮	সুধা সেন
৩৯.	জয়শ্রী	১৩৩৮	লীলাবতী নাগ (রায়)
৪০.	অঙ্কুর	[১৩৩৮] ১৩৫১ সাল থেকে মহিলা-সম্পাদিত	লাবণ্যপ্রভা মল্লিক
৪১.	রূপরেখা	১৩৩৯ ১৩৪৪ থেকে 'রূপরেথা' পত্রিকাটি 'বর্ষবাণী' নাম দিয়ে নবকলেবরে প্রকাশিত হতে থাকে	জাহানারা চৌধুরী
৪২.	বুলবুল	১৩৪০	মহম্মদ হবিবুল্লা ও শামসুন নাহার
৪৩.	আগন্তুক	১৩৪০	শ্রীমতী পরিমল মিত্র
৪৪.	এডুকেশন গেজেট	১৩৪১ সাল থেকে মহিলা-সম্পাদিত	অনুরূপা দেবী
৪৫.	রূপশ্রী	১৩৪১	বেলা দেবী (ঘোষ)
৪৬.	অনুভব ও সাহিত্য	১৩৪৩	জ্যোৎস্নাহাসি সেনগুপ্ত
৪৭.	গৃহলক্ষ্মী	১৩৪৪	কনকপ্রভা দেব
৪৮.	মন্দিরা	১৩৪৫	কমলা চট্টোপাধ্যায়
৪৯.	সঙ্ঘসাথী	১৩৪৬	কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়

৫০.	ছেলেখেলা	১৩৪৬	বাণী দেবী ও মিনতি ঘোষ
৫১.	বিজয়িনী	১৩৪৭	জ্যোৎস্না চন্দ
৫২.	শিক্ষা	১৩৪৭	স্বর্ণপ্রভা সেন
৫৩.	আশ্রমী	১৩৪৭	কেশবলাল বসু ও কমলবাসিনী দেবী
৫৪.	উদয়াচল	১৩৪৮	বাণী রায় ও রবীন্দ্র ঘোষ
৫৫.	জাগরণ	১৩৪৯	সুলতানা বেগম
৫৬.	প্রভাতী	১৩৪৯	সুধা ঘোষ
৫৭.	ললিতা	১৩৪৯	অরুণা বসু ও মুরারী দত্ত
৫৮.	অর্চ্চনা	[১৩১০] ১৩৫১ সাল থেকে মহিলা-সম্পাদিত	চিত্রিতা দেবী
৫৯.	মাতৃভূমি	[১৩৪৫] ১৩৫২ সাল থেকে মহিলা-সম্পাদিত	অমিতা দত্ত মজুমদার
৬০.	পরিক্রমা	১৩৫৩	কল্যাণী মুখোপাধ্যায়
৬১.	মহিলা	১৩৫৪	বীণা গুহ
৬২.	মহিলা মহল	১৩৫৪	অঞ্জলি সরকার, কমলা মুখোপাধ্যায় ও গীতা বোস
৬৩.	সংগঠন	১৩৫৪	অংশুরানী মিত্র
৬৪.	বেগম	১৩৫৪	নূরজাহান বেগম ও সুফিয়া কামাল
৬৫.	শতাব্দী	১৩৫৪ (১৯৪৭)	মুরারি দে ও সুজাতা ঘটক

দেবশ্রুতি রায়চৌধুরী

বর্গীয় পুরুষতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের আলোকে বঙ্গীয় আদর্শ নারী

১৮৮৫ সালের ২৮-২৯ ডিসেম্বর বোম্বেতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যখন জন্মলাভ করে সেখানে ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে যে ৭২ জন প্রতিনিধিকে সম্মেলন উপলক্ষে ডাকা হয়েছিল তাঁরা ছিলেন স্বভাবতই সমাজে উচ্চ-প্রতিষ্ঠিত, ইংরেজি-জানা, শহুরে এবং সর্বোপরি ব্রিটিশ প্রশাসনের আস্থাভাজন সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। কিন্তু তার থেকেও বড় একটি পরিচয় তাঁদের ছিল বলে আমরা এই আলোচনায় তুলে ধরার চেষ্টা করব, আর তা হল এই বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষের ব্রাহ্মণত্ব ঘেঁষা আচরণ। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন এক বাঙালি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্পষ্টতই উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণ। তা ছাড়া যে ৭১ জন এই সম্মেলনে যোগ দিতে বোম্বে যান তাঁদের মধ্যে যে-দু'জন মাত্র বাঙালি ছিলেন তাঁদের একজন গিরিজা মুখার্জিও উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণ এবং তৃতীয় জন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম নেতা কেশব সেন-এর ভাই ও *ইন্ডিয়ান মিরর* পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন। ব্রাহ্ম হলেও সেন ভ্রাতৃদ্বয়ের এবং তাঁদের মতো আরও অনেক মুক্তমনা বিপ্লবী নেতার উচ্চ বর্ণপ্রীতি আজ এক ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত। এই বিশিষ্ট উচ্চবর্ণের বা নিম্নবর্ণের নেতারা, যাঁরা অর্থবলে বা ইংরেজি শিক্ষার জোরে সমাজে বিশিষ্ট স্থান দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁদের ব্রাহ্মণত্বমুখী আচার-আচরণ নিয়ে লেখালিখি হয়েছে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও যে এই ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চ বা মুষ্টিমেয় মধ্যম বা নিম্নবর্গীয় ভাগ্যবানদের একচেটিয়া বিচরণ ক্ষেত্র ছিল তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও করেছেন ঐতিহাসিকেরা। কিন্তু কেমন ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মেয়েদের ভূমিকা? সেই ভূমিকার বর্ণসত্তা কি উনিশ শতকের তথাকথিত নারীমুক্তি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সুখী সমাজসংস্কারের অঙ্গনে আছড়ে পড়েছিল, যার জেরে ভেঙে পড়েছিল উচ্চ ও নিম্নবর্গের মাঝের অটুট প্রাচীর? আমাদের এই আলোচনা দেখাবে এই প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক, উপরন্তু, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জেরে নিম্নবর্গের মহিলাদের জীবনযাত্রা কতটা উচ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণ্যবাদমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তারই বিশ্লেষণের চেষ্টা করব আমরা।

নব্যদৃষ্টি এবং চিন্তাধারা উনিশ শতকে, মূলত দ্বিতীয়ার্ধ থেকে, যে পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং বিস্তারিত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পটভূমি রচনা করেছিল তার সূচনাকার হিসাবে মোটামুটি ভাবে বিতর্কবিহীন একাধিপত্য যিনি দাবি করতে পারেন তাঁর নাম রামমোহন রায়। রামমোহনের হাত ধরে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই বাঙালি শিক্ষিত জনমত বলে যে-চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটে তার নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা অনস্বীকার্য ভাবে সমাজের অভিজাত সম্ভ্রান্তবর্গীয়। এই শ্রেণি পরবর্তীতে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের[১] হাত ধরে এক নতুন অভিধায় অভিষিক্ত হয়— ভদ্রলোক। এই ভদ্রলোক গোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ ছিলেন সমাজের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় অথবা ব্রাহ্মণ না হয়েও সমাজে নিজেদের প্রতিপত্তি সুনিশ্চিত করে ব্রাহ্মণ্যবাদের ধ্বজাধারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ মধ্যম বর্গীয় সম্ভ্রান্ত শ্রেণি। তাঁরা সমাজে তাঁদের বহু কষ্টে অর্জিত প্রতিপত্তি নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ী করতে ব্রাহ্মণ্যবাদের আশ্রয় নেওয়াই সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য পথ বলে অনুভব করেছেন। একই কথা প্রযোজ্য সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের মুষ্টিমেয় প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠী সম্পর্কেও। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে উপনিবেশিক বাণিজ্যায়নকে কাজে লাগিয়ে শেঠ বা বসাক গোষ্ঠীর যে-উত্থান তা অর্থনৈতিক ভাবে যথেষ্ট প্রভাববিস্তারী হলেও সামাজিক প্রতিপত্তির বিষয়টি তখনও কিছু মুষ্টিমেয়র জাত ও কুলের চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই বর্গীয় গোষ্ঠীর বিস্তারিত বিকাশ সমাজের অন্যান্য স্তরে পরিলক্ষিত হয়নি। ফলে, অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় জাতভিত্তিক প্রতিপত্তিকে অস্বীকার করার একটা সাময়িক প্রবণতা এবং তার আপাত গ্রহণযোগ্যতা দেখা দিলেও উনবিংশ শতকের গোড়া থেকে দেশীয় বাণিজ্যে ভারতীয় বণিকদের প্রতিপত্তি হ্রাস পেতে থাকায় অর্থনৈতিক কৌলীনের থেকে জাত ও কুলের বাড়বাড়ন্ত আবার সমাজের মূলে প্রবেশ করে পাকাপাকি ঘাঁটি গেঁড়ে বসে।

অষ্টাদশ শতকে জাতের বাড়াবাড়িকে নবলব্ধ অর্থনৈতিক প্রতিপত্তির জোরে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দেখাতে সমর্থ হয়েছিলেন এক গোষ্ঠীর মানুষ। অথচ সেই স্পর্ধিত ভঙ্গি ছিল একান্তই সাময়িক। তারই খতিয়ান নিতে গিয়ে আমরা দেখি ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়াতে বাণিজ্যের স্বার্থে উপনিবেশের কর্তাদের স্থানীয় ভাষা-না-জানা-জনিত সমস্যার সমাধানে নির্ভর করতে হত স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর। এই সব স্থানীয় বাঙালিরা ব্রিটিশ কর্তাদের হয়ে নিছক দোভাষীর কাজ বা বাণিজ্যিক চুক্তির সম্পাদনে গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতেন। গ্রামগঞ্জ থেকে জীবিকার সন্ধানে, জীবিকার আকর বিশেষ 'কলিকাতা কমলালয়ে' আসা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের অধিকাংশই ছিলেন নিম্নবর্গের এবং তাঁরাও নিজেদের জীবন থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতার কারণে এই জাতীয় জীবিকায় ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেননি। নিতান্ত গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজন চিরকালই ব্রাহ্মণ বা অন্যান্য মধ্যবর্গীয় প্রতিপত্তিশালীদের তুলনায় বেশি ছিল এই নিম্নবর্গীয়দের। উপরন্তু, ম্লেচ্ছ বণিকদের সঙ্গে লেনদেনের জন্য জাত খোওয়ানোর আশঙ্কাও তাদের প্রায় ছিল না বললেই চলে, কেন না জাতের নামে বাড়াবাড়িটা ছিল উচ্চবর্গীয়দেরই একচেটিয়া, ফলে জীবিকার বাছবিচারে বর্গীয় বিলাসিতা দেখানো কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল। এক্ষেত্রে বলে নেওয়া

প্রয়োজন, এই লেখায় উচ্চবর্গীয় বলতে আমরা ব্রাহ্মণ এবং মধ্য-বর্গীয় বলতে কায়স্থ ও বৈদ্যদের আর নিম্নবর্গীয় বলতে বাকি অন্যান্য বর্গভুক্ত গোষ্ঠীকে অভিহিত করেছি। এই বর্গীয় ভেদাভেদে ব্রাহ্মণ্যবাদ কীভাবে সর্বজনীন চেহারা নিয়েছিল এই গোষ্ঠীগুলির পুরুষতান্ত্রিক গতানুগতিক প্রয়োজনের মাধ্যমে, সেই আলোচনাই এই লেখার মূল প্রতিপাদ্য।

আগের কথায় ফিরে যাই এবার— বিলেতি বণিকদের ভাষাজনিত সমস্যা নিম্নবর্গের মানুষের সামনে উপার্জন এবং বহু আকাঙ্ক্ষিত সামাজিক প্রতিপত্তির নতুন যে-জগৎ খুলে দিল সেই কথায়। বিদেশি বণিক সম্প্রদায়ের পিঠ-চাপড়ানিতে সামাজিক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে সমাজের বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষ হিসাবে পরিচিত হতে থাকলেন নিম্নবর্গীয় এই মানুষেরা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ধোপা রতন-এর কথা।[২] সমাপাতনিকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রথমে, ঘটনাচক্রে, দোভাষীর পেশায় নিযুক্ত হয়ে (খান কয়েক ইংরেজি শব্দের জ্ঞান নিয়ে) এবং পরে বাঙালি সমাজের কেষ্টবিষ্টু রতন সরকার হিসাবে তিনি প্রচুর ধনসম্পত্তি ও সামাজিক প্রতিপত্তির অধিকারী হয়ে বসেন। একই কথা প্রযোজ্য উত্তর কলকাতার পোস্তা রাজবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মীকান্ত ওরফে নকু ধর সম্বন্ধে, কোনও এক ব্রিটিশ সাহেবকে প্রাণে বাঁচিয়ে যাঁর ভাগ্য খুলে যায় এবং সেই সাহেবের বিশ্বাসভাজন হয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। একই ভাবে ঠাকুর পরিবারের দর্পনারায়ণ ঠাকুর তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল মি. হুইলারের দেওয়ান হওয়ার পর থেকেই লক্ষ্মীর বড়পুত্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। শুধু তাই নয়, গোটা বংশকে তিনি পিরালী ব্রাহ্মণ হওয়ার অসম্মান থেকে উদ্ধারও করেছিলেন নিছক আর্থিক ও তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সামাজিক প্রতিপত্তির জোরে। নিম্নবর্গের মানুষের আর্থিক রমরমার দৌলতে সামাজিক রীতিনীতিকে নিজের ইচ্ছামাফিক পরিচালনা করতে পারার সব থেকে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সম্ভবত তৎকালীন ধনকুবের কালীপ্রসাদ দত্তর ঘটনাটি। একটি মুসলমান মেয়েমানুষ পুষেছিলেন কালীপ্রসাদ যার দরুণ সমাজের প্রতিপত্তিশালী বর্গীয় গোষ্ঠী তাঁকে একঘরে করার সিদ্ধান্ত নেয়। বেগতিক বুঝে কালীপ্রসাদ আশ্রয় নেন রামদুলাল দে-র কাছে, যিনি নিজের নিম্নবর্গীয় অবস্থান সত্ত্বেও উপনিবেশিক রমরমার যুগে ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনের সুবাদে সমাজের কেউকেটা হয়ে উঠেছিলেন। রামদুলাল কালীপ্রসাদের সমস্যা এক নিমেষে সমাধান করে দেন এই বলে যে, সমাজের মাথা যে-সব উচ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণরা তাঁর বিরুদ্ধে নিদান দিয়েছেন শ্রদ্ধার্ঘ স্বরূপ তাঁদের বিপুল পরিমাণ অর্থদান করলেই সমাজের এ-হেন মাথারা আর কালীপ্রসাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মাথা ঘামাতে আসবেন না। রামদুলালের কথা মতো কাজ করেন কালীপ্রসাদ এবং এর পরে তাঁর ভিন্ন জাতের মেয়েমানুষ পোষা নিয়ে আর কোনও কটূক্তি শোনা যায়নি। এই জয়ে উৎফুল্ল রামদুলাল স্বভাবতই সদর্পে ঘোষণা করেন, "এই সব জাতপাতের সমস্যাকে আমি পকেটে পুরে ঘুরি।" এ ঘটনায় প্রমাণিত হয়, অর্থবল কী ভাবে তখন সামাজিক প্রতিপত্তির একমাত্র মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, পিছনে ফেলে দিয়েছিল ব্যক্তিবিশেষের বংশ কৌলীন্যকে। কিন্তু অর্থবলের এই রমরমা যে সাময়িক, জন্মজনিত বর্গীয় পরিচয় সামাজিক প্রতিপত্তির একমাত্র না হলেও অচিরেই যে আবার সর্বাপেক্ষা

প্রভাবশালী মাপকাঠি হয়ে দাঁড়াবে, সেই আলোচনায় আমরা এবার প্রবেশ করব।

প্রসঙ্গত বলা যায় কলকাতার বিখ্যাত শেঠ সম্প্রদায়ের কথা; অর্থবলে বলীয়ান এই গোষ্ঠী উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই কলকাতায় জাঁকিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু শুধু অর্থবলে যে সমাজে কদর মেলে না তা বুঝে শহরের শিক্ষিত অথচ দরিদ্র যুবাসম্প্রদায়ের লেখাপড়ার জন্যে তাঁরা বিশেষ পড়ার ঘরের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। একে লেখাপড়া ও তার প্রসারে এতদিনকার ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রয়াসেরই অনুসরণ বলা চলে। এই শেঠরাই ধর্ম কর্মে বিশেষ মনোনিবেশ করে কলকাতায় তাঁদের পারিবারিক বিগ্রহ রাধাকান্ত জিউ প্রতিষ্ঠা করেন, যার পূজার্চনা হত যাবতীয় শাস্ত্রীয় অনুষঙ্গ মেনে। ব্রাহ্মণ্যবাদের এমন চরম অনুকরণের উদাহরণ ভূরি ভূরি ছড়িয়ে আছে উনবিংশ শতকের কলকাতার অব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণ্যবাদের নির্লজ্জ চাটুকারিতার মধ্যে। এ রকম আরও একটি উদাহরণ মৌলিক কায়স্থ গোষ্ঠীর, কায়স্থদের মধ্যে বংশমর্যাদায় যাদের অধিষ্ঠান তেমন উঁচুতে ছিল না। সেই গোষ্ঠীরই বিশিষ্ট ধনী নবকৃষ্ণ মিত্র কুলীন ব্রাহ্মণদের জন্যে বিশেষ তহবিল খুলে তাদের আর্থিক ভাবে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে সমাজে কল্কে পাবার চেষ্টা করেছিলেন। বড়বাজার-এর সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ও অর্থের জোরে সমাজে বিশেষ স্থানের অধিকারী ছিলেন। এই বংশের নিমাইচরণ মল্লিক ১৮৩০-এ ধর্মসভার সভাপতি হয়ে বসেন, যে-ধর্ম সভা কিনা রামমোহনের সতীদাহ বিরোধী আন্দোলনের বিরোধিতায় সমাজে বর্গীয় অনুশাসন বা বলা যায় ব্রাহ্মণ্যবাদকে কায়েম রাখতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সামাজিক প্রতিপত্তি শুধুমাত্র অর্থবলে জাহির করার দিকটি ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে দেশি ব্যবসায়ী মহল বা দেশি শিক্ষিত শ্রেণির মধুচন্দ্রিমার অবসানের দিন থেকে বাঙালিদের হাতছাড়া হতে থাকে। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই বাঙালি বানিয়া গোষ্ঠীর উপর তাদের যাবতীয় নির্ভরতাকে প্রায় সার্থকভাবে দূরে সরিয়ে ব্রিটিশ বণিকসম্প্রদায় বাণিজ্যের বিষয়টি পুরোপুরি কুক্ষিগত করে ফেলতে সমর্থ হয়। অন্যদিকে, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত দেশীয় ভদ্রলোকেরা, যাঁরা বিলিতি ব্যবস্থায় কেরানি হয়ে পরিতৃপ্ত ছিলেন, উচ্চশিক্ষার দুয়ার তাঁদের সামনে ক্রমশ উন্মোচিত হওয়ায় নিছক মাছিমারা কেরানি হিসেবে আর সন্তুষ্ট থাকতে পারছিলেন না। ফলত, এই গোষ্ঠীর উপরে ওঠার তাগিদ আরও বেড়ে যায় এবং বিলেতি প্রশাসনিক ব্যয়ভার যে তাঁদের উন্নয়নের পরিপন্থী সেই চিত্রটি তাঁদের সামনে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, উপনিবেশিক চাকুরিতে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ক্রমাগত উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিলেতি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যখন তাঁকে বলেছিলেন যে ব্রিটিশদের বদান্যতায় তাঁর এই রমরমা, তাতে ভূদেব উত্তর দিয়েছিলেন, দেশে যদি বিলেতি শাসন না থাকত তা হলে এত দিনে তাঁর মেধার জোরেই তিনি আরও সহজে অনেক বেশি উন্নতি করতেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ব্রিটিশ প্রশাসন তাদের কাজের সুবিধার্থে বাঙালিদের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে যে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা তাদের দিকে প্রায় বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে যখন এই নব্য ইংরেজিশিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকগোষ্ঠী মিল-বেন্থাম-

এর দর্শনে শিক্ষিত হয়ে উঠল। এই গোষ্ঠী ইউরোপের সাম্য ও গণতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই একই ধরনের সম্মানজনক বন্দোবস্ত ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর কাছ থেকেও দাবি করতে শেখে। স্বভাবতই তাদের সে আশা অপূর্ণ থেকে যাওয়ার দরুন বাঙালি শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণি, যাঁরা ছিলেন তৎকালীন বঙ্গসমাজের অতন্দ্র প্রহরী এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি যাঁদের আস্থা ছিল অসীম— সেই তাঁদেরই ব্রিটিশ প্রশাসনের উপর থেকে বিশ্বাস লোপ পেতে শুরু করে। উপরন্তু, এই শাসক গোষ্ঠী যখন দেশীয় সমাজ সংস্কারের পবিত্র দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে দেশি সমাজের খাস অন্তঃপুরে ঢুকে পড়ার উপক্রম করল, তখন এই 'ম্লেচ্ছ' শাসকদের সঙ্গে দেশীয় শিক্ষিতের মধুচন্দ্রিমার ইতি আক্ষরিক অর্থেই টানতে বাধ্য হয় বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণি।

ঠিক এই সময়েই দেশীয় সমাজ তার নিজস্বতা বজায় রাখার তাগিদে প্রাচীন আচারঅনুষ্ঠান ও সংস্কারবিধি আঁকড়ে ধরে ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে তাদের সামাজিক ব্যবধান নিশ্চিত করতে উদ্যোগী হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, বাঙালি দেশীয় সমাজ ও তার অনুশাসন বিলিতি সমাজ ও তার অনুশাসনের থেকে আলাদা— শুধু এটা প্রমাণ করলেই এই ভদ্রলোক গোষ্ঠীর কাজ শেষ হত না, তাদের উপর গুরু দায়িত্ব ছিল, দেশীয় সমাজব্যবস্থা, রীতিনীতি অনুশাসনকে ব্রিটিশ সামাজিক রীতিনীতি ও ন্যায় অন্যায় বোধের থেকে উৎকৃষ্ট প্রমাণ করার, যার দরুন তারা ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে তাদের কর্মজগতের দরাদরিতেও জয়ী হতে পারবে। বাঙালি ভদ্রলোকের ব্রিটিশ সামাজিক অনুশাসনকে চ্যালেঞ্জ জানানোর এই ভঙ্গি, বিলেতি উচ্চশিক্ষার দৌলতে তাদের মধ্যে জাতীয়রাষ্ট্র গড়ে তোলার চেতনার উন্মেষের ভিতর দিয়ে, ধীরে ধীরে এক রাজনৈতিক চেহারা নিতে শুরু করে, যা পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ নেয়। বহির্জগতে ব্রিটিশ শাসকদের হাতে মুহুর্মুহু পর্যুদস্ত বাঙালি ভদ্রলোকের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার কেন্দ্র হয়ে ওঠে এতদিন অবধি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা তাদের অন্দর মহল। অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ব্রিটিশশক্তির কাছে পরাজিত বাঙালি ভদ্রলোকের সমস্ত আস্ফালন এখন এই অন্দরমহলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আরও বিশদ বলতে গেলে, ব্রিটিশশক্তির হাতে লাঞ্ছনা ও অবমাননার যোগ্য জবাব দিতে অন্তঃপুরবাসিনী বাঙালি মহিলারাই হয়ে ওঠেন তাদের তুরুপের তাস। এর ফলে উনিশ শতকের মহিলাদের জীবনযাত্রা, আচার আচরণের মাপজোক যে-ভাবে আতস কাচের নীচে রেখে শুরু হয়ে যায় তা এক কথায় অভূতপূর্ব। সতীদাহ প্রথা রদ আইন (১৮২৯) এবং বিধবা বিবাহ আইন (১৮৫৬) চালুর মাধ্যমে, সমাজসংস্কারের ধুয়ো তুলে, ব্রিটিশ শক্তি বাঙালির অন্দরমহলে প্রবেশ করে এবং সেই থেকেই বাঙালি মহিলার শারীরিক অস্তিত্বকে ন্যায় অন্যায় বোধের নিক্তিতে মাপা হতে থাকে। পরবর্তীকালে, অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষার্ধে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যখন ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ছে ব্রিটিশ শক্তির দরজায়, তখন এই নারীশক্তিকেই আদর্শ নারীর বা বলা ভাল, তাকে উন্নততর দেশীয় অস্তিত্বের রূপ দান করে, ব্রিটিশ শক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশীয় শক্তির লড়াইয়ের অন্যতম প্রধান প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা

হয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতন ঐতিহাসিকেরা বলেছেন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রকোপে দেশীয় নারীর অবস্থান সংক্রান্ত সংস্কারকে কেন্দ্র করে সংস্কারের যে হুজুগ এক সময় তৈরি হয়েছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সঠিক রাস্তা খুঁজে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা চাপা পড়ে যায়। অর্থাৎ, বহু চর্চিত 'উইমেন'স কোশ্চেন' বা দেশীয় নারীর অস্তিত্বজনিত সমস্যা, যা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শুরুতে সংস্কারবাদী বা স্থায়িত্ববাদী উভয় পক্ষের জাতীয়তাবাদী নেতাদেরই হাতে তুরুপের তাস হয়ে দেখা দিয়েছিল, জাতীয় আন্দোলন সঠিক রূপ ধারণ করার পর তার হদিশ মেলা দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যের বিরোধিতা করে আমরা দেখব, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রকোপে দেশীয় নারীর অবস্থানজনিত সমস্যাগুলি আর শুধু উচ্চস্তরের ও উচ্চবর্ণের সমস্যা হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা ছড়িয়ে পড়েছে সমাজের সকল স্তরে, এবং যার ফলে সর্বজনগ্রাহ্য ভারতীয় নারীর একটি আদর্শ রূপ সমাজের প্রায় সকল স্তরের মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।[৩] কী সেই আদর্শ রূপ এবং কী ভাবে তা উচ্চবর্ণের নিরাপদ ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে এসে পড়েছিল নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে, পরবর্তী পর্যায়ে তা নিয়ে আমরা কথা বলব। কিন্তু আগে জেনে নেওয়া দরকার আদর্শ ভারতীয় নারীর এই মডেলের উপকরণগুলো ঠিক কী ছিল, কেন না সেগুলি বিশ্লেষণ করলেই উচ্চ-বর্ণাশ্রিত এই আদর্শের চেহারাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই উপনিবেশিক আধুনিকতার ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে কর্মক্ষেত্রের বিরূপ আবহে নিজেদের অস্তিত্ব হারানো দেশীয় ভদ্রলোকদের নিজেদের অস্তিত্বকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এবং এক্ষেত্রে সব থেকে বেশি যে-বিষয়টির নবনির্মাণ জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা হল দেশীয় অন্তঃপুরে অবস্থিত নারীর জীবনযাত্রা ও সেই সঙ্গে ঘরের পুরুষটির সঙ্গে তার সম্পর্কের পুনর্বিবেচনা, যা কিনা বিলেতি আধুনিকতার আলোকে মেপে নেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। অন্দর ও বহির্জগতের নির্মাণ ও অপরিসীম গুরুত্ব উৎপাদনকারী বিভাজনের তাই এ ছিল এক তাৎপর্যপূর্ণ সূচনা। গৃহের চার দেওয়ালের বাইরে আমরা/ওরা-র চেহারা নিয়ে বাঙালি ভদ্রলোকের অস্তিত্বকে, তাদের ব্রিটিশ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক শক্তি আর উন্নততর সামাজিক উপস্থিতির সঙ্গে এক তুলনামূলক হিসেব নিকেশে তা বাধ্য করেছিল। ফলে এই প্রথম (এবং হয়তো শেষ বারের মতোই) বাঙালি ভদ্রলোককে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল, ঠিক কীভাবে তাদের অন্তঃপুরকে লোকসমাজে উপস্থিত করা হবে, বা আদৌ করা হবে কি না! বাঙালির অন্তর জগতের সঙ্গে প্রাচীন বৈদিক সভ্যতার মিলন ঘটিয়ে অন্তঃপুরকে বাঙালির উন্নত মনের চারণভূমি হিসাবে তুলে ধরার সেই শুরু। আবার একই সঙ্গে, উপনিবেশিক আধুনিকতার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে তাদেরও মাথায় রাখতে হয়েছিল বৈদিক যুগের কোন বৈশিষ্ট্যগুলি তারা সাদরে গ্রহণ করবে আর কোন গুলিই বা বর্জন করবে। বহির্জগতে সর্বস্ব হারানো বাঙালি ভদ্রলোকের পরাজিত অস্তিত্ব এই সার্বিক পরাজয়ের গ্লানি ভুলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছিল এক মাত্র তার সাধের অন্তঃপুরে, যেখানে ব্রিটিশ

শক্তির প্রবেশ অন্তত নৈতিক স্তরে এক প্রকার নিষিদ্ধই ছিল বলা চলে। তাই অন্তঃপুরই হয়ে উঠেছিল দেশীয় ভদ্রলোকদের যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্র। আর অন্তঃপুরের সূক্ষ্মতম কাজ থেকে বৃহত্তম দায়িত্বের দিকে ভদ্রলোকদের অহর্নিশ নজরদারির ফলে বদলে গিয়েছিল অন্তঃপুরবাসিনীদের জীবনযাত্রা— যা ধীরে ধীরে আকার নিয়েছিল আদর্শ এক অস্তিত্বের, যার ওপর ভর দিয়ে নতুন জাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শে উদ্দীপ্ত এবং স্বশাসনের দাবিতে তেজোদ্দীপ্ত বাঙালি তাদের যাবতীয় পরাজয় ভুলতে চেয়েছিল।

কিন্তু ঠিক কী কী উপাদানের মিশেলে গড়ে উঠেছিল এই আদর্শ নারী যা পরবর্তীকালে বর্গীয় অস্তিত্ব ও শ্রেণি নির্বিশেষে প্রায় সব ধরনের মানুষের কাছে তাদের নিজের নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই অনুকরণীয় হয়ে উঠেছিল? এবার সেই ইতিহাসের আলোচনা আমরা উনিশ শতকের দ্বিতীয় ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রকাশিত উচ্চ ও নিম্ন উভয় বর্গের একটি গার্হস্থ্য নির্দেশাবলী ও কিছু পত্র-পত্রিকাকে অবলম্বন করে করব।

প্রথমেই চোখ রাখব ধীরেন্দ্রনাথ পাল নামে এক ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী লেখকের *স্ত্রীর সহিত কথোপকথন* (১৮৮৩) শীর্ষক নির্দেশাবলীর দিকে। ধীরেন্দ্রনাথের লেখার নায়ক, কাল্পনিক স্বামী চরিত্রটি, প্রথমেই ঘোষণা করেন, "আজ আমি এখানে তোমাকে নারী স্বাধীনতার পাঠ পড়াতে আসিনি...আমি এখানে এও বলতে আসিনি যে মহিলাদের পুরুষদের সমান অধিকার দেওয়া হোক, মহিলাদের অন্তঃপুরের বাইরে নিয়ে এসে মেমসাহেবে পরিণত করাও আমার উদ্দেশ্য নয়...মহিলারা এ সব চায় না।" মহিলারা কী চান সেই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে ধীরেন্দ্রনাথ প্রথমেই তাঁর নির্দেশাবলীর সুর বেঁধে দিয়েছেন উচ্চবর্গীয় তারে। তিনি বলেছেন, হিন্দু ধর্ম অনুসারে বর্গীয় সম্মান এবং কুল রক্ষাই মহিলাদের সব থেকে বড় ধর্ম, যার যথাযথ প্রতিপালন তাদের একনিষ্ঠ পতিধর্ম পালনের মাধ্যমে সম্ভব। এখানে পাতিব্রত্য পালনে একনিষ্ঠ যে-ভারতীয় নারী সে অন্য সব দেশের নারীর থেকে ভিন্ন এবং উচ্চস্তরীয়। তবে এই বিশেষ পাতিব্রত্য ধর্ম পালনের প্রয়োজনে অতীতের থেকে কিছু পৃথক ভাবে, কিছুটা নতুন সাজে সেজেছে এই নারী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ভারতীয়দের নিরক্ষরতার সমস্যার প্রতি ব্রিটিশ শাসকদের ভ্রূকুটি আর সমালোচনার জবাব দিতে নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মহিলাদেরও আধুনিক শিক্ষায় কিঞ্চিৎ শিক্ষিত করে তুলতে ব্রতী হয়েছেন ধীরেন্দ্রনাথের মতো ভদ্রলোকেরা। কিন্তু তাতে পতি প্রেমের মূল সুরটি কোনও ভাবেই বেসুরো হয়ে পড়েনি।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে যখন এই নির্দেশাবলীগুলি প্রকাশিত হয়েছে তত দিনে নারীশিক্ষার বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে পুরুষ-শাসিত দেশীয় অচলায়তনের দরজায় দরজায়। দেশীয় নারী শিক্ষিত না হলে তার রক্ষাকর্তা, প্রতিপালক স্বামীটির স্কন্ধেই চেপে বসে অশিক্ষা, কুসংস্কারের দায়, তাই কিছুটা বাধ্য হয়েই নারী-শিক্ষায় সায় দিয়েছেন সমাজের উচ্চবর্গীয় কর্তাব্যক্তিরা যাঁরা হয় জন্মসূত্রে উচ্চবর্গীয়, নয়তো আচার আচরণে নিজেদের সুর বেঁধে নিয়েছেন ব্রাহ্মণ্যবাদের সুরের সঙ্গে। এবং নারীশিক্ষাকে তুরুপের তাস বানিয়ে সমাজের এই কর্তারা ব্রিটিশ শক্তির মুখোমুখি লড়াইয়ের তাল ঠুকেছেন, তাঁদের নারীদের

সেই বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছেন যে-শিক্ষার তাগিদ অতীতের বৈদিক সভ্যতাকে স্বর্ণ যুগের আখ্যা দিয়েছে আর সীতা, সাবিত্রী এবং দময়ন্তীর মতো নারী চরিত্রের আদর্শে তাদের নারীদের অনুপ্রাণিত করেছে। এ ক্ষেত্রে যে-বিষয়টির দিকে চোখ রাখা বিশেষ দরকার তা হল, ব্রিটিশের সঙ্গে বহির্জগতে দর কষাকষির প্রয়োজন মুষ্টিমেয় বাঙালি ভদ্রলোকের ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়েছিল এবং তা হয়েছিল তাদের নব-অর্জিত ইংরেজি শিক্ষা এবং তারই দৌলতে প্রাপ্ত চাকরির সুবাদে। সমাজের সব স্তরের মানুষের কাছে এই শিক্ষা কখনওই পৌঁছয়নি, ফলে সব স্তরের নারীদের শিক্ষার প্রশ্নটিও উঠে আসেনি কোনওদিন। অর্থাৎ পুরুষদের মতো নারীর শিক্ষাও সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণির কুক্ষিগত হয়ে থেকেছে উনিশ শতকের প্রায় গোটাটা জুড়ে। পরিবর্তন শুরু হয়েছে উনিশ শতকের শেষের দিকে যখন শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের উপরতলায় উঠে আসার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন নিম্নবর্গের মানুষজন এবং সেক্ষেত্রে তাদের স্ত্রীদের অশিক্ষা যে তাঁদের ঊর্ধ্বগতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে সেটা বুঝতে তাঁদেরও দেরি হয়নি। এই সময়ের উচ্চ ও নিম্নবর্গীয় সমস্ত ধরনের গার্হস্থ্য নির্দেশাবলীতেই সব চাইতে গুরুত্ব পেয়েছে নারীর শুচিতা ও পতিপ্রেম এবং সর্বোপরি পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়ার গৌরব। কিন্তু তফাত থেকেছে এই ধর্মপালনের মাধ্যমে তাদের অভীষ্ঠ সিদ্ধির বেলায়। উচ্চবর্ণের গার্হস্থ্য নির্দেশাবলী যেখানে নারীর শুচিতাকে কাজে লাগিয়ে, তাদের বর্গ ও শ্রেণিসম্মানকে আরও শক্তপোক্ত করতে চেয়ে তাদের নারীদের বারে বারে সীতা-সাবিত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে আহ্বান জানিয়েছেন, নিম্নবর্গের মানুষ সেখানে তাঁদের স্ত্রীদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে উচ্চবর্ণের সমকক্ষ প্রমাণে উদ্যোগী হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের কিছু নির্দেশাবলী কাটাছেঁড়া করে আমাদের দাবি প্রমাণের চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রথমেই ফিরে যাই ধীরেন্দ্রনাথ পাল রচিত *স্ত্রীর সহিত কথোপকথন* নামের অতি জনপ্রিয় উচ্চবর্গীয় গার্হস্থ্য নির্দেশাবলীতে।

ঐতিহাসিক জুডিথ ওয়ালস তাঁর *হাউ টু বি দ্য গডেস অব ইওর হোম* বইতে উনিশ শতকে সর্বাধিক জনপ্রিয় যে নয়টি গার্হস্থ্য-বিষয়ক নির্দেশাবলী নিয়ে আলোচনা করেছেন তার সব ক'টি উনিশ শতকের শেষের দিকে রচিত এবং লক্ষ্ণীয় ভাবে উচ্চবর্গীয় রসে সিঞ্চিত। নির্দেশাবলীগুলির নাম তাদের প্রকাশনার কাল অনুসারে যথাক্রমে নবীনকালী দাসীর *কুমারী শিক্ষা* (১৮৮৩), ধীরেন্দ্রনাথ পালের *স্ত্রীর সহিত কথোপকথন* (১৮৮৩), সত্যচরণ মিত্র-র *স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপদেশ* (১৮৮৪), পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত-র *বাঙালী বউ* (১৮৮৮), চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *মা ও ছেলে* (১৮৮৭), তারকনাথ বিশ্বাস-এর *বঙ্গীয় মহিলা* (১৮৮৭), গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর *গৃহলক্ষ্মী* (১৮৮৮) এবং নগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তফি)-র *নারীধর্ম* (১৯০০)। নির্দেশাবলীগুলি খুঁটিয়ে দেখলে যে বিষয়টি সব থেকে আগে চোখে পড়তে বাধ্য তা হল জাতীয়তাবাদের সুর কীভাবে সমাজের সম্ভ্রান্ত স্তরের লেখক ও লেখিকাদের লেখনীতে ধ্বনিত হয়েছে। ধীরেন্দ্রনাথ পাল-এর ১৮৮৩-র লেখায় যে-সুর কিছুটা এলোমেলো ১৯০০-তে, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুতে, নগেন্দ্রবালা দাসী (মুস্তফি)-র লেখার সেই সুরই সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে দ্বিধাহীনভাবে।

এই লেখায় আমরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একেবারে শুরুর লগ্নে স্বায়ত্ত শাসনের দাবির সঙ্গে তৎকালীন সমাজে আদর্শ নারীর অবস্থান বুঝে নিতে মূলত ধীরেন্দ্রনাথ পালের লেখাতেই মনোনিবেশ করব। এবং সে ক্ষেত্রে যে-বিষয়গুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য তা হল তাঁর লেখায় ফুটে ওঠা উচ্চবর্গের (ও শ্রেণির) অভিঘাত।

ধীরেন্দ্রনাথ ছিলেন সমাজের ভদ্রলোক সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্যভাবে বলতে গেলে, সমাজের বিশিষ্ট শ্রেণিভুক্ত সেই সব মানুষদের তিনি একজন, যাঁরা বিশেষ কোনও প্রচেষ্টা ছাড়াই সমাজে নানা ধরনের সুখসুবিধা ভোগ করতেন, তাঁদের বংশগত আভিজাত্যের দৌলতে অথবা তাঁদের জীবনযাত্রায় উচ্চবর্গীয় ভাবধারার কারণে। এ ক্ষেত্রে স্বভাবতই উল্লেখযোগ্য ধীরেন্দ্রনাথের জন্মগত অব্রাহ্মণ অস্তিত্ব যা তাঁর লেখনীর মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রচারের অন্যতম অস্ত্র হয়ে ওঠে অনায়াসে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ না হয়েও সমাজের এই বিশিষ্ট শ্রেণির লেখনী, আচারআচরণের প্রশ্নে ব্রাহ্মণ্যবাদের সুরে বাজে, কারণ সমাজে নিজেদের বিশেষ অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় ও সুনিশ্চিত করে নিতে তারা উদগ্রীব। আর ভনিতা না করে এবার চোখ রাখা যাক ধীরেন্দ্রনাথ পালের লেখায়। ধীরেন্দ্রনাথের মতে উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রলোকের আদর্শ সঙ্গিনী হয়ে উঠতে হলে বাঙালি রমণীকে স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ককে মোট চারটি ধারায় প্রভাবিত করতে হবে। সেগুলি হল: ১. অংশীদারিত্ব, ২. স্ত্রী, ৩. সখা এবং ৪. আধ্যাত্মিক ধারা।

প্রথম ধারাটি একজন নারীকে তার স্বামীর সঙ্গে নিজেকে আদর্শের বন্ধনে বাঁধতে সাহায্য করবে এবং তাদের মধ্যে যুগল ভাবধারার উদ্রেক করবে। এর মাধ্যমে বিবাহিত সম্পর্কের হেন উন্নত দিক নেই যা এই যুগলের অধরা থেকে যাবে। যেমন, বিবাহিত সম্পর্কের চাহিদা অনুসারে একজন ভাল স্ত্রী হয়ে ওঠার জন্য আনুগত্য, সততা ও পাতিব্রত্য ছাড়াও সংসার চালনায় অনায়াস দক্ষতা, বাড়িঘরদোর পরিষ্কার রাখা, গুরুজনদের সেবা করা এবং সেই কারণে ওষুধপত্রের সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কথাও ধীরেন্দ্রনাথ এই সম্পর্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ভারতীয় নারীর এই আদর্শের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে তিনি একসুরে বেঁধেছেন এই মর্মে যে, ইউরোপীয় আধুনিকতায় নারীর দ্বিধাহীন প্রত্যুৎপন্নমতিত্বকে যে যে রূপে দেখা হয়, প্রাচ্যের সেবা ও সংসারের প্রতি দায়বদ্ধতার আদর্শ তারই অঙ্গ মাত্র।

স্ত্রী হিসাবে ভারতীয় আদর্শ নারীর স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের দ্বিতীয় দিকটির আলোচনায় ধীরেন্দ্রনাথ স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর শারীরিক সম্পর্কের এমন সব খুঁটিনাটি টেনে এনেছেন, বাঙালি জীবনে ইউরোপীয় আধুনিকতার ছোঁয়া লাগার আগে এই ভাবে যার খোলাখুলি আলোচনা কল্পনাতীত ছিল। ধীরেন্দ্রনাথ মহিলাদের ঋতুকালীন সমস্যা থেকে গর্ভধারণের বিভিন্ন দিক নিয়ে স্বামীর সঙ্গে আলোচনা বাধ্যতামূলক বলে বর্ণনা করার পর দাবি করেছেন যে এর মাধ্যমে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্ক আরও গভীর সুরে সাধিত হবে যার মূল সুর বাঁধা থাকবে বিজ্ঞানসম্মত আধুনিকতার সঙ্গে। এ ক্ষেত্রে স্পষ্ট যে বিদেশি শাসকদের দেশীয় গার্হস্থ্যসম্পর্ক সম্বন্ধে অশিক্ষা ও কুসংস্কারের জালে বাঁধা পড়ে থাকা নিয়ে যে বদ্ধমূল

ধারণা তার সমুচিত জবাব দিতেই উঠে পড়ে লেগেছেন ধীরেন্দ্রনাথ এবং সে কারণে তিনি তাঁর কাল্পনিক স্বামী ও স্ত্রীর চরিত্রগুলিকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার মধ্য দিয়ে গার্হস্থ্যধর্ম পালনে উদ্যোগী করে তুলেছেন। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য, গর্ভধারণ ও ঋতুকালীন বিষয় সম্বন্ধে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর এই খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে উচ্চবর্গীয় আদর্শ মেনে বিবাহ ও গর্ভধারণের আদর্শগুলি স্বামীটি তার স্ত্রীকে বুঝিয়ে দিতে সমর্থ হলে স্ত্রীজাতি আর তার সন্তানধারণের ক্ষমতার অপব্যবহার করবে না। বস্তুত, এই আশঙ্কায় সদাই তটস্থ থাকতেন সমাজের উচ্চবর্গীয় কর্তাব্যক্তিরা। এ ক্ষেত্রে গর্ভধারণ ও ঋতুকালীন প্রসঙ্গে আলোচনা কোনও স্ত্রীর আর তার সমবয়স্কা অশিক্ষিত মেয়ে বন্ধু বা মা-মাসিদের সঙ্গে করার প্রয়োজন থাকবে না, স্বামী এইখানে একাধারে তার গর্ভের রক্ষক ও সেই সংক্রান্ত সুপরামর্শদাতা সখা হয়ে উঠবে। এই সব আলোচনার বিজ্ঞানসম্মত দিকগুলি সম্বন্ধে শিক্ষিত স্বামী তার স্ত্রীকে শিক্ষিত করে তুললে নারীর পক্ষে গর্ভধারণ ও ঋতুকালীন সমস্যার আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বিহিত সম্ভব হবে যার দ্বারা উপনিবেশিক শাসকদের দৃষ্টিতে অশিক্ষিত ও সংস্কারাচ্ছন্ন ভারতীয় হিসাবে তাদের যে দুর্নাম তা ঘুচিয়ে ফেলার একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা যাবে। সেই সঙ্গে স্ত্রীর গর্ভের উপর স্বামীর একচ্ছত্র আধিপত্য, যা বর্গীয় ভাবধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত, সহজেই আরও জোরদার হয়ে দাঁড়াবে। একই সঙ্গে, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রসূতি ও মায়ের যত্নে যে উন্নত স্বাস্থ্যের সন্তান লাভ হবে তাতে বাঙালি ভদ্রলোকের রমণীসুলভ দুর্বল ও নমনীয় শারীরিক ধাঁচ বদলে ফেলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে উন্নততর শারীরিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ঔপনিবেশিক শাসকের মুখোমুখি তারা হতে পারবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কর্মক্ষেত্রে উপনিবেশিক শাসকের চোখে চোখ রেখে দাবি আদায়ের যে-ভঙ্গি ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে স্বায়ত্ত শাসনের দাবিতে পরিণত হয়েছে, সেই লড়াইয়ে জয়ের সম্ভাবনা আরও দৃঢ় হওয়ার পিছনে বাঙালির শারীরিক গঠনের পরিবর্তনের দিকটি এক বহু আকাঙ্ক্ষিত চেহারা নিয়েছিল। আর এ আকাঙ্ক্ষার আসল রূপকার হলেন বাঙালি নারীকুল যাঁরা সার্বিক ভাবে সুস্থ ও পেশিবহুল আদর্শ পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রয়োজনে সমাজকে আদর্শ সৈনিক-পুত্র উপহার দেওয়ার মাধ্যমে হয়ে ওঠেন আদর্শ মা ও নারী।

ধীরেন্দ্রনাথের মতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের তৃতীয় সুরটি বাঁধা আছে সখ্যতার বন্ধনে, যেখানে এক আদর্শ স্ত্রী তার সমস্ত সত্তাকে স্বামীর মধ্যে বিলীন করে দিয়ে স্বামীর সঙ্গে নিজের সম্পর্ককে এক আধ্যাত্মিক সখ্যতার জালে বেঁধে নেবে। ধীরেন্দ্রনাথের মতে স্ত্রী ও স্বামী উভয়েই যখন সব রকম ক্ষুদ্র স্বার্থকে দূরে সরিয়ে রেখে একে অন্যের ভিতরে এভাবে বিলীন হয়ে যাবে, একমাত্র তখনই স্বামীর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সম্পর্ক সেই উচ্চ তারে বাঁধা হবে যা পরিবার-জীবনে এক অপূর্ব দাম্পত্য সুরের সঞ্চার করে সমাজকে আরও স্থিতিশীল করে তুলবে। এ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই দাম্পত্যের মহান সুরে বাঁধা পড়ার কথা বলা হলেও, গর্ভধারণের গুরুদায়িত্ব যেহেতু স্ত্রীর উপর ন্যস্ত থাকে এবং সমাজকে তার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উপহার দেওয়ার সম্ভাবনা যেহেতু নারীর মধ্যেই নিহিত, উপরন্তু,

যেহেতু নারী তার স্বভাবগত দুর্বলতা ও অসাধু চরিত্রের জন্য পুরুষের তুলনায় নিকৃষ্ট— তাই এই সখ্যতার সম্পর্ক সার্থক করার দায় নারীর উপরেই বেশি বর্তাবে বলে নির্দ্বিধায় নিদান দিয়েছেন ধীরেন্দ্রনাথ।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের চতুর্থ দিকটি হল আধ্যাত্মিক, যেখানে যাবতীয় সামাজিক ক্ষুদ্র সমস্যার বেড়া টপকে এক ভারতীয় স্বামী তার ভারতীয় স্ত্রীর সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার নতুন এক সুরে বাঁধা পড়ে। এই সম্পর্ক জন্মজন্মান্তরের, মৃত্যুও এই সম্পর্ককে মলিন করতে পারে না, বিবাহিত সম্পর্কে বাঁধা পড়া এই নারী ও তার স্বামী জন্মজন্মান্তরের সঙ্গী হিসেবে এক চরম আধ্যাত্মিকতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সমাজজীবনে এক অপূর্ব সমন্বয় সৃষ্টি করে। বর্তমান জন্ম, পূর্ব জন্ম এবং পরজন্মের এই অসামান্য মেলবন্ধন অন্য যে-কোনও সমাজে অনুপস্থিত, যেহেতু সেখানে বিবাহ কেবলমাত্র বর্তমান জন্মের গতানুগতিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেই সব সম্পর্ককে এক লহমায় অনেক দূরে ঠেলে ভারতীয় বৈবাহিক সম্পর্ক উপনিবেশিক শাসকের যাবতীয় সমালোচনাকে নস্যাৎ করে এগিয়ে যায় পার্থিবতার ক্ষুদ্রতা ছাড়িয়ে আধ্যাত্মিকতার মহান জগতে, দেশীয় সমাজ ও তার সামাজিক অনুশাসন সম্পর্কিত সমস্ত সমালোচনাকে ছুড়ে ফেলে। ব্রিটিশ নারী ও পুরুষের সম্পর্ক যেখানে শুধুমাত্র একটি জীবনেই সীমাবদ্ধ, সেখানে আধ্যাত্মিকতার রসে সিঞ্চিত ভারতীয় নারী-পুরুষের প্রেম ও বৈবাহিক জীবন জন্ম-জন্মান্তরের— পারিবারিক জীবনের এই মহানতা সমাজজীবনেও দেশীয় গোষ্ঠীর হাতিয়ার হয়ে অশিক্ষা, কুসংস্কারের অভিযোগে জর্জরিত এক সমাজকে এক লহমায় এমন এক স্তরে উন্নীত করে দেয় যে স্বায়ত্ত শাসনের দাবিকে তা আরও জোরদার করে তোলে।

আদর্শ নারীর যে যে উপকরণ এতক্ষণ ধীরেন্দ্রনাথের লেখনীর সূত্রে আলোচিত হল তাতে আদর্শ এক নারী আর শুধু সমাজব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম একক যে পরিবার তার নয়, কুল বা বংশ, যা নারীর যথাযথ পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়ার ওপর নির্ভরশীল, সেই কুল ও বর্গেরও শুধু নয় সে, সে আরও বৃহত্তর স্বার্থে নিবেদিত। এ ক্ষেত্রে নারীর উপর দায়িত্ব এক নতুন এবং স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলার। অন্যান্য সবক্ষেত্রে বিদেশি শক্তির হাতে পরাজিত ভারতীয় পুরুষ তার জয়ের স্মারক হিসাবে দেখাবে তার অন্দরমহলকে, যেখানে তাদের মা ও স্ত্রী এক মহান আদর্শের ধারক হিসাবে প্রতিযোগী অন্য সব সমাজের নারীদের থেকে মহান। তাই বহির্জগতে সব হারিয়ে অন্দরের এই মহৎ শক্তির গরিমায় উজ্জ্বল ভারতীয় পুরুষ স্বায়ত্ত শাসনের দাবি করবে নতুন উদ্যমে।

এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, তাদের নারীকে মহত্তের উচ্চতম স্তরে উন্নীত করতে ভারতীয় পুরুষের যে-ভদ্রলোক গোষ্ঠী তৎপর ছিল সব চাইতে বেশি, তারা প্রথমত কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রতি ব্রিটিশ শক্তির অবমাননাকর আচরণের প্রতিবাদ স্বরূপ চেয়েছেন অন্দরমহলে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে এবং সেই উদ্দেশ্যে স্ত্রীদের এক নতুন স্তরে নিয়ে যেতে, যেখানে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ তাদের এই স্ত্রীদের আসল নিয়ন্ত্রণকর্তা কিন্তু তাঁরা অর্থাৎ পুরুষেরাই। পৌরাণিক ও মহাকাব্যের নারীদের উদাহরণ টেনে বার বার ভারতীয় নারীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ

করে এই পুরুষেরাই তাই দেখিয়েছেন, দুর্গা তা তিনি যতই দশভূজা দশপ্রহরণধারিণী হয়ে অসুরের মোকাবিলা করুন না কেন, তাঁর আসল পরিচয় তিনি মহাদেবের স্ত্রী। সীতা যাবতীয় স্থৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে মহাকাব্যের অবিস্মরণীয় নায়িকা হলেও তাঁরও প্রধান পরিচয় তিনি রামচন্দ্রের স্ত্রী। তাই নারীশক্তিকে দুর্গা, কালী বা সীতার আদর্শে বলীয়ান করে ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে আত্মমর্যাদার দরাদরির পথ সুগম করে নেওয়া ভারতীয় ভদ্রলোক শ্রেণি নারীকে একাধারে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দিয়েছে, অন্য দিকে পুরুষশক্তির কাছে তাকে চিরকাল পরাধীন রেখে সুচতুরভাবে, স্বায়ত্ত শাসনের দাবির পাশাপাশি, বর্গীয় অনুশাসনকেও অক্ষত রেখেছে। প্রথম দিকে এই দরাদরি কেবলমাত্র কর্মক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায়ে ব্যবহার করা হলেও, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণির মধ্যে জোরদার হয়ে উঠতে না উঠতেই, নারীশক্তির এই তথাকথিত অসামান্য রূপটিকে ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে স্বায়ত্ত শাসন সংক্রান্ত দর কষাকষিতে কাজে লাগাতে দেরি হয়নি।

এ ক্ষেত্রে আরও যা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য তা হল, নারীশক্তির বলে বলীয়ান শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকের উচ্চবর্গের বা (আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে) ব্রাহ্মণ্যবাদের আদর্শকে বজায় রাখার বিষয়টি। আদর্শ নারী তার শুচিতা অশুচিতার বা ন্যায় অন্যায়ের ভাবনায়, উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের বিভাজনের পথটি আরও সুগম করেছে আমরা/ওরা— এই চিরপরিচিত binary-টির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। যেখানে binary-টির বাঁ দিকের এককটি অর্থাৎ 'আমরা' তার শ্রেষ্ঠত্বের আলোকে ডান দিকের একক অর্থাৎ 'ওরা'-র নিকৃষ্টতাকে সূচিত করে ব্রাহ্মণ্যবাদের মহানতাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে বারংবার। আর নারীর গর্ভকে সুরক্ষিত ও শুচি রাখার আপ্রাণ চেষ্টায় ঋতুমতী হওয়ার আগে তার বিবাহ আবশ্যিক করার সামাজিক আদেশ, ঋতুমতী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার কোলে পুত্র সন্তানের নিদান ইত্যাদির মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদের বেঁধে দেওয়া উচ্চবর্গীয় সামাজিক অনুশাসনেরই জয় সুনিশ্চিত হয়েছে। এই চিন্তাধারায় কন্যাকে ঋতুমতী হওয়ার আগে বিবাহ না দিলে তা পদস্খলনের সম্ভাবনা থেকে যায়, যা পরবর্তী বর্গীয় নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বর্গীয় নিয়মের বাইরে গিয়ে সন্তান উৎপাদনের মাধ্যমে সামাজিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে পারে। কন্যাকে তাই সঠিক বয়সে সঠিক পাত্রের হাতে তুলে দিয়ে তার গর্ভকে সুরক্ষিত করার কথা বার বার বলেছে বাংলা গার্হস্থ্য নির্দেশাবলী এবং তৎকালীন নারীবিষয়ক বাংলা পত্র-পত্রিকা; আর সেই কারণেই কন্যার বিবাহের বয়সবৃদ্ধি সংক্রান্ত আইন বা সহবাস আইন নিয়ে তোলপাড় হয়েছে সমাজে।

কন্যার গর্ভের অধিকার পুরুষের হাতে থাকা মানেই সমাজে বর্গ ও বর্ণ সংকীর্ণতাজনিত ভেদাভেদ বজায় রেখে উচ্চতর এক জীবনযাত্রা সুনিশ্চিত করা। সঠিক সময়ে সঠিক পাত্রের হাতে কন্যাকে অর্পণ করা তাই সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত কাম্য, অন্যথা সমাজে বিশাল বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, ঠিক যে-ভাবে জাতীয় রাষ্ট্রের দাবিতে আদর্শ নারীর ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সমাজের উচ্চবর্গ তাদের একাধিপত্য সুনিশ্চিত করতে চেয়েছে, সেই একই আদর্শের অনুসরণ করে সমাজের নিম্নবর্গ তাদের

বঞ্চনার ইতিহাসের গতি পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে পার্থ চ্যাটার্জির বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে আমরা দেখাব, উনিশ শতকের 'নারীবিষয়ক প্রশ্ন' হিসাবে-খ্যাত বিষয়গুলি ভদ্রলোক গোষ্ঠীর নারীর তৎকালীন সামাজিক অবস্থানের উন্নয়নে ব্রতী হওয়ার ফলে যে-রাজনীতির সূচনা করেছিল, নানাবিধ সমাজসংস্কারের মাধ্যমে তা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের এক বিশিষ্ট রূপ পেয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়নি। বরং সমাজের অন্য স্তরে অন্য রূপে তা আত্মপ্রকাশ করেছিল। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যের একমুখিতা ব্রাহ্মণ্যবাদী ভাবধারারই ফসল বলা যায় এক অর্থে। সমাজের নিম্নবর্গের মানুষও যে উচ্চস্তরে উন্নীত হওয়ার আশায় একই ব্রাহ্মণ্যবাদের অস্ত্র শানিয়েছিল তাদের প্রতিপক্ষ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে— এই কথাটি তাঁর ব্যাখ্যায় অনুচ্চারিত থেকে গেছে। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে নিম্নবর্গের কিছু পত্রিকায় নারীবিষয়ক লেখার পর্যালোচনার ভিতর দিয়ে আমরা সেই সত্যেরই উদ্ঘাটন করব।

সমাজের উচ্চবর্গীয় মানসিকতায় পুষ্ট ভদ্রলোক গোষ্ঠীর মধ্যে যেমন এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল যে, তাদের নারীসমাজের উন্নয়নই তাদের উন্নতির সব চাইতে শক্তিশালী অস্ত্র এবং ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে কর্মজগতে ও পরবর্তীতে স্বায়ত্ত শাসনের দাবির দরকষাকষির একমাত্র হাতিয়ার, ঠিক তেমনি সমাজের নিম্নবর্গীয় গোষ্ঠীর কাছেও তাদের নারীসমাজের উন্নয়ন ছিল শ্রেণি-বিন্যস্ত সমাজে উপরে ওঠার অন্যতম সিঁড়ি। নিম্নবর্গীয় পত্র-পত্রিকাগুলি এই সব মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার মুখপাত্র হয়ে উঠে যখন প্রকাশ পেতে শুরু করে, উনিশ শতকের প্রায় শেষার্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তখন প্রবল ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়েছে বাংলার ঘরে ঘরে। আর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সেই আবেগের হাত ধরে এক আদর্শ সমাজ গড়ার ডাক দিয়ে এই নিম্নবর্গীয় পত্রিকাগুলি বলছে এক মহান বর্গীয় সমাজের কথা যেখানে উচ্চবর্গীয় মানুষ নিম্নবর্গের মানুষকে অবহেলার চোখে দেখে না। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, কোনও নিম্নবর্গীয় সমাজই এই বর্গীয় বিভিন্নতা একেবারে মুছে ফেলার ডাক দেয়নি প্রধানত কয়েকটি কারণে। প্রথমত, কোনও নিম্নবর্গীয় সমাজই তাদের সামাজিক অনুশাসন ও বিভিন্নতাকে ব্রাহ্মণ্যবাদের তুলনায় নিম্নমানের বলে মানতে রাজি ছিল না। এঁরা প্রধানত, এক ধরনের বিশেষ সাম্যের কথা বলেছেন যাতে বিভিন্ন বর্গ তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখে সমাজে এক সঙ্গে সম্মানের জীবনযাপন করতে পারে, কোনও রকম ভেদাভেদ ছাড়াই। দ্বিতীয়ত, এ ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বর্গীয় বিভিন্নতাকে বৈদিক সভ্যতার প্রধান অবদান হিসাবে তুলে ধরা হয়েছিল, কেন না সেই অবদানকে অস্বীকার করলে স্বায়ত্তশাসনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে যে-ভারতীয়আনা গড়ে তোলার চেষ্টা ছিল তা দুর্বল হয়ে পড়ে। তা ছাড়া, ভারতীয় সমাজের ভেদাভেদকে সমাজে বিষময় অসাম্য সৃষ্টিকারী উপাদান বললে, ব্রিটিশ শক্তি তৎকালীন দেশীয় সভ্যতাকে পিছিয়ে-পড়া এক সমাজ বলে যে-অভিযোগের অবতারণা করেছিল তা-ও সঠিক বলে প্রমাণিত হয়ে যায়। বর্গীয় বিভাজনকে অক্ষত রেখে তাই নিম্নবর্ণের সমাজের উচ্চস্তরে উত্তরণের এই উদ্যোগের মূল হাতিয়ার ছিল তাদের মহিলারা।

যেমন মাহিষ্য সমাজ তাদের মুখপত্রে বলছে, "অতীতে আমরা স্ত্রীলোকদের অধীন করে রেখেছি...মানুষ হিসেবে নয় তাদের মেয়ে হিসেবে গৃহের অবরোধে বসিয়ে চরকা করিতে বাধ্য করিয়ে স্বরাজরূপ এত বড় বস্তু লাভ করা যাবে না। গেলেও সে থাকবে না" (*মাহিষ্য সমাজ*, আশ্বিন, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ)। নিম্নবর্গের নারীসমাজের উন্নয়নের প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিম্নবর্গীয় সমাজকে বর্গীয় বিন্যাসের উপর দিকে তুলে আনার সেই প্রচেষ্টা কতখানি উচ্চবর্গীয় আধুনিকতার মোড়কে ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবার সেটাই আমরা দেখব।

সদ্‌গোপ সমাজের একটি পত্রিকায় দেখা যাচ্ছে সমাজে তাদের নারীর অবস্থানের উন্নতিতে স্ত্রীশিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে একেবারে উচ্চবর্গের নারীমুক্তির ভাবধারার আদলে। লেখাটিতে বলা হচ্ছে, "নারী আর স্বামীর দাসী হতে চাইছে না— চাইছেন সহধর্মিণী হতে; সহকর্মিণী বা সঙ্গিনী হতে। এই সঙ্গিনী হওয়া বা সহকর্মিণী হওয়া শুধু মুখেই হওয়া যায় না। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে শিক্ষায়, ভাবে, চিন্তা করায় যেখানে আকাশ পাতাল প্রভেদ সেখানে নারীর প্রকৃত শিক্ষালাভ না হলে নূতন সমাজ গড়ে তোলা যাবে না, সমাজের অশুভ শক্তিও নির্মূল হবে না" (*সদ্‌গোপ পত্রিকা*, চৈত্র, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ)। অশুভ শক্তি বলতে এখানে স্পষ্টতই সমাজের বঞ্চিত শ্রেণির এই মানুষেরা বর্গীয়অসামঞ্জস্যউৎপাদনকারী সামাজিক রীতিনীতির দিকেই ইঙ্গিত করছেন। কিন্তু তা নির্মূল করতে নারী-শিক্ষাকে হাতিয়ার করতে চেয়েও, তার অপব্যবহার ঘটলে নিম্নবর্গের মধ্যেও প্রায় সমানভাবে প্রভাব বিস্তারী পুরুষতান্ত্রিকতার ভবিষ্যৎ কী হবে ভেবে তাঁরা তাঁদের উচ্চবর্গীয় পথ প্রদর্শকদের মতোই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। যেমন, *মাহিষ্য মহিলা* নামে মাহিষ্য সমাজের নারীবিষয়ক পত্রিকা ১৩২১ বঙ্গাব্দে জানাচ্ছে, "সমগ্র নারী সমাজের উন্নতি করতেই এই পত্রিকার অবতারণা, কেননা যে ভারত ললনা এক সময় সতীত্বের জন্যে জগতের মধ্যে আদর্শ স্থান অধিকার করিয়াছিল, যাহার দয়া দাক্ষিণ্য ও অতিথি সেবায় জগৎবাসী মুগ্ধ হত, যাহার প্রেমে ভক্তিতে স্নেহ মমতায় সংসারে স্বর্গীয় সুখ প্রবাহিত হত, পরোপকার্‌রূপ ব্রত পালনে যাহারা প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ মনে করত, সেই ললনা আজ বিলাস মদে মত্ত, কর্তব্য পথে ভ্রষ্ট" (*মাহিষ্য মহিলা*, ১৩২১, আশ্বিন-কার্তিক)। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, সমাজের উচ্চবর্গীয় ভদ্রলোকগোষ্ঠী ঠিক যে-ভাবে স্ত্রীদের শিক্ষিত করতে গিয়ে ইউরোপীয় আধুনিকতার ছোঁয়া-পাওয়া তাঁদের স্ত্রীজাতির উপর অধিকার হারানোর ভয়ে শঙ্কিত ছিলেন, সেই একই দুঃশ্চিন্তার ছাপ দেখা যায় সমাজের নিম্নবর্গীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে, যারা উনিশ শতকের শেষের দিকে জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে তোলার আদর্শে সামিল হয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজেদের অবস্থানের উন্নয়নেই ব্রতী হয়েছিলেন। *মাহিষ্য মহিলা* সহ অন্যান্য আরও নিম্নবর্গীয় পত্রিকায় নারীকে কোনও বিভাজন-সূচক বিশেষণে চিহ্নিত না করে 'হিন্দু নারী' হিসাবে বর্ণনা করে বলা হয়েছে, সীতা-সাবিত্রীর দেশ ভারতবর্ষ এবং সেই দেশের নারী ত্যাগ ও পরোপকারের আদর্শে বলীয়ান হয়ে পৃথিবীর সকল নারীগোষ্ঠীর থেকে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছে। এই নারীসমাজ উচ্চবর্গীয় গোষ্ঠীর অনুকরণে ব্রাহ্মণ্যবাদে সম্পৃক্ত হয়ে তাদের পালন কর্তা পুরুষগোষ্ঠীকে উন্নততর সেই অবস্থান লাভে সাহায্য করেছে যা উচ্চবর্গের পুরুষদের জাতীয়তাবাদী

আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ক্ষেত্রে নিম্নবর্গীয় নারীসমাজকে কীভাবে এই ব্রাহ্মণ্য রসে জারিত করে তাদের উচ্চবর্গীয় ভগিনীদের মতন জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন নিম্নবর্গীয় পুরুষগোষ্ঠী, তার উদাহরণ দেখা যায় *মাহিষ্য মহিলা*-তেই প্রকাশিত একটি লেখায়। সেখানে উচ্চবর্গীয় গার্হস্থ্য নিয়মাবলীর অনুকরণে এক স্বামী-স্ত্রীর কাল্পনিক কথোপকথনের মাধ্যমে নিম্নবর্গীয় নারীসমাজকে উন্নততর করার আপ্রাণ চেষ্টা লক্ষ করা যায়। কথোপকথনটি এই রকম: "নগেন: সরলা তোমাকে এত দিন ধরে যা বলা হল তাতে বেশ বুঝতে পেরেছ যে স্ত্রীলোকের পতিভক্তি ভিন্ন আর কোনও ধর্ম নাই। স্ত্রীলোকের এই গুণের নামই সতীত্ব। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী সকলেই এই গুণের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। এই সতী ধর্মই স্ত্রীলোকের একমাত্র অলঙ্কার। এই অলঙ্কার যার নাই তাকে লোকে ঘৃণা ব্যতিরেক আর কিছু করে না। নারীধর্ম নামক একখানি পুস্তকে এই নারীধর্ম সম্বন্ধে অতি সুন্দর ভাবে উপদেশ দেওয়া আছে; আজ তারই খানিকটা আমি তোমাকে পড়িয়ে শোনাব। আশা করি, তুমি এই উপদেশগুলি বেশ মনে রাখিতে চেষ্টা করবে; শুধু মনে রাখলেই চলবে না, যাতে কাজে পরিণত হয় সেই রকম করবে। আর যখন অবসর পাবে তখন বৃথা গল্পগুজব না করে পাড়ার মেয়েদের বেশ করে বুঝিয়ে দেবে" (*মাহিষ্য মহিলা*, ফাল্গুন, ১৩২১)।

এ ক্ষেত্রে সতীত্বের যে-আদর্শকে পাথেয় করে উচ্চবর্গীয়সমাজ প্রধানত নারীর গর্ভের উপর তাদের ক্ষমতা জাহির করতে ও বর্গ-শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে সফল হয়েছিল, নিম্নবর্গীয় সমাজ সেই ব্রাহ্মণ্য পুরুষতান্ত্রিক চেতনারই অনুকরণে তাদের নারীর গর্ভের উপর পুরুষমাত্রেরই অধিকার কায়েম করে সমাজে নিজেদের অবস্থানকে উন্নত করতে চেয়েছে। এক্ষেত্রে নারীর চরিত্র, তার অচলা পতিভক্তি ও পুত্রসন্তান উৎপাদন ক্ষমতাই তার শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিলি সমাজ যেমন সদর্পে ঘোষণা করেছে, "সন্তান উৎপাদন ও তাদের সঠিক পালনই নারীর একমাত্র ধর্ম হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ নারীই এই সত্য অনুধাবনে ব্যর্থ" (*তিলি বান্ধব*, বৈশাখ, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ)। এই একই সংখ্যায় পত্রিকাটিতে বলা হয়েছে সুস্থ, সবল পুত্রসন্তানের জন্ম ও সঠিক প্রতিপালনেই সেই গোষ্ঠীর সার্বিক সামাজিক উন্নয়ন নিহিত রয়েছে। *সদ্‌গোপ পত্রিকা* আরও এক ধাপ এগিয়ে ঘোষণা করেছে, মায়ের চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা, সঠিক শিক্ষা সন্তানের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, তাই আদর্শ মা ও আদর্শ নারী প্রতিটি সমাজের উন্নয়নের মূল সোপান (*সদ্‌গোপ পত্রিকা*, কার্তিক ১৩২৬ বঙ্গাব্দ)। আদর্শ পুত্রসন্তান তৈরির মাধ্যমে বর্গীয়, সামাজিক ও সর্বোপরি জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনার ওপর বারে বারে জোর দিয়েছে নিম্নবর্গীয় এই পত্রিকাগুলি। *সুবর্ণ বণিক সমাচার* যেমন একটি ইংরেজি আপ্তবাক্য স্মরণ করে বলেছে যে, পুত্রসন্তানের প্রকৃত শিক্ষা শুরু হয় তার মাতৃজঠরে (*সুবর্ণবণিক সমাচার*, ভাদ্র, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ)।

তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে নিম্নবর্গীয় মানুষদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের আদর্শ বহু ক্ষেত্রেই উচ্চবর্গীয় সমাজের মতন স্বায়ত্ত শাসনের চেহারা নেয়নি। উনিশ শতকের শেষার্ধে, সমগ্র সমাজে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রসারের ফলে যখন বিরাট টালমাটাল অবস্থা এবং

একের পর এক সমাজ-শোধনকারী বিষয় যখন প্রভাবিত করছে প্রধানত নারীসমাজকে, তখন সেই সব ঘটনাপরম্পরায় অনুপ্রাণিত হয়ে নিম্নবর্গীয় বহু গোষ্ঠী ব্রিটিশ শাসকসম্প্রদায়ের কাছে বিনম্র আবেদনের মাধ্যমে তাদের সমাজের দীর্ঘকালীন নিম্নাবস্থানের পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিল। এই আবেদন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল তাদের তুলনায় অগ্রসর ও ক্ষমতাশালী এক শাসকগোষ্ঠীর কাছে আর্জি, উচ্চবর্গীয় ভাবধারায় রঞ্জিত, সমাজে বিশেষ সুবিধা উপভোগকারী ভদ্রলোকগোষ্ঠীর মধ্যে উনিশ শতকের শেষে যে-সুর আর প্রায় দেখাই যায় না বলা চলে। ব্রিটিশ শক্তির ভালত্বের প্রতি উচ্চবর্গীয়গোষ্ঠীর বিশ্বাসে তখন ধীরে ধীরে ফাটল ধরেছে। তার সূত্রপাত উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে। তত দিনে ব্রিটিশ শক্তির কাছ থেকে যে যে সুবিধা উচ্চবর্গীয় ভাবধারায় উজ্জীবিত ভদ্রলোকগোষ্ঠীর পক্ষে আদায় করা সম্ভব ছিল তার প্রায় সবই আদায় করা হয়ে গেছে। উপরন্তু এই গোষ্ঠী এ কথা বেশ বুঝতে সমর্থ হয়েছে যে স্বায়ত্তশাসন পেলেই একমাত্র এর থেকে আরও বেশি উন্নয়ন তাদের গোষ্ঠীর পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব। নিম্নবর্গীয় গোষ্ঠীগুলি তখনও সমাজে তাদের নিম্নাবস্থার কারণে এই সুবিধাগুলি বিলেতি শাসকদের কাছ থেকে আদায় করতে পারেনি। যদিও, শাসকদের সমাজ সংস্কারকের চেহারা তাদের মনে এমন আশার সঞ্চার করেছিল যে, তাদের অবস্থানেও পাকাপাকি পরিবর্তন বোধহয় একমাত্র এই সরকারের দ্বারাই হবে। বিশেষত, জাতীয় গণনা বা সেনসাসে যখন ব্রিটিশ শক্তি উদ্যোগী হয়ে উঠল তখন নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্গীয় বিন্যাসে তাদের অবস্থান স্থায়ীভাবে উন্নত করার তাগিদ লক্ষণীয় হয়ে দাঁড়ায়। এই শক্তির প্রতি তাদের সুর তাই স্বভাবতই ছিল অন্য তারে বাঁধা। তবে সামাজিক অবস্থানগত বিবাদের মীমাংসায় রত এই গোষ্ঠী ব্রিটিশ শক্তির কাছে আবেদন জানাতে গিয়ে তাদের উন্নয়নের যে-নমুনাগুলি পেশ করেছেন তা একান্ত ভাবেই ব্রাহ্মণ্যবাদে সিঞ্চিত। সমাজে তাদের উন্নত অবস্থানের সূচক আদর্শনারী তাই সব সময় সীতা-সাবিত্রী না হয়ে বেহুলা হলেও, বলা হয়েছে বেহুলা সীতা-সাবিত্রীর থেকেও বড় সতী, বড় পতিব্রতা। আর সেটা তার যাবতীয় বিরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলা করে স্বামীর প্রতি অচঞ্চল আনুগত্যেই প্রমাণিত। গন্ধবণিক সমাজ তাদের নারীদের সীতা-সাবিত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত না হয়ে বেহুলার আদর্শ অনুসরণ করতে বলেছে এই বলে যে, "অন্য যে কোনও নারী তাহার সম্মুখে পতিভক্তিতে ছোট মনে হতে বাধ্য...যেভাবে স্ফীত, গলিত, কীটকুলিত, পূতিগন্ধ মৃত পতিকে ক্রোড়ে লইয়া বেহুলার যাত্রা" (*গন্ধবণিক*, পৌষ, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ)।

এই অচঞ্চল পাতিব্রত্য আসলে ব্রাহ্মণ্যবাদেরই নামান্তর, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নিম্নবর্গের মহিলাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিলুপ্তিকরণ তারই পরিচায়ক। এরই অন্তিম পরিণতি, সম্ভবত, একমুখী ব্রাহ্মণ্যবাদে রঞ্জিত অনন্য এক আদর্শনারীর ভাবনা, যা বর্গ নির্বিশেষে সব নারীর কাছেই হয়ে উঠেছিল অনুকরণীয়।

টীকা:

১. ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮) তাঁর *কলিকাতা কমলালয়* (১৮২৩), *নব বাবুবিলাস* (১৮২৫), *নব বিবি বিলাস* (১৮৩১) প্রভৃতি স্যাটায়ার ধর্মী গ্রন্থে মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত বাঙালি যেসব

পুরুষ ব্রিটিশ প্রশাসনে চাকরির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতেন, অথবা উপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্কে জড়িয়ে সমাজে প্রতিপত্তি বিস্তারে সমর্থ হয়েছিলেন— এই বিভিন্ন শ্রেণির বাঙালি যারা তাদের জীবনধারণ ও সামাজিক অবস্থানের জন্য ব্রিটিশ রাজশক্তির দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন, তাঁদের সকলকেই সঠিকভাবে 'ভদ্রলোক' এই এক নতুন নামে অভিষিক্ত করেন।

২. ধোপা রতনের গল্পটি এই রকম: কোনও এক ইংরেজ বণিক কলকাতার কোনও এক ঘাটে এসে অবতরণ করলে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে তার আলাপচারিতায় ভাষাজনিত সমস্যা এমন আকার নেয় যে সাহেবকে সমূহ বিপদে পড়তে হয়। এহেন অবস্থায় নেহাৎই ভাগ্যক্রমে ওই ঘাটে উপস্থিত রতন কোনওক্রমে আকারে ইঙ্গিতে সেই বণিকের বক্তব্য বুঝতে ও অন্যদের সেই বক্তব্য বোঝাতে সমর্থ হন। এর পরেই সেই ইংরেজ বণিকের দাক্ষিণ্যে গোটা কয়েক ইংরেজি শব্দ শিখে দোভাষীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন রতন। পরবর্তীতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিরাট ধনী রতন সরকার নামে যাঁর পরিচিতি।

৩. পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে ঊনবিংশ শতকে নারীর অস্তিত্ব বিষয়ক সমস্যাজনিত অবস্থানের পরিবর্তনের যে-আন্দোলন এক বিশাল ঢেউয়ের চেহারা নিয়ে বাংলার বুকে আছড়ে পড়েছিল তা সমাজের বিশেষ এক শ্রেণির পুরুষের নিজস্ব সমস্যা ও অভাব অভিযোগের মঞ্চ হিসেবে কাজ করেছিল মাত্র। এই অভাব অভিযোগের সুরাহা হতে শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এবং পাশাপাশি আরও বৃহত্তর দাবিদাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে (যা পরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চেহারা নেয়) সমাজের বিশেষ সুবিধাভোগী এই পুরুষগোষ্ঠীর নারীর অবস্থানজনিত সংস্কার আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনজনিত প্রভাব সমাজের বুক থেকে ধীরে ধীরে মুছে যায়। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যে যে দিকটি ভীষণভাবে অনুপস্থিত তা হল সমাজের কোনও একটি স্তরে সামাজিক কোনও সমস্যাজনিত আশা আকাঙ্ক্ষার আপেক্ষিক অন্তর্ধানের অর্থ এই নয় যে, সমাজের অন্যান্য সব স্তরেও এর প্রভাব একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। 'উইমেনস কোয়েশ্চেনস্' বা নারীর অবস্থানজনিত সমস্যা বিষয়ক আন্দোলন উচ্চবর্গীয় পুরুষদের কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়লেও সমাজের নিম্নবর্গীয় অন্যান্য গোষ্ঠীর কাছে এই একই সমস্যা ও দাবিদাওয়া কীভাবে তাদের অস্তিত্ব নির্ণায়ক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল তার কোনও আলোচনাই পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের এই ব্যাখ্যায় অনুপস্থিত। উচ্চবর্গীয় একমুখী এই আলোচনার প্রতি ঝোঁককে ব্রাহ্মণ্যবাদমুখিতার আর এক ফসল বলাটা সম্ভবত অত্যুক্তি হবে না (পার্থ চট্টোপাধ্যায়: ১৯৯০)।

গ্রন্থতালিকা

এই লেখার জন্য ব্যবহৃত প্রধান গ্রন্থাবলী, পত্র-পত্রিকা ও বিবিধ রচনা ছাড়াও লেখায় সরাসরি ব্যবহৃত হয়নি অথচ বিষয়টির মূল সুরকে প্রভাবিত করেছে এ রকম কিছু সহায়ক গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ও রচনার তালিকাও এখানে দেওয়া হল।

ইংরেজি গ্রন্থাবলী

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৯৯০) কাস্ট, পলিটিক্স এ্যান্ড দ্য রাজ: বেঙ্গল ১৮৭২-১৯৩৭ ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা, ডিপার্টমেন্ট অব হিস্টরি, মনোগ্রাফ নং ৫, সাউথ এশিয়া বুকস

—(১৯৯৭) কাস্ট, প্রোটেস্ট এ্যান্ড আইডেনটিটি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া: দ্য নমশূদ্রাস অব বেঙ্গল, ১৮৭২-১৯৪৭ (রিচমণ্ড: কার্জন প্রেস)

—(২০০১) 'ডিফারেনসিয়েশন এ্যান্ড ট্রানসিয়েন্স: হিস্টরি অব কাস্ট, পাওয়ার এ্যান্ড আইডেনটিটি ইন বেঙ্গল'। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) বেঙ্গল: রিথিংকিং হিস্টরি: এসেস ইন হিস্টরিওগ্রাফি (মনোহর: নিউদিল্লি)

—(১৯৯৪) 'ফ্রম অ্যালিয়েনেশন টু ইনটিগ্রেশন: চেঞ্জেস ইন দ্য পলিটিক্স অব কাস্ট ইন বেঙ্গল, ১৯৩৭-৪৭', দ্য ইন্ডিয়ান ইকনমিক এ্যান্ড সোস্যাল হিস্টরি রিভিউ। ভলিউম ৩১, নং ৩, জুলাই-সেপ্টেম্বর, পৃ. ৩৪৯-৯১
সুমন্ত ব্যানার্জি (১৯৮৯), দ্য পার্লর এ্যান্ড দ্য স্ট্রিটস: এলিটস এ্যান্ড পপুলার কালচার ইন নাইটিনথ সেঞ্চুরি ক্যালকাটা (ক্যালকাটা: সিগ্যাল বুকস)।
মেরেডিথ বর্থউইক, (১৯৮৪), চেঞ্জিং রোল অব উইমেন ইন বেঙ্গল ১৮৪৯-১৯০৫, (প্রিন্সটন, এন. জে: প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস)।
মন্দাক্রান্তা বোস, (২০০০), 'টেক্সচুয়াল কনফ্রনটেশনস উইথ ফিমেল ট্রান্সগ্রেশন ইন দ্য বেহুলা লেজেন্ড; মারিওয়ালা অফরেডি (সম্পাদিত), দ্য বানিয়ান ট্রি: এসেস অন আরলি লিটারেচার ইন নিউ ইন্ডো-আরইয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস: প্রেসিডিংস অন দ্য সেভেনথ ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন আরলি লিটারেচার ইন নিউ ইন্ডো-আরইয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস, ভেনিস, ১৯৯৭ (নিউ দিল্লি: মনোহর, ভলিউম-১)
জে. এইচ. ব্রুমফিল্ড (১৯৬৮), এলিট কনফ্লিক্ট ইন আ প্লুরাল সোসাইটি: টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি বেঙ্গল, (বার্কলে: ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস)।
সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, (১৯৯৫), চেঞ্জিং নোশনস অব কনজুগাল রিলেশনশিপস ইন নাইনটিস্থ সেঞ্চুরি বেঙ্গল', আর. কে. রায় (সম্পাদিত) মাইন্ড, বডি এ্যান্ড সোসাইটি (ক্যালকাটা: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস)।
উমা চক্রবর্তী, (১৯৯০), 'হোয়াটএভার হ্যাপেনড টু দ্য ভেদিক দাসী?' কে. সাংগারি এবং এস. ভেইদ (সম্পাদিত), রিকাস্টিং উইমেন (নিউ ব্রানসউইক: রাটগার্স ইউনিভার্সিটি প্রেস)
—(২০০৩), জেন্ডারিং কাস্ট: থ্রু অ্যা ফেমিনিস্ট লেন্স (ক্যালকাটা: স্ত্রী)।
পার্থ চ্যাটার্জি, (১৯৮৬), ন্যাশনালিস্ট থট এ্যান্ড দ্য কলোনিয়াল ওয়ার্ল্ড: অ্যা ডেরিভেটিভ ডিসকোর্স? (লন্ডন: জেড ফর দ্য ইউনাইটেড নেশনস ইউনিভার্সিটি)
—(১৯৯৬) টেকসট্স অব পাওয়ার: এমারজিং ডিসিপ্লিন্স ইন কলোনিয়াল বেঙ্গল, (ক্যালকাটা: সাম্য)
—(১৯৯০) 'দ্য ন্যাশনালিস্ট রেসলিউশন অব দ্য উইমেন্স' কোয়েশ্চেন', কে সাংগারি এ্যান্ড এস. ভেইদ (সম্পাদিত), রিকাস্টিং উইমেন (নিউ ব্রানসউইক: রাটগার্স ইউনিভার্সিটি প্রেস)
—(১৯৯৩), দ্য নেশন এ্যান্ড ইটস ফ্র্যাগমেন্টস: কলোনিয়াল এ্যান্ড পোস্ট কলোনিয়াল হিস্টরিস (নিউ দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস)
নিকোলাস. বি. ডিকস, (২০০১), কাস্টস অব মাইন্ড: কলোনিয়ালিজম এ্যান্ড দ্য মেকিং অব মর্ডান ইন্ডিয়া (প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস)
লীলা দুবে, (১৯৮৬), 'সিড এ্যান্ড আর্থ: সিমবলিজম অব বায়োলজিকাল রিপ্রোডাকশন এ্যান্ড সেক্সুয়াল রিলেশনস অব প্রোডাকশন', লীলা দুবে এবং অন্যান্য (সম্পাদিত) ভিসিবিলিটি এ্যান্ড পাওয়ার: এসেস অন উইমেন ইন সোসাইটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস)।
বিনয় ঘোষ, (সম্পাদিত) (১৯৮০), সিলেকশনস ফ্রম ইংলিশ পিরিওডিক্যালস অব নাইনটিস্থ-সেঞ্চুরি বেঙ্গল, ভলিউম ৩-৫, (ক্যালকাটা: প্যাপিরাস)।
রোনাল্ড ইন্ডেন, (১৯৭৬), ম্যারেজ এ্যান্ড র‍্যাঙ্ক ইন বেঙ্গলি কালচার (নিউ দিল্লি: বিকাশ পাবলিশিং হাউস)।
এস. এন. মুখার্জি, (১৯৭৭), ক্যালকাটা: মিথ এ্যান্ড হিস্টরি (ক্যালকাটা: সুবর্ণরেখা)
—(১৯৭৫) 'দলাদলি ইন ক্যালকাটা ইন নাইনটিস্থ সেঞ্চুরি', মডার্ন এশিয়ান স্টাডিস। (৯, ১)।
—(১৯৭৬) 'ভদ্রলোক ইন বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার: এন এসে অন দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং অব কাস্ট অ্যান্ড স্টেটাস', বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট, ভলিউম-১৮)
গোলাম মুরশিদ, (১৯৮৩), রেলাকট্যান্ট ডেব্যুট্যান্ট (রাজশাহী: রাজশাহী ইউনিভার্সিটি প্রেস)
ধীরেন্দ্রনাথ পাল, (১৯০৯), দ্য হিন্দু সায়েন্সেস অব ম্যারেজ (ক্যালকাটা: যতীন পাল)।
—(১৯১১), দ্য হিন্দু ওয়াইফ, (ক্যালকাটা: ফণীন্দ্রনাথ পাল)

তপন রায়চৌধুরী, (১৯৮৮), ইউরোপ রিকনসিডারড, (দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস)
সুমিত সরকার, (১৯৯৭), রাইটিং সোশ্যাল হিস্টরি (দিল্লি; নিউ ইয়র্ক: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস)।
তনিকা সরকার, (২০০১), হিন্দু ওয়াইফ, হিন্দু নেশন: কমিউনিটি, রিলিজিয়ন এ্যান্ড কালচারাল ন্যাশনালিজম (লন্ডন: হার্স্ট এ্যান্ড কোম্পানি)।
মৃণালিনী সিনহা, (১৯৯৫), কলোনিয়াল ম্যাসকুলিনিটি: দ্য 'ম্যানলি ইংলিশম্যান' এ্যান্ড দ্য 'এফিমিনেট বেঙ্গলী' ইন দ্য লেট নাইনটিস্থ সেঞ্চুরি (ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি প্রেস, ম্যানচেস্টার এ্যান্ড নিউ ইয়র্ক)।
জুডিথ. ই. ওয়ালশ, (১৯৯৭), ডোমেসটিসিটি ইন কলোনিয়াল ইন্ডিয়া, (নিউ দিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস)।
—(১৯৯৭), হাও টু বি দ্য গডেস অব ইওর হোম: অ্যান অ্যানথলজি অব বেঙ্গলি ডোমেস্টিক ম্যানুয়ালস (নিউ দিল্লি: ইওডা প্রেস)।

বাংলা গ্রন্থ

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৮৮৭), মা ও ছেলে, (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ)
হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৮৮৭), শিশু পালন সম্বন্ধে পিতামাতার প্রতি উপদেশ (কলকাতা: জি. পি. রায়)
সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, (২০০১), সরস্বতীর ইতর সন্তান (কলকাতা: অনুষ্টুপ)
ঈশ্বরচন্দ্র বসু, (১৮৮৪), স্ত্রীদিগের প্রতি উপদেশ, তৃতীয় সংস্করণ (কলকাতা: ভিকটোরিয়া প্রেস)
সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী, (১৯৯৮), অন্দরে অন্তরে: উনিশ শতকে বাঙালি ভদ্রমহিলা (কলকাতা: স্ত্রী)
নগেন্দ্রবালা দাসী, (মুস্তাফি) (১৯০৪), 'প্রয়োজনীয় প্রার্থনা', বামাবোধিনী পত্রিকা, পৃ. ১৯১-১৯২
—(১৯০৪) গার্হস্থ্য ধর্ম, (কলকাতা: খগেন্দ্রনাথ মুস্তাফি)
—(১৯০০) নারী ধর্ম, (কলকাতা: লেখক দ্বারা প্রকাশিত)
পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, (১৮৮৫), বাঙালি বউ, (কলকাতা: এ. কে. ব্যানার্জি)
গিরিবালা মিত্র, (১৮৮৮), রমণীর কর্তব্য, (কলকাতা: গিরিবালা মিত্র)
ধীরেন্দ্রনাথ পাল, (১৮৮৪), সঙ্গিনী, (কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশিং কোম্পানি)
—(১৯০৮), স্ত্রীর সহিত কথোপকথন, (কলকাতা: বৈষ্ণবচরণ বসাক)
গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, (১৮৮৪), গৃহলক্ষ্মী, দ্বিতীয় সংস্করণ (কলকাতা: গুরুদাস চ্যাটার্জি)

বাংলা পত্র-পত্রিকা

বামাবোধিনী পত্রিকা (১২৭০-১৩২৯ বঙ্গাব্দ)
গন্ধবণিক সমাচার (১৩২৯-১৩৩১ বঙ্গাব্দ)
মাহিষ্য মহিলা (১৩২১-১৩২৯ বঙ্গাব্দ)
মাহিষ্য সমাজ (১৩২৩-১৩২৯ বঙ্গাব্দ)
সদ্‌গোপ পত্রিকা (১৩৩৫-১৩৪০ বঙ্গাব্দ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ)
সুবর্ণ বণিক সমাচার (১৩২৩-১৩২৫ বঙ্গাব্দ)
তিলি বান্ধব (১৩২৬ বঙ্গাব্দ)
তিলির গৌরব (১৩২৪-১৩২৬ বঙ্গাব্দ)

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

বাংলার নারী: অতীত, বর্তমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ: আন্দোলনের রূপরেখা

না, বাংলার নারী আন্দোলনের কোনও সম্পূর্ণ রূপরেখা তুলে ধরা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কেবল দু'-একটি তরঙ্গ, বিভিন্ন যুগের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমরা বোঝার চেষ্টা করব। সাপ মইয়ের খেলার মতো মেয়েদের অবস্থার উত্থানপতন, এক পা অগ্রসর হয়ে দু'পা পেছানো এখানে বিশ্লেষণের বিষয়। অতীতের মধ্যে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত নিহিত আছে বলেই পিছন দিকে দৃষ্টিপাত প্রয়োজন।

পরিবর্তন যে ঘটেছে এবং তার অনেকটাই ইতিবাচক, সে কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। এক ঝলক তাকিয়ে দেখা যাক আজকের দিনের একমাত্র বৃহৎ শক্তির দিকে। ১৯৬৩-তে প্রকাশিত হয়েছিল বেটি ফ্রিডানের *The Feminine Mystique*, যা কিনা আধুনিক নারীবাদের এক ক্ল্যাসিক গণ্য হয়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের গোড়ার মার্কিন মিডিয়া ও বিভিন্ন লেখক, চিন্তাবিদ, সমাজপতিদের বক্তব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বেটি দেখিয়েছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দু'-এক দশক জুড়ে সবচেয়ে উন্নত পুঁজিবাদী দেশ নারীকে কীভাবে দেখত। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে আজকের ভাষায় তালিবানি বললে হয়তো একটু অত্যুক্তি হবে, কিন্তু খুব বেশি নয়। সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বোচ্চ পদের জন্য আজ রেসের মাঠে নেমেছেন এক নারী। হতে পারে, ভূতপূর্ব এক প্রেসিডেন্টের জীবনসঙ্গিনী হিসাবে, কয়েক বছর আগেকার 'ফার্স্ট লেডি' হিসেবে তিনি কিছুটা বাড়তি সুবিধা ও সম্মানের অধিকারিণী। কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ নয়। অন্তত ফ্রিডানের লেখায় যে অন্ধকার যুগের চিত্র ফুটে ওঠে, তাতে যে-কোনও সম্বন্ধ বা সামাজিক অবস্থান নারীজন্মের 'অপরাধ' খণ্ডন করতে পারত না। রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার স্বপ্ন দেখা দূর স্থান, কোনও রকম উচ্চশিক্ষা, পেশা, চাকরি তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। ঠিক তালিবানি মতে আইন প্রণয়ন না-করলেও সমাজপতি ও ধর্মনায়করা এ ব্যাপারে ফতোয়া জারি করেছিলেন। সে দিক থেকে দেখতে গেলে চার দশকের মধ্যে এই অগ্রগতি বিস্ময়কর বইকী। যেমন বিস্ময়কর হিলারির প্রতিদ্বন্দ্বী ওবামার এতখানি উঠে আসা। ওবামা আংশিক ভাবে অ-শ্বেতাঙ্গ। মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রে অ-শ্বেতাঙ্গদের ষাটের দশক পর্যন্ত নাগরিক সুলভ সমান মর্যাদা দূরে থাক, মানুষের মর্যাদা দেওয়া হত না। এটাও একটা অগ্রগতির লক্ষণ বইকী। যদিও বর্ণ, শ্রেণি ও লিঙ্গভিত্তিক সাম্য এখনও বহু দূরে।

কিন্তু এই অগ্রগতি সরলরেখায় হয়নি। আশির দশকে প্রেসিডেন্ট রেগানের আমলে রাজনীতি ও অর্থনীতির মতো নারীবাদের ক্ষেত্রেও মার্কিন সমাজ ও রাষ্ট্র কিছুটা পিছু হটেছিল। দাবি উঠেছিল, শ্বেতাঙ্গ পুরুষরাই এখন অবহেলিত, নির্যাতিত। অভিযোগের আঙুল তোলা হয়েছিল নারী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীদের বিরুদ্ধে। যথারীতি ধর্মগুরুরা সোচ্চার হয়েছিলেন। এমনকী স্বয়ং বেটি ফ্রিডান বলেছিলেন, নারীবাদীদের এবার হয়তো একটু অন্য ভাবে ভাবা উচিত। ওই 'ব্যাকল্যাশ' ষাটের দশকের প্রাপ্তি নাকচ করে দেবে কিনা, এমন সংশয় কারও কারও মনে দেখা দিয়েছিল। হিলারি ক্লিন্টনের হোয়াইট হাউস দখলের ক্ষেত্রে নামা হয়তো এ হেন সন্দেহ আংশিক ভাবে দূর করেছে।[১]

বাংলার নারীদের কথা বলতে গেলে এক নজরে দেখতে হয় দক্ষিণ এশিয়ার ঐতিহ্য। বৈদিক যুগে নারীদের প্রভূত সম্মান ছিল, এ হেন দাবি প্রায়ই করা হয়। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আংশিক ভাবে সত্য।[২] বৈদিক যুগ ক্ষুদ্র সময় পরিসর জুড়ে ছিল না। এই দীর্ঘকাল ধরে অনেক বিবর্তন ঘটেছিল আর নারীদের অবস্থার অবনতি ঘটেছিল বলেই মনে হয়। তবে গার্গী, মৈত্রেয়ী, লীলাবতীর কথা আমরা শুনেছি, যেমন শোনা গেছে নারী যোদ্ধাদের কথা। মধ্যযুগে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি প্রথা, সতীদাহের ব্যাপক প্রচলন নারীদের জীবন সুখে ও সম্মানে ভরে তোলেনি। একাদশ শতাব্দীর পর্যটক পণ্ডিত আল বেরুনি মন্তব্য করেছেন, বিধবাদের বেছে নিতে হত সহমরণ ও চরম দুরবস্থায় জীবনযাপনের মধ্যে। বেরুনি অবশ্য পঞ্জাবের প্রত্যক্ষদর্শী। তবে বাংলা সম্বন্ধেও তাঁর বক্তব্য প্রযোজ্য বলেই মনে হয়।

অন্য দিকও একেবারে ছিল না তা নয়। কোনও কোনও রাজা বা সম্রাট নারী রক্ষীদের রাখতেন। রাজ পরিবারের মেয়েরা অনেক সময় অস্ত্রশিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষা করতেন। আলাওলের বিখ্যাত কাব্য *পদ্মাবতী*তে আছে: "পঞ্চম বৎসর যবে হইল রাজবালা/বিদ্যা শিখিতে তারে দিল পাঠশালা।/মহান পণ্ডিত হইল কন্যা গুণবান।" পুঁথি সাহিত্যের জৈগুণ বিবি প্রমুখ নায়িকারা যেমন বিদুষী তেমনি বীরাঙ্গনা। এ সব কাহিনিকে নারী মুক্তির দর্পণ হয়তো বলা যেত, যদি তার সঙ্গে যুক্ত না হত হামজা বা হানিফার মতো নায়কের বহুবিবাহের অভিযোগ![৩]

অপেক্ষাকৃত নিচু শ্রেণির মেয়েদের নানা কার্যকলাপ বা পেশার বিষয়েও আমরা কিছু তথ্য পাই।

> নারীরা নানা ভাবে জীবিকা উপার্জন করতেন। চর্যাগীতিতে (সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী) ডোমণীদের কথা আছে: নিম্নশ্রেণীর এই মেয়েদের কেউ কেউ তাঁত বিক্রি করত, বিক্রির জন্য চাঙারি তৈরি করত... শুন্ডিনীরা মদ চোলাই করত। নৃত্যগীতবাদ্য ও অভিনয়কলার সঙ্গেও নারীরা সম্পৃক্ত থাকতেন...[৪]

মেয়েরা পসারিণির ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হত। মঙ্গলকাব্যে নিষাদ বধূ ফুল্লরা মাংস বিক্রি করে। মালিনী ও গয়লানিরা বেচাকেনা করে। ঈশ্বরী পাটনী পুরুষ না নারী, তা নিয়ে আজও বিতর্ক অব্যাহত। বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*-এ স্বয়ং রাধা সঙ্গিনীদের নিয়ে নিত্য বিকিকিনি করেন। এ সব বাস্তবেরই প্রতিফলন। তেমনটা ধরে নেওয়া যায়।

যে যুগে জীবন ও সমাজের অনেকটাই ছিল ধর্ম পরিচালিত, ধর্মক্ষেত্রে সেখানে মেয়েদের স্থান তাদের সামাজিক অবস্থানের চিহ্ন বহন করে। হিন্দু মুসলমান কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যেই নারীকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেওয়া হয়নি। এখনও হয় না। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক মুসলমান মহিলা ধর্মীয় সমাবেশে ইমাম, অর্থাৎ প্রধানের কাজ করে শোরগোল তুলেছেন। ধর্মধ্বজরা ফতোয়া দিয়েছেন। নারীরা কেবল নারীদের সমাবেশে ইমাম হতে পারবে। মিশ্র সমাবেশে নয়। সেমিটিক ঈশ্বর অবশ্য চিরকাল পিতৃপ্রতিম, পিতৃতান্ত্রিক, যদিও লিঙ্গের উর্ধ্বে। ইদানীং অবশ্য কোনও কোনও পশ্চিমা নারীবাদী She বলে ঈশ্বরের উল্লেখ করছেন। কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রে দুর্গা, কালীর মতো মহা শক্তিধারিণী দেবীদের উপস্থিতিও মেয়েদের বিশেষ ক্ষমতায়ন ঘটায়নি। পুরোহিতরা অধিকাংশ পুরুষ। মেয়েরা বড়জোর পাঁচালি পড়ে লক্ষ্মী পুজো করে বা বার ব্রত। কিন্তু মধ্যযুগে বৈষ্ণবদের মধ্যে কোনও কোনও নারী শাস্ত্র পাঠ করতেন, এমনকী লিখতেন। তাঁদের শিষ্যও ছিল। এদের মধ্যে স্থান দেওয়া যায় শ্রীচৈতন্যের নিকটতম অনুগামীদের পরিবারের কয়েকজন নারীকে। জাহ্নবী, সত্যভামা, হেমলতা, হটী ও হটু বিদ্যালঙ্কার। মধ্যযুগ থেকে আধুনিকতার দোরগোড়া অবধি বেশ কয়েকজন বিদুষী ও প্রভাবশালিনী নারীর নাম চোখে পড়ে। কিন্তু এটা কি নিয়ম না ব্যতিক্রম?

বৈষ্ণবদের মধ্যে নারীশিক্ষার ঐতিহ্য অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল। হয়তো পরেও। বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবনীতে দেখি, সাধারণত বাংলায় দুই শ্রেণির নারীদের লেখাপড়া শেখানো হত, বিশেষ উদ্দেশ্যে। জমিদার বাড়ির মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হত, যাতে তারা দরকার হলে পারিবারিক বিষয় সম্পত্তি দেখভাল করতে পারে। আমাদের মনে পড়ে রানি ভবানী বা রানি রাসমনির কথা। আর বৈষ্ণব মেয়েদের পড়ানো হত, শাস্ত্র চর্চার উদ্দেশে। অনেক দিন পর্যন্ত বৈষ্ণবীরা সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের 'প্রাইভেট টিউটর' বা ভ্রাম্যমান গভর্নেসের কাজ করত। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও তাদের আনাগোনা ছিল। রবীন্দ্র-ভগিনী, লেখিকা ও সমাজসেবিকা স্বর্ণকুমারীদেবী নিজের বাল্যস্মৃতি প্রসঙ্গে একথা জানিয়েছেন। এই বৈষ্ণবীরা বাংলা, সংস্কৃত ও কীর্তন শেখাত।

সময় এক হাতে যা দেয়, অন্য হাতে কেড়ে নেয়। অগ্রগতি নামক মুদ্রার অন্য দিকও থাকতে পারে না তা নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্য, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত বাঙালি কি অতীতের অনেক কু-রীতি, কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে কিছু মূল্যবান বস্তুও ত্যাগ করেছিল? আধুনিক শিক্ষা কি বৈষ্ণবী গৃহশিক্ষিকা, মেয়েদের তরজা গান, মেয়েদের কবির ই ইত্যাদিকে জনমানস ও জনজীবন থেকে বিতাড়িত করেছিল? এমন প্রশ্ন তুলেছেন কোনও কোনও যুগ বিশেষজ্ঞ।[৫]

বাংলার রেনেসাঁস কী ছিল, কেমন ছিল, আদৌ তেমন কোনও বস্তু ছিল কি না, রেনেসাঁস অর্থই বা কী, বাংলার ক্ষেত্রে কী মরেছিল আর পুনর্জীবিত হয়েছিল (রেনেসাঁস বলতে পুনর্জীবন বোঝায়), তা নিয়ে অজস্র বিতর্ক আজও চলছে ও বহুদিন চলবে মনে হয়। আমরা কেবল প্রশ্ন তুলব, বাংলার রেনেসাঁস, খাঁটি হক, মেকি হক, বঙ্গ নারীর জন্য কী করেছিল? অন্য ভাবে দেখতে গেলে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দু'-এক দশক থেকে শুরু করে শতাব্দী খানেকের মধ্যে মেয়েদের কী উন্নতি হয়েছিল বা হয়নি।

হয়েছিল যে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। দুই শতাব্দীতে মেয়েরা যতখানি মুক্তি পেয়েছিল, সামনে এগিয়েছিল, তেমন বোধ হয় পূর্ববর্তী দু'-হাজার বছরে হয়নি। কিন্তু আমরা দেখেছি, অগ্রগতি সরলরেখায় হয়নি। শত্রুমিত্রদেরও একেবারে সাদায় কালোয় ভাগ করা যায় না। একজন হয়তো এক দিক থেকে পশ্চাৎগামী, অন্য দিকে প্রগতিশীল। অবশ্য কোন দিকে সাদা আর কোথায় কালোর পাল্লা ভারী তা বোঝা যায়।

সে যুগে নারী-অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় ছিল সুবিদিত, স্বতঃসিদ্ধ। সতীদাহ, সতীদাহ নিষিদ্ধ হওয়ার পর বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ। উপযুক্ত স্ত্রীশিক্ষার অভাব। আর সব কিছুর মূলে মেয়েদের অর্থনৈতিক পরাধীনতা। যদিও এ কথাটার উপর সবাই জোর দিত না।

রামমোহন সতীদাহ রদ করিয়েছিলেন, বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ আইন পাশ করিয়েছিলেন, বহুবিবাহ বিরোধিতা করেছিলেন, ব্রাহ্ম সমাজ স্ত্রীশিক্ষা ও (আপেক্ষিক) স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন, এ সব কথা কে না জানে। আবার বিরোধী পক্ষও কম জোরদার ছিল না। তাদের কী বলা যায়? রেনেসাঁসের অঙ্গ, না কি অ্যান্টি রেনেসাঁস? বিরোধীদের কারও কারও মধ্যে ইতিবাচক কিছু ধারা দেখা যেত না তা নয়। রাধাকান্ত দেব ইতিহাসে বিখ্যাত বা কুখ্যাত হয়েছেন সতীদাহের সমর্থনে রামমোহনের সঙ্গে লড়াই করে আর বিধবা বিবাহ আইনের বিরোধিতা করে। হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিওকে বহিষ্কারের অক্ষয় কীর্তি তো ছিলই! রাধাকান্তের পক্ষে কেউ কেউ অবশ্য যুক্তি দিয়েছেন যে, আসলে রাধাকান্ত সতীদাহের পক্ষে ছিলেন না। কেবল ভারতীয়দের সামাজিক ব্যাপারে বিদেশি শাসকদের হস্তক্ষেপ অপছন্দ করতেন। এই যুক্তি খুব জোরদার নয়। কারণ ব্রিটিশ প্রশাসনকে বাদ দিয়ে, আইন পাশ না করেই সতীদাহ যাতে বন্ধ হয়, এমন কোনও উদ্যোগ রাধাকান্ত নিয়েছিলেন বলে আমরা জানি না। তেমন হলে কি রামমোহন অখুশি হতেন? তিনি তো এটাই চেয়েছিলেন। কিন্তু রাধাকান্তকেও পুরোপুরি নারীবিদ্বেষী বলা যাবে না। তিনি নারীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। সে জন্য কিছু চেষ্টাও করেছিলেন। তাঁর মত ছিল, বাইরের স্কুলকলেজ নয়, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা বাড়ির অভ্যন্তরে পাঠশালায় লেখাপড়া করবে। মেয়েদের শিক্ষিত করা আর সিঁথির সিঁদুর মুছে গেলে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা, দুয়ের মধ্যে তিনি স্ব-বিরোধ খুঁজে পাননি।

রামমোহন সতীদাহ বন্ধ করতে প্রাণপাত করেছিলেন, বাংলার নারীর ইতিহাসে এটাই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। তিনি মেয়েদের মানুষ মনে করতেন আর সেই মর্মে সামাজিক স্বীকৃতি চেয়েছিলেন। কাউকে মানুষের মর্যাদা দিলে হয়তো জীবন্ত পুড়িয়ে মারা সহজ হয়

না। বলা যেতে পারে, সতীদের তো দেবী মনে করা হত। বস্তুত সতীদাহ সমর্থকদের আক্রমণ ছিল দু'মুখো। এক দিকে তাঁরা শাস্ত্র বুলি আওড়াতেন তোতা পাখির মতো। দাবি করতেন, যে-নারী সতী হয় সে সাক্ষাৎ দেবী। তার নিজের ও তার স্বামীর অনন্ত স্বর্গবাস নিশ্চিত। সাপুড়ে যেমন গর্ত থেকে সাপকে টেনে বার করে, তেমনি সতী, অর্থাৎ সহমৃতা স্ত্রী নরক বাসের যোগ্য স্বামীকেও নিজের সঙ্গে স্বর্গে নিয়ে যান। কিন্তু শাস্ত্র বচনের পাশাপাশি ছিল গভীর ঘৃণা। নারী জাতি অত্যন্ত নিকৃষ্ট, গুণহীনা। সব দোষের আকর। স্বামী থাকতে যদি বা মেয়েদের বেঁচে থাকার কোনও কারণ থাকে, যেমন গৃহকর্ম, স্বামীর উত্তরাধিকারীকে পৃথিবীতে আনা, স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাদের বেঁচে থেকে পৃথিবীর জঞ্জাল বাড়ানোর চেয়ে সহমরণ ভাল। রামমোহন তারই উত্তর দিয়েছেন:

> প্রথমত বুদ্ধির বিষয়, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন, যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্প বুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভবও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্প বুদ্ধি কহা সম্ভব নয়; আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?...
>
> দ্বিতীয়ত তাহারদিগকে অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন। ইহাতে আশ্চর্য জ্ঞান করি, কারণ যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিয়া মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য দ্বারা স্বামীর উদ্দেশে অগ্নি প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়। ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন, যে তাহারদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য নাই।
>
> তৃতীয়ত বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়। এ দোষ পুরুষে অধিক কি স্ত্রীতে অধিক উভয়ের চরিত্র দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবেক।... তবে পুরুষেরা প্রায় লেখাপড়াতে পারগ এবং নানা রাজকর্মে অধিকার রাখেন, যাহার দ্বারা স্ত্রীলোকের কোন এরূপ অপরাধ কদাচিৎ হইলে সর্বত্র বিখ্যাত অনায়াসেই করেন, অথচ পুরুষে স্ত্রীলোককে প্রতারণা করিলে তাহা দোষের মধ্যে গণনা করেন না।
>
> চতুর্থ যে সানুরাগা কহিলেন, তাহা উভয়ের বিবাহ গণনাতেই ব্যক্ত আছে, অর্থাৎ এক ২ পুরুষের প্রায় দুই তিনশত বরঞ্চ অধিক পত্নী দেখিতেছি, আর স্ত্রীলোকের এক পতি সে ব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ সুখ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গে মরিতে বাসনা করে, কেহ বা যাবজ্জীবন অতিকষ্ট যে ব্রহ্মচর্য তাহার অনুষ্ঠান করে।
>
> পঞ্চম তাহারদের ধর্মভয় অল্প, এ অতি অধর্মের কথা, দেখ কি পর্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে।[৬]

এখানে রামমোহন নারীপুরুষের অসাম্যের, নারীর পরাধীন ও পদানত অবস্থার মূল কারণটি তুলে ধরেছেন। পুরুষেরা 'লেখাপড়াতে পারগ', তারা 'রাজকর্ম' করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পত্তিও পুরুষের দখলে। অন্য ভাবে বলতে গেলে, রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী পুরুষ। অবশ্যই সব পুরুষের সুযোগ সুবিধা, ক্ষমতা এক নয়। সমাজে লিঙ্গভেদের পাশাপাশি

শ্রেণিভেদ আছে। তবে যে-সমাজ ও রাষ্ট্র সাধারণ ভাবে পুরুষপ্রধান, সেখানে পরিবারের অভ্যন্তরেও মেয়েরা নীচে থাকবে, পুরুষ বহুবিবাহ বা ব্যভিচার করতে পারবে কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে তা হবে দৃঢ়ভাবে নিষিদ্ধ। এ কথা রামমোহন বুঝেছিলেন এবং তাঁর দেশবাসীদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। বস্তুত রামমোহন যে কেবল সতীদাহের মতো বর্বর প্রথা উচ্ছেদ করে ক্ষান্ত হননি, আজকের যুগে যাকে মেয়েদের empowerment, ক্ষমতায়ন বলা হয়, তার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন, এমন দাবি করেছেন কয়েকজন আধুনিক নারীবাদী।[৭]

সতীদাহ নিষিদ্ধ করার বহু পরেও এ নিয়ে বিতর্ক থামেনি। অথচ যাঁরা সতীদাহের পক্ষপাতী ছিলেন, আইন পাশ হওয়ার আগে বা পরে, তাঁদের বাংলা রেনেসাঁসের বৃত্ত থেকে বাদ দেওয়াও সমীচীন নয়। তাঁদের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞানী ছিলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কিংবা সে-শিক্ষার অনুরাগীও ছিলেন। তবু প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁরা সরে আসতে পারেননি। 'রামারঞ্জিকায়' (১৮৬০), সতীদাহ নিষিদ্ধ হয়ে যাবার অত কাল পরে, প্যারীচাঁদ মিত্র সহমরণের বিষয়ে যে গৌরব প্রকাশ করেছেন তা তারই পরিচয় বহন করে।[৮]

এমনকী এ প্রশ্নে বাংলার সেরা সন্তান, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের চিন্তা প্রশ্নাতীত ছিল না। বঙ্কিমের *মৃণালিনী* উপন্যাসেও একটি দীর্ঘ কবিতায় সতীদাহের উজ্জ্বল চিত্র আছে।[৯] সে কথাও না হয় ছেড়ে দেওয়া গেল, কারণ কবিতায় বা কথা সাহিত্যে যা থাকে তা সর্বদা লেখকের মনের কথা নয়। কিন্তু *কমলাকান্তের দপ্তর*-এ একটি প্রবন্ধে সতীদাহের প্রশংসা লক্ষণীয়। একই যুক্তি অনুসারে রবীন্দ্রনাথের *কথা ও কাহিনী*-র একটি কবিতায় এক রাজপুত নববধূর সহমরণ আমরা রবীন্দ্র চিন্তার সঙ্গে একাত্ম করে নাও দেখতে পারি। কিন্তু 'মাভৈঃ' প্রবন্ধে তিনি যে ভাবে সহমরণ প্রথার গুণকীর্তন করেছেন, তা উড়িয়ে দেওয়া কঠিন। পিতামহদের বিরুদ্ধে কবিগুরুর অভিযোগ, তাঁরা সেই তো মরলেন— কে আর অমর— কিন্তু এমন ভাবে মরলেন না কেন যাতে তাঁদের বংশধররা গর্ব করতে পারে। তেমন ঐতিহ্য রেখে গেছেন বরং হাসিমুখে চিতারোহণ করা পিতামহীর দল।[১০] 'নববর্ষ' প্রবন্ধে সতীদাহ প্রথা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রশংসাসূচক মন্তব্য পাওয়া যায়। একদা ভারতীয় সৈন্যরা যেমন জোয়ারের রুটি খেয়ে রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়ে নীরবে, অনাড়ম্বর ভাবে নিজেদের কর্তব্য পালন করত, তেমনি সতী নারীরা করতেন চিতায় প্রাণ দিয়ে। বিপরীতে উল্লেখ করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের অসামান্য গল্প 'মহামায়া'র কথা। অনিচ্ছুক সতী মহামায়া ঝড়বৃষ্টির রাতে চিতা থেকে পালিয়ে এসে তার প্রেমিকের কাছে আশ্রয় নিল। কিন্তু লেলিহান শিখা তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের এক দিকে চিহ্ন রেখে গেছে। যে দিন প্রেমিক রাজীব সে কথা জানতে পারল, মহামায়া তাকে চিরতরে ছেড়ে গেল।

এমন শক্তিশালী সতীদাহ প্রথা বিরোধী কাহিনি বিরল। তা ছাড়া 'মহামায়া'র ঠিক সময়সীমা জানা না গেলেও মনে হয়, তখন ব্রিটিশ আমল শুরু হয়ে গেছে। রাজীব তার সাহেব মুরুব্বির সাহায্যে মহামায়াকে রক্ষা করার কথা ভাবে। সুদূর অতীতে যে প্রথা রোমান্টিক কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল, আধুনিকতার দোরগোড়ায় তার অনেকটাই মিলিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতামহের বন্ধু রামমোহনকে গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করতেন, এ কথাও স্মরণযোগ্য।

বিবেকানন্দকে প্রত্যাশিত ভাবেই মিশনারিদের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল সতীদাহ নিয়ে। কারণ এটাই ছিল খ্রিস্টান দৃষ্টিতে হিন্দু বর্বরতার বৃহত্তম প্রমাণ। আমেরিকায় স্বামীজির শ্রোতারাও তাঁকে এ নিয়ে cross-examine করেছিলেন। বিবেকানন্দ সঙ্গত ভাবেই উত্তর দিয়েছিলেন, সতীদাহ যদি বর্বর হয়, তবে খ্রিস্টান ইউরোপে (এবং আমেরিকাতেও) তথাকথিত ডাইনি নিধন কী এমন চমৎকার রেওয়াজ ছিল! এ যেন ইংরেজিতে যাকে বলে the pot calling the kettle black। ইউরোপে শেষ আইনানুগ বা official ডাইনি পোড়ানো হয়েছিল ১৭৯৩ সালে। বিশ্ব ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ছত্রিশ বছরের ব্যবধান এমন কিছু নয়। আমাদের মনে পড়ে অমিয়ভূষণ মজুমদারের ঐতিহাসিক কাহিনি বা নভেলেট *মধু সাধুখাঁর* মন্তব্য: "এক দেশে পুড়ে সতী আর এক দেশে পুড়ে ডান।"

কিন্তু বিবেকানন্দ উচিত জবাবের পরে যখন যোগ করেন, সতীদাহ স্বেচ্ছা মৃত্যু ছিল, তখন কিঞ্চিৎ সংশয় জাগে। তিনি একে তুলনা করেছেন প্রেমিককে হারিয়ে শোকাহতা প্রেমিকার আত্মহত্যার সঙ্গে। সে ক্ষেত্রে নারী পুরুষ উভয়েই আত্মহত্যা করত না কেন? পত্নীশোক কি পতিশোকের তুলনায় কম?[11] তা ছাড়া একজন বহুপত্নীক কুলীনের অসংখ্য স্ত্রী, যাদের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীর কোনও সম্পর্কই ছিল না, পতিকে হারিয়ে ব্যক্তিগত শোকে অভিভূত হয়ে মরণ কামনা করবে, এমন সম্ভাবনা কম। বিবেকানন্দের আর এক যুক্তি সমান আপত্তিজনক। ইউরোপ আমেরিকায় তথাকথিত ডাইনিদের হত্যা করা হত প্রচণ্ড ঘৃণা ও ধিক্কার সহযোগে। অন্য দিকে সতীদের চিতায় ওঠানো হত দেবী জ্ঞানে। যাঁদের জয়ধ্বনিতে আকাশবাতাস মুখরিত হত। কিন্তু এই তুলনা কি সত্যই ভারতের ও হিন্দু ধর্মের পক্ষে মর্যাদাকর ছিল? ছাগল ছানাকে বলি দেওয়ার সময় প্রচণ্ড জোরে বাদ্যধ্বনি কি তাকে সান্ত্বনা দেয়? সতীদাহ ও তার বিরোধিতার কষ্টিপাথরে বাংলা রেনেসাঁসকে যাচাই করা যায়।

রেনেসাঁসের নারীশিক্ষা বা নারীপ্রগতির উদ্দেশ্য কী ছিল?

আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা রেনেসাঁসেরই সমবয়সি। যদিও আমরা দেখেছি মধ্যযুগেও কোনও কোনও স্তরে নারীরা শিক্ষিত হত। ১৮১৯-২০ সালে খ্রিস্টান মহিলারা The Female Juvenile Society for the Establishment and Support of Bengalee Female School ও Ladies' Society for Native Female Education in Calcutta and its Vicinity খুলেছিলেন।

প্রথম দিকে খুব সাড়া না জাগালেও ১৮২৪-এর মধ্যে পঞ্চাশটি এ জাতীয় পাঠশালা হয়েছিল। বেথুন স্কুলের ভিত্তি স্থাপন অবশ্যই নারীশিক্ষার পথে এক মাইলস্টোন। পূর্ব বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা, মনে হয়, আরও ছড়িয়ে পড়েছিল। ঢাকার ইডেন স্কুল, কুমিল্লার নবাব ফয়জুন্নেসা স্কুল, ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী ও চট্টগ্রামের খাস্তগীর বিদ্যালয় তার প্রমাণ।

তবু প্রশ্ন থেকেই গিয়েছিল। মেয়েরা কেন পড়বে? তারা তো চাকরি করে রোজগার করবে না। শামলা পরে কোর্ট কাছারিতে যাবে না। স্ত্রীশিক্ষা বিদ্বেষীরা দাবি করত, মেয়েরা লেখাপড়া শিখে কেবল উদ্ধত ভাষায়, বিবি সেজে ঘুরে বেড়াবে। এমনকী চরিত্র দোষ

অসম্ভব নয়। আর মেয়েরা বিধবা হয় লেখাপড়া শিখলে। এ তো প্রাচীন বিশ্বাস বা কুসংস্কার। মনে পড়ে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের *কাঞ্চনমূল্য*-এ পুরোহিত, টোল শিক্ষক অনাদি ভট্টাচার্য ও তাঁর সহধর্মিণীর কথোপকথন: "কেন, লেখাপড়া না শিখেও তো বিধবা হচ্ছে। তবেই দেখ, শিখলে কি আর রক্ষা থাকবে।"

বিপরীতে নারী যে পূর্ণ মানুষ, শিক্ষালাভে তার নিজস্ব তৃপ্তি হয়, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে, এমন যুক্তি দেওয়া হয়নি তা নয়। তবে নারীশিক্ষার উপযোগবাদী বা 'ইউটিলিটেরিয়ান' মূল্যও অস্বীকার করা হত না। নারীশিক্ষাপন্থীরা জোর দিয়ে বলতেন, লেখাপড়ার দরুন গৃহকর্ম ও শিশু পালন অবহেলিত হওয়া দূরস্থান, অন্তত আধুনিক যুগে কেবলমাত্র একজন শিক্ষিতা রমণীই আদর্শ জায়া, জননী ও গৃহবধূ হতে পারে। সংসারের আয়ব্যয়ের হিসেব রাখা, সুষম, স্বাস্থ্যকর খাদ্যের জোগান দেওয়া, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধির দিকে নজর রাখা, ছোটখাটো অসুখে চিকিৎসা, সর্বোপরি শিশু সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠন, শিক্ষিতা গৃহিণীরই সাধ্য।

এই পটভূমিকায়, টানাপোড়েনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন ওঠে, মেয়েরা কি নিজেরা মুক্তির উদ্দেশ্যে সক্রিয় ও সংগঠিত হয়েছিল? নারী আন্দোলন এই যুগে বা যাকে turn of the century বলে তখন কী রূপ নিয়েছিল?

সংস্কার ও নারী আন্দোলন

রেনেসাঁসের সংস্কার হয়তো নারী আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল না। কিন্তু তার পথ খুলে দিয়েছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, খ্রিস্টান মিশনারি কুল, এমনকী সতীদাহপন্থী রাধাকান্ত দেব।

প্রথম যুগের নারীমুখী সংস্কারে মেয়েদের খুব সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। থাকা সম্ভবও ছিল না। যদি সে যুগে বিধবারা বলত, তারা সহমরণে যাবে না বা দ্বিতীয় বার বিয়ে করবে, কে তাদের কথা শুনত? প্রথম পদক্ষেপ সংস্কারপন্থী পুরুষদেরই নিতে হত। মনে পড়ে বিবেকানন্দের সেই বিখ্যাত উক্তি: "বিধবা বিবাহ ভাল কি মন্দ আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন? আমি কি বিধবা?" এ ক্ষেত্রে তিনি হয়তো মেয়েদের 'অটনমি'র কথাই বলতে চেয়েছেন। কিন্তু এটাও ঘটনা যে বিধবাদের, বা সাধারণ ভাবে মেয়েদের মনের ভাব কেউ জানতে চায়নি। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা মেয়েরা এর পরবর্তী পর্যায়ে সরাসরি রণাঙ্গনে নামলেন।

এক সমাজতত্ত্ববিদের ভাষায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকে মহারাষ্ট্রে অনেকটা এ রকম হয়েছিল:

> We can certainly see elements of these ideas emerging in Western India during the 1870s in the circles around the Prarthana Samaj. M. G. Ranade, G. V. Kanitkar, who was a judge, reformer and translator of J. S. Mill's The Subjection of Women, the lawyer G. V. Joshi, and the novelist Hari Narayan Apte all tried to put

> them into practice by educating their own child-wives. Together with their menfolk, and joined in 1882 from Bengal by the eminent young sanskrit scholar Pandita Ramabai, these women founded the Arya Mahila Samaj, the 'Aryan Women's Society', as a basis for what was planned to be a much wider organization throughout the presidency.[১২]

রমাবাইয়ের কথা পরে আরও আসবে। এখন দেখা যাক, বাংলায় ও উত্তর ভারতে কী ধরনের নারী সংগঠন গড়ে উঠেছিল আর নব্য শিক্ষিতা, প্রগতিশীল পরিবারের নারীরা কীভাবে তার নেতৃত্ব দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন।

সখী সমিতি থেকে ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল

প্রত্যাশিত ভাবেই বাংলার নারী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি বিখ্যাত পরিবারের নারীর নাম। রবীন্দ্র অগ্রজা স্বর্ণকুমারী। তাঁর দুই কন্যা, হিরন্ময়ী ও সরলাদেবী। দুর্গামোহন দাসের কন্যা, জগদীশচন্দ্র বসুর স্ত্রী লেডি অবলা বসু। বাংলার মুকুটহীন রাজা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পত্নী বাসন্তীদেবী ও বোন উর্মিলাদেবী। অবশ্যই আরও অনেকে ছিলেন, যাঁদের নাম ইতিহাস মনে রাখেনি। অখ্যাত কিন্তু অক্লান্ত কর্মী।

স্বর্ণকুমারী একজন উচ্চমানের ও জনপ্রিয় লেখিকা ছিলেন। ইংরেজ লেখিকা ও নারীবাদী Virginia Woolf তাঁর *A Room of One's Own* গ্রন্থে কাল্পনিক ইতিহাস রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। যদি শেকসপিয়ারের একজন বোন থাকত। ভাইয়ের মতোই তার অলৌকিক, অলোকসামান্য প্রতিভা। কী হত তার পরিণতি? উত্তর, সে যুগে নারী প্রতিভার কোনও মূল্য ছিল না, ছিল না বিকাশের সুযোগ। হতাশ, পরাজিত জুডিথকে (ভার্জিনিয়া শেকসপিয়ারের বোনকে এই নাম দিয়েছেন) শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে হয়েছিল, জারজ সন্তানকে গর্ভে নিয়ে। লেখিকা বোঝাতে চেয়েছিলেন, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ একজন নারী-শেকসপিয়ারকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয় না।

স্বর্ণকুমারীর ভাগ্য ছিল অনেক ভাল। তিনি সমাজের শীর্ষেই জীবন কাটিয়েছেন। খ্যাতি, সম্মান, জনপ্রিয়তা কিছুরই অভাব হয়নি। প্রতিভার দিক থেকে অনুজ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয়া না হলেও তিনি উপেক্ষার উপযুক্ত ছিলেন না।[১৩] কিন্তু এখানে আমরা আলোচনা করব তাঁর নারী সংগঠন সখী সমিতি নিয়ে।

এই সমিতির উৎস বা জন্মরহস্য একটু বিচিত্র। মাদাম ব্লাভাটস্কি, কর্নেল অলকট ও তাঁদের থিওসফিকাল সোসাইটি একদা ভারতে বেশ জনপ্রিয়তা ও প্রসার লাভ করেছিল। স্বর্ণকুমারী ও তাঁর স্বামী জানকীনাথ সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বিদেহী আত্মাদের নিয়ে ছিল সোসাইটির কাজ কারবার। নানা কারণে থিওসফিকাল সোসাইটি ভেঙে গেল। মাদাম ব্লাভাটস্কি ইংল্যান্ডে ফিরে গেলেন। স্বর্ণকুমারী ও অন্যান্য কিছু সদস্যা অলৌকিক ছেড়ে লৌকিকের দিকে মন দিলেন।

সরলাদেবীর গ্রন্থের সম্পাদকের ভাষায়ঃ

মহিলা থিয়সফিস্ট সভা ভাঙিয়া গেলে সভানেত্রী স্বর্ণকুমারী দেবী ইহার সম্ভ্রান্ত মহিলা সদস্যদের লইয়া ১৮৮৬ সালে 'সখী সমিতি' গঠন করেন। এই নামটি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পরে প্রকাশিত সখী সমিতির একটি বিবরণীতে ইহার উদ্দেশ্য এইরূপ বিবৃত হইয়াছে:

"অসহায় বঙ্গবিধবা ও অনামী বঙ্গকন্যাগণকে সাহায্য করা এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য।

"আবশ্যক অনুসারে দুই উপায়ে এই সাহায্য দান হইবে। বিধবাই হউন আর কুমারীই হউন, যিনি নিরাশ্রিত, যাঁহার কেহ নাই, বা যাঁহার অভিভাবকেরা নিতান্ত সঙ্গতিহীন তাঁহাদের অভিভাবকদের সম্মতিক্রমে সখি সমিতি কোনও কোনও স্থলে তাঁহাদের ভার লইতে প্রস্তুত, কোনও কোনও স্থলে সাধ্যানুসারে অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

"যে সকল অল্পবয়স্ক অনামা বিধবা বা কুমারীগণের ভার সখি সমিতি গ্রহণ করিবে, তাঁহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করা সখি সমিতির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। শিক্ষিত হইয়া যখন এই বালিকাগণ অন্তঃপুরের শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত হইবেন, তখন সমিতি ইঁহাদিগকে বেতন দান করিবে। ইহা দ্বারা দুইটি কাজ এক সঙ্গে সাধিত হইবে। অনামা ও বিধবা বঙ্গকন্যাগণ হিন্দু ধর্মানুমোদিত পরোপকার কার্যে জীবন দিয়া সুখে স্বাচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিবেন, আর দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের একটি প্রকৃত পথ মুক্ত হইবে।"[১৪]

অবশ্য সরলাদেবী জানিয়েছেন, সমিতির সাহায্যে শিক্ষালাভের পর অনেক মেয়েই শিক্ষাদানে উৎসাহ দেখায়নি। তবু সাধারণ ভাবে পরিকল্পনাটি প্রশংসনীয় ছিল। সমিতির আর এক কাজ ছিল মহিলাশিল্প মেলা সংগঠিত করা। মেয়েদের তৈরি হস্তশিল্পের কাজ এ সব মেলায় বিক্রি হত।

এ মেলার একটি বিবরণ এ রকম:

গত ১৫ই পৌষ, কলিকাতার বেথুন স্কুল বাটিতে লেডী বেলী কর্তৃক বেলা দ্বিপ্রহরের সময় হইতে এই মেলা খোলা হয়, মেলা খুলিবার পরেই লেডী ল্যান্সডাউন আগমন করেন।... কলিকাতার অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলাগণ এই মেলায় আগমন করিয়াছিলেন।[১৫]

কিছুটা মোগল আমলের সুন্দরী, অভিজাত রমণী পরিচালিত মিনাবাজারের কথা মনে করিয়ে দিলেও এ জাতীয় মেলার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অনুরূপ ভাবে হিরণ্ময়ীদেবী 'বিধবা শিল্পাশ্রম' প্রতিষ্ঠান করেছিলেন ও সে কাজে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। যেমন ছিলেন তাঁর ও সরলার মা স্বর্ণকুমারী, অবলা বসু।

...১৯১৯ সালে নারীশিক্ষা সমিতি স্থাপন করেন। শিল্পভবন ও বাণীভবন দুইটি বিভাগের মাধ্যমে তিনি বালবিধবা ও দুর্গতা নারীদের সাধারণ বিদ্যা ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়েছিলেন।[১৬]

দেশবন্ধুর পরিবারের মেয়েরা, বিশেষত উর্মিলাদেবী, মেয়েদের কুটির শিল্পে বিশেষ ভাবে উৎসাহ দিতেন। কংগ্রেস ও মহাত্মা গান্ধীর চরকা সংক্রান্ত পরিকল্পনা যে বিশেষ ভাবে মেয়েদের উপযোগী, এ কথার উপর জোর দিতেন। রাজনীতি ও নারীকেন্দ্রিক অর্থনীতির মেলবন্ধন ছিল তাঁর পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে মেয়েরা কিছুটা অর্থনৈতিক শক্তি ও স্ব-নির্ভরশীলতা পাবে, এমন ধারণা বা পরিকল্পনা নতুন নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই মনে করা হত, কুটিরশিল্প কিছু পরিমাণে নারীশিক্ষার অন্তর্গত হওয়া উচিত। তার সাহায্যে তারা ঘরের কাজ আরও ভাল করে করতে পারবে, আবার দরকার হলে অর্থোপার্জনও করতে পারে। মেয়েদের জন্য অন্য কোনও জীবিকার কথা ভাবা হয়নি। হয়তো শিক্ষা, ডাক্তারি, কুটিরশিল্প ভিন্ন আর কিছু সে যুগে সম্ভবও ছিল না। অন্তত তথাকথিত ভদ্র মেয়েদের পক্ষে।

রাধাকান্ত দেব প্রস্তাব করেছিলেন যে, সাধারণ বিদ্যালয়ে নবশাক-কন্যাদের ভর্তি করা হোক, তারা সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ ও যান্ত্রিক বিদ্যা আয়ত্ত করুক, পরে তারাই সাধারণ বিদ্যালয়ে এবং হিন্দু প্রধানদের গৃহে ছাত্রী পড়াতে পারবে। প্যারীচাঁদ মিত্র আরও বিস্তৃত পরিকল্পনা করেছিলেন। মেয়েদের শিখতে হবে প্রথমত গৃহকর্ম... তারপর তাকে শিখতে হবে অর্থকরী বিদ্যা অর্থাৎ শিল্পকর্ম— যাতে অবস্থার বিপর্যয় ঘটলে কিছু রোজগার করা যায়।[১৭]

এই চিন্তার ও বাস্তবের ভিত্তিতে যে নারীসংগঠন নারীদের চেষ্টা ও শক্তিতে গড়ে উঠেছিল, তার মূল্য কম নয়।

সরলাদেবী বিবাহের সূত্রে পঞ্জাবের বাসিন্দা হওয়ার পরও তাঁর নারীসংগঠনমূলক কাজে ভাটা পড়েনি। বরং তা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সরলাদেবীর সমাজসেবার প্রধান অভিব্যক্তি— ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যটন করিয়া নারীজাতির অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। ইতিপূর্বে বাংলার যুবশক্তির উদ্বোধনকল্পে তিনি যাবতীয় শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন... মাতা স্বর্ণকুমারীর 'সখী সমিতি' এবং দিদি হিরন্ময়ীর 'মহিলা শিল্পাশ্রম' এই প্রতিষ্ঠান দুইটির আদর্শ তাঁহার সম্মুখে। এই প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের যে যে অভাব ছিল, তাহার পূরণকল্পেই এই ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠা।১৮

১৯১০ সালে সরলাদেবীর উদ্যোগে ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠা ঘটে। অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা, রানি, বেগম সাহেবা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সরলা জানান, যে দেশে গৌরীদান প্রথা, পর্দা ইত্যাদি এখনও বহুল প্রচলিত, সেখানে স্ত্রীশিক্ষার সমস্যা কম

নয়। তার মোকাবিলার জন্য চাই একটি সর্বভারতীয় সংগঠন। শিক্ষিকাদের বেতন দেওয়ার জন্য অর্থ সংগ্রহ প্রয়োজনীয়। সরলা নিজে তখন লাহোরে ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে সেখানে সংগঠন গড়ে উঠল। স্ত্রী মহামণ্ডল ছড়িয়ে পড়ল ক্রমে দিল্লি, করাচি, হায়দরাবাদ, কানপুর, হাজারিবাগ, কলকাতা ও অন্যান্য শহরে। কলকাতায় এ ব্যাপারে সবচেয়ে সক্রিয় হলেন লেখিকা কৃষ্ণভাবিনী দাসী। সরলা বাংলায় ফিয়ে আসার পর নিজেই সংগঠনের ভার নিলেন। অন্যান্য নারীসংগঠনের মতো স্ত্রী মহামণ্ডলের মাধ্যমে প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি মেয়েদের শিল্পশিক্ষা দেওয়া হত, প্রয়োজনে জীবিকা উপার্জনের উদ্দেশ্যে।

অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স

সর্ব ভারতীয় নারী সম্মেলন, ভারতের নারীসংগঠনের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ১৯২৭ থেকে অন্তত নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত এই সংস্থা সক্রিয় ছিল। নারীশিক্ষা থেকে শুরু করে পারিবারিক আইন, শ্রম আইন, নারী শ্রমিকদের মজুরি, কাজের সময়সীমা ও পরিবেশ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, এমন কোনও আন্দোলন বা সংগঠনের ইতিবাচক ক্ষেত্র নেই, যেখানে এই সংস্থা এগিয়ে আসেনি। যেন সর্বঘটে কাঁঠালি কলা। সফল হয়নি, এমনও নয়, যদি সাফল্য ব্যাপারটি আমরা আপেক্ষিক ভাবে দেখি। এখানে অবশ্য আমরা কেবল প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের ব্যাপারটাই নজরে আনব।

এর আগে নারীসংগঠনের ইতিহাস ছিল। আমরা দেখেছি। সখী সমিতি, স্ত্রী মহামণ্ডল, আর্য মহিলা সমিতি। তবে 'সম্মেলনের' ক্ষেত্র ছিল আরও প্রসারিত। বিশেষ শহর বা অঞ্চলভিত্তিক নারী সমিতি প্রথম দিকে অধিক প্রচলিত ছিল। পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী ১৮৮২ সালে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে সারদা সদন প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য, বিধবাদের শিক্ষা ও জীবিকা। উল্লেখযোগ্য যে, ওই বছরেই বঙ্গে স্বর্ণকুমারীর উদ্যোগে সখী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মহারাষ্ট্রের আর এক রমাবাই, প্রখ্যাত সংস্কারপন্থী নেতা গোবিন্দ রানাডের স্ত্রী অনুরূপ ভাবে সেবা সদন শুরু করেছিলেন। আমেদাবাদে গুজরাটি স্ত্রী মণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মহিলা সেবা সমাজ মহিশুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১৩ সালে, পুনেয় তার বছর তিনেক পরে। বাংলার শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিধবাশ্রম খুলেছিলেন। বিবেকানন্দ এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। কেবল মৌখিক সমর্থন নয়, বিদেশে বক্তৃতা দিয়ে যে অর্থোপার্জন করেছিলেন, তার একাংশ দিয়ে সহায়তা করেছিলেন। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে, উনবিংশ শতাব্দীর আশির দশক থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের কাল অবধি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নারীসংগঠন জন্ম নিয়েছিল।[১৯]

আরও বড় মাপের সর্ব ভারতীয় সংস্থা তৈরি হল ১৯১৭ সালে। মাদ্রাজ নগরে প্রতিষ্ঠিত হল Women's India Association। প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিন জন শ্বেতাঙ্গিনী: Annie Besant, Margaret Cousins ও Dorothy Jinrajadas. ডরোথি অবশ্য একজন সিংহলিকে বিয়ে করে পারিবারিক সূত্রে দক্ষিণ এশীয় হয়েছিলেন। অ্যানি ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট।[২০]

তখন মন্টাগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কারের কথা চলছিল। প্রদেশগুলিকে সীমিত স্বায়ত্তশাসন ও সীমিত ভোটাধিকার দানের প্রস্তাব প্রথম মহাযুদ্ধের পর পরই ভারতে রাজনৈতিক মানচিত্রে দেখা দিল। অ্যাসোসিয়েশন দাবি করল, ভারতীয় নারীদেরও ভোটের অধিকার দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব।

Margaret Cousins-এর আর এক বড় পরিকল্পনা ছিল নারীশিক্ষা। তাঁর মতে, ভাসা ভাসা চিন্তা বা টুকরো টুকরো প্রচেষ্টায় বিশেষ লাভ হবে না। মেয়েদের ভাগ্য নিজেদের হাতেই নিতে হবে। সারা ভারতের জন্য একটি নীল নকশা চাই এবং চাই তাকে কাজে রূপান্তরিত করার মতো সংগঠন।

> There is undoubtedly a great need for women to express their considered views on the subject of present day education for boys and girls in India and especially for girls. If these opinions are formulated into a memorandum, women will be doing a service to the future and will be helping those who at present control the educational destinies of young India.[২০]

১৯২৭-এ প্রথম সম্মেলন হল পুনেয়। পুনেকে বেছে নেওয়ার হয়তো বিশেষ কারণ ছিল। এই শহরটি যে কেবল পশ্চিম ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী ছিল তাই নয়। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল জ্যোতিবা ফুলে, মহর্ষি কার্ভে, পণ্ডিতা রমাবাই, রানাদে দম্পতির মতো সংস্কারকদের ঐতিহ্য। প্রথম সম্মেলনে ভারতীয় রমণী রত্নের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। অভিজাত অন্তঃপুরের রানি ও বেগম সাহেবারা থেকে শিল্পী, শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক নেত্রী। প্রেসিডেন্টের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন বরোদার মহারানি। বরোদার গাইকোয়াড় রাজ পরিবার উদারপন্থা ও সংস্কারের জন্য 'নেটিভ প্রিন্স'দের মধ্যে স্বতন্ত্র ও সুপরিচিত ছিল।

> The Conference began a new era in the evolution of women's education in India and laid the foundation of the All India Women's Conference which henceforth met annually and became a leader among organizations fighting for women's rights and equality.[২১]

সম্মেলনের প্রথম দিকে কিছু বিতর্ক হয়েছিল। যেমন, বিদ্যালয়ে কি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হবে? অধিকাংশের মতানুসারে স্থির হল, ব্যাপারটা পারিবারিক শিক্ষার উপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল। তবে শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে কোনও দ্বিমত ছিল না। তার চেয়েও বড় কথা, মেয়েরা নিজেরাই নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্যোগী হবে, অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে, এটাই ছিল প্রত্যাশিত। কেবল সামাজিক ভাবে নয়, রাজনৈতিক ভাবে। কারণ শেষ বিচারে রাজনীতি ও সমাজ অবিচ্ছেদ্য।

> The expenditure on men's institutions was almost seven times that of women's institutions in 1927. Therefore, Dr. Reddy said, women should find representation on legislative councils, local bodies, senates, syndicates and educational boards and councils so that they could control all stages of education.[২২]

সে যুগে বেশির ভাগ মানুষের, বিশেষত মেয়েদের, নির্বাচনের অধিকার ছিল না বললেই চলে। এ হেন উচ্চাশা বা প্রস্তাব অবাস্তব বলেই মনে হতে পারে। তবে সত্যিই সম্মেলন কিছুটা সফল হয়েছিল। মুথুলক্ষ্মী স্বয়ং মাদ্রাজ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্যা হয়েছিলেন। সেখানে তাঁর ভূমিকা নিতান্ত নগণ্য ছিল না।

সম্মেলনের সমস্ত কার্যকলাপের বিবরণ, কেবল প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ ধরলেও, বিস্তারিত ভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষা তাদের 'অ্যাজেন্ডা'র প্রথম হলেও আরও অনেক কিছু ছিল। জীবিকা, বিশেষ করে বিধবাদের জীবিকার সমস্যা। নারীশ্রম, শিশুশ্রম মেয়েদের নানা অধিকার সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন। নারীদেহ ব্যবসার বিরোধিতায় এর দক্ষিণ ভারতীয় সংস্করণ, দেবদাসী প্রথা (গালভরা নাম থাকলেও দেবদাসীরা প্রকৃতপক্ষে ছিল কোনও প্রভাবশালী পুরুষের দাসী। স্থানীয় রাজা, জমিদার, মন্দিরের প্রধান পুরোহিত— এরা এই অসহায় মেয়েদের যথেচ্ছ ভোগদখল করত এবং/অথবা ধনী মক্কেলদের কাছে ভাড়া খাটাত) তুলে দেওয়ার ব্যাপারে মুথুলক্ষ্মী সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। পর্দা প্রথা ছিল সংগঠকদের আর এক 'টার্গেট' বা আক্রমণের লক্ষ্য। সম্মেলনের এক প্রেসিডেন্ট বললেন, যে সব পুরুষ নিজেদের ঘরে মেয়েদের কড়া পর্দায় রাখে, তারা বাইরে নিজেরা বে-পর্দা মেয়েদের সঙ্গে দিব্যি মেলামেশা করে। এই 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড' কেন? তবে পর্দাপ্রথা এক দিনে দূর করা যাবে না জেনে সম্মেলন চেষ্টা করেছিল অবরোধবাসিনীদের মধ্যেই শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে।

পরিবার পরিকল্পনা, নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষা ছিল এই সংগঠনের আর এক উদ্দেশ্য। Margaret Sanger পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে ছিলেন বিশেষ ভাবে সক্রিয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ জন্য তিনি জেল খেটেছিলেন। সাধারণত পরিবার পরিকল্পনার পক্ষে দুটি যুক্তি দেওয়া হত। নারীদের স্বাস্থ্য ও দেশে জনসংখ্যার আধিক্য (overpopulation)। আধুনিক নারীবাদী যুক্তি, মেয়েদের বেছে নেওয়ার অধিকার, নিজেদের দেহের উপর অধিকার, বিশেষ আলোচিত হয়নি। এটুকুতেও কোনও কোনও সদস্যের আপত্তি ছিল। কেউ বলতেন, ভারতীয় মেয়েরা এতই লাজুক ও রক্ষণশীল যে, মুখ ফুটে এমন ব্যাপারে পরামর্শ নেবে না। পরিবার পরিকল্পনা 'পাপে'র জন্ম দেবে, অর্থাৎ সন্তানসম্ভবা হওয়ার ভয় না থাকলে মেয়েরা বিবাহ বন্ধনের বাইরে দেহদান করবে, এমন ধারণাও প্রকাশ পেয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী বা তাঁর অনুগামীরা তো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও সন্তান কামনা ছাড়া দৈহিক সম্পর্ক অন্যায় মনে করতেন। এ সব সত্ত্বেও দিল্লি, কলকাতা ও অন্যান্য শহরে পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত ক্লিনিক খোলা হল। মহীশূর রাজ্যে এ জাতীয় উদ্যোগ সরকারি সমর্থন পেল।

সম্মেলন মূলত নারীবাদী সংস্থান হলেও কেবল নারীসংক্রান্ত বিষয়ে যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেনি, তা আমরা দেখেছি। জাতীয় বিপর্যয়ে তারা সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ১৯৩৪-এ বিহারের ভূমিকম্প বা বাংলায় পঞ্চাশের মন্বন্তরের কালে। হরিজন উন্নয়ন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিস্তার ও বজায় রাখা, সব কিছুতেই এই সম্মেলনের অংশীদাররা সক্রিয় ছিল।

নারীসংগঠন ও ভোটের লড়াই

নারীসংগঠনের এক বড় লড়াই ছিল ভোটের লড়াই। কেবল শিক্ষা ও জীবিকা উপার্জন নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, অন্তত ক্ষমতা নামক কেকের একাংশ নেওয়া ছিল তাদের লক্ষ্য। কারণ শেষ বিচারে রাজনীতি সব কিছুর চাবিকাঠি। অনেক সময় বলা হয়, ভারতের মেয়েরা সংগ্রাম ছাড়াই ভোট পেয়েছিল। বিনা চেষ্টায়, প্রায় উপহার রূপে। তুলনা করা হয় ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে। প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক পূর্ববর্তী এক দশক বা আরও বেশি সময় জুড়ে ইংল্যান্ড সাফ্রাজেট অর্থাৎ ভোটের দাবিদার নারীদের আন্দোলনে উত্তাল হয়েছিল। মিটিং মিছিল জেল ভরা কিছুই বাকি ছিল না। একটি মেয়ে রাজার ঘোড়ার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দিয়েছিল। এ দেশে তুলনীয় কিছু হয়েছিল কি?

সর্বত্র ইতিহাস এক নয়। ভারতে নারীদের ভোটের জন্য সংগ্রাম স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। এক পরাধীন দেশে ব্যালট বাক্স অতখানি গুরুত্ব ও তাৎপর্য স্বাভাবিক ভাবেই পায়নি। তারপরও ভারতীয় মেয়েরা এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন ছিল না। Margaret Sanger, Annie Besant, Dorothy Jinarajadasa, ওই দক্ষিণ এশীয় বনে যাওয়া শ্বেতাঙ্গিনী ও তাঁর সঙ্গিনীদের কথা আগেই বলা হয়েছে।

> They took up the issue of voting rights for women with the Secretary of the State for India, Lord Edwin Montagu, who was in India to discuss the demands for political reform. The South borough Franchise Committee was initially reluctant to give women the right to vote but because of the sustained campaign launched by women's organizations and the support given to them by the Indian National Congress and other political parties, it was finally left to the provincial legislatures to decide the matter.[২৩]

মাদ্রাজ ও তারপর বোম্বাই প্রেসিডেন্সি মেয়েদের ভোটের অধিকার দিল ১৯২০ ও ১৯২১ সালে। অবশ্য এই অধিকার খুবই সীমিত ছিল। প্রথম নির্বাচনের সময় সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের মধ্যে এক শতাংশ ভোট দিতে পারত মাত্র। তারপরও একে অগ্রগতি বলা চলে। তবে ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে একে নারী-পুরুষ দ্বন্দ্ব নয় (যেমনটা হয়েছিল ইউরোপ আমেরিকায়), বরং সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের মিলিত প্রয়াস

হিসাবে গণ্য করা হত। কোনও কোনও বিদেশি সাংবাদিকের মতে, স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐক্য বজায় রাখা ছিল দু'পক্ষেরই প্রয়োজন ও অভিলাষ। সাম্প্রদায়িক বিভাজন তো আছেই, তার উপর লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন হলে জাতীয়তাবাদের সর্বনাশ। হয়তো, এ রকমই ছিল সে যুগের মনোভাব।[২৪]

সাউথ বরো কমিটির কথা আগেই বলা হয়েছে। তা ছাড়া সরোজিনী নাইডু, অ্যানি বেসান্ত, হীরাবাই টাটা প্রমুখ নারী ভোটদানের সপক্ষে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে লন্ডনে গেলেন। (এই কমিটি গঠিত হয়েছিল মন্টাগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের প্রস্তাব আলোচনা, প্রয়োজনে ঘষামাজা করতে)। আমরা দেখেছি, ব্যাপারটায় কমিটি প্রাদেশিক সরকারের কোর্টেই বল ঠেলে দিয়েছিল। ১৯২১-এ মেয়েদের বাংলার আইনসভায় (legislative assembly) প্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। ললনারা এই পরাজয় মেনে নেননি। মিটিং মিছিলে উত্তাল হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ১৯২৩ সালে বাংলার মেয়েরা পৌর নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকার পেল। উৎসাহিত হয়ে কামিনী রায়, বেগম রোকেয়া ও বেগম সুলতানার নেতৃত্বে এক দল মেয়ে ভোটের ব্যাপারে কথা বলতে লর্ড লিটনের সঙ্গে দেখা করলেন। শেষে ১৯২৬ সালে বাংলার মেয়েরা আইনসভায় ভোট দিল। পুরুষ প্রাধান্যের দেওয়ালে একটি আঁচড় পড়ল।

এই জয়ের গুরুত্ব খুব বেশি বাড়িয়ে দেখা উচিত নয়। ভোটদাতাদের সংখ্যা ও আইনসভার ভূমিকা দুই-ই খুবই সীমিত ছিল। তারপরেও নারীসংগঠনগুলির সক্রিয় আন্দোলন স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় সংবিধানে মেয়েদের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেছিল। কারও উপহার হিসাবে এটা মেয়েরা পায়নি।

অন্যান্য সংগঠনেও নারীবাদ

'দ্বৈত ব্যবহার' dual use বলে একটি কথা প্রচলিত আছে। নারীসংঘ ও অন্যান্য কাজকর্মের সংগঠনের মধ্যে কোনও চিনের প্রাচীর ছিল না। All India Women's Conference যেমন বিশেষ ভাবে নারীশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেও, আরও অনেক কিছু করেছিল। বিপরীত উদাহরণও আছে। কংগ্রেস একটি জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন হলেও তার কোনও কোনও শাখা মেয়েদের ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। বস্তুত, মেয়েদের বৃত্তিগত স্বার্থ ও কংগ্রেসের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যে অভিন্ন তা বোঝাবার চেষ্টা চলত।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কারাবাসের সময় তাঁর পত্নী বাসন্তীদেবী বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি হন ও ১৯২২ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তাঁর বক্তৃতার অর্থনৈতিক দিক সম্বন্ধে বলা হয়েছে:

> বাংলাদেশে মূলত তিনি তাই করেছিলেন— গুজরাটে কস্তুরবা যা করেছিলেন। অর্থাৎ গ্রামীণ অর্থনীতি ও কুটিরশিল্প পুনঃপ্রবর্তনে গান্ধীর অর্থনীতিক পদ্ধতিকে প্রাধান্যদান যা কিন্তু মহিলাদেরই হারিয়ে যাওয়া আর্থিক উৎসের কয়েকটা তাদের হাতে ফিরিয়ে দেয়।[২৫]

দেশবন্ধু ভগিনী উর্মিলাদেবীর কথা আগেই বলা হয়েছে। তিনি এবং হেমপ্রভা দেবী— স্বরাজ্য দলের পাঁচ স্থাপক সদস্যদের (founder member) একজন, সম্ভবত সে যুগের যোগ্যতমা বাঙালি রাজনৈতিক নেত্রী— নারী কর্মী মন্দির পরিচালনা করতেন। এটা উঠে যাওয়ার পর তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন মহিলা কর্মী সংসদ।

> উদ্দেশ্য ছিল একই সাথে রাজনৈতিক এবং সামাজিক— তা হল নারীদের বৃত্তিগত প্রশিক্ষণদান ও জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় রঞ্জিত করে তোলা। সংসদ একটি মহিলা নিবাস পরিচালনা করত যেখানে পরিত্যক্ত মেয়েদের আশ্রয় দেওয়া হত।... পরে নারায়ণগঞ্জে গিয়ে একটি মহিলা সংগঠনের সূচনা ঘটান।... যখন সরোজিনী নাইডু কংগ্রেসের সভাপতি হন (১৯২৬) হেমপ্রভা তাঁর প্রতি মূল্যবান সাহায্যের হাত প্রসারিত করেন। বস্তুত, এই দু'জন মহিলাই বোধহয় স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারীমুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী মাধ্যম রূপে পরিগণিত হন।[২৬]

জাতীয়তাবাদ ও নারীবাদ যদি অনেক সংগঠনের দুই বাহু হয়, তবে শ্রমিক আন্দোলন ত্রিভুজের তৃতীয় বাহু। হেমপ্রভা ১৯২১ সালে চাঁদপুর ও গোয়ালন্দে স্টিমার ধর্মঘটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সন্তোষকুমারী দেবী ও প্রভাবতী দাশগুপ্তা ছিলেন উল্লেখযোগ্য শ্রমিক আন্দোলন নেত্রী। তাঁরা নারী সংক্রান্ত কাজ কারবারও বাদ দেননি। ঢাকার আশালতা সেন মহিলা সমিতি শুরু করেছিলেন দ্বৈত উদ্দেশ্য নিয়ে। মেয়েদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও গান্ধীবাদী চিন্তার প্রচার ও তাদের অর্থনৈতিক ভাবে স্ব-নির্ভর করে তোলা। খদ্দর বেচা ও স্বদেশি শিল্পের বার্ষিক মেলার মাধ্যমে এই দুইয়ের সমন্বয় কিছুটা সাধিত হত।

বাংলার অগ্নিযুগের অগ্নিবলয়ের সঙ্গেও নারীসংগঠন সংযোগহীন ছিল না। ঢাকার লীলা রায় নামকরা ও প্রভাবশালী দীপালি সংঘ গড়ে তুলেছিলেন। এদের কাজ ছিল, সশস্ত্র বিপ্লবের পথে মেয়েদের, বিশেষত, কিশোরী ছাত্রীদের টেনে আনা। আবার মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারও ছিল এক লক্ষ্য। কেবল 'ফ্রন্টে'র বাইরের মুখোশ নয়। অনুরূপ কথা বলা যায় কলকাতার ছাত্রী সংঘ সম্পর্কে। দীপালি সংঘের বিষয়ে বলা হয়—

> এই সংঘের ছাত্রী শাখাটি তৎপরতার সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে মন দিলেন এবং ধর্ষিতা মেয়েদের পুনর্বাসন সহ মেয়েদের নানান সামাজিক অধিকার নিয়ে বিতর্ক সভা ও আলোচনা সভার ব্যবস্থা করলেন। এরই পাশাপাশি চলল মেয়েদের ছোরা ও লাঠিখেলা শেখানো ও অন্যান্য আত্মরক্ষা ব্যবস্থাতে পটু করা।[২৭]

ভারতে নারীসংগঠনের ভূমিকা ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আজকের দিন পর্যন্ত কম নয়। মেয়েরা যেটুকু উন্নতি করেছে তার মূলেও অনেকটাই সংগঠিত স্ত্রীশক্তি। বর্তমানে নারীসংগঠন মোটামুটি তিন ভাগে পড়ে। রাজনৈতিক দলের নারী শাখা (প্রায় সব দলের এমন শাখা আছে), বেসরকারি সংস্থা বা এন.জি.ও (Non Government Organisation যারা অনেকগুলি নারী সংক্রান্ত কাজকর্ম করে) আর সম্পূর্ণ নারীবাদী সংগঠন (feminist organization)। এরা সবাই কোনও না কোনও ভাবে অতীতের ঐতিহ্য বহন করে। তা কি ভবিষ্যতের পাথেয় হতে পারবে?

তথ্যসূত্র:

১. Susan Faludi: Backlash: The Undeclared War Against American Women, Crown Publishers, N. York, 1991

২. এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য সুকুমারী ভট্টাচার্যের প্রাচীন ভারত: সমাজ ও সাহিত্য বা উমা চক্রবর্তীর Whatever happened to the Vedic Dasi?

৩. Frances W. Pritchett: Women, Death and Fate in Bridging Women, Studies on Women in South Asia, ed. Sally J. M. Sutherland, Oxford University Press, 1991

৪. আনিসুজ্জামান, বাঙালি নারী, সাহিত্যে ও সমাজে, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১৫

৫. Sumanta Banerjee; The Parlour and the Streets, Seagull, 1989

৬. বাঙালি নারী, পৃ. ৩৮-৩৯

৭. যেমন সুতপা ভট্টাচার্য। এখানেই হয়ত রামমোহনের বৃহত্তম অবদান।

৮. বাঙালি নারী, পৃ. ৩৯

৯. এখানে বিষয় "যবন" কর্তৃক ভারত জয় ও সংযুক্তার অনলে প্রাণ দান। হয়ত সতীদাহ ও জহর ব্রতের মাঝামাঝি। অনেকে দুই প্রথাকে ভুল ভাবে একাত্ম করতে চেয়েছেন।

১০. এই নিবন্ধটি লিখিত হয়েছিল স্বদেশি যুগ ও পুনরুত্থানবাদী (revivalist) জাতীয়তাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে।

১১. আরব্য উপন্যাসের সিন্ধুবাদের এক গল্পে স্বামী স্ত্রী উভয়ের সহমরণ বিধির কথা আছে।

১২. Tarabai Shinde: A Comparison Between Women and Men, translation and edition, Rosalind O'Hanlon, Oxford University Press, 1994, p. 15
মহারাষ্ট্রে উনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকে দুটি ঘটনা নারী আন্দোলন ও সংগঠনকে প্রভাবিত করেছিল। এক ব্রাহ্মণ বিধবার নিজ সন্তান হত্যা (এটাই তারাবাইয়ের গ্রন্থের প্রাথমিক বিষয়) আর রুকমাবাই-এর স্বামীর ঘর না করার সিদ্ধান্ত। কারণ তার বিয়ে দেওয়া হয়েছিল বাল্যে, বোঝার বয়স হওয়ার আগে।

১৩. রবীন্দ্রনাথ অবশ্য অগ্রজা স্বর্ণকুমারীর লেখা বিশেষ পছন্দ করতেন না।

১৪. সরলা দেবী চৌধুরানী, *জীবনের ঝরাপাতা,* দে'জ পাবলিশিং, ২০০৭, পৃ. ২০০-০১।

১৫. ঐ, পৃ. ২০১

১৬. ঐ, পৃ. ১৯৬

১৭. বাঙালি নারী, পৃ. ৫২

১৮. জীবনের ঝরাপাতা, পৃ. ১৭০

১৯. Women's Struggle: A History of the All India Women's Conference 1927-1990, Aparna Basu and Bharati Roy.

২০. Ibid, p. 5.

২১. Ibid, p. 4.

২২. Ibid, p. 19.

২৩. Ibid, p. 3.

২৪. এ বিষয় নিয়ে রাজশেখর বসু বা পরশুরাম এক ব্যঙ্গমূলক চিত্রাঙ্কন করেছেন 'উলট পুরাণ' গল্পে।

২৫. ভারতী রায়: *স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বাংলাদেশে নারী জাগরণ, ভারত-ইতিহাসে নারী,* পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, পৃ. ৫২।

২৬. ঐ, পৃ. ৫৩।

২৭. ঐ, পৃ. ৫৬।

শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্ত

বাঙালি মেয়ের রাজনীতি-ভাবনা

কয়েকদিন আগে পুণ্যলতা চক্রবর্তীর স্মৃতিকথা *একাল যখন শুরু হল* পড়ছিলাম। পুণ্যলতার মাতামহ দেশসেবক, নারীকল্যাণব্রতী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের এবং তাঁর স্ত্রী ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা অনেকেই জানেন। এই স্মৃতিকথা পড়ে জানতে পারলাম দ্বারকানাথের বড়দিদি কৈশোরে চিরকুমারী থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কেন না কোনও কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে নামমাত্র বিবাহ তাঁর অপমানকর মনে হয়েছিল। তিনি তাই ব্রাহ্ম দ্বারকানাথের কাছে চলে এসে 'বিধবার মতো শুদ্ধচারিণী'-র জীবনযাপন করেন।[১] এ হল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কথা। একে কি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বলা যাবে না? নিজের দেশের অধীনতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত যদি রাজনৈতিক হয়, তা হলে নিজের দেহ-মনের সর্বব্যাপী অধীনতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে জীবন সম্পর্কে এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারাটা কিছু কম রাজনৈতিক নয়। কিন্তু সমাজ-সংসারে মেয়েরা কতটা পরাধীন, সে সম্পর্কে বাঙালি নারীর আত্মচেতনার উন্মেষ তাদের লেখালেখিতে কবে থেকে টের পাওয়া যাচ্ছে— এই প্রবন্ধ সে প্রসঙ্গে প্রবেশের জন্য নয়। যখন থেকে বাঙালি ভদ্রমহিলা পরাধীন দেশের রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্যে জায়গা করে নিতে শুরু করেছে, তখন থেকে ব্রাহ্ম ও হিন্দু ঘেঁষা কয়েকটি সাময়িকপত্রে মেয়েদের লেখালেখির মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক আলোচনার পরিধি কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে— সেটাই খানিকটা দেখার চেষ্টা করব।

বঙ্গভঙ্গের জন্মলগ্নে

১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে বহু পত্র-পত্রিকায় মেয়েদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। *ভারতী* পত্রিকায় স্বর্ণকুমারী দেবী লেখেন 'রমণীর স্বদেশব্রত' আর প্রায় একই সময় *নবনূর* পত্রিকায় খায়রন্নেসা বেগমের 'স্বদেশানুরাগ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।[২] দুটি লেখারই মূল উপজীব্য নারী কীভাবে দেশের মঙ্গলের জন্য পুরুষের পাশে দাঁড়াতে পারে। নারীকে স্বদেশানুরাগী করে গড়ে তোলার

প্রয়োজনে বঙ্গভঙ্গের বছরেই শুরু হয়েছিল 'বঙ্গরমণীগণের জন্য বিশেষভাবে পরিচালিত স্ত্রী-লোক সম্পাদিত একমাত্র পত্রিকা' *ভারত-মহিলা*।[৩] সরযূবালা দত্ত সম্পাদিত এই মাসিক পত্রিকাটিই সম্ভবত মেয়েদের রাজনীতি-সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র। সরলা দেবী চৌধুরানীর সম্পাদনাকালে *ভারতী*-তে জাতি ও দেশগত স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে অনেক সুপরিচিত লেখক-লেখিকাই কলম ধরেছেন। কিন্তু *ভারতী* কখনওই 'বঙ্গরমণীগণের' নিজস্ব পত্রিকা ছিল না, যদিও দেখা যায় যে *ভারত-মহিলা*-য় প্রকাশিত কুমুদিনী মিত্রর 'মাতৃভূমির দুর্দিনে মহিলাগণের কর্তব্য'[৪] শীর্ষক প্রবন্ধের ঝোঁক *ভারতী*-তে প্রকাশিত স্বর্ণকুমারীদেবীর 'রমণীর স্বদেশব্রত' প্রবন্ধ থেকে খুব একটা ভিন্ন নয়। সরযূবালা দত্ত নিজেই তো পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখেছিলেন, ''রাজনীতি হউক, আর শিল্প-বিজ্ঞানই হউক, পুরুষের পার্শ্বে নারী দণ্ডায়মান না হইলে পুরুষ শক্তি কখনও সম্যক বিকশিত হইতে পারে না।''[৫] রাজনীতির ক্ষেত্রেও যখন পুরুষের নারীকে প্রয়োজন, তখন সে প্রয়োজনে সাড়া দিতে হলে দেশের রাজনীতির কিছু খবরাখবরও নারীর রাখা উচিত। সম্ভবত সেই কারণেই *ভারত-মহিলা*-য় শুরু হয় 'রাজনৈতিক কথা' নামক একটি বিভাগ। 'নারী-সংবাদ' নামক আর একটি বিভাগ *ভারত-মহিলা* চালু করে, যার উদ্দেশ্য ছিল বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা ও দেশের অন্যান্য প্রান্তের মহিলা সমিতির দেশাত্মবোধক কাজকর্মের বিবরণ তুলে ধরা।

স্বদেশসেবায় *ভারত-মহিলা* যখন তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে, তখন কুমুদিনী মিত্র-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় *সুপ্রভাত* নামে আর একটি মাসিক কাগজ। যদিও এই কাগজটি 'বঙ্গরমণী'-র জন্য 'বিশেষ ভাবে পরিচালিত' হত না, কিন্তু এখানেও বঙ্গনারীর মনে দেশভক্তি সঞ্চারিত করার উদ্দেশ্যে বহু লেখা প্রকাশিত হত। এখানেই ধারাবাহিকভাবে বেরোয় অরবিন্দ ঘোষের 'কারা-কাহিনী', নগেন্দ্রকুমার গুহরায়ের 'ফরাসী বীরাঙ্গনা জোয়ানদার্ক' এবং ফ্লোরেন্স স্মিথ-এর 'নারীজাতির অধিকার সংস্থাপনের আন্দোলন।' এ ছাড়া 'নারীর কার্য্য' নামক নিয়মিত বিভাগটিতে শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের কাজে নারীর সংঘবদ্ধ প্রয়াস গুরুত্ব পেত।

মনে রাখতে হবে ১৯০৫ থেকে ১৯১৮-এর মধ্যে প্রকাশিত এই দুটি সাময়িকপত্রেরই সম্পাদিকা ছিলেন দু'জন সমাজসংস্কারক নারী। সরযূবালা দত্তর 'ভারত-মহিলা পরিষদ' কুলীনপ্রথা, বহুবিবাহ প্রথা ও বরপণ প্রথার বিরুদ্ধে নিরন্তর অভিযান চালায় এবং একটি বিধবাশ্রম পরিচালনা করে। ব্রাহ্মনেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র-এর কন্যা কুমুদিনী মিত্র আজীবন নারীশিক্ষা, বিপন্না নারীদের রক্ষা ও আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে স্থাপিত 'নারী রক্ষা সমিতি' ও 'নারী কল্যাণ আশ্রম'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁদের দু'জনের নেতৃত্বে, অন্যান্য স্বদেশি পত্রিকার মতো *ভারত-মহিলা* ও *সুপ্রভাত*-এ সেই শিক্ষাই দেওয়া হত, ''যে শিক্ষা স্ত্রীলোকদের মনে হিন্দুভাব বজায় রাখিয়া দেশানুরাগ প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিতে পারে''।[৬] অর্থাৎ সুকন্যা, সুমাতা এবং সুগৃহিণীসুলভ চিরাচরিত ভূমিকাগুলো পালনের মধ্যে দিয়েই যে নারী দেশপ্রেমের আগুন দেশময় ছড়িয়ে দিতে পারে, এটাই ছিল এই পত্রিকাগুলোর বক্তব্য। সে কারণে

'দেশসেবায় নারীজাতি'[৭]-র মতো প্রবন্ধের পাশে স্বচ্ছন্দে সহাবস্থান করত 'একান্নবর্তী পরিবার ও স্ত্রী শিক্ষা'[৮] বা 'আদর্শ ভারত গৃহিণী'[৯]-র মতো প্রবন্ধ। অতীত ইতিহাসে হিন্দু নারীর মহিমান্বিত অবস্থান সম্পর্কে আধুনিকাদের সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে নিয়মিত প্রকাশিত হত 'প্রাচ্য নারীর পূর্ব্বাবস্থা'[১০] বা 'বৌদ্ধ-ধর্মে রমণীর স্থান'[১১] জাতীয় প্রবন্ধ। হিন্দু জাতীয়তাবাদী পরিবারের সুযোগ্যা সদস্য হিসেবে স্বদেশানুরাগের প্রমাণ দিতে হলে প্রথাবহির্ভূত ভূমিকা পালনের কোনও প্রয়োজন তাই ছিল না। স্বদেশি জিনিস ব্যবহারের শপথ নিয়ে, কাচের চুড়ি ভেঙে, স্বদেশি ভাণ্ডারে গয়না ও টাকা দান করে, সন্তানকে সুশিক্ষা দিয়ে ও স্বামী-পুত্রকে বীরোচিত কাজে উদ্বুদ্ধ করে মেয়েরা দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন।

কিন্তু অল্প কয়েকজন সমাজসংস্কারক জাতীয়তাবাদী নেতা ব্যতীত, স্বদেশসেবী বেশির ভাগ হিন্দু পুরুষ কি মনে করেছিলেন যে যাঁদের ওপর পরিবার ধরে রাখার দায় বর্তানো হয়েছে, সেই গৃহলক্ষ্মীদেরও স্বদেশসেবার অধিকার থাকা উচিত? নিশ্চয়ই নয়, কারণ এঁদের বিরুদ্ধে আঙুল তুলে সরলাবালা সরকার লিখেছিলেন যে, স্বামীরা যেখানে বিদেশি দ্রব্য বর্জনের খাতিরে দেশে-বিদেশে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন, দেখা যাচ্ছে যে, স্ত্রীরা সেখানে সাংসারিক প্রয়োজনে বিদেশি জিনিস কিনেই চলেছেন। এর কারণ, স্বামীরা মনে করেন না যে স্ত্রীরা তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানের অংশভাগিনী হওয়ার উপযুক্ত।[১২] যে পুরুষরা জাতি গঠনে অন্তঃপুরিকা, গৃহিণী-জননীর ভূমিকা স্বীকার করেন না, তাঁদের কার্যত চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে এই লেখায়। একই সঙ্গে বাঙালি নারী যাতে বিদ্যাশিক্ষার নামে 'বিলাসিতা শিক্ষা'-য় শিক্ষিত না হয়ে ওঠেন এবং অন্তঃপুরের কার্যক্ষেত্রকে দেশসেবার পক্ষে অল্প পরিসর মনে না করেন— সে সতর্কতাও উচ্চারিত হয়েছে। অর্থাৎ অন্তরালবর্তিনী নারীর পক্ষে সংসারের সব দায়-দায়িত্ব পালন করে বর্ণপরিচয়ের পাতা ওলটানোও যেদিন দুরূহ ছিল, সেদিন সরলাবালার মতো লেখিকার বা সরযূবালার মতো সম্পাদিকার অত্যন্ত সজাগ থাকতে হত যাতে তাঁদের বিরুদ্ধে মূল্যবোধ বিচ্যুতির অভিযোগ না ওঠে।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে মহিলা-সম্পাদিত প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র *বঙ্গমহিলা* যখন প্রকাশিত হয়, তখন *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*-র সম্পাদক আশা প্রকাশ করেন যে, সম্পাদিকা 'অনুচিত বিজাতীয় অনুকরণে' ব্যগ্র না হয়ে 'স্ত্রীজনোচিত শান্তভাব প্রকাশ' করবেন। তারও কয়েক বছর আগে *বামাবোধিনী পত্রিকা*-র সম্পাদক মেয়েদের গদ্য রচনায় উৎসাহিত করে 'স্বামী-স্ত্রীর সদ্ভাব' বা 'শিল্পকর্ম' জাতীয় বিষয় নিয়ে লিখতে পরামর্শ দেন।[১৩] মেয়েরা কী লিখবে বা কীভাবে লিখবে, তা লেখার বিষয় ও ভঙ্গি সম্পর্কে পুরুষতন্ত্র আরোপিত বিধিনিষেধ মাথায় রেখে অতি সন্তর্পণে ছাপার অক্ষরের জগতে পা ফেলতেন বাঙালি ভদ্রমহিলা। পুরুষ ও পরিবারের স্বার্থবিরোধী না হয়েও, ক্ষমতাচাপের বিরুদ্ধে সেদিন মুষ্টিমেয় বাঙালি নারীর এগোবার কৌশল লক্ষ করতে গিয়ে চোখে পড়েছিল *ভারত-মহিলা* পত্রিকায় প্রকাশিত ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুহর প্রবন্ধ 'নারী জাতির রাজনৈতিক অধিকার'।[১৪] বিলেতে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন ওই প্রবন্ধে মিল,

ব্লুন্টস্লি, হার্বার্ট স্পেনসর প্রমুখ দার্শনিকদের নারীর ভোটাধিকার-বিরুদ্ধ মতামত পর্যালোচিত হয়। প্রবন্ধের শেষে সম্পাদিকা টীকা যোগ করেন: "এই প্রবন্ধোক্ত বিষয়ে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। প্রতিবাদযোগ্য অনেক কথা প্রবন্ধে রহিয়াছে। আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে কেহ যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ করিলে আমরা তাহা *ভারত-মহিলা*-য় প্রকাশ করিব। ভাঃ মঃ সঃ।" সম্পাদিকার এই টীকা থেকে স্পষ্ট যে তিনি সমানভাবে পাঠক ও পাঠিকাকে নাগরিক অধিকার নিয়ে কথা বলার আমন্ত্রণ জানিয়ে, *ভারত-মহিলা*-র রাজনৈতিক আলোচনার পরিধি বিস্তৃত করছিলেন। অর্থাৎ স্বদেশব্রতী পুরুষের যোগ্য সহচরী হওয়া যদি মেয়েদের কাজ হয়, তাহলে বিলেতের মেয়েদের ভোটাধিকারের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সম্বন্ধে জানাও তার কর্তব্য।

স্বদেশভক্তির যথেষ্ট 'স্ত্রীজনোচিত' পরিচয় দিয়ে, দেশসেবকদের কাছ থেকে তাঁরা যে অনুমোদন আদায় করেছিলেন, তারই সুবাদে পরবর্তী পর্যায়ে জনজীবনের কয়েকটি বাছাই করা ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রবেশাধিকার মিলেছিল। যে সব ক্ষেত্রে প্রবেশপত্র মিলত, সেই সব ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে তাঁদের চিন্তা-ভাবনা ঠাঁই পেত মূলধারার অগ্রণী পত্র-পত্রিকায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে সর্বভারতীয় স্তরে নেতৃস্থানীয়াদের তরফে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মেয়েদের সংগঠিত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়, যাতে তারা শিক্ষিত ও সচেতন হয়ে তাদের 'নারীসুলভ' গুণগুলোর পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে দেশের ও সমাজের আর পাঁচটা কাজে লাগতে পারে। ১৯১৩ সালে সরলা দেবী চৌধুরানীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভারত স্ত্রী মহা মণ্ডল' এবং ১৯১৭ সালে অ্যানি বেসান্ট ও অন্যান্যদের উদ্যোগে 'উইমেন্স ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'। ১৯১৮ সালে সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে কয়েকজন মহিলা ভারতসচিব মন্টাগু ও বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের সঙ্গে দেখা করে ভারতীয় স্ত্রী-পুরুষের সমান ভোটাধিকার দাবি করেন। সরোজিনী নাইডু মেয়েদের দেশের কাজে আহ্বান করেন যাতে তারা সুগৃহিণীসুলভ গুণগুলো কাজে লাগিয়ে জাতীয় জীবনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারে।[১৫] এরপর ১৯২১ সালে কামিনী রায়, মৃণালিনী সেন ও কুমুদিনী মিত্র-এর নেতৃত্বে 'বঙ্গীয় নারী সমাজ' নামক সংগঠন যখন মেয়েদের ভোটাধিকারের আন্দোলনে শামিল হন, তখন তাঁদের যুক্তি ছিল এই যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিশুকল্যাণের মতো বিষয়গুলোতে শিক্ষিত মেয়েদের মতামত জানাবার ও আইনি সংস্কার সম্বন্ধে সুপারিশ করবার অধিকার থাকা প্রয়োজন। সমাজসেবার কাজে তাঁদের ভূমিকার প্রশংসা করে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ব্রাহ্মনেতা আনন্দমোহন বসুর পুত্র সুধাংশুমোহন বসু মেয়েদের ভোটাধিকারের পক্ষে প্রস্তাব পেশ করে বলেন যে, মেয়েরা রাজনীতিতে যোগ দিলে সমাজসংস্কারমূলক কাজের অনেক সুবিধা হবে।[১৬] এর আগের পনেরো-কুড়ি বছরে অন্তঃপুরের মেয়েদের শিক্ষাদানে, বিধবাশ্রম ও নানা শিল্পাশ্রম পরিচালনায়, বিপন্না নারীদের রক্ষার্থে উদ্ধারকেন্দ্র স্থাপনে, স্বদেশসেবার প্রয়োজনে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' গড়ে তোলায় বাঙালি ভদ্রমহিলা যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তারই সুবাদে অল্প কয়েকজন

শিক্ষিত, নারীকল্যাণব্রতী পুরুষ মেয়েদের ভোটাধিকারের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন আইনসভার ভেতরে ও বাইরে। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ বিরোধীদের চাপে ১৯২১ সালে আইনসভায় মেয়েদের সীমিত ভোটাধিকারের প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়,[১৭] ওই সময় থেকেই বাংলার নেতৃস্থানীয়া সমাজকর্মীরা জোর দিতে থাকেন সমাজ সংস্কারের কাজে মেয়েদের উপযোগিতা প্রমাণে এবং কতগুলো বিশেষ বিষয়ে মেয়েদের প্রশিক্ষণ প্রদানে— যেমন, সেবা-শুশ্রূষা, শিক্ষিকা শিক্ষণ, শিশু মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি।

যে ভদ্রমহিলারা ১৯২১-২২-এ ভোটাধিকারের জন্য সংঘবদ্ধ হচ্ছিলেন, ১৯২৮-এ তাঁদেরই কয়েকজন গড়ে তুলেছিলেন 'বেঙ্গল উইমেন্স এডুকেশন লীগ'। এঁরা একদিকে যেমন প্রাথমিক স্তরে স্ত্রীশিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য আন্দোলনে নেমেছিলেন, অন্যদিকে 'নারীসুলভ' শিক্ষার আদর্শে বিশ্বাসীও ছিলেন। তা ছাড়া, সমাজকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করার সীমিত অধিকার আদায় করতে গিয়ে এঁরা নিজেদের প্রান্তিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই হয়তো পিতৃতান্ত্রিকদের সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে থাকতে চেয়েছিলেন জনজীবনের মূলস্রোতে।

যে ক'জন প্রভাবশালী পুরুষ সমাজসংস্কারের স্বার্থে মেয়েদের ভোটাধিকারের দাবিকে জোরালো সমর্থন জানান, তাঁদের মধ্যে ছিলেন *প্রবাসী* সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। *প্রবাসী* তার জন্মলগ্ন (১৯০১) থেকেই 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামক সম্পাদকীয় বিভাগে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, বালবিধবাদের অবস্থা, পর্দাপ্রথার কুফল ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত প্রচার চালাত। ইংরেজির অধ্যাপক ও ব্রাহ্ম সংস্কারক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মনে করতেন যে, পুরুষের অন্যতম কর্তব্য নারীর 'উন্নতির' জন্য সচেষ্ট হওয়া এবং নারীর কর্তব্য পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন করে, উদ্বৃত্ত সময়ে 'জগতের সেবা করা'। তিনি জানতেন যে, "অনেক দেশে রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রাপ্তা মহিলাদের চেষ্টায় শিশু কল্যাণ প্রচেষ্টা আরব্ধ হইয়াছে এবং বিনা ব্যয়ে সূতিকাগার এবং প্রসূতিদের সেবা-শুশ্রূষা ও খাদ্যের ব্যবস্থা হইয়াছে।"[১৮] অতএব 'মাতৃজাতীয়ারা' যদি শিক্ষিতা ও ভোটাধিকারপ্রাপ্ত হন, তা হলে দেশহিতকর অনেক কাজে তাঁরা যোগ দিতে পারবেন। তাই বিশ ও তিরিশের দশক জুড়ে *প্রবাসী*-তে বহু অগ্রগণ্যা সমাজসেবিকাদের দিয়ে তিনি লিখিয়েছেন। বৃত্তিমূলক শিক্ষা, নারী সমবায়, দুঃস্থ নারীর পুনর্বাসন, ভোটের অধিকার, হিন্দু নারীর আইনি অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে এঁরা সরব হয়েছেন। নারীপ্রগতির পক্ষে যে সহানুভূতির পরিমণ্ডল সম্পাদক নিজেই সৃষ্টি করেছিলেন, সেই পরিমণ্ডলে শিক্ষিতা নারীর কর্তব্য ছিল মেয়েদের উন্নতিতে মন দেওয়া এবং রাজনীতির গা-বাঁচিয়ে সমাজসেবার ক্ষেত্রে নিজের শিক্ষার প্রয়োগ ঘটানো। যে ধরনের প্রকাশ্য কংগ্রেসি মিটিং-মিছিল বা গোপন বিপ্লবাত্মক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়লে 'নারীত্ব' ক্ষুণ্ণ হওয়ার বা কারাবাসের সম্ভাবনা ছিল, সে ধরনের কাজগুলো *প্রবাসী* মেয়েদের সযত্নে এড়িয়ে যেতে বলেছে।[১৯] তাই জনজীবনের কয়েকটি ক্ষেত্রে নারীর উল্লেখযোগ্য অবদান সম্বন্ধে *প্রবাসী*-র পাতা থেকে জোরালো ধারণা করা গেলেও, দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে বাঙালি মেয়ের চিন্তা-চেতনার পরিচয় সেখানে পাওয়া যায় না।

বিশের দশকের শেষ দিকে, *প্রবাসী* যখন খ্যাতির মধ্যগগনে, সেই সময় সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিতে চেয়ে যে মেয়েরা সশস্ত্র বিপ্লববাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে বিপ্লবী কমলা দাশগুপ্ত লিখেছেন:

"অধিকাংশ মেয়েই নিজেদের প্রেরণায় আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। বাবা, মা অথবা অভিভাবকদের অনুমতি অনেকেই পেতেন না; বিপ্লবী কাজে অনুমতি পাওয়া তো প্রায় অসম্ভবই ছিল। অভিভাবকদের অনেকেরই ভয় ছিল সমাজের নিন্দার, ভয় ছিল কন্যার বিবাহ না হওয়ার, ভয় ছিল পুলিশের অত্যাচারের, ভয় ছিল নিজের চাকরি যাবার, ভয় ছিল কন্যার উপর রাজরোষের। এই ভয়ের সীমা পরিসীমা ছিল না।"[২০]

এই সমস্ত ভয়কে দূরে ঠেলে যে মেয়েরা বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মনে হচ্ছিল 'ভাল মেয়ে'-র সংজ্ঞা বদলাবার দিন এসে গেছে।[২১] বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থেকে গোপনে পুরুষ সহযোদ্ধাদের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করার চেষ্টা করলে, চরিত্র সম্পর্কে অনেক বদনাম কিনতে হত মেয়েদের। কিন্তু এই বদনামের ভয়ের থেকে সেদিন তাঁদের কাছে অনেক বড় হয়ে উঠেছিল এটা প্রমাণ করা যে দেশের জন্য মরতে বা জেলে যেতে তাঁরা ভয় পান না। ভারতের 'ঐতিহ্যকে' স্মরণ করে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার তো লিখে গিয়েছেন যে, রাজপুত রমণীরা যদি 'অসীম সাহসের সহিত রণাঙ্গনে যুদ্ধ' করে থাকেন, তা হলে আজকের নারীর ক্ষেত্রে তা করতে বাধা কোথায়?[২২]

শারীরিক ও মানসিক জড়তাস্বরূপ যে বাধা মেয়েদের পেছনের দিকে টেনে রাখছিল, তা দূর করার জন্য বিপ্লবী মেয়েদের ছোট ছোট সংঘ সে সময় সচেষ্ট হচ্ছিল। আদর্শ গৃহিণী-জননী হিসেবে গড়ে না তুলে, দেশের 'ভবিষ্যৎ কর্মীরূপে' মেয়েদের গড়ে তোলার দিকে নজর দিয়েছিলেন বাংলার প্রথম এবং সম্ভবত একমাত্র বিপ্লবী নেত্রী লীলা নাগ (রায়)। প্রথম বললাম এই কারণে যে ১৯২৬ সালে ঢাকার বিপ্লবী দল 'শ্রী সংঘ'-এ যখন লীলা নাগ যোগ দেন, তখনও বাংলার অন্যান্য বিপ্লবী দলে নারী সদস্যভুক্তি নিয়মবিরুদ্ধ ছিল।[২৩] একমাত্র বলার কারণ হল, বাংলার আর কোনও পুরুষপ্রধান বিপ্লবী দলের নারী নেত্রী ছিল বলে জানা যায়নি। শ্রী সংঘে যোগ দেওয়ার আগে 'দীপালি সংঘ' নামক নারী সংগঠন পরিচালনা কালেই তিনি মেয়েদের মধ্যে শঙ্কাহীন দেশসেবার ভাব জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। দীপালি সংঘের মুখপত্ররূপে লীলা নাগের সম্পাদনায় ১৯৩২ সালে *জয়শ্রী* পত্রিকা যখন আত্মপ্রকাশ করল, তখন 'সর্বপ্রকার দেশসেবা'-র কাজে মেয়েদের অনুপ্রাণিত করাই হয়ে উঠল তার লক্ষ্য।[২৪]

প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো *জয়শ্রী* সম্পাদিকা লীলা নাগ মনে করেননি যে 'কোন প্রকার সংগ্রাম মাতৃজাতির উপযোগী'[২৫] কাজ নয়। মেয়েদের কোনও বিশেষ কর্মক্ষেত্র বা 'special calling' আছে, এমনও তিনি বিশ্বাস করতেন না কারণ, তাঁর মতে পুরুষ ও নারী উভয়েরই ঘরের ও বাইরের সব কর্মক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার থাকা উচিত।[২৬] তাই ১৯৩০-এর লবণ সত্যাগ্রহ ও চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনোত্তর পর্বে যখন *জয়শ্রী*-র আবির্ভাব

ঘটল, তখন মেয়েদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিই হয়ে উঠল পত্রিকাটির উদ্দেশ্য। প্রথম সংখ্যা থেকেই সম্পাদকীয় বিভাগ 'আলোচনী'-তে দেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ ও অন্যান্য জরুরি সমস্যার বিশ্লেষণ থাকত। 'আলোচনী'-তে একদিকে যেমন 'গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট' বা 'গোল টেবিল বৈঠকে নারী সদস্য' শীর্ষক সংবাদ স্থান পেত, অন্য দিকে 'স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবার অধিকার'-এর মতো বিষয়ও বাদ যেত না। ছোট গল্প ও ধারাবাহিক উপন্যাসের পাশাপাশি মেয়েরা লিখতেন 'সমাজতন্ত্রবাদের অ, আ, ক, খ', 'বিক্রমপুরের নারী আন্দোলন', 'সোভিয়েত রাশিয়াতে নাগরিক অধিকার' বা 'কর্পোরেশনের মহিলা সদস্য'-দের নিয়ে।[২৭] *প্রবাসী* চেয়েছিল মেয়েদের রাজনীতি থেকে দূরে রেখে তাদের মধ্যে সুনীতিবোধ ও সমাজসেবার ভাব জাগিয়ে তুলতে। তাই সমাজতন্ত্রবাদের মতো রাজনৈতিক বিষয় যেমন *প্রবাসী*-র লেখিকাদের উপজীব্য হয়ে ওঠেনি, তেমনই 'জন্মশাসন'-এর মতো সামাজিক প্রসঙ্গও সযত্নে এড়িয়ে গেছে *প্রবাসী*।

ভারত-মহিলা-র সঙ্গে *জয়শ্রী*-র তুলনা করলে দেখা যায় যে দুটি কাগজই চেয়েছিল নারী যাতে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে ওঠে। তবে দেশকালগত পরিস্থিতির কারণে বিশ শতকের গোড়ায় *ভারত-মহিলা* আর্য নারীর মহিমা প্রচারে এবং আধুনিক নারীর জাতীয়তাবাদী নব্য পুরুষের সুযোগ্য সহধর্মিণী হয়ে ওঠার ওপর জোরটা দিয়েছিল। এর পঁচিশ বছর পর যখন *জয়শ্রী* বেরোতে শুরু করল তখন সশস্ত্র বিপ্লবী মেয়েরা নিজেরাই শরীরচর্চা আর আখড়ায় গিয়ে লাঠিখেলা/ছোরাখেলা শিখতে শুরু করেছে। তাঁদের কাছে অনেক বেশি জরুরি ছিল প্রাচীন ভারতে নারীর গৌরবময় অতীত তুলে ধরার চেয়েও পৃথিবীর সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলনগুলো সম্পর্কে মেয়েদের অবহিত করা। তাই রাশিয়ার সমাজতন্ত্র বা আইরিশ বিপ্লবের আলোচনা প্রতিধ্বনিত হয়েছে *জয়শ্রী*-তে।

মেয়েদের লেখালেখির জগতের রাজনীতি আলোচনা করলে তাই দেখা যায়, যাঁরা লিখতেন তাঁদের লেখার ক্ষেত্রগুলো ছিল ভিন্ন এবং এক-একটি পত্রিকা আলাদা আলাদা উদ্দেশ্যে পরিচালিত ও সম্পাদিত হত। মেয়েরা যে সময়ে, যেভাবে জনজীবনে অংশগ্রহণ করেছে ঠিক সেভাবেই সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে তাঁদের আলোচনার পরিধিও বদলেছে। স্বদেশি আন্দোলনের সময় মেয়েদের রাজনৈতিক আলোচনার ধরনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ রাজনীতির মঞ্চে প্রবেশপর্বে তাঁদের আলোচনার ধরন পৃথক। এর পরের পর্যায়ে ১৯৪০-এর দশকে শ্রেণি চেতনার আলোকে যে মেয়েরা বিভিন্ন গণ আন্দোলনে শামিল হলেন, তাদের ক্ষেত্রে রাজনীতি করার ধরনটা গেল আমূল বদলে।

মালিনী ভট্টাচার্য

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে নারীসৈনিক: কল্পনা-প্রীতিলতাদের কথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *জীয়ন্ত* (১৯৫০) উপন্যাসে ব্রিটিশ পুলিশের বীভৎস অত্যাচার সহ্য করেও কিশোর পাকা তার বিপ্লবী সঙ্গীসাথীদের হদিশ ফাঁস করে দেয় না। কিন্তু সেই বিপ্লবী সঙ্গীরাই তার মামি সুধার ব্যাপারে তার 'পদস্খলনে'র কারণে তাকে একেবারে বাতিল করে দেয়। ওই উপন্যাসেই একটি সাধারণ গ্রাম্য মেয়ে প্রতিমা বিপ্লবী দলে তার কোনও স্থান নেই জেনেও তার প্রেমিক অমিতাভ'র সাহচর্য খোঁজে, গভীর রাত্রে গামছায় বুক বেঁধে ছেলে সেজে সাইকেলের হ্যান্ডেলে বসে পাড়ি দেয় অ্যাকশনে মৃত অমিতাভ'র দেহ শেষবারের মতো দেখবে বলে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী পর্যায়ের অনেক উপন্যাসের চরিত্রের মতোই প্রতিমা ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে যায়। উপন্যাসের শেষ দিকে পাকাকেও আমরা আর প্রত্যক্ষ ভাবে দেখতে পাই না। কিন্তু *জীয়ন্ত* উপন্যাসে ব্রিটিশবিরোধী সশস্ত্র রাজনীতি এবং তার মধ্যে নারীর অবস্থান নিয়ে এই এপিসোড বোধহয় সমালোচকদের যথাযোগ্য নজর পায়নি। *চার অধ্যায়*-এর এলা বা *পথের দাবী*-র সুমিত্রা অনন্যসাধারণ নারী হিসাবেই উপস্থাপিত, স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র আন্দোলন যাদের ব্যক্তিক ঔজ্জ্বল্যের অন্ধকার ঝোড়ো পৃষ্ঠপট। *জীয়ন্ত*-র বৈশিষ্ট্য এখানেই যে ওই আন্দোলনের উচ্চাবচতা ও তার অন্তর্দ্বন্দ্বের থেকেই মূর্তি ধরে উঠে আসে পাকা বা প্রতিমার মতো ব্যক্তিচরিত্র। প্রতিমা তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বন্ধুদের দেখে এই আন্দোলনে আকৃষ্ট, এই বিপদসংকুল গোপন পথকে সেও জানতে চায়, বুঝতে চায়, কিন্তু এর মধ্যে তার প্রবেশাধিকার নেই সে মেয়ে বলে। প্রাথমিক ভাবে হয়তো তার পরিচিত পুরুষ অমিতাভ বা কালীনাথের সূত্রেই তার এই কৌতূহল, মৃত অমিতাভকে দেখে বাড়ি ফেরার পর উপন্যাস থেকে সে অদৃশ্য। কিন্তু অনুমান করা যেতেই পারে যে এরপরে তার সামনে দুটিই রাস্তা আছে— যা দেখেছে তা স্মৃতি থেকে মুছে ফেলা, কিংবা এই সশস্ত্র আন্দোলনের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার তাগিদেই যেভাবে সম্ভব যুক্ত থাকা। এই আন্দোলনের মধ্যে মেয়েদের পক্ষে বাস্তবে কীভাবে আসা সম্ভব হয়েছিল তার এক ধরনের গতিপথ প্রতিমার চরিত্রকে দিয়ে চিহ্নিত করা যায়।

বিপ্লবী কল্পনা দত্তের কাহিনি তাঁর নিজের স্মৃতিচারণ থেকে, চট্টগ্রামের সংগ্রামী অভ্যুত্থানের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য বিপ্লবীদের স্মৃতিকথা থেকে, তীর্থা মণ্ডলের ব্যাপক প্রেক্ষাপট জুড়ে লেখা *Women Revolutionaries of Bengal 1905-1939* থেকে, বা মানিনী চ্যাটার্জির *Do and Die: the Chittagong Uprising, 1930-1934* থেকে আমরা অনেকটাই সংগ্রহ করতে পারি।

একই ধরনের সূত্র থেকে সংগ্রহ করা যায় প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার সংক্রান্ত নানা তথ্য। বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থায় এ ধরনের কিছু কাগজপত্র সংকলিত আছে। অন্যান্য জেলা থেকে যে মেয়েরা এই আন্দোলনে যুক্ত হন তাঁদের উল্লেখও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে রয়েছে। কিন্তু সব কিছু সত্ত্বেও বলব মানবীবিদ্যাচর্চায় গান্ধীবাদী আন্দোলন বা পরবর্তী সময়ে কৃষক আন্দোলনে মেয়েদের ভূমিকা নিয়ে গবেষণার হদিশ মিললেও স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিশেষ পর্যায়ে মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত মেয়েরা পারিবারিক ও সামাজিক গণ্ডি ছাড়িয়ে সশস্ত্র ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে সৈনিক হিসাবে কীভাবে অবতীর্ণ হলেন তা নিয়ে যেন আমাদের কৌতূহল বড়ই কম। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দেন। কনক মুখোপাধ্যায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, যে ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে তাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলন ও সাম্যবাদী আন্দোলনের মধ্যে কোনও বিভেদরেখা টানেননি। কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রামে এসে যাঁদের আন্দোলনে হাতেখড়ি হয়েছিল, তাঁদের বিবর্তনের প্রথম পর্যায়ও তুলনায় অনালোকিত। পারিবারিক সূত্র থেকে, মৌখিক স্মৃতিচারণ থেকে, চিঠিপত্র ইত্যাদি থেকে এখনও হয়তো মেয়েদের ইতিহাসের এই পর্বটি উদ্ধার করার কিছু সুযোগ রয়ে গেছে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি বড় ভূমিকা ছিল। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম বলি ভারতের কৃষকশ্রেণি; বর্ধিত শোষণের ফলে ক্রমবর্ধমান দুর্দশা অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই একাধিকবার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কৃষক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে। মধ্যবিত্ত ব্রিটিশ শাসনে কিছু কিছু প্রাথমিক সুবিধা পেয়েছিল, তাদের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ মাথাচাড়া দিয়েছে অনেক পরে। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই নিজেদের অধঃপতিত ও পরাধীন অবস্থা সম্বন্ধে ক্ষোভ ও গ্লানি এবং সেই গ্লানি থেকে মুক্ত এক আধুনিক সমাজগঠনের অভীপ্সা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। এই আধুনিকতার অনুসন্ধান প্রথমে চলেছে সমাজসংস্কারমূলক বিভিন্ন আন্দোলনের পথে, আর উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে এই অনুসন্ধানই জাতীয়তাবাদী চেতনার আধারে নতুন রূপ নিয়েছে। যে ইংরেজি শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যের প্রসাদভোগী, বশংবদ একটি শ্রেণি তৈরি করা, তার সামাজিক ফলাফল সর্বথা সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনাকে অনুসরণ করেনি। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্তদের মধ্য থেকেই প্রথাগত সমাজের পারিবারিক, ধর্মীয় এবং জাতপাতভিত্তিক অনুশাসনগুলিকে নিয়ে প্রশ্ন করা এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে এবং পরবর্তী সময়ে জাতীয় আন্দোলনের অহিংস এবং সশস্ত্র এই দুটি ধারাতেই শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের একাংশ একটি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। বিংশ শতকের শুরু থেকে

ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনের একটা ইতিহাস আছে, বিশেষত বাংলায়, যেখানে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবক এবং যুবতীদেরই প্রাধান্য। ওই সময়ের পরে জাতীয় আন্দোলন একটি গণ আন্দোলনে পরিণত হয়। কৃষক, শ্রমিক ও ব্যাপক জনসাধারণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলনের ধারা বহুমুখী হয়ে ওঠে। শ্রমিকশ্রেণি ও কর্মচারীদের মধ্যে সাধারণ ধর্মঘট ও বিভিন্ন সংগ্রামী কর্মসূচি, কৃষকের দাবি নিয়ে তেভাগা আন্দোলন, সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর মধ্যে অভ্যুত্থান— এই সমস্ত ঘটনাই স্বাধীনতা সংগ্রামের তীব্রতাকে পুষ্ট করতে থাকে। কিন্তু এই পর্বের আগে পর্যন্ত বা এই পর্বেও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মধ্যবিত্ত শ্রেণির তরুণ প্রজন্মের একটা বড় ভূমিকা ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁদের পরিচালিত সশস্ত্র সংগ্রামের অনেক দুর্বলতা ছিল। রবীন্দ্রনাথের *চার অধ্যায়* উপন্যাসে এই সব দুর্বলতার যে সমালোচনা আমরা পাই, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বা সতীশ পাকড়াশির মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও পরবর্তীকালে তাঁদের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে সেগুলির কথা মেনে নিয়েছেন। ব্যাপক জনসাধারণকে তাঁদের দিকে টেনে আনতে না-পারা, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, কখনও কখনও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা— এই সব সুপরিচিত মধ্যবিত্ত বিচ্যুতি এই সশস্ত্র সংগ্রামের চরিত্রের একটা দিক। কিন্তু তাঁদের অসমসাহস ও ত্যাগস্বীকার যে স্বাধীনতা আন্দোলনকে তীব্রতর করে তুলতে সাহায্য করেছিল তা অনস্বীকার্য।

উনিশ শতকের মধ্যবিত্ত তরুণগণ যে বিষয়টিকে সমাজসংস্কারের একটি প্রধান কেন্দ্রবিন্দু করে তুলেছিল, তা হল নারীমুক্তির সমস্যা। বিশেষত হিন্দু সমাজে, মেয়েদের সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে হীন অবস্থার বিষয়টি তখন হয়ে দাঁড়িয়েছিল সমগ্র দেশীয় সমাজের অধঃপতিত পরিস্থিতির একটি দগদগে উদাহরণ। সতীদাহ প্রথা-বিরোধী আন্দোলন থেকে মেয়েদের শিক্ষার দাবি নিয়ে লড়াই, বিধবাবিবাহ বা সম্মতিদানের বয়সসংক্রান্ত বিতর্ক— সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে আধুনিকতা ও আত্মমর্যাদার জন্য শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এই যে অনুসন্ধান— তার অনেকটাই নারীমুক্তির সমস্যাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। অনেক গবেষক মনে করেছেন, যে বিশ শতকের গোড়ায় যখন জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটতে থাকল, তখন ক্রমবিবর্তিত জাতীয়তাবাদী কর্মসূচির মধ্যে মেয়েদের অধিকারের প্রসঙ্গটি ক্রমশ গৌণ হয়ে গেল। মেয়েদের সম-অধিকারের প্রশ্নটিকে রাজনৈতিক আন্দোলনের আশু কর্মসূচির চাপে স্থগিত করে রাখা হল, অথবা এই আন্দোলনের সাফল্যের ওপরই ওই প্রশ্নের সমাধান নির্ভরশীল, এ রকম একটা মানসিকতা প্রাধান্য পেয়ে গেল— পূর্বোক্ত গবেষকরা এ রকমই মত প্রকাশ করেছেন। জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের মধ্যে তাঁরা এক নয়া পিতৃতন্ত্রের সন্ধান পেয়েছেন, যার মাধ্যমে মেয়েদের সম-অধিকারের প্রসঙ্গটিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা যেতে পারে।

জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের মধ্যে কতগুলি পিতৃতান্ত্রিক উপাদানের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে, এ কথা স্বীকার করলেও উপরোক্ত গবেষকদের যুক্তিকে সম্পূর্ণ মেনে নিতে কিছু বাধা থেকে যায়। তাঁদের যুক্তির মধ্যে এমন একটি প্রাক্‌ধারণা রয়ে গেছে যে নারীমুক্তির প্রসঙ্গটি ধ্রুব ও অপরিবর্তনীয় একটি প্রসঙ্গ, ইতিহাসের পরিবর্তিত প্রেক্ষিত তাতে কোনও নতুন মাত্রা নিয়ে আসতে পারে না। তাঁরা ধরেই নিচ্ছেন যে উনিশ শতকের প্রথম পর্বে—

যখন নাকি মেয়েদের নিজেদের কণ্ঠরুদ্ধ ছিল এবং কতিপয় উদার মনোভাবসম্পন্ন পুরুষই আধুনিক সমাজগঠনের লক্ষ্যে নারীর ওপর অবিচারের প্রতিবাদ করছিলেন— তখন তাঁদের কাছে এই প্রসঙ্গটির যে অর্থ ছিল, আর উনিশ শতকের শেষ দিকে কিছু কিছু মেয়ে যখন লেখাপড়া শিখে গৃহকোণ থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছেন— তখনও এই প্রসঙ্গটির তাৎপর্য একই। তাঁরা যেন বলতে চাইছেন, উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের গোড়ায় রাজনৈতিক আন্দোলনের যে বাতাবরণ তৈরি হল, নারীমুক্তির প্রশ্নটিকে চাপা দেওয়া বা অপ্রাসঙ্গিক করে তোলাই তার কাজ। যেন, মেয়েরা যখন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে শুরু করলেন, তখন একটা চাপিয়ে-দেওয়া মতাদর্শের বাধ্যবাধকতা থেকেই তা করলেন এবং নারীমুক্তির সমস্যাটিকে স্থগিত রেখেই তা করা হল। অন্যভাবে বলতে গেলে, এই গবেষকদের মতে রাজনৈতিক আন্দোলন মেয়েদের ব্যবহার করেছে এবং এই ব্যবহৃত হওয়ার সুবাদে তাঁদের 'নিজস্ব' প্রসঙ্গগুলিকে তাঁরা উহ্য রাখতে বাধ্য হয়েছেন।

এই প্রবন্ধটিতে আমি বলতে চাইছি যে উপরে উল্লিখিত এই মতবাদটি রাজনৈতিক আন্দোলন এবং নারীমুক্তির প্রসঙ্গটির পারস্পরিক সম্পর্কের অতি সরলীকরণ করেছে এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টির সম্পূর্ণ একমাত্রিক ব্যাখ্যা দিচ্ছে। বস্তুত, *ঘরে বাইরে* বা *চার অধ্যায়* উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথও রাজনৈতিক আন্দোলনে মেয়েদের অংশগ্রহণকে 'অস্বভাবী' বলেই মনে করেছেন। এর জটিল চোরাঘূর্ণিতে আটকে পড়ে তারা নিজেদের আত্মস্থতাকে হারাচ্ছে, এ রকম চিন্তার আভাস আমরা এই দুটি উপন্যাসে পাই। সেদিক থেকে বলতে গেলে মনে হয় উপরে উল্লিখিত নারীবাদী তত্ত্বও 'নারীস্বভাব'কে শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় বলে ধরে নেওয়ার থেকে বেশি দূর এগোতে পারেনি।

ব্রিটিশ আমলে সরকার যখন রক্ষণশীলদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মেয়েদের স্কুলশিক্ষার জন্য কিছু কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করল, তখন কেবলমাত্র মানবিক উদ্দেশ্যে তারা তা করেনি। তার পেছনে এমন একটা ভাবনাও ছিল যে একমাত্র এই সব মেয়েরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনের অন্ধকার সভ্যতাবর্জিত কোণগুলি আলোয় উদ্ভাসিত হবে এবং বাঙালি পুরুষদের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সম্ভাবনা কমে যাবে, মেয়েরাই তখন সেই বিদ্রোহের রাশ টেনে রাখবে। রক্ষণশীলদের প্রতিরোধ কিন্তু থেকেই গিয়েছিল এবং বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশক পর্যন্তও দেখা যায় যে এই শ্রেণিগুলির মধ্যে নারীশিক্ষা সীমিতই রয়ে গিয়েছে। তবু নিষেধের বেড়াজাল ভেঙে যে মেয়েরা সে সময়ে উচ্চশিক্ষার প্রাঙ্গণে পৌঁছেছিলেন, তাঁরা সবাই যে শিক্ষাকে 'সুখী গৃহ' তৈরি করার কাজেই ব্যবহার করেননি এটা প্রমাণিত। পুরুষদের মধ্যেও যেমন আধুনিক শিক্ষার প্রসার তাঁদের সচেতন করে তুলেছিল পরাজিত ও পরাধীন অস্তিত্বের গ্লানি সম্বন্ধে, এবং তাঁদের মধ্যে দেশকে স্বাধীন করার ইচ্ছার জন্ম দিয়েছিল, ঠিক একই ভাবে মেয়েদের মধ্যেও এই শিক্ষা পরাধীনতার অসহনীয় লজ্জা সম্বন্ধে সচেতনতার ফসল ফলিয়েছিল। ওই বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে এই লজ্জা দূর করার যে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের পরিকল্পনা, তার প্রভাব মেয়েদের ওপরেও যদি পড়েই থাকে এবং তাদের

কাছে যদি এটা একটা আশু কর্তব্য বলে মনে হয়, তা হলে কি তাকে 'স্বভাব'-এর বিরুদ্ধে বিচ্যুতি বলেই চিহ্নিত করতে হবে? নারীসত্তা কি রাজনৈতিক আন্দোলনে আলোড়িত পরাধীন দেশের মানুষ হিসাবে তার আত্মসচেতনতার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটা কিছু, যা এই বৃহত্তর আন্দোলনগুলির বিপরীত পথেই শুধু যায়?

মধ্যবিত্ত শ্রেণির তরুণ প্রজন্মের দ্বারা পরিচালিত সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে উচ্চবর্গীয় (elitist) এবং পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রভাব থাকলেও, মেয়েরা যে কেবলমাত্র পুরুষ-প্রবর্তিত মতাদর্শের চাপেই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন, এই সিদ্ধান্ত খুবই একমাত্রিক। কেবল সশস্ত্র আন্দোলনেই নয়, গান্ধীবাদী আন্দোলনেও পিতৃতান্ত্রিক নির্দেশ মেয়েদের অংশগ্রহণের মধ্যে সর্বাংশে অনুসৃত হয়নি। সশস্ত্র আন্দোলনের নেতৃবর্গ প্রথম দিকে মেয়েদের সরাসরি অংশগ্রহণেরই বিপক্ষে ছিলেন, কিন্তু গান্ধীজি সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। ১৯২১ সালে বিদেশি বস্ত্র বর্জন আন্দোলনের সময়েই গান্ধীজি একথা বলেছিলেন যে, স্বরাজ অর্জনে ভারতের মেয়েদেরও সমান অংশগ্রহণ করতে হবে। এই সময়েই কলকাতায় বাসন্তী দেবী এবং ঊর্মিলা দেবী খদ্দর বিক্রি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তারবরণ করেন। বস্তুত গান্ধীজির মতে অহিংস আন্দোলনে শারীরিক শক্তির চাইতে আত্মিক শক্তি এবং স্থৈর্যের প্রয়োজন বলেই সেখানে মেয়েদের অংশগ্রহণ বিশেষ জরুরি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে এই গুণগুলি নারীর চরিত্রেরই স্বাভাবিক অঙ্গ। অর্থাৎ গান্ধীজিও রবীন্দ্রনাথের মতোই নারীস্বভাবের কতগুলি ধ্রুব এবং অপরিবর্তনীয় লক্ষণ অনুমান করে নিয়ে সেই আদল অনুযায়ীই তাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনে যোগ দেবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। নারীস্বভাব রক্ষা করে এবং নারীর প্রত্যাশিত গার্হস্থ্য দায়িত্ব পালন করেই তারা স্বাধীনতা-আন্দোলনের শরিক হতে পারে এটাই ছিল তাঁর মত। কিন্তু অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিতে গিয়েও মেয়েদের এটাই অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে গৃহের গণ্ডি একবার ছাড়িয়ে গেলে প্রকাশ্য রাজনীতির ময়দানে নারীর প্রত্যাশিত ভূমিকার বাইরেও অনেক কিছুই করতে হয়, ব্রিটিশ পুলিশের ডান্ডা সত্যাগ্রহী নারীকেও রেয়াত করে না। গার্হস্থ্যজীবনের আব্রু জেলের মধ্যে অনেক সময়েই রক্ষিত হয় না। লবণ সত্যাগ্রহের সময়ে সরোজিনী নাইডুর অনুরোধেই গান্ধীজি মেয়েদের অংশগ্রহণে সম্মতি দেন এবং যাঁরা লবণ সত্যাগ্রহে যোগ দিয়েছিলেন 'নারীসুলভ' লজ্জা, কোমলতা এমনকী শারীরিক শুচিতার সংস্কার কাটিয়েই তাঁদের পুলিশি অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

আর সশস্ত্র আন্দোলনে যে মেয়েরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের তো নারীসুলভ সংস্কারগুলি বর্জন করার জন্য আরও অনেক বেশি প্রস্তুতি নিতে হয়েছিল। প্রথমত, মেয়েদের অংশগ্রহণ বিষয়ে নেতৃবৃন্দেরই গুরুতর দ্বিধা ছিল। দ্বিতীয়ত, তাঁদের পিছনে পারিবারিক কোনও সমর্থন প্রায়শই ছিল না। তৃতীয়ত, আন্দোলনের চরিত্রটাই এমন ছিল যে মেয়েদের প্রথাগত গার্হস্থ্য ভূমিকাকে প্রতিপদেই অতিক্রম করতে হত এবং যে কোনও শারীরিক বিপদ বা শারীরিক সংঘাতের জন্য তৈরি থাকতে হত। অর্থাৎ যে সশস্ত্র সংগ্রামে মূলত পুরুষরাই নেতৃত্বের স্থানে রয়েছে, তার মধ্যে মেয়েরা যখন অংশগ্রহণ করছেন তখন যে নেতৃত্বের প্রত্যাশিত

নারীভূমিকাটুকু পালন করেই তাঁরা থেমে যাচ্ছেন, তা নয়। আন্দোলনের অন্তর্নিহিত যুক্তিই তাঁদের এমন কাজের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে ওই প্রত্যাশিত ভূমিকার গণ্ডি অতিক্রম করতে তাঁদের দ্বিধা থাকছে না। সশস্ত্র সংগ্রামে যুক্ত নারীর নারীসত্তাকে পরাধীন দেশের একজন মানুষ হিসাবে তাঁর সচেতনতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখা তাই অসম্ভব। বস্তুত ঐতিহাসিক মুহূর্তে এই সচেতনতাই তাঁকে নারীত্বের প্রথাবদ্ধ গণ্ডি পেরিয়ে যেতে সাহায্য করছে। গার্হস্থ্য ভূমিকার বাধ্যবাধকতাই যে শুধু তিনি ভেঙে বেরিয়ে আসছেন তাই নয়, আন্দোলনের মধ্যে তাঁর জন্য যে স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তাঁর নিজের আগ্রহ ও প্রচেষ্টাতেই ক্রমশ তা বৃদ্ধি পেয়েছে। নেতৃত্বকে তাঁরা বাধ্য করেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক হিসাবে তাঁদের মর্যাদা দিতে। আন্দোলনে অংশগ্রহণের অন্তর্নিহিত এই দ্বান্দ্বিকতাকে ভুলে গিয়ে সশস্ত্র আন্দোলনে তাঁরা শুধু ব্যবহৃত হয়েছিলেন এ কথা বললে তাঁদের সচেতনতার ইতিহাসকেই অগ্রাহ্য করতে হয়।

আগেই বলেছি যে বিশেষত বিশের দশকের শেষ ও ত্রিশের দশকের গোড়া থেকে স্বাধীনতার চেতনাকে উন্মেষিত করার ক্ষেত্রে এবং বিশেষত সশস্ত্র আন্দোলনের সংকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষার একটা পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। পূর্ববর্তী পর্যায়ে যখন সশস্ত্র আন্দোলনে মেয়েরা মূলত সহায়কের কাজ করছিলেন, অর্থাৎ খবর পৌঁছে দেওয়া, নিষিদ্ধ কাগজপত্র বা অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখা বা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা— এগুলিই তাঁদের মূল কাজ ছিল, তখন বেশ কিছু অল্পশিক্ষিত গৃহবধূও পরিবারে কোনও বিপ্লবী কর্মী থাকলে তাঁদের সাহায্যার্থে এ সব কাজ করেছেন। দু'-একজন এ কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে ব্রিটিশ আদালতে দণ্ডও পেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বীরভূমের দুকড়িবালা দেবীর কথা সবচেয়ে আগে বলতে হয়। তাঁর বোনপো নিবারণ ঘটক ছিলেন 'যুগান্তর' দলের সদস্য, এবং তাঁর প্রভাবেই দুকড়িবালা দেবীর মধ্যে স্বাধীনতা-চেতনার উন্মেষ ঘটে। কয়েকটি 'মাউজার' পিস্তল তাঁর হেপাজতে লুকনো ছিল, এই অপরাধে ১৯১৭ সালে তাঁর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর বেশি এগোয়নি। কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু ঘরের দেয়াল পেরিয়ে চেতনার ঢেউ তাঁকেও স্পর্শ করেছিল। অন্যদিকে পরবর্তী প্রজন্মের যে তরুণীরা প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই স্কুল বা কলেজের ছাত্রী ছিলেন, অনেকে পরবর্তীকালে উচ্চশিক্ষা সম্পূর্ণও করেছিলেন। কম বয়সে তাঁদের বিয়ে হয়ে যায়নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বেথুন কলেজ বিশের দশকের শেষ ভাগে অগ্নিদীক্ষায় দীক্ষিত মেয়েদের একটি কেন্দ্র ছিল।

কমলা চ্যাটার্জি, কল্যাণী দাশ, কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার সকলেই এই কলেজের স্নাতক। লীলা নাগও বেথুন থেকে স্নাতক, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। প্রীতি ঢাকা ইডেন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে এসেছিলেন। বীণা দাশ ১৯৩১ সালে বি এ পাশ করেন কলকাতার সেন্ট জন্‌স ডায়োসেশন কলেজ থেকে। ওই কলেজের বনলতা দাশগুপ্ত ও জ্যোতিকণা দত্তও আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। শান্তি ঘোষ এবং সুনীতি চৌধুরী যখন (১৯৩১) কুমিল্লার জেলাশাসককে হত্যার চেষ্টা করে গ্রেপ্তার হন তখন তাঁরা সবে কুমিল্লার ফয়জুন্নেসা গার্লস স্কুলে অষ্টম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণিতে ওঠার পরীক্ষা দিয়েছেন।

কলকাতা ছাড়াও, কুমিল্লা, ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রীরা সশস্ত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছিলেন। সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের জেলা কংগ্রেস কমিটি ১৯২৯ সালেই প্রকাশ্য আন্দোলনে ছাত্রীদের যুক্ত করার জন্য একটি নারী সম্মেলন করেছিল, এই ক্ষেত্রে যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সশস্ত্র আন্দোলনে যোগ দেবার পথে একটি পদক্ষেপ। কলকাতায় কল্যাণী দাশের প্রতিষ্ঠিত গার্ল স্টুডেন্টস্ সোসাইটি— কল্পনা ছাত্রী থাকতে যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, বা আরও আগে ঢাকায় লীলা নাগের নেতৃত্বে গঠিত দীপালি সংঘ-জাতীয় কিছু কিছু সংগঠনের মাধ্যমে ছাত্রীরা আন্দোলনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, অল্পসংখ্যক যে ছাত্রীরা তখন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এসেছিলেন, তার মধ্যে সশস্ত্র আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন আরও মুষ্টিমেয় একটি অংশ। সুতরাং স্কুলকলেজের শিক্ষার সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হবার কোনও কার্যকারণ সম্পর্ক এখানে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু এইটুকু বলা যেতেই পারে যে ওই বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে শিক্ষার সুযোগ স্বাধীনতার আগ্রহকে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে, স্বনির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এবং মননের দিক থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের তাৎপর্য বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল। নানা বইপত্র পড়ার সুযোগ তাঁদের ছিল। বহুদিন আগে উনিশ শতকে, বেথুন স্কুল স্থাপিত হবার প্রথম পর্বে, নারীশিক্ষাই যখন একটি বিতর্কিত বিষয় ছিল, তখন বিতর্কের একটি মূল প্রসঙ্গ ছিল গৃহের চৌহদ্দি ছেড়ে মেয়েদের প্রকাশ্য জগতে চলাফেরা করা। নারীশিক্ষার বিরোধী অনেক রক্ষণশীল মানুষও বাড়ির ভিতরে স্বপরিবারের মেয়েদের জন্য পড়াশুনোর ব্যবস্থা করতে অরাজি ছিলেন না। তাঁদের মূল আপত্তি ছিল মেয়েদের পড়াশুনোর জন্য বাইরে সময় কাটানোতে। মেয়েরা প্রাকাশ্য জগতে বেরোতে শুরু করলে তাদের ওপর আর নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, এমন ভয় তাঁদের মনে ছিল। যারা বাইরে বেরোয়, ঘরকন্নার জন্য যেটুকু প্রয়োজন তার বেশি পড়াশুনো করে, স্বাধীনভাবে বাইরের লোকের সঙ্গে, তথা পুরুষদের সঙ্গে মেশে এবং নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেয়, তাদের সম্বন্ধে নানা কটুকাটব্যের মাধ্যমে ভয় ও ঘৃণার একটা মনোভাব প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছিল তখন থেকেই। ১৯২০-র দশক থেকে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আগত কিছু তরুণী প্রমাণ করলেন যে, শিক্ষাব্যবস্থা তার ভিতরের অনেক স্ববিরোধ সত্ত্বেও যখন মেয়েদের জন্য কিছুটা সামাজিক পরিসর সৃষ্টি করে, গার্হস্থ্যজীবনের বাইরেও তাদের অস্তিত্বের একটা যুক্তি তৈরি করে, তখন মেয়েদের পক্ষে তার সুযোগ নিয়ে তাদের প্রথাগত ও প্রত্যাশিত ভূমিকার অনেকটাই বাইরে যাওয়া সম্ভব হয়।

কল্পনা, প্রীতিলতা, শান্তি, সুনীতি, বীণা দাস, কমলা চ্যাটার্জি বা উজ্জ্বলা মজুমদার— যার কথাই আমরা ভাবি না কেন, মনে হয় এঁরা ছিলেন এক নতুন প্রজন্মের নারী, যাঁদের চলাফেরায় অনেকখানি স্বাধীনতা ছিল, ঢাকা-কলকাতা-চট্টগ্রাম-কুমিল্লা যাঁরা একা একাই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়াতে অভ্যস্ত ছিলেন, অনাত্মীয় পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশায় যাঁদের দ্বিধা ছিল না, এবং বাড়ির বাইরে বেশ খানিকটা সময় কাটানোর মতো

আত্মনির্ভরতা যাঁদের ছিল। আত্মগোপন অবস্থায় থাকতে গিয়ে পুরুষ-সহযোদ্ধাদের সঙ্গে একই জায়গাতে তাঁদের দিনের পর দিন কাটাতে হয়েছে, কখনও পুরুষের বেশে যাতায়াত করতে হয়েছে, কখনও পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য কারও স্ত্রী-পরিচয়ে একই বাড়িতে তাঁরা বসবাস করতে বাধ্য হয়েছেন। সুহাসিনী গাঙ্গুলিকে এই রকম পরিস্থিতিতে যখন পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, তখন তাঁর ওপর অনেক অত্যাচার চালিয়েও তাঁকে দিয়ে তারা কবুল করাতে পারেনি, যাঁদের সঙ্গে এক বাড়িতে তিনি ছিলেন, তাঁদের প্রকৃত পরিচয় কী। কল্পনা দত্ত যে সময়ে বেথুন থেকে চট্টগ্রাম কলেজে এসে ভর্তি হন তখন সূর্য সেন তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন ল্যান্ডমাইনের জন্য 'গান-কটনে'র উপাদান কলকাতা থেকে সংগ্রহ করে আনতে। কলকাতার বিপ্লবী মেয়েদের কাছ থেকে টাকা তুলে 'গান-কটনে'র অধিকাংশ নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিড কল্পনা নিজে তাঁর দুই সাথী নলিনী ও সরোজিনী পালের সাহায্যে চট্টগ্রামে নিয়ে আসেন। গৃহবন্দিত্বে অভ্যস্ত কোনও মেয়ের দ্বারা এমন কাজ সম্ভব হত না। ১৯৩২ সালে ধলঘাটে পুলিশের সঙ্গে যে সংঘর্ষে নির্মল সেন ও ভোলা সেনের মৃত্যু হয়, বিবরণ পড়লে দেখা যায় গভীর রাত্রে প্রীতিলতা সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন সূর্য সেনের আহ্বানে অন্যান্যদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য, সেই সময়েই পুলিশ খবর পেয়ে আক্রমণ চালায়। ছিয়াত্তর বছর আগে ১৯৩২ সালে মফস্সল শহরের এক বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের তরুণী রাত দশটায় বিপদসংকুল পথ পেরিয়ে এক অপরিচিত জায়গায় বিপ্লবের প্রয়োজনে এসে হাজির হচ্ছেন, এর মধ্যে শুধু অসাধারণ সাহস নয়, অসাধারণ চলিষ্ণুতারও পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে৷ গৈরলা (ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩) এবং গহিরার (মে, ১৯৩৩) যে দুটি সংঘর্ষের ঘটনায় প্রথমে সূর্য সেন ও পরে তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত গ্রেপ্তার হন, তার বিবরণে দেখা যায়, অজ পাড়াগাঁয়ে বিশ্বস্ত সমর্থকের বাড়িতে পুরুষ বিপ্লবীদের সঙ্গেই আত্মগোপন করে রয়েছেন তরুণী অবিবাহিতা কল্পনা দত্ত। যে বাড়িতে রয়েছেন, তাঁরাও সেটা মেনে নিয়েছেন। গৈরলায় সূর্য সেন গ্রেপ্তার হলেও কল্পনা অন্যান্যদের সঙ্গে যেভাবে পালিয়েছিলেন, সেটাও একটা রোমহর্ষক কাহিনি।

এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, এঁদের জীবন ওই সময়কার আর পাঁচজন মধ্যবিত্ত ঘরের তরুণীর মতো নয়। তাঁদের জীবন থেকে এটা প্রমাণ হয় না যে তখন মেয়েদের গতিবিধির পরিসীমা সাধারণভাবে অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। কল্পনা, প্রীতি, বীণা বা উজ্জ্বলা নিজেরাই তাঁদের শিক্ষার ক্ষেত্র, বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ, বা বাড়ির বাইরে পরিবার থেকে আলাদা থাকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এমন ভাবেই নিজেদের তৈরি করেছিলেন যাতে আন্দোলনের স্বার্থে মেয়েদের প্রথাগত ভূমিকার বাইরে গিয়েও তাঁরা কাজ করতে পারেন। যে সমাজে শত শত বছর ধরে মেয়েদের বোঝানো হয়েছে যে, পরপুরুষের দৃষ্টি তাদের মুখে পড়লেই তাদের শারীরিক পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে, সেখানে ঘরের গণ্ডি পেরিয়ে প্রকাশ্য জগতে এসে কাজ করতেই মেয়েদের অনেক দিনের অনেক সংগ্রাম প্রয়োজন হয়েছে। তা নিয়ে অনেক গবেষণা এবং চর্চাও আমরা ইদানীং হতে দেখছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নারীবাদী গবেষকদের মধ্যে এ রকম একটা

বদ্ধমূল ধারণা রয়ে গিয়েছে যে, যে মেয়েরা কোনও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন, সেই আন্দোলনের যুক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে নারীমুক্তির প্রসঙ্গটিকে তাঁরা স্থগিত করে রেখে দেন। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তাই তাঁরা মনে করেন, রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত নারীদের নিয়ে গবেষণা করে লাভ নেই। বরং রাজনৈতিক আন্দোলন যে তাঁদের একটা সংকীর্ণ গণ্ডিতেই বেঁধে রেখেছিল এই প্রাক্‌ধারণাটার প্রমাণ খুঁজেই তাঁরা সাধারণত ক্ষান্তি দেন। অহিংস আন্দোলনে মেয়েদের অংশগ্রহণ নিয়ে কিছু নারীবাদী বিশ্লেষণ যদিও বা পাওয়া যায়, সশস্ত্র সংগ্রামে যোগদানকারিণীদের সম্বন্ধে ধরেই নেওয়া হয়েছে যে তাঁরা তাঁদের দলীয় নেতৃত্বের হাতের পুতুল ছিলেন। সুতরাং তাঁদের সম্বন্ধে নারীবাদী গবেষকরা নীরব থেকে গেছেন। একটা জীবন্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে যে দ্বান্দ্বিকতা থাকে তাকে কোনও স্বীকৃতি দিতে তাঁরা নারাজ। এই নীরবতাকে ভেঙে সশস্ত্র আন্দোলনে যুক্ত মেয়েদের নিয়ে নারীবাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই প্রকৃত নিরক্ষেপ বিশ্লেষণ হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয়।

সশস্ত্র আন্দোলনে যুক্ত তরুণীরা খুব ভালভাবেই জানতেন যে, তাঁরা যে জীবনের মধ্যে প্রবেশ করছেন, তাঁদের সমাজে তা কোনও সমর্থনই পাবে না। ব্রিটিশ শাসককুল এবং পুলিশ কখনও তাঁদের সম্বন্ধে এমন ধারণা হতে দিতে চায়নি যে, পরাধীনতার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে, অহিংস পদ্ধতিতে ব্রিটিশ শক্তিকে সরানো যাবে না, এই বিশ্বাস থেকেই এই মেয়েরা সশস্ত্র সংগ্রামের পথে এসেছিলেন। হয়তো তারা নিজেরাও ভাবতে পারেনি যে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত তরুণীরা রাজনৈতিক বিশ্বাসের কারণে এতদূর যেতে পারে। তাদের নথিপত্রে তাই তারা এই তরুণীদের দায়বদ্ধতাকে ব্যাখ্যা করতে রগরগে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। এঁদের ছবিতে নিজেদের মনের কালি মাখিয়ে তারা কখনও বলেছে প্রীতিলতা 'was said to have been the lover of Nirmal Sen', (যার একমাত্র কারণ ধলঘাটে, যেখানে নির্মল সেন নিহত হন, সেখানে প্রীতির একটি ছবি পাওয়া গিয়েছিল), আবার কখনও বলেছে প্রীতি "had been closely associated with, if not actually the mistress of the terrorist Biswas, who was hanged for the murder of Inspector Tarini Mukherji", যেহেতু প্রীতি দলের নির্দেশে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সেলে তাঁর বোন পরিচয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন। অর্থাৎ কোনও না কোনও পুরুষের প্রভাবেই তাঁরা আন্দোলনের মধ্যে এতটা জড়িয়ে পড়েছেন এটাই তারা প্রমাণ করতে চাইছিল। এই মিথ্যা ধারণাটা রয়েছে বলেই এটা আরও ভাল করে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে, এই মেয়েরা কি পুরুষনেতৃবৃন্দের চাপের বশবর্তী হয়েই আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকা পালন করেছিলেন, না নিজেদের বুদ্ধি, যুক্তি, অভিজ্ঞতারই ফসল তাঁদের আন্দোলনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত?

এ বিষয়ে মোটামুটি সকলেই একমত যে সশস্ত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ মেয়েদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্যে টেনে আনার বিরোধী ছিলেন। তাঁদের দিক থেকে এর কতগুলি যুক্তি ছিল। যদিও সহায়ক ভূমিকায় মেয়েদের না রেখে তাঁদের কোনও উপায় ছিল না, তবু সেই সংগ্রামের বিপদ এবং ধরা পড়লে মেয়েদের শারীরিক ভাবে অত্যাচারিত হবার সম্ভাবনা

এই নেতৃবৃন্দের চোখে একটা বড় বাধা ছিল। দ্বিতীয়ত, তাঁদের মনে এ রকম ধারণাও ছিল যে মেয়েরা তাদের স্বাভাবিক কোমলতাবশত হিংসাত্মক কর্মসূচিতে যোগ দিলেও শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে আসবে। কোনও কোনও জায়গা থেকে এই মেয়েদের এমন কথাও শুনতে হয়েছিল যে ঠিক মুহূর্তটিতে হাত কেঁপে তাদের হাতের রিভলবার খসে পড়তে পারে। তৃতীয়ত, এক সূর্য সেন ছাড়া বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকেই অবিবাহিত থেকে গিয়েছিলেন, এবং তাঁদের আদর্শই এরকম ছিল যে, দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত গৃহীজীবনে তাঁদের ফেরা চলবে না। সূর্য সেনও কোনও দিন গৃহীজীবন যাপন করেননি। নারীর সংস্পর্শে থাকলে তাঁদের এই কঠোর ব্রতভঙ্গ হতে পারে, বিপ্লবীদের মধ্যে নিবিড় পারস্পরিক সমঝোতা মেয়েরা মাঝখানে এসে পড়লে চিড় খেয়ে যেতে পারে, এ রকম ভয়েও তাঁরা ভুগতেন। চট্টগ্রামের অভ্যুত্থানে যাঁরা নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনন্ত সিংহ এতই নারীবিরোধী ছিলেন যে সূর্য সেন যখন প্রথম কল্পনা দত্তকে একটি কাজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তখন তিনি অন্যদের বলে দেন যে অনন্ত সিংহকে যেন এইটুকুই জানানো হয় যে বি এসসি ক্লাসের ছাত্র ভুলু দত্তকে ('ভুলু' আসলে কল্পনার ডাকনাম) অ্যাসিড সংগ্রহ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চট্টগ্রামে এবং অন্যত্র নেতৃবৃন্দকে নিজেদের একাগ্রতা সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েই মেয়েরা দলে যোগ দেওয়ার অধিকার পেয়েছিলেন।

প্রীতিলতা ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময়েই যখন ঢাকা ইডেন কলেজ থেকে চট্টগ্রামে আসতেন, তাঁর সম্পর্কিত ভাই পূর্ণেন্দু দস্তিদারের সঙ্গে বিপ্লবী দলে যোগদান বিষয়ে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হত এবং পূর্ণেন্দু নিজে যদিও প্রথমে মনে করতেন যে সশস্ত্র আন্দোলনে মেয়েদের সহায়ক ভূমিকায় থাকাই উচিত, তবু পরে প্রীতির ঐকান্তিক আগ্রহ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েই সূর্য সেনকে প্রীতির বিষয়ে জানান এবং সূর্য সেনও অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পরেই প্রীতিকে দলে নেওয়াতে সম্মতি দেন। অনন্ত সিংহের দিদি ইন্দুমতী সব রকম ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করা সত্ত্বেও এবং চট্টগ্রামের যুব অভ্যুত্থানে আড়াল থেকে সমস্ত সাহায্য করলেও ১৮ এপ্রিল, ১৯৩০ ওই অভ্যুত্থান যখন শুরু হল তখন তাতে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেবার অনুমতি পাননি। মনের দুঃখ প্রকাশ করে তিনি সূর্য সেনকে এ বিষয়ে একটি চিঠিও লেখেন। পরেও বিপ্লবী কাজকর্মের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কিন্তু অব্যাহত ছিল।

মানিনী চ্যাটার্জি তাঁর বইতে চট্টগ্রামের কালীকিংকর দে'র স্ত্রী প্রেমলতার অভ্যুত্থানে যুক্ত হওয়ার কাহিনিটি বলেছেন। অভ্যুত্থানের প্রথম পর্বের পরে কালীকিংকর বাড়ি ফিরে এলে তিনি পিতামাতার অনুরোধ-উপরোধে বাধ্য হয়ে দরিদ্র, পিতৃমাতৃহীন, প্রায় নিরক্ষর প্রেমলতাকে বিবাহ করেন। কিন্তু তিনি স্ত্রীকে জানান যে, দেশ স্বাধীন না হলে তিনি গৃহী হবেন না। প্রেমলতা কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ হন, এবং কল্পনার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রধারণের ট্রেনিং নেন। তাঁদের বাড়ি বিপ্লবীদের একটি গোপন কেন্দ্র হয়ে ওঠে। পাহাড়তলির ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণে প্রীতির সঙ্গে কল্পনা ও প্রেমলতা দু'জনেরই থাকার কথা ছিল, শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদলের ফলে প্রীতি একাই যান। এর পরে যখন কালীকিংকর সহ অনেকেই পুলিশের জালে গ্রেপ্তার হলেন, তখন প্রেমলতা বিপ্লবীদের

সঙ্গে থেকে যেতে চান। সূর্য সেন তাঁকে প্রায় জোর করেই বাড়ি পাঠান, পরবর্তী অ্যাকশনে তাঁকে রাখা হবে এই কথা বলে। কিন্তু চট্টগ্রামের অভ্যুত্থান সম্পূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেলে এবং কালীকিংকরের দ্বীপান্তর হয়ে গেলে ১৯৩৫ সালে প্রেমলতা হতাশায় আত্মহত্যা করেন। আমরা কি তা হলে বলব যে স্বামী বিপ্লবী দলে ছিলেন বলেই প্রেমলতা বাধ্য হয়েছিলেন সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে আসতে এবং তিনি শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রামের এক অসহায় বলিতে পরিণত হন? মানিনী চ্যাটার্জি এই ঘটনার একটা অন্য ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলছেন: "Marriage for her had not been a prison but a wonderful release. It had opened out new vistas of comradeship and action, of struggle and sacrifice she had never known. Her dream had been to die a martyr rather than live the remainder of her life behind walls that once again closed in upon her after the IRA was smashed in Chittagong." প্রেমলতা অন্যদের মতো শিক্ষিত ও স্বনির্ভর ছিলেন না। বিপ্লবী জীবনে ফিরে যাবার রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলেই তিনি আত্মহত্যা করেন। কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রামের সঙ্গে যোগাযোগের পর্বটি তাঁকে যে আত্মমর্যাদা দিয়েছিল এবং তাঁর জীবনকে যে তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছিল, এক গৃহবন্দি বধূর কাছে তা ছিল অকল্পনীয়। অন্য মেয়েদের ক্ষেত্রেও এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করা সম্ভব। সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ তাঁদের আত্মমর্যাদা ও স্বনির্ভরতার বোধকে বাড়াতে সাহায্য করেছিল, প্রথাবদ্ধ পরাধীন জীবন থেকে মুক্তির একটা রাস্তা দেখিয়েছিল। নিজেদের এই ভূমিকার স্বীকৃতি পাবার জন্য এই মেয়েরা নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অবিরল তর্কবিতর্ক করেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত নেতৃবৃন্দকেও দৃষ্টিভঙ্গি পালটাতে বাধ্য করেছেন। কল্পনা দত্ত তাঁর আত্মকথায় বলেছেন, তারকেশ্বর দস্তিদারের সঙ্গে যে তাঁর একটা বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিল, সেটাকে সূর্য সেন কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখতেন, বিপ্লবী দলের কঠোর শৃঙ্খলা এতে কোনও ভাবে ব্যাহত হতে পারে এরকম মনোভাব থেকে তাঁদের নিভৃতে কথোপকথন পছন্দ করতেন না। সূর্য সেনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অটুট থাকা সত্ত্বেও কিন্তু কল্পনা সূর্য সেনের এই সন্দেহকে মেনে নিতে পারেননি এবং তাঁকে তা স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন। সূর্য সেনও যে কখনও কল্পনাকে এ কারণে বিপ্লবী সংগঠনে থাকার অনুপযোগী বলে মনে করেছেন এমন প্রমাণ নেই। অর্থাৎ মেয়েদের যোগদান সম্বন্ধে নেতাদের যে আপত্তি গোড়ায় ছিল, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাঁরাও তা কাটিয়ে উঠছিলেন।

মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত যেসব তরুণী সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দিচ্ছিলেন, কী ধরনের মনোভাব থেকে তাঁরা আন্দোলনে আসছিলেন তার কিছু ইঙ্গিত আমরা পেতে পারি আদালতে বীণা দাসের লিখিত বিবৃতি থেকে অথবা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের শেষ ইচ্ছাপত্র থেকে। সদ্য বি এ পাশ তরুণী বীণা তাঁর বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন, গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসন সম্বন্ধে তাঁর কোনও ব্যক্তিগত আক্রোশ না থাকলেও যে তাকে তিনি হত্যার চেষ্টা করেছিলেন তার কারণ ব্রিটিশের অত্যাচারের নানা কাহিনি ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর মনে তীব্র যন্ত্রণার সৃষ্টি করেছিল, যে-যন্ত্রণার উপশম একমাত্র মৃত্যুতেই হতে পারে। হত্যার কারণে মৃত্যুদণ্ডে

দণ্ডিত হবেন এটা ধরে নিয়েই তিনি বলছেন: "Is life worth living in an India so subject to wrong and continually groaning under the tyranny of a foreign Govt. or is it not better to make one supreme protest against it by offering one's life away?" প্রীতিলতার শেষ ইচ্ছাপত্রেও পরাধীন জীবনের অসহনীয়তার উল্লেখ আছে; স্বাধীনতা লাভের পথে 'একমাত্র অন্তরায়' ব্রিটিশ সরকারকে যে কোনও উপায়ে উৎখাত করাই এই মুক্তিসংগ্রামের উদ্দেশ্য। হিংসার পথ মেয়েরা কেন নিল দেশবাসীর কাছে তার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে প্রীতিলতা সংগ্রামে অংশগ্রহণে 'ভাই'দের পাশাপাশি 'ভগিনী'দের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, এবং রাজপুত নারীদের উদাহরণ দিয়ে বলেন, তারাও যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে স্বহস্তে শত্রু সংহার করত। স্বদেশি আন্দোলনের সময় থেকে টডের *রাজস্থান*কে অবলম্বন করে মুঘলদের বিরুদ্ধে রাজপুতদের যুদ্ধকে রাজপুতদের 'স্বাদেশিকতা'র লক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত করা এবং ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনেও সেই 'স্বাদেশিকতা'কেই একটি আদর্শ হিসাবে দেখা জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের একটি অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল এবং প্রীতি এখানে তারই পুনরাবৃত্তি করছেন। কিন্তু হননক্রিয়ার বিপরীতে তাঁর স্বেচ্ছামৃত্যুবরণের যে কারণ তিনি দিচ্ছেন তা রাজপুত 'স্বাদেশিকতা'র পুনর্নির্মিত আদর্শের সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। রাজপুত নারীর 'স্বেচ্ছামৃত্যু' বা 'জহরে'র যেসব কাহিনি প্রচলিত হয়েছিল, তার বিন্যাসে নারী মৃত্যুবরণ করে, তার সম্মান, তথা জাতির সম্মান কলঙ্কিত হতে দেবে না এই যুক্তিতে। কিন্তু বীণা বা প্রীতি মৃত্যুবরণ করতে চান পরাধীন অবস্থায় বেঁচে থাকার যে চূড়ান্ত গ্লানি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, স্বাধীনতার জন্য মেয়েরা যে জীবনদানে পরান্মুখ নয়, তা প্রমাণ করার জন্য। নারীর প্রথাগত শুচিতা বা 'সম্মানে'র ধারণার সঙ্গে স্বাধীনতা-সংগ্রামীর এই স্বেচ্ছামৃত্যুর কোনও সম্পর্ক নেই। ফলত এখানেও নারীত্বের ছাঁচ থেকে বেরিয়ে আসার একটা প্রচেষ্টা আছে, স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষা পুরুষদের মতো মেয়েদের মধ্যেও যে সমানভাবে কাজ করতে পারে, তার ঘোষণা রয়েছে।

এইসব দলিল এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে আমি এই কথাই বলার চেষ্টা করেছি যে, এ ধরনের দলিলপত্র এবং মৌখিক ইতিহাসের ভিত্তিতে এমন অনেক গবেষণার সূত্র আবিষ্কার করা যেতে পারে, যার মধ্য দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে যে মেয়েরা যোগদান করেছিলেন তাঁদের ভাবনাচিন্তা ও মানসিকতার আর একটু কাছাকাছি আমরা পৌঁছতে পারি। স্বাধীন দেশে যাদের জন্ম পরাধীনতার গ্লানি যে কী তা সঠিকভাবে অনুধাবন করা তাদের পক্ষে কঠিন। কোন পরিস্থিতিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের একটি প্রজন্ম থেকে এতজন মেয়ে সেই গ্লানিকে এমন মর্মে মর্মে অনুভব করেছিল যে মৃত্যুভয় শুধু নয়, নারীসুলভ অস্তিত্বের গণ্ডিও তারা অতিক্রম করে গিয়েছিল, চটজলদি সিদ্ধান্ত না করে এই ব্যাপারটিকে আরও গভীরে গিয়ে নিরপেক্ষতার সঙ্গে যাচাই করা প্রয়োজন।

[এই প্রবন্ধটি প্রাথমিকভাবে ২০০৩ সালে বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থা আয়োজিত প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার স্মারক বক্তৃতা হিসাবে বেথুন কলেজে পঠিত হয়। এর প্রাসঙ্গিকতা এখনও আছে এই বিবেচনায় কিছু নতুন অংশ এর সঙ্গে যুক্ত করে এ যাবৎ অপ্রকাশিত প্রবন্ধটি এখানে প্রকাশ করা হচ্ছে। — মালিনী ভট্টাচার্য]

প্রভাতকুমার দাস

যাত্রা-থিয়েটারে মেয়েরা

গত শতকের দ্বিতীয় দশকের শুরুতে গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১২) প্রয়াণের প্রায় মাস আস্টেক পর কলিকাতা টাউন হলে তাঁর স্মৃতিসম্মানে যে বিরাট অধিবেশন হয়, তাতে নাট্যানুরাগী বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর অনেকে যোগ দিয়েছিলেন।[১] সেই স্মরণসভায় রঙ্গালয়ের নটীরা আহূত হওয়া তো দূরের কথা, তদানীন্তন সময়ে জনপ্রিয় সুশীলাবালা দাসীর (১৮৮৪-১৯১৫) নেতৃত্বে অভিনেত্রীরা প্রবেশাধিকারের দাবি জানালেও তা গ্রাহ্য করা হয়নি। অবশেষে স্টার মঞ্চের কর্তৃপক্ষ অমরেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৭৬-১৯১৬) কাছে অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেকেই মর্মস্পর্শী ভাষায় আবেদন জানিয়েছিলেন: 'টাউন হলে বা অন্য কোনও প্রকাশ্য সভায় প্রবেশাধিকার আমাদের নাই; কিন্তু আশা করি যে আপনার ন্যায় নাটকব্রত অধ্যক্ষ এই হতভাগিনীদের ঘরে বসিয়া কাঁদিবার, নিজ রঙ্গমঞ্চে নতজানু হইয়া আমাদের গুরু ও দেবতা গিরিশবাবুর উদ্দেশে প্রণাম করিবার অধিকার দানে বঞ্চিত করিবেন না।"[২] এ ধরনের আবেদন পেয়ে প্রথমে একটু বিব্রত হতে হয়েছিল অমরেন্দ্রনাথকে, 'অবশেষে অনেক গবেষণার পর' ২ আশ্বিন, বুধবার, ১৩১৯ (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১২) তিনি সেদিনের অভিনয় শুরুর পূর্বে অভিনেত্রীদের উদ্যোগে স্মৃতিসভা করার সুযোগ দিয়ে, নিজে স্বেচ্ছায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। কলঙ্কের হার কণ্ঠে ধারণ করে, আত্মীয়-স্বজনের ঘৃণা গঞ্জনা তুচ্ছ জ্ঞান করে, নাট্যশালার কার্যে আত্মোৎসর্গ করলেও— প্রকাশ্য সভায় অভিনেত্রীদের এই স্মৃতিসভা আয়োজনে তাঁর পৃষ্ঠপোষণা সকলে যে সুনজরে দেখেননি, তা উল্লেখ করেও অমরেন্দ্রনাথ 'সমবেত ভদ্রমহোদয়' সম্বোধনে স্পষ্টত বলেছিলেন: "এই অভিনেত্রীদের সভাপতিত্ব করা রুচিবাগীশগণের নিকট দোষণীয় হইলেও যাহাদিগকে লইয়া আমাকে এই ব্যবসায় পরিচালনা করিতে হয়— প্রতি পদক্ষেপে আমাকে যাহাদের মুখাপেক্ষী হইতে হয়— যাহাদের অভাবে এই রঙ্গালয়ের ব্যবসায় পরিচালনা সম্পূর্ণ অসম্ভব— তাহাদিগকে ঘৃণা করা, বর্জ্জন করা, পরিহার করা— আমার পক্ষে যে কোনক্রমেই সঙ্গত নহে, এ বলাই বাহুল্য।. সুতরাং প্রতি পদক্ষেপেই আমাকে ইহাদের অভাব অভিযোগে কর্ণপাত করিতে হয়।"[৩]

অমৃতবাজার পত্রিকা-য় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে স্টার থিয়েটারের পক্ষ থেকে অমৃতলাল বসুর (১৯৫৩-১৯২৯) বয়ানে ঘোষণা করা হয়: "The coming wednesday— is a Red-Letter / Day in the Dramatic World! / Please read carefully!"[৪] আলোচ্য বিজ্ঞাপনে জানানো হয়েছিল, প্রধান অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এই উপলক্ষ্যে বলবেন, কিন্তু কার্যত প্রধান অভিনেতারা প্রায় কেউই বলেননি— কিন্তু সুশীলাবালা, রানিসুন্দরী, নরীসুন্দরী (১৮৭৭-১৯৩৯), বসন্তকুমারী ছাড়া সে সভায় একমাত্র পুরুষ-বক্তা শ্রীপুরের জমিদার নরেন্দ্রনাথ সরকার। যিনি নাবালক অবস্থা থেকেই থিয়েটার-প্রেমী, যিনি ক্লাসিকে সুশীলাবালার অভিনয় দেখে এমনই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, মিনার্ভা থিয়েটার কিনে নিয়েছিলেন দুটি কারণে। প্রথমত অভিনেত্রী হিসেবে সুশীলাবালার প্রতিষ্ঠা এনে দেবেন সহজে, আর দ্বিতীয়ত নিজেকে একজন নট-নাট্যকার হিসেবে খ্যাতির শীর্ষে দেখবেন। প্রথম আকাঙ্ক্ষা সত্যে পরিণত হয়েছিল অবিলম্বে, কিন্তু দ্বিতীয়টি অচিরকালের মধ্যে তাঁর জীবনে এমন মরীচিকা হিসেবে দেখা দিল যে— তার পেছনে ছুটে ছুটে সর্বস্বান্ত, নিজেকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এরই মধ্যে অবশ্য সুশীলাবালার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ ঘর বেঁধেছিলেন, তবে তাঁরা প্রথা মেনে বিবাহিত না হলেও স্বামী-স্ত্রীর মতো একত্রে বসবাস করেছেন। নিষিদ্ধপল্লিতে জন্মগ্রহণ করেও পিতৃপরিচয়হীন সুশীলা ঝামাপুকুর এ এম গার্লস স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণা হয়েও— উচ্চতর বিদ্যার্জনের পরিবর্তে থিয়েটারকেই পেশা করেছেন বালিকা বয়সে, না হলে বারাঙ্গনা জীবনই তাঁর অবলম্বন হয়ে উঠত। নিজগুণে অভিনয় জগতে 'প্রাইমাডোনা', 'দি ডিভাইন সুশীলা' নামে পরিচিতা হয়েও— শেষ জীবন ভাল কাটেনি। অভাবে-অসুস্থতায় অল্প বয়সেই মঞ্চজগৎ থেকে বিদায় নিতে হয়। নিজের আর্থিক অনটনের দিনে নিঃসম্বল নরেন্দ্রনাথকে পালন করেছেন, তবু দারিদ্র্যমোচনের জন্য কোনও বিত্তবানের কুপ্রস্তাবে সম্মত হননি। অথচ সুশীলার শেষ জীবনে নরেন্দ্রনাথ নাকি তাঁর প্রতি উপেক্ষা দেখিয়ে অন্য কোনও অভিনেত্রীর প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। যে জন্য সুশীলার অকস্মাৎ প্রয়াণ, মৃত সন্তান প্রসব করে সুতিকা কিংবা বসন্ত রোগে— তার কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। সে জন্য রহস্যময় সেই মৃত্যুকে কেউ কেউ আত্মহত্যা বা হত্যা বলেও অনুমান করেছেন। কিন্তু অভিনেত্রী হিসেবে সুনামের পাশাপাশি চারিত্রিক দিক থেকেও যে তাঁর 'সতীনারীর আদর্শ' বহুল প্রচারিত ছিল— তার বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ, *অমৃতবাজার পত্রিকা*-য় তাঁর মৃত্যুসংবাদ মর্যাদার সঙ্গে উল্লেখ করে জানানো হয়, প্রায় একশো জন ভদ্রলোক শ্রেণির মানুষ প্রশেসন করে তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যান। সেদিন সন্ধ্যায় স্টারে অভিনয়ের পূর্বে হরিসংকীর্তন ছাড়াও প্রবীণ অমৃতলাল বসু শোকজ্ঞাপন করে জানিয়েছিলেন: ইংলন্ডে জন্মালে তাঁর শবাধারে রাজমাল্য শোভা পেত।[৫] তা ছাড়া আর একটি ঘটনাও উল্লেখ্য, সুশীলার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে কেউ কেউ মুদ্রিত শোককাব্যলিপি রঙ্গালয়ে দর্শকদের মধ্যে বিলিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এ রকম প্রয়াণোত্তর সম্মান প্রদর্শনের উদাহরণ দ্বিতীয় রহিত। এতদ্‌সত্ত্বেও প্রশ্ন দেখা দেয়, বিপুল জনপ্রিয়তা নিয়েও— রঙ্গ-মঞ্চের অভিনেত্রীর রহস্যময় মৃত্যুর কোনও কিনারা খোঁজার চেষ্টাই হয়নি,

সে কি এই জন্যে যে যত প্রতিভাময়ীই হোন, সুশীলা কেন— তখনও পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চের সকল অভিনেত্রীর নিন্দনীয় পরিচয়, তাঁরা প্রধানত বারবিলাসিনী। যে জন্য, যে অভিনেত্রীর রোজগারে প্রতিপালিত হয়েছিলেন দেউলিয়া জমিদার নরেন্দ্রনাথ— তাঁরও কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি, সামাজিক কুৎসার ভয়ে। তা ছাড়া আশ্চর্যময়ী (১৮৯৭-?) নামের এক অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে সে সময় যে গুজব উঠেছিল— সুশীলার মৃত্যুর সেটাই কারণ বলে অনেকের অনুমান।

গিরিশচন্দ্রের উদ্দেশে পঠিত শোকলিপিতে সুশীলাবালা বলেছিলেন: "চিরদিন মনে বড় অনুতাপ হইত যে নিরুপায় হইয়া আমাদের সাহচর্যে ভদ্র অভিনেতাগণ আপনাদের চক্ষে কতকটা ঘৃণিত হইতেন, হায় আমাদের কপাল। কিন্তু সেদিন টাউন হলে অভিনেতাদের আদর, অভিনেতাদের যশ, অভিনেতাদের সম্মান দেখিয়া আমাদের সে অনুতাপ দূর হইয়াছে। তাই আমরা আপনাদের সম্মুখে অশ্রুধারা ঢালিতে সাহসী হইয়াছি।"[৬] সেই শোকসভায় আর যাঁরা অন্তরের আকুলতা দিয়ে গিরিশচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তাঁদের মধ্যে সকলেই প্রায় অভিনেত্রীর জীবন যে ধীরে ধীরে সম্মানের পথে অগ্রবর্তী হচ্ছে সে জন্য গিরিশচন্দ্রকে দায়ী করেছেন। রানিসুন্দরী বলেছেন: "কর্ম্মজীবন লইয়া নিজের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করা অপেক্ষা সুখ-সম্পদ মানুষের কিছু নাই"— তিনি এই অভিনেত্রী জীবনের ভিতরে দাঁড়িয়ে পতিতালয়ের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টার মধ্যে 'অলৌকিক জীবনমুক্তি' উপলব্ধি করেছিলেন। অভিনেত্রীদের প্রতি সমাজপতিদের যে নির্দয় ব্যবহার সে-কথা উল্লেখ করে একই সভায় নরীসুন্দরী বলেছিলেন: "আমার জন্মের পর, সাধুসমাজ আমায় বলেছিলেন যে পুণ্যের ছাপমারা কূলে তোর যখন জন্ম নয়, তখন তুই চিরকালই পাপ করিতে থাক, আর আমরা পুণ্যের তেজে তোদের গাল দিতে, ঘৃণা করিতে থাকি।"[৭] সংসারে যারা 'বাজার-চলন পুণ্যাত্মা' তাঁদের প্রতি কটাক্ষ করে বসন্তকুমারী অভিমানাহত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'অভিনেত্রী নাট্য সাজ' না পরে 'সোজা মানুষের মতো এই সাধারণের সম্মুখে' দাঁড়াবার অনুমতি পেয়ে এবং সমাগত সতী-সাধ্বী ও সজ্জনের চরণে তাঁদের প্রাণের ব্যথা জানাবার অবসর পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করেছেন। তবে অভিনেত্রীরা অত্যন্ত সঙ্গত ভাবেই তাঁদের নাট্যগুরু গিরিশচন্দ্রকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, কেন না তিনি রঙ্গমঞ্চে তাঁদের যথাযথ সম্মান প্রতিষ্ঠায় 'আদরে যত্নে আশ্বাসে, জ্বালাময় জীবনে শান্তির জল' ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।[৮] সেদিনের সভায় 'সমাগত সুধিবৃন্দ [য] ও মা জননী গৃহলক্ষ্মীগণ' সম্বোধনে সুশীলাবালা তাঁদের সেই দুঃসাহসিক আয়োজনের বিষয়ে আত্মপ্রত্যয় প্রকাশ করে বলেছিলেন: "আজ আমাদের ধৃষ্টতা কেন? পতিতা আমরা, সমাজবর্জ্জিতা বটে— কিন্তু আমরা মানুষ। আপনারা মনে না করিতে পারেন, কিন্তু সুখদুঃখ অনুভব করিবার শক্তি আপনাদের ন্যায় আমাদেরও আছে।"[৯] অভাগিনী নটীসমাজের পক্ষ থেকে এই আয়োজন স্টার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে— এক অত্যুজ্জ্বল ঘটনা হয়ে আছে, কলকাতার সংরক্ষণপন্থী নীতিবাগীশদের সামনে এই প্রতিবাদী সভাটির প্রশংসা করার লোকের নিশ্চয় অভাব ঘটেছিল সেদিন।

রঙ্গমঞ্চে প্রকৃত নারীর সংযোগের সূচনা হিসেবে, অনেককাল থেকেই রুশদেশবাসী গেরাসিম স্তেপানভিচ লিয়েবেদেফ-এর (১৭৪৯-১৮১৭) উদ্যোগকেই স্মরণ করা হয়, বাঙালি সমাজে যিনি *লেবেদেফ* নামেই পরিচিত। এদেশে তাঁর ভাষাশিক্ষক গোলকনাথ দাসের পরামর্শে, ২৫নং ডোমতলায় নিজের ভাড়াবাড়িতে 'বেঙ্গলি থিয়েটার' স্থাপন করে *কাল্পনিক সংবদল* নামে যে অনুবাদিত নাটকের অভিনয় আয়োজন করেছিলেন, তাতে স্ত্রীলোকের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য তিন জন অভিনেত্রী সংগৃহীত হয় সমসাময়িককালের মেয়ে-যাত্রা কিংবা ঢপ-কীর্তনের বা ঝুমুরের দল থেকে। তাঁদের বিষয়ে নির্দিষ্ট তথ্য না জানা গেলেও অনুমান করা হয়েছে, কলকাতা বা পার্শ্ববর্তী এলাকার পতিতাপল্লি থেকেই তাঁদের আনা হয়েছিল। মেয়ে-যাত্রা, ঝুমুর, ঢপ-কীর্তনে মহিলাদের অংশগ্রহণ তদানীন্তনকালে জনপ্রিয় হলেও, থিয়েটার-চর্চার ক্ষেত্রে প্রকৃত নারীদের অনুপ্রবেশ ঘটানো নিছক বাড়তি চমক সৃষ্টির চেষ্টা ছিল কিনা, তা প্রশ্ন-সাপেক্ষ। হায়াৎ মামুদ (১৯৩৯) এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন: "আসলে, তিনি অভিনেত্রী সম্পর্কে অনেক চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন মনে হয় না; নাটকে নারী চরিত্রে মেয়েই অভিনয় করবে— এ-সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধভাবেই তাঁর মনে গাঁথা ছিল। কারণ, স্ত্রী-চরিত্রে অভিনেত্রীর অভিনয়ের স্বাভাবিকত্ব ও শিল্পরুচি বিষয়ে তাঁকে সংশয়হীন করেছিল তাঁর স্বদেশের রুশ ঐতিহ্য এবং তাঁর অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল তাঁর নিজের যৌবস্মৃতি। মঞ্চ পরিচালনায় যেমন ক্রিয়াশীল ইয়ারস্লাভল-মঞ্চের ছবি, অভিনেত্রী প্রসঙ্গে হয়তো তেমনি কাজ করে গেছে ইয়ারস্লাভল-মস্কভা-সাংক্ত পির্তেবুর্গ, হয়তো-বা য়োরোপীয় মঞ্চ জগতের তদানীন্তন প্রথা।"[১০]

১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে মাত্র পাঁচ মাসের ব্যবধানে দুটি অভিনয়ের পর সমস্ত পরিকল্পনা স্থগিত হয়ে যায়। 'ইউরোপীয়দিগের চিত্তবিনোদনের জন্য' তাঁর এই নাট্যশালার সংকল্প অতি দূর অগ্রসর হয়নি কেন, সে বিষয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৯২) *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস* প্রণয়নের সূত্রে যুক্তি দেখিয়েছেন: "দেশের লোকের উৎসাহ ও রুচির সহিত উহার কোন যোগ ছিল না; তাই উহা স্থায়ী হইতে পারিল না।"[১১] তা ছাড়া সেই নাট্যাভিনয়ের বাইশ দিন পূর্বে *ক্যালকাটা গেজেট*-এর বিজ্ঞাপনে 'The characters to be supported by performers of both Sexes' উল্লেখ সত্ত্বেও— বাঙালি দর্শক মহলে কোনও বাড়তি উত্তেজনার কারণ ঘটেনি।[১২] এমনকী সে-ঘটনার অভিনবত্ব সংবাদপত্রে উল্লিখিতও হয়নি— বিজ্ঞাপনগুলি না মুদ্রিত হলে সেই আপতিক ঘটনার তাৎপর্য কোনও দূর ভবিষ্যতে স্মরণ করা হত কিনা সন্দেহ।

তবে অস্বীকার করা যায় না, নাট্যাভিনয়ে প্রকৃত নারীদের অংশগ্রহণের যে সম্ভাবনার বীজ এই ঘটনায় নিহিত ছিল, তা প্রকৃতপক্ষে বাস্তবায়িত হতে আরও চল্লিশ বছর সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের (১৮০১-১৮৬৮) হিন্দু থিয়েটার বেশি দিন স্থায়ী হয়নি, অনুমান ১৮৩২-৩৩-এর কোনও সময় সেটি বন্ধ হয়ে যায়। এর এক বৎসর পরে শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু তাঁর নিজের বাড়িতে যে নাট্যালয় স্থাপন করেন, সেটিতে হিন্দু থিয়েটারের

দৃষ্টান্ত অনুসারে ইংরেজি নাটকের অভিনয় না করে, বাংলা নাটকের অভিনয় করানো হল। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে যে জন্য সে নাট্যালয়ের বৈশিষ্ট্য স্মরণীয় হয়ে আছে।

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর কৈলাশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত *হিন্দু পাইয়োনিয়র* ইংরেজি পাক্ষিকে প্রকাশিত দীর্ঘ সংবাদ-সমালোচনার উল্লেখ থেকেই ৬ অক্টোবর *বিদ্যাসুন্দর* অভিনয়ে অভিনেত্রী-নিযুক্তির পুনঃপ্রবর্তনার সময় নির্ধারিত হয়ে থাকে। কিন্তু ওই সমালোচনার প্রথমাংশের বিবরণ থেকে জানা যায়, নবীনচন্দ্র তাঁর সেই দেশীয় নাট্যশালাটি স্থাপন করেছিলেন প্রায় বৎসর দুই পূর্ব্বে— অর্থাৎ ১৮৩৩-৩৪-এ। সে নাট্যশালায় বৎসরে চার-পাঁচটি নাটকের অভিনয় হওয়া ছাড়াও, 'যাহা আমাদের এবং ভারতবর্ষের উন্নতিকামী বন্ধুমাত্রেরই নিকট অতিশয় আনন্দের বিষয়' বলে উল্লেখ করা হয় সেটি হল: ''এই নাট্যশালায় বাঙালী রমণীরা সর্ব্বদাই দেখা দিয়া থাকেন, কারণ, স্ত্রীলোকের অংশের অভিনয় ইহাতে হিন্দু রমণীরাই করিয়া থাকেন।''[১৩] একটা ঘটনা আশ্চর্যের, *বিদ্যাসুন্দর* ছাড়া, আর যে সব নাটক সেই নাট্যশালায় অভিনীত হয়েছে এবং নিয়মিত সেগুলিতে প্রকৃত নারীরাই অংশগ্রহণ করেছেন সে-সংবাদ পরিবেশনে সংবাদপত্র উৎসাহিতই হননি।

যা হোক, *হিন্দু পাইয়োনিয়ার* তাদের সমালোচনার উত্তরঅংশে স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয়ের প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন। ষোলো বছর বয়স্কা বিদ্যার ভূমিকাভিনেত্রী সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়: ''রাধামণির মতো অশিক্ষিত এবং মাতৃভাষার সূক্ষ্ম অর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞ একটি বালিকা যে এরূপ কঠিন একটি অংশ এরূপ কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিতে পারিবে এবং সকলকে তৃপ্ত করিয়া ঘনঘন করতালি লাভ করিতে পারিবে, তাহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল।''[১৪] আলোচ্য অভিনয়ে অন্যান্য স্ত্রী-চরিত্রের অভিনেত্রীদের মধ্যে জয়দুর্গা নাম্নী এক প্রৌঢ়া রমণীর রানি ও মালিনীর দ্বৈত ভূমিকাভিনয় ছাড়াও প্রায় সমান কৃতিত্বের অধিকারিণী রাজকুমারী বা রাজুর সম্পর্কেও প্রশংসা করা হয়। তা ছাড়া সেই প্রতিবেদনে স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয় প্রশংসিত হলেও, কীভাবে অভিনয়ের দ্বারা 'সমাজ-সংস্কারের একটি ধারা সূচিত হইতেছে' সে অভিমতও ব্যক্ত হয়েছিল। অভিনয় বর্ণনার পরই সমালোচক দেশব্যাপী অজ্ঞানের মধ্যে এরূপ একটি অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটতে পেরেছে বলে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নের সম্মুখীন করে দিয়েছিলেন নাট্যামোদী দর্শককে: ''এই সকল বালিকাদের দেখিয়া কি দেশীয় দর্শকেরা তাঁহাদের স্ত্রী ও কন্যাদের শিক্ষা দিবার জন্য উৎসাহিত হইবেন না? হিন্দু-হিসেবে আমি এই কথাটা আমার দেশবাসীদের জিজ্ঞাসা করিতে চাই— এই যে বালিকা, যে নাট্যশালায় এরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, সে যদি মাতৃভাষায় শিক্ষিতা হইত, তবে কি তাহার প্রতিভার আরও স্ফূর্ত্তি হইত না?''[১৫] প্রতিবেদক স্পষ্ট করে বলেছিলেন, ''যতদিন পর্য্যন্ত নারী শিক্ষাহীন থাকিবে, তত দিন তাহারা সমাজে অবর্ত্তমান বলিলেই চলে? আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকদের সামাজিক শক্তির এই মহান ও নূতন দৃষ্টান্ত দেখিয়াও যদি লোকে স্ত্রীশিক্ষায় অবহেলা প্রদর্শন করেন, তবে তাঁহাদের হৃদয় কঠিন ও চিত্ত আবেগহীন বলিতে হইবে।''[১৬] 'ভ্রমে পতিত স্ত্রীলোকদের চারিত্রিক উন্নতি করিবার এই প্রচেষ্টার জন্য' নাট্যশালার স্বত্বাধিকারী বাবু নবীনচন্দ্রকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর, ধনী-সম্প্রদায় সেই দৃষ্টান্ত

অনুসরণ করবেন কি না সেই প্রশ্ন উত্থাপন করে নিজেদের প্রত্যাশার কথা জানিয়ে লেখেন: "আমরা যেন একটা বড় নৈতিক বিপ্লব দেখিতে পাই— যাহা দ্বারা কালে ভারতবর্ষের প্রাপ্য খ্যাতি লাভ ঘটিবে।"[১৭]

দেখা যায়, সমসাময়িককালে *হিন্দু পাইয়োনিয়ার*-এ প্রকাশিত এই প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের কাজে *ইংলিশম্যান এন্ড মিলিটারি ক্রনিক্যাল* মুখর হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে তাঁরা জনৈক পত্রপ্রেরকের অভিমত সমর্থন করে জানান: "এই সকল নাট্যাভিনয়ে হিন্দুদিগের মানসিক বা নৈতিক কোন প্রকার উন্নতি ত হয়ই না, বরং লোকহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই এই সকল অভিনয়ের বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত। এই সকল অভিনয়ে কোন নূতনত্ব, উপকার, এমনকী, শালীনতাও নাই।"[১৮] অনুমান হয়, বিরোধীপক্ষ শালীনতার প্রশ্ন তুলেছিলেন স্ত্রীভূমিকার অভিনেত্রীদের বারাঙ্গনাপল্লি থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছিল বলেই। তবে *হিন্দু পাইয়োনিয়ার*-এর বিবরণ অনুযায়ী বিদ্যার ভূমিকাভিনেত্রী রাধামণি, যিনি আগাগোড়া খুব নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন, যাঁর সুললিত অঙ্গভঙ্গি, মধুর কণ্ঠস্বর, সুন্দরের প্রতি প্রণয়সূচক হাবভাব দর্শকমণ্ডলীকে অতিশয় মুগ্ধ করেছিল, তিনি এবং তাঁর সহঅভিনেত্রীরা পতিতাপল্লির বাসিন্দা হলেও— কোনও মেয়ে-যাত্রাদলের সঙ্গে নিশ্চয় যুক্ত থাকা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। যা হোক, সেদিনের বিরোধিতা নিশ্চয় তীব্র আকার ধারণ করেছিল, যে জন্য ঠিক সাল তারিখ না জানা গেলেও নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালা যে অবশেষে বিলুপ্ত হয়েছিল সে জন্য নাট্যশালার সঙ্গে অভিনেত্রী সংশ্রবকে দায়ী করা যায় কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে।

৩

নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালার পর এদেশে ১৮৭২-এ প্রথম পেশাদার মঞ্চ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান দীর্ঘ আটত্রিশ বছর— কিন্তু প্রকৃত মহিলাদের অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা এই কালপর্বে বিলম্বিত হয়েছে, পরিবর্তে রঙ্গমঞ্চে মেয়েদের চরিত্রে পুরুষদের রূপদানের প্রথা অব্যাহত থেকেছে। পরের বছর ১৮৭৩-এর ১৬ আগস্ট, বেঙ্গল থিয়েটারে আশুতোষ দেবের (১৮০৫-১৮৫৬ ছাতুবাবু নামে সমধিক পরিচিত) দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষের (১৮৩৪-১৮৮০) নেতৃত্বে, সদ্যপ্রয়াত 'মধুসূদনের অপোগণ্ড সন্তানগণের সাহায্যার্থে' *শর্মিষ্ঠা* নাটকের প্রথমাভিনয়ে, প্রকৃত মহিলাদের সংযুক্ত করা হয়। এই অভিনয় দেখার পর *হিন্দু পেটরিয়ট* ও *ভারত-সংস্কার* সামাজিক অধঃপতনের ধুয়ো তুলে হায় হায় রব তুলেছিলেন। *ভারত-সংস্কার* লিখেছিলেন: "অভিনেতাদিগের মধ্যে দুইজন বেশ্যাও ছিল। এ পর্য্যন্ত আমরা যাত্রা, নাচ, কীর্ত্তন, ঝুমুরেই কেবল বেশ্যাদিগকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু বিশিষ্ট বংশীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত প্রকাশ্যভাবে বেশ্যাদিগের অভিনয় এই প্রথম দেখিলাম। ভদ্র সন্তানেরা আপনাদিগের মর্য্যাদা আপনারা রক্ষা করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়।"[১৯] দুই জন বেশ্যা জগত্তারিণী ও এলোকেশী প্রথম রাত্রিতে অবতীর্ণ হলেও, ২৩ আগস্ট দ্বিতীয় রাত্রি থেকে অংশ নেন গোলাপসুন্দরী যিনি পরবর্তীকালে *শরৎ-সরোজিনী* নাটকে সুকুমারী চরিত্রে রূপদান করে সুকুমারী দত্ত হিসেবেই সমধিক পরিচিতি পান। এই পর্যায়ে শ্যামাসুন্দরী নাম্নী এক অভিনেত্রীও নিযুক্তি

পেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জগত্তারিণী ও এলোকেশীকে ছাতুবাবুর দেওয়ান রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের যাত্রা দল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। আলোচ্য নাটকে— গোলাপসুন্দরী ও শ্যামাসুন্দরী মহলা দিয়েও প্রস্তুত হতে পারেননি। তবে তখনও পর্যন্ত নারী চরিত্রে পুরুষদের অভিনয়ই প্রথাসিদ্ধ ছিল এবং ক্রমশ প্রকৃত মহিলার সংযুক্তি সত্ত্বেও বেঙ্গল থিয়েটার জমেনি। অমৃতলাল বসু জানিয়েছেন— মাইকেলের (১৮২৪-১৮৭৩) পরামর্শে নারী একট্রেস নিয়েও তাঁদের খালি বেঞ্চের সামনে প্লে করতে হয়েছিল। মধুসূদনই, শরৎচন্দ্র ঘোষ ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়-এর (১৮৪০-১৯০১) প্রস্তাবে নাটক দিতে সম্মতি জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী নিয়োগের প্রতিশ্রুতিতে। অবশ্য, এই প্রতিশ্রুতি পালন করার প্রশ্নে উদ্যোক্তারা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যান, বেঙ্গল থিয়েটারের উপদেষ্টা সমিতির জরুরি সভায় মহিলাদের নিযুক্তি প্রসঙ্গ সমর্থন করেন সত্যব্রত সামশ্রয়ী (১৮৪৬-১৯১১), উমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪০-১৯০৭)। এমনকী গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৩-এর ৩১ ডিসেম্বর তাঁদের উদ্‌বোধনে অভিনেত্রী নিয়োগে সাহস দেখাতে পারেননি, কেবল অধিকাংশ সংবাদপত্র ও সমাজ-শিরোমণিরা তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছিল বলে।

অমৃতলাল বসুর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় সে-সময় রামবাগানের প্রখ্যাত মনীষী উমেশচন্দ্র দত্ত তাঁদের বলেছিলেন: "তোমাদের এই নতুন থিয়েটরের দেয়ালের গায়ে লিখে দিচ্ছি যে স্ত্রীলোকঅভিনেত্রী বাদ দিয়ে তোমাদের এ থিয়েটর ১৭/১৮ দিনের বেশী চল্‌বে না।"[২০] এই চ্যালেঞ্জের বিরোধিতা করে তাঁরা নারী-চরিত্রে পুরুষ অভিনেতাদের নিয়েই পূর্বের মতো অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই ১৮৭৪-এর ১৯ সেপ্টেম্বর তাঁরা ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী, হরিদাসী, যাদুমণি ও রাজকুমারী নামে পাঁচজন অভিনেত্রী নিযুক্ত করেন— তাঁদের *সতী কি কলঙ্কিণী* নাটকের অভিনয়ে। ওই দলেই এর পর যোগ দিয়েছিলেন বিনোদিনী (১৮৬৩-১৯৪১), একই বছরে ১২ ডিসেম্বর *বেণী সংহার* অবলম্বনে *শত্রুসংহার* নাটকে দ্রৌপদীর সখীর ভূমিকায় দু'চারটি মাত্র সংলাপ মুখে নিয়ে। সেই সামান্য আবির্ভাব মুহূর্তে 'অতিশয় বালিকা, তাহাতে গরিবের কন্যা' বিনোদিনীকে 'সমস্ত দর্শক আনন্দধ্বনি করিয়া করতালি' দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনেত্রী নিয়োগের সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) শুধু প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেননি, ক্রোধে-অপমানে এতটাই বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন যে, এরপর থেকে থিয়েটারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। জীবিতাবস্থায় পরবর্তী প্রায় আঠারো বছর থিয়েটারের প্রতি কোনও আগ্রহ দেখাননি। অথচ তাঁরই নেতৃত্বে সংগঠিত বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ কিংবা বাল্যবিবাহ রদ প্রভৃতি আন্দোলনের প্রেরণা ও প্রভাবে নাটক রচনা করেছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬), দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩), মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২)। মদ্যপান বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক ঈশ্বরচন্দ্র বুঝেছিলেন, রঙ্গমঞ্চে যুক্ত নাট্যার্থীদের নিয়মিত মদ্যপানের অভ্যাসের সঙ্গে নারীসঙ্গের এই প্রকাশ্য সংযোগ, সামাজিক নীতি ও রুচি রক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠবে— এই দৃঢ় বিশ্বাসে তিনি বন্ধু মধুসূদনের প্রস্তাবের সমর্থক হতে

আপত্তি জানিয়েছিলেন। অথচ স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে তিনি যে ভূমিকা পালন করতে পেরেছিলেন, তার সঙ্গে বারাঙ্গনা সমাজের মহিলাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন থেকে প্রকৃত শিক্ষার পথে ফিরিয়ে আনার কোনও উদ্যোগ কর্মসূচি গৃহীত হলে হয়তো পূর্বোক্ত *হিন্দু পাইয়োনিয়ার* পত্রিকায় প্রতিবেদকদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথ ত্বরান্বিত হয়ে উঠতে পারত।

বিরোধিতার প্রশ্নে *মধ্যস্থ* পত্রিকার সম্পাদক, নাটককার মনোমোহন বসুর (১৮৩১-১৯১২) নামও উল্লিখিত হয়। ন্যাশনাল থিয়েটারের সাম্বৎসরিক উৎসব উদ্‌যাপণের সভায় প্রদত্ত বক্তৃতায়, অভিনেত্রী নিয়োগের এই নতুন প্রবর্তনাকে ভর্ৎসনা করে তিনি বলেছিলেন: "ভদ্র যুবকগণ আপনাদের মধ্যে বেশ্যাকে লইয়া আমোদ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে একত্র সাজিয়া রঙ্গ-ভূমিতে রঙ্গ করিবেন, বেশ্যার সঙ্গে নৃত্য করিবেন, ইহাও কি কর্ণে শোনা যায়? ইহাও কি সহ্য হয়? ইহাও যে রাজধানীতে— এত সুশিক্ষা, সদুপদেশ ও সভ্যতার মধ্যে কোনও সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অনায়াসে অনুষ্ঠিত হইতেছে, ইহার অপেক্ষা বিস্ময় ও আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে?"[২১] মনোমোহন তাঁর ভাষণে ক্রোধের তীব্রতা প্রকাশ করে বলতে দ্বিধা করেননি: "শতবর্ষ নাটক না দেখিতে হয়, যুগযুগান্তরে এ দেশে নাটকাভিনয় রূপ সুখ-দৃশ্য না ঘটে, চিরকাল স্বভাবের বিরোধী যাত্রাওয়ালারা জঘন্য অভিনয় প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত থাকে, সেও ভাল, তবু যে এমন দুষ্প্রবৃত্তিসাধক ধর্ম্মনীতিঘাতক ঘোর লজ্জাজনক প্রথাকে আমাদিগের এই জাতীয় নাট্যসমাজ অথবা অন্যান্য অভিনেতৃসমাজ অবলম্বন না করেন।"[২২] অবশ্য ষোলো বছরের ব্যবধানে সেই মনোমোহনের মতো রক্ষণশীল নাট্যপ্রেমীকেও তাঁর বিস্ময় ও আক্ষেপ মোচন করে এমারেল্ড থিয়েটারে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথম ভাগে তাঁর *রাসলীলা*-য় অভিনেত্রী নিয়োগ করতে বাধ্য হতে হয়েছিল, কেন না একজন পেশাদার প্রযোজক হিসেবে দর্শকের চাহিদা উপেক্ষা করার সাহস দেখাতে পারেননি। স্মরণ করা যেতে পারে, তার আগেই রাজকৃষ্ণ রায়কেও (১৮৪৯-১৮৯৪) স্ত্রী ভূমিকায় পুরুষদের অভিনয় অব্যাহত রাখতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হতে হয়েছিল। ঋণের দায়ে, নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বীণা থিয়েটার উপেন্দ্রনাথ দাসকে (১২৫৫-১৩০২ বঙ্গাব্দ) ভাড়া দিয়েছিলেন মহিলা অভিনেত্রী সহযোগে অভিনয় করার জন্য। এই সংবাদ জানিয়ে *সুলভ সমাচার ও কুশদহ* পত্রিকায় (৭ ডিসেম্বর ১৮৮৮) লেখা হয়: "আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে আর্য্য নাট্য সম্প্রদায়ও রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের পক্ষে ইহা একটি কম ঘৃণা এবং লজ্জার কথা নহে, যে বাঙ্গালীরা আজিও সন্নীতির পোষকতা করিতে শিখে নাই। তা না হইলে এক কলিকাতা শহরেই "বেঙ্গল", "ষ্টার", "এমারেল্ড" বেশ্যা অভিনেত্রী মিশ্রিত এই তিনটী রঙ্গভূমি বহুকাল হইতে নির্ব্বিবাদে চলিয়া কি প্রকারে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে? গত বৎসর কলিকাতার ষ্টার থিয়েটার কতকগুলি বেশ্যা লইয়া অভিনয় করিবার জন্য ঢাকায় গিয়াছিল, কিন্তু তথাকার ভদ্রলোকদিকের প্রতিবন্ধকতায় তথায় অভিনয় করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাতে বোধ হয়, কলিকাতার লোক অপেক্ষা ঢাকার লোকেরা অধিক নীতিপরায়ণ।"[২৩]

মনোমোহন প্রদত্ত পূর্বোক্ত ভাষণের প্রায় সমসময়ে, বছর খানেকের ব্যবধানে *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, 'চিরাভ্যস্ত লজ্জায় জলাঞ্জলি' দিয়ে, নাটক ও নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে কীভাবে সমাজকে কলুষিত করছে তার সমালোচনা করে 'রঙ্গভূমি' শিরোনামে একটি প্রতিবেদনে লিখেছিল: "নাট্যশালায় অসম্মানিত স্ত্রীলোকের অধিকার; ইহা একটি বহুল অনর্থের মূল হইয়া উঠিয়াছে। যে দূষিত বায়ু দূর হইতে পরিহার্য্য তাহাই অতি যত্নে ব্যবহার্য্য হইতেছে। মানিলাম, সুশীলতার দৃষ্টান্তে দুঃশীলতা যাইতে পারে এবং পুণ্যের দৃষ্টান্তে পাপ পলায়ন করিতে পারে, কিন্তু যিনি দয়ার্দ্র হইয়া ওই সমস্ত স্ত্রীলোকের উপকারের জন্য এই রূপ ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনি অন্য কোন রূপ উৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া উহাদের উদ্ধার সাধন করিতে পারেন, কিন্তু যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মাত্রে বিশ্ব দগ্ধ করিবার শক্তি ধারণ করে, সে বিশ্বাস করিয়া তাহা বস্ত্রাঞ্চলে ধারণ করে, বিশ্বাস করিয়া তাহা বস্ত্রাঞ্চলে বন্ধন করা উচিত নহে।"[২৪] এবং শুধু স্ত্রীলোকের রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী হিসেবে যোগদান তো দূরের কথা, হিন্দু শাস্ত্রকারগণ যে স্ত্রীলোকদিগের যাত্রা উৎসবাদি দর্শন করা নিষেধ করেছেন, সেই যৌক্তিকতার কথা উল্লেখ করে স্ত্রী স্বাধীনতাপ্রিয় যুবক যাঁরা রঙ্গভূমিতে আপনাদিগের স্ত্রীদের পাঠাচ্ছেন, তাঁদের প্রতি উপদেশ দিয়েছিল: "স্ত্রীজাতি স্বভাবতই আমোদে অনুরাগী, কিন্তু এই আমোদের যত বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হয়, ততই মঙ্গল। বিশেষত যে স্থানে নির্ব্বিশেষে লোকের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জনসমাজে প্রবেশ করিলে নানারূপ কুদৃষ্টান্ত কোমল মনে সহজেই অঙ্কিত হইতে পারে।"[২৫]

সমাজ ও সংবাদপত্রের একটা বড়ো অংশের প্রবল প্রতিপক্ষতা সত্ত্বেও বেঙ্গল থিয়েটারের সময় থেকে নাট্যালয়ের প্রয়োজনেই বারবণিতারা এসেছেন— রঙ্গমঞ্চের সেবা করেছেন। নিজেদের আর্থিক সংকট মোচন করা সম্ভব হবে এই প্রত্যাশায় রঙ্গমঞ্চে যোগ দিয়ে, হয়তো কেউ কেউ দেহব্যবসার নৈপুণ্য, ছলাকলা, শরীর সৌন্দর্যের অধিকারিণী হয়ে ফিরে গেছেন অন্ধকার জগতের হাতছানিতে। সামাজিক প্রতিপত্তি প্রদর্শনের লক্ষ্যে অথবা অধঃপতিত বাবুরা, নিষিদ্ধপল্লিতে নিয়মিত রক্ষিতা রাখার বন্দোবস্তের প্রলোভন দেখিয়ে, থিয়েটার থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছেন কাউকে-কাউকে। যাঁরা থেকে যেতে পেরেছেন, তাঁদের মধ্যে থেকে গড়ে উঠেছে গোলাপসুন্দরী, এলোকেশী, জগত্তারিণী, যাদুমণি, বিনোদিনী, প্রমদাসুন্দরী, বসন্তকুমারী, তারাসুন্দরী (১৮৭৮-১৯৪৮), কুসুমকুমারী (১৮৭৬-১৯৪৮), সুশীলাবালা, নীরদাসুন্দরী, রানিসুন্দরীর দল। তা ছাড়া একই নামের কত বিচিত্র সব বিশেষণ একই সময়ে— হরিমতী বিভা, হরিমতী বিড়াল, হরিমতী ডেকচি, হরিমতী ছোটো। এছাড়াও হরিসুন্দরী, হরিদাসী। এই তালিকায় হরিমতী গুলফন বা গুলফম-ই দীর্ঘস্থায়ী খ্যাতি পেয়েছিলেন। পিতৃপরিচয়হীন অনাথ সব বালিকারা এসে জুটেছে রঙ্গমঞ্চের ব্যালেট্রুপে— ভবিষ্যতে নাচগান অভিনয়ের শিক্ষা নিয়ে অভিনেত্রী পদে উন্নীত হয়ে সাংসারিক অসচ্ছলতার সহায় হিসেবে দেখা দিয়েছেন। এই নিয়তির পথেই তাদের অভিযাত্রা চলেছে যুগের পর

যুগ। অভিজাতদের ব্যসনের, স্ফূর্তির, অবসর বিনোদনের পণ্য হয়েই হারিয়ে যাওয়াতেই পুরুষানুক্রমিক পরিচয় নিহিত।

গিরিশচন্দ্র বলেছেন: "কাজেই নাট্যাধ্যক্ষেরা রঙ্গালয়ে স্ত্রীলোক আনিয়াছেন; কিন্তু আমাদের সমাজে অভিনেত্রী রূপে কুলস্ত্রী কোথায় পাইবেন? প্রথমে কোন দেশে কে পাইয়াছে?"[২৬] অনেক সুবিবেচক ব্যক্তি গণিকার সঙ্গে সংযোগ লক্ষ করে রঙ্গালয়কে ঘৃণা করলেও কীর্তনী ও নর্তকীর প্রতি তাঁরা সে রকম বিদ্বেষ পোষণ করেন না। গিরিশচন্দ্র দেখেছেন: "কীর্ত্তনী গাহিতেছে, সে সভায় সকলেই বসেন। নাচের নিমন্ত্রণে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ যাওয়ায় কোন সম্প্রদায়ের ধর্মযাজক আপত্তি করেন না। কিন্তু রঙ্গালয়ের প্রতি— তাঁহাদের সে উদারতা প্রকাশ নাই। কীর্ত্তনে নর্ত্তনে গুণ দেখেন— বেশ্যা দেখেন না। কিন্তু সমস্ত রঙ্গালয় বেশ্যার ঘ্রাণে পরিপূর্ণ।"[২৭] বোঝাই যায় *রঙ্গালয়* পত্রিকায় যখন এই প্রবন্ধ লিখছেন গিরিশচন্দ্র, ১৩০৭ বঙ্গাব্দের ১৭ ফাল্গুন অর্থাৎ ১৯০১-এ তখনও সমাজে অভিনেত্রীরা অচ্ছ্যুৎ। এমনকী তার সতেরো বছর পূর্বে স্টার থিয়েটারে স্বয়ং পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব (১৮৩৬-১৮৮৬) এসে বিনোদিনীর মস্তক স্পর্শ করে সমগ্র নটীকুলকেই আশীর্বাদ জানিয়ে যাওয়ার পরও সমাজ-শিরোমণিদের মনোভাব বদলায়নি।[২৮]

বিচক্ষণ নাট্যাধ্যক্ষ নটগুরু গিরিশচন্দ্র বুঝেছিলেন, বিনোদিনীর প্রতি রূপমুগ্ধ গুর্মুখ রায় তার দেহের বিনিময়ে রঙ্গালয়-গৃহ গড়ে দিলেও বিনোদিনীর নামানুসারে 'বি-থিয়েটার' রাখা সম্ভব নয়। এমনকী, স্টারের অন্যতম অংশীদার করতে চেয়েও ব্যর্থ হয়েছিলেন গুর্মুখ। এই প্রবঞ্চনার শিকার হতে হয়েছিল বিনোদিনীকে সমাজের বিষদৃষ্টির অজুহাতে, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে তাঁর সহকর্মী পুরুষরাই তো সেই পরিস্থিতিতে ইন্ধন জুগিয়েছিলেন।

বিশ শতকের সূচনা সময়েও হিন্দু সংস্কারকদের কাছে রঙ্গালয় কেমন ঘৃণার বস্তু তার উল্লেখ পাওয়া যায়, এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মিঃ স্ট্যানলীকে ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনন্দন জানানোর যে বিবরণ *রঙ্গালয়* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সেটি পড়লে। 'থিয়েটারের অভিনেত্রী সকল বেশ্যা; সুতরাং থিয়েটার সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য'— ব্রাহ্মদের এই অভিমত উদ্ধৃত করেও *রঙ্গালয়* পত্রিকা স্পষ্টত জানিয়েছিল: "এই নিষেধের মূল্য কিছুই নাই, কেবল শ্রেণী বিশেষের খেয়ালের পুষ্টি করা মাত্র। থিয়েটার বেশ্যা না হইলে চলে না, হয় থিয়েটার বন্ধ করিতে হয়, নয় বালকের সাহায্যে স্ত্রী অংশ অভিনয় করাইতে হয়। মৃত রাজকৃষ্ণ রায় বালকের সাহায্যে থিয়েটার করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। সুতরাং থিয়েটারী ব্যবসায় চালাইতে হইলে বেশ্যার সাহায্য অনিবার্য্য। এমন অবস্থায় বেশ্যা বলিয়া নাসিকা কুঞ্চন করাও মূর্খতার পরিচায়ক। থিয়েটারের অভিনেত্রীর বার্দ্ধক্যেও দারিদ্র্যের ভয় নাই।"[২৯] সে সময় 'খোস্‌খেয়ালী ধনী যুবজনের উপদ্রবে' থিয়েটারের অভ্যন্তরে যে মাঝেমাঝেই বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল— তার কারণ অভিনেত্রীদের কেন্দ্র করে একটা প্রতিযোগিতা তখন কোনও কোনও রঙ্গালয়ে খুব তীব্রতা পেত। *রঙ্গালয়* পত্রিকায় এ রকম একটি ঘটনার উল্লেখ করে লেখা হয়: "থিয়েটারের ব্যবসায় মজার সামগ্রী, উপার্জ্জনকে উপার্জ্জন— ইয়ারকীকে ইয়ারকী। কাজেই খামখেয়ালী বাবুদের এ ব্যবসায়ের উপর বড়ই

খরদৃষ্টি। এই বিষম খরদৃষ্টিবশতঃ থিয়েটারে ভাল অভিনেত্রীকে চিরস্থায়ী রাখা যায় না, আটঘাট না বাঁধিয়া রাখিলে থিয়েটারের ব্যবসায়ও করা চলে না।"[৩০] এই 'আটঘাট' বাঁধার কারণেই থিয়েটারের বাবুদের মধ্যে 'রক্ষিতা' রাখার প্রচলন কেন আবশ্যিক সে বিষয়ে স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ৪ নভেম্বর তারিখে আদালতে একটি মানহানির মামলায় সাক্ষী দিতে গিয়ে স্পষ্টত বলেছিলেন: "আমার রক্ষিতা আছে। আমার যে ব্যবসায় তাহাতে রক্ষিতা না রাখিলে চলে না। ভাল অভিনেত্রী বাজারে পাওয়া যায় না, গড়িয়া লইতে হয়। রক্ষিতা করিয়া না রাখিলে ধনী বাবুদের গ্রাস হইতে তাহাদের কেমন করিয়া রক্ষা করিব?"[৩১] অমরেন্দ্র স্বীকার করেছেন তারা নামের অভিনেত্রীকে এই কারণেই আট বৎসরকাল রক্ষিতা রেখেছিলেন। কুসুমকুমারীকেও একই কারণে ধরে রেখেছিলেন তিনি, কিন্তু ধনীবাবুদের গ্রাস থেকে অমরেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত তাঁদের রক্ষা করতে পারেননি— রঙ্গালয়ে এ রকম রোমাঞ্চকর ঘটনা সকলে স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করতে অভ্যস্ত।

বেঙ্গল থিয়েটার থেকে পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের অধিক সময় জুড়ে বারাঙ্গনাপল্লির সঙ্গে অভিনেত্রীদের সংযোগের ধারাবাহিকতায় প্রথম ব্যতিক্রমী ঘটনা কঙ্কাবতী সাহু বি এ-র (১৯০৩-১৯৩৯) আত্মপ্রকাশ। স্টার রঙ্গমঞ্চে আর্ট থিয়েটারে তিনি যোগদান করলেও, শিশিরকুমার ভাদুড়ী (১৮৮৯-১৯৫৯) তাঁকে নাট্যমন্দির রঙ্গমঞ্চে নিয়েছিলেন— যে জন্য উভয় রঙ্গালয়ের বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল। নাট্যাচার্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রঙ্গমঞ্চের বাইরে যে নিবিড়তা পেয়েছিল, তাতে বিপত্নীক শিশিরকুমারের সঙ্গে তাঁর পরিণয় সম্পর্কের একটা বিশ্বাসযোগ্য রটনা প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু শিশিরকুমারের ব্যক্তিগত জীবনে নিয়মিত মদ্যপান ও উচ্ছৃঙ্খলতা— তাঁর পূর্ব জীবনের অধ্যাপনা বৃত্তির পরিচয়ে কোনও কালিমা লেপন করেনি। এতটাই তাঁর প্রতিভার দ্যুতি, নতুন নাট্যযুগের প্রবর্তনায় বিচ্ছুরিত হয়েছিল যে— তাঁর অবসর-বিনোদনের মুখরোচক গল্প সামাজিক ভাবে কোনও নিন্দার কারণ হয়েছে বলে আমরা জানি না। সেই উদারচিত্ত মুক্ত মানুষটি নাকি তাঁর মায়ের অনিচ্ছাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কঙ্কাবতীর মতো শিক্ষিতা, রুচিশীলা, ব্যক্তিত্বময়ী মহিলাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারেননি। তাঁর সন্তানের ক্ষেত্রে পিতৃত্বের পরিচয় না প্রতিষ্ঠিত করলে— ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকার কী সমস্যার মধ্যে পতিত হতে পারে সে-কথা ভাববার সময় বা সদিচ্ছা তাঁর হয়নি।

রঙ্গমঞ্চের শিশিরযুগেরই আর এক প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী প্রভাদেবী (১৯০৩-১৯৫২) ও তারাকুমার ভাদুড়ীর সন্তানদের ক্ষেত্রে আজও যে অন্ধকার সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি, সে তো শিশির-অনুজের অদূরদর্শিতার ফল। কেতকী দত্ত (১৯৩৪-১৯৫২) আর চপল ভাদুড়ী (১৯৩৯) বাংলার নাট্য ও যাত্রা জগতের দুই কৃতী অভিনেত্রী ও অভিনেতার কাছে পিতৃস্বীকৃতির প্রশ্নে যে কুৎসার বিষময় পরিস্থিতি তুলে ধরা হচ্ছে— সে তো সামাজিক আভিজাত্যের প্রবঞ্চনারই নামান্তর। ভূমেন রায় (১৮৯৯-১৯৫৩) আর রেণুবালা সুখের (১৯০৮-১৯৭৯) সন্তানদের ক্ষেত্রেও তো এ-অভিজ্ঞতা অশ্রুসজল বেদনারই নামান্তর। রেণুবালার মা হরিমতী (ছোটো)-র জীবনে যে নবীন নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এসেছিলেন, শিক্ষিত কেতাদুরস্ত সেই মানুষটি একদিন নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন সমাজের নিরাপদ সম্মান বজায় রেখে। সাহস করে একজন অভিনেত্রীর পরিচয়েই হরিমতী তাঁর মেয়ে রেণুকে হেদুয়ার ডাফ স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণেই পিতৃপরিচয়হীন সেই মেয়েকে স্কুল ছাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত মিনার্ভায় পাঠিয়েছেন অভিনেত্রীর মেয়েকে অভিনেত্রী করার ভবিতব্য মেনে নিয়ে। এ রকম উদাহরণ আরও দেওয়া যায়, কিন্তু স্বীকৃতির প্রশ্নে, সামাজিক অন্যায়ের প্রশ্নে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সুবিধাভোগী এক ধরনের হীনম্মন্য ব্যক্তির স্বার্থপরতার প্রশ্নে নামাবলি উদ্ধার না করাই ভালো। তবে এর পাশাপাশি কৃষ্ণচন্দ্র দে (১৮৯৩-১৯৬২) আর তারকবালা লাইট-এর সার্থক-সন্নিধান সে তো সমাজের মধ্যেই ঘটেছে— ব্রাহ্মণ ডেকে, মন্ত্র উচ্চারণ করে, মালা পরিয়ে সম্ভ্রান্ত জনের অবৈধ সন্তান তারককে বিবাহিত জীবনের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন অন্ধ গায়ক। এই তারকবালাও আশ্চর্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন— নিজের অভিনেত্রী জীবনের সব আকর্ষণ ছেড়ে নিজের একমাত্র খোকাকেই সময় দেওয়া প্রধান কর্তব্য বিবেচনা করেছিলেন। মাঝে মাঝে, 'মা কোথায় যাচ্ছ?'— খোকার এই প্রশ্নে বিব্রত বোধ করতেন, তিনি জানিয়েছেন: "আমি যেন কিছুতেই ছেলেকে সত্যি কথাটুকু বলতে পারতুম না যে আমি থিয়েটার করতে যাচ্ছি—। খোকার কাছে আমার মিথ্যে কথা বলতে মন সায় দিত না, তাই একদিন থিয়েটার ছেড়ে দিলুম।" কৃষ্ণচন্দ্রও সেই আদর্শবোধকে মর্যাদা দিয়েছেন, নিজের প্রকাশ্য স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত বোধ করেননি। পাছে তাঁর অবর্তমানে তারকের অসম্মান হয়, সে জন্য পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে মনোমোহন বসুর পুত্র মতিলাল বসু অভিনেত্রী রাজবালার গর্ভে ইন্দুবালার জন্ম দিয়েই বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। রাজবালা ঘর বাঁধবার স্বপ্ন চরিতার্থ করতে পারেননি— তবু তাঁর মেয়ে ইন্দুবালা বড় হয়ে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেও নিজেকে 'রামবাগানের মেয়ে' বলে পরিচয় দিয়ে গর্ব বোধ করতেন।

কঙ্কাবতীর পথে শিক্ষিতা মেয়েরা অভিনেত্রী জীবনকে বরণীয় মনে করেছেন গত শতকের চল্লিশের দশকে গণনাট্য সঙ্ঘের সময় থেকে। তৃপ্তি মিত্র (১৯২৫-১৯৮৯) স্বীকার করেছেন: "বিনোদিনীর পর অনেক যুগ কেটে গেছে। মেয়েদের অবস্থা বলতে গেলে সামান্যই বদলেছে। তবে মেয়েদের অভিনয় বৃত্তিকে এখন আর অপাঙক্তেয় মনে করা হয় না, এটাই যা প্রগতির লক্ষণ।... তবু চল্লিশের দশকে কাজটা খুব সহজ ছিল না সে যে থিয়েটারেই হোক না কেন।"[৩২] অন্যত্র তিনি প্রাক-বিবাহ সময়ে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে *জবানবন্দী* নাটকের অভিনয় করতে গিয়ে, প্রবল তৃষ্ণায় এক গৃহস্থ বাড়িতে জল চাইলে একটি বউ হাসিহাসি মুখ করে কাঁসার গ্লাসে জল দিচ্ছে দেখে এক প্রৌঢ় পুরুষকণ্ঠ চিৎকার করে উঠেছিল: "নটীদের গেলাসে জল দিচ্ছ কেন, ঘটি করে হাতে ঢেলে দাও, ওই বাইর বাড়ির থেকেই বিদায় কর।"[৩৩] সঙ্গে আর এক অভিনেত্রী ললিতা বিশ্বাস (দেবব্রত বিশ্বাসের বোন) ছিলেন, তিনি গৃহকর্তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন: 'আমরা দেশের কাজের জন্য'..., তাতে কোনও ফল হয়নি, বরং ওই সব শিক্ষাপ্রাপ্তারা বুঝেছিলেন পথটা খুবই শক্ত।[৩৪]

স্মরণে বিস্মরণে, নবান্ন থেকে লালদুর্গ (১৯৯৩)— পাঠ করলে নতুন থিয়েটারের

জগতের মেয়েদের সংকট ও সংগ্রামের কথা জানতে পারা যায়, ব্যষ্টির দর্পণে সমষ্টির ছবিটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শোভা সেন (১৯২৩) এ কাজের বিস্তার দিয়েছেন *ওঁরা, আমরা, এরা* নামের একটি সংকলনে— উনিশজন থিয়েটার-যাত্রার মেয়েদের পরিচয় দিয়েছেন, সে কাল থেকে এ কাল তাঁদের পরিধি, পেশাদার-অপেশাদারের জগতে তাঁরা একটা সত্যেই দেদীপ্যমান যে তাঁরা ভালবাসেন থিয়েটারকে। শোভা বলেছেন: "আমরা যেমন যশ খ্যাতি সবই পাই এই থিয়েটার থেকে, আবার সবই খোয়াতেও হয় এখানেই। কত অত্যাচার, কত বঞ্চনা— সে সব কথা তো বলা যাবে না কোনোদিন। বুক ফেটে গেছে কিন্তু বাইরে তার প্রকাশ নেই। পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েদের তো এ বঞ্চনা সইতেই হবে।"[৩৫] পূর্ণিমা দেবীর (১৯২৭) অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গিয়ে এই সমবেদনা জানিয়েছেন শোভা। তাঁর মনে পড়েছে *টিনের তলোয়ার*-এর ময়নাকে। বসুন্ধরার স্মরণীয় রূপকার সে নাটকের সংলাপে বলেছে: "ঘর বাঁধো ময়না। আমি ঘর বাঁধতে পারিনি। পনেরো বছর বয়সে এক রাজা বাহাদুর, তার নাম বলবো না, আমাকে চুরি করে নিয়ে যান। তাঁর সখ মিটে গেল শিগ্‌গিরই। তারপর দেহ বেচে পেট চালিয়েছি বহু বছর। আর একাকিত্বের একটা দিগ্বিদিকহীন প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছি নিরাপত্তা আর আশ্রয়ের খোঁজে। তুমি আমার সেই অসম্পূর্ণ স্বপ্ন, ময়না, তোমার সংসার হোক, কোলে রাঙা ছেলে আসুক, তোমার মধ্যে আমি পূর্ণ হই।"[৩৬] থিয়েটারের এই ময়না বাস্তবের ছন্দা চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৭)— জীবনের অনেক প্রলোভন ত্যাগ করে, সম্ভ্রান্ত ডাক্তারের মেয়ে হয়েও অভিনয়কেই পেশা করেছেন, অথচ তাঁর স্বামীর হাতের পুতুল হয়ে নিছক 'পয়সা আমদানির একটা যন্ত্র' হিসেবেই ব্যবহৃত হতে হতে নিজের যথাসর্বস্ব খুইয়েছেন।

নিজের মধ্যে তাঁর মায়ের স্বপ্ন পূর্ণ হবে এই আশায় প্রভার মেয়ে কেতকী দত্ত বিবাহিত জীবনের স্বাদ পেতে চেয়েছিলেন। মায়ের সূত্রে একই পরিবারে দুটি পদবির পরিচয়, সিকদার আর ভাদুড়ি, এই দুটির সহাবস্থান সংঘাত থেকে সমাজ-সংস্কারের গোলকধাঁধায় তাঁর সাংসারিক জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। পরবর্তী জীবনে তাঁর স্বামী হাওড়ার এক বর্ধিষ্ণু দত্ত পরিবারের মদনমোহন, তাঁকে সামাজিক স্বীকৃতি দিয়ে নিজের ঘরে নিতে পারেননি— অন্যদিকে ভালবাসার ব্লোহট *বারবধূ*-র সফল মঞ্চ জীবনে থিয়েটারের স্বার্থে অসীম চক্রবর্তী (১৯৩৩-১৯৮১) এলেও— তার বঞ্চনার যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছে। সেই অসীমের মৃত্যুসজ্জায় তাঁর সৎকারকর্মে— তাঁর স্ত্রীর উপস্থিতিতে কেতকীকেই নতুন পাঞ্জাবি পরিয়ে, চন্দন দিয়ে সাজিয়ে, ধুতি পরিয়ে বিদায় জানাতে হয়েছে— 'সমাজে অপাংক্তেয়' হওয়া সত্ত্বেও সব করণীয় সম্পন্ন করতে হয়েছে। তারাশঙ্করের *মঞ্জরী অপেরা*-র শেষ দৃশ্যে গোরাবাবুর মৃতদেহের সামনে বেশ্যাকন্যা মঞ্জরীকেও নীরব হয়ে যেতে হয়েছে মানসিক যন্ত্রণায়।

৫

আসলে থিয়েটার বা যাত্রা বলে কথা নয়, অভিনেত্রী মাত্রেই বসুন্ধরার মতো 'একাকিত্বের একটা দিগ্বিদিকহীন প্রান্তরে' একটা জীবনকে দিনের পর দিন বহে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে

'নিরাপত্তা আর আশ্রয়ের খোঁজে'। পেশাদার-অপেশাদার যাত্রায় প্রধানত নারী-চরিত্রে পুরুষদের অভিনয় দীর্ঘকালের এক ঐতিহ্যবাহী জনপ্রিয় প্রথা। কোনও এক সময়, সম্ভবত উনিশ শতকে মদন মাস্টারের পুত্রবধূ কৈলাসকামিনী যে দলটির পরিচালনভার নেন তাঁর স্বামী নবীন মাস্টারের প্রয়াণের পর, সেটি বউ মাস্টারের দল নামেই সর্বত্র পরিচিতি লাভ করে। সে দলের সাফল্যের অনুসরণে নবদ্বীপের বিখ্যাত যাত্রা অধিকারী নীলমণি কুণ্ডুর পত্নীও যে দলটি সংগঠিত করেন, সেটি বউ কুণ্ডুর দল হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। এরা উভয়েই স্বত্বাধিকারিণী হলেও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন এমন তথ্য জানা নেই।

তবে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, যাত্রা, কীর্তন, নাচ, ঝুমুর দল থেকে থিয়েটারের অভিনেত্রী সংগৃহীত হয়েছে। এক সময় চিৎপুর সোনাগাছি, জোড়াবাগান, শোভাবাজার, নিমতলা অঞ্চলে যে সব মেয়ে-যাত্রার দল জনপ্রিয় হয়েছিল সেগুলির মধ্যে উল্লেখ্য কটাগোলাপীর দল, ভবতারিণীর দল, ত্রৈলোক্যতারিণীর দল, রাধাবিনোদিনীর দল। আশ্চর্যের বিষয় ইদানীংকালে চিৎপুরে পেশাদার হিসেবে দু-একটি মেয়ে যাত্রার দল সংগঠিত হতে দেখা যাচ্ছে।

যাত্রায় পুরুষদের পাশাপাশি স্ত্রীভূমিকায় মহিলাদের অংশগ্রহণ কিছুটা আকস্মিক—গত শতকের পঞ্চাশের দশকে পরিলক্ষিত হয়েছিল। যুগপৎ স্বাধীনতা আর দেশবিভাগের বিষময় ফল হিসেবে উদ্বাস্তু সমস্যা অত্যন্ত প্রকট আকার নিয়ে সমাজ-অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল। সে-রকম এক সময়ে বরিশালের ভোলা শহরের আইনজীবী সুরেন্দ্রচন্দ্র দত্তের পরিবার ভাগ্যবিপর্যয়ে এদেশে চলে আসেন। কিছুদিন পরে সর্বহারা সেই পরিবারের একটি বালিকা বছর সাতেক বয়সে বাধ্য হয়ে রোজগারের লক্ষ্যে যাত্রাদলের সখীব্যাচের নাচিয়ে হিসেবে যোগ দেয়। তিনিই ধীরে ধীরে বাংলার পেশাদার যাত্রাজগতে যাত্রাসম্রাজ্ঞী জ্যোৎস্না দত্ত (১৯৪১-২০০২) হিসেবে পরিচিতি পান। প্রচুর খ্যাতি অর্থের অধিকারিণী জ্যোৎস্না জীবন-সায়াহ্নে গভীর বেদনায় সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (১৯৫৪) জানিয়েছিলেন, যে সংসারের জন্য সাত বছর বয়সে পা দিয়েছিলেন এক অচেনা জগতে, সেই সংসার আর আত্মীয়-সমাজ শেষ পর্যন্ত তাঁকে পরিত্যাগ করে। তাদের চোখে জ্যোৎস্না তখন হয়ে গেছেন 'যাত্রা দলের নটী'। অভিমানাহত কণ্ঠে তিনি বলেছিলেন: ''নামযশ হয়েছে। টাকা পয়সাও এক সময় করেছিলাম। কিন্তু কি পেলাম বলুন তো। কলঙ্কের ছাপটাই শুধু রয়ে গেল।''[৩৭]

ব্রজেন্দ্রকুমার দে (১৯০৭-১৯৭৬) তাঁর লেখা পালায় নটীকুলসম্রাজ্ঞী বিনোদিনীর মুখে তুলে এনেছিলেন সমাজ অপাঙ্‌ক্তেয় জীবননাট্যের সহজ পরিণতি: ''তুমি আমায় জাতে তুলতে চেয়েছিলে ঠাকুর। যাদের জন্য জীবনপাত করলুম তারাই আমায় নিলে না।''[৩৮] এই আত্মধিক্কার শুধু তাঁর পরিবারের দিকে ছুড়ে দেওয়া নয়, নীতিবাগীশ সমাজের প্রতিভূ যাঁরা তাদের দিকেও নিক্ষিপ্ত। এই বিনোদিনীর ভিতর দিয়েই নারী জীবনের প্রবল ক্ষোভ, বেদনার ব্যঞ্জনা, আর বিদ্রুপের কষাঘাত দিয়ে ব্রজেন্দ্রকুমার কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকেই ধিক্কার দিয়েছিলেন: ''আমি গণিকার মেয়ে নাচলে দোষ হয় না, গাইলে লোকে শুনবে, অভিনয়

করলে লোকে বাহবা দেবে। তাই বলে আমার নামে থিয়েটার আর তাতে কাজ করবেন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা, এ বড় লজ্জার কথা।"[৩৯]

জ্যোৎস্না দত্তের দীর্ঘ যে নাট্যজীবন, সেখানে বিনোদিনীর অন্তর্বেদনার হাহাকারটাই সারা জীবনের বেদনা হয়েই বেজেছে: "পতি-প্রেম সাধ আমাদেরও আছে, কিন্তু কোথায় পাইব? কে আমাদের হৃদয়ের পরিবর্তে হৃদয় দান করিবে? লালসায় আসিয়া প্রেমকথা কহিয়া মনোমুগ্ধ করিবার অভাব নাই, কিন্তু কে হৃদয় দিয়া পরীক্ষা করিতে চান যে আমাদের হৃদয় আছে? আমরা প্রথমে প্রতারণা করিয়াছি, কি প্রতারিতা হইয়া প্রতারণা শিখিয়াছি, কেহ কি তাহার অনুসন্ধান করিয়াছেন।... অর্থ দিয়া কেহ কাহারও ভালোবাসা কেনেন নাই। আমরাও অর্থে ভালোবাসা বেচি নাই। এই আমাদের সংসারের অপরাধ।"[৪০] এই অপরাধের পথে স্বপনকুমারের মতো নায়ক জ্যোৎস্নার জীবনে এসেছেন, ভালবেসেছেন, বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েও মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া সম্ভব নয় বলে তাঁকে পরিত্যাগ করতে দ্বিধা করেননি।[৪১] আর এক নায়ক তপনকুমারকে যখন আশ্রয় করতে চেয়েছেন— সেখানেও কোনও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার ভয়ে তাঁকে গ্রহণ করার সাহস দেখাতে পারেননি তাঁর প্রেমিক। পরে আশ্চর্য গল্পও তৈরি করেছেন তপনকুমার, সম্ভব হয়নি কেন না— কয়েক বছর প্রেম করার পরেও তিনি তাঁর মধ্যে একমাত্র প্রয়াতা দিদিকে প্রত্যক্ষ করেছেন বলে।[৪২] আসলে পুরুষতান্ত্রিকতার বিশাল ষড়যন্ত্র তাঁর জীবিকায় যেমন বারবার পেছন থেকে প্রতারিত করেছে তেমন নিভৃত প্রেমের ব্যর্থতায় বিক্ষত হয়ে নিজের কাছে ফিরে আসতে হয়েছে। *সোনাই দীঘি* পালার অত জনপ্রিয়তার পর হ্যান্ডবিলে, মুদ্রিত পালা গ্রন্থের প্রচ্ছদে নায়িকার ছবি ছাপার ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র অভিপ্রায়কে মর্যাদা দেননি দল মালিক-ম্যানেজার-প্রধান অভিনেতা সম্মিলিত ভাবে। যখন তাঁর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে— সে সময় ওই পালার অভিনয় এইচ এম ভি রেকর্ডে গ্রহণের সময় তাঁকেই বাদ দেওয়ার কথা শুনে স্বয়ং ব্রজেন্দ্রকুমার, জ্যোৎস্নাকে বাদ দিলে *সোনাই দীঘি* শুধু দীঘিতেই পড়ে থাকবে বলেছিলেন। সুতরাং সে প্রস্তাব তিনি গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। আমাদের দুর্ভাগ্য ব্রজেন্দ্রকুমারের মতো প্রকৃত সংস্কারকের মন নিয়ে যাত্রার জন্য ভাবনাচিন্তা করতে আর একজনও আসেননি।

বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনেত্রী নিয়োগের ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র, থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। যাত্রা জগতের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, বিশ শতকের পালাসম্রাট হিসেবে বন্দিত ব্রজেন্দ্রকুমার দে যাত্রাজগতের সঙ্গে প্রকৃত নারীর সংযোগকে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। প্রকৃত অর্থে সব দিক থেকে মুক্তমনের অধিকারী ব্রজেন্দ্রকুমার এই প্রথার ভবিষ্যৎ পরিণাম নিয়ে অত্যন্ত ভাবিত হয়েছিলেন। আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি বলেছিলেন: "আগামী দিনের শুধু মাত্র ব্যবসায় বুদ্ধি সম্পন্ন অধিকারীর হাতে নারীত্বের চরম অবমাননা ঘটা খুবই স্বাভাবিক। আসরে কুৎসিত জীবন-বিমুখ পালা উপস্থাপনা করে তার জঘন্যতম দৃশ্যে অভাবী মেয়েদের তুলে দেওয়া হবে। যার সব পথ বন্ধ, যার বাড়িতে অন্নাভাব, সে কীভাবে এর হাত থেকে রেহাই পাবে? এর পর আরও থাকবে বড় অভিনেতা, ম্যানেজার মালিকের নির্মম অত্যাচার।"[৪৩] তিনি চেয়েছিলেন: "অফিসে আদালতে স্কুলে কলেজে

মঞ্চে পর্দায় সর্বত্রই তো নারীদের স্থান বেশি করে হচ্ছে। যতদিন না মালিক ম্যানেজার সর্দার অভিনেতাদের মানসিকতার পরিবর্তন হচ্ছে, মহিলাশিল্পীদের নিজেদের মধ্যে আত্মরক্ষার শক্তি জন্মাচ্ছে অথচ সামগ্রিক পরিস্থিতির আমূল সংস্কার হচ্ছে, ততদিন এ শুধু পুরুষদের জন্য থাক।"[৪৪]

ব্রজেন্দ্রকুমার, বড় ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ (১৮৯৩-১৯৬৮) সমকালের দুই যাত্রা ব্যক্তিত্ব ঐকমত্য পোষণ করেও শেষ পর্যন্ত যাত্রায় মহিলা অনুপ্রবেশের প্রবল তরঙ্গ রোধ করতে পারেননি। এ-চেষ্টায় প্রবল মানসিক জোর দেখিয়ে নট্ট কোম্পানি দলে কোনও মেয়ে নেয়নি, এমনকী বৈকুণ্ঠ নাট্য সমাজ নামে দ্বিতীয় দল তৈরি করে তাতে পরীক্ষামূলক অভিনেত্রী গ্রহণ করলেও— প্রথম পর্যায়ে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। কেন না তাদের নিজস্ব ঘরানায় পুরুষদের নারীচরিত্রে অভিনয় দীর্ঘকাল প্রবল চাহিদা বজায় রেখেছিল। কিন্তু নট্ট কোম্পানিকেও সমসাময়িক চাহিদার প্রাবল্যের কাছে নতিস্বীকার করতে হয়েছিল। যাত্রার নতুন কালের দর্শকদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ১৯৭৪-এর পর থেকে সার্বিকভাবে যাত্রা জগৎ থেকে পুরুষরানিদের তথা হি-উম্যান, রড ফিমেল বা গুঁপো রানিদের বিদায় নিতে হয়।

গত শতকের ষাটের দশকের মধ্যবর্তী পর্ব থেকে যাত্রায় নারীচরিত্রে রূপদানের জন্য এক-এক করে যোগ দিয়েছেন চিত্রা মল্লিক, বীণা ঘোষ, ছবি রায়, রিক্তা সরকার, কনকলতা, অঞ্জলি ভট্টাচার্য, বর্ণালী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামলী ভট্টাচার্য, জয়শ্রী মুখোপাধ্যায়, বীণা দাশগুপ্ত (১৯৪৮-২০০৫), মিতা চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৬-১৯৯৫), তারারানি পাল (১৯৫৪-১৯৯৪), শিখা বসু, অঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্দনা দেবী, বেলা সরকার, সাহানা বসু, মীনাকুমারী,— একটার পর একটা নাম। এদের মধ্যে সম্ভবত একমাত্র সম্পন্ন ঘরের গৃহবধূ চিত্রা মল্লিককে বাদ দিলে প্রায় সকলেই এসেছেন দারিদ্র্যের কারণেই, এসেছেন পূর্ববঙ্গের সব হারানো নিম্নবিত্তের পারিবারিক জীবনে মাথা তুলে দাঁড়ানোর প্রধান সহায়ক হয়ে, বিস্বাদ বিবাহিত জীবন ফেলে এসে কেউ কেউ যাত্রায় যোগ দিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন চরিতার্থ করতে চেয়েছেন। এমনও উদাহরণ আছে, শুধু নিরাপত্তার কারণে অঞ্জলি ভট্টাচার্যের মতো রূপসী নায়িকা, দলের রান্নাঘরের পূজারি ব্রাহ্মণ দীনেশ ঠাকুরকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁদের সন্তান বুলা ঘোষ যাত্রায় জুটি বেঁধেছিলেন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের অমিতাভ ঘোষের সঙ্গে। তাঁদের অনেকের জীবনের ঘনঘটা, সংগ্রামের প্রবল ঝড়বিদ্যুৎ দুর্বিপাকের কথা জানতে শিক্ষিত সমাজ এখনও আগ্রহ পোষণ করেন কিনা সন্দেহ। বাঙালির কোনও সারস্বত প্রতিষ্ঠান শুধু যাত্রার অভিনেত্রীদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে উদ্যোগ নিলে সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশের নথি সংগৃহীত হতে পারত।

অথচ এঁদের জীবনকথা, এঁদের পেশাগত উত্থানপতনের ইতিহাস একই সঙ্গে কম রহস্যময় এবং করুণ নয়। দিনের পর দিন ঘর সংসার ছেড়ে রাত্রি জেগে জেগে অভিনয় করা যাঁদের পেশা, পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবার সুযোগে নারী-পুরুষের সম্মেলন তাদের অন্যতর জীবনের দিকে নিয়ে গেছে। যাত্রাজীবন আর ব্যক্তিজীবনের পার্থক্যের পথে ভিন্ন এক অসামাজিকতার অন্ধকারে ডুবে যেতে হয়েছে। প্রধান অভিনেতা-মালিক-ম্যানেজারদের

নির্লজ্জ থাবায় গুঁড়িয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে তাঁদের নারীজীবনের সম্ভ্রম, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যৎ। এক জ্যোৎস্না দত্ত-ই ফুরিয়ে গেছেন কত সব খ্যাতকীর্তি কুমারদের ছলনার শিকার হয়ে, অবশেষে বিনোদ ধাড়ার সুযোগ্য পুত্র গায়ক-অভিনেতা বিবাহিত গুরুদাসের (১৯৩৬-১৯৯৪) সঙ্গে তাঁর যে ছদ্ম সাংসারিক-গার্হস্থ্যজীবন তার বিষণ্ণতা আমাদের বিস্মিত করে। ৩ নম্বর শিবু বিশ্বাস লেনের ঘরে— প্রতিবেশীর সন্তানদের নিয়ে তাঁর মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষার বিভোল চিত্র মুগ্ধ করলেও সে ছবি বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। গীতাঞ্জলি অপেরা স্থাপন করে সর্বস্বান্ত হয়ে, তাঁর নিঃসহায় জীবনের পরিণতি আমাদের ব্যথিত করেছে। বঙ্গরঙ্গমঞ্চের আর এক স্বনামধন্যা অভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৭), তাঁকেও তো উদ্বাস্তু জীবনের অসহায়তার মধ্যেই মাথা তুলে দাঁড়াতে হয়েছিল— বিবাহিত উত্তমকুমার (১৯২৬-১৯৮০) তাঁর জীবনস্বপ্নে প্রবেশ করেছিলেন প্রথম ভালবাসার নায়ক হয়ে। সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়ার ভয়ে প্রত্যাখ্যান করতে লজ্জিত বোধ করেননি— কী যাত্রায়, কী থিয়েটারে, এ রকম অনেক কুমার বারবার দেখা দিয়েছেন একজন অভিনেত্রীর অসহায়তা, একাকিত্বের সুযোগে। সমাজ বাস্তবতার নামে হোটেল দৃশ্যে নগ্ন নারী, অত্যাচার কিংবা ধর্ষণের দৃশ্যে নামমাত্র পরিধানে তার উপস্থিতি পেশাদার যাত্রায় অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল— এবং সে সবের সূচনা ও বিস্তার ঘটেছিল সত্তরের দশক থেকে। সেই ধারারই রমরমা চলছে এখন।

নাট্য কিংবা যাত্রাজগতে মেয়েদের বঞ্চনার ইতিহাস তৈরি করার কাজে এক সময় কেয়া চক্রবর্তীর (১৯৪২-১৯৭৭) মতো অধ্যাপিকা আগ্রহী হয়েছিলেন। সংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করে, কঙ্কাবতীর মতো থিয়েটারে যোগদানের সাফল্য চূড়া স্পর্শ করেছিল কেয়ার যোগদানের মধ্যে। ছেলেবেলা থেকে চারিদিকে নানা বৈষম্য— মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ, সমাজের অর্থনৈতিক অসাম্য, নারী ও পুরুষের মধ্যে স্পষ্ট একটা সীমারেখা টেনে রেখে নারীকে তার উপযুক্ত মর্যাদা স্বীকৃতি ও কর্মদক্ষতা থেকে বঞ্চিত করে রাখার চেষ্টা তাঁর চেতনাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে বলেই তিনি মঞ্চে থিয়েটার করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। সেই আগ্রহে পথ প্রশস্ত করেই এক-এক করে দেখা দিয়েছেন নমিতা মজুমদার (১৯৪৪-১৯৯৭), শাঁওলী মিত্র (১৯৪৮), উষা গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৪৫), সোহাগ সেন (১৯৪৬), সীমা মুখোপাধ্যায় (১৯৫৯), জয়তী বসু (১৯৫৩), ঈশিতা মুখোপাধ্যায় (১৯৬৩), স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত (১৯৫০), সোহিনী হালদার, ময়ূরী ঘোষ (১৯৭০), সুরঞ্জনা দাশগুপ্ত (১৯৬৩), বিষ্ণুপ্রিয়া পাল (১৯৬১) প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে, অবশ্যই না বললেও চলে শাঁওলী আর বিষ্ণুপ্রিয়া পেয়েছেন তাঁদের প্রতিভাবান মা-বাবার সফল উত্তরাধিকার। যদিও শাঁওলীর তুলনায় বিষ্ণুপ্রিয়া কোনও শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন আমাদের দিতে পারেননি, তবু আমাদের নাট্যজগতে আবহমান নটীর দুঃখ-বেদনার একটা সংকটময় সময়ের সম্পাতনের ছবির স্পষ্ট রূপটি তিনি দেখাতে চেয়েছেন। মা শোভা সেনের আত্মকথার জবানিতে তিনি *নটী* নামের একটি প্রযোজনায় উত্থাপন করেছেন সামাজিক একজন মানবী হিসেবে অভিনেত্রীদের সংকটের কথা: "বিনোদিনীর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত অভিনেত্রীর জীবন থেকে গেছে দায়দায়িত্বের এক নির্মম অর্থনীতি। থিয়েটারও সেই অমোঘ অর্থনীতিরই

অঙ্গ। তা হলে সেখানে কোথায় অভিনেত্রীর কামনার স্থান? কোথায় থিয়েটারে তাঁর নিজের সত্তার বোধে উদ্ভাসিত উদ্বেল আনন্দের তুঙ্গক্ষণের উচ্ছ্বাস? যদি থিয়েটারে সেই কামনা, সেই আনন্দ, সেই উচ্ছ্বাসেরই স্থান না থাকে, তবে 'থিয়েটার' শব্দটাই বরবাদ হোক।"[৪৫] একথা ঠিকই, পুরুষ আর নারীকে পৃথকভাবে দেখে, তাঁদের কৃতিত্বের অংশটাকে আলাদা ভাবে বিচার করে থিয়েটারের অগ্রগতির কোনও স্পষ্ট ছবি পাওয়া সম্ভব নয়। থিয়েটারের সাফল্য ও ব্যর্থতায় তাদের উভয়ের দায় ও দায়িত্বকে সমান গুরুত্ব নিয়েই দেখা দরকার।

বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে তবু এই পথে একদিন ক্রমমুক্তি সম্ভব। সুরঞ্জনা দাশগুপ্তের মতো বলতে সাধ হয়: "জীবনে চলার পথে ক্ষত, বড়ো বড়ো খানা খন্দ। সেগুলোতে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকাটাই শেষ কথা নয়। অপেক্ষাতেও বসে থাকা যায় না কবে কোন্ মহাশয় আমায় এসে বাড়িয়ে দেবে হাত। নিজের চলার পথ খুঁজে নিতে হয় নিজেকেই। খুঁড়িয়ে চলতে চলতেই সোজা পায়ে চলার দিন আসে। সময় বদল হয়। ভালো দিনটা সামনে ছবির মতো ফিট করা— এমন আশা জাগে মনে। এই আমাদের দিনগত পাপক্ষয়। সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত নয়— মধ্যাহ্ন-সূর্যের প্রখর প্রভা আমাদের থিয়েটার ফিরে পাবে এই আশা। কেননা প্রখরতাই চিরটাকাল থিয়েটারের আলো হয়েছে।"[৪৬]

একালের সুরঞ্জনার সঙ্গে সেকালের বিনোদিনীর জন্মগত ব্যবধান একশো বছরের। কিন্তু এই দীর্ঘকাল পর্বের ব্যবধানে আজও সমাজে একজন নারী হিসেবে নিজের অবস্থান একজন অভিনেত্রী হিসেবে নিজের প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির পক্ষে কতটা প্রতিবন্ধকতা হয়ে ওঠে সেটা স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা সহজ কাজ নয়। তবে আর একটি বিষয়ও ভেবে দেখা দরকার, অভিনেত্রী জীবনের কারণেই হয়তো তাঁদের কারও কারও মধ্যে অন্যতর চর্চার যে স্ফুরণ তার যথাযোগ্য স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব হয়নি। আমরা কজন জানি বিনোদিনী এবং তারাসুন্দরী নিয়মিত কাব্যচর্চা করেছেন, সমসাময়িক কালের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে। *সৌরভ* পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩০২) তাঁদের কাব্যনমুনা উপহার দিয়ে গিরিশচন্দ্র লিখেছিলেন: "সভ্য সমাজে আমার স্থান আছে কিনা জানি না, জানিতে চাহি না। কারণ যৌবনের প্রথম অবস্থা হইতে রঙ্গভূমির উন্নতি-উদ্দেশ্যে দৃঢ় সংকল্প লইয়া জনসাধারণের উপেক্ষার পাত্র হইয়া আছি। সে যাহা হউক, অভিনেত্রীবর্গ আমার চক্ষে পুত্র-কন্যার মতো সন্দেহ নাই। তাহাদের গুণগ্রাম অপ্রকাশিত থাক, আমার ইচ্ছা নয়।"[৪৭] সেইসব রচনার কিছু নিদর্শন, তাঁদের জীবিতাবস্থায় কিংবা পরবর্তীকালে কোনও সংকলনে মহিলা কবিদের তালিকায় দেখা গেছে কিনা আমার জানা নেই।

বিনোদিনী 'মর্ম্মবেদনা-গাথা' আত্মজীবনীর ভূমিকায় লিখেছিলেন: "ইহা কেবল অভাগিনীর হৃদয় জ্বালার ছায়া। পৃথিবীতে আমার কিছুই নাই, শুধুই অনন্ত নিরাশা, শুধুই দুঃখময় প্রাণের কাতরতা। কিন্তু তাহা শুনিবারই লোক নাই। মনের ব্যথা জানাইবার লোক জগতে নাই— কেননা, আমি জগৎ মাঝে কলঙ্কিনী, পতিতা। আমার আত্মীয় নাই, সমাজ নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, এই পৃথিবীতে বলিতে এমন কেহই নাই।" আমরা জানি, দীর্ঘায়ু

বিনোদিনী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক রক্ষা করে চলেননি, তা সত্ত্বেও মাত্র বারো বছরের অভিনেত্রী জীবনের মূল্যবান স্মৃতিকথার ভিতর দিয়ে বঙ্গরঙ্গালয়ের ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে লিখিত ভাবে উপহার দিয়ে পথপ্রদর্শিকার ভূমিকা পালন করে গেছেন। যদিও সে ধারার অনুবর্তী হয়ে পরবর্তীকালে পেশাদার রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীরা এ কাজে ব্রতী হয়েছেন এমন নিদর্শন আমাদের হাতে নেই বলে দীর্ঘকালের আক্ষেপ এখনও মোচন হয়নি। তারই মধ্যে শোভা সেন, রেবা রায়চৌধুরী, সাধনা রায়চৌধুরীর মতো অভিনেত্রীরা তাঁদের অভিনেত্রী জীবনের কথা বলেছেন, কিন্তু সেসব কথায় 'কলঙ্কিনী পতিতা'র গ্লানি নেই। বিনোদিনীর মতো এক অনির্দেশ বেদনার অবিরাম ভার সহ্য করে সমাজবান্ধবহীন আত্মীয়পরিজনহীন জীবন কাটাতে হয়নি তাঁদের।

এমন নয় যে, বিনোদিনী, গোলাপসুন্দরী, তারাসুন্দরী, তিনকড়ি বা কুসুমকুমারীদের জীবনের দুঃখকষ্টের সীমা তাঁদের কালেই শেষ হয়ে গিয়েছিল— সেই গ্লানির উত্তরাধিকার যে আজকের এই আলোকজ্জ্বল যুগেরও কলঙ্ক হয়ে আছে, তার চেয়ে বড় দুঃখের ঘটনা আর কি হতে পারে? তাই বিনোদিনীর প্রয়াণের প্রায় পয়ষট্টি বছর অতিক্রম করে এসেও কেতকী দত্ত-র *নিজের কথায়, টুকরো লেখায়*[৫৮] পড়ে বিমূঢ় হতে হয় আমাদের। আধুনিক এই কালে একজন নটীর বঞ্চনা, বেদনা, ব্যর্থতা, বিষাদ দৈন্যের ইতিকথার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিনোদিনীরই লেখা কবিতার পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করে আমাদের বলতে হয়: 'স্মৃতি লো বিষের জ্বালা দিও নাকো আর।'[৫৯]

সুধীর চক্রবর্তী

প্রান্তবাসিনীদের কথা

ষাট সত্তরের দশকে যখন গ্রামে গ্রামে ঘুরতাম, গৌণধর্মীদের সন্ধানে, তখন বিশেষভাবে লক্ষ্য ছিল বাউল-ফকিরদের বিচিত্র ধর্মবিশ্বাস আর ব্যতিক্রমী জীবনযাপনের কাণ্ডকারখানা দেখা। তাতে যেমন ছিল প্রথম দেখার বিস্ময়, তেমনই অজানা পারিপার্শ্বিক বোঝার চেষ্টা। গড়পড়তা মধ্যবিত্ত শহুরে সমাজের বাইরের সংকীর্ণ এক একটা গ্রামীণ পরিসরে গভীর নির্জন এই বাউলদের জগৎ। যার কিছুটা প্রকাশ্য ('জাহির') বেশির ভাগটাই গোপন ('বাতুন')। তার মধ্যে ছিল বেশ কিছু ধোঁয়াটে ব্যাপার। কিন্তু ভুল বাতলানো ইচ্ছাকৃত ভাবে, কেন না তাদের সাধনকথা অন্যকে বলা নিষেধ। তন্ত্রে আছে যে সেই 'শাম্ভবী বিদ্যা' কুলবধূদের মতো গোপন করে রাখতে হবে। বাউলদের তদুপরি একটা আলাদা কায়দা ছিল। তাদের গুরুনির্দেশে বলা হত 'যাইবি দক্ষিণে বলিবি বামে'। কাজেই তাদের কাছ থেকে প্রকৃত তত্ত্ব বা সত্য বার করা ছিল কঠিন ব্যাপার। অনেক হয়রানি হয়েছে। নাকে দড়ি দিয়ে তারা প্রচুর ঘুরিয়েছে আমাকে। তবে হাল ছাড়িনি। তার ফলে দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে লেগে থেকে বাউল ফকিরদের কথা, তাঁদের গুহ্য সাধনার অন্তর্দেশ, তাঁদের দেহতত্ত্বের আয়না-মহল এবং তাঁদের স্বচ্ছ সাবলীল মানবধর্মের মহিমা অনেকটা বুঝেছি। তাঁদের সংস্পর্শে ও সংলাপে আমার পুঁথিপড়া জানাবোঝার গর্বিত জগৎ বেশ ধ্বস্ত হয়ে গেছে এবং বিনিময়ে গড়ে উঠেছে প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিহীন শ্রেণিপঙ্‌ক্তির বাইরে বহমান জীবনের অজানা জগতের অধিকার। কিন্তু এত সব জেনেও এখন মনে হয় মাঝে মাঝে, বাউল ফকিরদের এই গহন জগতে প্রান্তবাসিনীদের কথা ঠিকঠাক আলাদা করে সঠিক তাৎপর্যে যেন বলা হয়ে ওঠেনি। প্রান্তবাসিনী মানে তো 'মার্জিনাল ওম্যান', কিন্তু অত কেতাবি সংজ্ঞায় বোধহয় সেই নারীবিশ্বকে ধরা যাবে না। ফকিররা রহস্য না বলে 'ভেদ' বলেন। নারীজীবনের ভেদ নাকি দেবতারাই জানেন না আমি তো নিতান্ত মানবক। তার মধ্যে আবার গুহ্য সাধনার জীবনসঙ্গিনী বিশেষ যে-নারীরা, তাঁদের বোঝা জানা কি সহজ কথা?

তবে কবুল করব যে, গ্রামদেশে ব্যাপক ঘোরাঘুরির সময়ে নারীরা কত সময় যে খুলে দিয়েছেন তাঁদের হৃদয়ের প্রশস্ত পথ, যা সেবাধর্মে আন্তরিক এবং আহ্বান অকৃত্রিম। সে সব

নারী নিতান্ত সাদামাঠা মানুষ— কারও ঠাকুমা, কারও পিসি, কারও দাদি, কারও আপা। অর্থাৎ একেবারে আদ্যপ্রান্ত সংসারী যাপন তাঁদের। কাকভোরেরও আগে অন্ধকারে কুপি জ্বেলে তাঁরা ঢেঁকিঘরে পাড় দেন, গালগল্প করেন, শ্রমে স্বেদে ব্যাকুল, হয়তো ঊর্ধ্বাঙ্গে কাপড়টুকুও ফেলে দেওয়া নিজেদের অন্তরমহল। তখনও পুরুষ আর শিশুরা ঘুমে অচেতন, মসজিদে ফজরের নামাজ পড়বার জন্য মোয়াজ্জিনের আজান শোনা যায়নি, ওঠেনি কুঁকড়োর প্রভাতী ঘোষণা। ততক্ষণে তাঁদের দু' মণ ধানে পাড় দেওয়া শেষ। তারপরে বিহানের শান্ত আলোয় গোয়াল পরিষ্কার করা, উঠোন নিকানো, গোরুর নাদায় জল দেওয়া, ভুষি তৈরি করা, তার মধ্যে হঠাৎ ককিয়ে ওঠা কোলের শিশুকে দৌড়ে গিয়ে স্তন্যদান। এই দেশে জন্ম নেওয়া সার্থক সেই ভোরে গ্রাম্য নারীর দৈনন্দিনের সূচনা-কাঠামো তো এই রকমই। তাতে ত্যাগ আছে, কিন্তু তার জন্য গর্বিত জানানদারি নেই, শ্রম আছে কিন্তু বচনব্যাদানে তা স্পষ্ট নয়, দেহের আধিব্যাধিও আছে কিন্তু গোপন রাখাই রীতি। সেই সঙ্গে আছে, স্বামীর মতিগতির অনিশ্চয়তা, ব্যান-বন্যা-খরার ঝকমারি, অতিপ্রজতার নিত্যতা— ঘর আর আঁতুড় ঘরে তফাত নেই।

গ্রামদেশের নিত্যদিনের এই সব সংসারিণীদের পাশে বাউলদের ডেরায় বা সহজিয়া বৈষ্ণবদের আখড়ায় যে সব নারীরা থাকেন তাঁদের ততটা সংসার ধর্মের দায় নেই— কারণ অনেকেরই এক ছটাক জমি নেই, সঙ্গীর নেই লাঙল বা বিদেকাঠি, ঘরে নেই কলভাষে মুখর শিশু, আসবাবপত্র অনুপস্থিত, আত্মীয়স্বজনের আনাগোনা নেই। তবে কী আছে? আছে গোপন সাধনভজন, উদাসীন ভক্ত বা শিষ্যদের হঠাৎ উদয় ও প্রস্থান, ক্ষণিকের জীবনসঙ্গীর কাম চরিতার্থতার সহায়তা করা, তাকে যৎসামান্য আহার্য দিয়ে পরিপোষণ। কিন্তু সব সময়ে তাঁর মনে একটা আশঙ্কা উদ্যত যে, যে কোনও দিন ভেঙে যেতে পারে তাঁদের জুটি। তাতে শোচনাও নেই কেন না এঁরা স্বভাবে নির্বন্ধন। এঁদের সাধনাকে প্রতীকী ভাষায় বলে লা-শরিকি করণকৃত্য। 'লা-শরিক' মানে শরিক নেই যার। লালন বলেছেন:

শরিক কোরো না রে মন
করি বারণ॥

কথাটার দু'দুটো অর্থ। ইসলামি মতে শরিক কোরো না মানে একনিষ্ঠ ভাবে শুধু আল্লার উপাসনা কর, কারণ 'লা ইলাহা ইল্লালাহ্' অর্থাৎ আল্লাই একমাত্র উপাস্য, তাঁর আর কোনও শরিক হয় না। এর ফকিরি অর্থ হল, এই সাধনা কর একক ভাবে। নারীকে সঙ্গিনী কর, তার দেহকে আশ্রয় কর কিন্তু তার গর্ভে সন্তান এনো না। তা হলেই ছেলেমেয়ের মায়াবন্ধন, বিষয়বাসনা আর অর্থসঞ্চয়ের নেশা এসে যাবে। তাই নারীকে ধর, তার অনুগত হও, কিন্তু কামে থেকে হও নিষ্কামী, কর প্রেমের যজনযাজন। মনে রেখো:

প্রেমের রসিক যে জন
পর আর আপন সে তো ভাবে না।
সে প্রেম হয় যার, হয় যার,
তার আর কামের ব্যবহার থাকে না॥

এই প্রকৃত প্রেম, যার প্রাপ্তিযোগে কাম থেকেও নেই, নারী থেকেও নেই, সংসার থেকেও নেই, আপন যে সে যেকোনও সময়ে পর হয়ে যেতে পারে, আবার যাকে ভাবছি নিতান্ত পর সে যেকোনও সময়ে হয়ে যেতে পারে আপন। এ এক অদ্ভুত সাধনরহস্য যার আসাযাওয়ার দুটি পথই বেবাক হাট করে খোলা। দু'জনের মন মিলেছে, হাতে এসেছে দেহরহস্যের চাবি, আনন্দ কর, সঙ্গ কর কিন্তু কোনও চিরসম্পর্কের বাধ্যতা নেই, দু'পক্ষেই নেই— কেন না সমাজ শাসন নেই, পরিবার কাঠামো নেই— গ্রাম সমাজের মধ্যে বসবাস করেও এঁরা গ্রামনির্ভর নয়, কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার শরিক নয়। গ্রামের দোল দুর্গোৎসবে, গ্রাম্যদেবতা বা দেবীর সমবেত উপাসনায় এঁরা নেই— নেই চড়কে গাজনে টুসু ভাদুতে যাত্রাপালায় নবান্নে ব্রতপারণে শান্তিস্বস্ত্যয়নে নারাণপুজোর সিন্নিভোগে বা শেতলা ষষ্ঠীর অন্ধবিশ্বাসে। এঁরা বদ্ধ নেই শাস্ত্রশাসনে, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে বা গঙ্গাজলের সাত্ত্বিক অস্তিত্বে। গ্রামের বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশনে শ্রাদ্ধে বা নবজাতকের জাতকর্মে এঁরা ডাক পাবেন না। সেই জন্যেই কি এঁদের প্রান্তবাসী বলব? না কি এঁরা নিজেরা স্বেচ্ছায় নিয়েছেন নির্বাস নির্বন্ধন তাই প্রান্তিক? কাকভোর থেকে পেঁচা ডাকা তমিস্রাব্যাপী গ্রামজীবনের যে অচ্ছেদ্য শ্রম ও অবসর, নতুন ধানের গন্ধ, নবজাতকের অনাবিল হাসি-কান্না, নবদম্পতির রহস্যময় আনন্দ— এর কোনওটাতেই তাঁরা যে নেই!

গ্রামসমাজের মধ্যে থেকেও অবন্ধনের সম্পর্ক এঁদের কিন্তু তাই বলে পরজীবী বলা যাবে না। অন্যের ফসল বা উৎপাদিত শস্যে কোনও দাবি নেই, প্রাপ্যও নেই। তা হলে কী করে চলে? একটা কথা বেশ স্পষ্ট যে গৌণধর্মীদের কোনও ব্যক্তিগত চাহিদা নেই, নেই ভোগবিলাস বা আহার্যলিপ্সা? যা পাই তাই খাই। কোনও শিষ্যসেবক হয়তো আনল সবজি বা ডাল, সপ্তাহে একদিন গেরস্থদের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তারা দেবে চাল বা একটা দুটো আনাজ। প্রায় কোনও উদাসীনের বাড়িতে শৌচালয় নেই, বাড়ির আশেপাশে পুকুর, ডোবা বা সোঁতায় স্নান। মাঠের শূন্যতায় শৌচস্থান উন্মুক্ত। ডেরার এক কোণে, হয়তো উঠোনে বা বারান্দায় কাঠকুটো কুড়িয়ে এনে সবজি আর চাল মিশিয়ে ফুটিয়ে নেওয়া, সঙ্গে একটু লবণ ও কাঁচালংকার ঝাল। তেমন তৈজস পাতি নেই। মাটির হাঁড়ি, অ্যালুমিনিয়ামের শানকি, একটা ঘটি— ব্যস। সঙ্গিনীর রান্নাকাজে উৎসাহ কম, দক্ষতা শূন্য— স্রেফ সামান্য আয়োজনের উদরপূর্তি। কোনও বাউলের কাঁচা ঘরের দাওয়ায় (সেটাও তার নিজের নয়) মাঝদুপুরে উঁকি মেরে দেখছি মেটে হাঁড়িতে বা মেটে কড়াইতে অন্ন পাক চলছে। শুকনো খেজুরপাতা, তালপাতা, কাঁঠালপাতা, শালপাতা দিয়ে জ্বালানি, সঙ্গে কাঠকুটো। ফুটন্ত ফ্যানের ঘূর্ণিপাকে চালের সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করছে দু'-এক টুকরো বেগুন বা মেটে কুমড়ো বা কচু বা মেটে আলু। রন্ধনরতাকে জিজ্ঞেস করি:

'আজ কি সেবা হবে?'

—ওই ধরুন পঞ্চতত্ত্ব।

—সেটা আবার কী?

—চাল আর চার রকম আনাজ মেশানো ফ্যানা ফ্যানা ভাত, তাতে কৃষ্ণনামের

একটু মিষ্টি ছিটে।

—সেটা আবার কোন বস্তু?

—ওই যাকে বলে লবণ। কৃষ্ণ ছাড়া পঞ্চতত্ত্ব মুখে রোচে?

এরা হল জাতরসিকের ধারাবাহী আর সদাই উড়ে চলার ধাত। সংসারে নিবিষ্ট হবার মতি নেই মোটে। বাউলের পরনে তহবন্দ বা 'তবন' অর্থাৎ নিম্নাঙ্গের লজ্জা নিবারণের হাঁটু পর্যন্ত এক সাদা লুঙ্গি, তার নীচে অবশ্যই আছে কৌপীন। সাধারণত থাকে খালি গা, বাইরে বেরোলে ছোট একটা পিরান। শীতে একটা কম্বল— ব্যস। কাঁধে ঝুলছে কাঁথায় বানানো ঝুলি। তাঁর সঙ্গিনীর পরনে সস্তা মার্কিন সাদা কাপড়ের শায়া জামা, কচিৎ গেরুয়ায় ছোপানো। ভিক্ষের ঝুলি আর খঞ্জনি করতাল, খালি পা। কিন্তু সঙ্গে থাকে এক দুর্লভ সামগ্রী— গানের পর গানের সঞ্চয়। কী গান?

যেমন ধরা যাক আশমানী দাসী তার ছিন্নবস্ত্রে ছুঁচ সুতোর সেলাই চালাচ্ছে আর গাইছে, বেশ সুর খেলিয়েই গাইছে:

ও আমি দালান কোঠা ত্যাজ্য করে
গাছতলা করেছি সার—
গৌর গলে ও ঝলমল চাঁদেরই হার।
কুলকলঙ্কের ভয় কি আছে আর।

এ হল প্রকৃত প্রান্তিক নারীর বয়ানে তার যথাযথ আত্মবিবৃতি। এ সব আশমানী দাসীদের কোনও পুরাঘটিত বর্তমান বা নিত্যবৃত্ত অতীত নেই। সবটাই বর্ত অর্থাৎ টিকে থাকার কাহিনি।

আশমানীর গানের রেশ টেনে হয়তো ছাঁচের বেড়া সারাতে মশগুল তার গোঁসাই গানের স্বরে পাদপূরণ করে:

ও আমি ধুতি চাদর ত্যাজ্য করি
ডোরকৌপীন করেছি সার।

এই গানটা একদিন খালেদদা গেয়ে শুনিয়ে বুঝিয়ে বলেছিলেন, "তারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হচ্ছে না, কিন্তু মিনিমাম জায়গায় নিয়ে চলে আসছে জীবনকে। দালানকোঠা ছেড়ে থাকছে গাছতলায়, মাঠে থাকছে না কিন্তু। ধুতিচাদর ছেড়ে ডোরকৌপীন পরে লজ্জা নিবারণ করছে। কেন এই ত্যাগ? এই ইচ্ছাকৃত অবনমন?"

আমি তাঁকে বলি: "এই ত্যাগ আসলে মায়ার বন্ধনকে ছেঁড়ার চেষ্টা, দালানকোঠা চন্দ্রহার, আসবাব বা মনোহারী পোশাক মানুষকে মায়ালি করে তোলে— তার টানে সাধনজীবনে পড়ে বাধা।"

উপস্থিত আমি আশমানী দাসীকে কুবির গোঁসাইয়ের একটা গান শোনাই, খুব ভাবরসে গেঁথে:

গৌর আমার পঁইছে পলা শঙ্খ শাড়ি
গৌর আমার গলার হার চুল বাঁধা দড়ি
গৌর কাঁচুলি।

আশমানী গান শুনে খুব মজা পেয়ে বলে, "ভাল একখানা শাড়ি কখনও পরিনি গো। আছে কেবল এই সবুজপাড় জনতা শাড়ি দু'খানা। পঁইছে পলা শঙ্খ এসব চোখেই দেখিনি কখনও। তবে হ্যাঁ চুল বাঁধা কালো ধাগা অগ্রদ্বীপের মেলা থেকে এনে দিয়েছিল এক শিষ্যের বউ। হ্যাঁ গো ওই যে গাইলে কাঁচুলি, সেডা কী বস্তু?"

আমি লজ্জা পাই। তাই দেখে আশমানী জিভ কেটে বলে, "এ মা মানুষটা যে লজ্জা পেয়ে গেল। শোনো বাপু, আমাদের জীবনে তোমাদের তিনটে জিনিস ত্যাজ্য করতে হবে। লজ্জা ঘেন্না আর ভয়, বুঝেছ?"

—না বুঝিনি, তবে কথাটা শুনেছি অনেকবার যে, লজ্জা ঘৃণা ভয়/তিন থাকতে নয়— সেটি বুঝি তোমাদের কথা? জানতাম না তো।

আশমানীর গোঁসাই বলে, "শোনো বাবা, তুমি কাঁচুলি শুনে লজ্জা পেলে চলবে কেন? শরীরের মধ্যে কোনও লজ্জা নেই", এ বারে আশমানীকে বলে, "কাঁচুলি মানে স্ত্রীলোকের বুক ওঁচানোর ছোট জামা বুঝলে? তো সে তোমার বোঝার দরকার কী? সাঁই তোমাকে দু'খানা দিব্যি শ্রীফল দিয়ে দিয়েছে। যাকে আমরা বলি মদন মাদন স্তম্ভন মোহনের মধ্যে মোহন। কেমন কিনা? তো আপনার গানের ভাবটা ভাল। যে স্বয়ং গৌরকে পেয়ে গেছে তার আবার সাজসজ্জা কীসের? গৌরই তার অলংকার, গৌরই তার কাঁচুলি, সর্বদা দেহের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, না কি বল?"

আমি বিহ্বল হয়ে পড়ি খানিকটা। আশমানীর আঙিনার ওপরে সূর্যতপ্ত আশমান খোলামেলা। ওদের জীবনটাও তেমনই উদার উন্মুক্ত। গোঁসাইকে বলি, "এত খোলামেলা জীবন তোমাদের, তো ছাঁচের বেড়া সারানোতে মন কেন এত? ও তো গেরস্থের ব্যাপার।"

—সাধকেরও ব্যাপার। বেড়া দেয় কেন? যাতে ছাগল গোরু ঢুকে ফসল না খায়। আমাদেরও কামপ্রবৃত্তিতে বেড়া দিতে হয়। কথায় বলে এই দেহ হল মায়ার ঘর তাতে প্রবোধের বেড়া।

আশমানীদাসীদের মতো অনেক নারী যেমন দেখেছি তেমনই দেখেছি বেদানাবালাদের। তবে তফাত আছে। কেন না আশমানীর জীবনে একটু স্থিতু ভাব আছে, গোঁসাই তাকে ছেড়ে যাবে না হঠাৎ। তার সাধনভজনে দেহতত্ত্বে আশমানী যোগ্য সঙ্গী। গোঁসাই বলে আমাকে, "আমাদের সাধন হল গোপন। কথায় বলে ভজন, ভোজন আর সাধন করতে হয় লোকচক্ষুর আড়ালে। ঠিক ঠিক সঙ্গিনী না পেলে সাধনে ব্যাঘাত ঘটে। আশমানী হল শান্ত স্বভাবের পদ্মিনী ধাঁচের নারী— শঙ্খিনী নারী হলে সেক্স বেশি থাকে।"

তাকে বাধা দিয়ে বলি, "সেক্স শব্দটা শিখলে কোথা থেকে?"

—শব্দ তো পড়ে থাকে না, হাওয়ার মতো ঘুরে বেড়ায়। এক মেমসাহেব আসত মাঝে মাঝে। ওই কথাটা প্রায়ই বলত সঙ্গের পুরুষ মানুষটাকে। পরে বুঝতাম সেক্স মানে

কাম ঠিক নয়, আমরা যাকে বলি চণ্ডকাম তাই। বাঘিনিদের থাকে চণ্ডকাম।

—ওকি লক্ষণ দেখে বোঝা যায়?

—হ্যাঁ আমাদের গুরু বলতেন শঙ্খিনী মেয়েছেলে কী রকম জানিস? সে হল খুব লোভী, খুব খাদ্যের লালচ আর—

খটমটিয়ে হাঁটে নারী

কটমটিয়ে চায়— ভজনে কম ভোজনে দেড়ে।

আর সবচেয়ে বড় লক্ষণ হল উগ্র গায়ের বদ গন্ধ।

—আর পদ্মিনী?

—এই আশমানীর মতো। শান্ত ধীর স্থির, খিদে কম, লাজ বেশি, ভজনে মন, ভোজনে ব্যগ্রতা নেই, সেবাধর্মে সদাশয়। আর গায়ে পদ্মগন্ধ। ওরা কেবল একজন পুরুষেই সুখী। বিয়ে হলে ভাল গেরস্থালি করত।

—এটা কি বিয়ে হওয়া নয়, তোমরা যেমন আছ?

—বিয়ে করলে সাক্ষী লাগে, শাস্ত্র মন্ত্র লাগে, পুরুত লাগে, এয়োস্ত্রীদের চাই, শাঁখা সিঁদুর রঙিন শাড়ি গয়না লাগে। মন্দির বা দেবস্থানে বিয়ে করতে হয়। আমাদের এসব কিছুই তো নেই। আশমানী তো মূলে ফকিরদের ঘরের মেয়ে। ফকিররা শান্তিবাদী। ওদের হানাহানি নেই, সাজগোজ নেই, এত গরিব যে পেটপুরে খেতে পায় না কিন্তু বাড়িতে কেউ এলে নিজের খাবারটা তাকে দেয়, নিজে উপোস করে। আমার গুরু কোনও এক ফকিরদের ডেরা থেকে আশমানীকে এনে দিয়েছেন আমার সাধনভজনে সুপথে নিয়ে যাবে বলে। আশমানী ওর নামও নয়, ওর নাম ছিল বিন্দু। বিন্দু মানে বোঝো?

—বিন্দু মানে রূপ, যাকে তোমরা বল রস।

—হ্যাঁ, ও রসবতী আর আকাশের মতো খোলামেলা, তাই আমি ওকে আশমানীবিবি বলি। খোলা আশমান।

আমি খুঁত ধরে বলি, "কিন্তু আশমানীবিবি বললে কী রকম মুসলমান মুসলমান লাগে। তাই না?"

গোঁসাই বলে, "একে আমরা বলি শব্দের ভেদ। যা হিন্দু তাই মুসলমান, তাই খ্রিশ্চান। যা অপ, তাই জল, তাইই পানি। নামের পেছনে আছে রূপ, তার পেছনে আছে স্বরূপ। রূপস্বরূপ ভেদ বোঝো?"

জানি এসব ক্ষেত্রে 'জানি' বললে গোঁসাইয়ের ব্যাখ্যানটা শোনা যাবে না। আমাকে নীরব দেখে গোঁসাই গেয়ে ওঠে:

'পানি হতে বরফ হয়
বরফ কিন্তু পানি নয়'

"কী বুঝলে? পানি হল মূল স্বরূপ, বরফ হল তার রূপ। রূপের মধ্যে আছে স্বরূপ। রূপ থেকে আসবে রূপী। যেমন ধরো বরফের আকৃতি, গোল করলে গোল, চৌকো করলে চৌকো। গলে গেলে কিন্তু রূপের কাঠামো থাকে না, আবার স্বরূপে স্থিতি। আশমানী হল

রূপের পরিচয়, তার স্বরূপ লুকানো আছে স্বভাবে— তা ধরা পড়বে যখন সাধনসমর হবে।''
এসব গুহ্য কথার টানে শুনে যাচ্ছি, সব যে বুঝছি তা নয়। সব যে বুঝতে হবে তার কি মানে আছে? গড়পড়তা জীবনযাপনে এমন কথা তো রোজ রোজ শোনা যায় না। আমার মন কিন্তু ততক্ষণে চলে গেছে সুদূর হাঁসপুকুরিয়া গাঁয়ে দেলবারি ফকিরের আস্তানায়। ফকিরবৃত্তি নিয়েছেন বলে সংসার করেননি, পাড়াপ্রতিবেশী তাঁকে দেখে। জ্ঞানী মান্যমান মানুষ, তেমনই দীর্ঘকায় রজতকান্ত রূপ, শ্মশ্রুগুম্ফময় সত্ত্ববান সত্তা। বাড়ির ভেতর মহলে একটা একানে দাওয়ায় পড়ে আছে একটা ন্যাংটো দুধের বাছা। তার মা তাকে প্রকাশ্যে বুক উদোম করে দুধ খাওয়াচ্ছে। দেলবারি বলেন, ''ওই মেয়েটার নাম ফুড়কি— ও হল তালাক খাওয়া মেয়ে, হ্যাঁরে ও ফুড়কি না মুড়কি, তোর কি একটা ভাল নাম আছে নাকি?''
অসম্বৃত বেশবাস সামলে সে বলে, ''আব্বা নাম দিয়েছিল খাদেজা। আব্বা আম্মা সেই কবেই তো গোরে গেছে গো, কে আর ডাকবে খাদেজা বলে। পড়েছিলাম চাচার ঘরে, চাচি মারত অষ্টপ্রহর খাটিয়ে। তারপর বিয়েসাদি দিল। মানুষটা ছিল দৈত্যের মতো। আর মোষের মতো রাগ। একটু বেগরবাঁই উলটুল দিলেই ভয় দেখাত তালাক দেবে। তা দিয়েই দিলে...''
দেলবারি বললেন, ''এ মেয়েটা টিউকলের মতো— বগবগ করে পানি বেরোচ্ছে। কথা যেন পানির পারা। তোকে এ সব বিষাদসিন্ধু হাঁটকাতে কে বলেছে রে? চুপ যা। বরং দেখ দিকি এই শহুরে বাবুকে একটু চা খাওয়াতে পারিস নাকি, গা তোল।''
উঠোনে কড়াই চাপা দেওয়া উনুন খুলে খাদেজা বিবি যতক্ষণ কাঠকুটো এনে আগুন দেবে তার আগেই ফকির আমাকে বসান তাঁর দলিজে। দাড়িতে আঙুলের চিরুনি চালিয়ে ফকির বলে, ''এই মেয়ে তালাক খেয়েছে যখন, তখন বাচ্চাটা পেটে। মুসলমানের মায়াদয়া কম। এখন বলুন দেখি খাদেজা না নাদেজা সে এসে ফকির বাড়ি জুটল কেন?''
—পেট পুরে খেতে পাবে।
—সে ও অন্য জায়গাতেও পেত— তবে তার বদলে তারা ওর শরীরটা খুঁড়ে খেত। তালাক পাওয়া মেয়ে আর বেওয়ারিশ জানোয়ার একই মাল। এ আমার কাছে এসেছে বাঁচতে। জানে যে এখানে তাকে কেউ লালচ দেখাতে পারবে না। ওর দেহটা দেখছেন না? আর সত্যি কথা বলতে কী যা কাঁচা বয়েস ওর, দেহধর্মে ওরই ভরসা নেই। কার চক্রে পড়ে কে জানে! তাই আল্লার নাম নিয়ে এখানে ডেরা কেটে পড়ে থাকে। টুকটাক হুকুম তামিল করে, কিছু থাকলে খেতে পায়। আল্লাই দেয়, ভেবে দেখুন আমি দেবার কে?
আশমানীবিবির দেল্ আকাশের মতো খোলসা, তার মুক্তি ব্যাপক, কারণ তার গোঁসাই মানুষ ভাল, রসে বশে আছে। খাদেজা-র জীবন হতে পারত ঘরগেরস্থি আর মরদকে নিয়ে প্রাণবান শ্রীমন্ত, তা হয়নি। ফুড়কি নামের মতো তুচ্ছ তার জীবন, যেন বদ্ধ ডোবা। সেই নোংরা পচাজলের বদ্ধ যাপনেও কোনও কোনও কামাচ্ছন্ন মরদ ঢিল ছুড়তে চায়। তার যে যৌবন রয়েছে আশরীর— সেটা যখন চলে যাবে তখন কী হবে? সে ভাবনা অন্তত এখন করে লাভ নেই। সত্যি কথা বলতে কী ফুড়কির জীবন-পরিণতি কী হবে তা ভাবার অবকাশ খুব একটা নেইও, কারণ সে তো কোনও প্রতিভাময়ী বা লাস্যময়ী নারী নয়। কেবল

অনুমান করা যায় অনেক কিছু। সে বেশ কিছুকাল থেকে যেতে পারে এই আস্তানায়— অন্তত বেঁচেবর্তে থাকবে। তবে ফকিরেরও তো বয়স বাড়ছে। ধরা দিতে পারে কারও কামলালসায় কেন না তার তো লালসারই ভরা বয়েস। আবার হয়তো কোনও বয়স্ক মুসলমান নিকে করে তাকে ঘরে তুলল। সকাল থেকে সন্ধে উদোম খাটনি কিন্তু পেট ভরে খেতে পাবে।

কিন্তু বেদানাবালার পরিণাম নিয়ে ভাবতেও পারি না। তাকে যতদিন দেখিনি কোনও সমস্যা ছিল না। দেখা হল কেতাবি এক সেমিনারে, না, বলা উচিত ওয়ার্কশপে। এক সমাজহিতকারী সংস্থা গ্রামদেশের লোকশিল্পীদের জড়ো করেছিল বর্ধমানের বরশুল কমিউনিটি সেন্টারে। লোকশিল্পী বলতে পটচিত্রকর, বাউল, ফকির, দোতারা শিল্পী, আলকাপ গায়ক, পুতুল নাচের কারিগর, শোলার সাজের রূপদক্ষ, বহুরূপী এরা সব। ওয়ার্কশপে এক রবিবার সকালে আলোচ্য ছিল: 'লোকশিল্পীদের অভাব অভিযোগ: তাদের বয়ানে।' একজন লোকসংস্কৃতিবেত্তা কেতাব মেনে তাদের প্রশ্ন করছিলেন, ফর্ম ফিলআপ করছিল এক তরুণী। পরে সেই সব বয়ান পড়ে কর্তৃপক্ষ স্থির করবেন কোনও অনুদান বা গোঁজামিল কিছু ব্যবস্থার। কিন্তু তাঁদের পূর্বকল্পিত ছক ভেঙে একজন শিল্পী বলে উঠলেন: "আমরা কোনও টাকা চাই না। টাকা তো দু'দিনেই খরচ হয়ে যাবে, কারণ আমরা বড় গরিব। টাকা খরচ করতে জানি কিন্তু জমাতে জানি না।"

—তবে কী চান আপনি? আপনারা?

—আমরা চাই প্রোগ্রাম। আমাদের শিল্পকাজ দেখিয়ে তার বিনিময়ে আমরা রোজগার করতে চাই। কী ভাবছেন আমাদের? আমরা কি ভিখিরি? গ্রামে গ্রামে প্রোগ্রাম দিন, আমরা জমিয়ে দেব, দেখবেন।

কর্তৃপক্ষের মহতী উদ্দেশ্য ভেস্তে গেল। কেউ আর মুখ খোলে না। পরিবেশ থমথমে। ঘরে একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়া। তার মধ্যে থেকে ঘরের কোণের এক বৃদ্ধা শিল্পী বলে উঠলেন— "আমি কিন্তু কিছু বলতে চাই, আমি পোগাম নাকি বললেন ও সব চাই না কেন না আমি অক্ষম। গলায় আর সুর নেই।"

—তা হলে আপনি এলেন কেন?

—আমি তো আসতে চাইনি। বিডিও সাহেব পাঠিয়েছে জোর করে। আমার নাম গিয়ে বেদানাবালা দাসী, সাকিন তালডাংরা।

—আগে যাত্রায় গান করতেন নাকি? বেদানাবালা নামটা তো সাজানো। প্রকৃত নাম কী?

বেদানাবালা এবার উঠে বসেন। ক্ষীণকণ্ঠে বলেন, "আগে নাম ছিল পারুল হাজরা, জাতে ডোম। গানের গলা চিকন ছিল, শরীরে যৌবন ছিল। যাত্রাদলে প্রথমে সখী নাচতাম, পরে সাইড পার্টে। নানা হাতবদল হতে হতে যাত্রারানি বেদানাবালা হল বৈরেগির কাঁথাবওয়া সেবাদাসী আর কল্কে সাজার ঝি। তবে ওখানেই দেহতত্ত্বের গান শিখি। গুরুর নাম ওঙ্কার বৈরেগী— জাতবোষ্টম। ওঁর কাছেই আমার দীক্ষাশিক্ষা।"

আমি তাঁকে উজিয়ে দিয়ে বলি, "বেশ তো। জাত বৈষ্ণবের কাছে দীক্ষাশিক্ষা হল, তার পরে শিখলেন গান। সে নিশ্চয়ই ঢপ কীর্তন আর বাউল গান। বৈরেগির সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে, সেই যাত্রাপালার নাচেরও আগে কী করতেন?"

—কী আবার করব বাবাসকল। ডোমের ঘরের মেয়ে। বাবা বানাত ঝুড়ি, চুবড়ি, পেতে এই সব— বাঁশের ছিলে কেটে দিতাম— চুবড়িতে রং লাগাতাম। আমার মা করত ধাইয়ের কাজ, তাকে হাতে হাতে জোগান দিতাম, পোয়াতির জন্যে মালসায় কাঠকয়লার আগুন তৈরি করতাম। পোয়াতির মা-দিদিমারা এটা ওটা খেতে দিত। সেই লোভ ছিল।

—তা হলে লাইন পাল্‌টে ভালই তো হল। নাচলে, গাইলে, কত লোক মানইজ্জৎ টাকা দিল। তাই না? নইলে তো ধাইয়ের কাজ করতে হত।

—শাড়ি গয়নাও পেয়েছি গো বাবা, বয়স কালে। তবে গাওনার বাহবা পেলেও শরীরের ইজ্জত থাকেনি। কাক শেয়াল শকুনে সব খেয়ে নিয়েছে। সে যাই হোক ওঙ্কার বৈরেগি আমাকে মান দিয়েছিল, কণ্ঠিবদল করেছিল। মানুষটা ছিল বাবাজি গোষ্ঠীর। আখড়াধারী নয়। বুঝলে?

—না, বুঝলাম না। আখড়াধারী না হয় বুঝলাম, কি না যারা আখড়ায় থাকে। কিন্তু বাবাজি গোষ্ঠীটা কী?

—তেনাদের পায়ের তলায় সরষে, থিতু হবার ধাত নেই। আশ্রম আখড়া সম্পত্তি গৃহী শিষ্য এসব নেই। সেবাদাসীও বদলে যায়। তাদের একটা নতুন নাম দেয় বাবাজি। আমার আগে সেবাদাসী ছিল বিশাখা। আমার নাম ছিল বেদানাবালা, গোঁসাই তা পালটে করে দিলে দীনদাসী। নিজে ব্যগ্রতা করে ধরে ধরে গান শেখাল। তাতেই তো জীবনটা একটা থাই পেল। নইলে কোথায় ভেসে যেত বাঁকা নদীতে। সে বড় কঠিন নদীর খরস্রোতে কাম নামে কুমির এসে সর্ব দেহ ধ্বংস করে দিত। সেই গানটা শুনেছ:

সেই না নদীর বাঁকা ঘাটে
নাইতে গেলে আন্‌খা কাঠে
কাম নামে এক কুমির জুটে
চিবিয়ে চুষে খায় তারে।

দীনদাসীর কণ্ঠস্বর সকরুণ আর্তিতে ভরে ঘরকে বিষণ্ণ করে তোলে। বুঝতে পারি গলায় ভাল মতন সুর ছিল আগে— গানের শিক্ষাও পাকা। কিন্তু বয়স থাবা বসিয়েছে কণ্ঠে, সেই সঙ্গে ক্ষুৎকাতর যাপন আর ব্যাধি।

ঘরের সবাই উশখুশ করতে লাগল। চা আর দুটো বিস্কুট খেয়ে তাদের কীই বা পেটে দল হতে পারে! তাদের লক্ষ্য বেশ পেট পুরে খাওয়া, কিছু গানবাদ্যের কসরত বা হাতের কাজ বা অভিনয় সরেজমিন করে দেখানো, কর্তাব্যক্তিদের নেকনজরে পড়া, নিদেন কিছু রাহাখরচ আদায়। তার মধ্যে কোন এক জটাই বুড়ি শুরু করেছে ঘ্যানর ঘ্যানর সাতসতেরো। দীন ভিখারির পারের কড়ি থাকে না, কণ্ঠের গানও তো শেষ পারানির কড়ি হতে পারে না, বিশেষত দীনদাসীদের— তা হলে কী ভরসা তার? এখানে এই সমাবেশে সে যেন বেশ

বেমানান— রবাহুত। না রবাহুত ঠিক নয়, বরং বিডিও সাহেব প্রেরিত। তিনি তাঁর কোটা পূরণ করেছেন, চাকরির স্বার্থে।

বেখাপ্পা সেই পরিবেশে, বিহ্বল হতবাক দীনদাসীর কথার খেই হারিয়ে যায় সমবেত গ্রামিক শিল্পীদের স্পষ্ট অসহিষ্ণু গুঞ্জনধ্বনিতে। একজন বললেন, "এ তো ভ্যালা জ্বালাতন। কাঁহাতক ফাটা বাঁশির ককানি শোনা যায়?" শুনে আর একজন বলে বসলেন, "এ যেন কেত্তনের মধ্যে বাঁশের গাড়ি।" একজন ছোঁড়া বলে উঠল, "ও মাসি, তুমি আসলে চাও কী? বাবুকে সেটা সংক্ষেপে হেঁকে বল।"

"চাইব আবার কী?" দীনদাসী তাঁর জীর্ণ কণ্ঠে যথাসম্ভব তেজ এনে হেঁকে বলে, "কী চাইব আর? জানতে চাই আমাকে দেখবে কে? কে দেবে আশ্রয়? কে করবে চিকিচ্ছে? আমার তো কেউ নেই। বৈরেগিও মাটি নিয়েছে কবে। তা হলে?"

না, কোনও দিকে কোনও সহানুভূতি সমবেদনার ধ্বনি শোনা গেল না এই কণ্ঠরুদ্ধ একদা-গায়িকার জন্যে। একজন ফচকে ছেলে, যে পুতুলনাচের সহায়ক, বলে উঠল, "মাসি, তোমার তো তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, তবু তুমি বুঝলে না একটা কথা যে ফুল যখন ফোটে তখন ভ্রমর তাতে বসে। তোমার যৌবনের ফুল শুখাই গেছে এখন কে তোমারে দ্যাখবে? কেউ না। তুমি বাপু ভাল করে বরং মরণকে ডাকো।"

দীনদাসী ধপ করে বসে পড়ে। কর্মশালা চলে। যথানির্দিষ্ট মধ্যাহ্নভোজও হয়। আমি শুধু চলে আসি।

আমার আবার জাতিতত্ত্ব নিয়ে একটু ঝোঁক আছে। লোকশিল্পীদের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে করতে আমার ছোট নোটবুকে লিখে রাখি শিল্পীর জন্মসাল, জীবিকা, সাকিন এবং আলতো করে জেনে নিয়ে তার জাত বা শ্রেণি পঙ্‌ক্তির বিবরণ। আমার খেয়াল থাকে যে উনিশ শতক থেকে বাউল বৈরাগীদের দলে যারা নাম লিখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ প্রায় নেই। ব্যতিক্রম ছিলেন পদকর্তা হাউড়ে গোঁসাই আর রাজখ্যাপা— তাঁদের পূর্বাশ্রমের নামটাও ত্যাগ করেছিলেন। সাত্ত্বিক বৈষ্ণব বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একবার কৌতূহলবশে বাউল দীক্ষা নিয়েছিলেন কিন্তু তাদের দেহতত্ত্বের গুহ্য কারবার জেনে শুনে তার থেকে ছটকে বেরিয়ে আসেন।

আসলে ইংরেজি শিক্ষিত নাগরিক বাঙালির রুচিবোধ ও উনিশ শতকীয় নীতিবাদ একদিকে, আর গ্রামীণ অশিক্ষিত মুক্তমনা বাউলদের জীবন আর এক দিকে। রামমোহনের সমকালীন লালন ফকিরের জীবনপ্রত্যয়ের বলিষ্ঠতা, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ ও সংস্কারমুক্ত যাপন সে কালে কেউ জানতেই পারত না, যদি না রবীন্দ্রনাথ লালনের আখড়া থেকে লালনগীতি সংগ্রহ করে *প্রবাসী* পত্রিকায় ছাপতেন বা তাঁর ভাষণে লালনের গানের অন্তর্গত মৌলিকতা বিষয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেন। কোথায় কোন কুষ্টিয়া-কুমারখালি গ্রামাঞ্চলে পড়ে ছিল লোকগীতির সমৃদ্ধ রত্নকণা, কলকাতার পত্র-পত্রিকা কিংবা এলিটবর্গ তাঁর খোঁজ

করবেন কেন? কলকাতা তখন নবজাগরণের স্বপ্নে মশগুল। প্রথাবিরোধিতা, গোমাংস ভক্ষণ এবং ইংরেজিয়ানার হাওয়া বইছে। বিধবা বিবাহ নিয়ে সোরগোল, পক্ষীদলের গান, জেলেপাড়ার সং, নববাবুবিলাস, বাগানবাড়ি ও পণ্যাঙ্গনাদের নাচগান দেহবিলাস তাঁদের গ্রাস করেছে। তার সমান্তরালে গড়ে উঠছে স্বাদেশিকতার চেতনা, মাতৃভাষা নিয়ে ভাবাবেগ, নারীদের স্বাতন্ত্র্যবোধের উদ্দীপনা, স্ত্রী শিক্ষার আয়োজন, বহু বিবাহের বিরুদ্ধ স্রোত। সেই বিপুল তরঙ্গে লোকজীবন, গ্রামীণ গান বা বাউলজীবন বিষয়ে কেই বা উদ্গ্রীব হবে?

উদ্গ্রীব না হলেও উৎকণ্ঠিত হবার মতো কেউ কেউ কিন্তু ছিলেন, যেমন দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। বাউল ও কর্তাভজাদের যুগলসাধনা তাঁর বরদাস্ত হবার কথা নয়, কারণ তাঁর মতে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করা আবশ্যিক। তাঁর এক শিষ্য কাঙালিচরণ কর্তাভজাদের দেহযৌগিক গুহ্য সাধনাপথে আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলে তিনি সরোষে মন্তব্য করেছিলেন: "ও তো কর্তাভজা মাগীদের পাল্লায় পড়েছে।" নারী সম্পর্কে এমন হীন উল্লেখ বিশেষ ভাবে তাঁর সময়কেই চিহ্নিত করে। গৌণধর্মীদের সাধনচর্যা ও যাপনকে বিদ্রূপ করে সে কালে দাশরথি রায় পাঁচালি লিখেছিলেন এবং অনুমান করা যায় সে-পাঁচালি নগর কলকাতার অনেকের মনোরঞ্জন করেছিল। জেলেপাড়ার সং বেরিয়েছিল একই রকম ধারালো ব্যঙ্গ নিয়ে। গৌণধর্মের সাধনায় নারীর সহযোগ ও দেহ অবশ্যম্ভাবী অথচ সেই সাধকদের সম্পর্কে বিশেষত তাদের করণকারণ সম্পর্কে ইংরেজি শিক্ষিত নীতিবাগীশদের আক্রমণের লিখিত ভাষা ছিল অব্যর্থ শাণিত ও মর্মভেদী। অক্ষয়কুমার দত্ত ও পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এই সব ধর্মাচারীদের ইতর, কুৎসিত, ঘৃণ্য, শবভক্ষণকারী পর্যন্ত বলেছেন এবং মানবসমাজের বাইরে তাদের বিতাড়নের নির্দেশ দিয়েছেন। অবশ্য তাঁদের বক্তব্য ও জীবনে স্ববিরোধও ছিল। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ গাইতে ভালবাসতেন এমন অনেক গান যা গৌণধর্মীদের রচনা এবং তারা সাধনমার্গের গুহ্যতত্ত্বে স্বতন্ত্র। তার অন্তরমহলের রহস্য সম্পূর্ণ শোধন করে ভক্তির রসান দিয়ে অন্য এক ভাষ্য ঠাকুর গাইতেন। যেমন ধরা যাক, দেহের যৌনযৌগিক সাধনপন্থায় বিশ্বাসী সাহেবধনী সম্প্রদায়ের গীতিকার কুবির গোঁসাইয়ের লেখা একটি পদ পরমহংসদেব খুব গাইতে ভালোবাসতেন। তার প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি:

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে
আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে
পাবি রে প্রেম রত্নধন।।

তলাতল পাতাল চুঁড়ে আরও অতলান্ত গভীরে পাওয়া যায় প্রেমরূপ রত্নধন— গানের অন্তঃস্থ তত্ত্বকথা সেইটাই। অথচ কুবির গোঁসাইয়ের আখড়ায় রক্ষিত গানের পুঁথি থেকে যে-মূল পাঠ পাওয়া গেছে তার একেবারে বিপরীত বক্তব্য। তাতে যে-পাঠ আছে তার বয়ান:

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপসাগরে
আমার মন।
তলাতল পাগল খুঁজলে
পাবি না প্রেম রত্নধন॥

এখানে বলার কথা হল তলাতল পাতাল ঢুঁড়েও সেই প্রেম রত্নধন মিলবে না। তা পেতে গেলে ডুব দিতে হবে রূপসাগরের গহীনে— অর্থাৎ নারীর রূপাশ্রয়ে মিলবে সেই পরম শ্রেয় বস্তু। 'রূপ' মানে নারীর দেহরজ। এই সাধনা রজবীর্যের সাধনা। তার থেকেই প্রকৃত প্রাপ্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং এ গানের যে-ভাষ্য গাইতেন তা অনেক পরিশুদ্ধ ও ভদ্রপঞ্চজনের পক্ষে রোচক, মূল পাঠের ভাষ্য একেবারে গুহ্য সাধকদের পক্ষেই একমাত্র বোধ্য ও গ্রহণীয়। এই ভাষ্য গ্রহণ করলে সাধনায় নারীসঙ্গের অনিবার্যতা মানতে হয়। মানতে হয় গৌণধর্মের ভূমিকা। উচ্চবর্গের উচ্চবর্ণের পক্ষে তা তো রুচিকর নয়।

বিচারশীল মানুষরা প্রশ্ন তুলবেন, পুঁথির পাঠ আর শ্রীরামকৃষ্ণের গায়নের পাঠ (যা *শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত* বইতে একাধিকবার উদ্ধৃত) তার এতখানি ভাষ্যগত তফাত হল কেন? মূল পুঁথির পাঠের প্রামাণিকতাই বা কতটা? দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব আগে দেওয়া যাক। মূল পাঠ যে বিশেষ ভাবেই প্রামাণিক তার কারণ ওই পুঁথিতে কুবির গোঁসাইয়ের ১২০৯ খানা গানের মধ্যে আছে ওই গান এবং বহু বাউল ফকিরের গায়ন পরম্পরায় প্রচারিত, বহুকাল। তার সুরও স্বতন্ত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ গীত পাঠটি স্পষ্টত পরিশোধিত এবং তার সুরও আলাদা। এই শোধন কর্মটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, যার সাহায্যে গানের অন্তর্গত বক্তব্যটাই বদলে গেছে। গানটির text হয়ে গেছে নারীসাধনাবর্জিত অমল ও সম্বৃত। এর কারণ কী? এর কারণ নিম্নবর্গের মানুষের লেখা (কুবির ছিলেন বস্ত্রবয়নকারী যোগী সম্প্রদায়ের মানুষ, তাঁর কৌলিক উপাধি ছিল সরকার) এবং রজবীর্যের যৌনযৌগিক সাধনার ইঙ্গিত উচ্চবর্ণের পক্ষে তো গ্রহণযোগ্য নয়।

এখানে উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ হেজিমনির সঙ্গে উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ দ্ব্যণুক সম্পর্কটি বেশ চিন্তা জোগায়। প্রথমত নিম্নবর্গে প্রচারিত নানা গৌণধর্ম উনিশ শতকের গ্রামেগঞ্জে ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। এ সব ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বা পরিকল্পকদের একজনও ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য বংশজাত ছিলেন না এবং গুরু-শিষ্য পরম্পরা বা পীর-মুরিদ পরম্পরাও ছিল নিম্নবর্ণীয়। এই নিম্নবর্ণীয়দের মধ্যে এক ব্যাপক অংশ (তখনও ছিল এবং এখনও আছে) শূদ্রদের নীচের থাকের বা ইসলামি গোষ্ঠীর সর্বনিম্ন থাকের (যাকে বলে 'অরজল') মানুষ। তাঁদের সামনে খোলা ছিল না মন্দির-মসজিদের দরজা, উপাসনার শাস্ত্রীয় পথ, ব্রাহ্মণ পুরোহিত বা মোল্লা মৌলবিদের আহ্বান। ছিল না আরবি বা সংস্কৃতে লেখা শাস্ত্র পাঠের ক্ষমতা বা সুযোগ, কারণ তাঁরা ছিলেন কৃষক বা নিম্নবৃত্তিজীবী, অশিক্ষিত। কে তাঁদের অধ্যাত্মপথের নির্দেশ দেবে?

এই রকম এক শূন্যতার মাঝখানে স্থান করে নিলেন একেকজন প্রবর্তক গৌণধর্মসাধক। এসে পড়লেন বহিরাগত সুফি প্রচারকরা। মাথা তুললেন বৈষ্ণব সাধন পরম্পরা থেকে প্রশ্নাতুর কোনও কোনও সহজিয়া, যাঁরা আখড়া, *উজ্জ্বলনীলমণি*, বৃন্দাবনশাসিত পরিমণ্ডলে দম নিতে পারছিলেন না। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রূপ কবিরাজ, যাঁকে বৈষ্ণব নৈষ্ঠিক ধারা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে এই রূপ কবিরাজি স্রোত, বীরভদ্র স্রোত, পাটুলি স্রোত প্রভৃতি নানা কায়াযোগী গৌণ বৈষ্ণবীয় ধারা এই মুক্তির পথ খুলে দেয়। এখানে মুক্তি বলতে মানবমুক্তি বা মানবস্বীকৃতি। যার মূল কথা হল: সাধনপথ সকলের জন্য খোলা, শ্রেণিবর্ণ জাতির কোনও ভেদাভেদ নেই, মন্ত্র বা মোহান্তর পরাক্রম থেকে সকলকে মুক্ত করা। সপ্তদশ শতক থেকে বাংলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় মূল বৃন্দাবনকেন্দ্রিক গোস্বামীদের হাতে। রূপ-সনাতন-জীব-গোপাল ভট্টদের সকলেই প্রায় ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশজাত, সংস্কৃতজ্ঞ এবং সনাতনি চিন্তার মানুষ। তাঁদের কঠোর শাস্ত্রব্যাখ্যান ও ধর্মীয় নির্দেশে মহাপ্রভুর উদার বহুতা সমন্বয়বাদী বৈষ্ণবরা মরা গাঙে আটকে গেল। শাস্ত্রকাঠিন্য, আচরণবাদ, প্রচল সর্বস্বতা এবং ব্রাহ্মণ্য নেতৃত্ব বাংলায় বৈষ্ণবদের সাংগঠনিক কাঠামোয় আবদ্ধ করল। শূদ্র বৈষ্ণবের অধিকার থাকল না ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দেবার। একমাত্র 'ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব'দের হাতে থাকল দীক্ষাদানের শক্তি তথা শাসন কাঠামো ও আখড়াকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক সচ্ছলতা।

অথচ চৈতন্যদেব রচিত 'শিক্ষাষ্টক' থেকে সবাই জেনেছিল, যে-অমানী তাকে মান দিতে হবে ('অমানীনা মান দেন') অর্থাৎ নিম্নবর্গ-নিম্নবর্ণ সম্ভূত অবমানিত সব মানুষকে মানবস্বীকৃতি দিয়ে আনতে হবে বৈষ্ণবীয় মূল স্রোতে। শোনা যায় নিত্যানন্দ ও তাঁর ছেলে বীরভদ্র এই কাজটাই করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা এমনকী ভ্রষ্ট বৌদ্ধদের (যাদের মাথা কামানো থাকত) বৈষ্ণব ধর্মে টেনে এনেছিলেন কিন্তু নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবরা এই নববৈষ্ণবদের 'নেড়ানেড়ি' এই হীনার্থক আখ্যা দিয়ে তাদের 'কদাচারী' 'অবাধ যৌনাচারী' বলে চিহ্নিত করে সমাজের প্রান্তিক অবস্থানে নিক্ষেপ করলেন। এই ধরনের সামাজিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া থেকে কালক্রমে জন্ম নিল নানা গৌণধর্ম— প্রধানত সাধারণ গহন গ্রামে— গ্রাম সমাজের এক কোণে প্রান্তীয় অবস্থানে। তাঁদের মধ্যে ছিল সহজিয়া নানা বৈষ্ণবীয় স্রোত বাউল ও জাতিবৈষ্ণবরা এবং সুফি-যোগী-তন্ত্রধারা বিশ্বাসী নানা মতের গৌণ সাধক। এঁদের মধ্যে কায়াসাধনার চল ছিল। কায়াসাধনায় আবশ্যিক ছিল পরকীয়া সাধনা এবং সেই কায়াসাধনার প্রত্যক্ষ নির্দেশক ছিলেন গুরু ও মুর্শেদরা। পরকীয়া সাধনায় শিষ্যদের জন্য দরকার হত নারীদের। কোথা থেকে আসবে সেই সব নারী? প্রান্তীয় সমাজ থেকেই আসবে। আসবে অসচ্ছল দরিদ্র নিম্নবর্ণের অসহায় নারীদের মধ্যে থেকে। যাদের বড় একটা অংশ পতি পরিত্যক্ত বা বিবাহবিচ্ছিন্ন, বিবাহহীন কুমারী (যাদের বিবাহ দেওয়া যায়নি), পিতৃমাতৃহীন গৃহহীন নারী, বিধবা ও হীনবৃত্তিজীবী (যেমন দেহজীবী)। তাঁদের কোনও সামাজিক সম্মান ছিল না, ছিল না নিরাপত্তা ও সচ্ছলতা।

বিদ্যমান সমাজ-কাঠামো এঁদের মান্যতা দেননি, অপমান করেছেন, দেশে তখন নারীবাদের ঢেউ ওঠেনি। *বীরাঙ্গনা কাব্য* বা *মহিলা কাব্য* লেখা হয়েছে কিন্তু গৌণধর্মীদের সাধনসঙ্গিনীদের সম্পর্কে ব্যঙ্গ করে শোলোক বানানো হয়েছে:

আগে বেশ্যে পরে দাস্যে
মধ্যে মধ্যে বোষ্টমী।

অর্থাৎ আগে যারা ছিল বেশ্যা, জীবন পরিণামে তারা হয়েছে দাসী বা ঝি— মাঝখানে তারা ছিল বোষ্টমী। এই শ্লোকের সত্যতা অস্বীকার করা যাবে না, তবে যে-সমাজ এই ব্যঙ্গ বানিয়েছে তাদের দৃষ্টিকোণ প্রশংসনীয় নয়। উনিশ শতকের পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মনে হয়েছিল, এই সব গৌণধর্মীদের যা করা উচিত তা হল:

> Aristocratic Brahmanism can only punish them by keeping them excluded from the pale of humanity.

সেই দৃষ্টিকোণ কি আজও পালটেছে?

এখানে প্রশ্ন হল, নানা বর্গের গুহ্য সাধকদের সমাজে অদ্ভুত বা বিতাড়নযোগ্য বলে মনে করা হল, অথচ ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের সঙ্গে জড়িত তন্ত্রসাধনা যে মান্যতা পেল তার কারণ কি এই যে গৌণধর্মীরা মূলত নিম্নবর্গ ও বর্ণের? আর একটি প্রশ্ন হল, গৌণধর্মীরা পরকীয়া তত্ত্বে তথা যুগল ভজনে বিশ্বাসী বলেই কি তাঁদের এই অবমান? পরকীয়াবাদের ব্যবহারিক ভাষ্যকার রূপ কবিরাজকে গৌড়ীয় সমাজ থেকে বিতাড়ন করে দেওয়া হয় এবং 'চিন্তামণি' নামে এক সম্প্রদায় গড়ে ওঠে তাঁরই ভাবধারায়। এঁদের চোখে নারীই গুরু।

আসলে কায়াবাদী পরকীয়া সাধনার ভিত্তিমূলে ছিল 'বর্তমান' অভিধার এক বিশ্বাসভিত্তি। গৌণধর্মী সাধকরা উচ্চবর্গের বা প্রতিষ্ঠিত উন্নত ধর্মধারণাকে বললেন 'অনুমান'। বিশেষত গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের সাধনচর্যায় স্মরণ-মনন-কীর্তন-অর্চন-নিদিধ্যাসন প্রধান হয়ে উঠেছিল। পৌরাণিক রাধাকৃষ্ণ, মথুরা বৃন্দাবন যমুনা, রাসলীলা এই সব অনুমানাত্মক প্রসিদ্ধি বা 'মিথ' ছিল তাঁদের অবলম্বন। বাউল ও অন্যান্য অনেক গৌণধর্মমত এই অনুমানের বিপরীত ভাবনায় বর্তমানকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। বর্তমানের ভিত্তিতে কোনও কাল্পনিক অনুমানের স্থান ছিল না— ছিল বর্তমান বা প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ নরনারী আর তাদের স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেহধর্ম, তার কাম, দেহসঙ্গম, রজোপ্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। সেই দেহকে ঘিরে, কামকে বা প্রবৃত্তিকে স্বীকার করে তার থেকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেমের অনুভবে স্থিত হওয়াই এই পন্থীদের সাধনার গুহ্যধারা। এই পথে দেহের কিছুই ঘৃণাযোগ্য নয়। মল-মূত্র-রজ-বীর্য ('চারচন্দ্র') সবই তাদের পক্ষে গ্রহণীয়, তবে তা সাধনার এক উচ্চস্তরে পৌঁছলে, তবে। সেই গুহ্যসাধনার সফলতা পেতে লাগবে গুরুর সম্মতি ও নির্দেশ। সেই গুরুকে তাঁরা শিক্ষাগুরু বা তার চেয়েও উন্নত স্তরে সাধনগুরু বলে মান্য করেন। সাধারণ ভাবে বর্তমানপন্থীদের প্রথমে আশ্রয় করতে হয় দীক্ষাগুরুকে, তারপরে আসে শিক্ষাগুরুর সান্নিধ্য, তারপরে সাধনপথে চরম সফলতা অর্জনের জন্য লাগে সাধনগুরুর প্রত্যক্ষ উপদেশনা। এই সাধনায় নারীই

তার একমাত্র সহায়। তার অনুকম্পা ও দেহ সাহচর্য ছাড়া সাধক একক ও অসম্পূর্ণ। সেই জন্য কোনও কোনও মতে সাধনসঙ্গিনীই প্রকৃত গুরু। তাঁর সহায়তাতেই একমাত্র দেহাশ্রয় করে পৌঁছতে হয় কাম থেকে প্রেমে। তাঁদের কৃপা ছাড়া সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। এমনকী যথোপযুক্ত নারীসঙ্গিনীর বদলে দুর্লক্ষণযুক্ত কামী প্রকৃতির নারী শুদ্ধ প্রকৃতির সাধককে ব্যর্থতা তথা ক্রমপতনের পথে নিমজ্জিত করে। পক্ষান্তরে গুরুনির্দেশিত বা গুরুর নির্বাচিত নারীর সঙ্গ সাধককে প্রকৃত পথে উন্নত করে। নৃতাত্ত্বিক মানস রায় তাঁর লেখা *Bauls of Birbhum* বইতে এক চিত্তাকর্ষক তথ্য দিয়েছেন। তাঁর সরেজমিন গবেষণা থেকে জানা গেছে বীরভূমের দাসকলগ্রামের বাউল গুরু রামানন্দ গোঁসাইয়ের মেয়ের সঙ্গে দেবীদাস বাউলের বিবাহ হয়। গুরু নিজে তাঁর শিষ্যশিষ্যা অর্থাৎ জামাই ও মেয়েকে দেহদীক্ষার গুহ্য সাধনপথের সন্ধান দেন এবং সেই কারণে নিজে "demonstrated to them the nature and mode of sexual performance with the help of his own sadhan-sangini or female consort."।

এই বৃত্তান্ত থেকে বোঝা যায়, বর্তমানপন্থীদের কাছে গুহ্য সাধনা যতখানি গোপন ও দুর্নিরীক্ষ, সময় বিশেষে বা ব্যক্তিবিশেষে ততটাই খোলামেলা। প্রচলিত সমাজবিন্যাস বা পরিবার কাঠামোয় যা অসম্ভাব্য বা অকল্পনীয় তেমন সম্পর্ক সেখানে অবাধ। এর একটা প্রতিক্রিয়া হতে পারে কাম-বিকৃতি ও যথেচ্ছ যৌনাচার কিন্তু যে দিকটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই সাধনায় নারীপুরুষের কোনও স্বতন্ত্র পরিবারবন্ধন থাকতে পারে না, তেমন সম্ভ্রম বা দূরত্বের আড়ালও থাকে না। বলাবাহুল্য এমনতর সাধনমার্গে সাধনসঙ্গিনী হতে রাজি হয়ে যাঁরা কুলত্যাগ করে বা গৃহবন্ধন ছেড়ে হয়ে ওঠেন সেবাদাসী (অথবা এমনকী সাধকের একান্ত অনিবার্য দেহাবলম্বন) তাঁরা কারা? কুমারী-বিধবা-পতিতা-পরিত্যক্তা ছাড়াও অনেক স্বেচ্ছাবৃতাদের দেখেছি যাঁরা এক মুক্ত জীবনের স্বপ্নে সানন্দে এসেছেন এমন মার্গে। তাঁদের বিবাহ স্বীকৃতি থাকবে না, সন্তান হতে পারবে না, সমাজের বিন্যাসে তাঁরা হবেন প্রান্তবাসিনী, দরিদ্র ও অর্ধাশনা, তবু তাঁরা আছেন। নইলে এই গৌণধর্ম কবেই লোপ পেত।

এখানে তথ্যের দিকে একটু নজর করা দরকার। মানস রায় তাঁর বীরভূমভিত্তিক সরেজমিন বাউল অন্বেষণে আট বছর ধরে ১১২ জন গৌণধর্মী সাধকের পরিসংখ্যান পেশ করেছেন। তাঁরা হয় সহজিয়া বৈষ্ণব না হয় বাউল— দু'-দলই কায়াবাদী এবং সাধনসঙ্গিনী বা ধর্মপত্নীর সঙ্গে 'বর্তমান' পন্থার সাধনপথিক। তাঁদের জাতিগত পরিচয় হল (শতকরা হিসাবে):

বাগদি ১৯.৬৪ ডোম ১৭.৬৫ গন্ধবণিক ৬.২৫ হাড়ি ২১.৪৩
মুচি ২৪.১১ সদ্‌গোপ ৫.৩৬ কায়স্থ ২.৬৮ ব্রাহ্মণ ২.৬৮

এঁদের মধ্যে শতকরা ৬২.৫০ জন নিরক্ষর।

তথ্য থেকে স্পষ্ট যে, গৌণধর্মে অশিক্ষিত এবং নিম্নবর্ণ সংখ্যাগুরুত্বে প্রাধান্য পেয়েছে। এ সব সম্প্রদায় সমাজ বিন্যাসে বেশ নীচের থাকের মানুষ, আর্থিক ভাবে দৈন্যগ্রস্ত এবং মানবস্বীকৃতির বিচারে উপেক্ষিত। সেই জন্যই কি তাঁরা রহস্যময় গুহ্য সাধনার শীর্ণ পরিসরে এসে কিছুটা গুরুত্ব পেতে চান? এঁদের সাধনসঙ্গিনী ও পত্নীদের জাতি পরিচয় কোথাও কোথাও পুরুষদের চেয়ে হীনতর হতে পারে। মানস রায় সে দিকটা খতিয়ে দেখেননি।

সেটা আমি খেয়াল রেখেছিলাম। ১৯৯৫ থেকে ২০০০ সালের কালসীমায় আমি যখন সারা পশ্চিমবঙ্গের বহু গ্রামগঞ্জ জনপদ টুঁড়ে অজস্র বাউল ফকিরদের সন্ধান করেছিলাম তখন এই সেবাদাসী আর সাধকদের সঙ্গিনীদের সম্পর্কে আলাদা নোট রাখতাম। তাতে দেখতে পাই ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ কন্যা প্রায় নেই। আছে হাড়ি, ডোম, বাগদি, মুচি ছাড়াও রাজবংশী, চাঁড়াল (মালো), নমঃশূদ্র, মাহিষ্য ও জন্মসূত্রহীনরাও। এঁরা অনেকেই বহুপুরুষের দ্বারা ব্যবহৃত, যৌনশোষিত এমনকী প্রহৃত, কারণ এঁদের সাধনসঙ্গীরা সব সময়ে শুদ্ধশীল সাত্ত্বিক স্বভাবের নন, অনেকেই বিকৃতকামী ও যদৃচ্ছ সঙ্গিনী বদলে অভ্যস্ত। তবু কেন এঁরা রয়ে যান আখড়ায়? তার কারণ এক ধরনের নিরাপত্তা ও অন্য বাউলের অন্যতর যৌনাচারের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা। আর একটি কারণ হল সাধকের কাছে যতই উৎপীড়িত হোন তাঁর শিষ্যদের চোখে কিন্তু তিনি জননীস্বরূপা। তারা এসেই মা বলে পদধূলি নেয়, তাঁর সেবাকাজে কৃতার্থ বোধ করে, তাঁর কাছে মিনতি করে 'রূপ' (রজ) চেয়ে নেয় পরকীয়া সাধনের স্বাদ নিতে। গুরু যে তাঁর সাধনসঙ্গিনীর দেহসান্নিধ্য দিয়ে শিষ্যদের যৌনযৌগিক শিক্ষা দেন সেটাও সত্যি কিন্তু তার একটা সীমা থাকে। গুরুসঙ্গিনীর সঙ্গে দেহযোগ কালে তাঁকে ভোগের সামগ্রী ভাবা গর্হিত অপরাধ। তাঁকে তারা মা বলেই ভাবে। সমুদ্রগড়ে এক বৈষ্ণব পরিবারে দেখেছি উন্মুক্ত কলতলায় গুরুমা স্নান করছেন, শিষ্যরা টিউবওয়েল থেকে জল তুলে তাঁর গায়ে মাথায় ঢালছে, তাঁর ঊর্ধ্বাঙ্গ গামছা দিয়ে মুছে দিচ্ছে। তাদের দৃষ্টিতে যেমন কোনও লজ্জা বা সংকোচ দেখিনি তেমনই লালসাও দেখিনি। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বোধহয় লালন ফকির বলেছিলেন:

কামে থেকে হও নিষ্কামী॥

আমাদের সামাজিক অনভ্যস্ত পাপসন্ধানী চোখ এসব দৃশ্যে অস্বস্তি পায়, অন্য ব্যাখ্যান খোঁজে, কিন্তু তা যদি সত্য হত তবে এই আশ্চর্য গুহ্য সম্পর্কগুলো কি টিকত? শিষ্যদের গৃহবাসিনী স্ত্রীরাও দেখেছি গুরুপত্নীকে বিপুল সমাদর করে। শিষ্যবাড়িতে গুরু ও গুরুপত্নী এসে উঠলে আনন্দের হাট বসে যায়। তবে কি আমাদেরই দৃষ্টি আচ্ছন্ন? আমরাই কি কামমোহিত?

মাঝে মাঝে মনে হয় এ সব প্রান্তবাসিনীদের দিকে অন্য কোনও বীক্ষণদৃষ্টিতে দেখা উচিত। যেমন ধরা যাক, নবাসনের হরিপদ গোঁসাইয়ের সঙ্গিনী নির্মলা মা। হরিপদ নব্বইয়ের কোঠায় পা ছুঁই ছুঁই হন যদি তবে নির্মলা আশি ছুঁই ছুঁই। তাঁদের সম্পর্ক (দাম্পত্য বলা যাবে না) চার দশক পেরিয়েছে। কেউ কাউকে ত্যাগ করার কথা ভাবেনি। হরিপদ যখন নির্মলাকে সঙ্গিনীরূপে বেছে নেন তখন নির্মলা কন্যাসন্তান নিয়ে নিতান্ত অসহায় ও ত্রস্ত। হরিপদ তাঁকে মান দিয়ে কাছে টানেন, কন্যার বিবাহ দেন— তারপরে নির্মলার সম্মতি নিয়ে তাঁকে সাধনপথে আনেন। তাঁকে সঙ্গে করে ঘোরেন, যুগল গান করেন, বিদেশেও নিয়ে যান তাঁকে কারণ হরিপদ-র অনেক ফরাসি শিষ্যশিষ্যা আছে যারা তাঁকে সে দেশে নিয়ে যায়, দল বেঁধে এ দেশেও আসে। থাকে নবাসনের আখড়ায়। হরিপদ গোছানো মানুষ, যোগাচারে সিদ্ধ সাধক, নিজে গান রচনা করেন। গুরু মা-কে নিয়ে শিষ্যদের বাড়ি

যান। নিজের আখড়াও বেশ সাজানো আর পরিসরযুক্ত। তাতে আছে এমনকী আধুনিক শৌচব্যবস্থা— বিদেশিদের জন্য। বিদেশ থেকে তাঁর গানের সুদৃশ্য সিডি বেরিয়েছে তার প্রচ্ছদে হরিপদ ও নির্মলা মা-র সহাস্য আলেখ্য।

নির্মলা মা সম্বোধনেই বোঝা যায় এই নারী অত্যাচারিত, বঞ্চিত নন, বেশ ভরভরন্ত জীবন তাঁর। গোয়ালে গোরু আছে, শিষ্য সেবকদের যাতায়াত আছে। সন্ধেয় বসে গানের আসর। তাতে অনেক শ্রোতা সমাবেশ হয়। তাঁর আখড়ার বারান্দায় শীতের চমৎকার রোদের সংসার। উঠোনে ঘুরে ঘুরে ধান খাচ্ছে পায়রার দল। পান চিবোতে চিবোতে নির্মলা মা যখন আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে চলেন তখন কে বলবে যে ইনি একজন আত্মতৃপ্ত পল্লিগৃহিণী নন? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তো তিনি অন্যান্য সাধন সেবাদাসীদের মতোই প্রান্তবাসিনী। থাকেনও গ্রামের প্রান্তসীমায়। হরিপদ বিহনে তাঁর জীবন অন্ধকার এই অর্থে যে তার কোনওই আলাদা ভরকেন্দ্র নেই। অধিকার নেই। মূলত আশ্রিতা এই জন্যে যে যদি বেসুর বাজে তবে যে কোনও অছিলায় হরিপদ তাঁকে নির্বিকারচিত্তে ত্যাগ করবেন। এমন ঘটনা এই প্রান্তিক সমাজে খুব একটা অলীক নয়।

কিন্তু আসলে তো এঁরা বর্তমানের সাধক— আর 'বর্তমান চায় বর্তিয়ে থাকতে', এটাই নির্মলার সার কথা। বললেন, 'দ্যাখো বাবা জীবনটা কী রকম জানো? এই শীতের রোদটুকুর মতো। বেশ রোদ পোহাচ্ছ হঠাৎ দেখলে নেই? মানুষের আচার ব্যবহারও তেমনই। কালকের মানুষটা আজকে বদলে যায়। ওই যে তোমাদের হরিপদ গোঁসাই— এখন খুব নরমসরম— একটু সেবা চায়, ঘুম চায়, কথা বলতে চায়।'

—আগে কী অন্য রকম ছিলেন?

—চণ্ড রাগী— সারা রাত নির্ঘুম। ছটফট করত। আর সে কী সাধনা! ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আমার শরীরের সঙ্গে শরীর মিলিয়ে। ছাড়ানছোড়ান নেই। কাম তার মধ্যে এক ফোঁটা নেই। একটু বেচাল দেখলেই মার। উঃ সে যে কত মার মারিছে। কিন্তু কী জানো, মানুষটা সৎ। আমাকে গড়েপিটে তার নিজের মতো বানিয়ে নিয়েছে। আমাকে মানসম্মানও দিয়েছে। আমার এখন দেশে দেশে অনেক শিষ্যশাবক। তারা আমাকে মা বলে ডাকে। গোঁসাইকে বলে বাবা।

আমি অবাক চোখে তাকিয়ে থাকি। ভরা সংসার তবু তাতে বৈরাগ্যের রোদ। স্বামী-স্ত্রী নয় তবু তার চেয়ে বেশি। এতটা যে সংসারিণী আসলে সে কিন্তু শঙ্কিত। গোঁসাই যদি তাকে... কোনও দিন...

এর উলটোটাও তো দেখেছি বাংলারই আর এক গ্রামে। হরিপদ-নির্মলার মতো ছিমছাম আখড়া বলা যাবে না, তবে গৌরচাঁদ যে ডেরা বেঁধেছে তা জীর্ণ না হলেও খুব পোক্ত নয়। জ্যৈষ্ঠের ঝড়ের আগে বাঁধন দিতে হবে। এটা ছিল মূলে গৌরের গুরু সাধুচাঁদের ডেরা। মানুষটা ছিল বাউণ্ডুলে। তার সেবাদাসী কেটে পড়েছিল অন্য এক গোঁসাইয়ের সঙ্গে। সাধুচাঁদ একা একাই থাকত, তারপরে একদিন গৌরচাঁদকে ডেকে তার হাতে আখড়া রক্ষার

ভার দিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে। গৌরের সাধনপথ বিচিত্র। তার বাবা নাকি এগারো জন সঙ্গিনী নিয়ে সাধনা করেছিলেন— গৌরচাঁদের লক্ষ্য তিন নারীর সাধনা। তার ভাষায় 'স্বত্ব রজ তম বা ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার আস্বাদন'। প্রথমে ভেবেছিলাম এ সব হল কথার বুজরুকি, আসলে অবাধ যৌনতার লীলা খেলা। মুশকিল যে গৌরচাঁদকে নিরীক্ষণ করলে তা মনে হয় না। চোখ দুটো সাধকের মতো নিমীল। শরীরের মধ্যে তীব্র যৌবনের জ্যোতি। দাড়িগোঁফ ভরা প্রসন্ন মুখ, সুগঠিত নির্মেদ খালি গা, পরনে ছোট্ট এক তহবন্ধ অর্থাৎ কানি। তার সেবাদাসী তরঙ্গ বেশ ডাঁটো। মুড়ি-চা সেবা করতে করতে গৌরচাঁদ বলল, "এই তরঙ্গটা এখনও টিঁকে আছে— ইচ্ছে ছিল তিন তারের সাধনা করব। তাই বিম্‌লি আর চম্পা বলে দুটো মেয়ে এনেছিলাম, তারপরে এই তরঙ্গকে পেয়েছি।"

অবাক হয়ে বলি, "ওরা দু'জন চলে গেল কেন?"

—এটাকে ভাবল গেরস্থের সংসার। নিজেদের ভাবল সতীন। তাই নিয়ে চুলোচুলি, ঝগড়া, খিস্তি— আশ্রম তো নয় যেন নর্দমা। কে আমাকে অধিকার করবে তাই নিয়ে ঝগড়া। আরে, তাদের বোঝাতেই পারি না যে, আমি কারোরই নই— আমি সাধক। তাদের শরীরটা আমার চাই— নিষ্কামী সাধন— যোগের কঠিন পথ। স্খলন চলবে না, ঊর্ধ্বরেতার সাধনা।

তরঙ্গ চুপ করে বসে আছে। পরনে যেন বিধবার সাজ। সাদা ব্লাউজ আর পাড়হীন থান শাড়ি। তার মুখটা উজ্জ্বল। আশ্চর্য এই গ্রামীণ লোকায়ত জগৎ। বেওয়ারিশ মেয়েদের কোনও অভাব নেই। এরা নাকি সাধিকা? মন কিছুতেই মানে না। তবে কোথায় একটা গোপন রহস্য আছে। দেহোপভোগ এদের কাম্য নয় সেটা স্পষ্ট। এরা কেউ লম্পট নয়। কী একটা আন্তর শক্তি এরা অর্জন করেছে। তরঙ্গের দৃষ্টিতে কোনও ছলাকলা নেই। গভীর নিবিষ্ট চোখ। গৌরচাঁদের কাছে সে স্বেচ্ছায় এসেছে— সাধনপথ জানতে। তার কোনও হেলদোল নেই, সাজগোজও নেই। আগে আর এক জনের সঙ্গে ছিল— ভাল লাগেনি, ছেড়ে দিয়েছে। এ সব সে ধীরে ধীরে নিজেই কবুল করে।

এতক্ষণে এতদিনে একটা মুক্ত নারী দেখলাম। একে তো প্রান্তবাসিনী বা পুরুষের দয়ায় বেঁচে আছে এমন বলা যাবে না। ভবিষ্যতের চিন্তা নেই, ধনদৌলত বাস্তুও তো নেই। একেই বলা চলে সত্যিকারের বর্তমান পন্থী। জীবনরহস্যকে সে জানতে চায়, স্বাদ পেতে চায় পৌরুষের। তাই গৌরচাঁদকে তরঙ্গ বেছে নিয়েছে। তাই বলে তাকে আশকারা দিতে চায় না। বাউল গানে পড়েছি একে নাকি বলে,

> নির্বিকারী করণধারী
> লাখে এক মিলয়ে নারী।

এর ভেতরে কামনার তাপ নেই, সন্তানবাসনা নেই, সম্পদসুখ চায় না, ঘরগেরস্থিতে মন নেই। ভিটেটাও অগোছালো। তার লক্ষ্য স্থির। গৌরচাঁদকে লেহন করে সে বুঝে নেবে দেহতত্ত্বের শেষ কথা। প্রান্ত নয় তার অবস্থান। সে কেন্দ্রবাসিনী— জীবনের অন্তঃস্তলে।

শুচিব্রত সেন

আদিবাসী জীবনে নারী: প্রসঙ্গ সাঁওতাল সমাজ

মানব জাতির সৃষ্টির সময় থেকে সমস্ত গোষ্ঠী কোনও না কোনও অঞ্চলের আদিবাসী ছিল। তারপর বিভিন্ন ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ঘাত-প্রতিঘাতে ঘটে গেছে তাদের স্থানান্তর। রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর *ভোলগা থেকে গঙ্গা*-য় সমাজ বিকাশের যে অনবদ্য বিবরণ কাহিনির আকারে বর্ণনা করেছেন তা ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি কেন্দ্রিক হলেও দ্রাবিড়ীয় বা প্রোটো অস্ট্রোলয়েড গোষ্ঠী সম্পর্কেও প্রযোজ্য, কেন না সভ্যতার আগে বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে আর্য, অনার্যের স্বতন্ত্র সমাজ চেতনার অস্তিত্ব ছিল না, আর এই সমাজে মাতৃতান্ত্রিকতার প্রাধান্য সম্পর্কে নৃতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকেরা একমত। রাহুল সাংকৃত্যায়ন-এর গ্রন্থে এই সমাজের কাল নির্ধারিত হয়েছে ৩৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ। প্রখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক গর্ডন চাইল্ডের বিবরণ অনুসারে (G.Childe, *What happened in History*, Penguin, 1942, Reprint 1964) এরও আগে প্রায় ৮,০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে ৩,০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত বিশাল সময়কালে নব্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ারের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বস্তু নির্ভর জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বদল ঘটে গেল। এই হাতিয়ারে জমি কর্ষণ হল সহজতর। এবং চাইল্ডের গবেষণানুসারে এ-সবই সম্ভব হয়েছিল মূলত নারীদের বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায়। নব্যপ্রস্তর যুগের এই অবদানকে তাই তিনি চিহ্নিত করেছেন 'Mankind' বা 'Womankind'-এর অবদান হিসাবে (G. Childe পৃ. ৬৫)। তাঁর মতে, "All the foregoing inventions and discoveries were, judged by the ethnographic evidence, the work of the women" (পৃ. ৬৬)।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় নব্যপ্রস্তর যুগের পর এল তাম্রযুগ, আর তখন থেকেই সমাজে নারীর আধিপত্যের প্রভাব কমতে থাকে। শিকারি ও খাদ্য সংগ্রাহক থেকে কৃষিজ অর্থনীতির উত্তরণে মানব সমাজে নারীর ভূমিকারও পরিবর্তন ঘটে। দৈহিক দিক থেকে তারা আকারেও পুরুষের তুলনায় ছোট হতে শুরু করেছিল (ইরফান হাবিব, *প্রাক্ ইতিহাস*, এন. বি. এ ২০০২, পৃ. ৬৬)। লাঙলের আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীর অর্থনৈতিক অবস্থানে ঘটে আরও অবনমন। লোহার আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত কাঠের লাঙল ব্যবহৃত

হলেও তা শক্তির প্রয়োজনে পুরুষের একাধিপত্যে পরিণত হয়। চাইল্ডের ভাষায় বলা যায়, "By relieving women of a lot of heavy but essential tasks in the way of hoeing, carrying burdens, and making pots, they (men) cut away the economic foundations of mother-right." (পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪)। কৃষি সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত ধনোৎপাদনে সৃষ্টি হল শ্রেণিভিত্তিক সমাজ। অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে নারীর অধিকারের এই সম্পর্ক আদিবাসী সমাজ বিশ্লেষণে অধিকতর প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে এই কারণেই যে সমাজবিকাশে অর্থনীতির বিবর্তনে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির অবস্থান বিভিন্ন স্তরায়িত। শিকারি, খাদ্য সংগ্রাহক, ঝুম চাষ বা স্থায়ী কৃষিজীবী সর্বস্তরেই কোনও না কোনও ভারতীয় আদিবাসীকে খুঁজে পাওয়া যাবে, এবং সে দিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যাবে এই স্তরায়িত ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকারও আছে হেরফের। সে ক্ষেত্রে আদিবাসী মাত্রেরই একই বন্ধনীর অন্তর্ভুক্তি অনৈতিহাসিক। আলোচনাকে একটি নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করার প্রয়োজনে আমাদের তাই বেছে নিতে হবে কোনও বিশেষ আদিবাসী গোষ্ঠীকে এবং সে ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে অতি পরিচিত পূর্ব ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সাঁওতাল সমাজে নারীর স্ব-ক্ষমতায়নের ইতিবৃত্তকে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা যেতে পারে। পূর্ব ভারত বলতে যে-ভৌগোলিক পরিসীমার কথা বলা হয় তার অন্তর্ভুক্ত হল বাংলা, বিহার, ওড়িশা। প্রধানত মুণ্ডা, হো, সাঁওতাল, ওঁরাও, ভূমিজ, শবর, লোধা, খেড়িয়া, মাল পাহাড়িয়ারা এই ভৌগোলিক সীমার অধিবাসী। ১৯৭৬ সালের সিডিউলড কাস্টস অ্যান্ড সিডিউলড ট্রাইব অর্ডার (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট অনুযায়ী ৩৮টি গোষ্ঠীকে পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী তালিকাভুক্ত করা হয়। ভাষাগোষ্ঠীর দিক থেকে ভাগ করলে এদের দু'ভাগে ভাগ করা যায়। মুণ্ডারী ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হল মুণ্ডা, সাঁওতাল, হো প্রভৃতি আর দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে আসে ওঁরাও, মাল পাহাড়িয়া ইত্যাদি। অন্য দিকে সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, ভূমিজরা যেখানে স্থায়ী কৃষিজীবী হিসাবে পরিচিত, সেখানে মাল পাহাড়িয়া, শবর, খেড়িয়ারা ঝুম চাষি বা খাদ্য সংগ্রাহক হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীর সমস্ত আদিবাসীদের উৎপত্তি সংক্রান্ত যে-লোককথা তা মোটামুটি এক। ভারতবর্ষ, গ্রিস, মিশর, আফ্রিকা, রেড ইন্ডিয়ান এমনকী এসকিমোদের উপকথায় বার বার এসেছে সূর্য, পাহাড়, সাপ, খরগোস, শৃগাল, হরিণ, ভাল্লুক এবং সর্বোপরি জঙ্গল। আশ্চর্যের কিছু নেই। কেন না আদিতে জল, জঙ্গল ও মাটিকে কেন্দ্র করেই সভ্যতার বিবর্তনের সূচনা। নীতি ও শিক্ষার দিক থেকে এই সমস্ত গল্পে সব সময় ঘটেছে সত্যের জয় ও দুর্জনের পরাজয়। আদিতে উদারতম আশ্রয় সূর্য ছিলেন মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু। আদিবাসী এবং অনাদিবাসী উভয়ের কাছেই তিনি রক্ষক। এসকিমো গল্পে তুষার দানবের হাত থেকে একটি বাচ্চা ছেলে রক্ষা পেয়ে যায় সূর্যের উদয়ে। তেমনি হিন্দু শাস্ত্রে বলা হয়েছে, অনূঢ়া কন্যা সূর্যের দ্বারা সংরক্ষিত, তাই বিবাহ অনুষ্ঠানে সূর্যার্ঘ্য দিয়ে কন্যাকে গ্রহণ করতে হয়। সাঁওতালি জন্মকথা শুরু হয় এই বলে:

"বেড়ায় রাকাব আ অকাস্য রে,
জানাম লেনাবন
মানওয়া অনেতেরে, দূরয়া লাতার হাসা,
ইনৈয়াতে তাহে কানা ধ্যর্তি।"

সূর্য যেদিকে ওঠে, ঠিক সেই দিকেই আমাদের জন্ম হয়েছিল, তখন চারদিকে শুধু জল আর জল, আর ছিল জলের নীচে মাটি।

মুণ্ডাদের কাছে সবচেয়ে পূজ্য সিংবোঙ্গা বা সূর্য দেবতা, আর ইনকা সভ্যতায় তো 'সূর্য কাঁদলে সোনা।' সাঁওতাল সৃষ্টিতত্ত্বে (কারাম বিনতি) আদম এবং ইভের মতো প্রথম মানব ও মানবী ছিলেন পিলচু বুড়া ও পিলচু বুড়ি। এঁদের জন্ম হয়েছিল হাঁসের ডিম থেকে। হংস-প্রসঙ্গ অন্যান্য বিদেশি লোককাহিনিতেও খুঁজে পাওয়া যায়। পিলচু বুড়া ও পিলচু বুড়ির মধ্যে মিলন ঘটাতে সূর্যদেবের নির্দেশেই তৈরি হল ইলি বা মদ। একদা ভাইবোন পরিণত হল স্বামী-স্ত্রীতে আর এদেরই বারো জন পুত্র থেকে সাঁওতালদের বারোটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি।

সৃষ্টিতত্ত্বে মানব-মানবীর সমমর্যাদা দিয়েও দেবতত্ত্ব থেকে দেখা গেল পুরুষ প্রাধান্য। মারাং বুরু বা বোঙ্গারা সবাই পুরুষ। ধর্তী আবা বা পৃথিবী নারী হলেও তাকে মাঝে মাঝে পুরুষ দেবতা হিসাবেও বর্ণনা করা হয়েছে। একমাত্র জাহের থান বা জাহের-এরা হলেন মাতৃকা দেবী। মাঘসীম বা বাহা পরবের সময় জাহের থানের উদ্দেশে যে সংগীত গীত হয় তা এক সময়কার মাতৃতান্ত্রিক সমাজের আদি কৃষির কথা মনে করিয়ে দেয়।

"Salutation to you, Mother Jaher Era,
On the occasion of the Baha Festival
we offer you
Young fowls, new flowers and
freshly husked rice...
We take these new flowers and
fruits
Let there be no disease and
sickness from them
Please make the animals before us".

প্রসঙ্গত বলা ভাল, জাহের থানে ফুল উৎসর্গের আগে সাঁওতাল নারীরা মাথার খোঁপায় ফুল গোঁজে না। এই সব গানে ফুটে ওঠে মায়ের কাছে সন্তানের চিরন্তন প্রার্থনা। (সীতাকান্ত মহাপাত্র, *Invocation: Rites of propitiations*, গীতি সেন সম্পাদিত *Indigenous Vision* নিউদিল্লি, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৮, পৃ. ৭১ এর অন্তর্ভুক্ত)

'জা' অর্থ বীজ বা অঙ্কুরোদ্গমনের সুপ্ত ক্ষমতা, এবং 'হের' অর্থ বপন করা। রামদাস

টুডু রেস্কা তাঁর 'খেরওয়াল বংশা ধরম পুথি'তে লিখছেন, "মোড়েকো-তুরুইকা শব্দের অর্থ হল পাঁচজন বা ছয় জন নারী। সম্ভবত, পিলচু বুড়া বুড়িদের সন্তানেরা। এখন এই শব্দদ্বয় দ্বারা গ্রাম্য পরিষদ বা পঞ্চায়েত বোঝায়। এরাই প্রথম সাঁওতালদের গ্রাম পত্তন ও সামাজিক বিন্যাস করেছে বলে পরবর্তীকালে দেবতা হিসাবে গণ্য হয়েছে।" (অনুবাদ ও সম্পাদনা সুকুমার শিকদার ও সারদাপ্রসাদ কিসকু। প্রথম প্রকাশ ১৯৫১; ২য় সংস্করণ ১৯৫২, কলকাতা, পৃ. ৩৩)

কিন্তু সাঁওতাল গ্রাম সমাজের সাংগঠনিক পদে নারীর ভূমিকা সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। বস্তুত পক্ষে সমাজ গঠনের সূচনাতেই গর্ডন চাইল্ড কথিত 'Mother Right' এর মূলে কুঠারাঘাত পড়েছিল। প্রসঙ্গত এ কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে আদিবাসী সমাজ সংগঠন বা বিভিন্ন সামাজিক আচার আচরণ পরবর্তীকালে হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর *বাঙ্গালীর ইতিহাস* (আদিপর্ব, ১ম প্রকাশ, ১৯৪৯) এবং ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর *ভারতের সংস্কৃতি* (১৩৫০, বিশ্বভারতী) গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কাজেই সংস্কৃতায়নের বিপরীতে আদিবাসী প্রথার আত্মস্থকরণও ভারতীয় সমাজে যে যথেষ্টই কার্যকরী ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। আর তাই সৈয়দ মুজতবা আলি যখন বলেন, "...ভারতবর্ষের যা কিছু প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে তোমরা-আমরা সবাই গর্ব করি সেটা গড়ে উঠেছে আর্য-অনার্যের সভ্যতার সংমিশ্রণ অর্থাৎ বর্ণ-সঙ্করের ফলে' (*চাচা কাহিনী*, পঞ্চদশ সংস্করণ, ২০০৪, কলকাতা) তখন সেখানে সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক সত্যেরই প্রতিফলন ঘটে। এই বক্তব্যের অনুসরণে বলা যায় যে ভারতে প্রথম পঞ্চায়েত প্রথা আদিবাসীদের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল। যে কোনও বিচারালয়ে সাক্ষ্য দেবার আগে আদিবাসী মুণ্ডা বা সাঁওতাল শপথ নেওয়ার সময় সাধারণত বলে থাকেন, "সিরমারে সিঙ্গবোঙ্গা ওতেরে পঞ্চা।" (আকাশে সূর্য দেবতা, পৃথিবীতে পঞ্চায়েত)। আদিবাসী বা সাঁওতাল সমাজে যে পঞ্চায়েত বা রাজনৈতিক কাঠামো বিদ্যমান তার কার্যনির্বাহী ব্যক্তিরা হলেন যথাক্রমে মাঝি বা গ্রাম প্রধান, জগমাঝি, পারানিক, জগ পারানিক, গোডেৎ, নায়েকে, কুড়ুম নায়েকে। কোনও নারী এই সবের পদের অধিকারিণী হতে পারতেন না বা এখনও পারেন না। তাতে কী যায় আসে? সংসদে তো এখনও শতকরা ৩০ জন নারী প্রতিনিধিত্বের দাবি স্বীকৃতই হল না।

সাঁওতাল সমাজকে এক egalitarian বা সর্বসমতাবাদী সমাজ হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। সন্দেহ নেই তথাকথিত হিন্দু বা মুসলমান সমাজের তুলনায় এরা অনেকটাই সমতাবাদী। লিঙ্গবৈষম্য অনেকটাই কম, তবে একেবারেই নেই তা বলা যায় না। পঞ্চায়েত পরিচালনাতেও যেমন নারীর কোনও ভূমিকা নেই, তেমনই তাদের পরবের দিন নির্ধারণের ক্ষমতা একান্ত ভাবেই পুরুষের। এমনকী পরবের প্রথম দিনের পুজো দেখাটাও মেয়েদের পক্ষে নিষিদ্ধ কিন্তু পুজোর যাবতীয় উপচার বিশেষত হাঁড়িয়া তৈরিতে তাদের একাধিপত্য। অন্য দিকে 'থুন্টু' উৎসব বা গোপ মাতার পুজোয় বাড়ির কর্ত্রীই সব কাজ করেন। উপকরণ, অর্থাৎ ধান, দূর্বা, সিঁদুর, কাঁচা শালপাতা দিয়ে তৈরি জ্বলন্ত প্রদীপ— সব কিছু

কুলোর ওপর সাজিয়ে নিয়ে গোয়াল ঘরের দরজা খুলবে বাড়ির কর্ত্রী। ঠাট্টা করে ছড়া কেটে বলা হয়:

"বউটা বাড়ির সব কাজ করে,
মাঝি তুই তার পুজো কর।"

ক্ষেত্র সমীক্ষায় প্রাপ্ত (ধনপতি বাগ, *সাঁওতাল সমাজ সমীক্ষা*, ১৯৮৩, কলকাতা, পৃ. ১৬) এই ব্যঙ্গাত্মক ছড়াটির মধ্যে সাঁওতাল পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের বিশ্লেষণে এই সমাজে নারীর স্থানের তাৎপর্য অনেক গভীরে চলে যায়। যাঁরা এই সমাজকে প্রত্যক্ষভাবে জানেন তাঁরা সবাই স্বীকার করেন এদের পুরুষরা কর্মের উপাসক যত না তার চেয়ে বেশি আনন্দের উপাসক। গ্রাসাচ্ছাদনের মতন ব্যবস্থা হলে সন্ধ্যা হলেই হাঁড়িয়া পান করে নাচ গানেই এদের বেশি উৎসাহ, আর সে কারণেই সময়ের মূল্যও এদের কাছে তুচ্ছ। Time বা সময় সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে আধুনিকতা, ইতিহাস ও আদিমতাকে মিশিয়ে প্রথমা চৌধুরী *Politics of Time* নামে বেশ জটিল এক পুস্তক আমাদের উপহার দিয়েছেন। Primitive বা আদিমতার নির্মাণ ও বাসস্থান আধুনিকতার ভাবনার রাজ্যে। আধুনিকতার বিপরীতে এক 'অপর' সময়ের বাসিন্দা সাঁওতালদের "দেখে মনে হয় ওদের জন্য সময়টা যেন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে" (পূর্বোক্ত, ধনপতি বাগ, পৃ. ১৮)। কিন্তু সময় পুরুষতান্ত্রিকতায় দাঁড়িয়ে থাকলেও জীবন ও সংসার চলমান। তাই সাঁওতাল সমাজে নারীর মূল্যের অন্য এক মাত্রা। এদের নারীরা শুধু ঘরে নয়, বাইরের কাজেও পুরুষের সমান বা তার চেয়ে বেশি সহযোগী। হালটাই শুধু পুরুষ চালায়, কিন্তু বীজ বপন, শস্য কাটা, জ্বালানী সংগ্রহ, ঘর গৃহস্থালী, শিশু পালন সবটাই মেয়েদের কাজ। সাঁওতালদের বিবাহে বরপক্ষই কন্যার পিতাকে পণ দেয়, যদিও তা এক সময় ছিল প্রতীকী ১২ টাকা ৫০ পয়সা মাত্র। এর থেকে পঞ্চাশ পয়সা সম্মান দক্ষিণা হিসাবে পঞ্চায়েতের প্রাপ্য— বাকিটা নিজের। মেয়ে যে এমনি পাওয়া যায় না, তাকে মূল্য দিয়ে কিনতে হয় এবং সে যে সমাজে সমাদৃত এ বোধ এই সমাজে বিদ্যমান। বাল্য বিবাহ প্রচলিত নয় এদের মধ্যে এবং পরবের দিনে উন্মুক্ত মেলামেশার কারণে অনেক সময় পাত্রপাত্রীরা নিজেরাই নিজেদের পছন্দ করে, যদিও পিতামাতার দ্বারা নির্বাচিত বিবাহই এখনও সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। মজার বিষয় হচ্ছে বিবাহের সময় যাত্রাকালে ছেলেকে মা জিজ্ঞাসা করেন, "ওকাতেম চালাকানা বাবু?" অর্থাৎ কোথায় যাচ্ছ বাবা? ছেলে উত্তর দেয়, "কাসি বাগী কাতে কড়মি আগু"। এর অর্থ "তোমার কাজ করতে কষ্ট হচ্ছে, তাই বউ আনতে যাচ্ছি।" পাঠক স্মরণ করতে পারেন একদা বাংলার বিবাহে একই ভাবে ছেলের উত্তর, "মা তোমার জন্য দাসী আনতে যাচ্ছি।" সাঁওতাল অবশ্য 'দাসী' বলে না— কারণ শ্রম বিভাজনের এ ধারণাই তাদের মধ্যে প্রচলিত নয়।

সাঁওতাল সমাজ নারীর এই প্রয়োজনীয়তাকে স্মরণে রেখেই তাকে বেঁধেছিল কিছু প্রথার নিগড়ে। অবশ্য এ কথা বলা যেতেই পারে যে সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদরা যে

আদিবাসীদের চিহ্নিত করেছেন 'encapsulated society' হিসাবে (G. Somers: *The Dynamics of Santal Traditions in a Peasant Society*; Delhi, 1977, P. 51)। তারা বাঙালি হিন্দুদের প্রতিকূলতায় তৈরি করেছিল এই প্রথা। সাঁওতাল নারীদের স্ব-সমাজ ব্যতীত অন্য সমাজে বিবাহ তাদের কাছে প্রতীয়মান হত জাতিগত অপমান হিসাবে, আর সে কারণেই 'বিটলাহা' অর্থাৎ সমবেত হয়ে শত্রু নিকেশের প্রচলন। সাঁওতালদের মধ্যে দীর্ঘকাল কাটিয়ে সেই অভিজ্ঞতা থেকে Culshaw জনৈক সাঁওতাল গ্রাম প্রধানের জবানি উল্লেখ করে লিখেছেন, "...there are no others who are greater than us. You can see that from the fact that even today our womenfolk will not eat rice that has been cooked by Brahmins. Formerly, when our menfolk ate Hindu rice they were made to sleep outside for one night; they could not sleep with their wives". এই উক্তির অবস্থান এক দিকে যেমন শ্রীনিবাসনের 'সংস্কৃতায়ন' তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীতে, অন্যদিকে নৈতিকতার মানদণ্ডে নিজের সমাজে নারীর উচ্চাবস্থানের সঙ্গে হিন্দুদের তুলনা করে তারা বলে, "When the Deko (non-Santals) put out their lamps at night they have no sense of what is right and wrong. They respect no one, whether their younger brother's wife, elder brother's wife, their own sister or any one else, they do not respect any of their relations by marriage" (W. J. Culshaw, *Tribal Heritage, A Study of the Santals*; London, 1949, P. 16)। পাঠক ভেবে দেখতে পারেন হিন্দু নারীর অসহায়তা সম্পর্কে আদিবাসী দৃষ্টিভঙ্গির যাথার্থতা।

এই সমাজের অলস পুরুষতন্ত্রে নারীর প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেই তাকে সমাজভুক্ত করে রাখার বিভিন্ন প্রচেষ্টার শেষ ছিল না। আদিবাসী সমাজে নারী পুরুষের পাশাপাশি কাজ করে এ কথা যেমন সত্য, তেমনই সত্য নারীর নিজস্ব জগৎ সৃষ্টির বিরুদ্ধ বেড়াজাল। সাঁওতাল বিদ্রোহের আলোচনায় ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে দেখিয়েছেন যে, এই বিদ্রোহে পুরুষদের পাশাপাশি নারীর ভূমিকাও কোনও অংশে কম উল্লেখযোগ্য নয়, যদিও ইতিহাসে সে কথা খুব কমই আলোচ্য। বাস্কে মহাশয়ের এ মন্তব্য খুবই সঙ্গত, "...দেখা যায় যে সাঁওতাল সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার পিছনে প্রধান ভূমিকা মেয়েদেরই।" (ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, সাঁওতাল বিদ্রোহে নারীসমাজের ভূমিকা, *গণশক্তি*, ৩০.৭.১৯৫২)। বিদ্রোহ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিকার দলের অনুবর্তী হত মেয়েরা। অনেক সময় পুরুষের বেশে তারা সরাসরি লড়াই করেছে ইংরেজ সেনার বিরুদ্ধে। উপরন্তু আহতদের শুশ্রূষায় ও গুপ্তচরের ভূমিকাতেও তারা নিয়োজিত ছিল। সিধুর স্ত্রী সুমী মেঝেন, কিংবা ডাটা মাঝির মেয়ে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিতে পিছপা হয়নি (পূর্বোক্ত)। বিদ্রোহের পর বন্দি হিসাবে পুরুষদের মতো শত শত নারী শিশুসন্তান সহ কারাবরণ করেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *অরণ্যবহ্নি* উপন্যাসে বিদ্রোহে নারীর ভূমিকার আরও কিছু পরিচয় পাঠক পাবেন।

কিন্তু বিদ্রোহ ইত্যাদি তো আকস্মিক ঘটনা, চলমান জীবনের নিত্যদিনে সাঁওতাল রমণীর মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা কতটুকু? পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে সাঁওতাল সমাজের রাজনৈতিক কাঠামো বা ধর্মে নারীর স্থান নেই বললেই চলে। জনৈক গবেষকের এই মন্তব্য যথার্থ যে, 'Santal religion is essentially a man's religion' (Devnathan and Goind Kelkar; *Gender and Tribe: Women, Land and Forests in Jharkhand*, Kali for Women, New Delhi, 1991, P. 91)। হিন্দু নারীদের সম্পর্কে সাঁওতালরা কটাক্ষ করলেও ধর্মের ক্ষেত্রে নারীদেবীর যে প্রাধান্য হিন্দু সমাজে বর্তমান তা কিন্তু সাঁওতাল সমাজে 'জাহের থান' ব্যতীত একেবারেই অনুপস্থিত। উপরন্তু স্বমহিমায় উজ্জ্বল সৌন্দর্য চেতনায় উদ্ভাসিত সাঁওতাল নারীকে অবদমিত রাখার অন্যতম উপায় বেছে নেওয়া হয়েছিল ডাইনি প্রথার মাধ্যমে। অলৌকিক বা আধিভৌতিকে বিশ্বাস আদিবাসীদের মধ্যে প্রবল এ কথা ঠিক কিন্তু পশ্চিমি ঐতিহাসিকরা যখন এই বিশ্বাসকে বর্বরতার অন্যতম উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করেন তখন তাঁরা ভুলে যান যে ইউরোপীয় ইতিহাসের একটা পর্যায়ে ডাইনি হত্যা ছিল এক স্বাভাবিক জিনিস। অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের উৎপত্তির কারণ এ দেশে বা ও দেশে একই। যুক্তিবাদের বিবর্তনের একটি স্তরে সাঁওতালরা যে আটকে আছেন তার দায়িত্বও বর্তায় পশ্চিমের জাত্যাভিমানী ঔপনিবেশিক শাসনে। সাঁওতাল উপকথা 'মারে হাপেরাম রেয়াক: কথা'য় বলা হচ্ছে যে মারাং বুরু ডাইনি বিদ্যা পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত রেখেছিলেন, কিন্তু সুকৌশলে মেয়েরাই সেটা আগে শিখে নিয়ে পুরুষদের উপর আধিপত্য চালাচ্ছে। নারী আধিপত্য অসহ্য হওয়ায় তারা প্রতিকারের উদ্দেশ্যে স্বয়ং মারাংবুরুর কৃপাপ্রার্থী হয়। তিনি বলেন যে, রক্ত দিয়ে শালগাছকে চিহ্নিত করলে ইপ্সিত ফল লাভ হবে। ছদ্মবেশে গোপনে অনুসরণকারী নারীরা এ কথা শুনে ফেলে মারাংবুরুর ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে এবং নারীরা পেয়ে যায় ডাইনি বিদ্যার গোপন হদিশ। বলা বাহুল্য পুরুষবেশধারী নারীদের মারাংবুরু চিনতে পারেননি। পরে নারীদের এই মিথ্যাচারে অসন্তুষ্ট হয়ে সাঁওতাল দেবতা পুরুষদেরই ডাইনি চিহ্নিত করার একমাত্র অধিকারী করেন আর তার ফলে 'ওঝা' মাত্রেই পুরুষ, আর ডাইনি মাত্রেই নারী (*হরকরেন মারে হাপরামকো রিয়াক কথা*: পি. ও. বোদিং কর্তৃক অনূদিত, দিল্লি, ১৯৪২, পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৪, পৃ. ১৬২-৬৪)।

সম্ভবত মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরের কোনও এক সময়ের কাহিনি এটি। সমাজতত্ত্ববিদরা মনে করেন যে, নারীশক্তির প্রাধান্যজনিত ভীতি থেকে উদ্ভব ডাইনি চেতনা। মনে রাখা দরকার যে, ছোটনাগপুরের মতো আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রকৃতির সঙ্গে নারীর সম্পর্ক ছিল গভীর। জ্বালানি সংগ্রহ থেকে ঔষধি বৃক্ষ সব বিষয়েই মেয়েরা ছিল বিশেষজ্ঞ (Bosu Mullick, Gender Relations and Witches Among the Indigenous Communities of Jharkhand in G. Kelkar etc ed: *Gender Relations in Forest Societies in Asia, Patriarch at Odds*; New Delhi, 1991, p. 120)। জ্ঞান ও কর্মের অপ্রতিরোধ্য এই শক্তিকে পরাহত করার জন্য ডাইনি হয়ে দাঁড়াল পুরুষতন্ত্রের এক অস্ত্র। ক্রমে তা কালান্তরে পরিণত হয় অন্ধ বিশ্বাসে যার থেকে মুক্ত ছিল না স্বয়ং

নারীরাও। ঈশ্বরের দ্বারা এই শক্তিশালিনীরা যাতে আরও শক্তিশালী না হয় তার জন্য ঈশ্বর প্রার্থনা এমনকী ধর্মাচরণেও নারীর প্রতি জারি হল নিষেধাজ্ঞা। তথাকথিত egalitarian বা সমতাভিত্তিক সাঁওতাল সমাজেও নারী-পুরুষ সমতা হল সুদূর পরাহত।

ঔপনিবেশিক যুগের প্রতিক্রিয়ায় প্রথাভিত্তিক সাঁওতাল সমাজের যে ভাঙন সূচিত হয়, তার পরোক্ষ প্রভাবে নারী অধিকার আরও সংকুচিত হয়ে ডাইনি চিহ্নিতকরণের পথ প্রশস্ততর এক পরিসর লাভ করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এক দিকে যেমন ভূমির উপর সাঁওতালদের যৌথ মালিকানা স্বত্বে আঘাত হানে, অরণ্যের অধিকার হরণ করে সৃষ্টি করে ব্যক্তিগত মালিকানার, অন্য দিকে মহাজন ও বাজার অর্থনীতির অনুপ্রবেশ নারীদের জমির উপর প্রথা সম্মত অধিকারেও হস্তক্ষেপ করে। এই সমাজে বিধবা এবং নিঃসঙ্গ নারীর জমির উপর অধিকার ছিল এক স্বীকৃত প্রথা। এই সব নারীদের ডাইনি চিহ্নিত করে হত্যার ঘটনা আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই হত্যাকারীরা হত সেই নারীর আত্মীয় (H. Coupland, *Bengal District Gazetteer*, Manbhum, 1911, Calcutta, p. 74)। একজন গবেষক সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, "Greater incidence of witch killings among the Santals could thus be explained by the fact that their women had traditionally enjoyed a higher order of rights in land." (Nathan and Kelkar; 'Gender and Tribes', in E.P.W, Oct 31 Nov 6 1998, p. 96)। প্রায় একই রকম পর্যবেক্ষণ থেকে Archer দেখিয়েছেন যে, সাঁওতাল পরগনায় ১৯০৬-এ ভূমি বন্দোবস্তের হিসাব অনুযায়ী জমির স্বত্বে নারীদের সংখ্যা ১৯২২-এর সংশোধিত ভূমি বন্দোবস্তের তালিকায় কমে যায়। সেখানে অন্যান্য নারীদের বাদ দিয়ে শুধু বিধবা ও একক খোরপোশদার নারীদের স্বত্ব স্বীকৃত ছিল। এই সময় থেকেই অবশ্য বিধবা নারীদের কন্যারা এবং সাধারণ কন্যা সন্তানেরা মায়ের ও পিতার সম্পত্তির দাবিদার হয়ে আদালতে মামলা শুরু করে। কাজেই ডাইনি হিসাবে বিধবাদের হত্যা করেও সম্পত্তি হস্তগত করা ক্রমশ অসুবিধাজনক হয়ে ওঠে (W. G. Archer, *Tribal Law and Justice; A Report on the Santals*; New Delhi, 1984; pp. 684-85)। অরণ্যের অধিকার সংকুচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওঝাদের পক্ষে ঔষধিবৃক্ষের মূল, পাতা বা ফল সংগ্রহ দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়, স্বাভাবিকভাবে রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে তারা অসহায় হয়ে পড়ে, কিন্তু এ তাবৎকালের সামাজিক মর্যাদা রক্ষার দায় থেকে তারা বিভিন্ন রোগ বা অপঘাত মৃত্যুর জন্য ডাইনিকেই চিহ্নিত করতে থাকে। আশ্চর্য এই যে ডাইন হিসাবে কদাচিৎ চিহ্নিত হতেন পুরুষরা।

পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতার দ্বান্দ্বিক পথেই উত্তরিত হয় ইতিহাস, আর আদিবাসী রমণীজীবনও নয় তার ব্যতিক্রম। সাতচল্লিশ পরবর্তী ঘটনাবলিতে আদিবাসী জগতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে খুব শ্লথগতিতে হলেও ঘটতে থাকে পরিবর্তন। সর্বজনীন ভোটাধিকারের প্রবর্তনে একদিকে নির্বাচনী রাজনীতি, অন্য দিকে শিক্ষার প্রসার তাদের অনেকটাই তথাকথিত মূল স্রোতের কাছাকাছি নিয়ে আসে। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্বও ছায়া ফেলতে শুরু করে। নির্বাচনী রাজনীতির বাধ্যবাধকতায় সব রাজনৈতিক দলই কুপ্রথাকে

আঘাত করতে ইতস্তত করলেও আদিবাসী সমাজের ভিতরেও আসছিল পরিবর্তন। ঔপনিবেশিক যুদ্ধের সময় থেকেই আদিবাসী গ্রামসমাজের ভাঙন মাঝি প্রথাকে (Headmanship) আঘাত করায় নারীর উপর সামাজিক নিপীড়ন অনেকটাই শিথিল হয়ে আসে। কয়লাখনি, খাদান বা চা বাগানে কর্মরতা নারীরা কৃষিভিত্তিক গ্রাম সমাজের আধিপত্যের বাইরে চলে যায়। সেখানে অবশ্য তারা অন্য ধরনের শোষণের শিকার হয়, যে শোষণ সার্বিকভাবে আধুনিকায়িত ধনতান্ত্রিক শাসনের অনিবার্য পরিণতি। ডাইনি হিসাবে মৃত্যুর পরিবর্তে পতিতাবৃত্তির বিষপানে তারা বাধ্য হয়। জানগুরু বা ওঝার পরিবর্তে সে-সমাজ শাসন করে আড়কাঠি বা ঠিকাদার। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সুন্দরলালদের (*বীতংস*) ধারাবাহিকতায় কোনও ছেদ পড়ে না। পরিবর্তনের ধারায় শিক্ষার সুযোগে যে নতুন এলিট আদিবাসী শ্রেণির সৃষ্টি হয় তাঁরা গ্রাম পরিত্যাগ করে শহরবাসী হন এবং অবশ্যই সেই সমাজের নারীরা পুরুষতান্ত্রিক শোষণের পুরনো ধারা থেকে অব্যাহতি পান। আর পিছনে যে গ্রাম সমাজ পড়ে থাকে, যা কিনা ঘরেও নয় পাড়েও নয়, সেখানে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতায় ক্রমশই ঘনীভূত হতে থাকে এক সংকট, শুধু নারীর নয়, সার্বিক। সে সংকট এক আত্ম-পরিচয়ের সংকট। মনে রাখা দরকার যে, উত্তর আধুনিকতায় নারীর স্ব-ক্ষমতায়নের আলোচনার আধিক্যে ইতিমধ্যেই বিচ্ছিন্ন আদিবাসীরা যেন আরও এক নতুন বিচ্ছিন্নতার শিকার না হয়।

গত শতাব্দীর নব্বই-এর দশকের সূচনা থেকে আমূল বদলে যেতে থাকা সার্বিক অস্তিত্বের সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে বিচ্ছিন্নভাবে আদিবাসী নারীর ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজনীয়তা কতখানি সে কথা বিতর্কিত। এই সত্য আজ প্রতিভাত যে শুধু নারী নয়, এই সংকটের মুখোমুখি আজ এক বিরাট জনগোষ্ঠী যারা প্রতিনিয়ত বিচ্ছিন্ন হয়ে চলেছে বহুজাতিক সংস্কৃতির নয়া উপনিবেশবাদের প্রবাল্যে। বিশ্বায়নের নামে বেনে দানবের একচ্ছত্র আধিপত্যে আজ যেখানে জন্ম, সেখানে পা রাখার ভূমি চৌপাট। আনন্দ নয়, উত্তেজনার খোরাক জোগায় টিভি আর ভিডিও। বাজারি সংস্কৃতির প্রবল উপস্থিতিতে পিছু হটে যায় গ্রামীণ সংস্কৃতির লেটো, ভাদু আর কবিগান, আর আদিবাসী সংস্কৃতির করম, বাঁদনা আর সেহরাই উৎসব। এই দুর্দিনে তাই একক ভাবে আদিবাসী নারী খুঁজে পাবে না তার মুক্তির পথ। নিজস্ব গণ্ডির সন্নিকট বৃত্তকে অতিক্রম করে তাকে আজ মিলতে হবে সেই বৃহত্তর জনতার সঙ্গে যারা তারই মতো একই বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার শিকার। নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকট যখন রূপায়িত হয় অস্তিত্বের সংকটে তখন সম্প্রদায়গত সংহতির পরিবর্তে প্রয়োজন আরও বৃহত্তর সংহতির। ইতিহাসের অনিবার্যতায় পুঞ্জীভূত অসহায়তাই শেষ কথা নয়, শুধু প্রতীক্ষা সেই অন্তিম লগ্নের যখন কাল তার নিজস্ব নিয়মে বহন করে আনবে যুগান্ত।

সৈয়দ তানভীর নাসরীন

মুসলমান, বাঙালি ও নারী: সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ

ইসলাম ধর্মের নির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিকতার ধারা ও তার দ্বারা পরিচালিত জীবনচর্যার অনুসারীদের বোঝাতে 'মুসলমান' শব্দটির যে ব্যবহার, তা সাধারণত এই সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেছে এমন মানুষজনের সত্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর ফলে একজন মানুষের জীবনে তাঁর ধর্মীয় পরিচিতিটুকু ছাড়া, অন্যান্য যে সমস্ত পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য থাকে, তা উপেক্ষিত হয়। ধর্মকেন্দ্রিক এই পরিচিতি, অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ 'পৃথক' রূপে মুসলমানদের চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।

ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের যে পাঠে আমরা অভ্যস্ত, সেখানেও ভারতীয় উপমহাদেশের এই ধর্মাবলম্বী সমস্ত মানুষকে সমপর্যায়ভুক্ত করে তাদের রাজনৈতিক সত্তার নির্মাণ, সাম্প্রদায়িকতাবাদের উত্থান ও বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবণতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সেখানে এই ধর্মে জন্মগ্রহণকারী মানুষদের পক্ষে অন্য মতাদর্শ পোষণ ও রাজনৈতিক ধারায় যোগদান ব্যতিক্রমরূপেই পরিগণিত।

১৯৪৭-উত্তর পর্বেও 'মুসলমান ভোটব্যাংক', 'সংখ্যালঘু তোষণ', 'মাইনরিটি সেন্টিমেন্ট' জাতীয় শব্দবন্ধ যখন রাজনৈতিক এবং বুদ্ধিজীবী মহলে অকাতরে ব্যবহৃত হয়, সেখানেও আপামর মুসলমানের জীবনদর্শন, আশা ও হতাশা পরিমাপের মানদণ্ড তার ধর্ম। একজন মানুষের জীবনে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, সেটি তার জীবনে একমাত্র নিয়ন্তা হতে পারে না। একই ধর্মানুসারী হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষের মুসলমানরা যেমন মধ্যপ্রাচ্য অথবা ইউরোপের কোনও দেশের মুসলমানদের থেকে আলাদা, ভারতীয় মুসলমানরা তাঁদের রাজ্যগত অবস্থানভেদেও একে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র। এ দেশে মুসলমান সমাজের বিন্যাসে বহু ক্ষেত্রে সনাতন বর্ণপ্রথার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ[১]; আবার পারিবারিক কাঠামো, আত্মীয়সম্পর্ক এবং বিবাহরীতি[২], ধর্মাচরণ[৩] প্রভৃতিতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রতিবেশীদের উল্লেখযোগ্য প্রভাব আছে।

বাঙালি মুসলমানরা ধর্মের ভিত্তিতে যেমন অন্য মুসলমানদের সমপর্যায়ভুক্ত, তেমন একই সঙ্গে তাঁরা বাংলার বাসিন্দারূপে তার ইতিহাস, ভূগোল, রীতিনীতি, ভাষা ও সংস্কৃতির

উত্তরাধিকারী। বাংলায় (অবিভক্ত, পশ্চিমবঙ্গ ও অধুনা বাংলাদেশ সহ বৃহত্তর বাংলায়) বসবাসকারী মুসলমান মাত্রেই বাঙালি মুসলমান নন। ইসলাম ধর্মাবলম্বী যে কোনও মানুষ কর্মসূত্রে বাংলায় এসে বাস করতে পারেন, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ভাষা-সংস্কৃতি-জীবনচর্যা তাঁদের বাঙালিত্ব অর্জনের পথে অন্তরায়স্বরূপ হতে পারে। বাঙালিত্ব অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রক্রিয়াটি কখনও স্বতঃস্ফূর্ত, কখনও বা স্বতঃস্ফূর্ত নয়। অন্তরায়গুলিও কখনও স্বাভাবিক, কখনও সযত্নলালিত।

বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচলনের সূত্র সম্পর্কে কয়েকটি প্রধান ধারা আছে।[৪] তার মধ্যে একটি তত্ত্ব এই যে প্রাক-ইসলামি যুগের বাংলায় নিম্নতর জাতি ও শ্রেণিভুক্ত মানুষরা এক গভীর বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার ছিলেন; ইসলামি সাম্যবাদী ধর্মদর্শন তাঁদের একটা সম্মানজনক বিকল্পের সন্ধান দিয়েছিল। ফলত বাংলার সেই সমস্ত মুসলমান, যাঁদের ভাষা-সংস্কৃতি-রীতিনীতি অনেক বেশি 'বাঙালি', তাঁদের থেকে আদবকায়দা, পোশাক, ভাষা ইত্যাদির ব্যবহারে একটি সচেতন পার্থক্য পালন করে এক শ্রেণির মানুষ তাঁদের 'শরাফতি' বা আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন; বোঝানোর চেষ্টা যে তাঁরা ধর্মান্তরিত, স্থানীয়, নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ নন!

বরিশালের শায়েস্তাবাদ-নবাব পরিবারের কন্যা ছিলেন সুফিয়া কামাল। তিনি যখন বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি একটা আত্মিক টান অনুভব করে বাংলাভাষায় লিখতে শুরু করলেন, তখন, তাঁর নিজের কথায়, "আমি বাংলা শিখেছি, আমার বাংলা লেখা বেরিয়েছে, বাংলা অক্ষরে আমার নাম ছাপা হয়েছে। এতে সবাই আমার ওপর রুষ্ট হলেন।... আমার পরিবারের কেউ চাইত না, আমি লিখি।... আমি, আমার মা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম পরিবার থেকে (১৯৩৩ সাল)। কারণ বাংলা লেখালেখি, বাংলায় কথা বলা, বাঙালিদের সঙ্গে মেলামেশা, সমাজসেবার জন্য পর্দা ছাড়া বোরখা ছাড়া বাইরে বের হওয়া, আমাদের পরিবারের জন্য বেইজ্জতির ব্যাপার ছিল। আমাদের পরিবার একেবারে লজ্জায় ঘেন্নায় আমাদের দিকে ফিরে চাইত না।"[৫]

অভিজাত নন, এমন অনেকের মনেও, আভিজাত্য প্রতিষ্ঠার উচ্চাশা ছিল। যেমন, হামিদা খানমের *ঝরা বকুলের গন্ধ* নামক আত্মজীবনীতে একটি কৌতুককর কাহিনির উল্লেখ আছে। জনৈক গোয়ালার মা 'সবুরনের দাদি', মিউনিসিপ্যালিটির টিউবওয়েলের পাশে বসে বাসন মাজত। হামিদা খানম লিখছেন, "আমরা দাদিকে দেখলেই একটু দাঁড়াতাম। তারপর দাদিকে জিজ্ঞাসা করতাম তার দেশ কোথায়।... দাদি বলতো, 'আমাদের দেশ তো এখানে লয়, আরবে।' খুব মজা লাগত দাদির কথা শুনে। দাদি বাংলায় কথা বলে, পাবনায় বাস করে, দেশ বলে আরবে।"[৬]

হিন্দুত্বের সঙ্গে বাঙালিত্বকে সমার্থক না করে, 'বাঙালি' ও 'মুসলমান', এই দুই পরিচিতির ভারসাম্য রক্ষার এক আন্তরিক সমন্বয়ী প্রচেষ্টা ছিল আর এক দল মানুষের। ফারসি-আরবি-উর্দুর সঙ্গে তৎসম বাংলা শব্দের অকাতর মিশ্রণে সৃষ্ট 'ইসলামি বাংলা' নামক বাংলাভাষার একটি স্বতন্ত্র ধারার মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানের সক্রিয় সামাজিক নির্মাণের পদ্ধতিটি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।[৭]

'বাঙালি মুসলমান মহিলা' বিষয়টিও এ রকম দ্বিধাদীর্ণ। 'নারীর মর্যাদা', 'নারীর অধিকার' ইত্যাদি সাম্প্রতিক কালে বহু ব্যবহৃত শব্দবন্ধগুলির সৌজন্যে নারী বিষয়ক প্রেক্ষাপটটিও আপাতভাবে সমসত্ত্ব হয়ে ওঠে। 'নারী' শব্দটির বিস্তৃত পরিধির মধ্যে বাস করে অজস্র নারী। সেখানে তাঁর সত্তার নির্মাণে ধর্ম ছাড়াও আরও অনেকগুলি উপাদান ক্রিয়াশীল।

যেমন, একজন নারী কোথায় বাস করেন, গ্রাম, মফস্‌সল, শহর না কি মহানগরে, তার সঙ্গে তাঁর সামাজিক/শ্রেণিগত অবস্থান, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, স্বাধীনতা ও পারিবারিক প্রেক্ষাপট, পরিবারের মধ্যে তাঁর অবস্থান, অর্থাৎ তিনি কন্যা, বধূ না মাতা, পুত্রসন্তানের জননী না কেবলই কন্যার জন্মদাত্রী, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা মিলে গড়ে ওঠে একক নারীর অস্তিত্ব। আবার একই প্রতিবেশে বাস করায়, একই আর্থ-সামাজিক অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হবার কারণে, একই পেশায় থাকার কারণে বা এক ধরনের দায়িত্ব-অধিকার, সুযোগসুবিধা ভোগ এবং অনিশ্চয়তা-উৎপীড়ন-বঞ্চনার শিকার হবার কারণে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে সমদৃষ্টিসম্পন্নতা বা ঐক্যবদ্ধ হবার ক্ষেত্র তৈরি হয়। এই ক্ষেত্রগুলি সব নারীর জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

যেমন, শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে নয়, যত বেশি সংখ্যায় কাজের হাত, তত বেশি উৎপাদন ও উপার্জনের সম্ভাবনায় নিম্নতর অর্থনৈতিক শ্রেণিভুক্ত শ্রমিক নারীর কাছে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব নাও গ্রহণযোগ্য হতে পারে। ধর্মসত্তার মতোই, শুধুমাত্র লিঙ্গসত্তার ভিত্তিতে সমতাবিধানের চেষ্টা অনৈতিহাসিক।

এ সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশের সরকারি উদ্যোগে গঠিত কমিটিগুলির প্রতিবেদনে প্রায়শই একটি সাধারণীকৃত মন্তব্যের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যেমন, ফুলরেণু গুহ-র নেতৃত্বে গঠিত Committee on the Status of Women in India-র প্রতিবেদন *Towards Equality*-তে বলা হয়েছিল, "The meaninglessness of national and state averages in determining the actual condition and status of women in the country, in the context of the gross inequalities and wide variations in socio-economic factors that influence women's lives..."[৮] এই প্রতিবেদনেই আবার সর্বস্তরের মুসলমান মহিলাদের একই পর্যায়ভুক্ত করে বলা হচ্ছে, "Apart from the lower literacy rates among Muslim women, our survey of minority communities definitely revealed that the number of Muslim women with no formal education continues to be very high in the states which have otherwise progressed considerably in the development of women's education (e.g., Kerala)".[৯]

বাঙালি মুসলমানদের মধ্যেও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক শ্রেণির অস্তিত্ব সাপেক্ষে আমরা এখানে শুধুই মধ্যবিত্ত 'ভদ্র' শ্রেণিটির কথা আলোচনা করছি। 'ভদ্র' কারা, এ বিষয়ে শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিত্ত কৌলীন্যের মাত্রায় সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা হয়েছে ইতিহাসে।[১০] এই দর্পণে নারীকে বিম্বিত করেই গড়ে উঠেছে ভদ্রমহিলার সংজ্ঞা। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার অনুপাতে খুব নগণ্য হলেও এই বাঙালি মুসলমান এবং তার ভদ্রমহিলা আমাদের বর্তমান আগ্রহের বিষয়।

ভারতবর্ষে একটি বৃহত্তর ইতিহাসের পরিসরে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখটির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলার ইতিহাসে দেশভাগ ও স্বাধীনতালাভ যে প্রভূত পরিবর্তন সূচিত করেছিল, তার অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া গিয়েছিল ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের পর থেকেই। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় সম্প্রদায়ের নারীদের সত্তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের শিকার হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে মূলত নিরাপত্তার খোঁজে হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে মুসলমান 'ভদ্রলোক'-রা পূর্ববঙ্গে চলে গিয়েছিলেন, পর্যালোচনা করলে তার কয়েকটি কারণ পাওয়া যায়।

প্রধানতম আকর্ষণ অবশ্যই ছিল স্বধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার আহ্বান, যার সমস্ত পরিকাঠামো নতুন করে তৈরি হচ্ছিল। হিন্দু প্রতিদ্বন্দ্বীহীন কর্মক্ষেত্রে সহজ সাফল্যের অব্যর্থ ফর্মুলায়, উন্নতির সম্ভাবনা বিচার করে বহু সরকারি আধিকারিক, শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, প্রযুক্তিবিদ ও ব্যবসায়ী পাকিস্তানে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। জীবিকা-কেন্দ্রিক এই মধ্যবিত্ত মুসলমানদের অনেক ক্ষেত্রে কোনও পিছুটান ছিল না। যাঁদের ছিল, তাঁদের মধ্যে যাঁরা অনায়াসে সম্পত্তি বদল বা বিক্রি করতে পেরেছিলেন, তাঁদের পক্ষে দেশত্যাগ সহজতর হয়েছিল।

ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে ইসলামি রাষ্ট্রতত্ত্বও অনেককে এ ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেছিল। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন মুসলিম লিগের সক্রিয় সমর্থক বা কর্মী। ধর্মীয় পবিত্রতা (পাক) ও ইসলামি সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে গঠিতব্য এক অভিনব রাষ্ট্রব্যবস্থার কল্পনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বহু মানুষ। এঁদের অনেকেই ছিলেন আধুনিক, শিক্ষিত তরুণ, যাঁরা প্রজন্মলালিত ধর্মীয় সংস্কারের কারণে নাস্তিক্যবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি। আবুল ফজলের *রাঙা প্রভাত* (চট্টগ্রাম, ১৯৫৭), আবু রুশদের *নোঙর* (চট্টগ্রাম, ১৯৬৭) উপন্যাসের নায়করা এই প্রবণতার উদাহরণ। দেশভাগের সময় যাঁরা পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে যাননি, পরবর্তী দুই দশক ধরে বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তাঁদের প্রাণ ও সম্পত্তি আক্রান্ত হওয়ার ফলে নিরাপত্তার সন্ধানে তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানে গেছেন। এই ধারাটি অব্যাহত ছিল ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত। যাঁরা প্রত্যক্ষত আক্রান্ত হননি, তাঁদের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল এক জটিল মনস্তত্ত্ব। গভীর নিরাপত্তাহীনতা থেকে যে কোনও মুহূর্তে আক্রান্ত হওয়ার ভয় পেয়েছিলেন তাঁরা। অন্য সম্প্রদায়ের সহকর্মী বা প্রতিবেশী পরিচিতজনের চোখে তাঁরা যে 'ঘৃণা' দেখেছিলেন

অথবা কল্পনা করেছিলেন, তা জিঘাংসায় পরিণত হওয়ার আগেই তাঁরা এ দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নদিয়ার জনৈক বাস্তুকার ইউসুফ আলি তাঁর হিন্দু প্রতিবেশীদের চোখে এক ধরনের নীরব ভর্ৎসনা অনুভব করেই এ দেশ থেকে চলে গিয়েছিলেন, তাঁর দিনলিপি থেকে এ কথা জানা যায়।[১১] ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ বা 'দেশমাতৃকার অঙ্গচ্ছেদনের বিনিময়ে স্বাধীনতা', দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করেছিল। এই বিরুদ্ধতা প্রায়শই বিরূপ আচরণ বা অপ্রীতিকর মন্তব্যের মাধ্যমে ফুটে উঠত। আলিপুর আদালতের প্রেক্ষিতে এই অবস্থাটির বিবরণ চিত্রিত আছে আবুল মনসুর আহমদের লেখায়।[১২] অনেক সময় বিশেষ কাউকে উদ্দেশ করে বলা না হলেও, এই ধরনের আলোচনা থেকে সৃষ্ট অনভিপ্রেত অস্বস্তি এড়াতে 'স্বধর্ম'কে আশ্রয় করে 'স্বদেশ' ছেড়েছিলেন তাঁরা।

তা ছাড়া পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা এবং মফস্‌সল শহরগুলি থেকে যে বাঙালি মুসলমানরা উচ্চশিক্ষা এবং চাকরির কারণে কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহরে এসেছিলেন, অবশ্যম্ভাবী দেশভাগের কথা জেনে তাঁরা ফিরে গিয়েছিলেন নিজেদের শিকড়ের কাছাকাছি। ১৯৪৭ সালের আগে অবিভক্ত বাংলায় যে মুসলমান মহিলারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপুল কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশের বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে।

প্রাক্-১৯৪৭ পর্বে কলকাতায় মেয়েদের হস্টেলগুলিতে পূর্ববঙ্গের মেয়েদের প্রাধান্য ছিল। কলকাতার মেয়েদের হস্টেলে থাকার প্রয়োজন হত না। কিন্তু হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েরাই কলকাতায় পড়তে আসতেন প্রধানত পূর্ববঙ্গ থেকে। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে পূর্ববঙ্গ অধিকতর অগ্রসর ও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল এ রকম মনে করার কোনও কারণ নেই। অপরপক্ষে, সেখানে স্ত্রীশিক্ষার অনুকূল পরিকাঠামো, পরিবেশ বা মানসিকতা, কোনওটাই ছিল না। হামিদা খানম লিখেছেন, "বিজলীদি (ডা. আসমা খাতুন)-র কাছে গল্প শুনেছি তিনি ও রাবেয়াদি (রাবেয়া আলী, লেখক সৈয়দ মুজতবা আলীর স্ত্রী) রাজশাহীতে যখন স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়তেন, তখন তাঁদের পড়া বন্ধ করার জন্য পাড়ার কিছু লোক বাড়ির দেওয়ালে তাঁদের নামে কুৎসা লিখে রাখত।"[১৩] মেয়েদের লেখাপড়া শিখতে স্কুলে পাঠালে সেই পিতাকে নামাজে নিতে অস্বীকার করত কিছু মানুষ, এমন উল্লেখও পাওয়া যায়।[১৪] তবু মেয়েরা থেমে থাকেননি। কলকাতার অপেক্ষাকৃত মুক্ত শিক্ষা পরিবেশে ডানা মেলেছিলেন তাঁরা। হামিদা খানমের লেখাতেই পাওয়া যায়, "আমাদের (বেথুন কলেজের) ... নিউ হোস্টেলে পঁচাত্তরজন ছাত্রী, এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ঢাকার অবস্থাপন্ন ও জমিদার বাড়ির মেয়ে।... হস্টেলে পঁচাত্তরজন ছাত্রীর মধ্যে আমরা চারজন ছিলাম মুসলমান।... রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর, পাবনা এই চার শহর থেকে আমরা চারজন।"[১৫] পঁচাত্তরজন ছাত্রীর মধ্যে চারজন মুসলমান ছাত্রীর উপস্থিতিকে শতকরা হিসাবে সংখ্যাগত মাত্রায় দেখলে তা নগণ্য মনে হতে পারে, কিন্তু বাঙালি মধ্যবিত্তের সামাজিক বিন্যাসে মুসলমান মধ্যবিত্তের এই প্রতিনিধিত্ব অস্বাভাবিক ছিল না। দেশভাগ প্রসঙ্গে বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯২৩ সালে বেথুন কলেজের প্রথম মুসলমান ছাত্রী ছিলেন ফজিলতুন্নেসা (১৮৯৯/মতান্তরে ১৯০৫-৭৬)। তিনিই প্রথম বাঙালি মুসলমান ছাত্রী যিনি ১৯২৮ সালে

উচ্চশিক্ষার্থে বৃত্তিসহ বিদেশযাত্রা করেছিলেন। বিদেশ থেকে ফিরে অল্প দিনের মধ্যে তিনি বেথুন কলেজের অঙ্কের অধ্যাপিকা, পরে সহ-অধ্যক্ষার পদ গ্রহণ করেন। এঁর আদি বাড়ি ছিল টাঙ্গাইলে। ১৯৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার জন্য গঙ্গামণি দেবী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত আখতার ইমামের বাড়ি ছিল ঢাকায়। অবরোধ প্রথা থেকে উত্তরণের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯০৮-৬৪) ছিলেন লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপিকা, তাঁর শিকড় ছিল নোয়াখালি ও চট্টগ্রামে। এই কলেজেরই দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপিকা হামিদা খানমের বাড়ি ছিল পাবনায়। নব্যনির্মিত পাকিস্তানে উন্নতির সম্ভাবনার পাশাপাশি এঁদের ক্ষেত্রে কাজ করেছিল 'ঘরে' ফেরার টান। সম্পত্তিরক্ষার বিষয়টিও এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল।[১৬] এই সমস্ত কারণে দেশভাগের পরে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, বাঙালি মুসলমান সমাজে একটা ভাটার টান লক্ষ করা গিয়েছিল।

অবিভক্ত বাংলায় মুসলমানরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাংলার জনগণনা মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে ৫৩.৫৫ শতাংশ, ৫৪.৪৩ শতাংশ এবং ৫৪.২৯ শতাংশ।[১৭] কিন্তু শিক্ষা বা উচ্চবর্গীয় সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এই সংখ্যাধিক্যের কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল না; কারণ এটি গড়ে উঠেছিল মূলত ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী ডিভিশনগুলিতে তাদের প্রবল সংখ্যাধিক্যের কারণে।[১৮] ঢাকা ও চট্টগ্রামে মুসলমানরা ছিলেন মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশেরও বেশি; রাজশাহীতে অন্তত ৬৪ শতাংশ।[১৯] এঁদের অধিকাংশই বাস করতেন গ্রামে। দরিদ্র শ্রেণির কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষরা যেখানে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের চিন্তায় আকুল, শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা সেখানে অলীক স্বপ্নেরই নামান্তর ছিল।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের পরেও যে বাঙালি মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গে থেকে গিয়েছিলেন, পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাঁরা অনেকে সক্রিয় রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য। মুসলিম লিগের সাম্প্রদায়িক আদর্শের বিরোধী কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে বহু মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান পরিবার এ দেশে থেকে যান। তবে গায়ে দাঙ্গার আঁচ না লাগা পর্যন্তই এই পরিবারগুলি তাদের আদর্শ রক্ষা করতে পেরেছে। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এ রকম বহু আদর্শনিষ্ঠ পরিবার কিন্তু আক্রান্ত হওয়ার পরে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে গেছেন। বর্ধমান জেলার একটি বিখ্যাত রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য আবুল হাশিমের দেশত্যাগের কোনও পরিকল্পনা ছিল না। তিনি ১৯৪৭-এর পরে বর্ধমান শহরের বুকে একটি বসতবাড়ি বানিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৫০-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বর্ধমান শহরে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে বাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। বড়সড় কোনও ক্ষতি না হলেও অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত পরিবারটি এ দেশ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়, নিরাপত্তা খোঁজে আপন ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি রাষ্ট্রে।

দ্বিতীয়ত, সক্রিয় রাজনীতি বা বিশেষ কোনও আদর্শের কারণে নয়, পাকিস্তান নামক নব্যনির্মিত রাষ্ট্রটির দীর্ঘজীবিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেননি বলেই এক শ্রেণির মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান তাঁদের এত কালের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে যেতে সাহস

করেননি। এই মানসিকতা বিধৃত আছে আবু রুশদের *নোঙর* উপন্যাসের দুই ভাই, রহিম ও কামালের সংলাপে।[২০]

তৃতীয়ত, শহরবাসী মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানের জীবনযাত্রার মান অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করত গ্রামের সম্পত্তি ও তৎসম্পর্কিত উৎপাদন ও উপার্জনের উপর। তাই শুধুমাত্র চাকরির বেতনটুকুর উপর নির্ভর করে সম্পূর্ণ অজানা একটি দেশে চলে যাওয়া অনেকের পক্ষে অসম্ভব ছিল। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত হিন্দুরা স্বভাবতই বদল বা ক্রয়ের জন্য শহর এলাকায় অমুসলমান অঞ্চলের সম্পত্তি পছন্দ করতেন। কাজেই সাধারণ বাঙালি মুসলমানের পক্ষে সম্পত্তি বদল বা বিক্রি, কোনওটাই খুব সহজ ছিল না। এ ছাড়াও ছিল যৌথ মালিকানাধীন গ্রামীণ সম্পত্তি, যেখানে সম্পত্তি বিক্রির প্রস্তাবে সবাই সম্মত না হলে, একজন শরিকের পক্ষে তাঁর নিজস্ব অংশটুকু বিক্রি করা অসম্ভব। মুসলমান উত্তরাধিকার আইনের কারণে প্রক্রিয়াটি আরও জটিল হয়ে ওঠে। দেশত্যাগ বিষয়ে উচ্চাভিলাষী শহরবাসী চাকরিজীবী এবং গ্রামবাসী কৃষিজীবী (অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাঁর সাম্প্রদায়িক বৈরিতা বা দাঙ্গার কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না) সহোদরদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। পাশাপাশি সকলের মধ্যেই কমবেশি কাজ করত পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি সম্পর্কে এক ধরনের আবেগসঞ্জাত অধিকারবোধ। সম্পত্তি 'এক্সচেঞ্জ'-এর মনস্থ করে পূর্ব পাকিস্তানে একাধিকবার বাড়ি দেখতে গিয়ে পছন্দ না হওয়ায় ফিরে এসেছেন, এমন অনেক ভদ্রলোকের সংকটের মূল ছিল এই ধরনের মানসিকতায়। দেশত্যাগের ক্ষেত্রে এই উপাদানটিও ছিল প্রবল অন্তরায়স্বরূপ।

বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তদের এই অংশগুলি পশ্চিমবঙ্গে থেকে গিয়েছিলেন; দেশভাগের কারণে একাংশের নির্গমনের ফলে যে শূন্যস্থান সৃষ্টি হয়েছিল, ১৯৪৭-পরবর্তী কালে ইতিহাসের নিয়মে horizontal এবং vertical mobility-র দ্বারা তা পূরণ হতে থাকে। অর্থাৎ, গ্রামের মধ্যবিত্ত শহর অভিমুখে আসার ফলে এবং মেধা, অধ্যবসায় ও ব্যবসায়িক সাফল্যকে সম্বল করে নিম্নতর অর্থনৈতিক শ্রেণিভুক্ত মানুষদের আর্থ-সামাজিক উত্তরণের ফলে আমরা যাঁদের পাচ্ছি, ১৯৪৭-উত্তর কালে তাঁরাই পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমান ভদ্রলোক।

পরবর্তী বিভাগগুলিতে আমি যে নারীদের কথা বলেছি তাঁরা সকলেই কোনও না কোনও সূত্রে এই মূল ধারাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। সমকালীন ইতিহাস চর্চায় অপ্রতুল সরকারি তথ্যের কারণে (বিশেষ করে ১৯৪৭ সালের পরে, 'সংখ্যালঘু'-র সংখ্যালঘু মুসলমান মহিলা বিষয়ক ক্ষেত্রে), দু' বছর ধরে বর্ধমান শহর, বর্ধমান জেলার কয়েকটি গ্রাম এবং কলকাতা শহরে বিভিন্ন বয়সি বাঙালি মুসলমান ভদ্রমহিলাদের যে সাক্ষাৎকারগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল, আমার বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত প্রধানত তার উপরেই ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এখানে কয়েকটি প্রধান বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে মাত্র। সমকালীন ইতিহাসে একটি সক্রিয় সজীব সমাজ সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না, প্রবণতাগুলি চিহ্নিত করাই আমাদের কাজ। নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ পদ্ধতি (intensive interviewing method) তথা 'মুখের কথায় ইতিহাস'-এর এই অনুশীলনে কোনও নিরপেক্ষতার দাবি নেই। যাঁরা

এই বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এবং ধর্ম, সমাজ, শ্রেণি, লিঙ্গ বিষয়ক বিবিধ টানাপোড়েন ও সেই প্রেক্ষিতে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও মতামত জানিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই এই প্রকল্পের 'সোর্স' তথা 'রিসোর্স'।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ আবার নতুন করে এই উপমহাদেশের দৈনন্দিনতায় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অপরিহার্যতা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিল। বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যেই শুরু হয় প্রাক্-১৯৪৭ পর্বের শিক্ষা, জীবিকাভিত্তিক কর্ম, সমাজসেবা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের যাবতীয় প্রাগ্রসরতার উদাহরণ জনস্মৃতি থেকে মুছে ফেলে রক্ষণশীল ধর্মীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার একটা প্রচ্ছন্ন প্রয়াস। সনাতন, রক্ষণশীল ছাঁচে ঢালা এই নতুন আদর্শের সামাজিক নির্মাণে নারীর জন্য আধুনিক শিক্ষা ও অর্থকরী জীবিকাগ্রহণ খুব কাম্য ছিল না। অবশ্য দেশভাগের পরবর্তী প্রায় দুই দশক ধরে প্রকাশিত মুসসমান নারীর আদর্শ আচরণবিধি বিষয়ক পুস্তিকাগুলিতে এ ব্যাপারে সরাসরি কোনও মন্তব্য করা হয়নি। তার পৃথক সত্তাকে চিহ্নিত করার জন্য তার ধর্মাচরণ ও গার্হস্থ্য বিন্যাসের ওপরেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে স্ত্রীশিক্ষাকে গ্রহণীয় করে তোলার অভিপ্রায়ে মাতৃত্ব বিষয়ক প্রতর্কটির অবতারণা করেছিলেন। "যেহেতু মাতার দোষগুণ লইয়া পুত্রগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়," তাই মেয়েদের শিক্ষাদানের নির্দোষ উদ্দেশ্য থেকে তিনি ক্রমে আরও বলিষ্ঠ যুক্তিতে পৌঁছন, "পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয় তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব।... উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই?"[২১] রোকেয়ার স্বপ্নকে সাকার করে প্রাক্-১৯৪৭ যুগেই শিক্ষা, ক্রীড়া[২২] এবং চিকিৎসা ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন যে মেয়েরা ১৯৪৭-উত্তর পর্বে তাঁদের উদাহরণ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হল বাঙালি মুসলমান সমাজ। এই পর্বে ধর্ম বিষয়ক পুস্তিকাগুলিতে আবার সেই মাতৃত্ব বিষয়ক প্রাথমিক প্রতর্কটি কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছিল স্ত্রীশিক্ষার যৌক্তিকতা।

১৯৪৭-এর পরে ঢাকা শহরে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল এবং লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের প্রাক্তনীদের মিলনমঞ্চ প্রতিষ্ঠা এ দেশ থেকে শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য নিষ্ক্রমণের তত্ত্বটিই জোরদার করে এবং এর মধ্যেই পাওয়া যায় স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে এই বঙ্গে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমান মেয়েদের অনুপস্থিতির ব্যাখ্যা। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায়ের মেয়েদের আবার দেখা পেতে কিছু সময় লেগেছিল।

সেই পর্বেও সংখ্যাল্পতা বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ বাঙালি মুসলমান সমাজে মেয়েদের শিক্ষাদানের আর্থিক সঙ্গতি ও অনুকূল মানসিকতা মধ্যবিত্তের (যাঁরা সংখ্যায় খুবই মুষ্টিমেয়) মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। সঙ্গে এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন, আর্থিক সঙ্গতি থাকলেও যে সব মেয়েরা উচ্চশিক্ষা বিষয়ে আগ্রহ ও মেধা প্রদর্শন করবে, এমন নয়।

পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষদের সামাজিক উদাহরণের কথা। ১৯৪৭-এর পরে পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ক যে কোনও আলোচনা-গবেষণায় পূর্ববঙ্গ, পরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা মানুষদের সংগ্রাম ও সাফল্যের কথা স্বভাবতই উঠে এসেছে।[২৩] ছোট গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও অন্যান্য সৃজনশীল কলাক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। ১৯৫১ সালে সলিল সেনের *নতুন ইহুদী* নাটক থেকে শুরু করে নিমাই ঘোষের *ছিন্নমূল* পেরিয়ে ঋত্বিক ঘটকের হাতে এই ইতিহাসের চলচ্চিত্রায়ণ পূর্ণতা লাভ করে। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষদের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৭-উত্তর পর্বে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ খুব দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। গৃহবিন্যাসে অন্দর ও বাহিরের নির্দিষ্ট ব্যবধানও ঘুচে যাচ্ছিল ১৯৪৭-এর পরে।[২৪] ১৯৪৭ সালের সাম্প্রদায়িক-রাজনৈতিক উত্তোলনের পরে শিক্ষার প্রেক্ষিতটাও সম্পূর্ণ পালটে যায়। পায়ের তলার মাটির সন্ধানে, জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে যখন বাধ্যত তাঁদের বেরোতেই হল বাড়ির বাইরে, তখন মেয়েরা উপলব্ধি করেছিলেন এ-বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মানপত্রই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। উচ্চশিক্ষা বিষয়টি আর ঐচ্ছিক রইল না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন ১৯৪৭-এর পরে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য এবং জমির উপর যে চাপ পড়েছিল, সেই যুক্তি দিয়ে কিন্তু ১৯৪৭-পরবর্তী পর্বে স্কুল কলেজে মেয়েদের সংখ্যাবৃদ্ধিকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না।

বাঙাল-ঘটি সামাজিক পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে যতই বিতর্ক থাক, পশ্চিমবঙ্গের নারীর সামাজিক আদর্শ বিন্যাসে পূর্ববঙ্গীয় মানুষদের প্রাথমিক ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। পথটা তাঁদের সকলের জন্যও মসৃণ ছিল না। 'বাহির'-এর সঙ্গে আচরণের পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে তাঁরা নানাবিধ সংকটে দীর্ণ হয়েছেন। বহু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা-উত্তরপর্বে নির্মিত হয়েছে এই 'নতুন নারী'-র সত্তা। *মেঘে ঢাকা তারা* (কাহিনি: শক্তিপদ রাজগুরু, চলচ্চিত্রায়ণ: ঋত্বিক ঘটক, ১৯৬০)-র নীতা, প্রবোধকুমার সান্যালের *হাসুবানু* উপন্যাসের (কলকাতা, ১৯৫২) অন্যতম নায়িকা মীরা, জ্যোতির্ময়ী দেবীর *এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা* উপন্যাসের (কলকাতা, ১৯৬৮) সুতারা চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে এই পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে।

পশ্চিমবঙ্গে এই পর্যায়ে বিস্তার লক্ষ করা যায় সহশিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ছাত্রীদের সংখ্যাবৃদ্ধির তথ্যেও। কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে প্রবলভাবে। ১৯৫২-৫৩ সালে কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১৩৭২, ১৯৫৩-৫৪ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫১৯-এ।[২৫] জনসংখ্যার একটি বিশেষ অংশের তাগিদ এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের শিক্ষা বিষয়ক উদ্যোগের কারণে এগুলির প্রতিষ্ঠা হলেও সব মেয়েরাই এর সুবিধা ভোগ করেছেন। এই প্রাগ্রসর নারীদের সামাজিক দৃষ্টান্ত রক্ষণশীলতাকে অতিক্রম করার বিষয়ে অন্যদের সাহায্য করেছে।

"ঈশ্বর, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।"[২৬] নারীপুরুষ নির্বিশেষে কোরান পাঠকারী সকল ব্যক্তিই এই প্রার্থনা করেন। কাজেই ইসলাম ধর্মে নারীর জন্য জ্ঞানান্বেষণ নিষিদ্ধ এ জাতীয় কথার কোনও ভিত্তি নেই। উপরন্তু, ভবিষ্যতে যাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের বাদ দিয়ে

দেবার সুযোগ কেউ না পায়, তাই অসামান্য দূরদর্শিতা থেকে 'মুসলেমিন' (মুসলমানগণ) বলার পরে 'মুসলেমাতিন' (মুসলমান মহিলাগণ) শব্দটিও আলাদা করে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে।

লক্ষ করা গেছে

ক. ব্যতিক্রমী রকমের রক্ষণশীল স্বল্পসংখ্যক মহিলা,

খ. যাঁরা নিজেরা রক্ষণশীল নন, কিন্তু রক্ষণশীল পরিবেশের (পরিবার, প্রতিবেশী বা সামাজিক বৃত্ত) চাপে পীড়িত, এবং

গ. যাঁদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য সীমিত,

তাঁরা ছাড়া, আজকের বাঙালি মুসলমান মহিলারা, তাঁদের মেয়েদের জন্য শিক্ষা বিষয়ে কোনও আপস করতে রাজি নন। ইংরাজি মাধ্যমে শিক্ষা, সহশিক্ষা এবং চিত্রশিল্প, অভিনয়, নৃত্যগীতাদি চারুশিক্ষা বিষয়েও শুধুমাত্র ধর্মের কারণে কোনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় না। অর্থনৈতিক সম্ভবপরতা, প্রাগ্রসর মানসিকতা, অন্য সম্প্রদায়ের মেয়েদের কৃতিত্বের উদাহরণ, পরিবার বা পরিচিত ধর্মীয়-সামাজিক বৃত্তে পাওয়া কোনও দৃষ্টান্ত, পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধা এবং মিশ্র পরিবেশে বসবাস শিক্ষা সংক্রান্ত ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহায়ক।

মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান ভদ্রমহিলাদের মধ্যে খুব আগ্রহ লক্ষ করা যায় না। হয় তাঁরা এ বিষয়ে অজ্ঞতার অজুহাতে বিনীতভাবে প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যান, অথবা তাঁদের পরিবারের মেয়েদের মাদ্রাসায় শিক্ষার সম্ভাবনাকে সরাসরি নাকচ করে দেন। বর্ষীয়ান ভদ্রমহিলাদের মধ্যে যাঁরা কেউ কেউ মাদ্রাসায় পাঠগ্রহণ করেছেন, তাঁরা বাল্যকালে যে মুসলমান-অধ্যুষিত গ্রামে বাস করেছেন সেখানে আর কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না বলেই তাঁরা মাদ্রাসায় পড়েছেন বলে জানিয়েছেন। নিজের মেয়েদের তাঁরা মূলস্রোতের স্কুলকলেজেই পাঠিয়েছেন। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলেও মাদ্রাসা শিক্ষা নিম্ন অর্থনৈতিক শ্রেণিভুক্ত মানুষদের জন্য বরাদ্দ।

মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে মহিলারা যতটা নির্দ্বিধায় তাঁদের মত ব্যক্ত করেছেন, ধর্মশিক্ষা বিষয়ে ততটা নয়। বাঙালি মুসলমানের সত্তার টানাপোড়েনটি এখানে স্পষ্ট। স্কুলকলেজের পাঠ্য বিষয়সূচির পর্বতপ্রমাণ বোঝা সামলে, সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে, অজানা একটি ভাষা আয়ত্ত করে ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও নিয়মনিষ্ঠ ধর্মচর্যা খুব সহজ ব্যাপার নয়। এই সমাজে মেয়েদের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব অটুট; এঁরা সকলেই গোঁড়া ধর্মভাবে আক্রান্ত নন, অনেকেই আপন সম্প্রদায়ের বৃত্তে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার প্রতর্কটি উত্থাপন করেছিলেন। মুষ্টিমেয় যে মহিলাদের জীবনে ধর্মশিক্ষা বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাঁরা

ক. রাজনৈতিক আদর্শের কারণে পরিবারে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মচর্যা নেই এমন পরিবারের সন্তান (তবে রাজনৈতিক আদর্শ ও ধর্মচর্যার সহাবস্থান আমরা পরের বিভাগটিতেই দেখব), অথবা

খ. আন্তঃধর্মীয় বিবাহের সন্তান, অথবা

গ. পড়াশোনার চাপ কিঞ্চিৎ লাঘব হলে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হবে এই বিবেচনায় পিতামাতা তা স্থগিত রেখেছিলেন এবং ধর্মশিক্ষা গ্রহণ আর কখনও কার্যকরী হয়ে ওঠেনি, অথবা

ঘ. প্রথাগত ধর্মীয় শিক্ষা শুরু করার পরে কোনও পর্বে নিজেরাই এ বিষয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন, তার সঙ্গে এ ব্যাপারে কেউ আর পীড়াপীড়ি করেননি।

সাচার কমিটি প্রতিবেদনে এক জায়গায় বলা হয়েছে, "There is a clear and significant inverse association between the proportion of the Muslim population and the availability of educational infrastructure in small villages... Muslim concentration villages are not well served with pucca approach roads and local bus stops"...[২৭] এই মন্তব্যের যাথার্থ্য নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে কিন্তু একটি গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি যে মেয়েদের শিক্ষাক্ষেত্রে কী বিপুল পরিবর্তন সাধন করতে পারে, তার উজ্জ্বল উদাহরণ বামশোর নামক গ্রামটি। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে সরকারি উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির ফলে গ্রামের সঙ্গে মফস্‌সল, মফস্‌সলের সঙ্গে কলকাতার দূরত্ব কমে এসেছে। ব্যক্তির গতিশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ভাবনাচিন্তা, সচেতনতার স্তরেও ব্যাপক বিস্তার লক্ষ করা গেছে। ১৯৭০-এর দশকের আগে পর্যন্ত বামশোর গ্রামটিতে একটি হাই স্কুলের সৌজন্যে মেয়েদের শিক্ষার চূড়ান্ত পর্যায় ছিল দশম শ্রেণি। সত্তরের দশক থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে (কাটোয়া-বর্ধমান সড়ক পথ নির্মাণ ও বাসের সংখ্যাবৃদ্ধি) অভিভাবকরা আর বিশেষভাবে মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবিত নন; মেয়েরা শহরে পড়াশোনা করে দিনান্তে বাড়ি ফিরে আসতে পারেন। এই গ্রামের স্নাতক মহিলারা নিজেরাই এ কথা তুলে ধরেছেন।

শিক্ষা প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় মনে আসে। ১৯৩০-এর দশকে যখন মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি পৃথক পর্দা-কলেজের দাবি ওঠে (যার ফলশ্রুতি স্বরূপ ১৯৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ), তখন ১৯৩৭-৩৮ সালে বিধানসভার দৈনন্দিন কার্যাবলীর নথি থেকে দেখা যায়, হাসিনা মুর্শেদ প্রমুখ বিধায়করা বারবার তুলে ধরছিলেন ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের হস্টেলে মুসলমান মেয়েদের অসুবিধার কথা।[২৮] বিতর্কে বলা হচ্ছিল এই অসুবিধা সর্বত্রই আছে এবং তার সমাধানে মুসলমান মেয়েদের জন্য পৃথক কলেজ এবং হস্টেল থাকা একান্ত প্রয়োজন। স্বাধীনতা-উত্তরপর্বে ৮০-র দশক থেকে কলকাতা এবং জেলা শহরগুলিতে মুসলমান ছাত্রী আবাস নির্মাণের জোরালো দাবি উঠতে থাকে। এখন প্রশ্ন জাগে, স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ একটি রাষ্ট্রের চিন্তাচেতনায়, প্রাগ্রসর বলে প্রতিষ্ঠিত এক রাজ্যের অধিকাংশ জেলায় মুসলমান মেয়েদের জন্য পৃথক ছাত্রী আবাস নির্মাণ, শুধুই কি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে এই সম্প্রদায়ের মেয়েদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও তাদের উৎসাহ প্রদানের কারণে?

উচ্চশিক্ষায় উত্তরণের প্রক্রিয়াটির সমান্তরালে চলছে স্বীয় সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট বৃত্তে প্রত্যাবর্তন। প্রাক্-১৯৪৭ পর্বে বাংলার একমাত্র মুসলমান ছাত্রী আবাসটি ছিল মানিকতলায়। ১৯৪৬-এর দাঙ্গায় হস্টেলটিতে আগুন লাগানো হয়, যদিও আবাসিকাদের সময়মতো নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

বর্ধমান শহরে বড়বাজার (১৯৮৯) এবং কলকাতায় পার্ক সার্কাসের (১৯৯০) মতো মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলিতে, আপন ধর্মসম্প্রদায়ের নিরাপদ পরিবেশে গড়ে তোলা হস্টেলগুলির উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করে আমাদের রাজনৈতিক-সামাজিক জনজীবনে সাম্প্রদায়িক চেতনার চোরা স্রোতের উপস্থিতি।

কোরানে বলা হয়েছে:

"পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ, এবং
নারী যা, অর্জন করে সেটা তার অংশ।"[২৯]

এ থেকে বোঝা যায় যে পৃথক ভাবে 'সম্পত্তি অর্জন' করার ব্যাপারে ইসলাম নারীর প্রতি কোনও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি। যে রক্ষণশীল মানসিকতা অবরোধ প্রথার সপক্ষে কুযুক্তি বিস্তার করে নারীর অর্থনৈতিক জীবিকা অর্জনের বিষয়ে বাধা সৃষ্টি করেছিল, ১৯৪৭-উত্তর পর্বে তা অনেক অংশেই অপসৃত।

"আমার চাকরি করার প্রয়োজন নেই, তাই আমি চাকরি করি না", নিজেদের আর্থিক সম্পন্নতায় সন্তুষ্ট এমন কয়েকটি অহংকারী নির্ঘোষের পাশাপাশি, "চাকরি করার কোনও পেশাগত যোগ্যতা আমার কখনও তৈরি হয়নি, না হলে অবশ্যই চাকরি করতাম", "চাকরি করা বিষয়ে আমাকে কেউ কখনও বুঝিয়ে বলেনি, যখন বুঝতে পারলাম তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে", "শ্বশুরবাড়িতে (প্রত্যক্ষ রক্ষণশীলতার চাপ বা পরোক্ষ পারিবারিক অসযোগিতার কারণে) আমি চাকরি করতে পাইনি, আমার মেয়ের ক্ষেত্রে কখনও এরকম হবে না"-জাতীয় উক্তিই বেশি শোনা গেছে।

বাড়ির বাইরে চাকরি করতে গেলে পারিবারিক মর্যাদা বা ব্যক্তিগত পর্দা ক্ষুণ্ণ হয়, এরকম কথা এমনকী গ্রামাঞ্চলের তথাকথিত অল্পশিক্ষিত বয়স্ক মহিলারাও বলেননি। বরঞ্চ মেয়েরা চাকরি করলে সংসারে তথা সন্তানপালনে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির কথাটিই বারবার উঠে এসেছে। কলকাতার মুসলিম ছাত্রী আবাসটির ভবন সংলগ্ন টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট-এ মেয়েদের বৃত্তি উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয়, রূপচর্চা ও প্রসাধন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ছাড়াও সূচিশিল্প, টেলারিং ডিপ্লোমা থেকে শুরু করে মেধা ও সাধ্যানুসারে কম্পিউটার অপারেশন পর্যন্ত। ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত All Bengal Muslim Women's Association (যদিও এর কার্যকরী সমিতির অধিকাংশ সদস্যাই অবাঙালি) নামক সংস্থাটি মেয়েদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষানির্ভর একটি স্বনিযুক্তি প্রকল্প গড়ে তুলেছেন। এঁরা বিভিন্ন সময়ে রাজ্যজুড়ে সচেতনতা শিবিরও পরিচালনা করে থাকেন। এছাড়া আছে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম-জাতীয় সংস্থাগুলি। যদিও এই উদ্যোগগুলি প্রধানত অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণির মেয়েদের কথা ভেবে গৃহীত, তবু এটি খুবই উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, যে-সম্প্রদায় সামাজিকভাবে মেয়েদের বিষয়ে অত্যন্ত রক্ষণশীল বলে প্রচারিত সেই সম্প্রদায়ের ভিতর থেকেই এই উদ্যোগগুলি উঠে আসছে।

কর্মক্ষেত্রে মুসলমান মেয়েদের যোগদান বিষয়ে কোনও সরকারি পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। জরি শিল্প, বিড়ি শিল্প, সবজি বাজারে যে-শ্রমিক নারীদের দেখতে পাওয়া যায়,

তাঁরা প্রধানত অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকে এই জীবিকাগুলিতে আসেন; কিন্তু 'মধ্যবিত্ত' মহিলারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের অধীত বিদ্যার প্রয়োগ করতেই কর্মে যোগদান করেন। শিক্ষকতার চিরন্তন সম্মানীয় ক্ষেত্রটুকু ছাড়া সাংবাদিকতা, জনসংযোগ, ওকালতি, প্রযুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসা, নার্সিং, স্বাধীন ব্যবসা প্রভৃতি অপ্রচলিত ক্ষেত্রগুলিতেও তাঁদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে।

কলকাতা মেডিকেল কলেজের স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিদ্যা বিভাগের প্রধান ডা. মুমতাজ সঙ্ঘমিত্রা যখন ষাটের দশকে ওই কলেজের ছাত্রী ছিলেন, একমাত্র মুসলমান ছাত্রীরূপে তিনি অনেকের বিস্ময় উদ্রেক করেছেন; এর তিন দশক পরে যখন তাঁর মেয়ে ওই একই কলেজে ডাক্তারি পড়তে গেছেন, "ততদিনে সকলের চোখ মুসলমান মেয়ের ডাক্তারি পড়ায় ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।"[৩০] মুসলমান ভদ্রমহিলাদের মধ্যে যাঁরা প্রথম প্রজন্ম কর্মসূত্রে 'বাহির'-এর সঙ্গে আদানপ্রদান করছেন, তাঁদের অনভ্যাসজনিত উদ্বেগ কাটিয়ে উঠতে কিছু সময় লাগে। অপরপক্ষে, কর্মক্ষেত্রে যাঁরা প্রথমবার কোনও মুসলমান মহিলার সংস্পর্শে আসছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকের 'মুসলমান' এবং 'মুসলমান মহিলা' বিষয়ক কিছু বদ্ধমূল ভ্রান্তি থাকার কারণে প্রাথমিক আদানপ্রদানে কিছু সংশয় সৃষ্টি হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে তা কেটেও যায়। কৌতুককর এমন অনেক স্মৃতি সমৃদ্ধ করেছে মুসলমান মহিলাদের। পাশাপাশি দেখা যায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রবল ভেদবুদ্ধি প্রয়োগ করা হয়েছে; সেখানে অভিজ্ঞতা স্বভাবতই তিক্ত।

* * * * *

প্রথমবার শুনলে এ কথা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে যে রাজনীতির মতো রণক্ষেত্রে নারীদের যোগদানের বিষয়টি মহম্মদের সময় থেকেই ইসলাম ধর্মে স্বীকৃত। তাঁর পারিবারিক বৃত্তের মধ্যেই উম্মে আতিয়া, উম্মে সালামা, আয়েশা, সাফিয়া, ফাতিমা ও জয়নারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তগুলি পাওয়া যায়।

বাঙালি মুসলমান মহিলাদের মধ্যে রাজনীতি বিষয়ে প্রথম আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন খায়রন্নেসা খাতুন। সিরাজগঞ্জের হোসেনপুর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা খায়রন্নেসা স্বদেশি আন্দোলনের প্লাবনে উদ্বুদ্ধ হয়ে "অন্তঃপুরচারিণীদের কি করা কর্তব্য" সেই বিষয়ে 'স্বদেশানুরাগ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন।[৩১] সৈয়দ আবুল মকসুদের বক্তব্য, "বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর বিরাট ভূমিকা ছিল। শোনা যায়, সিরাজগঞ্জে সে সময় কংগ্রেসের মিছিলেও যোগ দিয়েছিলেন তিনি। যে কারণে মুসলমানদের কাছে অবহেলিতও হন খায়রন্নেসা।"[৩২]

চিত্তরঞ্জন দাশের ঘনিষ্ঠ সহযোগী তথা কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি এক্সিকিউটিভ অফিসার আব্দুর রশিদ খানের কন্যা এবং কংগ্রেস নেতা আশরাফউদ্দিন আহমেদ চৌধুরীর পত্নী রাজিয়া খাতুন চৌধুরানী (১৯০৭-৩৪), রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন না ঠিকই, কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে গভীর রাজনীতিবোধ প্রতিফলিত হয়েছিল।[৩৩]

ভারতীয় উপমহাদেশের সক্রিয় রাজনীতিতে মুসলমান মেয়েদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে গত শতাব্দীর বিশের দশক থেকে।[৩৪] ভোপালের বেগম কর্তৃক ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত All India Muslim Women's Conference-এর কলকাতা শাখাটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৭ সালে। ১৯৩৭ সালে অক্টোবর মাসে মুসলিম লিগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে প্রথম উত্থাপিত হয় মহিলাদের অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রসঙ্গ। প্রস্তাবটি গৃহীত হয় পরের বছর, ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে, পাটনা অধিবেশনে। তদনুসারে গঠিত সারা ভারত মুসলিম মহিলা লিগের কেন্দ্রীয় উপসমিতি এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক উপসমিতির সদস্যারা, যেমন বেগম শাহাবুদ্দিন, মিসেস ইস্পাহানি ছিলেন অবাঙালি আশরফ শ্রেণিভুক্ত মানুষ। বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে তাঁদের ভাষাজনিত ও শ্রেণিগত ব্যবধান ছিল অনতিক্রম্য।

তুলনায় দেখা যায়, ১৯৪৩ সালে গঠিত মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি ধর্মশ্রেণি নির্বিশেষে বাঙালি মহিলাদের বেশি আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা ছিলেন নাজিমুন্নেসা আহমেদ। এই সমিতির বর্ধমান শাখার সংগঠনে অন্তত তিনজন মহিলার কথা জানা যায়, রাবেয়া বেগম, শামসুন্নেসা এবং জোলেখা খাতুন। রাবেয়া বেগম এবং জোলেখা খাতুন, দু'জনের স্মৃতিচারণ থেকেই জানা যায়, তাঁদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাঙালি মহিলাদের মধ্যে সম্প্রদায়গত দূরত্ব দূরীকরণে সহায়ক হয়েছিল।[৩৫] বর্তমান কালে বাঙালি মুসলমান ভদ্রমহিলারা অনেকেই কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্য, কিন্তু এ ব্যাপারে সক্রিয় নন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নির্বাচনী মতদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ বিষয়ে অনেকেই মনে করেন চাকরি ও গার্হস্থ্য পরিচালনার পরে নিয়মনিষ্ঠভাবে রাজনীতিতে নিয়োগ করার মতো বাড়তি সময় তাঁদের হাতে নেই। কারও যুক্তি, "চাকরির একটা নির্দিষ্ট বাঁধাধরা সময় আছে, রাজনীতির তা নেই, ফলে এটি মহিলাদের পক্ষে অসুবিধাজনক"; কেউ ভাবেন, "পরিবারের উন্নতিসাধনই নারীর প্রাথমিক উদ্দেশ্য। সে ক্ষেত্রে, যাবতীয় অসুবিধা সত্ত্বেও মেয়েরা চাকরি করার ফলে পরিবারের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়, কিন্তু রাজনীতি করে কোনও 'লাভ' নেই।" এ ছাড়া অন্যান্য যে কারণগুলি উঠে এসেছে, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

ক. রাজনীতি না-করা আমার স্বাধীন সিদ্ধান্ত, এ বিষয়ে আমি কখনও আগ্রহ বোধ করিনি, অথবা

খ. আমি মনে করি রাজনীতি বিষয়টি পুরুষের ক্ষেত্র, অথবা

গ. রাজনীতির জটিলতা সহজবোধ্য নয়। এই কাজকর্মের মধ্যে সর্বক্ষণ জড়িয়ে থাকার মতো প্রশিক্ষণ আমার নেই।

যাঁরা সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন, এমনকী গৃহবধূরাও কেউ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সম্পর্কে পর্দা বা ধর্মীয় বিধিনিষেধের যুক্তি দেননি। অধিকাংশ মুসলমান ভদ্রমহিলাই মনে করেন, জাতিধর্ম নির্বিশেষে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত; এভাবেই মহিলাদের স্বার্থ সুরক্ষিত হতে পারে।

উল্লেখযোগ্য যে, গত প্রায় একশো বছর ধরে যে মুসলমান মহিলাদের মধ্যে সক্রিয় রাজনৈতিক অংশগ্রহণ লক্ষ করা গেছে, বর্তমান কালেও যাঁরা নিজেদের রাজনৈতিক 'কর্মী' অথবা 'নেত্রী' বলে পরিচিত করেছেন, তাঁরা সকলেই রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য। পিতা, ভ্রাতা বা স্বামীর উদ্যোগ ও সমর্থন সাপেক্ষেই তাঁদের এই যোগদান। এমন উদাহরণ বিরল যেখানে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক একটি পরিবারের মেয়ে তাঁর নিজস্ব উদ্যোগে এ বিষয়ে এগিয়ে আসছেন।

কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানকারী আচারনিষ্ঠ বৈষ্ণব পরিবারের কন্যা মণিকুন্তলা সেন-কে 'ভগবান ও কমিউনিজমের দ্বন্দ্ব' কতখানি পীড়িত করেছিল, তার বিবরণ আছে তাঁর আত্মজীবনীতে।[৩৬] এই মতাদর্শে বিশ্বাসী রাজনীতিকদের সবাইকে এখন আর এ জাতীয় দ্বন্দ্ব যে অস্থির করে তোলে না, সাক্ষাৎকারগুলি থেকে তার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মোহিনী খাতুন একটি মুসলমান প্রধান গ্রামে বাস করেন, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ, গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে রোজা-নামাজ প্রভৃতি ধর্মীয় কর্তব্য পালন করেন। মসজিদের আজান শোনামাত্র আদব-বশত মাথায় আঁচল তুলে দেন। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মানুষ্ঠানের কোনও বিরোধ আছে কি না প্রশ্ন করায় তিনি বিব্রত বোধ করেন। ক্রমে প্রকাশ পায় বাড়িতে, পাড়ায় এবং গ্রামে তাঁর গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তি এই আচারনিষ্ঠা। মোহিনী মনে করেন, তিনি যেখানে, যাঁদের মধ্যে থাকেন, তাঁদের সঙ্গে 'মানিয়ে চলতে' পারেন বলেই তাঁরা তাঁর প্রতি আস্থা রাখেন এবং তাঁকে নির্বাচিত করেন। 'মানিয়ে না চলা'-র কোনও কারণ আছে বলে তিনি মনে করেন না।[৩৭] মোহিনী ছাড়াও, শহরাঞ্চলে 'অন্দর' এবং 'বাহির'-এর মধ্যে একটা সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করে ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মাচারনিষ্ঠা এবং সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে ধর্মনিরপেক্ষ কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাস, দুটি বিপরীতমুখী চিন্তনের সুষম সহাবস্থান লক্ষ করা গেছে অনেকের মধ্যেই। এই দ্বন্দ্ব শুধু যে রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখা যায় তা নয়, বাঙালি মুসলমান ভদ্রমহিলার নির্মীয়মাণ সত্তার অনেকখানি এই দ্বৈধতায় দীর্ণ। যেমন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বিষয়ক ভাবনাচিন্তায়। যাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বর্ষীয়সী অনেকেই মনে করতে পারেন ১৯৪৬ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দাঙ্গার সময়ে তাঁদের অনিশ্চয়তা ও সংকটের কথা। দাঙ্গার কারণে যাঁরা দেশ ছেড়ে চলে গেছেন এমন অনেক আত্মীয়বন্ধুর কথা বলতে গিয়ে এখনও তাঁদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়। দাঙ্গার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলেও, পরিবারের বা পরিচিত কারও অভিজ্ঞতার কাহিনি যে আবেগের সঙ্গে বর্ণিত হয়, তা থেকে বোঝা যায় তার সঙ্গে তাঁরা কী গভীরভাবে একাত্মবোধ করেন। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক, যাঁদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আক্রান্ত হবার কোনও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা পারিবারিক বৃত্তে এমন কোনও ঘটনা নেই, তাঁদের মধ্যেও দাঙ্গার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কিছু উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা কাজ করে।

প্রাণ এবং সম্পত্তি ছাড়াও, নারীর শরীরটি যে বিশেষভাবে তার রক্ষাকর্তা, পরিবারস্থ পুরুষ এবং সমষ্টিগত সমাজের ইজ্জতের আধার, যাকে আক্রমণ করে নিছক একটি দেহ

নয়, চিহ্নিত শত্রুর অহমিকায় আঘাত করা যেতে পারে— এই প্রতর্কটি সুপ্রাচীন কাল থেকে, বোধহয় কোনও ধর্মীয় সমাজের উত্থান হবার আগে থেকেই, সাম্প্রতিক কালে ১৯৭৯-এর গুজরাট গণহত্যার সময় পর্যন্ত অপরিবর্তিত লক্ষ করা যাচ্ছে। ফলত এক ধরনের অনিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তার অভাববোধ বাঙালি মুসলমান ভদ্রমহিলার সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে রয়েছে। ১৯৬৫ সালের পরে পশ্চিমবঙ্গে কোনও উল্লেখযোগ্য হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ঘটনা না থাকলেও, দেশের অন্যান্য জায়গায় ঘটে যাওয়া দাঙ্গাগুলি সম্পর্কে স্পর্শকাতরতার জন্ম এই মানসিকতা থেকে। ১৯৬৪ সালে রাউরকেল্লার দাঙ্গা, ১৯৭৯ সালে জামশেদপুরের দাঙ্গা, ১৯৮০ সালে মোরাদাবাদ গণহত্যা,

এক জটিল দ্বিধা থেকে শহরবাসী আধুনিক মুসলমান গ্রামের সঙ্গে তাঁর সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারেন না। শিকড়ের সঙ্গে সম্পর্কের টান ছাড়াও, ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে একটি আরও বাস্তব কারণ পরিস্ফুট হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা উত্তেজনার অনিশ্চয়তা পর্বে আপাত-নিস্তরঙ্গ গ্রাম স্বীয় সম্প্রদায়ের ছত্রছায়ায় কিছুটা নিরাপত্তার সন্ধান দেবে, এই ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনার দ্বারা অনেকে প্রভাবিত।

শুরু থেকেই পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু আন্দোলনে ব্যাপক কমিউনিস্ট প্রভাব থাকার কারণে, উত্তর-পশ্চিম ভারতের মতো, পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংখ্যালঘুদের জন্য তেমন ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক আন্দোলন বিষয়েও এ কথা প্রযোজ্য।

বাংলার ইতিহাসে উভয় সম্প্রদায়ের ভদ্রলোকদের দাঙ্গায় যোগদানের একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় প্রখ্যাত চক্ষুবিশেষজ্ঞ ডা. জামাল মহম্মদকে হত্যা করেছিল এক দল 'শিক্ষিত যুবক'।[৩৮] ওই দাঙ্গাতেই এক অসহায় বৃদ্ধ ডিমওয়ালাকে 'হাড়ের ডাণ্ডা' দিয়ে খুন করেছিল এক দল 'মেডিক্যাল ছাত্র'।[৩৯] আশার কথা এই যে, এ সব উদাহরণ এখন অনেকেই বিস্মৃত। বাঙালি মুসলমান ভদ্রমহিলারা অনেকেই বিশ্বাস করেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক' শ্রেণির বাঙালি (হিন্দু এবং মুসলমান) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করতে পারেন না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চিহ্নিত করা যায় একটি পরিষ্কার বৈপরীত্য। গুজরাট গণহত্যায় 'দুর্গা বাহিনী'-র সক্রিয়তা প্রচারিত হওয়ার পরে নেওয়া সাক্ষাৎকারগুলিতে ভদ্রমহিলাদের প্রতি এতটা আস্থা পোষণ করা হয়নি। বহু ক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অর্থনীতির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। ১৯৭৯ সালে এই প্রসঙ্গে K F Rustamji লিখেছিলেন, "A riot does not occur in a sleepy little village of UP where all suffer equally nor in a tribal village of MP where all live safely in their poverty. It occurs in Moradabad where the metalworkers have built up a good industry– it occurs in Aligarh where lock makers have made good– it occurs in Bhaivandi where powerloom rivalries are poisonous– it occurs in Hati and Ahmedabad and Hyderabad and Jamshedpur where there are jobs to get, contracts to secure, houses and shops to capture– it occurs in Agra and Ferozabad and in all other towns

where there are economic rivalries, and have to be covered up with a cloak of communalism."[৪০]

মেধা বা বিত্ত নির্ভর করে গড়ে ওঠা মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণিটি ১৯৪৭-উত্তর পর্বে পশ্চিমবঙ্গে যত দৃশ্যমান হয়ে উঠছে, ততই প্রবল হয়ে উঠছে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিযোগিতার বিষয়টি প্রত্যক্ষ সংঘাতে রূপান্তরিত হবার আশঙ্কা। একদিকে যেমন এই ভদ্রমহিলারা বিশ্বাস করেন বাঙালি ভদ্রলোক দাঙ্গা করতে পারেন না, অপরদিকে তাঁরা মনে করেন অর্থনৈতিকভাবে সম্পন্ন হয়ে উঠলে তাঁরা অন্য সম্প্রদায়ের কিছু মানুষের ঈর্ষার শিকার হতে পারেন।

অবচেতনে নিরাপত্তার এই অভাববোধ থেকেই তাঁরা আপন সম্প্রদায়ের প্রতিবেশ গড়ে তুলতে চান। এই 'ghetto' গুলি গড়ে ওঠার পেছনে প্রশাসনিক কারণ এবং অন্য সম্প্রদায়ের অবদানের কথা বলা হয়। প্রাক্-১৯৪৭ পর্বের মিশ্র বসতিগুলি লুপ্ত হয়ে গিয়ে সম্প্রদায়ভিত্তিক এলাকা কেবলমাত্র শহর কলকাতাতেই নয়, মফস্‌সল এবং জেলা শহরগুলিতেও দৃশ্যমান।[৪১]

এই এলাকাগুলি প্রত্যক্ষ করলে যেমন এই পর্বে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণিটির ক্রমনির্মাণ বুঝতে পারা যায়, তেমনই সম্প্রদায়ভিত্তিক বেষ্টনী নির্মাণের এই প্রয়াস দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না তার গভীর নিরাপত্তাহীনতার কথা।

মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান নারীসত্তায় কোনও কোনও ক্ষত খুব গভীর হয়ে রয়ে গেছে এখনও। দেশভাগ তার মধ্যে অন্যতম; ব্যক্তিগত-পারিবারিক স্তরেও তা নারীমানসে গভীর রেখাপাত করেছিল। নিকট আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বিচ্ছেদের বিষয়টি বিশেষভাবে বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে অমিত্রভাবাপন্ন দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতির নিরিখে। যোগাযোগ রক্ষা করা শুধু জটিল এবং ব্যয়বহুল নয়, ভারত-পাক যুদ্ধের প্রেক্ষিতে হয়ে উঠেছে দুঃসাধ্য, সামাজিকভাবে অকাম্যও। স্বাভাবিক ভাবেই তার গভীর প্রভাব পড়েছে মহিলাদের মনে, বিশেষত যদি তাঁরা আগে কোনও পর্যায়ে যৌথ পরিবারের সদস্যরূপে এক ছাদের তলায় বাস করে থাকেন।

মুসলমান ভদ্রমহিলার গার্হস্থ্য ও সামাজিক বিষয়ে চিন্তন ও ব্যবহারে বহু বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। 'গৃহ' ও 'সমাজ', 'অন্দর' ও 'বাহির', 'মুসলমান' ও 'বাঙালিত্বের' সাযুজ্য রক্ষা করা বহু মহিলার কাছেই বেশ কষ্টসাধ্য। একদিকে কাজ করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও ধর্মসম্প্রদায়গত সংস্কার, অন্যদিকে আছে বাঙালিত্বের প্রতি দায়বদ্ধতা। 'মুসলমান থাকিব না বাঙালি হইব?' এই দ্বন্দ্ব বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোড়িত করেছে বাঙালি মুসলমান নারীর সত্তাকে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের কথা ধরা যাক। ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র ভেঙে যখন বাংলাদেশ নামে আর একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য আন্দোলন চলছিল এবং শেষ পর্যন্ত তা সাকার হল, তার কারণগুলি এপার বাংলার মুসলমানদের ভাবিয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের হাত ধরে যে সংগ্রামের শুরু এবং স্বাধীনতায় পরিসমাপ্তি,

ধর্মের উপরে ভাষা-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করে তা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমানের সত্তা নির্মাণে কিছু আত্মবিশ্বাস প্রদান করেছিল। বস্তুত সত্তরের দশক থেকে এই সমাজে পরিবর্তনের যে প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল, তাতে ওই যুদ্ধের একটা পরোক্ষ প্রভাব অবশ্যই কাজ করেছিল। বহু শতাব্দী পাশাপাশি বসবাস করার ফলে অবধারিতভাবে বাঙালি হিন্দু সমাজের কিছু বৈশিষ্ট্য মুসলমান সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে, কখনও আবার তাঁরাই সচেতনভাবে ধারাটি পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন। বিবাহ প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে এই বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। মুসলমান সমাজে 'ঘটক' নামক কোনও পেশাদার মানুষদের দেখা যায় না, কিন্তু এই সমাজের অধিকাংশ বিয়েই 'সম্বন্ধ' করে হয়। বিষয়টির তাৎপর্য এই যে, সনাতন একটি পদ্ধতি এখানে মূলত ক্রিয়াশীল। সমস্যা দেখা দেয় যখন আর্থ-সামাজিক বৃত্তের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় ধর্মীয়-সামাজিক ক্ষেত্রে পরিচিতি সংকুচিত হয়ে আসে। মুসলমান সমাজে বর্ণপ্রথা নেই, বর্ণের অনুরূপ 'বিরাদরি' গোষ্ঠী, যেমন জোলা (তন্তুবায়), নিকারি (মৎস্যজীবী), ইত্যাদিও মধ্যবিত্ত সমাজে দুর্লভ। শুধুমাত্র মুসলমান পাত্রপাত্রীর পরিচিতি নথিবদ্ধ ও বিবাহ যোগাযোগ সহজতর করে তোলার চেষ্টায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে কলকাতা শহরে একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মুসলমান বিবাহে 'দেনমোহর' (অর্থাৎ স্ত্রীকে দেয় অর্থমূল্য) বিষয়টি বর্তমানে আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ; বিবাহ বিচ্ছেদ ব্যতীত প্রসঙ্গটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবনে আর কখনও উত্থাপিত হয় না। অন্যদিকে দেখা যায় পণপ্রথার ক্রমবর্ধমান বিস্তার।

যদিও ইসলাম ধর্মে প্রতিষ্ঠানিক স্তরে বিধবা বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কিত অনুশাসনগুলি উদার, হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির পারস্পরিক প্রভাবে গড়ে ওঠা বাঙালি মুসলমান সমাজে, এমনকী মেয়েদের মধ্যেও এ ব্যাপারে অনেক দ্বিধা রয়ে গেছে। মুসলমানদের মধ্যে তুতো-ভাইবোন সম্পর্কে বহু ক্ষেত্রে বিবাহ অনুমোদিত; প্রধানত দুটি কারণে এই প্রবণতাটিও হ্রাস পাচ্ছে বলে দেখা গেছে:

ক. শিক্ষা ও পারস্পরিক আদানপ্রদানের ফলে একটি দীর্ঘ সময়কাল ধরে বৃহত্তর পরিবারের সদস্যরূপে এই ছেলেমেয়েরা সহজভাবে ভাইবোন সম্পর্কেই মিশছেন, বিবাহ সম্ভাবনা সেখানে গড়ে উঠতে সুযোগ পাচ্ছে না। আগে মেয়েদের উপর নিয়ন্ত্রণ অনেক কঠোর ছিল, তাঁদের সাক্ষাতের সুযোগ ঘটত না; ফলত বিবাহ সম্ভাবনা দিয়েই সম্পর্কের সূচনা করা সম্ভব হত।

খ. রক্ত সম্পর্কের মধ্যে বিবাহের ফলে যে সমস্ত জিনঘটিত রোগের কথা সাম্প্রতিক কালের গবেষণাগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে তার কারণেই এ বিষয়ে অনীহা গড়ে উঠেছে।

এছাড়া হিন্দুধর্মে এই জাতীয় সম্পর্ককে নিষিদ্ধ করা হয়েছে; শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানের মধ্যেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে সঞ্চারিত হয়েছে এই নীতিবোধ।

মুসলমান সমাজের বহুবিবাহ ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয় দুটি নিয়ে বহু বিভ্রান্তি আছে। মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমান পরিবারগুলিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে একটি ইতিবাচক মানসিকতা লক্ষ করা যায়। পরিবার ছোট হলে সন্তানদের প্রতি বেশি মনোযোগ ও তাদের বিকাশে

অধিক পরিমাণে আর্থিক বিনিয়োগ করা যায়, এই দুটি ছিল প্রধান যুক্তি। পরিবার পরিকল্পনা তাঁদের ধর্মে নিষিদ্ধ, এমন কথা স্পষ্ট করে কেউ বলেননি। যাঁরা এই বিষয়ে দ্বিধান্বিত, তাঁরা প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেছেন। যে সমস্ত পরিবারে মহিলারা নিজেদের ক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনার সুযোগ পাননি, তাঁদেরও অনেকে বিষয়টি সমর্থন করেন।

বহুবিবাহ সম্পর্কে কোরানে বলা হয়েছে:

"যদি তোমরা ভয় কর যে অনাথ মেয়েদের অধিকার যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সে সব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভাল লাগে, তাদের বিয়ে করে নাও; দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এ রকম আশঙ্কা কর যে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই; এতে পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা।"[৪২]

বহুবিবাহের সপক্ষে এই আয়াতটি[৪৩] প্রায়শই উল্লিখিত হয়; তবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ না হওয়ার কারণে এর মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে অসুবিধা হয় অনেক সময়। কোরানে বহুবিবাহের স্বীকৃতি অবশ্যই আছে, তবে তা সপত্নীদের মধ্যে নিরপেক্ষতার শর্তসাপেক্ষে। বোঝা যায়, কোনও স্বামী একাধিক পত্নীর মধ্যে ব্যবহারসমতা অসাধ্য বোধ করলে, তাঁর পক্ষে বহুবিবাহ কাম্য নয়। তবে শুধু অপারগতা থেকে নয়, সম্ভবত প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের প্রভাবেও বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে বহুবিবাহের উদাহরণ অতীব বিরল।

পর্দা প্রসঙ্গে কোরানে বলা হয়েছে:

"বিশ্বাসীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের শালীনতা রক্ষা করে। এতেই পবিত্রতা। নিশ্চয় তারা যা করে ঈশ্বর সে সম্পর্কে অবহিত আছেন।"[৪৪] "বিশ্বাসী নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের শালীনতা রক্ষা করে।"[৪৫]...

অর্থাৎ পর্দা শুধু নারী নয়, পুরুষের জন্যও বিধেয়। মুসলমান নারীদের ক্ষেত্রে পর্দার চূড়ান্ত রূপ 'বোরকা' যেমন একটি ধর্মীয় জগতে প্রতীকী আশ্রয় প্রদান করে এবং জনসমক্ষে নারীটির ব্যক্তিপরিচিতিকে অগ্রাহ্য করে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ধর্মীয় পরিচিতিকে প্রকট করে তাঁকে 'পৃথক' রূপে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। বোরকা যদি তাঁকে এক ধরনের anonymity দেয়, বোরকা ছেড়ে বাইরে এলেও কিন্তু সাধারণ্যে মিশে তিনি এক ধরনের anonymity ভোগ করতে পারেন। লক্ষ করা গেছে, 'বোরকা'-র প্রচলন যাঁদের মধ্যে সর্বাধিক, তাঁদের বাড়ির বাইরে বেরোতে হয় সব থেকে কম। যাঁদের ঘন ঘন বেরোতে হয়, তাঁরা অনেকেই বোরকা ত্যাগ করে স্বচ্ছন্দ হয়েছেন।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক ধরে মৌলবাদী হিন্দু সংগঠনগুলি যত সক্রিয় হয়েছে, অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও লক্ষ করা গেছে মৌলবাদের নতুন সংজ্ঞা ও বিস্তার। একটি দৃশ্যমান প্রতীক দ্বারা পৃথক সত্তাকে চিহ্নিত করার প্রয়োজনে নতুন করে, বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে, শুরু হয়েছে চাদরের ব্যবহার। রক্ষণশীলতার নয়া অবতার বলে এই চাদরকে চিহ্নিত করা সম্ভব কারণ যাঁরা এই চাদর ব্যবহার করছেন, তাঁরা অনেকেই তাঁদের পরিবারে প্রথমবার এর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন।

শহরবাসী আধুনিক বৃত্তিজীবী শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের সঙ্গে এই চাদরের সম্পর্ক নেই। সম্প্রদায়ের বৃত্তেই শুধু নিরাপত্তার সন্ধান নয়; মিশ্র বসতিতে অমুসলমানের কাছে বাড়ি ভাড়া চেয়ে তাঁরা প্রত্যাখ্যাত হন; সাগ্রহে যোগ দেন দোল এবং দীপাবলীতে, ইসলামি বাংলার নবতম প্রয়োগে অন্দরে আরবি-ফারসি সম্পর্কবাচক শব্দাবলী ব্যবহার করলেও, 'খালা-ফুফু-চাচা', বাহিরের অভিধানে 'মাসি-পিসি-কাকা' হয়ে যায়। এর কিছুটা স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ, কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাঙালিত্ব অর্জনের এই প্রয়াস নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার একটি কৌশলমাত্র। কার ক্ষেত্রে কীভাবে, কখন, কতটা, এই সূক্ষ্ম বিচারের দ্বৈধতার মধ্যেই নির্মিত হতে থাকে সমকালীন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি মুসলমান নারীর সত্তা।

কল্পসাহিত্যের মধ্যে ঐতিহাসিক উপাদান কিছু থাকে কি না বা তা ব্যবহার করা কতখানি সঙ্গত, এ নিয়ে বহু বিতর্ক আছে। বাঙালি মুসলমান এবং তার নারীদের দেখা কদাচিৎ পাওয়া যায় বাংলা সাহিত্যে। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের আমিনা হতদরিদ্র কৃষক শ্রেণির মুসলমান, রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' ছোট গল্পের নায়িকা বদ্রাওনের নবাবের কন্যা। মধ্যবিত্ত নারীর দেখা মেলে কই?

প্রাক্-১৯৪৭ পটভূমিতে রচিত *প্রেম নেই* উপন্যাসের নায়ক শফিকুল মোল্লা তাঁর নিজের বিষয়ে বলেন তিনি 'প্র্যাকটিসিং চাষার ছেলে'।[৪৬] শফিকুলের সংগ্রাম ও সাফল্যের কাহিনির মধ্যে বিধৃত আছে সেকালের মধ্যবিত্ত। বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত ভদ্রমহিলার পরিবর্তমান দৃশ্যপট ধরা পড়েছে, এমন তিনটি উপন্যাসের উল্লেখ প্রয়োজন।

প্রথমটি, সৈয়দ মুজতবা আলীর ষাটের দশকে লেখা উপন্যাস, *শহর-ইয়ার*।[৪৭] কলেজে পড়া, রবীন্দ্রচেতনায় ঋদ্ধ শহর-ইয়ার একটি অভিজাত বাঙালি পরিবারের বধূ। ষাটের দশকে লেখা এই উপন্যাসে, আলী নিজেই বলছেন, "মুসলমান ছাত্রী এই দশ বছর আগেও এত বিরল ছিল যে, হিন্দু অধ্যাপকরা তাদের বিশেষ আদরের চোখে দেখতেন, হয়ত বা তাতে নূতনের প্রতি খানিকটা কৌতূহল মেশানো থাকত।"[৪৮] শহর-ইয়ার মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের তিন হাজার গানের তিন হাজার স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে তাঁর জীবন। আর তার ফলে তিনি কিছু বিচ্ছিন্নও বোধ করেন; মনে হয় যেন একটি নির্জন দ্বীপে তিনি একা বাস করছেন; হাতে অনেক টাকা, কিন্তু কেনবার কিছু নেই। শহর-ইয়ারের এই নিঃসঙ্গতাবোধের হাহাকার কেবল এক অন্তর্মুখী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনাঋদ্ধ একাকিত্ব বিলাস নয়। শহর-ইয়ারের এই উক্তিতে তাঁর ঔদ্ধত্য বা শ্রেষ্ঠতাবোধ নয়; এক মরমী নারীর অসহায় আত্ম-মূল্যায়ন ধরা পড়ে যিনি তাঁর ধর্মীয় সম্প্রদায়, তথাকথিত 'স্বজাতি'-র অন্য নারীদের সঙ্গে মিশতে পারছেন না। আবার অন্য দিকে, কলেজ পাশ করার পরে গৃহবধূ-রূপে অন্য সম্প্রদায়ের মহিলাদের সঙ্গে যাঁর যোগাযোগ অত্যন্ত সীমিত, প্রায় নেই বললেই চলে।

এই গভীর অবসাদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য পশ্চিমবঙ্গীয় শহর-ইয়ারের জন্য দুটি বিকল্প আলী ভাবতে পেরেছিলেন, একটি আধ্যাত্মিকতা, অপরটি মাতৃত্ব কেন্দ্রিক গার্হস্থ্য। কখনও পীর ধরে, কখনও গর্ভধারণ করে বিকল্প খুঁজছেন নায়িকা। অপরদিকে, লেখকের নিজের পরিবারেই, তাঁর স্ত্রী রাবেয়া আলী তখন পূর্ব পাকিস্তানে প্রধান বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত। সুশিক্ষিতা শহর-ইয়ারকে লেখক চাকরি দিলেন না; সেটা কি শুধু বিত্তবান পরিবারের বধূর চাকরি করার 'প্রয়োজন' ছিল না বলে? নাকি প্রস্তাবটি ১৯৪৭-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি মুসলমান সমাজে সেই সময় ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি, সেই কারণে?

ঢাকা বেতার কেন্দ্রে ষাটের দশকে অন্তত দু'জন প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী, হুসনা বানু খানম এবং বিলকিস নাসিরুদ্দিনের কথা জানা যায়। আর পশ্চিমবঙ্গে সম্পন্ন পরিবারের কন্যা শহর-ইয়ারকে শুধুমাত্র রেকর্ড শুনে গান শিখতে হয়েছে, কারণ সেই পরিবারের 'কট্টর পিউরিটান আদর্শ'[৪৯] অনুসারে 'গানবাজনা বরাহমাংসবৎ ঘৃণ্য।'[৫০] শহর-ইয়ারের পরের প্রজন্ম থেকেই অবস্থার পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় শহর-ইয়ারের ভাগ্নির চরিত্রে। শহর-ইয়ারের তটস্থতার তুলনায় আমরা এই ভাগ্নিকে দেখি পারিবারিক-সামাজিক বিবিধ অনুশাসন এবং পর্দার প্রহসন পেরিয়ে অনেক বেশি স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ ও আত্মস্থ।

এর প্রায় দুই দশক পরে প্রকাশিত আবুল বাশারের *ফুলবউ* উপন্যাস।[৫১] যাবতীয় প্রতিকূলতার সঙ্গে যুঝবার জন্য, এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজিয়ার একমাত্র সম্বল তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। এই শিক্ষাকেই হাতিয়ার করে সে বাড়িয়ে চলেছে তার যোগ্যতা। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা তার মুক্তির একমাত্র পথ উপলব্ধি করে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখাচ্ছে সে। তার সম্প্রদায়ভিত্তিক সত্তা এ ক্ষেত্রে আর কোনও অন্তরায় সৃষ্টি করছে না। *ফুলবউ* প্রকাশিত হবার প্রায় দেড় দশক পরে, কলকাতা থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত মতি নন্দীর *বিজলিবালার মুক্তি* উপন্যাসে হাসিনা বানো বা হাসি নামক চরিত্রটির কণ্ঠে পরিষ্কার উচ্চারিত হয়, "লেখাপড়া শিখে ঘরে বসে থাকব আর স্বামী মুখের রক্ত তুলে উদয়াস্ত খেটে সংসার চালাবার টাকা রোজগার করবে, তাই কখনও হয়?"[৫২] এই উপন্যাসটিতে বাঙালি মুসলমানের অন্যান্য সংকটও প্রতিফলিত হয়েছে। স্কুলশিক্ষক জ্যোতির্ময় চক্রবর্তীর স্ত্রী হাসিকে গ্রহণ করতে তার বাড়িওয়ালি বিজলিবালার কোনও অসুবিধা হয়নি। হাসির মৃত্যুর পর যখন প্রকাশ পায় তার আসল নাম হাসিনা বানো, আজন্মলালিত বিশ্বাসগুলি টলে যাওয়ায় তিনি জ্যোতির্ময়কে তিরস্কার করেন, "আমি তো জীবনেও জানতে পারতুম না হাসি মুসলমান, জানলে কি ওকে ঠাকুর ছুঁতে দিতুম? আর হাসিই বা কোন আক্কেলে পাঁচালি পড়ল? ওর ধম্মেও তো এসব করা বারণ। এটা পাপ। তুমিও ধম্মো মানো না, মানলে মুসলমান মেয়ে বিয়ে করতে না।"[৫৩]

পরিচিতি গোপন করে জ্যোতির্ময় কেন তাঁকে ঠকাল এই প্রশ্নে জ্যোতির্ময়ের অসহায় স্বীকারোক্তি, "নিরুপায় হয়ে। মাসিমা, ঘরভাড়া নিতে গেছি, বউ মুসলমানের মেয়ে শুনে ভাড়া দেয়নি। ভাড়া নিয়ে এক মাস থেকেছি, বাড়িওয়ালা পাড়ার লোক দিয়ে তুলে দিয়েছে।"[৫৪]

আচারগত দৈনন্দিনতায় এই ব্যবধান কাম্য কিনা তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, এখানে একটি রূঢ় বাস্তব প্রতিফলিত হয়েছে। এই সংকট যদি আন্তঃসাম্প্রদায়িক সম্পর্কের কারণে হয়, বাঙালি মুসলমান মেয়ের অন্তরের একান্ত সংকটগুলিও ধরা পড়েছে সমকালীন সাহিত্যে। আকাশলীনা নামের মেয়েটির *দাদি* (ঠাকুমা) তার "নামের আকাশকে বিদেশী শব্দে, আরব্য-পারস্য শব্দে বদলে নিয়েছেন। করেছেন আসমান। তারপরেই তাঁর ঝোঁকটি মারাত্মক। আসমানের দন্ত্য ন বিসর্জন দিয়ে আসমা ডাকতে চান।"[৫৫] ঈদের উৎসবে মিশ্র সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী, মিশ্র বিবাহের সন্তান এই মেয়েটির সংকট আরও তীব্র হয়, যা ছোট্ট একটি অনুষঙ্গে ধরা পড়ে। মেয়েটি জানে আধুনিক আইলাইনার অনেক বেশি উপযোগী প্রসাধন, কিন্তু আরবি রং 'সুর্মা' এই উপলক্ষে অনেক বেশি উপযুক্ত।[৫৬] সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠতে পারে না সে। ১৯৪৭-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে ঘরে-বাইরে বাঙালি মুসলমান ভদ্রমহিলার সত্তা নানা টানাপোড়েনে গড়ে উঠেছে। ক্ষেত্রটি শুধু মানবীচর্চা বিষয়ক নয়। ইতিহাসে সাধারণত একটি ঘটনাকে আমরা সময়ের নিরিখে দূর থেকে দেখি বলে তার সম্পর্কে কিছু নির্মোহ, নিরপেক্ষ মতামত দেবার চেষ্টা করে থাকি। সমকালীন ইতিহাস সম্পর্কে এ কথা প্রযোজ্য নয়। সমকালে ঘটতে থাকা ঘটনাবলী সম্পর্কে নিরপেক্ষ হওয়ার চেষ্টা পর্যন্ত দুরূহ; সময়ের পরিমাপে সেই ঘটনাক্রমকে সুনির্দিষ্ট করতে না পারার কারণে তার সামগ্রিক মূল্যায়ন আরও দুঃসাধ্য। বৈপরীত্য-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সমস্যা ও সংকটগুলির সমাধান তথা ভারসাম্য বিধানের প্রচেষ্টার প্রক্রিয়াটির নামই ইতিহাস।

তিন

অভ্র ঘোষ

লিঙ্গ-অনপেক্ষ মনুষ্যত্বের চর্চা এবং রবীন্দ্রনাথ

রাজনীতির ধারণাটির সঙ্গে ক্ষমতার ধারণা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ক্ষমতার বৈষম্য থেকেই রাজনীতি তৈরি হয়। তৈরি হয় আধিপত্য আর অধীনতার ধারাবাহিক ইতিহাস। যুগভেদে কালভেদে দেশভেদে তার বিচিত্র প্রকাশ। নারী-পুরুষের লিঙ্গভেদেও আছে এই বৈষম্যের প্রকট চিহ্ন, আছে ক্ষমতার তারতম্য— পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর ওপর পুরুষের দোর্দণ্ডপ্রতাপ। সামাজিক জীবনে পুরুষের অবস্থান আর নারীর অবস্থান এক নয়, পুরুষ বলশালী, নারী কোমল প্রাণ। পুরুষ বাহিরের, নারী অন্দরের। ইতিহাস বলছে এই অন্দর-বাহিরের ধারণা থেকেই ক্ষমতার বৈষম্যের সৃষ্টি। বাহির পুরুষের অধিগত বলে তার সুযোগ-সুবিধা, কর্তৃত্ব-কর্মপরায়ণতার ক্ষেত্র বিস্তৃত, তার প্রভাব-প্রতিপত্তির সীমা নেই। নারী অন্দরের নিভৃত ক্ষুদ্র পরিসরে তার কোমল স্বভাব দিয়ে সংসারের শান্ত পরিবেশ তৈরি করে সন্তুষ্ট, ঘরকন্নাই তার ধর্ম।

নারী-পুরুষের অবস্থানগত এই পার্থক্য প্রাকৃতিক বলে মনে করারই রেওয়াজ সাধারণ ভাবে। এই বৈষম্যকে পুরুষের আধিপত্য বিস্তারের ভিত্তি বলে মনে করার যুক্তি নেই— এমনই বিশ্বাস ছিল এক সময়ে। তবে সে-বিশ্বাসে আঘাত লেগেছে আধুনিক কালে, নারীবাদী আন্দোলন ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে এ কথা বোঝাবার ও বুঝবার নিরন্তর চেষ্টা করছে যে অন্দর-বাহিরের এই প্রচলিত সামাজিক ছকের সঙ্গে নারী-পুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্যকে জুড়ে দেওয়া আসলে ক্ষমতার রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া, পুরুষ আধিপত্য রচনার বৈধ ক্ষেত্র তৈরির সযত্ন অশুভ প্রয়াস। বস্তুত লিঙ্গ-রাজনীতির ধারণা এর থেকেই উদ্ভূত। লিঙ্গ -রাজনীতি বলতে বোঝায় স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্ককে কেন্দ্র করে পুরুষ আধিপত্যের এক রাজনৈতিক ব্যাখ্যা।

তবে লিঙ্গ-রাজনীতি আর নারীমুক্তি আন্দোলনের চেহারা যে সব যুগে সব দেশে একই রকমের নয়, তা বলা বাহুল্য। স্বাভাবিক নিয়মেই তাদের প্রকারভেদ ঘটে। আঠারো-উনিশ শতকে নারীর ওপর পুরুষের প্রভুত্বের যে ধরন ছিল, বিশ-একুশে পুরুষ আধিপত্যের ধরন যে পালটে যাবে, তা তো স্বাভাবিক। আর পাশাপাশি নারীমুক্তি ভাবনারও বহুল পরিবর্তন

ঘটছে। ভবিষ্যতেও ঘটতে থাকবে। সেটাই স্বাভাবিক, সমাজ প্রগতির সেই তো লক্ষণ।

প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতক থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত নারী আন্দোলনের তত্ত্বে প্রাধান্য পেয়েছিল সমাজের থাকবন্দি ক্ষমতার বিভিন্ন স্তরে নারী-ক্ষমতার অন্তর্ভুক্তি। অর্থাৎ জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর পুরুষের সমকক্ষ হয়ে ওঠার চেষ্টা। মেয়েদের অর্থনৈতিক অধিকারের বিস্তৃতি, শিক্ষা-সংস্কৃতির অধিকার, রাজনৈতিক অধিকারের সাম্য, সামাজিক ভূমিকার সমতা ইত্যাদি ছিল প্রধান স্লোগান। নারীর ক্ষমতায়ন, ইংরেজিতে যাকে বলে উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট, সেটাই ছিল যুগের প্রধানতম দাবি। পশ্চিমি দেশগুলিতে বিশেষত শিল্পোন্নত বুর্জোয়া সভ্যতায় এই ধারার আন্দোলনের শুরু আঠারো-উনিশ শতক থেকেই, বিশ শতকে তার পাকাপোক্ত চেহারাটাই আমরা দেখেছি। আমাদের মতো পিছিয়ে থাকা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে, বিশেষত আমাদের বঙ্গসমাজে, নারীর অধিকারের আন্দোলন, যথেষ্ট স্তিমিত আকারে হলেও, উচ্চকোটি সমাজে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু হয়েছিল। তার ব্যাপকতা ও গভীরতা ছিল কম। আর্থিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরবশ্যতা তো ছিলই, ছিল প্রাচ্য সমাজের স্বভাবজ অচলায়তনতার সমস্যা, শাস্ত্রাচারের অন্ধতা। তার ফলে সে-যুগের স্ত্রী-অধিকারের আন্দোলন ছিল চরিত্রগতভাবে খণ্ডিত, দীর্ণ, দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু আন্দোলনটা ছিল। উনিশ শতকের বাংলাদেশে সমাজসংস্কার আন্দোলনের প্রধানতম বিষয়ই ছিল স্ত্রীস্বাধীনতা, নারীসমস্যার প্রতিবিধান। ক্ষমতার অলিন্দে পুরুষের সমকক্ষতা লাভই ছিল প্রধান লক্ষ্য। আমাদের প্রাচ্য সমাজে না হোক উনিশ শতকের পাশ্চাত্যে এই সমকক্ষতা অর্জনের আন্দোলনে অন্দর-বাহিরের প্রেক্ষিতে নারী-পুরুষের সাবেকি শোষণমূলক ভূমিকাটি ভেঙে ফেলার গরজটাই ছিল প্রধান। অর্থাৎ প্রশ্ন তোলা হয়েছিল যে, নারীর স্থান অন্দরে পুরুষের স্থান বাহিরে— এই আপ্তবাক্য কতদূর সঙ্গত। নারীর কর্তব্য সন্তানপালন, সংসারের শ্রী বজায় রাখা, পুরুষকে কাজে অনুপ্রেরণা জোগানো আর পুরুষ বাইরের জগতে সাহিত্য কলা বিজ্ঞান দর্শন রাজনীতি অর্থনীতির জগতে সৃষ্টিকার্যে মগ্ন থাকবে— এমন ধারণা ভেঙে নারী-পুরুষের সাম্য রচনা করতে হবে— এমনই ছিল সে-আন্দোলনের লক্ষ্য। এ যুগে সকলেরই জানা যে, সমকক্ষতা অর্জনের এই লক্ষ্যটিকে সামনে রেখেই ফরাসি নারীবাদী ভাবুক সিমোঁ দ্য বোভোয়া বলেছিলেন, মেয়েদের নিরন্তর অনুশীলনের মাধ্যমে শারীরবৃত্তিকে গৌণ করে মননকে মুখ্য করে তুলতে হবে। পুরুষের কাজের জগতে ও মননের রাজ্যে নারীর অন্তর্ভুক্তির জোরদার লড়াই চালাতে হবে, পুরুষসৃষ্ট সমাজ পরিচালনায় নারীকে ক্ষমতাবান করে তুলতে হবে। এক কথায়, পুরুষসৃজিত ভুবনে নারীর অন্তর্ভুক্তি, ক্ষমতায়ন হবে প্রধান লক্ষ্য।

পশ্চিমি সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন বা অন্তর্ভুক্তির এই আন্দোলন খানিকটা বিস্তৃতি পেলে দেখা গেল এতেও রয়েছে এক প্রবল গলদ, এক মহা ফাঁকি। নারীর অন্দর ছেড়ে এই বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টার মধ্যে রয়েছে কঠিন থেকে কঠিনতম অনেক বাধা। বহুকাল ধরে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত সামাজিক নিয়ম-সংস্কার কাটিয়ে ওঠার বাধা, ঘনিষ্ঠজনদের কাছ থেকে বাধা, এমনকী নারীর নিজের বহুদিনের অভ্যাস কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার

বাধা। লিঙ্গ-বিভাজনের বহুকালের লালিত রাজনীতি-সমাজনীতিকে অস্বীকার করে লিঙ্গ সাম্য সৃজন ততটা সহজ নয়। এ যেন বহুকালের তপস্যা ও আয়াসসাধ্য— রাতারাতি এ-কাণ্ড ঘটবার নয়।

তা সত্ত্বেও নিরন্তর আন্দোলনের পর বিশ শতকের সাতের দশকে নারীবাদী আন্দোলনের নেতৃবর্গ বুঝতে পারলেন, অন্দর-বাহিরের ব্যবধান ঘোচানো সম্ভব হলেও নারীমুক্তি সফল হবার সম্ভাবনা কম। কেন না অন্দরের সংস্কৃতি ভেঙে নারী পুরুষালি বাইরের বৃহত্তর সমাজে পদার্পণ করে বুঝতে পারল যে এ-সমাজ তো পুরুষের স্বার্থে, পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, পুরুষালি অভিজ্ঞতাখচিত, পুরুষের সাংস্কৃতিক চেতনা ও মূল্যবোধ দিয়ে গড়া সমাজ। সে-সমাজের ক্ষমতার ভাষাভঙ্গি প্রকার-প্রকরণ সবই তো পুরুষালি। পুরুষের সমকক্ষতা লাভ করতে হলে তবে কি পুরুষালি হয়ে উঠতে হবে? অথবা পুরুষালি ক্ষমতার বিপ্রতীপে এক প্রতিস্পর্ধী মেয়েলি ক্ষমতাবিন্যাসের আয়োজন করতে হবে। দুই-ই সমান পরিত্যাজ্য।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তা হলে ক্ষমতার অলিন্দে অন্তর্ভুক্তি ঘটলেই মেয়েদের মুক্তি ঘটে না, পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠলেই নারী-পুরুষের সাম্য তৈরি হয় না, প্রকৃত মুক্তির জন্য প্রয়োজন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের তত্ত্বভিত্তিটাকে আঘাত করা, তার ভাব-অনুভব, দর্শন-মূল্যবোধের জগতে ক্রমাগত প্রশ্ন তুলে ভিন্ন এক সাম্যের তত্ত্ব নির্মাণ করা। ক্ষমতা-কাঠামোর পরিবর্তনের প্রশ্নে এই তাত্ত্বিক-দার্শনিক লড়াইটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ক্ষমতা-কাঠামোটি তিলে তিলে তৈরি হয়েছে আবহমান কাল থেকে পুরুষতন্ত্রের মূল্যবোধ নিয়ে, পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতি-দর্শন-আচারব্যবহার-বিধি-ব্যবস্থা দিয়ে। লিঙ্গ-রাজনীতির চাতুর্যময় ফাঁদ ছিঁড়তে হলে চাই এমন এক ব্যবস্থা যা পুরুষের প্রভুত্ব নয়, নারীর প্রতিস্পর্ধী প্রভুত্ব নয়, চাই লিঙ্গ-অনপেক্ষ মনুষ্যত্বের চর্চা। অর্থাৎ ক্ষমতা-কাঠামোতে পুরুষালি দাপটের বদলে মেয়েলি দাপট বাড়ানোর লক্ষ্য নয়, চাই মনুষ্যত্ব নির্মাণের চর্চা, মানবিকতার সংস্কৃতিচর্চার স্নিগ্ধ পরিবেশ। এ-রকম এক আকাঙ্ক্ষিত মানব সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য লিঙ্গ-স্বরূপের তিরোধান কাম্য নয় অর্থাৎ পুরুষ সত্তা আর নারী সত্তার প্রকৃতিগত ভিন্নতাকে অস্বীকার করা নয়, চাই লিঙ্গ-স্বরূপের পুনর্নির্মাণ যাতে কেবল নারীমুক্তি নয়, পুরুষমুক্তিও ঘটবে।

এই যদি হয় নারীমুক্তি আন্দোলনের বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কাঠামো তা হলে রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে কতখানি প্রাসঙ্গিক, এ-প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে। তবে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রবিচারের পদ্ধতি প্রসঙ্গে কিছু প্রাথমিক কথা বলে নেওয়া দরকার। আশি বছরের দীর্ঘ জীবনে রাবীন্দ্রিক চিন্তার সতত বিবর্তন ঘটেছে— সেই বিবর্তনের ধারার প্রেক্ষিত ছিল বিশ্ব-সংস্কৃতি, বিশ্ব-রাজনীতি, বিশ্ব-সাহিত্যবোধের বিপুল পরিধি। স্বদেশি সমাজ, স্বদেশি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রসঙ্গ তো ছিলই। দ্বিতীয়ত, স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে তাঁর লেখা ছোট-বড় প্রবন্ধ-নিবন্ধের সংখ্যা বিপুল, আছে গল্প-উপন্যাস-কবিতার বিপুল সমারোহ, আছে চিঠিপত্র আর আলাপচারিতা। এ-সবের বিশ্লেষণ থেকেই বোধহয় নির্মাণ সম্ভব রবীন্দ্রনাথের নারীমুক্তি ভাবনা। কাজটি আদৌ সহজ নয়, বরং অতিশয় জটিল ও শ্রমসাপেক্ষ। এই

নিবন্ধে আমরা ধরার চেষ্টা করব রাবীন্দ্রিক মূল প্রত্যয়টিকে, যথাসম্ভব তাঁর চিন্তার বিবর্তনের ধারাটিকে লক্ষ রেখে। প্রবন্ধ-নিবন্ধের উল্লেখই বেশি করব, থাকবে অল্পস্বল্প গল্প-উপন্যাসের সাক্ষ্য। কবিতা বা গান চকিতে এলেও আপাতত সে আমার লক্ষ্য নয়।

উনিশ শতকের বাঙালি সমাজের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীস্বাধীনতা নিয়ে যতখানি ভেবেছিলেন ততটা কি ভেবেছিলেন নারীমুক্তি নিয়ে? সচেতনভাবেই স্ত্রীস্বাধীনতা আর নারীমুক্তি ধারণাদুটির পৃথকীকরণ করতে চাই। একে অপরের সঙ্গে যুক্ত কিন্তু ধারণার গভীরতা ও ব্যাপকতার দিক থেকে নারীমুক্তি স্বতন্ত্র বিষয়। স্ত্রীস্বাধীনতা বলতে বুঝি মেয়েদের সামাজিক-আর্থিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক অধিকারের বিস্তৃতি। তাঁদের ক্ষমতাবান হয়ে ওঠার সংগ্রাম, এক কথায়, ক্ষমতায়নের প্রবাহ। নারীমুক্তির ধারণা তার চেয়ে ব্যাপক। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ভেঙে নারীর আত্ম-আবিষ্কার, আত্মোপলব্ধি, আত্মশক্তিচর্চা, তাঁর আত্মমুক্তির পথ প্রশস্ত করে তোলার ব্রত। অনপেক্ষ লিঙ্গ-স্বরূপের চর্চা, মনুষ্যত্বের চর্চা নারীমুক্তির লক্ষ্য। তাই কেবল অধিকার অর্জন নয়, নারীমুক্তি এক ভিন্ন মাপের ভাবনা।

১৮৮১-তে প্রকাশিত হয়েছিল *য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র*, রবীন্দ্রনাথের যখন কুড়ি বছয় বয়স। ইংল্যান্ডে যাপিত অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছিল স্বদেশের জীবনযাপনের ধরনের সঙ্গে বিদেশের বিপুল পার্থক্য। সেখানকার মেয়েদের প্রাগ্রসর অবস্থান তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। এই সূত্রেই *ভারতী*-র সম্পাদক অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রযুদ্ধে তরুণ রবীন্দ্রনাথ অন্তঃপুরবাসিনী পর্দানশীন বাঙালি রমণীর বাইরে বেরিয়ে আসার স্বাভাবিক স্বাধীনতার পক্ষে প্রবল উমেদারি করেছিলেন, পাশ্চাত্যের মেয়েদের স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করেছিলেন। ওই একই সময়ে ১৮৮০-তে প্রকাশিত আর এক নিবন্ধ 'পারিবারিক দাসত্ব'-এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আমাদের পরিবারের মূলগত ভাবটা কী? না, শাসনকারী ও শাসিতের সম্পর্ক, প্রভু ও অধীনের সম্পর্ক, গুরু ও কনিষ্ঠের সম্পর্ক। আর কোন সম্পর্ক নাই। সম্মান ও প্রসাদ ইহাই আমাদের পরিবারের প্রাণ। এমন-কি স্বামীর প্রতিও ভক্তি করা আমাদের শাস্ত্রের বিধান। স্বামীর আদেশ পালন করা পুণ্য। সেই সুগৃহিণী যাহার পতিভক্তি আছে! যাহার প্রতি স্বতঃই ভালোবাসা ধাবিত হয় এমন যে স্বামী, তাহার কথা শুনিবার জন্য কি ভক্তির আবশ্যক করে?" কর্তৃত্বময় পরিবার-প্রথার বিরুদ্ধে এ-লেখার ছত্রে ছত্রে তরুণ কবির দ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে। ইংল্যান্ডের সমাজ-সংস্থায় অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের জীবনযাত্রার ছবি রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন এবং তাঁর পত্ররাজিতে সেই সব অভিজ্ঞতার কথা আমরা জানতে পেরেছি। তথাপি প্রাচ্য সমাজের প্রতিতুলনায় স্ত্রী-স্বাধীনতার পীঠস্থান ইংল্যান্ডে নারীসমাজের অবাধ মেলামেশার অধিকার থাকলেও রবীন্দ্রনাথের এমন কথা মনে হয়নি যে পাশ্চাত্যের রমণীকুল সে-দেশের পুরুষের মতো স্বাধীন। *য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র*-এ তিনি জানিয়েছিলেন:

> "আমাদের দেশে যেমন ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের বিয়ের জন্য প্রস্তুত করে, যথেষ্ট লেখাপড়া শেখায় না, কেননা মেয়েদের আপিসে যেতে হবে না; এখানেও তেমনি মাগ্‌গি দরে বিকোবার জন্যে মেয়েদের ছেলেবেলা থেকে পালিশ করতে থাকে, বিয়ের জন্যে যতটুকু লেখাপড়া শেখা দরকার ততটুকু যথেষ্ট। একটু গান গাওয়া,

একটু পিয়ানো বাজানো, ভালো করে নাচা, খানিকটা ফরাসি ভাষা বিকৃত উচ্চারণ, একটু বোনা ও সেলাই করা জানলে একটি মেয়েকে বিয়ের দোকানের জানলায় সাজিয়ে রাখবার উপযুক্ত রঙচঙে পুতুল গড়ে তোলা যায়। এ-বিষয়ে একটা দিশি পুতুল ও একটা বিলিতি পুতুলের যতটুকু তফাত, আমাদের দেশের ও এ দেশের মেয়েদের মধ্যে ততটুকু তফাত মাত্র। আমাদের দিশি মেয়েদের পিয়ানো ও অন্যান্য টুকিটাকি শেখবার দরকার করে না, বিলিতি মেয়েদেরও অল্পস্বল্প লেখাপড়া শিখতে হয়, কিন্তু দুইই দোকানে বিক্রি হবার জন্যে তৈরি। এখানেও পুরুষেরাই হর্তাকর্তা, স্ত্রীরা তাদের অনুগতা; স্ত্রীকে আদেশ করা, স্ত্রীর মনে লাগাম লাগিয়ে নিজের ইচ্ছেমত চালিয়ে বেড়ানো স্বামীরা ঈশ্বরনির্দিষ্ট অধিকার মনে করেন।"

নারীর উপর পুরুষের এই সর্বময় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তরুণ রবীন্দ্রনাথের এই জেহাদ সত্ত্বেও স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রশ্নে কবির মনোভঙ্গিতে ছন্দোময় পরিশীলিত যে সম্পর্ক-বিন্যাসের ছকটি আভাসিত হয়ে উঠেছিল তাতে অন্দর-বাহিরের প্রতিষ্ঠিত কাঠামোটি পুরোপুরি ভেঙে যায়নি। রবীন্দ্রনাথ মেয়েলি জগৎ আর পুরুষালি জগতের ব্যবধানে দেখতে চাইছিলেন প্রাকৃতিক নিয়মের এক অবশ্যস্বীকার্য শর্ত। 'রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে' শীর্ষক রচনাটিতে তার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এই লেখাটির রচনাকাল ১২৯৬-এর জ্যৈষ্ঠ অর্থাৎ ১৮৮৯ সাল। আঠাশ বছর বয়সের তরুণ রবীন্দ্রনাথের মনোভঙ্গি বুঝবার জন্য এই রচনাটিকে আমরা একটি প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা বলে শনাক্ত করতে পারি। কী সেই প্রাকৃতিক নিয়ম? এ-লেখা থেকে তার কিছু দৃষ্টান্তমূলক উদ্ধৃতি দিই:

"সকল বিষয়েই প্রকৃতিতে একটা Law of compensation অর্থাৎ ক্ষতিপূরণের নিয়ম আছে। শারীরিক বিষয়ে আমরা যেমন বলে শ্রেষ্ঠ, মেয়েরা তেমনই রূপে শ্রেষ্ঠ; অন্তঃকরণের বিষয়ে আমরা যেমন বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, মেয়েরা তেমনই হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ। তাই স্ত্রী পুরুষ দুই জাতি পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন করতে পারছে। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পুরুষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প বলে অবশ্য এ কথা কেউ বলবে না যে, তবে তাদের লেখাপড়া শেখানো বন্ধ করে দেওয়া উচিত; যেমন, স্নেহ দয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে পুরুষের সহৃদয়তা মেয়েদের চেয়ে অল্প বলে এ কথা কেউ বলতে পারে না যে, তবে পুরুষের হৃদয়বৃত্তি চর্চা করা অকর্তব্য। অতএব স্ত্রীশিক্ষা অত্যাবশ্যক এটা প্রমাণ করবার সময় স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পুরুষের ঠিক সমান এ কথা গায়ের জোরে তোলবার কোনো দরকার নেই।"

শারীরিক ও বৌদ্ধিক স্তরে প্রাকৃতিক এই অসাম্যের পাশাপাশি সমাজে নারীর ভিন্ন অবস্থানের যৌক্তিকতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আরও এক যুক্তি হল নারীর সন্তানধারণ ও তার প্রতিপালনের প্রাকৃতিক বিধান। কবি লিখেছেন:

"যদি বা এমন বিবেচনা করা যায়, এক সময় আসবে যখন স্ত্রী পুরুষ উভয়েই আত্মরক্ষা উপার্জন প্রভৃতি কার্যে সমানরূপে ভিড়বে— সুতরাং তখন পরিবার সেবার

> অনুরোধে মেয়েদের অধিকাংশ সময় গৃহে বদ্ধ থাকবার আবশ্যক হবে না— বাহিরে গিয়ে এই বিপুল বিচিত্র সংসারের সঙ্গে তাদের চোখাচোখি মুখোমুখি হাতাহাতি পরিচয় হবে, তৎসম্বন্ধে পূর্বেই বলেছি আর সমস্ত সম্ভব হতে পারে, স্বামীকে ছাড়তে পার, বাপভাইয়ের আশ্রয় লঙ্ঘন করতে পার— কিন্তু সন্তানকে তো ছাড়বার জো নেই। যে যখন গর্ভে আশ্রয় নেবে এবং নিদেন পাঁচ ছয় বৎসর নিতান্ত অসহায় ভাবে জননীর কোল অধিকার করে বসবে, তখন সমকক্ষ ভাবে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা মেয়েদের পক্ষে কী রকমে সম্ভব হবে। এই রকম সন্তানকে উপলক্ষ করে ঘরের মধ্যে থেকে পরিবারসেবা মেয়েদের স্বাভাবিক হয়ে পড়ে, এ পুরুষদের অত্যাচার নয়, প্রাকৃতিক বিধান।"

স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ব্যবধানের এই প্রাকৃতিক নিয়মের অলঙ্ঘনীয়তার জন্যই তখনকার রবীন্দ্রনাথের যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত ছিল— "অতএব আজকাল পুরুষাশ্রয়ের বিরুদ্ধে যে একটা কোলাহল উঠছে, সেটা আমার অসংগত এবং অমঙ্গলজনক মনে হয়।"

অন্দর-বাহিরের মধ্যে এক সুসমঞ্জস বাঁধন তৈরি করাই সে-সময়ে রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল, স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক ব্যবধান কৃত্রিম উপায়ে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধতাই করেছিলেন তিনি। অতএব পুরুষের প্রতি স্ত্রীর নির্ভরতাকে তিনি নারী স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক বলতে রাজি ছিলেন না, বরং তাকে ধর্ম বলেই চিহ্নিত করেছেন। এই রচনাটিতেই লিখেছেন তিনি:

> "পূর্বকালে মেয়েরা পুরুষের অধীনতাগ্রহণকে একটা ধর্ম মনে করত; তাতে এই হত যে, চরিত্রের উপরে অধীনতার কুফল ফলতে পারত না, অর্থাৎ হীনতা জন্মাত না, এমন-কি অধীনতাতেই চরিত্রের মহত্ত্ব সম্পাদন করত।... আমি দাসত্ব মনে করে যদি কারও অনুগামী হই তা হলেই আমি বাস্তবিক অধীন, আর আমি ধর্ম মনে করে যদি কারও অনুগামী হই তা হলে আমি স্বাধীন।"

অন্দর-বাহিরের বিভাজনে আলোচ্য নিবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় আর এক বক্তব্য ছিল, এবং তাঁর সমকালে সেই বক্তব্য ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি বিতর্কিত। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অতি উৎসাহ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন:

> "য়ুরোপে অনেক মেয়েই সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত পিয়ানো ঠং ঠং এবং ডোরেমিফা চেঁচিয়ে মরছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কটা Mozart কিংবা Beethoven জন্মাল। অথচ Mozart শিশুকাল থেকেই musician।... আসল কথা প্রতিভা একটা শক্তি (Energy), তাতে অনেক বল আবশ্যক, তাতে শরীর ক্ষয় করে। তাই মেয়েদের একরকম গ্রহণশক্তি ধারণশক্তি আছে, কিন্তু সৃজনশক্তির বল নেই।"

কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনে, শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে এই অবস্থার কি হেরফের ঘটতে পারে না? কবি নিজেই তুলেছেন সে-প্রশ্ন, উত্তরে নারীর অবস্থা অবশ্য পালটায় না। কেন না কেবল বই পড়ে বুদ্ধিবৃত্তির যথার্থ বিকাশ ঘটে না, "বহিঃপ্রকৃতির ভিতরে পড়ে যখন

সংগ্রাম করতে হয়, সহস্র বাধা বিঘ্ন যখন অতিক্রম করতে হয়, যখন বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধিতে ও জড় বাধাতে সংঘাত উপস্থিত হয়, তখন আমাদের সমস্ত বুদ্ধি জেগে ওঠে।"... "মেয়েরা হাজার পড়াশুনা করুক, এই কার্যক্ষেত্রে কখনওই পুরুষদের সঙ্গে সমান ভাবে নাবতে পারবে না। তার একটা কারণ শারীরিক দুর্বলতা। আর-একটা কারণ অবস্থার প্রভেদ।" অর্থাৎ সন্তান ধারণ ও প্রতিপালনের জন্য বেশ কিছু দিন গৃহরুদ্ধ হয়ে থাকার জন্যই নারীর শক্তি পুরুষের শক্তি থেকে ন্যূন।

গল্পগুচ্ছ-এ অন্তর্ভুক্ত প্রথম প্রায় পঞ্চাশটি গল্প লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের শেষ দুই দশকে। লিঙ্গ-রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে এই গল্পসম্ভারের অনেকগুলিতেই নর-নারীর পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে পেষক-পেষ্যের সম্পর্কের ছবিই ফুটে ওঠে। নারীর প্রতি পুরুষ ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নির্যাতন কতটা মর্মান্তিক হতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন এই সব গল্পে নানান দিক থেকে। মেয়েদের অসহায়তার ছবি এমন ভাবে ব্যক্ত হয়নি তখনকার বাংলা সাহিত্যের আর কোথাও যেমন ভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে *গল্পগুচ্ছ*-র গল্পে। 'শাস্তি' 'নিশীথে' 'দৃষ্টিদান' 'দেনাপাওনা' ইত্যাদি এসব গল্পের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত। আচারশাসিত অচলায়তন বাঙালি সমাজে নারীর অবস্থান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্ভেদী এই গল্পগুলিতে সমগ্র সমাজব্যবস্থার পীড়নমূলক রূপ যেভাবে প্রতিভাত হয়েছে, তার তুলনা মেলা ভার। থাকবন্দি পুরুষশাসিত সমাজে নারীর চূড়ান্ত অবমাননাকর ভূমিকা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তিই শুধু নয়, তাঁর মানবিক বেদনাও এই গল্পগুলিতে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বেদনা থাকলেও এমন কথা কি হলফ করে বলা যাবে যে অচলায়তন বাঙালি সমাজে স্ত্রী-পুরুষের পেষ্য-পেষকের সম্পর্ক ভাঙবার জন্য রবীন্দ্রনাথ অন্দর-বাহিরের বিভেদ কিংবা নারী-পুরুষের বৈষম্যে প্রাকৃতিক বিধানের অলঙ্ঘনীয়তাকে অস্বীকার করার পথে এগোচ্ছেন? ইতিহাসগত বিচারে সে-কথা বলা সঙ্গত হবে না। ১৯২৪ সালেও *পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরি*-তে কবি লিখেছেন:

> "প্রাণসৃষ্টি, প্রাণপালন ও প্রাণতোষণের বিচিত্র ঐশ্বর্য তার (নারীর) দেহে মনে পর্যাপ্ত। এই প্রাণসৃষ্টি বিভাগে পুরুষের প্রয়োজন অত্যল্প, এই জন্যে প্রকৃতির একটা প্রবল তাগিদ থেকে পুরুষ মুক্ত। প্রাণের ক্ষেত্রে ছুটি পেয়েছে বলেই চিত্তক্ষেত্রে সে আপন সৃষ্টিকার্যের পত্তন করতে পারলে। সাহিত্যে কলায় বিজ্ঞানে দর্শনে ধর্মে বিধিব্যবস্থায় মিলিয়ে যাকে আমরা সভ্যতা বলি সে হল, প্রাণপ্রকৃতির পলাতক ছেলে পুরুষের সৃষ্টি।"

কবির জীবনসায়াহ্নের অনেক রচনাতেও এই দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষ্য আছে।

অন্দর-বাহিরের বিভাজন তো তাহলে থেকেই গেল। নারীর জগৎ আর পুরুষের জগতের মধ্যে পার্থক্য বা সংসারের বিচিত্র কর্মে মেয়ে-পুরুষের ভূমিকার তফাত রবীন্দ্রনাথ মুছে ফেলতে চাননি কখনওই। কিন্তু অন্দর-বাহিরের এই বিভাজন কি স্ত্রীস্বাধীনতা থেকে নারীমুক্তির পথে যেতে রবীন্দ্রনাথকে বাধা দিয়েছিল কোথাও? এই প্রশ্নটা আমাদের কাছে জরুরি হয়ে ওঠে। বস্তুত নারীমুক্তির ভাবনা তো রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের কেন্দ্রীয়

বিষয় হয়ে উঠছে সেই ১৯১৪-১৫ থেকেই। *স্ত্রীর পত্র* প্রকাশিত হয়েছিল *সবুজপত্র*-এ ১৯১৪-তে। ওই একই বছরে *সবুজপত্র*-এ প্রকাশিত হয়েছিল 'হৈমন্তী' 'বোষ্টমী' 'অপরিচিতা'-র মতো গল্পগুলিও। আর তার অব্যবহিত পরেই *ঘরে-বাইরে* উপন্যাস।

রানী চন্দের লেখা *আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ* বইটিতে পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথের এ রকম এক ভাষ্য: "প্রথম আমি মেয়েদের পক্ষ নিয়ে 'স্ত্রীর পত্র' গল্প বলি। বিপিন পাল তার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু পারবেন কেন? তার পরে আমি যখনই সুবিধে পেয়েছি— বলেছি।" মেয়েদের পক্ষ নিয়ে শুধু নয়, *স্ত্রীর পত্র* সরাসরি নারীর জবানিতে লেখা নারীর আত্মমুক্তির স্বপ্ন। মৃণাল পুরুষতান্ত্রিক পারিবারিক কাঠামোর অন্দরমহলে কেবল কঠিন সংগ্রামই করে না, তার দ্বিতীয় জন্ম ঘটে। সে লেখে, 'আমিও বাঁচব, আমি বাঁচলুম।' স্বেচ্ছায় চরণতলাশ্রয়চ্ছিন্ন মৃণাল স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়ে দিয়েছিল "...আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।"

স্ত্রীর পত্র গল্পে মৃণাল স্বনির্মিত, সে তার নিজের বাচনে দ্রোহ প্রকাশ করে, আত্মমুক্তির কথা বলে। সে অন্দর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে।

অন্দর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার এই ছবি আছে *ঘরে বাইরে* উপন্যাসেও। কিন্তু সেখানে বিমলা বাইরে বেরিয়ে আসে নিখিলেশের সাহায্যে। নিখিলেশের সত্যাসক্তি, বিমলার নিজেকে বুঝে নেওয়ার জন্য তাকে ঘরের বাইরে নিয়ে আসার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিখিলেশের বাচনে আমরা শুনি কেবল স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা নয়, নারীমুক্তি ভাবনার কথা। বিমলাকে নিখিলেশ বলে, "...তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে কেবলমাত্র ঘরকরণাটুকু করে যাওয়ার জন্যে তুমিও হওনি, আমিও হইনি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।" এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ নারীমুক্তির যে-দর্শন উপস্থিত করেছেন, তাকে লিঙ্গ-অনপেক্ষ মুক্তি বলাই সঙ্গত বিবেচনা হবে। কেন না নিখিলেশের বাচনে আছে এ রকম আরও কিছু কথা:

> "শাস্ত্রে পড়েছিলুম ইচ্ছাটাই বন্ধন; সে নিজেকে বাঁধে, অন্যকে বাঁধে। কিন্তু, শুধু কেবল কথা ভয়ানক ফাঁকা। সত্যি যেদিন পাখিকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিতে পারি সেদিন বুঝতে পারি পাখিই আমাকে ছেড়ে দিলে। যাকে আমি খাঁচায় বাঁধি সে আমাকে আমার ইচ্ছেতে বাঁধে, সেই ইচ্ছের বাঁধন যে শিকলের বাঁধনের চেয়ে শক্ত। আমি আপনাকে (মাস্টারমশাইকে) বলছি। পৃথিবীতে এই কথাটি কেউ বুঝতে পারছে না। সবাই মনে করছে, সংস্কার আর কোথাও করতে হবে। আর কোথাও না, কোথাও না, কেবল ইচ্ছের মধ্যে ছাড়া।"

মনে রাখা দরকার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আত্মশক্তি রবীন্দ্রনাথের আজীবন লালিত দর্শন। *ঘরে বাইরে* এই আত্মশক্তির উপন্যাস। আর রাবীন্দ্রিক আত্মশক্তির

চিন্তা লিঙ্গ-অনপেক্ষ মুক্তিভাবনার ভিত্তি। কেবল *ঘরে বাইরে* নয়, *চতুরঙ্গ* উপন্যাসে দামিনী-শচীশ-শ্রীবিলাসের আখ্যানে, *যোগাযোগ*-এ কুমুদিনীর অভিজ্ঞতায়, *চার অধ্যায়*-এ এলা-অন্তুর রাজনীতি চর্চায় কিংবা *শেষের কবিতা*-য় অমিত-লাবণ্যের প্রেমের আখ্যানে ওই আত্মশক্তিরই আশ্রয়ে মুক্তিভাবনার প্রকাশ।

লিঙ্গ-অনপেক্ষতার এই দৃষ্টান্তগুলি মনে রেখে 'নারীর মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে (১৯২৮) রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন, "আজ আমরা অর্ধনারীশ্বরের অপেক্ষায় চেয়ে আছি। এই কথা বলছি প্রাণের ঐশ্বর্যে মেয়ে-পুরুষের অসমান ভাগ নয়, উভয়ের সম্মিলিত অখণ্ড সম্পদ," তখন আত্মশক্তির যথার্থ দর্শনের প্রকৃতিটি আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু এই অর্ধনারীশ্বরের কল্পনায় প্রাকৃতিকতার নিয়মে মেয়েদের বা পুরুষের পৃথক সামাজিক অবস্থান বা ভূমিকার প্রসঙ্গ গৌণ হয়ে যায় না, প্রতিবন্ধকতার কাজও করে না কেন না "বৈষম্য শক্তিকে জাগরূক করে, সাম্যে আনে তার নিষ্ক্রিয়তা।"

রবীন্দ্রসাহিত্যে নারী-পুরুষের বিভেদ আগাগোড়াই স্বাভাবিক, অন্দর-বাহিরের ভেদকে কৃত্রিমভাবে বিনাশের প্রচেষ্টা সমর্থন পায়নি। কিন্তু সে-ভেদ শোষণমূলক হয়ে উঠবে না যদি তা যথার্থ শিক্ষা ও চেতনার দ্বারা শোধিত হয়। মুক্ত সাংস্কৃতিক চেতনা ও শিক্ষার গুরুত্ব কোথায় এবং কীভাবে সে-কথা বলতে গিয়েই এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

> "জীবনের পরিধি সংকীর্ণ হলে শুধু ইনস্টিংক্টের জোরেই চলে, কিন্তু বড়ো ক্ষেত্রে দেহ-মন-হৃদয়ের পরিপূর্ণ শিক্ষা চাই। বর্বরতার ক্ষুদ্র সীমায় ইনস্টিংক্টের স্থান আছে, সভ্যতার বড়ো সীমায় সে দুর্বল। মেয়েকে পূর্ণশক্তিতে আজ মেয়ে হতে গেলে তার সমস্ত মানবিক শক্তির পূর্ণ বিকাশ আবশ্যক।"

১৯২৭ সালে *প্রবাসী* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে ছিল দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এক আলাপচারিতা। তার শীর্ষনাম ছিল 'সমাজে নারীশক্তির প্রভাব।' এই আলাপচারিতাতে উঠে এসেছিল নারীর প্রেরণাদায়ী শক্তির কথা, শক্তি-সঞ্চারিণী, হ্লাদিনী শক্তির প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন:

> "সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ধর্মতন্ত্র গঠন, অর্থ অর্জন, তত্ত্বান্বেষণ, জ্ঞান ও কর্মের যোগসাধন, ভাবকে রসকে রূপদান প্রভৃতি নানা উদ্যোগ নিয়ে মানবসভ্যতাকে সৃষ্টি করে তোলা মুখ্য ভাবে পুরুষের দ্বারা ঘটেছে। এই সৃষ্ট কার্যে মেয়েদের ব্যক্তিরূপের যে প্রভাব সে হচ্ছে পুরুষের চিত্তকে গৌণ ভাবে সক্রিয় করে তোলা। আমাদের দেশের জ্ঞানীরা স্ত্রী-পুরুষের মনোমিলনের এই রহস্যকে স্বীকার করছেন তাই মেয়েদের বলেচেন শক্তি অর্থাৎ জৈব-সৃষ্টিতে পুরুষের যে স্থান মানস-সৃষ্টিতে সেই স্থান মেয়েদের।"

নর-নারীর বিবাহ-প্রসঙ্গ ছিল এই আলাপচারিতার এক বড় অংশ। প্রেরণাদায়ী স্ত্রীর ভূমিকা এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিষয়ে কথা উঠতে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের সম্পত্তিবিশেষ নয়, তার ওপর প্রভুত্ব খাটানো চলে না, দাম্পত্য সম্পর্কের ভিত্তি

যথার্থ প্রেম, পারস্পরিক প্রেরণার শক্তি। কবি জানিয়েছিলেন, "প্রভুত্ব নিয়ে মানুষ বড়াই করে কেননা প্রভুত্ব বর্বরতার অঙ্গ, প্রভাব নিয়ে বড়াই করে না, সেটা গায়ের জোরের উপরের কথা।" রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছিলেন:

> "বিবাহে তার সাধনা হচ্ছে, স্ত্রীকে মন্ত্র প'ড়ে পেয়েছি বলেই তাকে স্থূল বস্তুর মতো পেয়েছি এমন কথা মনে করার অপরিসীম মূঢ়তা ঘুচিয়ে দেওয়া, এই কথা অন্তরের সঙ্গে জানা যে, মানুষকে দখল না করলেই তবেই তাকে লাভ করা সম্ভব হয়। পরকীয়া-সাধনের তত্ত্বটা মিথ্য নয়,— তার মানেই হচ্চে পরকীয়া নারী আমার বাধ্য নয় বলেই আমার পরে তার শক্তি এত প্রবল, তার প্রেমের এত মূল্য। এই জন্য বিবাহ যখন বর্বরযুগের স্থূল শাসনের থেকে মুক্তি পাবে তখন সকল বিবাহেই পরকীয়া-সাধন প্রচলিত হবে, তখন স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য আছে বলেই তার মূল্য পুরুষের কাছে বেশি হবে। বিবাহে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে এই পরকীয়া-সাধনের যুগ এসেছে বলেই আশা করি। যদি এসে থাকে তবে মূঢ়তা ক'রে আমরা যেন সেই সাধনার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হই।"

এই হ্লাদিনী শক্তির প্রেক্ষিতেই আমাদের মনে পড়বে ১৯২৩-এ প্রকাশিত *রক্তকরবী* নাটকের নন্দিনীর কথা। যক্ষপুরীর যান্ত্রিকতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, ক্ষমতালিপ্সার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত নন্দিনী, বাহ্য রূপের সৌন্দর্যে নয়, মাধুর্যের শক্তি দিয়ে নন্দিনী জাগাবার চেষ্টা করে ব্যক্তিস্বরূপ— লিঙ্গ-অনপেক্ষ ব্যক্তিসত্তা তথা সমাজসত্তা। ঠিকই বলেছেন অধ্যাপিকা সুতপা ভট্টাচার্য তাঁর *সে নহি নহি: রবীন্দ্র-সাহিত্য নারীমুক্তি-ভাবনা* বইটিতে "সৌন্দর্যের টানে উর্বশী জাগায় শরীর, আর মাধুর্যের শক্তিতে নন্দিনী জাগায় স্বরূপ। তরুণ বয়সে সমাজে নারীর সৌন্দর্য-শক্তির প্রসার দেখতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, পরিণত বয়সে প্রত্যাশা করলেন নারীর মাধুর্যশক্তির প্রভাব।" আর কী সেই মাধুর্যের সংজ্ঞা? কবি নিজেই বলেছেন, "মাধুর্য লালিত্য নয়, তার সঙ্গে ধৈর্যত্যাগ সংযমযুক্ত চারিত্র্যবল, সহজ বুদ্ধি, সহজ নৈপুণ্য, চিন্তায় ব্যবহারে ভাবে ও ভঙ্গিতে শ্রী প্রভৃতি নানা গুণের মিশেল আছে।"

প্রসঙ্গত, আমাদের দেশের নারীবাদীরা অনেকেই *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাটকটিতে লিঙ্গ-অনপেক্ষতার অভাব দেখতে পান। হয়তো তাই, কারণ লিঙ্গ-অনপেক্ষতার যে-দর্শন নিয়ে তাঁরা ভাবিত তার সঙ্গে রাবীন্দ্রিক দর্শন পুরোপুরি মেলে না। রাবীন্দ্রিক লিঙ্গ-অনপেক্ষতার চিন্তায় মেয়ে-পুরুষের প্রাকৃতিক ব্যবধান অলঙ্ঘনীয়ই থেকে যায় এবং পুরুষ-নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে Law of compensation দেখতে চান রবীন্দ্রনাথ, কিংবা *Creative Unity* গ্রন্থে কবি যখন লেখেন:

"True womanliness is regarded in our country as the saintliness of love' এবং 'Thus the Eastern woman, who is deeply aware in her heart of the sacredness of her mission, is a constant education to man." তখন চিত্রাঙ্গদার আর্তিতে লিঙ্গপ্রাধান্য ছাপিয়ে অন্য এক বোধও কাজ করে এবং তাকে অসঙ্গতও মনে হয় না। কী ছিল সেই আর্তি—

দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।...

চিত্রাঙ্গদা লিখেছিলেন কবি ১৮৯২ সালে। ১৯৪০-এ বিশ্বভারতী-রচনাবলীর অন্তর্গত করবার সময়ে রবীন্দ্রনাথ লিখে দিলেন তার এক 'সূচনা' নিবন্ধ। তার থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধার করে কবি-মানসের বিশ্লেষণ শেষ করা যাক। 'সূচনা'য় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"...সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তা হলে সে তার সুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্যে। যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চরিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চারিত্রশক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।"

ঈশিতা চক্রবর্তী

অন্দর থেকে বাহির, বাহির থেকে অন্দর: আত্মকথনে বাঙালি মেয়েরা (১৮০৯-১৯৩৪)

১. আত্মকথার তত্ত্বকথা

প্রথম বাঙালি আত্মকথা রচয়িতা রাসসুন্দরী দেবী (১৮০৯-১৯০০) শ্বশুরবাড়িতে সবাইকে লুকিয়ে নিজের চেষ্টায় অক্ষর চিনতে শিখেছিলেন *চৈতন্য ভাগবত* পড়বেন বলে। ইচ্ছে মতো চলাফেরার স্বাধীনতার অভাবে মায়ের মৃত্যুশয্যায় পৌঁছতে পারেননি বলে তাঁর বড় ক্ষোভ ছিল। আত্মকথা *আমার জীবন* (১৮৭৬)-এ সেই ক্ষোভের কথা লিখেছিলেন: "আমার নারীকুলে কেন জন্ম হইয়াছিল? আমার জীবন ধিক্। ...এমন যে দুর্ল্লভ বস্তু মা, এই মায়ের সেবা করিতে পারি নাই। আহা আমার এ দুঃখ রাখিবার কি স্থান আছে? আমি যদি পুত্রসন্তান হইতাম আর মা-র আসন্ন কালের সম্বাদ পাইতাম, তবে আমি যেখানে থাকিতাম, পাখির মতো উড়িয়া যাইতাম। কি করিব, আমি পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গী।"[১] রাসসুন্দরীর অর্ধশতাব্দীরও পরে জন্ম শারদামঞ্জরী দত্তের (১৮৭২-১৯৫৪)। ততদিনে বাংলাদেশে সমাজসংস্কার আন্দোলনের কল্যাণে মধ্যবিত্ত বিশেষত ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর রেওয়াজ হয়েছে। শারদামঞ্জরী সেই হাতে গোনা বাঙালি মেয়েদের অন্যতম যাঁরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বিশ শতকের গোড়ায় চাকরিও করেছিলেন। কিন্তু সংস্কার আন্দোলন যে সীমিত সুযোগ তাঁকে দিয়েছিল, শারদামঞ্জরী তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। অতৃপ্ত বাসনার কথা জানিয়েছিলেন মেয়েকে লেখা এক চিঠিতে: "আমার ইচ্ছা করে দেশের দুর্গতি দেখিয়া সর্বদা কাগজপত্রে ওইসব বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে, বক্তৃতাদি দ্বারা দেশের লোকের মন হইতে ভ্রম ও কুসংস্কার দূর করিতে। কিন্তু সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া এ সকল সহজসাধ্য নহে।"[২] আশা করেছিলেন নিজে যা পারেননি সেটা তাঁর মেয়ে করে দেখাবে: "তুমি বিদ্যাবতী ও ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া আপনার জীবন সার্থক করিবে এবং আমার মুখ উজ্জ্বল ও স্বদেশস্থ দুর্ভাগা স্ত্রীলোকদিগের সৌভাগ্যসাধনে যত্ন করিবে আমার চিরদিনের এই আশা যেন বিফল করিও না। আমি যে তোমার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিতেছি, তুমি সচ্চরিত্রা ও বিদ্যাবতী

হইলে সে সকল আমার সার্থক হইবে।"[৩] শারদামঞ্জরীর মেয়ে সুবর্ণপ্রভা দাস (১৮৯০-১৯৬৪) তাঁর ডায়েরিতে মায়ের চিঠিগুলি উদ্ধৃত করেছেন। উনিশ শতকের বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক রাজনারায়ণ বসুর মেয়ে ও জাতীয়তাবাদী, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হোতা কৃষ্ণকুমার মিত্রের স্ত্রী লীলাবতী (১৮৬৪-১৯২৪) তাঁর অন্তিম শয্যায় আক্ষেপ করেছিলেন, মাত্র কয়েক বছর স্কুলে পড়ার বিদ্যায় যে সব মহৎ চিন্তা ও অনুভবের কথা প্রকাশ করার ইচ্ছে ছিল, তার কিছুই করে উঠতে পারেননি।[৪] রাসসুন্দরীর ঠিক একশো বছর পরে যাঁর জন্ম সেই সৈয়দা মনোয়ারা খাতুন (১৯০৯-১৯৮১) আত্মজীবনীতে লিখেছেন রাস্তায় নেমে বয়কট-পিকেটিং আন্দোলনে যোগ দিতে না পেরে তাঁর অস্থিরতার কথা। লিখেছিলেন শুধু ঘরে বসে চরকা কেটে মন ভরে না: "শুধু এইটুকুতে যেন তৃপ্তি হয় না। আরও করবার জন্য প্রাণটা উসখুস করে। কিন্তু কেন আমরা পারি না? আমাদের কথা কেউ শোনে না, শুধু অবরোধের প্রাচীরে মাথা কুটে মরবার জন্যই আমাদের সৃষ্টি না কি? ফ্রান্সের চাষার মেয়ে জোয়ান অব আর্ক যা যা করেছিল আমরা ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে তা পারি না কেন?"[৫] রাসসুন্দরী থেকে মনোয়ারা পর্যন্ত একশো বছরে বাঙালি মেয়ের নিজের জীবন নিয়ে এই সমষ্টিগত অতৃপ্তির খোঁজে যদি তাঁদের আত্মজীবনীমূলক লেখাপত্রে আরও হাত বাড়াই তা হলে তালিকাটা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে। কিন্তু সমকালীন বিখ্যাত অথবা কম খ্যাত বাঙালি পুরুষের আত্মকথায় এই সমষ্টিগত চেতনা ও ব্যর্থতাবোধ এত প্রকট নয়।

তা হলে কি মেয়েরা যখন নিজের জীবনের কথা লেখেন তখন পুরুষের থেকে অন্য রকম করে অন্য কথা লেখেন? অর্থাৎ লেখার ভঙ্গি, কোন বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হবে অথবা হবে না সে সব নারী ও পুরুষ ভেদে আলাদা হয়? যদি আলাদা হয় তা হলে এই তফাত কেন? মেয়েদের আত্মজীবনী কি একই রকম, না নানা রকম? গত তিন দশকের নারীবাদী চিন্তা এই বিষয়টি নিয়ে ভেবেছে। ইংরেজি ভাষায় মেয়ে ও পুরুষের আত্মকথনের পার্থক্যগুলি একটি তাত্ত্বিক কাঠামোয় ধরে দেখার চেষ্টার শুরু এস্টেল সি জেলিনেক সম্পাদিত মেয়েদের আত্মজীবনী বিষয়ক প্রবন্ধাবলি (জেলিনেক, ১৯৮০)।[৬] আঠারো শতকের ইংল্যান্ডে লেখা মেয়েদের আত্মকাহিনিতে প্রধান তিনটি ঝোঁক সনাক্ত করেছেন জেলিনেক: ঐতিহাসিক ঘটনার তুলনায় ব্যক্তিগত বিবরণের উপর জোর; চাকরি-বাকরি ও অন্যান্য বহির্জগতের কৃতিত্বের তুলনায় পারিবারিক জীবনে বেশি আগ্রহ; কালানুক্রম মেনে ঘটনা বর্ণনার বদলে আগে-পরে এলোমেলো গদ্য। ঠিক বিপরীত গুণগুলি দিয়ে ওই শতকের পুরুষের আত্মকথা চেনা যায় বলে মনে করেন জেলিনেক। পার্থক্যের বিষয়টি বিশেষ করে জোর দিতে মেয়েদের আত্মকথার জন্য ডমনা সি স্ট্যানটন তৈরি করেছেন নতুন একটি শব্দ— অটোবায়োগ্রাফির বদলে অটোগাইনোগ্রাফি (স্ট্যানটন, ১৯৮৭)।[৭] লিঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি যোগ করে যাঁরা সাহিত্য সমালোচনায় নতুন মাত্রা এনেছেন তাদের মধ্যে সিডনি স্মিথ মনে করেন: আত্মজীবনী নামে সাহিত্যিক ধারাটি বিশেষ ভাবে পুরুষালি (স্মিথ, ১৯৮৭)।[৮] তাঁর মতে, 'আমি' শব্দটি মেয়েদের মুখে অপ্রত্যাশিত, কারণ লিঙ্গ মতাদর্শে মেয়েদের জীবনকাহিনি মূল্যহীন, পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে তা একটি ছেদ বা শূন্যস্থান। আদর্শ

নারী নিজেকে মেলে না ধরে মুছে ফেলতে সচেষ্ট হবে। নিজের জীবন যদি সে লেখেও তা হলে লিখবে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিবরণ, কখনও তা হবে না অন্দরমহলের বাইরের, ইতিহাসের বড় সময়ের সাক্ষী। লিঙ্গ রাজনীতির শিকার হিসেবে দেখিয়ে মেয়েদের আত্মকথনকে এ হেন একমাত্রিক ছকে বেঁধে ফেলার চেষ্টার বিরুদ্ধে সঙ্গত আপত্তি করেছেন ডরিস সমনার (সমনার, ১৯৮৮)।[৯] লাতিন আমেরিকার মেয়েদের নিজ জীবনের সাক্ষ্য আলোচনা করে সমনার দেখাতে চেয়েছেন: মেয়েলি আত্মকথার কোনও একমাত্রিক সংজ্ঞা হয় না। সমনার-আলোচিত মেয়েরা তাদের অতি ব্যক্তিগত যন্ত্রণার, রাষ্ট্রীয় পীড়নের বিবরণ দিয়েছেন নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে। তাদের বাচনে 'আমি' শব্দটি এসেছে 'আমরা' বোঝাতে। আত্মকথনে ব্যক্তি মেয়ে সব সময়েই মনে রেখেছে যে সে এক গোষ্ঠীর সদস্য।

মেয়েদের আত্মকথা নিয়ে এই বিতর্ক পরিপ্রেক্ষিতে রেখে পড়ার চেষ্টা করা যেতে পারে গত প্রায় দেড় শতক ধরে বাঙালি মেয়েদের লেখা আত্মজীবনীমূলক রচনা। জেলিনেক আঠেরো শতকের যে মেয়েদের আত্মজীবনী বিশ্লেষণ করেছেন তাঁদের জন্ম ও কর্ম শিল্প বিপ্লব পূর্ব ইংল্যান্ডে। শিল্পবিপ্লব-উত্তর উনিশ শতকের ইংল্যান্ড এক গণ নারী জাগরণের সাক্ষী, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের চেষ্টায় পিতৃতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রের সঙ্গে লড়াইয়ের সাক্ষী। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাস অনেকটাই আলাদা। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সূচনায় সামাজিক সংস্কার আন্দোলন ও শেষ দিকে জাতীয়তাবাদের নির্মাণ দেশীয় সমাজের ভিতরকার বিরোধগুলি হয় নিয়ন্ত্রিত সমাধানে নয় ঢাকাচাপা দিয়ে রাখতে সচেষ্ট ছিল। এক স্বরে কথা বলার নির্দেশ বাঙালি মেয়েরা কতটা মান্য করেছিলেন বা করেননি তা খতিয়ে দেখার উপযুক্ত ক্ষেত্র তাঁদের আত্মকথা।

ভিখু পারেখ অবশ্য মনে করেন আত্মকথা লেখার আবশ্যক শর্তগুলি ভারতীয় সমাজে বিকশিত না হওয়ায়, আঠেরো শতক থেকে ইউরোপে যেমন লেখা হয়েছিল, সমকালীন ভারতীয়েরা তেমন আত্মকথা লেখেননি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য চেতনার মতো প্রয়োজনীয় শর্তগুলি ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে বিকশিত হতে শুরু করলেও গোড়ার দিকের ভারতীয় আত্মকথাগুলি কাঠামোগত ভাবে দুর্বল। ভারতীয় মনে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে মুগ্ধ বিস্ময়বোধ ক্রমশ কমে এলে এ দেশীয় আত্মকথন আধুনিক অর্থে আত্মজীবনী হয়ে ওঠে (পারেখ, ১৯৮৯)।[১০] পারেখ অবশ্য ভারতীয় আত্মজীবনী বলতে কেবল পুরুষের লেখাই বুঝেছেন। মেয়েদের আত্মকথা নিয়ে মাথা ঘামাননি।

২. সংস্কার আন্দোলন ও বাঙালি মেয়ে

উনিশ শতকের বাংলায় সমাজসংস্কার আন্দোলনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য হয়ে উঠেছিল নারীপ্রশ্ন। ভারতীয় সমাজে মেয়েদের হীনাবস্থার সমালোচনা শুরু করেন একদল প্রভাবশালী ব্রিটিশ লেখক যাঁরা ভাবতে ভালবাসতেন যে ভারতীয়দের 'সভ্য' করার দায় তাঁদের উপর বর্তেছে। ইংরেজি শেখা বাঙালি ভদ্রলোক খুব তাড়াতাড়ি এই সমালোচনায় কান দেয় ও সতীদাহ-বাল্যবিবাহ বন্ধ, নারীশিক্ষার প্রসার ইত্যাদি সংস্কারের কাজে উদ্যোগী হয়। তবে ঔপনিবেশিক

সমালোচক ও বাঙালি ভদ্রলোক উভয়েরই নারী স্বাধীনতা সম্বন্ধে লক্ষ্য ছিল অতি সীমিত। ব্রিটিশ প্রশাসকেরা আশা করেছিলেন, এ দেশের মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে সিভিল সার্ভিসের দেশীয় কর্মচারীরা শিক্ষিত বউ পাবেন; তাঁদের দাম্পত্য সুখের হবে এবং তাতে আখেরে লাভ হবে সরকারের। তা ছাড়া শিক্ষিত মায়েরা সাম্রাজ্যের প্রতি অনুগত প্রজাকুলের জন্ম দেবে এমন আশাও করা হয়েছিল।[১১] অন্য দিকে ইংরেজি শেখা বাঙালি ভদ্রলোক তাঁদের দাম্পত্যজীবন গড়তে চেয়েছিলেন ভিক্টোরীয় আদর্শে। চেয়েছিলেন স্ত্রী হবেন আদর্শ সঙ্গিনী। অর্থাৎ নারী কল্যাণের উনিশ শতকীয় ধারণা মেয়েদের আদর্শ মা ও বধূর নতুন ছাঁচে গড়েপিটে নিতে চেয়েছিল। সংস্কারের লক্ষ্য নারীস্বাধীনতা ছিল না। অজ্ঞ, অশিক্ষিত মেয়েদের মনে করা হয়েছিল আধুনিকতার লক্ষ্য পূরণে বাধা। আবার 'ভুলশিক্ষায় শিক্ষিত' বা 'অতিশিক্ষিত' মেয়েদের দেখা হত আদর্শ নৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে বিপজ্জনক বলে।[১২] উনিশ শতকের হিন্দু বাঙালির সংস্কার প্রচেষ্টার এই সীমাবদ্ধতার কথা আলোচনা করেছেন সুমিত সরকার,[১৩] পার্থ চট্টোপাধ্যায়[১৪] প্রমুখ। এক-ই ভাবে মুসলমান সমাজের কথা বলেছেন গেল মিনল্ট।[১৫] আধুনিক ইতিহাসবিদদের হাতে উনিশ শতকের 'নবজাগরণের' এই বিনির্মাণ মেয়েদের দেখেছে হয় সংস্কারক নয় জাতীয়তাবাদী ভদ্রলোকের আজ্ঞাবাহক হিসেবে। মালবিকা কার্লেকর অবশ্য আত্মজীবনীর সাক্ষ্য ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে, উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি মেয়েরা কেউ কেউ নিজেদের জন্য স্বাধীন পরিসর তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন।[১৬] জেরাল্ডিন ফোর্বস লিখেছেন, উনিশ শতকের শেষার্ধে সরলা দেবী চৌধুরানীর মতো মেয়েরা তাঁদের সময়ের তুলনায় ব্যতিক্রম হলেও ওই সময় থেকে বাঙালি মেয়েরা নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রণের পথে প্রথম পদক্ষেপ করেছিলেন।[১৭]

১৮৫০ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে কবিতা, উপন্যাস ও আত্মজীবনী মিলিয়ে বাংলাদেশের মেয়েদের রচিত অন্তত শ-চারেক সাহিত্যকর্ম ও তাঁদের সম্পাদিত একুশটি পত্র-পত্রিকার সন্ধান পাওয়া যায়।[১৭] ১৮০৯ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে জন্ম এমন বাঙালি মেয়েদের অন্তত ষাট জন আত্মকথামূলক রচনা প্রকাশ করেছেন।[১৮] এর উপরে ব্যক্তিগত সংগ্রহে অপ্রকাশিত আত্মকথা তো রয়েছেই। প্রথম যুগের শিক্ষিত বাঙালি মেয়েরা এত জন আত্মকথা লিখতে উৎসাহী হলেন কেন সে প্রশ্নটা বিশেষ ভাবে ভেবে দেখা দরকার। আধুনিক আত্মজীবনী রচনার একটি অন্যতম প্রয়োজনীয় শর্ত নিজের অভিজ্ঞতা অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার মতো প্রস্তুত পাঠকের উপস্থিতি। উনিশ শতক শেষের আত্মকথা রচয়িতা বাঙালি মেয়েরা সেই প্রস্তুত পাঠকগোষ্ঠী পেয়েছিলেন কি না তা তাঁদেরই একজন— বিখ্যাত অভিনেত্রী বিনোদিনীর (১৮৬৩-১৯৪১) কলমে পড়া যাক। বিনোদিনী তাঁর আত্মকথা-র (*আমার কথা ও অন্যান্য রচনা*, সুবর্ণরেখা, ১৩৯৪) ভূমিকায় লিখেছিলেন, যেহেতু তিনি একজন পতিতা, বারবণিতা— সমাজের বাইরের মানুষ তাই নিজের দুঃখ ভাগ নেওয়ার মতো কাউকে পাননি: "আমার আত্মীয় নাই, সমাজ নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, এই পৃথিবীতে আমার বলিতে এমন কেহই নাই।"[১৯] যে সমাজ তাঁকে অপাংক্তেয় করে রেখেছে আত্মকথা লিখে এই প্রতিভাময়ী শিল্পী যেন তাকেই জোর করে

নিজের কথা শোনাতে চান। আত্মকথার সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় (শিরোনাম: 'আমার এই মর্মবেদনা গাথার আবার ভূমিকা কি'?) অন্তত পাঁচবার নিজের পতিতা পরিচয়ের উল্লেখ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

উনিশ শতকে বড় হয়ে ওঠা অন্য যে বাঙালি মেয়েরা আত্মকথা-স্মৃতিকথা লিখেছিলেন তাঁরা অবশ্য প্রায় সবাই সমাজের অন্দরের বাসিন্দা, মধ্য ও উচ্চবিত্ত পরিবারের, প্রধানত ব্রাহ্ম বা বর্ণহিন্দু। তবু বিনোদিনীর মতোই রাসসুন্দরী, নিস্তারিণী, মনোদা দেবী, প্রসন্নময়ীও তাঁদের আত্মকথায় সমাজের কাছে পাওয়া বঞ্চনা ও বৈষম্যের কথা শুনিয়েছেন। 'ভদ্র সমাজে' অপাংক্তেয় নটীর অভিজ্ঞতায় যে প্রান্তিকতার চেতনা তারই প্রতিধ্বনি জমিদারগৃহের অন্দরমহলে। তবে গুণগত তফাতও ছিল। রাসসুন্দরী নিস্তারিণীদের পরের প্রজন্মের আত্মকথায় প্রান্তিকতার চেতনা প্রবল— কিন্তু সেই প্রান্তিকতা বিনোদিনীর অভিজ্ঞতার মতো নিঃসঙ্গ নয়, সমষ্টিগত। জ্ঞানদানন্দিনী (১৮৫০-১৯৪১), শারদামঞ্জরী (১৮৭২-১৯৫৪) অথবা সৈয়দা মনোয়ারা (১৯০৯-১৯৮১) এটা জেনেই আত্মকথা লিখেছিলেন যে তাঁদের কথা শোনার জন্য প্রস্তুত, তাঁদের অভিজ্ঞতার সহমর্মী পাঠকগোষ্ঠী রয়েছে, তা সে আকারে যতই ক্ষুদ্র হোক। এমনকী রাসসুন্দরীও হয়তো সেটা জানতেন। তাই নিজেকে মনে করেছিলেন 'নারীকুলের' সদস্য, দুর্ভাগা এক নির্বান্ধব মানুষ নন। উনিশ শতক শেষের মেয়েলি আত্মকথামূলক রচনায় (যার মধ্যে চিঠিপত্র, জীবনী ও এমনকী কাব্য-উপন্যাসকেও প্রসঙ্গত আলোচনায় আনা যায়) অবরোধের পীড়ন, শিক্ষার গুরুত্ব, নারীজীবনের বৃহত্তর উদ্দেশ্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ ঘুরেফিরে আসে যেন এক ছড়ানো সংলাপের মতো— অধিকারী যে-কেউই যাতে যোগ দিতে পারে।

রাসসুন্দরী ও তাঁর প্রায় সমকালীন সারদাসুন্দরী দেবী (১৮১৯-১৯০৭), কৈলাসবাসিনী মিত্র (১৮২৯-১৮৯৫), নিস্তারিণী দেবী (১৮৩৩-১৯১৬)— এই চার জনকে বলতে পারি আত্মকথা রচয়িতা বাঙালি মেয়েদের প্রথম প্রজন্ম। প্রখ্যাত ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের মা সারদাসুন্দরী ও সমাজ সংস্কারক কিশোরীচাঁদ মিত্রের স্ত্রী কৈলাসবাসিনী সম্ভবত আত্মকথা রচনার উৎসাহ পেয়েছিলেন তাঁদের পারিবারিক আবহে। আধুনিক শিক্ষার পরোক্ষ প্রভাব থেকেও সম্পূর্ণ বঞ্চিত জমিদার গৃহিণী রাসসুন্দরী দিনের বেলায় স্বামীর মুখ দেখতে তো পেতেনই না, স্বামীর ঘোড়াটা সামনে পড়লেও মাথায় কাপড় দিতেন বলে আত্মকথায় লিখেছেন।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫০-১৯৪১), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), শরৎকুমারী চৌধুরানী (১৮৬১-১৯২০), শরৎকুমারী দেব (১৮৬২-১৯৪১), লীলাবতী মিত্র (১৮৬৪-১৯২৪), শারদামঞ্জরী দত্ত (১৮৭২-১৯৫৪) প্রমুখ দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের আত্মকথা লেখকেরা আধুনিক শিক্ষার সুযোগ লাভ করেছিলেন। সংস্কারপন্থী ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়ে অথবা বউ হওয়ার সুবাদে এঁদের অনেকেই সমকালীন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলনের মূল তর্কগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে বেড়ে উঠেছিলেন। রাসসুন্দরী-নিস্তারিণীর বন্দি গৃহজীবনের তুলনায় তাঁদের বিচরণের পরিসরও বেড়েছিল। উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক-সামাজিক

আন্দোলনের পুরোধা ঠাকুর পরিবারের বউ জ্ঞানদানন্দিনী, মেয়ে স্বর্ণকুমারী সমকালীন নারী স্বাধীনতার ধারণার মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। বাড়ির বিখ্যাত পুরুষদের পৃষ্ঠপোষণা অধিকাংশ সময়েই তাঁরা লাভ করেছিলেন। লেখিকা স্বর্ণকুমারীর মেয়ে সরলা (১৮৭২-১৯৪৫) বাড়ি থেকে দূরে মহীশূরে চাকরি করতে গিয়ে, প্রকাশ্য জনসভায় জাতীয়তাবাদী গান গেয়ে, স্বাধীনতার মন্ত্রে অল্পবয়সি যুবকদের দীক্ষিত ও সমবেত করে কী রকম হইচই ফেলে দিয়েছিলেন তার একাধিক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায় তাঁর আত্মজীবনী *জীবনের ঝরাপাতা*-য় (পৃ. ১২৩-২৪)।[২০]

বিখ্যাত পরিবারের মেয়ে অথবা বউ না হয়েও, শিক্ষার সীমিত সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজের জীবন পালটে ফেলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এমন মেয়েদের উদাহরণ দুর্লভ নয়। সুদক্ষিণা সেন (১৮৫৯-১৯২৪) *জীবনস্মৃতি* (১৯৩২) নামে তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন তাঁর মা নিত্যকালীর সাহসিকতার বিবরণ।[২১] সমাজসংস্কারের অনুরাগী স্বামীর মৃত্যুর পরে নিত্যকালী তাঁর তিনটি নাবালক সন্তানকে নিয়ে ঢাকা জেলায় বাপের বাড়ির গ্রামীণ আশ্রয় ছেড়ে পাড়ি দিয়েছিলেন কলকাতা শহরে। উদ্দেশ্য ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়া, ছেলেমেয়েদের যথাযথ লেখাপড়া শেখানো ও মেয়েরা প্রাপ্তবয়স্ক হলে তবে বিয়ে দেওয়া। কুলীন বাড়ির বধূ নিত্যকালী মেয়ে সুদক্ষিণার বিয়ে দিয়েছিলেন তার ষোল বছর বয়সে এবং অব্রাহ্মণ পাত্রের সঙ্গে। সুদক্ষিণা স্মরণ করেছেন: "মাতৃদেবী জাতিভেদ অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন; বিশেষত জাতিতে বিবাহ হইলে হিন্দু সমাজে ফিরিয়া যাইবার আশঙ্কাও তাঁহার মনে ছিল। দুই-একজন ব্রাহ্মণ সন্তান প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন। মাতৃদেবীর তাঁহাদের প্রতি তেমন আগ্রহ দেখা যায় নাই। ...কোন বন্ধু শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেনের নাম করাতে মাতৃদেবী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং এই বিবাহ যাহাতে সম্পন্ন হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন।"[২২]

সরলা লিখেছেন মহীশূরে মহারানী গার্লস স্কুলে পড়াতে যাওয়াটা বস্তুত তাঁর শখ ছিল। শখ মিটে যেতে ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে এসেছিলেন (পৃ. ১২৪), সেটা বিশ শতকের প্রথম দশকের কথা। ওই একই সময়ে অখ্যাত পরিবারের মেয়ে, অখ্যাত পরিবারের বউ শারদামঞ্জরী শিলং-এ স্কুলে পড়িয়েছিলেন সংসার ভালভাবে চালানোর জন্য, কেন না তাঁর স্বামী নবগোপালের রোজগার তেমন ছিল না। দুই মেয়েকে কলকাতায় বোর্ডিং-এ রেখে বি এ পাশ করিয়েছিলেন মা। সেও তাঁর নিজের রোজগারে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হয়েছিলেন, নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন জনহিতকর নানা কাজে। ধর্মভীরু, মেয়েদের লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী শারদামঞ্জরী নারীস্বাধীনতা বলতে বুঝেছিলেন নিজের দেহ ও যৌনতার ব্যাপারে মেয়েদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও। আত্মজীবনী *মহাযাত্রার পথে* (১৯৪১)-তে তিনি লিখেছেন: "তৃতীয় কন্যার জন্মের পর মনে একটি নূতন চিন্তার আবির্ভাব হইল। নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিলাম, জনক-জননীর উপর অধিক সন্তানের চাপ থাকিলে ধর্ম-কর্ম সাধন-ভজনের ব্যাঘাত ঘটে। অধিক সন্তানের লালন-পালনে জননীর স্বাস্থ্য ভাঙিয়া যায়। ...নিজেদের

সামর্থ্য বুঝিয়া যে পরিমাণ শিশু গৃহে আসিলে...তাহাদের ভবিষ্যৎ সুখের করিয়া গড়া যায়...সেই পরিমাণ শিশু গৃহে জন্মলাভ করা উচিত। এই উপায় অবলম্বন করিতে হইলে মাতাপিতার পরস্পরের সংযম ও *স্বাধীনতা* থাকা কর্তব্য। ...যখন স্বামীর নিকট আপন মনোভাব ব্যক্ত করিলাম, তিনিও তাহাতে সায় দিলেন। আমরা সংসার ধর্মের এক ধাপ উপরে আরোহণ করিলাম।"[২৩] (নজরটান বর্তমান লেখকের)।

৩. ব্যক্তিগতই রাজনৈতিক

সংস্কার আন্দোলনের প্রতি মানসিক সমর্থন, সংস্কারমনস্ক স্বামীর প্রতি প্রবল অনুরাগ সত্ত্বেও কৈলাসবাসিনী মিত্র 'হিন্দুয়ানি' ও তার সঙ্গে স্বজন সমাজ ত্যাগ করতে তৈরি ছিলেন না।[২৪] তাঁর পরের প্রজন্মে একাধিক বাঙালি মেয়ে ঐতিহ্যিক সমাজের আশ্রয় ত্যাগ করেছিলেন। মেয়েদের সামাজিক অবস্থার আশু পরিবর্তন প্রয়োজন— সংস্কার আন্দোলনের এই মূল তর্ক মেনে নিয়ে আত্মকথা রচনা ও অন্যান্য লেখালিখির পুরুষালি জগতে পা দিয়েছিলেন। তাঁদের আত্মকথাগুলির সঙ্গে সমকালীন খ্যাত-অখ্যাত পুরুষদের আত্মকথার শিরোনামে পার্থক্য স্পষ্ট। আত্মকথার নামকরণ মেয়েরা নিজেরা করতেন, না কি স্বামী, পুত্র অথবা পুরুষ প্রকাশক— তা অবশ্য সব ক্ষেত্রে ঠিকঠাক জানা যায় না। যদি অন্য কেউ নামকরণ করতেনও তাতে রচয়িতার অনুমোদন অবশ্যই থাকত বলে মনে হয়। উনিশ শতকে জন্ম এমন অনেক মেয়ের আত্মকথার শিরোনাম খেয়াল করে দেখছি আত্মচরিত অভিধাটি একটি ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়নি। অন্যদিকে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) লিখেছেন *স্বরচিত জীবন-চরিত* (১৮৯৮), বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) *বিদ্যাসাগর চরিত* (১৮৯১), কার্তিকেয় চন্দ্র রায় (১৮২০-১৮৮৫) *আত্মজীবন চরিত* (১৯০৪), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) *আত্মচরিত* (১৯০৯), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) *আত্মচরিত* (১৯১৮), মনমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) *কেঁড়েলের জীবনচরিত* (মধ্যস্থ পত্রিকা, ১৮২০ সনের ভাদ্র থেকে ফাল্গুন), দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৫-১৯১৪) *আমার জীবনচরিত* (১৩৩১)। যে সব বিখ্যাত অথবা অখ্যাত পুরুষ আত্মজীবনীর শিরোনামে চরিত শব্দটি ব্যবহার করেননি তাঁরাও 'আত্ম' শব্দটির উপর জোর দিয়েছেন যেমন: গুরুচরণ মহলানবিশ (১৮৩৩-১৯১৬) *আত্মকথা* (১৯৭৪), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) *আমার বাল্যকথা* (১৯১৫), চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪-১৯১০) *আমার শেষকথা* (১৯৮৭), যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৭৯৪-১৮৮১) *আত্মকাহিনী* (সাহিত্য পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯), রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬) *আত্মকথা* (ভারতবর্ষ, কার্তিক, ১৩২৩)। মেয়েদের মধ্যে রাসসুন্দরী লিখেছেন *আমার জীবন* ও সারদাসুন্দরী *আত্মকথা*। এ ছাড়া চরিত শব্দটি তো বটেই 'আত্ম' শব্দটি বা এক বচনে উত্তম পুরুষের ব্যবহার মেয়েদের আত্মজীবনীমূলক লেখায় কম। কৈলাসবাসিনী দেবী (১৮২৯-১৮৯৫) লিখেছেন *গত যুগের জনৈকা গৃহ বধূর ডায়েরী* (১৩৫৯ বঙ্গাব্দের 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় পত্রিকায় পাঁচটি সংখ্যায় এই শিরোনামে প্রকাশিত), নিস্তারিণী দেবী (১৮৩৩-১৯১৬) *সেকেলে কথা* (ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২০

অগ্রহায়ণ ১৩২৪), সৌদামিনী দেবী (১৮৪৭-১৯২০) *পিতৃস্মৃতি* (১৯৮৬), জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫০-১৯৪১) *পুরাতনী* (১৯৫৩), প্রফুল্লময়ী দেবী (১৮৫২-১৯৪০) *আমাদের কথা* (১৯৮৬), প্রসন্নময়ী দেবী (১৮৫৭-১৯৩৯) *পূর্ব কথা* (১৯১৭), মনোদা দেবী (১৮৭৮-১৯৬৪) *সেকালের গৃহবধূর ডায়েরি* (১৯৯৬), ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী (১৮৭৩-১৯৬০) *জীবনকথা* (এক্ষণ পত্রিকা, ১৩৯৯-১৪০০), সরলা দেবী চৌধুরানী (১৮৭২-১৯৪৫) *জীবনের ঝরাপাতা* (১৯৭৫)। কেশব সেনের কন্যা ও কোচবিহার রাজপরিবারের বধূ সুনীতি দেবী (১৮৬৪-১৯৩২) অবশ্য লিখেছিলেন *অটোবায়োগ্রাফি অব অ্যান ইন্ডিয়ান প্রিন্সেস* (১৯২১)।

নিজের জীবনকথা লেখার মধ্যে দিয়ে লেখক যে 'আমি'-কে পাঠকের দরবারে হাজির করতে চান, আত্মকথার নামকরণে তার সম্বন্ধে খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে চরিতসাহিত্য রচনার যে ধারা তা একান্ত ভাবেই পুরুষালি। রাজা-রাজড়াদের জীবনবৃত্তান্ত রচনা করতেন সভাকবিরা যেমন *হর্ষচরিত, বল্লালচরিত* বা *রামচরিত*। জীবনকাহিনির শিরোনামেই থাকত ব্যক্তিনামের সদর্প ঘোষণা। উনিশ শতকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় পুরুষের আত্মকথাকে চরিত শিরোনামে প্রকাশ করার মধ্যে জীবনবৃত্তান্ত রচনার ঐতিহ্যিক গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা হয়তো কাজ করেছিল। দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ, শিবনাথ তো বটেই এমনকী বিখ্যাত নন এমন পুরুষরাও যখন আত্মচরিত প্রকাশ করেছেন তখন সেই বৃত্তান্ত যে একটি নির্দিষ্ট সাহিত্যগত ঐতিহ্যের অনুসারী এ বিষয়ে তাঁদের কোনও সন্দেহ ছিল না বলেই মনে হয়। ভিখু পারেখ অবশ্য মনে করেন ভারতে আত্মজীবনী রচনার ঐতিহ্য না থাকায় উনিশ শতকে ইংরেজি জানা ভারতীয়েরা যখন নিজেদের কথা বলতে চাইলেন তখন তার নির্দিষ্ট কোনও কাঠামো ছিল না, আত্মকথায় কোন 'আমি'-কে তুলে ধরা হবে তা নিয়েও ছিল অনিশ্চয়তাবোধ (পারেখ, ১৯৮৯)।[২৫]

অন্য দিকে, উনিশ শতকের শেষ পর্বে বর্ণ হিন্দু সমাজের বৃহত্তর অংশে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার ব্যাপারটাই সুনজরে দেখা হত না, আত্মকথা রচনায় উৎসাহদান তো দূরের কথা। তবু কিন্তু নব্য সংস্কারপন্থী প্রধানত ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েরা লেখাপড়া শিখে কবিতা, উপন্যাস রচনার পাশাপাশি নিজের কথা লেখার তাগিদ অনুভব করেছিলেন। সমমনস্ক পুরুষ সমাজের একটা ছোট্ট অংশের কাছ থেকে উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছিলেন। মেয়ে আত্মকথা রচয়িতারা নিজেরা ও তাঁদের উৎসাহদাতা পুরুষেরা উভয়েই জানতেন যে কাজটা সনাতন ঐতিহ্যের অনুসারী নয়। তাই চরিতসাহিত্য রচনার দরবারি ও পুরুষালি জগতে পা দিতে হয়েছিল দ্বিধা নিয়ে, কৌশলে। স্মৃতিকথা-আত্মকথার শিরোনামে বহুবচন ব্যবহার করে (*আমাদের কথা*), বহুর মধ্যে যে-কোনও এক জনের বৃত্তান্ত হিসেবে পেশ করে (*জনৈক গৃহবধূর ডায়েরি; বঙ্গ-মহিলার বিলাত যাত্রা*) অপ্রাসঙ্গিক, বাতিলের দলের এমন ভাবে দেখিয়ে (*সেকেলে কথা, পুরাতনী*) আসলে কী বলতে চাওয়া হচ্ছিল? কোন আত্মপরিচয়কে খুঁজতে চাইছিলেন মেয়েরা? মেয়েদের আত্মকথা ব্যক্তিজীবনের গুরুত্বপূর্ণ

দলিল হিসেবে সমাজ অভিভাবকদের অনুমোদন পাবে না এই বোধ তো অবশ্যই কাজ করেছিল। সংস্কারক ও জাতীয়তাবাদী পুরুষ উভয়েই নিজের নিজের মতো করে মেয়েদের সামাজিক ভূমিকার যে নিয়ন্ত্রিত পরিসর তৈরি করেছিলেন সেখানে ব্যক্তি মেয়ের কোনও স্থান ছিল না। পুরুষনির্দিষ্ট এই ভূমিকা মেয়েরা আত্মস্থ করে নিয়ে আত্মজীবনী লিখেছিলেন মনে করা যেতে পারত যদি তাঁদের আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটত সংস্কার বা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কাম্য গণ্ডি মেনে। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি উনিশ শতকের মেয়েরা আত্মকথায় সব সময় লক্ষ্মণরেখা মেনে চলেননি। তা হলে এটা মনে করা কি খুব অসঙ্গত হবে যে উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি মেয়েরা অসামান্য, ক্ষণজন্মা কেউ হিসেবে নয়, বহুর মধ্যে জনৈক, 'নারীজাতি' বা নারীকুলের এক সদস্য হিসেবে গোষ্ঠীগত পরিচয় সচেতনভাবে আঁকড়ে ধরতে চাইছিলেন। আধুনিক আত্মজীবনী রচনার আবশ্যক শর্ত বলে বিবেচিত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বোধ তাঁদের ততটা পরিচালিত করেনি যতটা করেছিল প্রান্তিকতা ও বিপন্নতার গোষ্ঠী চেতনা? বহুবচনে, গোষ্ঠীগত পরিচয়ে প্রকাশ পেয়েছিল সেই বোধ যে তাঁরা নিঃসঙ্গ নন, একই মেয়েলি ইতিহাসের শরিক। ব্যক্তিগত সময়কে তাঁরা পড়েছিলেন ইতিহাসের বড় সময়ের প্রেক্ষাপটে। এই অর্থে উনিশ শতকের বাঙালি মেয়েদের আত্মকথাগুলির অধিকাংশ যত না ব্যক্তিগত জীবনবৃত্তান্ত তার চেয়ে অনেক বেশি ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সচেতনতার ফসল।

বাংলাদেশের মতো ভারতবর্ষের অন্য যে অঞ্চলে তাড়াতাড়ি ইংরেজি শিক্ষার ও সংস্কৃতির প্রচলন হয়েছিল এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষ ও নারী আত্মকথা লিখতে উৎসাহী হয়েছিলেন সেটি হল মহারাষ্ট্র। সমাজসংস্কারক হিসেবে বিখ্যাত মারাঠি মেয়ে পণ্ডিতা রমাবাই (১৮৫৮-১৯২২) পূর্ণাঙ্গ কোনও আত্মজীবনী লেখেননি, যদিও বৈচিত্র্যে ভরা তাঁর জীবন ও কীর্তি রীতিমতো চমকপ্রদ। আত্মজীবনী হিসেবে পড়া যায় ইংরেজি ভাষায় লেখা তাঁর এমন দুটি অতি সংক্ষিপ্ত রচনার শিরোনাম *অ্যান অটোবায়োগ্রাফিক্যাল অ্যাকাউন্ট* (১৮৮৩) ও *ফেমিন এক্সপিরিয়েন্সেস* (১৮৯৭)। রমাবাইয়ের মতো বিখ্যাত নন কিন্তু যথেষ্ট আকর্ষণীয় আত্মকথার রচয়িতা পার্বতীবাঈ আথাবালে (১৮৭০-১৯৫৫)। শিরোনাম *মাই স্টোরি: দি অটোবায়োগ্রাফি অব এ হিন্দু উইডো* (১৯৩০)। উনিশ শতকের শেষ বছরে জন্ম ওড়িশার খ্যাতনামা সমাজ-সংস্কারক মধুসূদন দাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী রমা দেবীর (১৮৯৯-১৯৮৫)। তাঁর আত্মকথার শিরোনাম *জীবনের পথে* (১৯৮৪)। কেরলের রেবতী আম্মা-র (১৮৯১-১৯৮১) আত্মকথার শিরোনাম *সহস্রপূর্ণিমা* (১৯৭৭)। বাংলার বাইরে এই চার আত্মকথা রচয়িতার জীবনের সাদৃশ্য হল: তাঁরা সকলেই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, সংস্কার আন্দোলন অথবা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংস্কৃতিতে লালিত। রমাবাই ইংল্যান্ড-আমেরিকা ফেরত নামজাদা সমাজসংস্কারক ও লেখক। পার্বতীবাই একা আমেরিকা পাড়ি দিয়ে ও সে দেশে থেকে চাকরি করেন এবং দেশে ফিরে আত্মনিয়োগ করেন দুঃস্থ মেয়েদের কল্যাণে। রমাদেবী বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী ও সমাজকর্মী। রেবতী আম্মা মালয়লম ভাষার নাম করা লেখক। উনিশ শতকের বহু বাঙালি মেয়ের মতোই

এঁদের আত্মকথাগুলির শিরোনামেও নিজেকে আড়ালে রাখার চেষ্টা স্পষ্ট। আত্মকথার শিরোনামে বহুবচনের ব্যবহার মারাঠি মেয়ে রমাবাই রানাডে-র (১৮৬২-১৯২৪) রচনায় যার ইংরেজি ভাষান্তর: *মেময়রস অব আওয়ার লাইফ টুগেদার*। আরও উদাহরণ: মারাঠি ভাষায় লক্ষ্মীবাই তিলক (১৮৬৮-১৯৩৬) রচিত *স্মৃতিচিত্রে*, হিন্দিতে মহাদেবী বর্মা (১৯০৭-১৯৮৭) রচিত *স্মৃতি কি রেখায়েঁ* ও *অতীত কে চলচ্চিত্র* এবং ওড়িয়ায় হেমলতা মানসিং (১৯১৯-১৯৭৯) রচিত *সেদিন ও এ দিন*।

৪. আত্মকথায় বহু স্বর: বিশ শতক

বিশ শতকের দুই ও তিনের দশক নাগাদ যে ভারতীয় মেয়েরা লেখালিখি করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করছিলেন তাঁদের সামাজিক সমস্যার কথা লিখেছেন হিন্দি সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি ও প্রবন্ধকার মহাদেবী বর্মা। ১৯৩৬ সালে তিনি লেখেন: "যে ভুল বোঝা ও অন্য নানা সমস্যার মধ্যে আজকের মেয়েরা লিখছেন, তা যে কোনও লেখককে হতাশ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট... মেয়েরা যদি কোনও মেয়ের দুঃখের অভিজ্ঞতার কথা লেখেন, তখনই ধরে নেওয়া হয় সেটি আত্মজীবনীমূলক ও তাঁর পিছনে লাগার চেষ্টা চলে... সাহিত্যজগতে কোনও মেয়ে লেখক, পুরুষের চোখে প্রধানত হাসিমস্করা ও সময় কাটানোর উপকরণ।"[২৬]

কর্মজীবনেও সাংসারিক অস্তিত্ব এবং তার যন্ত্রণা ভুলতে না দেওয়ার পিতৃতান্ত্রিক কৌশলের কথা ভেবেই হয়তো মহাদেবী বর্মা আত্মজীবনী না লিখে স্মৃতিচিত্র ও কাব্য রচনার আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে মনে করেন অরসিনি। সমকালীন বাঙালি মেয়েরা সাহিত্যজগতে এই ধরনের বিড়ম্বনার অভিজ্ঞতার কথা না বললেও আন্তরিক আত্মজীবনী খুব কম জনই লিখেছেন।

লেখাপড়া শেখার পরে চাকরি অথবা কোনও পেশা গ্রহণ করা উনিশ শতকের বাঙালি মেয়েদের পক্ষে ছিল নেহাতই ব্যতিক্রম। স্কুলে যাওয়া অথবা না যাওয়া মধ্যবিত্ত মেয়েদের প্রায় সবারই জীবনের ষোলো আনা কেটে যেত অন্দরমহলে। শারদামঞ্জরীর মতো হাতে গোনা দু'-একজন যাঁরা রোজগারের জন্য বাইরে বেরিয়েছিলেন তাঁদের ছিল পদে পদে বাধা। ঠাকুরবাড়ির মেয়ে সরলা মহীশূরে চাকরি করতে যাওয়ায় *বঙ্গবাসী* কাগজে ব্যঙ্গ করে লেখা হয়েছিল: "এ ঘরের মেয়ের একলা একলা বিদেশে চাকরি করতে যাওয়ার দরকারটা কি? খাওয়াপরার তো অভাব নেই, কেন খামকা নিজেকে এমন বিপদগ্রস্ত করা? এ খালি বিলিতী সভ্যতার অনুকরণ" (*জীবনের ঝরাপাতা*, পৃ. ১২৩-২৪)।

আলোকপ্রাপ্ত পরিবারের ভিতরেও বাধা সরেনি। সরলা লিখেছেন, তাঁর বিখ্যাত পরিবারের এবং সেই পরিবারের সবচেয়ে বিখ্যাত মানুষটিও আত্মীয়-স্বজনেরা বাঁধা পথের বাইরে হাঁটলে তাদের কেমন শাসন করতেন। বেনারসে মন্দির দর্শন করে আসার পর সেই রকম এক অভিজ্ঞতার কথা: "এই কথাটা কলকাতায় ফিরে গেলে রবিমামার কানে যখন পৌঁছল তিনি আমাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হয়ে বললেন— 'তোরা এই রকম করে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিলি? মিথ্যাচার করলি?'

হায়! ৬নং জোড়াসাঁকোর বাঁধা অবিশ্বাসের পথ থেকে সরে অনেক ছেলেমেয়ে বউই যে যুক্তির অবলম্বনেই পুরনো বিশ্বাসের valley-তে চলে এসেছেন সে বিষয়ে ক্রমেই যত পরিচয় পেতে থাকলেন ততই রবিমামা ক্ষুণ্ণ হতে থাকলেন।" (*জীবনের ঝরাপাতা*, পৃ. ৭০)।

উনিশ শতকের একেবারে শেষে বা বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে যাঁদের জন্ম ও স্কুল কলেজে গিয়ে লেখাপড়া শেখা সেই বাঙালি মেয়েরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় চাকরি, পেশাদার লেখালিখি এবং সক্রিয় রাজনীতি করেছেন। আত্মজীবনী লিখেছেন এঁদের অনেকেই। সমকালীন আত্মকথা রচয়িতা মেয়েদের মধ্যে রয়েছেন বেশ কয়েকজন পেশাদার অভিনেত্রী যাঁদের সবাই হয়তো স্কুল-কলেজে প্রথাসিদ্ধ লেখাপড়া করেননি। কানন দেবী (১৯১৬-১৯৯২), উমাশশী দেবী (?-২০০১), কেতকী দত্ত (১৯৩৪-১৯৭৯), শোভা সেন (১৯২৩) প্রমুখের আত্মকথামূলক লেখা অথবা সাক্ষাৎকার আলোচ্য যুগের অভিনেত্রীদের রচনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। পেশাদার লেখক যাঁরা আত্মকথাও লিখেছেন তাঁদের মধ্যে নাম করা যায় জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৪-১৯৮৮) ও লীলা মজুমদারের (১৯০৮-১৯৭৯)। বিশ শতকের গোড়ার কয়েক দশকে জন্ম এমন যে মেয়েরা সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় আত্মকথা লিখেছেন তাঁরা হয় বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী নয় কমিউনিস্ট রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। মণিকুন্তলা সেন (১৯১১-১৯৮৭), বীণা দাস (১৯১১-১৯৮৬), রাণী চন্দ (১৯১২-১৯৯৭), শান্তিসুধা ঘোষ (১৯০৭-?), রেবা রায়চৌধুরী (১৯২৫), ছবি বসু (১৯২৪) প্রমুখ এই রাজনৈতিক-আত্মকথা রচয়িতাদের অন্যতম।

আত্মকথার মেজাজ-মর্জি অনুসারে উনিশ ও বিশ শতকে জন্মানো মেয়েদের রচনায় যদিও আক্ষরিক গণ্ডি টানা যায় না তবু পার্থক্য ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছিল। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত প্রথম দু-এক প্রজন্মের বাঙালি মেয়েরা তাঁদের সামাজিক দুরবস্থার কারণ ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে অনেকেই মোটামুটি একমত ছিলেন। রাসসুন্দরী সংসারকে পিঞ্জর বলে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁর পরের অন্তত দুই প্রজন্ম সেই পিঞ্জরের বাইরে কিছুটা বেরোলেও অন্দর ও বাইরের মানসিক-ভৌগোলিক ব্যবধান উনিশ শতক শেষে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারে ছিল দুস্তর। প্রথম যুগের শিক্ষিত বাঙালি মেয়ে যাঁরা 'বিলাতযাত্রা' করেছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন কীর্তিমান স্বামীদের অনুগামিনী— সম্ভবত একমাত্র ব্যতিক্রম কাদম্বিনী গাঙ্গুলি (১৮৬১/৬২-১৯২৩) যিনি নিজেই ডাক্তারি পড়তে ইংল্যান্ডে যান ১৮৯২ সালে। সেদিক থেকে বিচার করলে রমাবাই, আনন্দিবাই, পার্বতীবাই প্রমুখ সমকালীন মারাঠি মেয়েরা ঘর ও বাইরের তফাত ভেঙেছিলেন নিজেদের হাতে— একেবারে একা পাড়ি দিয়েছিলেন ভিনদেশে। ঘর থেকে উৎসুক চোখে বাইরেকে দেখার, ঘর ও বাইরের মাঝামাঝি এক দোদুল্যমান অবস্থাতে দাঁড়িয়ে থাকার বর্ণনা পাই জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথায় যিনি সংস্কারমনস্ক স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে, লাটসাহেবের ডিনারে ও 'বিলাতে'ও গিয়েছিলেন কিন্তু মানসিকভাবে অবরোধের আড়াল ভাঙেননি। স্বামীর সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন: "বিলেতে স্বপ্ন দেখেছিলেন যেন জোড়াসাঁকোর

বাড়ির ভিতরের খড়খড়ি ভেঙে দিচ্ছেন। কাজেও তাই করেছিলেন। বাইরে কিছু অনুষ্ঠান হলে আমরা ওই খড়খড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতুম, তার বেশি কখনও যেতুম না। সেইটেই অন্দরমহলে যাবার পথ।" (স্মৃতিকথা, *এক্ষণ* ১৩৯৭, পৃ. ২১) উনিশ শতক শেষে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি মেয়ে ঘর ও বাহির-সংযোগকারী বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন বলতে পারি। অন্য দিকে বিশ শতকের গোড়ার দিকে যাঁদের জন্ম ও লেখাপড়া শেখা তাঁরা অনেকেই কলেজে উচ্চশিক্ষা পেলেন, কর্মজগতে প্রতিষ্ঠিত হলেন। কারও মা বা স্ত্রী ছাড়া অন্য পরিচয়েও সমাজ তাঁদের জানল। 'বাহির' আর ততটা অভিনব, বিস্ময়কর অথবা কল্যাণকর বলে মনে হল না। বাহির যতটা চেনা হল সংসার তার শিকল ততটাই খুলল কি না আত্মকথা থেকে তা বোঝার উপায় কম। ঐতিহ্যিক সমাজ, পরিবার ও অবরোধের নিন্দায় প্রসন্নময়ী, মনোদা দেবী, সৈয়দা মনোয়ারা (১৯০৯ সালে জন্ম হলেও এঁর আত্মকথার মেজাজ উনিশ শতকের সঙ্গে অনেক বেশি খাপ খায়) যতটা মুখর ঠিক ততটাই পরিবারের খারাপ দিকগুলি সম্বন্ধে নীরব। পুণ্যলতা চক্রবর্তী (১৮৯০-১৯৭৪), লীলা মজুমদার কিংবা সাহানা দেবীও (১৮৯৭-১৯৯০) অন্তত শৈশবের কথা বলার সময় কেবল ভাল কথাই বলেছেন। পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মহত্ব-উদারতার বর্ণনা এঁদের আত্মকথার একটি ঘোষিত কর্মসূচি বলে মনে হয়।

৫. 'নিজস্ব ঘরের' সন্ধানে?

পুণ্যলতার *ছেলেবেলার দিনগুলি* (১৯৯৭),[২৭] লীলার *আর কোনখানে*[২৮] (১৯৬৭) বা *পাকদণ্ডী* (১৯৮৬)[২৯], সাহানার *স্মৃতির খেয়া* (১৯৭৯)[৩০] শৈশবের চিত্রণে ঝলমলে রঙিন। বাড়ির বড়রা সবাই স্নেহময়, মহৎ এবং উদার, প্রকৃতিও তার রূপ-রস উড়াড় করে দিতে অকৃপণ। দুই বোন— পুণ্যলতা ও লীলা-র আত্মকথা থেকে কিছু নির্বাচিত অংশ পাশাপাশি রেখে পড়া যাক। নিজের মায়ের সম্পর্কে পুণ্যলতা লিখছেন: "শুধু নিজের পরিবারেই নয়, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়াপড়শি, যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে আসত, সকলকেই তিনি সহজে আপনার করে নিতেন। মাকে দেখতাম, সারাদিন কাজে ব্যস্ত— যেন তাঁর নিজের আরাম বা বিশ্রাম বলে কিছু নেই! বাড়ির সমস্ত কাজ দেখাশোনা করা, সকলের সেবাযত্ন করা, বাইরে সকলের খোঁজখবর নেওয়া, কার অসুখ, কার কী অভাব, কার কিসে সাহায্য দরকার, সব দিকেই তাঁর খেয়াল থাকত।" (*ছেলেবেলার দিনগুলি*, পৃ. ৯৫)। আবার লীলা লিখছেন নিজের মায়ের সম্পর্কে: "ঐ ৯-১০ বছরের ছোট ছেলেটা যখন অদেখা অচেনা আমাদের কাছে এসেছিল, তখন তার মনের মধ্যে কেমন হয়েছিল তাই ভাবি। দু-দিনে সে আমাদের একজন হয়ে গেল। মা-হারা, বাপ-হারা, গৃহ-হারা মানুষদের আমার বাপ-মা-হারা গৃহ-হারা মা অমনি বুকে জড়িয়ে নিতেন।" (*পাকদণ্ডী*, পৃ. ১২৯)। আবার আর এক জায়গায় লিখছেন: "নিটোল সুন্দর পরিবারটি ছিল আমাদের।" (*পাকদণ্ডী*, পৃ. ১৩২)।

"পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান ছিল আমার মায়ের বাড়িটি"— এই বাক্য দিয়ে শুরু তাঁর *আর কোনওখানে* নামে জীবনকথাটি।

শৈশবে বাবা মারা যাওয়ার পর সাহানা দেবী বড় হয়েছিলেন তাঁর বিখ্যাত মামা চিত্তরঞ্জন দাশের আশ্রয়ে। মা ও মামাবাড়ির কথা আত্মজীবনীতে বার বার এসেছে: "মনে পড়ে তাই মায়ের সে-সব কথা, মনে পড়ে আজও মামার বাড়ির কথা— দানশীলতা, মহানুভবতা— এই সব ছিল যাঁদের সহজাত বৃত্তি, এই সব নিয়েই যাঁরা জন্মেছিলেন, এই সব ছিল যাঁদের সাথের সাথী, চরিত্রের স্বাভাবিক দিক, জীবনের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ।" (*স্মৃতির খেয়া*, পৃ. ৬)

নিটোল শৈশবের সন্ধানী উপরোক্ত আত্মকথা তিনটি ভাষা ও উপস্থাপনার দিক দিয়ে শারদামঞ্জরী বা জ্ঞানদানন্দিনীর আত্মকথার তুলনায় স্বতন্ত্র— পরিশীলিত ও নান্দনিক। আর একটা বড় তফাত হল এই যে, স্নেহময় আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে নিরাময় ক্ষমতার অধিকারী প্রকৃতিও পুণ্যলতা, লীলা ও বিশ শতকের অন্য বহু আত্মকথায় স্বতন্ত্র মর্যাদায় বর্ণিত। তুলনীয় প্রকৃতি বর্ণনা উনিশ শতকে দুর্লভ। পারিবারিক শৃঙ্খল ও সেই শৃঙ্খল কেটে বেরনোর উনিশ শতকীয় বয়ান বিশ শতকে কেন পালটে গেল, কেন পরিবারকে মেয়েরা তাঁদের আত্মকথায় লীলা-পুণ্যলতার মতো মসৃণ, অভ্যন্তরীণ সংকটহীন চেহারায় দেখাতে চাইলেন তার একাধিক ব্যাখ্যা সম্ভব। পুণ্যলতা, লীলা ও সাহানা তিনজনেই অত্যন্ত বিখ্যাত পরিবারের মেয়ে; জাতীয় রাজনীতি ও সমাজে যে পরিবারগুলির বিশিষ্ট স্থান ছিল। তা ছাড়া বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে এঁরা যখন বেড়ে উঠছেন ততদিনে বাঙালি মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি নিশ্চিতভাবে সংস্কার আন্দোলনের পথ ছেড়ে জাতীয়তাবাদকে আশ্রয় করেছে। ঔপনিবেশিক শাসনের কাছে পাওয়া অপমান ভুলতে খাড়া করা হয়েছে সনাতন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে (যে-ঐতিহ্যের একটি জরুরি স্তম্ভ ভারতীয় পরিবার ব্যবস্থা) গৌরবোধ।

নিশ্ছিদ্র, সুখী ভারতীয় পরিবার আত্মকথায় নির্মাণের জাতীয়তাবাদী দায় যে মেয়েরা বহন করতে চেয়েছেন তাঁরা কিন্তু পুরোপুরি সফল হননি। লীলা মজুমদার তাঁর অবিস্মরণীয় সব শিশুসাহিত্যে ছোটদের চোখে বড়দের ক্ষুদ্রতা, মনোমালিন্য, রেষারেষির ও একচোখোমির (*টংলিং, পদি পিসির বর্মিবাক্স*) যে সরস ছবি আঁকেন, নিজের জীবন বৃত্তান্তে তা যত্ন করে মুছে ফেলা। কিন্তু ঘষা পাতায় যেমন মুছতে চাওয়া লেখার দাগ থেকেই যায় তেমনি মায়াময়, উজ্জ্বল শৈশব-কৈশোর-প্রেমপূর্ণ যৌবনের আত্মকথা *পাকদণ্ডী*-তেও শোনা যায় দীর্ঘশ্বাস। বার বার ধরা পড়ে সংসার ও সন্তান পালনের দায়িত্ব এবং পেশাদার লেখক হয়ে ওঠার ইচ্ছে— এই দুইকে মেলাতে না পারার টানাপোড়েন। আবার ব্যর্থতাবোধে ভিতরে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার বৃত্তান্ত কতটা খোলসা করবেন তা নিয়ে ভোগেন দ্বিধায়। সাড়ে তিনশো পাতার বইয়ে অন্তত ছ'বার নিজের খেদের কথা লেখেন— কিন্তু কখনও দোষ দেন নিজেকেই, কখনও আড়াল করতে পারেন না 'সুখী' দাম্পত্যের উপরে অভিমান। *পাকদণ্ডী*-র ২৭০ পাতায় একবার বলেন, "কি করে বোঝাই যে বিঘ্নটা কাজের তাড়ায় বা সময়ের অভাবে নয়। বিঘ্ন আমার মনে। কি একটা আছে আমার মধ্যে যে আমাকে আমার সংসার থেকে অব্যাহতিও দেয় না। আবার যে-কাজ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে, সেটা করতে পারছি না বলে সব ব্যর্থ বলে মনে হচ্ছে।"

আবার ২৯৫ পাতায় লেখেন: "আমার মতো মেয়েরা নানা রকম সাংসারিক দায়িত্বে জড়িয়ে পড়ে। সেগুলোর অযত্ন করলে বিবেকও দংশন করে, আবার বাড়ির কেউও খুশি হয় না। খানিকটা দায়মুক্ত না হলে মেয়েদের পক্ষে কোনও সৃজনশীল কাজ করার পথে অনেক বাধা।"

এই টানাপোড়েনের জন্যই অবশ্য *পাকদণ্ডী* হয়ে ওঠে যৌথ অ্যাজেন্ডার সীমানা ছাড়ানো, ব্যক্তি মানুষের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের জটিল বৃত্তান্ত— এবং সেই কারণেই আধুনিক পাঠকের কাছে বেশি আকর্ষণীয়। তবে মেয়েদের সৃজনশীলতার বিকাশের জন্য সাংসারিক দায় থেকে মুক্তির প্রয়োজনের যে কথা লীলা মজুমদার হঠাৎ একটুখানি বলে ফেলেন, তা অনেক বিশদ ভাবে ও বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গিতে পাই জ্যোতির্ময়ী দেবীর কলমে। *স্মৃতি-বিস্মৃতির তরঙ্গ* (১৯৯৪)[৩১] আলোচ্য সময়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি মেয়ের আত্মকথার ধারায় একটি ব্যতিক্রম। এগার বছর বয়সে বিয়ে হওয়া জ্যোতির্ময়ীর শৈশব নিয়ে বিশেষ কোনও স্মৃতিমেদুরতা নেই। বেশ স্পষ্ট করে লিখেছেন বিবাহিত জীবনের দশ বছরে যে লেখাপড়া করতে পারেননি, বৈধব্যের পরে অত্যন্ত দ্রুত তা পেরেছিলেন। শ্বশুরবাড়ির ক্ষুদ্রতা ও নিষ্ঠুরতা তাঁর বালিকাবেলা-কে কীভাবে রক্তাক্ত করেছিল তার তীব্র বর্ণনা রয়েছে বার্ধক্যে রচিত আত্মকথায়। প্রসঙ্গত, আত্মকথায় 'বালিকাকাল' শব্দটি সম্ভবত প্রথম ব্যবহার করেছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। অখ্যাত পরিবারের মেয়ে ও বউ জ্যোতির্ময়ী দিয়েছেন তাঁর বাপের বাড়ির প্রতি শ্বশুরবাড়ির রূঢ় আচরণের বিবরণ। লিখেছেন তাঁর 'শিক্ষিত', 'পরিশীলিত (সেতার বাজানোয় পারদর্শী) শাশুড়ি কীভাবে কিশোরী পুত্রবধূকে নানা ছলে নির্যাতন করতেন। ছেলে-বউয়ের দাম্পত্যে ঈর্ষাকাতর শাশুড়ির চতুর কৌশল বর্ণনা করেছেন নিঃসংকোচ তীব্র ভাষায়: "তারপর এবার শাশুড়ি বললেন, 'খুকি আমার কাছে রাত্রে শোবে। যদি কাঁদে বা কোনও দরকার হয় তোমাকে ডেকে আনব, ...তাই রাত্রে তুমি তোমার শোবার ঘরের দরজা বন্ধ কোর না। ...আর একটি চতুরতা ছিল খুকিকে রাত্রে দেখতে ইচ্ছা। এবং আমার আর জাননদ ছিল না। সেই জন্য তাঁর ঈর্ষাতুরতা বেপরোয়া ছিল।" (*স্মৃতি-বিস্মৃতির তরঙ্গ*, পৃ. ৫১০)। পরিবারের ঘনিষ্ঠজন, বিশেষত গুরুজন সম্বন্ধে এ রকম নির্ভেজাল নিন্দা এর আগে একমাত্র যে আত্মকথায় পাই সেটি সরলা দেবীর। মা স্বর্ণকুমারীর আত্মকেন্দ্রিকতা, স্নেহের অভাব, বিখ্যাত মামার ক্ষুদ্রতা— সরলা এ সবই বর্ণনা করেছেন রাখঢাক না করে। কিন্তু বিবাহোত্তর জীবন সম্পর্কে দু'-একটি ইঙ্গিত ছাড়া তিনিও নীরব।

শ্বশুরবাড়ির নিষ্ঠুরতা ও তা দেখেও তাঁর স্বামীর চুপ করে থাকা জ্যোতির্ময়ীকে বেদনা দিয়েছিল। কিন্তু স্বামীর বিষয়ে অথবা দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে পীড়নের বৃত্তান্ত তিনিও লেখেননি। তবে শ্বশুরবাড়ির পীড়ন তাঁর বয়ানে কেবল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকেনি। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েছেন পারিবারিক সম্পর্কে অন্তর্নিহিত ক্ষমতার রাজনীতি বিশ্লেষণে। এইখানেই জ্যোতির্ময়ীর স্বাতন্ত্র্য যে, তিনি লিঙ্গ-রাজনীতির ছুরি দিয়ে চিড়ে দেখেছেন পরিবারকে: "আমাদের বিয়ের মন্ত্রে আছে 'শ্বশুরে সম্রাজ্ঞী ভব।' কিন্তু সে

সাম্রাজ্য কাদের বা কার, কি তার রীতিনীতি কেউ জানেন না। কেন না প্রত্যেক পরিবারই তো একটি রাজ্যবিশেষ, তার সাম্রাজ্যও পৃথক। কত খেয়াল-খুশিময় সে রাজ্য ও রাজা-রানির দল— সে কথার ইতিহাস কেউ জানে না। 'হুকুম আর তামিল' আদেশ পালন এই ছিল তখনকার (এখনো আছে) নিয়ম।'' (পৃষ্ঠা ৫০৮)। স্বামীর মৃত্যুর পরে সংসারজীবনের পাট চুকিয়ে বাপের বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হওয়ার অভিজ্ঞতা তুলনা করেছেন দেশভাগের পর উদ্বাস্তু মানুষের সঙ্গে: ''অতি গোপন ভয়-সঙ্কোচ সতর্কতা ভরা জীবনের একটা বিশাল প্রান্তরে এসে দাঁড়িয়েছি। এখনকার দেশত্যাগী উদ্বাস্তুদের মতো মনে করে নেওয়া যায় যেন। তাদেরও তো কোথাও মাটির বন্ধন নেই।'' (পৃ. ৫১৫)

৬. 'ওদের' মেয়েবেলা

বালিকা শ্রমিকদের দিনযাপনের গ্লানির বিবরণ শুনি অভিনেত্রীদের আত্মকথায়। কানন দেবী, উমাশশী দেবী, কেতকী দত্ত প্রমুখ প্রথম যুগের ভারতীয় চলচ্চিত্র ও থিয়েটারের অভিনেত্রীরা লীলা-পুণ্যলতার যুগের মানুষ, কিন্তু একই সমাজের মানুষ নন। সাত-আট বছর বয়সে অভিভাবকেরাই যাঁদের রোজগারের ধান্দায় অভিনয়ে নামিয়ে দেন তাঁদের বয়ানে মধুর শৈশব অথবা পরম নির্ভরতার উৎসরূপ পরিবারের ছবি না থাকারই কথা। বিশ শতকের প্রথম দিকে যাঁদের জন্ম সেই বাঙালি অভিনেত্রীদের অধিকাংশ সমাজের যে-তলার মানুষ সেখানে পরিবারের ধারণা মধ্যবিত্ত পরিবারের সঙ্গে মেলে না। কানন দেবীর আত্মকথায়[৩২] তাঁর বাবার কোনও ভূমিকা নেই। কেতকীর বাবা সংসারে যেন আগন্তুক। 'বৈধ' দাম্পত্যের গণ্ডিতে নির্দিষ্ট নয় স্বজনতার সম্পর্কগুলি। কাননের শৈশবে, কেতকীর যৌবনেও মায়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কেতকীর বয়ানে তাঁর মা প্রভাদেবী কোনও স্নেহময়ী জননী নন, এক কর্তৃত্বপরায়ণা, প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী যিনি পয়সার জন্য মেয়েকে বিক্রির চেষ্টারও কসুর করেন না।[৩৩] কানন, উমাশশী, কেতকী তিনজনেই জানিয়েছেন অত্যন্ত কম বয়সে রোজগারের ধান্দায় প্রকাশ্যে অভিনয়ে হাতেখড়ির কথা। কানন ও কেতকী শুনিয়েছেন সহ-অভিনেতা ও পরিচালকদের দুর্ব্যবহারের অভিজ্ঞতা। খোলাখুলি লিখেছেন যৌন লাঞ্ছনার কথা। *সবারে আমি নমি* শিরোনামে কানন দেবীর আত্মকথায় সেই গ্লানির বিবরণ: ''অল্প বয়স ও অনভিজ্ঞতার কত সুযোগই না সবাই নিয়েছে। নিরুপায় অবস্থার জন্য গ্লানিভরা মুহূর্তের সে অসহ্য যন্ত্রণা কি ভোলার?'' ওই পাতাতেই সহ-অভিনেতাদের যৌন উস্কানিমূলক কথাবার্তা (পৃ. ১৩) ও আচরণের বিবরণ: ''ও দেশের অভিনেত্রীদের কত 'প্রগ্রেসিভ আউটলুক' জড়িয়ে ধরা অথবা চুমু দেওয়া তাদের কাছে ডালভাত' বলতে বলতে এগিয়ে আসা হিরোদের চোখেমুখে ফুটে উঠত কি নির্লজ্জ লুব্ধতা আর স্থূল লোলুপতা। সারা শরীর যেন ঘৃণায়, ভয়ে শিউরে উঠত।''

এক দিকে পেশার জগতে দৈনন্দিন অবমাননা, 'নষ্ট' চরিত্রের মেয়ে বলে ছাপ পাওয়া, অন্য দিকে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বাড়ির লোকের বাধা— এই দুই অভিজ্ঞতাই আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগে বাংলার অভিনেত্রীদের খুব চেনা ছিল। ১৯২৯-১৯৩৮ পর্যন্ত বহু

বাংলা ও হিন্দি ছবিতে চুটিয়ে অভিনয় করে হঠাৎ বিদায় নেন উমাশশী দেবী। অর্ধশতাব্দীরও পরে ২০০০ সালে *খোঁজ এখন* পত্রিকাকে এক সাক্ষাৎকারে[৩৪] অভিনেত্রী জানিয়েছিলেন বিয়ের পর স্বামী কীভাবে খবরদারি করতেন কোন ছবিতে অভিনয় করবেন না করবেন সে সব বিষয়ে: "প্রমথেশ বড়ুয়ার *রূপলেখা* করলুম। তারপর *গৃহদাহ* বইতে আমাকে চান্স দিলেন। তো কর্তা বললেন, কাগজপত্র নিয়ে এস, আপত্তিকর কিছু না থাকলে তবেই করবে। তা সে প্রমথেশবাবু শুনবেন কেন? আমি ছাঁট হয়ে গেলুম। তখনই তো অচলার ভূমিকায় যমুনা করল। তারপরে যমুনাকে বিয়ে করলেন প্রমথেশবাবু।" অনেক সময়েই মেয়েদের আত্মকথায় যতটা বলা হয় তার চেয়ে বেশি থাকে চেয়েও না বলতে পারা— এটা যে কত আক্ষরিক অর্থে সত্যি তা মালুম হয়েছিল উমাশশীর উত্তর কলকাতার বাড়িতে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে। তাঁকে মনে হয়েছিল বহুদিন পর মনের কথা বলছেন, কিন্তু বড় সন্ত্রস্ত। আমরাও অনুভব করেছিলাম আড়াল থেকে নজরদারি— সম্ভবত তাঁর পুত্র-পরিজনের। ফল অর্ধসমাপ্ত এক সাক্ষাৎকার যেখানে নৈঃশব্দ্য বাঙ্ময়।

উমাশশীর তুলনায় কেতকীর সাক্ষাৎকার (কেতকী দত্ত: *নিজের কথায়, টুকরো লেখায়*) অনেক সরব ও দুঃসাহসিক। মাত্র সাত বছর বয়সে অভিনেত্রী মা প্রভাদেবীর সঙ্গে মঞ্চে দাঁড়াতে হয়েছিল কেতকীকে। তারপর বাকি জীবনটা মা থেকে শুরু করে স্বামী, প্রেমিক, থিয়েটারের প্রযোজক-নির্দেশক, সহ অভিনেতা-অভিনেত্রী, নিজের ছেলেমেয়ে— ইত্যাদি নানা জনের হাতে ব্যবহৃত লাঞ্ছিত হওয়া ও তা প্রতিরোধের চেষ্টার দমবন্ধ করা বিবরণ। লিখেছেন কারও নাম গোপন না করে। জানিয়েছেন বিয়ের পর তাঁর রোজগারে স্বামীর বসে খাওয়া ও খবরদারি, 'নষ্ট মেয়ে' বলে শ্বশুরবাড়িতে স্থান না পাওয়া, ছেলে-মেয়ে ও অন্য আত্মীয়স্বজনের চাহিদা মেটাতে মেটাতে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার কথা। তাঁর বয়ানে সংসারের ও মঞ্চের পরস্পরবিরোধী দাবির বিবরণ: "আমার দুটো সত্তা। আমি অভিনেত্রী কেতকী দত্ত। তারপর আমি কারও মা, কারও ভগিনী, কারও স্ত্রী। ...এই দুটো সত্তা আমার মধ্যে ঝগড়া করে, প্রচণ্ড লড়াই চলে কেতকী এবং কেতকী দত্তের মধ্যে।" (পৃ. ৬১) এই সংঘাতের বৃত্তান্ত কি খুব চেনা লাগছে? তা হলে শোনা যাক কেতকী দত্ত থেকে কেতকী হয়ে ফুটতে বাস্তবিক রক্তক্ষরণের বৃত্তান্ত, মধ্যবিত্ত অভিজ্ঞতায় যার কোনও পূর্বসূরি নেই। বিয়ের বাইরে অন্য পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের কথা কেতকী বলেছেন খোলাখুলি। লিখেছেন তাঁর সহ-অভিনেতা প্রেমিক পুরুষ মঞ্চে কেমন করে হয়ে উঠত হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বী: "...ওর ভেতর একটা কমপ্লেক্স গ্রো করল কেতকীকে নিয়ে। ওই যে দর্শক এসে বলে কেতকী অপূর্ব! ভাবা যায় না! সেইটে ও আর সহ্য করতে পারত না। যার জন্যে মেন্টাল আর ফিজিকাল টর্চার আরম্ভ হত। অন দ্য স্টেজ। ...ওই যে জামাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে লাইট কাট, আর মুখটা কাঁধে এসে পড়বে, কাঁধে ভীষণ জোরে কামড় বসিয়ে ধরত। এইভাবে টর্চার।" (পৃ. ৫২)

অভিনয় করা আটকাতে লম্পট স্বামী তাঁকে কীভাবে মারধর করত সেই অভিজ্ঞতা আত্মকথায় (*স্মরণে বিস্মরণে: নবান্ন থেকে লালদুর্গ*, ১৯৯৩)[৩৫] শুনিয়েছেন শোভা সেন-ও।

তিনি অবশ্য বিনোদিনী, উমাশশী, কানন বা কেতকীর মতো 'সমাজের বাইরের মানুষ' নন। প্রথম বিয়ে ভেঙে পরে অভিনেতা উৎপল দত্তের সঙ্গে সুখী দাম্পত্যের বিবরণও তাঁর আত্মকথায় পাই। তবে বিশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে প্রকাশ্যে অভিনয়ের জন্য মেয়ে নির্বিশেষে জুটত 'নষ্ট' অভিধা, চলত চরিত্রে কলঙ্কলেপনের চেষ্টা। জাতীয়তাবাদী নৈতিক শুদ্ধতার ধারণা এই মনোভাবকে কীভাবে মদত জোগাত তার সন্ধান পাওয়া যায় এক রাজনৈতিক কর্মী মেয়ের আত্মকথায়। শান্তিসুধা ঘোষ তাঁর আত্মকথায় (*জীবনের রঙ্গমঞ্চে*, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ)[৩৬] বরিশালে দুয়ের দশকের শেষে সতীন সেনের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপের সপ্রশংস বিবরণ দিয়ে লিখেছেন স্বাদেশিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ তরুণেরা পেশাদার অভিনেত্রীদের নৈতিকতার পক্ষে হানিকর বলে মনে করত: "...অশ্বিনীকুমারের বরিশাল নৈতিক পবিত্রতার আদর্শে অনুপ্রাণিত, তারা প্রকাশ্য ভাবে জনসাধারণের মধ্যে অভিনেত্রী দলের আবির্ভাব অনুমোদন বা বরদাস্ত করবে না। ...প্রদর্শনী বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল বিশিষ্ট নাগরিকগণের সমর্থনে সতীশ সেনের তরুণ সংঘ। বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদির সূচনা হল।" (পৃ. ৪০)

৭. দলের জীবন এবং জেলখানার

সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিয়ে ও বিশেষত গ্রেফতার হয়ে জেলে গিয়ে বাঙালি মেয়ে কীভাবে এই নৈতিক শুচিবায়ু থেকে মুক্ত হল তার বৃত্তান্ত তারা নিজেরাই শুনিয়েছে। বস্তুত বিশ শতকের প্রথমার্ধে যে-সব বাঙালি মেয়ে জন্মেছেন ও বড় হয়েছেন এবং পরে আত্মকথা লিখেছেন তাঁদের সবচেয়ে বড় অংশ রাজনৈতিক কর্মী। সন্ত্রাসবাদী অথবা কমিউনিস্ট রাজনীতি করে জেল খেটেছেন এঁদের অনেকেই। জেল জীবনের অভিজ্ঞতা আত্মকথার ধারায় এক নতুন সংযোজন যা অন্য এক পিঞ্জর থেকে জগৎ চেনাল বাঙালি মেয়েকে। তবে সেই বৃত্তান্তে ঢোকার আগে বাঙালি মেয়ের রাজনীতিতে ঔৎসুক্য ও সক্রিয়তায় হাতেখড়ির বিবরণ আত্মকথায় কবে থেকে পাই তা একটু দেখে নেওয়া যাক।

মধ্যবিত্ত শহুরে বাঙালির প্রথম জাতীয়তাবাদী গণজাগরণ ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে। ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের আন্দোলনে স্কুল-কলেজের ছাত্ররা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় যোগ দিয়েছিল। কিন্তু ছাত্রীদের এবং সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত মেয়েদের প্রকাশ্য ভূমিকা এই সময়ও দেখা যায়নি। ১৯০৫-এর আগেই মধ্যবিত্ত মেয়েরা কেউ কেউ কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রতিনিধি হয়েছিলেন। সরলা রাস্তায় বেরিয়ে যুবক ও তরুণদের সংগঠিত করে দেশের জন্য শরীর চর্চায় উৎসাহ দিয়েছিলেন। তাদের স্বাদেশিকতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে চালু করেছিলেন শিবাজি উৎসব ও বীরাষ্টমী ব্রত। ব্রতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে আত্মকথায় লিখেছেন: "বাঙালী মায়েদের বীরমাতা হওয়ার লক্ষ্যপথে আবার নিয়ে আসা, সে বিষয়ে তাদের ব্রতের পুনঃপ্রচলন করা। ভীরু বাঙালি মায়ের হাত দিয়েই ছেলের রক্ষাবন্ধন করিয়ে মায়ের নিজমুখে 'বীরোভব' বলে ছেলেকে বীরোচিত খেলাধূলায় কাজেকর্মে প্রবৃত্তি দেওয়ান।" (পৃ. ১৪০-৪১) তাঁর নিজের ভূমিকাকে সরলা এই

প্রেরণাদাত্রী মায়ের চেহারায় দেখতে পছন্দ করেছিলেন: "আজ আমায় দেশের অনেক ছেলে 'মা' বলে। না জেনে আগে থাকতেই আমি তাদের কারও কারও হাতে রক্ষাবন্ধন করেছিলুম।" (পৃ. ১৪১-৪১)। এটা খেয়াল করা দরকার যে সরলা প্রকাশ্য জনসভায় গান গাইতেন কিন্তু বক্তৃতা নিজে দেওয়ার বদলে লেখা প্রবন্ধ অন্য কাউকে দিয়ে পাঠ করাতেন। বিদেশ ভ্রমণে সঙ্গী হওয়ার জন্য বিবেকানন্দের আহ্বানে তিনি না করেছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের স্মৃতি লিখেছেন পুণ্যলতা, খানিকটা নিরপেক্ষ দর্শকের ভঙ্গিতে: "বিকালে চারদিক থেকে দলে দলে গান করতে করতে সকলে সার্কুলার রোডে বিরাট এক জনসভায় এসে মিলল। দেশটাকে দুই খণ্ড করলেও বাঙালি জাতিটা কিছুতেই দুই ভাগ হবে না, তার চিহ্নস্বরূপ 'অখণ্ড-বঙ্গভবন' তৈরি করা হবে, সেই সভায় তার 'ভিত্তিস্থাপন' হল। ঠিক তার পাশেই আমাদের সেই পুরনো স্কুলের নতুন বাড়ি হয়েছে, আমরা এবং আরও অনেক মেয়েরা স্কুলবাড়ির বারান্দা ও ছাতে বসে সভা দেখলাম। এত অসংখ্য লোক এমন বিরাট গম্ভীর সভা আমরা আগে কখনও দেখিনি।" (পৃ. ১৩৪)

স্বদেশি আন্দোলন মধ্যবিত্ত বাঙালি মেয়ের মনে কী আবেগের দোলা দিয়েছিল তার বর্ণনা লীলা মজুমদারের আত্মকথায়: "আমরা যে পরাধীন এ-কথা এতদিন ঠিক জানতাম না। পরাধীন কথাটার মানেই ভালো বুঝতাম না। এর আগেই দেশের জন্য কতজন প্রাণ দিয়েছিল, দ্বীপান্তরে গিয়েছিল, সব বললেন মা সেদিন। ক্ষুদিরামদের, উল্লাস কর দত্তদের বাড়ির সঙ্গে বোধহয় জ্যাঠামশাইদের যাওয়া-আসা ছিল। মা-র চোখে জল দেখেছিলাম।" (পৃ. ৫১) মেয়েদের রাজনীতি চেতনার প্রক্রিয়ায় একক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল সম্ভবত ক্ষুদিরামের ফাঁসি। ওড়িয়া মেয়ে বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী রমা দেবীর আত্মকথায় (*জীবনের পথে*) অনুরূপ আবেগের সাক্ষ্য রয়েছে। রমা লিখেছেন, ১৯০৮ সালের ১১ অগস্ট মজফ্‌ফরপুর জেলে ক্ষুদিরামের ফাঁসির সময় তাঁর বাবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদাধিকারী গোপালবল্লভ দাসের উপস্থিত থাকার কথা ছিল। ন' বছর বয়সি রমা কেঁদেকেটে বাবাকে নিরস্ত করেন।[৩৭] আবার শারদামঞ্জরীর মেয়ে সুবর্ণপ্রভা দাস (১৮৯০-১৯৬৪) তাঁর ডায়েরিতে (*দিনলিপি*, ১৯৭৯) জানিয়েছেন, ১৯১৬ সালে রেঙ্গুনে স্বামীর কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে ছিল অশ্বিনীকুমার দত্তের ভক্তিযোগ ও উইলিয়ম ওয়ালেসের একটি জীবনী। তল্লাসিতে সেগুলি ধরা পড়ার জেরে স্বামী প্রেমানন্দ সরকারি চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন এবং সেই ইস্তক তাঁর যাবতীয় ক্ষতির জন্য স্ত্রী-কে দোষী সাব্যস্ত করেন। ডায়েরিতে সেই দুঃখ সুবর্ণপ্রভা বার বার প্রকাশ করেছেন।[৩৮] এটা ভেবে আশ্চর্য লাগে যে প্রেমানন্দ ছিলেন জাতীয়তাবাদী চিকিৎসক সুন্দরীমোহন দাসের বড় ছেলে এবং সেই সুবাদে পারিবারিক ভাবে বিপিন পাল, উল্লাসকর দত্ত, বারীন ঘোষ প্রমুখের অতি ঘনিষ্ঠ।

গান্ধীজির আহ্বানে দুয়ের দশকের গোড়ায় প্রথম পথে নামেন মধ্যবিত্ত শহুরে মেয়েরা। রবীন্দ্রনাথের *ঘরে বাইরে* উপন্যাসের বিমলার অথবা বাস্তবে সুবর্ণপ্রভার মতো রাজনৈতিক মতের জন্য দাম্পত্যজীবন বিঘ্নিত করে নয়, পারিবারিক অনুমোদন নিয়ে। আগেই সৈয়দা মনোয়ারা-র সাক্ষ্যে দেখেছি যশোরে অসহযোগ আন্দোলনে হিন্দু বাঙালি মেয়েদের পিকেটিং

করা দেখে পথে বেরোনোর জন্য তাঁর ব্যাকুলতা (*স্মৃতির পাতা*)। সাংস্কৃতিক জাতি গঠনের তাগিদ মধ্যবিত্ত হিন্দু মেয়েকে সনাতন হিন্দু গৃহ রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেছিল উনিশ শতকের শেষে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে রাজনৈতিক জাতি গঠনের তাগিদ তাকে ঔপনিবেশিক প্রভুর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে পথে নামার নিয়ন্ত্রিত অনুমোদন দিল। তখনও মুসলমান মেয়ে সেই অনুমোদন পায়নি, তাই বীণা দাস বা শান্তিসুধা ঘোষ যে সময়ে বিপ্লবী রাজনীতিতে সক্রিয় হচ্ছেন, সেই সময়ে সৈয়দা মাথা খুঁড়ছেন 'অবরোধের প্রাচীরে'। কিন্তু মনোয়ারা জানতেন না হিন্দু মেয়েদের প্রকাশ্যে রাজনীতি করার যে স্বাধীনতা দেখে তিনি লুব্ধ হয়েছিলেন তা কতটা আপাত ছিল। দুয়ের দশকে ও তিনের দশকের গোড়ায় মেয়েদের বিপ্লবী রাজনীতি করতে হয়েছিল পরিবারকে লুকিয়ে। রাজনীতিতে মেয়েদের যে-নিয়ন্ত্রিত ভূমিকা নেতৃত্ব অনুমোদন করেছিল তার বাইরে যেতে চাইলে বাধা দিয়েছিল বিপ্লবী এবং এমনকী কমিউনিস্ট দলগুলিও। সমকালীন একাধিক রাজনীতি করা মেয়ের আত্মকথায় পরিবার ও দল এই দুই তরফের অভিভাবকত্বের সাক্ষ্য পাওয়া যাবে।

শান্তিসুধা লিখেছেন তিনের দশকের গোড়ায় কলকাতায় দাদার বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ার সময় বিপ্লবী সংস্রব থেকে তাঁকে আটকাতে বাড়িতে খবরদারির কথা: "...মহিলা কর্মীগণ যদি বা মাঝে মাঝে বন্ধুত্বের অছিলায় দেখাসাক্ষাৎ করতে আসতে পারতেন, পুরুষ কর্মীদের আগমন ও কোনও রকম আলাপ-আলোচনা একেবারেই অবৈধ। যদি বা অসাবধানতাবশত দাদার উপস্থিতিকালে বাসায় এসে আমার সঙ্গে কেউ দেখা করতে চেষ্টা করতেন, তাহলে তিনি নীচের বৈঠকখানা ঘর থেকেই দাদার জেরায় জর্জরিত হয়ে বিদায় নিতে বাধ্য হতেন। অবশ্য সে-সব দিনে অনেক পরিবারেই বিপ্লবীদের এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হত, কেননা নিজ পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিপ্লবী দলের সঙ্গে সংযুক্ত হতে দেবার সাহস বা সমর্থন অনেক অভিভাবকেরই ছিল না।" (পৃ. ৫৪)। অথচ শান্তিসুধার দাদা দেবপ্রসাদ ঘোষ নিজেও ছিলেন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী, পরে ভারতীয় জনসংঘের নেতা। কংগ্রেস অধিবেশনে ডেলিগেট হিসেবে নববিবাহিতা স্ত্রী ও বোনকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। স্ত্রী শোভারানি ঘোষের আত্মকথায় (*আজো তারা পিছু ডাকে*, ১৯৮১)[৩৯] ও শান্তিসুধার নিজের লেখায়ও সেই সাক্ষ্য পাই।

চারের দশকে কমিউনিস্ট রাজনীতি করতে আসা মেয়েদের উপরেও এই খবরদারি ও কখনও-সখনও সরাসরি পারিবারিক দমননীতি বজায় ছিল। সে কথা লিখেছেন রেবা রায়চৌধুরী[৪০]: "মেয়েদের রাজনীতি করাতেই বাবার প্রচণ্ড আপত্তি। বাবার মত হল, যা করবে বাড়িতে বসে কর, বাইরে বেরোনো চলবে না। বাবাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম, আমি তো কোনও খারাপ কাজ করছি না। তুমিও তো রাজনীতি করে জেলে গিয়েছিলে। বললেন, 'আমাদের রাজনীতি ছিল দেশপ্রেমের, তোমরা দেশকে উচ্ছন্নে দিচ্ছ। তোমার বাড়ি থেকে বেরোন চলবে না।' বলতে গেলে আমাকে বাড়িতে বন্দি করে রাখলেন।" (*জীবনের টানে শিল্পের টানে*, ১৯৯৯, পৃ. ৯)। আবার বীণা, মণিকুন্তলা অথবা ছবি বসু এতটা পারিবারিক বৈরিতার সাক্ষ্য দেননি।

দেশের জন্য যারা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিল সেই মেয়ে কর্মীদের দলীয় নেতৃত্ব কীভাবে দেখত তার সাক্ষ্য কল্পনা দত্তের (জোশী) স্মৃতিকথায়[৪১]: "সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে অনেক ছেলে ফাঁসিতে গেছে, মরেছে, পুলিশের সাথে সংঘর্ষের কথাও শোনা গেছে অনেক। কিন্তু এই আন্দোলনে মেয়েদের স্থান ছিল না এতদিন, নেতারা তাঁদের বিশ্বাস করতেন না। ১৯৩০ সালে মেয়েরা কিছু কিছু এর ভিতর এলেও প্রত্যক্ষ কাজে মেয়েরা নেমেছে খুব কমই।" (পৃ. ২৩)। প্রত্যক্ষ কাজে নেমে দেশের জন্য প্রথম যে বাঙালি মেয়েটি শহিদ হয়েছিলেন তিনি প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে পাহাড়তলি রেলওয়ে ক্লাবে প্রীতিলতার নেতৃত্বে হানা দেয় আটটি ছেলে। অভিযানের পরে সকলে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায় কেবল প্রীতি বাদে। সে ঘটনাস্থলেই পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মঘাতী হয়। সূর্য সেনের অনুগামী বিপ্লবী দলে প্রীতির সহকর্মী ও বন্ধু কল্পনা তার সাতদিন আগেই গ্রেফতার হয়েছে। তার সাক্ষ্যে প্রীতির আত্মঘাতী হওয়ার ব্যাখ্যা: "মাস্টারদার মুখে শুনি প্রীতির আত্মহত্যার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের কাছে প্রমাণ করা যে মেয়েরাও দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারে, দেশের জন্য তারাও লড়তে পারে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, বেঁচে থেকে আরও অনেক বেশি কাজ সে করতে পারত" (পৃ. ২৫)।

বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে মেয়েরা কেউ কেউ যেমন তিনের দশকেই সক্রিয় রাজনীতির স্বাদ পেয়েছিলেন তেমনি ওই সময়েই নানা সন্ত্রাসবাদী দমনমূলক মামলায় গ্রেফতার হয়ে তাঁরা প্রথম জেলও খেটেছিলেন। জেলে গিয়ে কীভাবে তাঁরা রাজনৈতিক পরিণতি লাভ করেন তার সাক্ষ্য রয়েছে রানি চন্দ, শান্তিসুধা, বীণা প্রমুখের আত্মকথা-স্মৃতিকথায়। রানির *জেনানা ফাটক* (১৯৮৩)— গোটা বইটিই তিন ও চারের দশকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলে কাটানোর বিচিত্র অভিজ্ঞতা।[৪২] সমাজের একেবারে নীচের তলা থেকে আসা খুন ও অন্যান্য ফৌজদারি মামলায় অরাজনৈতিক আসামী 'তসিমন', 'গঙ্গামাঈ', 'আজিমন'-দের সঙ্গে জেনানা ফাটকের দিনগুলিতে রানী আবিষ্কার করেছিলেন অন্য এক ভারতবর্ষ। শান্তিসুধা লিখেছেন জেলে যাওয়ার আগে দেশের এক বিরাট অংশকে তিনি চিনতেন না। অত্যন্ত আন্তরিকভাবে স্বীকার করেছেন লালবাজারে পুলিশি হেফাজতে কাটানোর সময় সি ক্লাস কয়েদি মেয়েদের দেখে প্রথমেই কেমন ভয় ও ঘেন্না পেয়েছিলেন (পৃ. ৬০)। ১৯৩২ সালে গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে রিভলভার ছুড়ে যে কিশোরীটি ঔপনিবেশিক দমনের জবাব দিতে চেয়েছিল জেলে গিয়ে সে আবিষ্কার করে শাসক ও শাসিতের বিরোধটাই একমাত্র সংকট নয়। জেলে দেখা সদিমন, নইমন হাপুসের মা-এর জন্য স্বাধীনতার মানে বীণা দাস-কে নতুন করে ভাবতে হয়েছিল। তেমনি হিন্দু মুসলমান, শ্রমিক-মালিক বিরোধের কারণগুলি নিয়েও গভীরভাবে ভেবেছিলেন বীণা।[৪৩] সাম্প্রদায়িক বিরোধ প্রসঙ্গে তাঁর আত্মজীবনীতে (*শৃঙ্খল ঝঙ্কার ও অন্যান্য*, ১৪০২) লিখেছেন: "এই বিরোধের অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কারণগুলো যদিও আমি ছোট করে দেখতে চাই না, কিন্তু কী জানি কেন কিছুদিন থেকে এর পিছনের সামাজিক কারণটাই আমার কাছে একান্ত বড়ো হয়ে দেখা দিয়ে সমস্ত মনটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে" (পৃ. ১০৭-০৮)। ১৯৪৭ সালে বিভেদের দায়

স্বীকার করে বলছেন: "...এ সম্বন্ধে আমাদের হিন্দু সমাজে সচেতনতা অত্যন্ত কম। ...একদিন কতকটা আত্মরক্ষার তাগিদেই হয়তো হিন্দু সমাজ নিজেকে যেভাবে নানা সংস্কার ও শুচিতার বেড়া দিয়ে আলাদা করে রেখেছিল, যা ক্রমে ক্রমে মুসলমান বা ম্লেচ্ছদের প্রতি নিদারুণ ঘৃণা আর অবজ্ঞায় পর্যবসিত হয়ে উঠল, তাই ক্রমে ক্রমে আরও নানান প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে মিশে গিয়ে আজকের হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে দুর্ভেদ্য ব্যবধানের প্রাচীরে পরিণত হয়ে উঠেছে" (পৃ. ১০৭-০৮)।

শ্রমিক-মালিক বিরোধে দুই পক্ষের মধ্যে সেতু হিসেবে রফা করার কংগ্রেসের দলীয় নির্দেশও মানতে পারেননি বীণা। তিনি চেয়েছিলেন শ্রমিকের লড়াইয়ে দৃঢ়ভাবে তাদের পক্ষ নিতে। আত্মজীবনীতে স্পষ্ট করে তাঁর ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। আর মেয়েদের পক্ষ নিতে চেয়েছিলেন কমিউনিস্ট কর্মী মণিকুন্তলা। গ্রামেগঞ্জে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মেয়েদের যখন তাঁরা শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্ব বোঝাতে নির্দেশ পেতেন, সন্তানসম্ভবা মায়েরা অনেকেই তাঁদের কাছে জানতে চাইত জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায়। অসহায় নিরক্ষর গ্রামের মেয়েদের মরিয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন না শিক্ষিত রাজনৈতিক কর্মী মেয়ে। আত্মজীবনী[৪৪]-তে তাঁরও অসহায়তার প্রকাশ: "...আমাদের পার্টি তো এসব পছন্দই করত না। এটাকে মার্কসীয় মতে গ্রহণের অযোগ্য 'ম্যালথাস থিওরি' বলা হত। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পার্টির মত হল জনবল হচ্ছে দেশের সম্পদ... কিন্তু আমাদের মহিলারা সত্যিই যেন অপেক্ষা করতে পারছে না। নতুন সন্তানটির জন্মলগ্ন তাদের মনে আনন্দের বদলে যেন আতঙ্কই জাগিয়ে তুলছে" (পৃ. ২৫৩)।

কমিউনিস্ট পার্টির গোড়ার দিকের কর্মী মেয়েরা আরও কেউ কেউ তাঁদের আত্মকথামূলক রচনায় দলের ভুল-ত্রুটি নিয়ে কিছুটা মুখ খুলেছেন। ছবি বসু তাঁর আত্মকথায়[৪৫] (*ফিরে দেখা*) লিখেছেন পার্টির সীমিত সামাজিক দৃষ্টি ও স্লোগানসর্বস্ব রাজনীতির কথা: "থেকে থেকে মনে হতো, বিশেষ করে সন্দেহ হতো, মানুষকে সত্যিই কি আমরা জানি বা চিনি? আমাদের তো শুধু বাঁধাধরা স্লোগানসর্বস্ব কথা। ...আমরা সাম্যের কথা বলতাম, সমাজ পরিবর্তনের কথা তো অবশ্যই বলতাম। দেশ স্বাধীন হলেই মেয়েপুরুষের, ধনী দরিদ্রের বৈষম্য দূর হবে। এক স্বর্গরাজ্যের পরিকল্পনা প্রায়... কিন্তু আমাদের পাশেই উপস্থিত মানুষটি চিরকালের দুঃখী, নির্যাতিতা বাঙালি রমণী, একথা কোনওদিনই জানা ছিল না" (পৃ. ৪৭)।

পার্টির লিঙ্গ-দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনায় যাঁর লেখনীর ধার সবচেয়ে তীক্ষ্ণ, তিনি সাবিত্রী রায় (১৯১৮-১৯৮৫)। সাবিত্রী অবশ্য আত্মজীবনী লেখেননি। হাতিয়ার করেছেন উপন্যাসকে। লিঙ্গদৃষ্টি থেকে পার্টির কর্মসূচি বিশ্লেষণের একটি সাক্ষ্য তাঁর *স্বরলিপি* (১৯৫২) উপন্যাস।[৪৬] এই উপন্যাসে পার্টি নেতৃত্বের নানা গভীর দুর্নীতির বর্ণনার ফাঁকে একটি আপাত কমিক রিলিফ পার্টিকর্মী কুঁড়ি, যে তার কমিউনিস্ট দাদা ও তার সহযোগীদের বৈঠকে কেবলই চায়ের জোগান দেয়। উপন্যাসটিতে কি আমরা পড়তে পারি চারের দশকের বাঙালি কমিউনিস্ট মেয়ের আত্মকাহিনি? এটা বিশেষ করে খেয়াল করা দরকার যে *স্বরলিপি* কার্যত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল সাবিত্রীর পার্টি।

গোড়ার যুগের আর এক কমিউনিস্ট কর্মী কমলা মুখোপাধ্যায় (১৯১৩-১৯৭৯) *খোঁজ এখন* পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে[৪৭] (২০০০, ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা) ও তারপর একাধিক অন্তরঙ্গ আলাপে জানিয়েছিলেন নারী প্রশ্ন ও অন্যান্য সামাজিক ইস্যু পার্টি নেতৃত্বের কাছে গুরুত্ব না পাওয়ায় তাঁর ক্ষোভ ও হতাশার কথা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বিপ্লবী অথবা কমিউনিস্ট রাজনীতি করা মেয়েরা কেউই দলের লিঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গির কথা বিশদভাবে বলেননি। সুভাষচন্দ্রের মূল্যায়ন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে জনযুদ্ধ আখ্যা— পার্টির এ জাতীয় অবস্থান সম্বন্ধে ক্ষোভের কথা বলেছেন। কিন্তু দলের পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে সে ভাবে কথা বলেননি। সেটা কি 'ঘরের কথা' বাইরে আনতে নেই— এই মনোভাব থেকে? কড়া করে মন্দ কথা বলতে চাইলে আশ্রয় নিয়েছেন গল্প-উপন্যাসের কাল্পনিক চরিত্রের। অথচ আত্মকথায় পরিবারের দমন-পীড়নের কথা বলেছেন। শান্তিসুধা, বীণা অথবা মণিকুন্তলা, রেবা-র মতো রাজনৈতিক মেয়েদের জীবনে দলই কি তাহলে পরিবারের জায়গা নিয়েছিল? ঘর ও বাইরের গণ্ডি এই মেয়েরা কি নতুন করে চিনলেন? তাই বোধহয় তাঁদের আত্মকথায় ঘরের দরজা খুলল না।

এমনকী দল যাঁরা জীবনের কোনও সময় ছেড়েওছিলেন তাঁরাও আত্মকথায় ক্ষোভ বা রাগ সে ভাবে প্রকাশ করেননি। বাস্তবে গণ্ডি ভেঙেছেন, কিন্তু কেন, তা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করতে চাননি। রাগ-দুঃখ-প্রেম-হতাশা নিয়ে আন্তরিক মানুষটির দেখা পাওয়ার সুযোগ বাঙালি মেয়ের আত্মকথায় কদাচিৎ মেলে। আত্মকথার লেখক বেশির ভাগ মেয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা। তাঁদের আত্মগোপনের অভ্যাস আত্মকথায় মধ্যবিত্ত বাঙালি পুরুষের আত্মগোপনের অভ্যাসের থেকে আলাদা নয়। বাংলা ভাষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আত্মকথায় 'এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ'-এর বিবরণ একটিও নেই। সম্ভবত অন্যান্য ভারতীয় ভাষায়ও বিরল।

এমনকী স্বাধীনতা উত্তর যুগে সাতের দশকে যে তরুণেরা সশস্ত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ডাক দিলেন, ভেঙেচুরে উলটে পালটে দেখতে চাইলেন সমাজ এবং অতীতকে তাঁরাও আত্মকথায় নীরব রইলেন দলের পিতৃতন্ত্র সম্পর্কে। ফলে সত্তরের বিপ্লবী মেয়েরা রাজনৈতিক স্মৃতিকথা লিখলেন (যেমন জয়া মিত্র, *হন্যমান* ও মীনাক্ষী সেন, *জেলের ভিতর জেল*), রাজনীতিতে নিজের কথা বললেন না। বাঙালি রাজনৈতিক কর্মী মেয়েদের আত্মকথা স্মৃতিকথার পাশাপাশি যদি তেলেঙ্গানার মেয়েদের লড়াইয়ের বিবরণ তাঁদের নিজেদের মুখে শুনি তা হলে তফাতটা স্পষ্ট হবে। চারের দশকের অন্ধ্রে নিজামবিরোধী ও জমিদারপ্রথা বিরোধী বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে মেয়েরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের অনেকের স্মৃতিচারণ সঙ্কলিত হয়েছে *'উই ওয়্যার মেকিং হিস্ট্রি...' লাইফ স্টোরিজ অব উইমেন ইন দ্য তেলেঙ্গানা পিপলস স্ট্রাগল* শিরোনামে একটি গ্রন্থে।[৪৮] অধিকাংশ নিরক্ষর অথবা অল্পশিক্ষিত প্রান্তিক চাষিঘরের মেয়েরা তাঁদের রোমাঞ্চকর গেরিলা যুদ্ধের বিবরণ যেমন দিয়েছেন তেমনি মুখ খুলেছেন সাম্যবাদী, বিপ্লবী দলে পুরুষকর্তৃত্বের ব্যাপারে। এঁদেরই একজন দলিত মেয়ে কমলাম্মা যাঁর মা, দিদিমা তিন প্রজন্ম ধরে ব্রাহ্মণ পরিবারে ক্রীতদাসী

ছিলেন। ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে কমলাম্মা কমিউনিস্ট দলে যোগ দিয়েছিলেন। গান গেয়ে, গল্প বলে দলীয় মতাদর্শের প্রচার করা, অথবা চিকিৎসাকেন্দ্রে ফার্স্ট এড, ইনজেকশন ইত্যাদি প্রাথমিক শুশ্রূষার কাজ তাঁকে পার্টি থেকে দেওয়া হয়েছিল। তেলেঙ্গানা অভ্যুত্থানের সময় গেরিলা যুদ্ধে যোগ দেন। স্বামীও ছিলেন একই দলের সদস্য। আঠার বছর হওয়ার আগেই একাধিকবার গর্ভবতী কমলাম্মা পার্টির কাজের সময় সদ্যোজাত সন্তানদের নিয়ে কী রকম বিব্রত থাকতেন সে কথা বলেছেন সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে কয়েক বার। আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকাকালীন সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন জঙ্গলের ঝোপঝাড়ের আড়ালে। দু'মাস ওই শিশুকে নিয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এখান থেকে ওখানে ঘুরে বেড়ানোর পর তাঁকে বলা হয়েছিল সন্তান অথবা সংগ্রাম— যে কোনও একটি বেছে নিতে: "তখন অঞ্চল কমিটির নেতারা আমাকে বললেন, হয় তুমি এই বাচ্চাটা অন্য কারও কাছে রেখে এসো নয় আমাদের ছেড়ে ছেলেকে নিয়ে গ্রামে গিয়ে থাকো।" (পৃ. ৪৮-৪৯) কারা এই নির্দেশ দিয়েছিলেন নাম করে বলেছেন কমলাম্মা। তাঁর স্বামীকে কিন্তু এরকম কোনও পরীক্ষা দিতে হয়নি।

চাকিলাম ললিতাম্মা[৪৯] (যিনি অবশ্য নিজেকে মধ্যবিত্ত বলে বর্ণনা করেছেন) জানিয়েছেন, গেরিলা দলে 'মেয়েলি' কাজগুলি মেয়ে কর্মীদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল এবং সেগুলি ঠিকঠাক মতো না হলে অভিভাবক 'কমরেডরা' মেয়েদের দস্তুর মতো বকাঝকাও করতেন: "...আন্দোলন তখন জোরদার। পার্টি ঠিক করল আমার বিজয়ওয়াড়া পরগনায় যাওয়া দরকার। তাই সেখানেই পাঠিয়ে দিল। ওখানে আমরা একদণ্ডও বসে থাকতাম না। মেয়ে বলে কথা! রান্না করতে হত। রামদাসের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালে সাহায্য করতে হত। আমি অপারেশনের সময় হাজির থাকতাম। ওষুধ দিতাম, ফার্স্ট এড দিতাম, প্রসবের সময় সাহায্য করতাম।" (*নৈঃশব্দ্য*, পৃ. ৯০) পার্টি-পরিবারে অন্য কমবয়সি কর্মী মেয়েদের সহবত শেখানোর দায়িত্ব ছিল 'লেখাপড়া জানা ভদ্র' পরিবার থেকে আসা ললিতাম্মা-র : "আমি ওদের শেখাতাম পুরুষদের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করতে হবে, শাড়ির আঁচল কী করে কাঁধের উপর দিয়ে ঢেকে নেবে ইত্যাদি। আমি একটু ইশারা করলেই ওরা বুকের কাপড় সামলে-সুমলে নিত।" (পৃ. ৮৮)। ললিতাম্মা-র বয়ান পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে গুলিয়ে যায় স্থান-কাল-পাত্র। গেরিলা যুদ্ধের বিবরণ না কি যৌথ পরিবারের— হারিয়ে যায় সেই বোধ: "রান্নার জন্য চাল-ডাল জোগাড় করা, আস্তানা বদলানো— সব কাজ আমরা মেয়েরাই করতাম। ...পুরুষেরা কখনওই এসব কাজে হাত লাগাত না। ...আমি কারও সঙ্গে কোনওদিন কাজ নিয়ে রেষারেষি করিনি। পুরুষেরাই দলের অন্য মেয়েদের বকাবকি করত যথেষ্ট কাজ করছে না বলে।" (পৃ. ৮৮)

বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলে মেয়েদের জন্য নির্ধারিত ভূমিকা (কল্পনা তাঁর স্মৃতিকথায় যার কিছু হদিশ দিয়েছেন), কমিউনিস্ট দলে লিঙ্গ-দৃষ্টিকোণ (মণিকুন্তলার আত্মকথায় সামান্য কিছু ইঙ্গিত), অথবা সত্তরের গেরিলা যুদ্ধে দলের পিতৃতন্ত্র (কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, *খোঁজ এখন*,) কি চারের দশকের অন্ধ্রের তুলনায় খুব অন্য রকম ছিল?

আমাদের ধারণা তা নয়। তা হলে আত্মকথায় বাঙালি মেয়েদের আত্মছলনার একটা কারণ হতে পারে তাঁদের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পারিবারিক পরিচয় যা ঘর ও বাইরে, বেশি গুরুত্বপূর্ণ-কম গুরুত্বপূর্ণ— ইত্যাদি বৈপরীত্যের শাসন থেকে মুক্তি চায়নি। আর একটা সম্ভাব্য কারণ লিখিত ভাষার নিজস্ব শাসনপদ্ধতি যা ভাষার পরিশীলনের দাবিতে সংযত, নিয়ন্ত্রিত করেছে বক্তব্যকে। মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাঙালি মেয়ের আত্মকথায় এই না বলা বাণীর ঘনযামিনী (*নৈঃশব্দ্য*, ১৯৭৯) হয়তো কাটত যদি জীবনযাপন না লিখে তাঁরা মুখে বলতেন। এ কথা খেয়াল করার মতো যে তেলেঙ্গানার ডায়েরি সব ক'টিই মৌখিক বয়ানের অনুলিখন। এ প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে অভিনেত্রী কেতকী দত্তের আত্মকথনে (যা এই লেখায় আগেই আলোচিত হয়েছে) চাঁচাছোলা স্পষ্ট কথা। কেতকীও লেখেননি। মুখে বলেছেন। *টুকরো লেখা*-য় তারই সম্পাদিত অনুলিখন। তবে এই ব্যাখ্যাগুলি একেবারেই অনুমাননির্ভর। সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর জন্য প্রয়োজন স্বতন্ত্র অনুসন্ধান। যে কারণেই করে থাকুন, এই আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে বাঙালি মেয়েরা সাধারণত তাঁদের আত্মকথা-স্মৃতিকথায় ব্যক্তিসত্তাকে আড়াল করেছেন। কখনও সংস্কার আন্দোলনের, কখনও জাতীয়তাবাদী স্বার্থের কখনও আবার সাম্যবাদী মতাদর্শের দাবি মেনে বিরোধিতা সামনে আনেননি। কয়েক প্রজন্মের আধুনিক শিক্ষায় নিজেকে আড়াল করার কৌশল ক্রমশ রপ্ত অভ্যাসের অনুশীলনে দাঁড়িয়েছে, ভাষাও হয়েছে আত্মগোপনের উপযোগী অস্ত্র। সংসারে ও সংসারের বাইরে দৈনন্দিনের লড়াই আত্মকথা-কে রক্তাক্ত করেছে খুব কম জনের ক্ষেত্রে (জ্যোতির্ময়ী দেবীর *স্মৃতি-বিস্মৃতির তরঙ্গ* একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ)। বাস্তব জীবনে নানা ক্ষমতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো মেয়েরা আত্মকথায় শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে চেয়েছেন এক নিটোল আখ্যানে। তাই বোধহয় বাঙালি মেয়ের দেড়শো বছরের আত্মপ্রকাশের ইতিহাসে স্বকীয় মেয়েলি কণ্ঠস্বর কেবলই শোনা যেতে যেতেও রুদ্ধ হয়ে গেছে। মেয়েদের এত অসংখ্য আত্মকথায় তৈরি হয়নি কোনও ধারাবাহিক আন্তরিক মানবীকেন্দ্রিক সমালোচনা। এই ঘটনা নিশ্চিত ভাবে পশ্চিমবঙ্গে নারীবাদী আন্দোলনের বিকাশকে দুর্বল করেছে। রাসসুন্দরীর জন্মের দুশো বছর পরেও আজও এই রাজ্যে বুদ্ধিজীবীরা তর্ক করেন মেয়েদের পক্ষে স্বকীয় আত্মপ্রকাশ সত্যিই সম্ভব কি না। গণ-প্রতিরোধের উপর রাষ্ট্রীয় দমনে খুন-জখম মেয়েরা লড়াইয়ের সামনের সারিতে *স্বেচ্ছায়* গেলেন, না কি পুরুষ সহকর্মীরা তাঁদের *ঠেলে* এগিয়ে দিল বন্দুকের মুখে— তা নিয়ে মিডিয়ায় জোরদার আলোচনা হয়। ধর্ষণে, গুলিতে জখম চাষি মেয়েরা হাসপাতালে শুয়েও যখন বলেন, "আমাদের নেতা নেই কেউ, আমরা নিজেরাই নেতা"— রাষ্ট্রপুষ্ট নারীবাদীরা সে কথা শুনতে চান না। নারীবাদেরও যে আসলে বহু স্বর, নানা দল।

তথ্যসূত্র:

১. রাসসুন্দরী দেবী, *আমার জীবন*, নরেশ জানা ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আত্মকথা*, ১ম খণ্ড, অনন্য প্রকাশন, ১৯৮১, পৃ. ২৭।

রুক্মিণী সেন

আত্মকথার নীরবতা: বাঙালি মহিলাদের আত্মজীবনী

"...বহু লাঞ্ছিত বঞ্চিত প্রবঞ্চিত নারীর কথা এতে মিশে আছে। যারা আমাদের ঘরের কোণে কোণে আছে। কত ভদ্র মনে শান্ত ধৈর্যে বহু আশায় নিজেদের কথা লুকিয়ে রাখে, কেউ কাউকে বলে না। বলতে পারে না। মনে অনুভব করে। তাদের রক্তমাংস শিরায় শিরায় সে কথা লুকানো আছে। এবং সে যা একদিন চূর্ণ টুকরো হয়ে যায়। আর তাদের ওপর অন্তঃপুরের ঐ সব নিঃশব্দ অনাচার অবিচার পুরুষেরা, অন্য পরিজনরা কী জানেন? জানতে পারেন? অথবা জেনেও জানেন না। কিংবা গুরুজনের ভয়ে নীরব থাকেন? হয়তো তাই। কে বলতে পারে কি জন্য! আর আজ আশ্চর্য হয়ে শিখলাম, দেখলাম, দেশ বিদেশের পণ্ডিতদের সব উক্তি সব কথাই সত্য, সব কটূক্তিই সত্য। আমরা সত্য বলি না! মেয়েরা সতী হন, কিন্তু সত্যশীলা সত্যভামিনী, সত্যবতী নন। হতে পারেন না!"[১]

জ্যোতির্ময়ী দেবীর আত্মজীবনী *স্মৃতি বিস্মৃতির তরঙ্গ*-তে এই কথাগুলো ব্যক্ত করেন তিনি। মেয়েদের পক্ষে সত্য কথা বলা সম্ভব নয়। অর্থাৎ মেয়েরা কথা বললেও নিজেদের অনুভূতির কথা বলেন না। তাঁদের পক্ষে সেগুলো বলা সম্ভব নয়। এক, সামাজিকীকরণের জন্য যে প্রাত্যহিক দুঃখকষ্ট, তা প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় নয় বলে, আর দুই, এই বিশ্বাসের জায়গা থেকে যে তাঁদের কথা, তাঁদের বেদনার তেমন কোনও গুরুত্ব নেই পরিবারে বা সমাজে। তাঁদের অনুভূতি এতটাই অকিঞ্চিৎকর যে তার প্রকাশ না ঘটানোই উচিত। তাই নীরবতা অর্থে একদিকে যেমন নানা বিষয়ে চুপ থাকা, অন্য দিকে নিজস্ব ভাব প্রকাশ না করাও নিঃশব্দতারই ইঙ্গিত করে। এই নিবন্ধের বিষয়বস্তু নৈঃশব্দ। উনিশ বা বিশ শতকের বাঙালি মহিলারা এই মৌনতাকে নিজেদের অস্তিত্বের অংশ বলে মনে করতেন। যে অনুভূতিগুলো সম্পর্কে মহিলারা নির্বাক, একটা সময়ের পরে সেই অনুভূতিই বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যায়। প্রাত্যহিক জীবনে পাওয়া নানান খারাপ লাগা, বিষাদ বা অপমান সম্পর্কে বাহ্যিক ভাবে তাঁরা বিস্মৃত থাকেন। সেই অবহেলাগুলো আর নিজেদের লেখায় প্রকাশ করেন না। বা কিছু ঘটনা এমন ভাবে লেখেন যেগুলো ঘটনার বিবরণ মাত্র। কোনও ধরনের অভিযোগেরও ইঙ্গিত থাকে না সেই বিবরণে। তাই আত্মজীবনীতে অনেক

কথা লিখলেও এতটাই সচেতন ভাবে মহিলারা লেখেন যাতে পাঠকের কখনওই মনে না হয় যে লেখার মধ্য দিয়ে কোনও ব্যক্তিকে আঘাত করতে চাইছেন আত্মজীবনীকার।

এই নিবন্ধে চারটি আত্মজীবনীর বিস্তৃত আলোচনা করা হচ্ছে। যে পরিপ্রেক্ষিতে এই আত্মজীবনীগুলো বিশ্লেষণ করা হবে তা হল: কী কী বিষয়ে মহিলারা নীরব থাকেন? কারা বা কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান তাঁদের নীরবতা পালন করতে বাধ্য করে? কীভাবে তাঁরা আপস করেন নীরব থাকার বিধানের সঙ্গে?

এই আত্মজীবনীগুলোতে মহিলারা তাঁদের প্রায় সম্পূর্ণ জীবনটাই তুলে ধরেছেন। জন্ম থেকে শুরু করে, শিক্ষা, বিবাহ, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক, সন্তানদের মানুষ করা এবং বৈধব্যের অভিজ্ঞতা— যে স্তরগুলো দিয়ে সচরাচর একজন মহিলা তাঁর জীবন অতিবাহিত করেন, তার প্রায় প্রতিটি স্তরেরই প্রতিফলন ঘটেছে এই লেখাগুলোতে। যে চারজন মহিলার আত্মজীবনী এখানে বিশ্লেষণ করা হবে তাঁরা হলেন: বিনোদিনী দাসী (১৮৬৩-১৯৪১)— উনিশ শতকের খ্যাতনামা মঞ্চ অভিনেত্রী; সরলা দেবী চৌধুরানী (১৮৭২-১৯৪৫) ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী (১৮৭৩-১৯৬০)— এঁরা দু'জন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ঠাকুর পরিবারের কৃতি কন্যা এবং দু'জনেই শিক্ষাগত দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। আর জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৪-১৯৮৮)— কলকাতার বাইরে রাজস্থানে তাঁর বেড়ে ওঠা, চাকরিরত পরিবারের কন্যা, বাড়িতেই শিক্ষা লাভ করেন।

এমন নয় যে, এই চারজন মহিলা একই ধরনের বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন। তাঁদের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের ভিন্নতার উপরেই তাঁদের নীরবতা নির্ভরশীল। তাঁরা কেউ নিজের নামের সঙ্গে 'দেবী' শব্দটা যোগ করেন, কেউ বা 'দাসী'। 'দেবী' অথবা 'দাসী' অবশ্যই সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত। এবং এই অবস্থান 'ভাল' মেয়ে এবং 'খারাপ' মেয়ের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে। বিনোদিনী দাসী 'খারাপ' মেয়ের আওতায় পড়েন কারণ উনিশ শতকে থিয়েটার অভিনেত্রীদের বারবনিতা হিসেবেই গণ্য করা হত। বিনোদিনী সমাজের চোখে নিচু তলার মানুষ, যাদের থেকে বিনোদন আহরণ করা যায় কিন্তু সামাজিক মর্যাদা দেওয়া যায় না। তাই তাঁরা 'দাসী'-ই থেকে যান, বা নিজেদেরও 'দাসী' মনে করেন। দেবী বা দাসী— যাই হোক, এই আত্মজীবনীগুলোর বিশ্লেষণ থেকে যা জানা যাবে তা হল মহিলাদের আত্মকথায় নৈঃশব্দতা এক মুখ্য বৈশিষ্ট্য। নীরবতার বিষয় পালটালেও নীরবতাই যে কাঙ্ক্ষিত তা তাঁদের সামাজিকীকরণের মধ্যেই স্পষ্ট।

বিনোদিনী দাসীর *আমার কথা*

'ইহা কেবল অভাগিনীর হৃদয় জ্বালার ছায়া! পৃথিবীতে আমার আর কিছুই নাই, শুধুই অনন্ত নিরাশা, শুধুই দুঃখময় প্রাণের কাতরতা! কিন্তু তাহা শুনিবারও লোক নাই। মনের ব্যথা জানাইবার লোক জগতে নাই— কেননা, আমি জগৎ মাঝে কলঙ্কিনী, পতিতা। আমার আত্মীয় নাই, সমাজ নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, এই পৃথিবীতে আমার বলিতে এমন কেহই নাই।''[২]

এই কথাগুলো দিয়েই বিনোদিনী তাঁর আত্মজীবনী শুরু করেন। ১৮৬৩ সালে জন্মগ্রহণ করে বিনোদিনীর থিয়েটার জগতের সঙ্গে পরিচিতি ঘটে ১০ বছর বয়সেই। ১৮ বছরের মধ্যেই তিনি খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে যান এবং ২৩ বছরে তিনি অভিনয় জীবন ত্যাগ করেন। তাঁর ছোটবেলা কাটে কলকাতার এক বস্তি এলাকায়, মা এবং দিদিমার সঙ্গে। *আমার কথা* বিনোদিনীর বেদনার, একাকীত্বের, নিরাশার বিবরণ। সেই কথায় বিনোদিনীর সংস্পর্শে আসা বিভিন্ন পুরুষের বিশ্বাসঘাতকতার বিবরণও। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিনোদিনী দু'-ধরনের বৈষম্যের শিকার— নারী বলে এক ধরনের বঞ্চনা আর 'নষ্ট মেয়ে' বলে আর এক ধরনের বৈষম্য। ভদ্র সমাজের চোখে বিনোদিনীর একজন ঘৃণ্য বারবনিতা হিসাবে ছাড়া আর কোনও অস্তিত্বই ছিল না। সেটা সম্পর্কে তিনি নিজে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বলেই হয়তো লিখেছিলেন: "...আমি সমাজ পতিতা, ঘৃণিতা বারনারী। লোকে আমায় কেন দয়া করিবে? কাহার নিকটেই বা প্রাণের বেদনা জানাইব; তাই কালি কলমে আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে মর্মান্তিক ব্যথা বুঝাইবার ভাষা নাই। মর্ম্মে মর্ম্মে পিশিয়া প্রাণের মধ্যে যে যাতনাগুলি ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় তাহা বাহিরে ব্যক্ত করিবার পথ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ জানেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু এই বিদ্যাবুদ্ধিহীনা, অজ্ঞানা, অধমা নারী যে কিছুই পারে নাই তাহা নিজেই মনে মনে বুঝিতেছি।"[৩]

আমার কথা বিনোদিনী উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর নাট্যশিক্ষক গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে। বিনোদিনী চেয়েছিলেন গিরীশ ঘোষ তাঁর জীবন সম্পর্কে কিছু কথা বলুন আত্মজীবনীর ভূমিকাতে, যেগুলো হয়তো বিনোদিনীর পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না। কিন্তু গিরীশ ঘোষ বলেছিলেন, "সত্য যদি অপ্রিয় ও কটু হয়, তাহা সকল সময়ে প্রকাশ করা উচিত নয়।"[৪] 'সত্য' কথা না বলে কিন্তু শিক্ষাগুরু সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে কি সমর্থনযোগ্য তারই বাস্তবিক পরিচয় দিয়েছিলেন। বিনোদিনী তাঁর আপত্তি ব্যক্ত না করে এই ভাবেই সেটা মেনে নিয়েছিলেন যে, "সংসারে আমাদের ন্যায় রমণীগণের মান অভিমান করিবার স্থল অতি বিরল।"[৫]

দ্বিতীয় যে পুরুষের কাছে নীরবে বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করেছিলেন বিনোদিনী তিনি ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের ভদ্রলোক যার কাছে বিনোদিনী আশ্রিতা ছিলেন এবং তাঁর পরিচিতি জানাননি বিনোদিনী আত্মজীবনীতে। "...যিনি আশ্রয় দিয়াছেন, তিনি আমার সহিত যে সত্যে আবদ্ধ ছিলেন তাহা ভঙ্গ করিয়াছেন, অপর পুরুষে যে রূপ প্রতারণা বাক্য প্রয়োগ করে, তাঁহারও সেই রূপ! তিনি পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম সাক্ষ্য করিয়া বলিয়া ছিলেন যে আমিই তাঁহার কেবল একমাত্র ভালবাসার বস্তু, আজীবন সে ভালবাসা থাকিবে। কিন্তু কই তাহা তো নয়। তিনি বিষয় কার্য্যের ছল করিয়া দেশে গিয়াছেন। কিন্তু সে বিষয় কার্য্য নয়, তিনি বিবাহ করিতে গিয়াছেন। তবে তাঁহার ভালবাসা কোথায়? এ তো প্রতারণা!"[৬] বিনোদিনীর ন্যায় মহিলারা কেবল মাত্র— ধনী এবং ক্ষমতাশীলা পুরুষদের বিনোদনের সঙ্গী, ভালবাসার সঙ্গী নন, হতে পারতেন না। তাই আনুগত্য শব্দটা এই পুরুষদের অভিধানে স্থান পেত না। এবং এই অপমান বিনোদিনীদের নীরবেই সহ্য করতে হত।

থিয়েটার সম্পর্কে বিনোদিনীর চূড়ান্ত ভালবাসা তাঁকে গুর্মুখ রায় নামের অন্য এক ধনী পুরুষের আশ্রিত করে। এই মানুষটির আশ্রয় নেওয়ার প্রধান কারণ ওনার থেকে থিয়েটার তৈরির জন্য টাকা পাওয়া। বিনোদিনীর থিয়েটারের সঙ্গীরা তাঁকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে থিয়েটার হলটা হলে তার নাম হবে 'বি' থিয়েটার। বিনোদিনী বিশ্বাস করেন তাঁর সঙ্গীদের। কিন্তু এই হলটির নাম রাখা হয় স্টার থিয়েটার এবং সেটা বিনোদিনীকে জানানো হল নিবন্ধকরণের পরে। ''যে পর্য্যন্ত থিয়েটার প্রস্তুত হইয়া রেজিস্ট্রি না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত আমি জানিতাম যে আমারই নামে 'নাম' হইবে। কিন্তু যে দিন উঁহারা রেজিস্ট্রি করিয়া আসিলেন— তখন সব হইয়া গিয়াছে, থিয়েটার খুলিবার সপ্তাহ কয়েক বাকি, আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলাম যে থিয়েটারের নূতন নাম কি হইল? দাশুবাবু প্রফুল্ল ভাবে বলিলেন যে 'স্টার'। এই কথা শুনিয়া আমি হৃদয় মধ্যে অতিশয় আঘাত পাইয়া বসিয়া যাইলাম যে দুই মিনিট কাল কথা কহিতে পারিলাম না। কিন্তু পরে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম 'বেশ!' পরে মনে ভাবিলাম যে উঁহারা কি শুধু আমায় মুখে স্নেহমমতা দেখাইয়া কার্য্য উদ্ধার করিলেন? কিন্তু কি করিব, আমার আর কোন উপায় নাই! আমি তখন একেবারে উঁহাদের হাতের ভিতরে! আর আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে উঁহারা ছলনা দ্বারা আমার সহিত এমন ভাবে অসৎ ব্যবহার করিবেন।''[৭]

নিজের জীবনের বিভিন্ন বঞ্চনা এবং প্রতারণা সহ্য করে বিনোদিনী নিজের আত্মজীবনীতে বারবার 'হতোভাগিনী', 'জনমদুখিনী', 'অভাগিনী', 'ভাগ্যহীনা', 'পতিতা', 'ক্ষুদ্র' এই শব্দগুলো নিজের সম্পর্কে ব্যবহার করেছেন। যে থিয়েটারের জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, সেখানকার সঙ্গীদের কাছেও যখন তিনি অপমানিত হলেন তখনও তিনি চুপ করেই ছিলেন।

জীবনের বেশির ভাগ সময় ধরে দুঃখ পেয়ে যাওয়াটাই যেন স্বাভাবিক ছন্দ ছিল বিনোদিনীর। থিয়েটারের সুখ্যাতি কোনও ভাবেই ব্যক্তিজীবনে তাঁকে সুখ এনে দেয়নি। ভদ্রসমাজে ঘৃণ্যই থেকে যান তিনি। যখন ঘটনাগুলো ঘটেছে তখন বিনা প্রতিবাদেই তা সহ্য করেছিলেন। আত্মজীবনী লেখার সময় অত্যন্ত সচেতন ছিলেন যাতে কোনও বিতর্ক না সৃষ্টি হয় বা কাউকে আঘাত না দেয় তাঁর লেখা। থিয়েটার যে একটি পুরুষ-শাসিত পেশা এবং সেখানে নারীকে অভিনয় করবার জায়গা দেওয়া হলেও অন্য কোনও ধরনের দায়িত্বে যে তাদের নিযুক্ত করা হয় না বা জনসমক্ষে সেই সব নারীর অবদানও যে স্বীকার করা হয় না, তা বিনোদিনীর লেখা পড়ে বোঝা যায়। সমাজের প্রতি এর জন্য কোনও অভিযোগ আনছেন না তিনি, বরং নিজের ভাগ্যকেই দোষারোপ করছেন। আর তাই পরিশেষে লিখছেন: ''এই আমি অসীম সংসার প্রান্তরে একটি সুশীতল বটবৃক্ষের একটু ছাওয়ায় বসিয়া কতক্ষণে চির শান্তিময় মৃত্যু আসিয়া দয়া করিবে তাহারই অপেক্ষা করিতেছি। সেই সুবিশাল সুশীতল তরুই আমার এই জীবন্মৃত অবস্থায় আশ্রয় স্থান।... কেন না আমার আত্মীয় নাই, আমি ঘৃণিতা, সমাজ-বর্জ্জিতা, বারবনিতা; আমার মনের কথা বলিবার বা শুনিবার কেহ নাই।''...[৮]

ঠাকুর পরিবারের কন্যাদের মধ্যে সরলা দেবীই প্রথম যিনি স্নাতক স্তর পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। উনিশ শতকের তুলনায় অত্যন্ত স্বাধীনচেতা স্বভাবের। উনি মহীশূর গিয়েছিলেন চাকরি করতে। যদিও কয়েক মাসের মধ্যে নিজের অসুস্থতাজনিত কারণে ফিরে আসেন কলকাতায় এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন, *ভারতী* পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন সরলা দেবী। সরলা বিবাহ করেন ৩৩ বছর বয়সে পঞ্জাবের রামভজ দত্ত চৌধুরীকে। সেই সময়ের তুলনায় অনেকটা বেশি বয়সে সরলার বিবাহ হয় এবং তাও বহু পাণিপ্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করবার পরে। যে ধরনের সুযোগ সরলা পেয়েছিলেন, বিনোদিনী সেগুলো ভাবতেই পারতেন না। অত্যন্ত আলাদা দুটি সামাজিক অবস্থানের মেয়ে হয়েও দু'জনেরই জীবনে অনেক কিছুই নীরবে মেনে নিতে হয়েছিল। এই মেনে নেওয়ার প্রেক্ষাপটটা সরলার ক্ষেত্রে খুবই ভিন্ন, কিন্তু যে কোনও ধরনের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতেই যে মহিলাদের বেশ কিছু বিষয়ে নৈঃশব্দ অবলম্বন করাই কাম্য, সেটা সরলার আত্মজীবনীতেও ধরা পড়ে।

সরলা যে ভাবে তাঁর আত্মজীবনী শুরু করেন, সেটাই অনন্য। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে যাঁর অবদান স্বীকৃত এবং অনস্বীকার্য, সেই রকম একজন ব্যক্তিত্ব তাঁর আত্মজীবনীর নাম দেন *জীবনের ঝরাপাতা*। এবং শুধু তাই নয়, তিনি মনেও করেন যে তাঁর জীবন যথেষ্ট প্রয়োজনহীন ভাবে কেটেছে: "ঝরে গেছে, ফুরিয়ে গেছে যা, তাদেরই কতকগুলি কুড়িয়ে বাড়িয়ে জড়ো করে এক খানা মালা গাঁথা— এ হল আমার জীবনস্মৃতি, জীবনকাহিনী। ঝরা হলেও মরা হয়নি সে পাতাগুলি, মানব প্রাণের সংস্পর্শে চিরপ্রাণবন্ত হয়ে আছে। আমার জীবনের দীর্ঘ পথে দিকে দিকে পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে— প্রভাতে সন্ধ্যায়, সজনে নির্জনে, দুঃখ দহনে, উৎসবে আনন্দে কত ঘটনা ও কত অঘটন ঘটেছে ঝরেছে সরেছে। পর পর যাঁদের সংযোগে মূল্যহীন জীবনের মূল্য, এ জীবন কাহিনীর পর্বে পর্বে তারাই আছেন ফুটে।"[৯]

সরলার আত্মজীবনীতে এক বিরল ধরনের অবহেলার কথা উল্লিখিত হয়— সরলার মা স্বর্ণকুমারী দেবীর তাঁর প্রতি নিস্পৃহতা এবং এক স্বাভাবিক অযত্নের অভিজ্ঞতা: "বলেছি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই মায়ের সঙ্গে আমাদের আর সাক্ষাৎ-সম্পর্ক থাকত না। তিনি আমাদের অগম্য রানীর মত দূরে দূরে থাকতেন। দাসীর কোলই আমাদের মায়ের কোল হত। মায়ের আদর কি তা জানিনে, মা কখনো চুমু খাননি, গায়ে হাত বোলাননি... দিদি প্রথম সন্তান বলে মা-বাবার আদুরে মেয়ে, দাদা প্রথম পুত্র বলে আদুরে, আমি আরএকটি অধিকন্তু অপ্রার্থিত মেয়ে মাত্র। তাই বৈদিক ঋষিকুমার শুনঃশেফের মত আমার জীবনের পৃষ্ঠপটে... একটা অনাদরের পর্দা টানা।... শাসনে শাসনেই গড়ে উঠেছি আমি, আদরে স্নেহে নয়।"[১০]

যেটা অনুধাবন করা যায় সরলার লেখা থেকে তা হল কন্যাসন্তানের প্রতি যে-অশ্রদ্ধা তা কেবলমাত্র নিম্নবিত্ত বা ব্যবসায়ী পরিবারেই পাওয়া যেত তা নয়, অত্যন্ত শিক্ষিত,

রুচিশীল পরিবারেও একই ধরনের আচরণ লক্ষণীয়। পরিত্যক্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা খুব ছোটবেলা থেকে পেয়েছিলেন বলেই হয়তো নিজের জীবনটা অর্থহীন মনে করা বা নিজেকে যে কোনও কাজেরই অনুপযুক্ত ভাবা সরলার স্বভাবেই ছিল। সরলার সঙ্গে স্বর্ণকুমারীর সম্পর্ক খুব স্বাভাবিক মা-মেয়ের সম্পর্ক ছিল না। সেটা নিয়ে সরলার মনে এক ধরনের ক্ষোভ থাকলেও নিজের মনের শূন্যতা নিয়ে তিনি কোনও সময়েই কোনও কথা কারও কাছে প্রকাশ করেননি। নিজের মনকে তিনি বুঝিয়েছিলেন এই বলে যে, এ ধরনের ব্যবহার তাঁদের মতন সম্ভ্রান্ত, সুবৃহৎ এবং সুপরিচিত ঠাকুর পরিবারে নিতান্ত স্বাভাবিক। তবু মনের মধ্যে ছাপ যে যথেষ্ট গভীরই ছিল সেটা বোঝা যায় জীবন সায়াহ্নে এসেও যখন এই ভাবনাগুলো স্মৃতির গহ্বরে তলিয়ে যায় না। উচ্চারিত হয়। যদিও অনুচ্চারিত থেকে যায় অভিমান বা অবহেলার অনুভূতি।

স্বাধীনচেতা সরলার জীবনেও এক ধরনের প্রচলিত নীরবতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিবাহ নিয়ে নিজস্ব মতামত তিনি ব্যক্ত করতে পারেননি। তাঁর ধারণা ছিল তিনি বিবাহ করবেন না। কিন্তু যথেষ্ট গুরুত্বই দেওয়া হয়নি তাঁর এই ইচ্ছার। সরলার দাবি, হিরন্ময়ী ওঁর উপর চাপ সৃষ্টি করেন এই বলে যে, স্বর্ণকুমারী যেহেতু অত্যন্ত অসুস্থ এবং সরলার বিয়ে দেখে যাওয়াটা তাঁর শেষ ইচ্ছা, তাই এর মর্যাদা দেওয়া সরলার উচিত। মায়ের ব্যবহারের জন্যই সরলার মনে আশৈশব ক্ষোভ ছিল, অথচ মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে করতে হল তাঁকে। বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিতে হল তাঁর জন্য পছন্দ করা পাত্র। সরলা দেবী আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন: "কোন দিক থেকেই আমার আপত্তি করবার মত নয়। অবশ্য তাঁর পূর্বে বিবাহ হয়েছিল, এখন তিনি বিপত্নীক। আমি যেন তাঁকে না দেখে শুনে, তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় না করে, গোড়া থেকেই নামঞ্জুর না করি।... অনিচ্ছুক ছেলেকে ঠিক যে রকম করে বিয়েতে প্রবৃত্ত করতে হয়, সহজে সম্মত না হলে মাতা বা পিতার প্রাণ সংশয়ের ভয় দেখিয়ে সেইটিই বিয়ের পক্ষে শেষ বড় যুক্তিরূপে পেশ করা হয়, এ স্থলে আমার সম্বন্ধেও তাই করা হল। আমায় নামতেই হল। হিমালয়ের অরণ্যবাসে দাঁড়ি পড়ে গেল।... বাড়ি আত্মীয়-স্বজনে ভরে গেছে, উৎসবের সানাই বাজছে। বিকালে ক্ষণিকের জন্য বরকে দেখলে কনে।... তারপর দিন সন্ধ্যাবেলা বিয়ে। পালাবার পথ নেই, আর, ছাড়াছাড়ি নেই।"[১১]

সামাজিকীকরণের শিক্ষাগুলো এতটাই গভীর যে, নিজের জীবন সম্পর্কে এক চূড়ান্ত হতাশাবোধ থাকলেও, সরলাও এই বিধান আত্মস্থ করেছিলেন যে, যে-কোনও পরিস্থিতিতেই একটা বাহ্যিক প্রসন্নতার ভাবমূর্তি বাইরের মানুষের সামনে মেয়েদের তুলে ধরতে হয়। নিজেদের বেদনা কখনওই উন্মোচিত করবার জন্য নয়। নিজের ভেতরে লুকিয়ে রাখার জন্য। দু'-এক ফোঁটা চোখের জল ফেলা হয়তো সমাজের অনুমোদন পায়, কিন্তু সেটাও দরজা বন্ধ করে সবার অলক্ষ্যে। এই অলিখিত বিধান সরলাও মেনে চলতেন তাঁর জীবনে:

"চিত্ত তখন একেবারে লঘু, ভয়-ভাবনার ধার ধারিনে, সবই মজার বিষয়, হাসির বিষয়। ভয়ের ভয়ঙ্করতা জানা না থাকার দরুনই নির্ভীক মানুষ। কিন্তু যখন জানলুম, তখনও

ভয়কে দুঃখকে চোখরাঙানিকে হাসি দিয়ে বঞ্চিত করার স্বভাব আমার রয়ে গেল; গভীর রাজনৈতিক বিপদের দিনেও মহাত্মা গান্ধী তাই একবার বলেছিলেন আমায়— "Your laughter is a national asset! Laugh away!" জীবনে কাঁদিনি তা নয়,— সে লুটোপুটি খেয়ে অন্তরের অন্তঃপুরে অনেকবার— লোকের সামনে নয়। বৌদ্ধ ত্রিপিটকে একটা গল্প আছে, একজন বোধিসত্ত্ব বলছেন— 'জনমে জনমে যত কান্না কেঁদেছি, তাতে অনেকানেক অশ্রুর সমুদ্র রচিত হয়েছে।' আমাদেরও একটা জন্মেরই কান্না জড়ো করলেও তাই হয়।'[১২]

এতটাই কান্না জমা থাকে মেয়েদের মনে যার কোনও প্রকাশ ঘটে না এবং আত্মকথাতেও সেই নীরবতা পালন করে চলা হয়।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর *স্মৃতি সম্পুট*

আত্মজীবনী লেখার মাঝেই সরলা দেবীর প্রয়াণ ঘটে। বিবাহিত জীবন সম্পর্কে কিছুই নথিভুক্ত করতে পারেননি সরলা দেবী। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর ডায়েরিতে ওঁর এবং প্রমথ চৌধুরীর বিবাহিত জীবন সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা আছে। মহিলাদের আত্মজীবনীতে বৈবাহিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা খুব কমই পাওয়া যায়। এটাই নীরবতা পালন করার একটা বিষয়। ইন্দিরা দেবীর ডায়েরি পড়ে এটা অনুধাবন করা যায় যে, এক স্বতন্ত্র মননের মহিলা একদিকে নিজের আত্মনির্ভরতা এবং অন্যদিকে সমাজের তৈরি করা নির্ভরশীলতা— এই দুইয়ের মধ্যকার দ্বন্দ্বে বিভক্ত। ইন্দিরা দেবীর মতন আত্মসচেতন মহিলাদের প্রাত্যহিক বৈবাহিক জীবনেও নীরবতার আশ্রয় কাম্য বলেই ধরে নেওয়া হত:

"ছেলেপিলে না হওয়ার দরুণ সংসারের সঙ্গে আলগাভাব কতকটা যেন থেকেই গেছে এবং শেষ পর্যন্তই থাকবে বোধ হয়। তবে ওরই মধ্যে যেন একটু চিনতে জানতে বুঝতে শিখেছি। একটু আত্মনির্ভর, একটু গভীরতা কি এতদিনে লাভ করিনি? তবু ঢের শিক্ষা বাকি আছে, এখনও বড় পরমুখাপেক্ষী রয়েছি। কে কী বললে, কে কী করলে, কে কী ভাবলে, কে একটু মুখ অন্ধকার করলে— চিরকাল কি এই বাইরের জিনিসের উপর আমার সুখ দুঃখ নির্ভর করবে? আরে বাপু, তুমি নিজে কী বলবে, কী ভাববে, কী করবে— সেইটেকে বড় করে দেখতে শেখো না? লতা না হয়ে গাছ হও। আশ্রিত না থেকে আশ্রয় হবার চেষ্টা করো— এই তো মানুষের মতো মানুষের কাজ।"[১৩]

সংসারের কর্মব্যস্ততার নানান অনুভূতির আদানপ্রদান প্রাত্যহিক বিভিন্ন খারাপ লাগার সম্মুখীন হতে হয় মহিলাদেরই। যেহেতু মহিলারাই অনেক বেশি সম্পর্কে সম্পৃক্ত থাকেন তাই তাঁদের আশাহতও হতে হয় অনেক বেশি। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে ইন্দিরা দেবীর এক ধরনের বন্ধুত্বপূর্ণ সখ্যতা ছিল বিবাহের পূর্বে। তাই জন্যই প্রমথ চৌধুরী অ-স্বামীসুলভ ভঙ্গিতে ইন্দিরা দেবীকে পারিবারিক কারণে পাওয়া ক্ষোভ বা দুঃখকে উপেক্ষা করতে বলেছিলেন। উনিশ শতকের অন্যান্য স্বামীরা সচরাচর তাঁদের আদেশ করতেন নীরবতা পালনের। প্রমথ চৌধুরীও ইন্দিরা দেবীকে প্রশ্ন না করে মেনে নেওয়ার উপদেশই দিয়েছিলেন, অর্থাৎ নীরব থাকার অনুনয় করেছিলেন। শুধু ভঙ্গিটা ছিল অন্য রকম:

"নববর্ষে ওঁর কাছে একটা কথা শিখেছি— উপেক্ষা। কথা অর্থে কাজের কথা— ভাবের কথা— শুধু ভাষা নয়। কোনও বিষয় আক্ষেপ প্রকাশ করায় উনি বললেন, 'জীবনে অনেক জিনিস উপেক্ষা করতে শেখো, ও-সব ছোটো জিনিসকে আমি তো আমলই দিই নে।' কথাটা আমার মনে লাগল। কোন্ ক্ষণে কি লেগে যায় বলা যায় না। সত্যই তো। কত সময় কত জিনিস মনে লাগে— সব মনে করে রাখতে গেলে কি চলে?— উপেক্ষা করো। কেউ তোমার সঙ্গে হাসিমুখে কথা কয়নি— উপেক্ষা করো। কেউ তোমার আত্মীয়তার দাবি পূর্ণ করে না?— উপেক্ষা করো। এর সঙ্গে নিজে আর একটা কথা জুড়েছি— অপেক্ষা। অপেক্ষা করো, এমন যে দুর্দম্য শোক, তাও কালে মন্দীভূত হয়। অপেক্ষা করো। যে পারিবারিক সমস্যা তোমার চেষ্টার অসাধ্য মনে হচ্ছে, কাঁটার মতো মনে বিঁধে রয়েছে— কালের চক্র পরিবর্তনে আপনিই সে জটিল সমস্যার সমাধান হবে, সে ব্যথার তেজ মরে আসবে। অপেক্ষা ও উপেক্ষা— দেখা যাক, এ বৎসরে এই মন্ত্র কতদূর ফলদায়ক হয়।"[১৪]

ইন্দিরা দেবীর 'উপেক্ষা', সরলা দেবীর 'অন্তঃপুরের কান্না' এবং বিনোদিনীর 'মর্ম্মের মর্মান্তিক ব্যথা'— এগুলো ভিন্ন নয়। যদিও এর কারণগুলো ভিন্ন, তবুও এগুলো একই দিকে ইঙ্গিত করে— নিঃশব্দতা। যে-নৈঃশব্দ সবচেয়ে বেশি দিয়ে থাকেন পরিবারের বিভিন্ন মানুষজন। পরিবার, পেশা ও ধর্ম— তিনটি প্রতিষ্ঠানই মহিলাদের নীরব করে রাখার ক্ষেত্রে সফল।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর স্মৃতি বিস্মৃতির তরঙ্গ

১৮৯৪-এ জ্যোতির্ময়ী দেবীর জন্ম, বিয়ে হয়ে যায় দশ বছর বয়সে, ১৯০৪-এ। প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করেন ১৯০৯ এবং বৈধব্য আসে ১৯১৮-তে। এর পরেই সাহিত্যিক হিসাবে নিজের প্রতিভার উন্মেষ ঘটে জ্যোতির্ময়ীর। পরিবারে ভাঙন, সম্পত্তির অধিকারে নারী পুরুষের অসাম্য, পণপ্রথা, বিবাহিত মেয়েদের সমস্যা— এই ধরনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি লিখতেন এবং *ভারতবর্ষ, প্রবাসী* বা *উত্তরা*-র মতন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তা ছাপা হত।

বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর শ্বশুরবাড়িতে মহিলাদের যে সমস্ত ধরনের ছোটখাটো দুঃখ কষ্টকে নীরবে মেনে নেওয়াই রীতি, সেই কথা উল্লেখ করেছেন জ্যোতির্ময়ী। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েই এই সামাজিকীকরণের কথা লিখেছেন:

"[বাবা-মার কাছে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে যেতে বাধা দেন শ্বশুরবাড়ি, তাই]... খুব মনে কষ্ট হল। বধূর মনের ক্ষোভ-কষ্টের কথা তাঁরা ভাবতে জানতেন না? অথবা গ্রাম্য কুটিল সঙ্কীর্ণতার উপরে ওঠবার মতো মন তাঁদের ছিল না? যাক। মানুষের মন, মেয়ে মানুষের মন খুব স্থিতিস্থাপক উপাদানে তৈরি। অথবা যারা অসহায় তারা সব মেনে নেয় এবং মানিয়ে নেয়। বৌরা তা চমৎকার ভাবে জানে। সেকালে জানত। আমাদের বিয়ের মন্ত্রে আছে 'শ্বশুরে সম্রাজ্ঞী ভব'। কিন্তু সে সাম্রাজ্য কাদের বা কার, কি তার রীতিনীতি কেউ জানেন না। কেননা প্রত্যেক পরিবারই তো একটি রাজ্য বিশেষ। তার সাম্রাজ্যও পৃথক।

কত খেয়াল-খুশিময় সে রাজ্য ও রাজা-রানীর দল— সে কথার ইতিহাস কেউ জানে না। 'হুকুম আর তামিল' আদেশ পালন এই ছিল তখনকার (এখনও আছে) নিয়ম।"[১৫]

যে-সাম্রাজ্যের কথা জ্যোতির্ময়ী দেবী লিখছেন, নারীবাদীরা তাকেই বলবেন পুরুষতন্ত্র। হুকুম আর আদেশ পালন হচ্ছে এক কর্তৃত্ব ফলানো এবং নিয়ন্ত্রিত হওয়ার সম্পর্ক যেখানে পারিবারিক সম্পর্কে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও পুরুষটি প্রভাবশালী এবং মহিলারা নিয়ন্ত্রিত হন। এই কর্তৃত্ব প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্জন করেছে সমাজে। এই কর্তৃত্বই মেয়েদের নীরব করিয়ে রাখে।

অতি সাধারণ দৈনন্দিন বিষয়েও নীরবতা পালন করতে বাধ্য হন মহিলারা। জ্যোতির্ময়ী দেবী সেই ধরনের কিছু অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর *স্মৃতি বিস্মৃতির তরঙ্গ*-তে:

"সেকালে বধূদের পরবার কাপড় শাশুড়িরা বা ননদরা বার করে দিতেন। ভাবলাম এবারে বড় হয়েছি কাপড় বুঝি বার করে গিন্নিপনা করার দোষ হবে না। একখানি ডুরে রঙিন কাপড় পরার নেই বাধা। পরেছি একটা পরিষ্কার কাপড় বিকালে। রান্নাঘরে গিয়েছি। একবার তির্যক দৃষ্টিতে নেত্রপাত করলেন কাপড়ের দিকে। তারপর বললেন, 'ওসব পরিষ্কার কাপড় এখানে কেন পরছ? বাপের বাড়িতে যখন উৎসব সময়ে যাবে পোরো। ছেড়ে রাখো।' (যদিও কোনও উৎসবেই এ যাবৎ যেতে দেওয়া হয়নি!) কিন্তু শ্বশুরবাড়িতেও সাজবার সাধ হয় সে কথা কি তাঁদের জানা ছিল না! ভীত ভাবে কাপড় বাক্সে তুলে রাখলাম।"[১৬] শাশুড়ি, ননদ থাকলে বাড়ির বউ-এর কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার জায়গা ছিল না। এমনকী একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় নিয়েও নয়। কী শাড়ি পরা সম্ভব তার নির্দেশও পরোক্ষ ভাবে পিতৃতন্ত্রই দেবে। মেয়েদের নিজস্ব সাধ এবং সেটা পূর্ণ করবার জন্য সিদ্ধান্ত দুটির বিরুদ্ধেই প্রতিকূল ধারণা ব্যক্ত করা হত।

বিবাহিত জীবন এবং বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার জন্য যে ধরনের নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয় এক মহিলার জীবনে তার মধ্যে যে অনেকাংশে ছলনা আছে সেটা জ্যোতির্ময়ী অনুধাবন করতে পেরেছিলেন:

"আর সেই চমৎকার নিরেট বোকা মেয়েটি আর তার শাশুড়ি দুজনে মিলে বেশ সংসার-ধর্ম করে চলে। এবং লোকে এসে বলে যায়— কী সুখী পরিবার! আমিও ভাবতাম— আহা কী সুখী! বাড়িতে সবাই হাসে, কথা কয়, গান গায়, পড়াশোনা করে। আমারও ষোলো বছর বয়সের জীবনের সামনে অনেক আশা অনেক কল্পনা। ভাবছি আমি খুব আদর্শ বধূ হচ্ছি। সেদিনের সেই অতি সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যে কর্তব্য ও স্নেহের ভানে সব কটি তুচ্ছ বিষয়ে বঞ্চিত নারী বা প্রবঞ্চিত বিমূঢ় তরুণীর ভাব কী ছিল?"[১৭]

জ্যোতির্ময়ী দেবী বিনোদিনী, সরলা বা ইন্দিরার চেয়ে একেবারেই ভিন্ন। উনি যে প্রতিষ্ঠিত নারীবাদী সাহিত্য পড়েছেন তা ওনার লেখা থেকে বোঝা যায়। অত্যন্ত প্রগাঢ় অনুভূতির কথা খুব সাবলীল ভাবে লিখেছেন জ্যোতির্ময়ী। উত্তর না থাকলেও, তিনি দাম্পত্য জীবনে বা বিবাহোত্তর সময়ে সুখের অর্থ কি তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

এক অক্ষয় নীরবতায় নিয়ে যায় জ্যোতির্ময়ী দেবীর অকাল বৈধব্য: "সে এক অদ্ভুত কঠিন ভাবে নিয়ন্ত্রিত জীবন শুরু হল। যে শোক বিয়োগের সঙ্গে মানুষের নিয়তই পরিচয় হয়— মেয়েদের বৈধব্যজীবনের শোকবিয়োগ তা নয় ঠিক।— এ শোক পুরুষদের জানা নেই। যাতে এসে পড়ে বিয়োগ শোক ছাড়াও এক চিরকালের আনুষ্ঠানিক শোক— অশন-বসন আচরণে ধরনে সমস্ত কিছুতে। আসে এক সামাজিক শোক। সমস্ত উৎসব সামাজিক মাঙ্গলিক আনন্দ অনুষ্ঠান থেকে বিমূঢ়ভাবে অপাংক্তেয় এক নতুন জগতে। আসলে আমার যেন নবজন্ম হল। দ্বিজ নয়, অন্য এক অপাংক্তেয় শুদ্র জগতে।... শাস্ত্রে আছে নিরালম্ব দেহমুক্ত মৃত-আত্মার কথা। যার স্থিতি নেই, আশ্রয় নেই, স্বস্তি নেই, বায়ুভূক শূন্যবাসী। দেহ থাকতে সেই অমর মৃত্যু আমাদের হয়। সে সমাজের মধ্যে থেকে সমাজের নয়। জীবন থেকেও জীবনের প্রতিদিনের তুচ্ছ সুখ-দুঃখেরও বাইরের মানুষ। আমার সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়ল এক বাধা— আচার-বিচার ছোঁওয়াছুঁয়ির অশুচি-শুচির বিধিনিষেধময় জীবন।"[১৮]

জ্যোতির্ময়ী দেবীর মতো এক চিন্তাশীল মানুষ যে বয়সে এসে আত্মজীবনী লিখছেন তখন তাঁর এই ভাবনার প্রতিফলন ঘটছে যে, বৈধব্য কেবলমাত্র ব্যক্তিজীবনের ক্ষতি নয়। ব্যক্তিজীবন থেকে উত্তরণ ঘটছে সামাজিক স্তরে। যে অভিযোজনগুলো ঘটে সেগুলো কেবলমাত্র ব্যক্তিজীবনেই ঘটে না, সামাজিক ক্ষেত্রেও ঘটে। বৈধব্যের অবস্থানে পিতৃতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি বিচ্যুতিহীন। এবং এই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে অন্যতম এক ধরনের স্থবিরতা। মেয়েদের জীবন এবং জীবনবোধের থমকে যাওয়া। নিয়মানুবর্তিতা এতটাই কঠিন যে তার সম্মুখে কোনও প্রশ্ন তোলাই অসাধ্য, অভিযোগ অসম্ভব। বৈধব্যের সঙ্গে তাই নীরবতার নিবিড় যোগাযোগ।

নারীজীবনের সারমর্ম পাওয়া যায় জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখায়। জীবনীমূলক সাহিত্য পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি এবং সমাজের মেলবন্ধন ঘটানো। *স্মৃতি বিস্মৃতির* তরঙ্গে সেই সমন্বয় ঘটে। যে কোনও মহিলা, তা তাঁরা যে ধরনের সামাজিক অবস্থানেই থাকুন না কেন, মহিলা হওয়ার জন্য কিছু অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য তাদের মধ্যে থাকেই:

"...আগেই বলেছি, জীবনের পথে মেয়েদের পাথেয় আমাদের সমাজে কখনওই কেউ পায় না। তাকে তৈরি করা হয় সমাজের জন্য। জৈবজীবনেরই যত কিছু প্রয়োজনের জন্য— বন্ধন, সেবা, সন্তান পালন আর পারিবারিক কাজ। অর্থাৎ বহুজনের মনরাখা জগতের জন্য এক কথায় তাকে মানুষ হিসাবে মানুষ করা হয় না, কাজে লাগাবার উপকরণ হিসাবে দেখা হয়।... এই অপচয়ের জগৎই হল নারী জগৎ। যার মন আছে, মননশক্তির বিকাশ নেই। হৃদয় আছে, হৃদয়ের সম্মান নেই। যেন সুর আছে, সঙ্গীত নেই। ভাব আছে, ভাষা নেই। এমনি জীবন।..."[১৯] "...আমার নিজের মতে মেয়েদের আনন্দের কোনও সৃষ্টিই স্বাধীন সত্তা ও স্বাধীন চিন্তা-কল্পনার অভাবে সার্থক হয় না। আমরা অনুগ্রহ আর কৃতজ্ঞতার ভারে ওতপ্রোতভাবে ডুবে আছি। আমাদের মাথা থেকে পা অবধি শেখা আছে, না স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য য অর্হতি। এবং স্বাতন্ত্র্য যার নেই, সে মানুষ হলেও সেই অর্থে মানুষ নয়।"[২০]

স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, মনন— এগুলো একটিও নারীজীবনের সঙ্গে যুক্ত করা যায় না। এবং সে জন্যই মেয়েদের মানুষ বলা যাবে কিনা তাই নিয়েই জ্যোতির্ময়ী দেবীর সন্দেহ হয়। কারণ বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত না হতে পারলে মেয়েদের ব্যক্তিসত্তার উন্মেষ ঘটবে না। পিতৃতন্ত্র এই নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখে মেয়েদের চুপ করিয়ে রেখে; এটা শিখিয়ে যে, মেয়েরা প্রশ্ন করতে পারে না। বাড়ির ভিতরের কাজ বিনা বাক্যব্যয়ে করে যাওয়াই মেয়েদের জীবনের মূল মন্ত্র। নীরবতার নিয়ন্ত্রণ এমন ভাবে আত্মস্থ করে ফেলেন মেয়েরা যে, সব সময় কোনও নির্দিষ্ট মাধ্যমেরও প্রয়োজন হয় না চুপ করানোর। নারীত্বের নিয়মগুলি এতটাই তীব্র এবং সর্বজনবিদিত।

যদিও আলোচিত চারজনের আত্মজীবনী একে অন্যের থেকে আলাদা এবং নিজের নিজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্বতন্ত্র, তবুও সাধারণভাবে কিছু সমাপ্তিসূচক বিশ্লেষণ করা যায়:

• আলোচিত মহিলাদের প্রত্যেকেরই নৈঃশব্দের সংস্কৃতিতে এক ধরনের সামাজিকীকরণ ঘটেছিল। পরিবারের অবস্থান কলকাতায় হোক বা কলকাতার বাইরে, চাকরিরত পরিবার হোক বা বনেদি ব্যবসায়ী বা নিতান্ত নিম্নবিত্ত— মেয়েদের কাছ থেকে খুব একই ধরনের প্রত্যাশা ছিল সকলের। প্রাত্যহিক জীবনের মান-অভিমান উপেক্ষা করা, বা শাশুড়ির নিয়ন্ত্রণে চুপ করে থাকা, বা বারবনিতার জীবনে নীরবে প্রতারণার হিসেব নিকেশ করা— বিষয়বস্তু পালটালেও মূল প্রতিপাদ্য একই থেকে যায়।

• বিভিন্ন মাধ্যমের ভিতর দিয়ে এই নীরবতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দেশ আসে মহিলাদের জীবনে। বিনোদিনীর ক্ষেত্রে সেই মাধ্যম যদি পেশাদার মঞ্চ হয়, সরলা দেবীর ক্ষেত্রে তা হচ্ছে ঠাকুর পরিবারের গরিমা, ইন্দিরা দেবীর ক্ষেত্রে বন্ধুবৎসল স্বামী আর জ্যোতির্ময়ী দেবীর ক্ষেত্রে দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাশুড়ি। অর্থাৎ পরিবারের ভেতরে কিছু নির্দিষ্ট মানুষ আছেন, কিছু অলিখিত কিন্তু আত্মস্থ করে নেওয়া সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিয়মানুবর্তিতা আছে, এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বা শিক্ষাব্যবস্থার পঠন-পাঠন— এই মাধ্যমগুলোর ভিতর দিয়ে মহিলারা নিয়ন্ত্রিত হন। কথা না বলতে দেওয়া বা মহিলাদের কথাকে যথেষ্ট স্বীকৃতি না দেওয়া এই নিয়ন্ত্রণেরই বৈশিষ্ট্য।

• নিয়ম মান্য করার জন্য পুরস্কৃত করা না হলেও নিয়ম অমান্যের জন্য শাস্তি যথেষ্ট নির্দিষ্ট ছিল। বিনোদিনী যেমন বুঝেছিলেন, নিজের লেখাতেও সব সত্য প্রকাশ করা যাবে না, বা জ্যোতির্ময়ী দেবী যেমন উপলব্ধি করেছিলেন যে মহিলারা সতী হলেও সত্যবাদী নন বা হতে পারেন না। এমনই পরিহাস যে মেয়েদের সত্য কথা বলাটাই গ্রহণযোগ্য নয় সমাজে। সেই সত্যের নির্মমতা বা স্পষ্টতা স্বাভাবিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমর্থনযোগ্য নয়। তাই সরলা দেবীও বলেন যে দুঃখের কথা কেঁদে গোপন করাই বাঞ্ছনীয় বা ইন্দিরা দেবী উপেক্ষা শব্দটির সঙ্গে যুক্ত করে দেন অপেক্ষা শব্দটি, যার সঙ্গে অদৃষ্টের যোগ এবং যার উপরে কোনও কিছুর নিয়ন্ত্রণই খাটে না। অর্থাৎ অদৃষ্ট চাইলেই একমাত্র মহিলাদের জীবনের পরিবর্তন আসতে পারে।

• এই নীরব থাকার সামাজিক নিয়মের সঙ্গে মহিলাদের আপস করা বা মানিয়ে নেওয়ার মধ্যেও তারতম্য ছিল এবং এই প্রভেদেও যেটা দ্রষ্টব্য তা হল তাদের সামাজিক অবস্থান, শিক্ষাগত যোগ্যতা। বিনোদিনী নিজের জীবনটাকে পূর্ব-নির্ধারিত নিয়তি বলেও মেনে নিয়েছিলেন। কোনও পরিস্থিতিতেই কোনও প্রশ্ন তোলেননি, কারণ নিজেকে একজন 'হতভাগিনী' বারবনিতা ছাড়া আর কিছুই ভাবেননি তিনি। সরলা, ইন্দিরা বা জ্যোতির্ময়ী নিজের নিজের সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে বা স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে চেয়েছেন নিয়ন্ত্রণ থেকে। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করা বা সেই বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশ করার মতন কোনও কিছুই তাঁরা করেননি যদিও তাঁরা ছিলেন শিক্ষার আলোকপ্রাপ্তা। জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখায় অবশ্য একটা উত্তরণ ঘটেছে, নিজের অবস্থানের বাইরে গিয়ে অন্য মেয়েদের সঙ্গে নিজের অবস্থানকে মেলানোর। এটাও এক ধরনের মানিয়ে নেওয়ার পদ্ধতি যা থেকে এটাই বোঝা যায় যে, আত্মজীবনী যিনি লিখছেন তিনিই শুধু বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিয়মের নিয়ন্ত্রণে আছেন তা নয়, বেশির ভাগ মেয়েরাই আছেন। আত্মজীবনী হয়তো লিখতে পারছেন খুব কম সংখ্যক মহিলা কিন্তু তাঁরা নিজের নিজের কথা লিখলেও অনেক মেয়েই তাঁদের সেই জীবন কাহিনির মধ্যে নিজেদেরকে খুঁজে পান কারণ পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের এক ধরনের রূপ আছে। তা ছাড়া, ব্যক্তি আমির গণ্ডির বাইরে বৃহত্তর সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে নিজের অবস্থানকে মেলানো— এই একাত্মতাও এক ধরনের আপস। 'দেবী' অথবা 'দাসী'— যাই থাক নামের সঙ্গে, যে কোনও সামাজিক স্তর বা পটভূমির মহিলাকেই নীরব করে দেওয়ার অস্ত্র পিতৃতান্ত্রিক মাধ্যমগুলোর আছে।

নারীবাদী গবেষণার ক্ষেত্রে আত্মজীবনী বিশ্লেষণ খুবই জনপ্রিয় একটি পদ্ধতি। এর মূল কারণ, মেয়েদের জীবন, জীবনচর্যা বা জীবনবোধ প্রচলিত ঐতিহাসিক লেখায় সহজে ধরা পড়ে না। যে কোনও ধরনের প্রান্তবাসী মানুষের জন্য জীবনী-ইতিহাসপদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ফলপ্রসূ। এই প্রান্তবাসী গোষ্ঠীরা, যাদের মধ্যে মহিলারা অন্যতম, তারা জীবনী, আত্মজীবনী, চিঠিপত্র, ডায়েরি এ সবের মাধ্যমে নিজেদের জীবনচর্যা লিপিবদ্ধ করেন। এ ধরনের আখ্যানের পাঠ ও ব্যবহার নারীবাদী গবেষণায় যথেষ্ট প্রচলিত। জীবনী ইতিহাস গবেষণাপদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল:[২১]

• কাল পরম্পরা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নয় এখানে, কারণ ব্যক্তিজীবনের উন্মোচনই এ ক্ষেত্রে জরুরি।

• যিনি লিখছেন তাঁর ব্যক্তি সত্তার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সামাজিক সময়ের বিবরণী পাওয়াটাও প্রয়োজনীয়।

• জীবনী ইতিহাস পদ্ধতিতে ব্যক্তিটি কীভাবে বহির্বিশ্বে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন তার বিশ্লেষণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

আত্মজীবনী লিখে ইতিহাস রচনা করতে চাওয়ার মধ্যে নীরবতা ভাঙার একটি আপাত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু সেই স্বাধীনতাও সমাজ-নির্মিত। নৈঃশব্দ যে-কোনও ভাষারই

অন্তর্গত এবং আত্মজীবনী লেখা মানে তো স্বীকারোক্তি। লজ্জা-সংকোচ অতিক্রম করে সেই স্বীকারোক্তি করতে হয়, যেটা মেয়েদের পক্ষে খুবই সমস্যার। পরিবার সম্পর্কে লেখা খুব সহজ বিষয় নয়। পরিবার বৈষম্য সৃষ্টি করে আবার পরিবারই মেয়েদের খুব বড় অবলম্বনও। প্রচলিত মূল্যবোধ প্রত্যাশা করে যে মহিলারা তাঁদের সম্পূর্ণ পরিচয় উন্মোচন করবেন না, লেখার সময়েও প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের প্রতি অনুগত থাকবেন অর্থাৎ লিখলেও অনেক কিছুই গোপন রাখবেন। এই আত্মজীবনীগুলো অবশ্যই মহিলাদের জীবনের আখ্যান। কিন্তু এমনি সেই আখ্যান যা তাদের জীবনের নানা দিক অন্তরালেই রেখে দেয়। কথা বলা হলেও অনেক বিষয়ে নীরবতাই সেখানে কাঙ্ক্ষিত এবং তা শেষ পর্যন্ত সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতেই সাহায্য করে।

কেতকী কুশারী ডাইসন

মেয়েদের আত্মবিবৃতিদান

লিঙ্গনির্বিশেষে মানুষের আত্মবিবৃতিদান আমার একটি ব্যক্তিগত কৌতূহলের বস্তু। বোধ হয় তাই ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর উপরে যখন গবেষণা করছিলাম তখন তাঁর লেখা কতগুলি লাইন, যাদের মধ্যে মানবতন্ত্রের সারাৎসার ধরানো আছে, পাথরের উপরে শিলালিপির মতো আমার মনে ব'সে যায়। তাঁর একটি প্রবন্ধে ভিক্তোরিয়া বলেছিলেন:

> মানুষের মধ্যে যা আমাকে সর্বাধিক মথিত করে তা তার মানবিক অবস্থা, যে-অবস্থাকে সে ব্যক্ত করে তার সব কাজে,— যদি সে বই লেখে তবে তার বইয়েও। আমার কাছে মানুষ সবার আগে মানুষ, লেখক বা ছুতোর বা বিচারক বা মিস্ত্রী নয়; ওগুলো তার বাড়তি পরিচয়। যা জরুরী তা হচ্ছে তার ভিতরের মানুষটা, তার যাবতীয় ক্রিয়াকর্মে সৃষ্টিতে ঐ মনুষ্যত্বের ঝিলমিলি। মানুষের মধ্যে যা আমাকে সর্বাধিক মথিত করে তা সেই মানুষটি যে দুঃখ পায়, সংগ্রাম করে, আত্মপ্রকাশ খোঁজে। যা আমার কৌতূহল আকর্ষণ করে তা এই: কিভাবে ঐ মানুষটি তার মানবিক সমস্যার সমাধান করছে, কিভাবে সে তার মানবিক নিয়তিকে স্বীকার করছে, সহ্য করছে, রূপ দিচ্ছে।[১]

যেহেতু আমি একজন মেয়ে, বিশ শতকে বড় হয়ে উঠে যুগোচিত ধর্মে নিজেও আত্মপ্রকাশ-অন্বেষণের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গেছি, তাই মেয়েদের আত্মবিবৃতিদান— তা মৌখিকভাবেই হোক, অথবা লিখিতভাবে— বিশেষভাবেই আমার মনের কাছাকাছি। জানি যে এটি অনেক দিন ধ'রেই আমার স্থায়ী কৌতূহলের লক্ষ্য।

বিষয়টার প্রতি সচেতনভাবে আকর্ষণ অনুভব করতে আরম্ভ করলাম কবে থেকে? মনে হয় যখন কুড়ি বছর বয়সে অক্সফোর্ডে প্রথম পড়াশোনা করতে এসেছিলাম, সেই সময়ে আমার সহপাঠিনীদের মুখে তাদের বড় হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত শুনে শুনে এ বিষয়ে আমার কৌতূহল তৈরি হয়ে ওঠে। তার আগে আমার মায়ের মুখে কাশীতে তাঁর বড় হয়ে ওঠার গল্প শুনেছি, একটু পরে নিজের কাশীতে বেড়াতে যাওয়ার সংক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতার

সঙ্গে তাকে মিলিয়ে নিতে পেরেছি। শৈশবের চোখ দিয়ে দেখা কাশীর সেই জীবনযাত্রায় প্রধান দর্শনীয় ছিলো গঙ্গার ঘাটে স্নান আর মায়ের আত্মীয়বাড়ির ছাদে বারান্দায় উঠোনে হনুমানদের ঘোরাফেরা। পরবর্তী কালে কলকাতার স্কুলে-কলেজে আমার সহপাঠিনীদের মুখ থেকে তাদের বড় হয়ে ওঠা সম্পর্কে দু'-চারটা টুকরো খবর পেয়েছি। মনে পড়ছে, স্কুলজীবনে একটি মেয়ের বাবা গরুমহিষের ব্যবসা করেন শুনে মনে মনে অনেক ভেবেছিলাম, একজন গরুমহিষব্যবসায়ীর কন্যার জীবন ঠিক কিরকম হতে পারে? আমি ছোটবেলা থেকে দেখি যে আমার বাবা 'অফিসে' যান, আমার জীবনের থেকে আমার ঐ সহপাঠিনীটির জীবন কোথায় কিভাবে আলাদা? তবু কাশীর প্রেক্ষাপট বা সেই সহপাঠিনীটির বাবার পেশা সামান্য অচেনা হলেও আমার পরিচিত জগতের থেকে ততটা দূরত্বে ছিলো না যে আমার মনের মধ্যে কোনো তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করবে। কাশী-ভ্রমণের আগেও হনুমানদের কীর্তিকলাপ আর নদীর ঘাটে মানুষের স্নান দেখেছি। আমার বাবা পশুব্যবসায়ী না হোন, গরুমহিষ না দেখে তো আর বড় হই নি; তাই এটুকু বুঝে নিয়েছি যে রাখালদের বা গোয়ালাদের দৈনন্দিন কাজের মতো সেটাও একটা পশুসংক্রান্ত কাজ, যা সমাজের অর্থনৈতিক জীবনের অন্তর্গত, এবং যা থেকে ঐ মেয়েটির বাবার জীবিকা অর্জিত হয়, কিন্তু আপাততঃ আমরা যে একই বইপত্র পড়ি, একই হোমওয়ার্ক বাড়িতে নিয়ে যাই, আমাদের বালিকাজীবনে সেই নৈকট্যই সর্বপ্রধান কথা।

বলতে চাইছি, যাকে বলা যায় আমাদের জীবনপ্রসূত 'নৃতাত্ত্বিক' কৌতূহল, তাকে কি কোনো-একটা সামাজিক-সাংস্কৃতিক দূরত্বের বোধ প্রাথমিকভাবে উস্‌কে দেয় না? খেয়াল করেছি, যখন মনে হয়, 'আমরা আর এরা নানা জায়গাতেই এক, তবু এদের জীবনযাত্রা আমার চেনা মানুষদের জীবনযাত্রার থেকে একটু অন্যরকম', তখন সেই ভিন্নতার বোধ আমার চেতনায় কৌতূহলের ট্রিগার হয়ে ওঠে। ঐভাবেই অক্সফোর্ডের কলেজে আমার সহপাঠিনীরা যখন তাদের বড় হয়ে ওঠা সম্বন্ধে আমাকে গল্প বলতো তখন মেয়েলী অস্তিত্বের একটা ভিন্ন নকশা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠতো। সেই প্রথম একটা যথার্থ ভিন্নতা অনুভব করতে আরম্ভ করলাম।

তাদের গায়ের রঙ সাদা বা তারা অন্য ধরণের খাবার খেতে বা পোশাক পরতে অভ্যস্ত, সেটাই বড় কথা ছিলো না। সেসব কথা জেনেই তো নতুন দেশে এসেছিলাম। কিন্তু যখন তারা বলতো যে মায়েদের সঙ্গে তাদের বনে না, তারা মায়েদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিণী, তখন আমার খটকা লাগতো। লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে বা প্রেসিডেন্সি কলেজে আমি এই ধরণের কথা শুনি নি। নিজেও অনুভব করি নি যে মায়ের সঙ্গে আমার বনে না। তাঁর বিরুদ্ধে কোনো মৌল বিদ্রোহ ঘোষণা করার তাগিদও অনুভব করি নি।

একটা ভিন্ন সমাজ, একটা ভিন্ন শ্রেণীবিন্যাস, সেই বিন্যাসের সঙ্গে সংলগ্ন একাধিক খাতে প্রবাহিত স্কুলশিক্ষাব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা মেয়েরা— তাদের মধ্যে গিয়ে পড়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের একই হাইওয়ে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি ওখানে পৌঁছেছি অন্য একটা দেয়ালের বিশেষ এক ধরণের কুলুঙ্গি থেকে বেরিয়ে। আজ পিছনে

তাকিয়ে মনে হয়, সেই ভিন্নতার চেতনা সেই সময় থেকেই আমাকে বিভিন্ন গোত্রের মেয়েদের জবানবন্দি শুনে নেবার অভিমুখে একটা উন্মুখতা দিয়ে থাকবে। লেখালিখিতে তার প্রথম ফসল ফলেছে আমার *নারী, নগরী* বইটাতে (১৯৮১, *দেশ*-এ ধারাবাহিক প্রকাশ ষাটের দশকে)। আমার ডক্টরেটের গবেষণাভিত্তিক ইংরেজী বই *আ ভেরিয়াস ইউনিভার্স*-এর (১৯৭৮) মধ্যে যে-অনুসন্ধান ধরানো আছে তার বিষয়বস্তু ছিলো ১৭৬৫-১৮৫৬ সময়সীমার মধ্যে ভারতপ্রবাসী বৃটিশ নরনারীদের দিনলিপি আর স্মৃতিচারণা। মেয়েদের লেখা বইগুলি আমার মনে বিশেষভাবেই দাগ কেটেছিলো, আর প্রবাসের পটভূমিকায় কিভাবে একটা বাংলা উপন্যাস নির্মাণ করা যেতে পারে তার একটা খেই পেতেও কিছুটা সাহায্য করেছিলো। আমার প্রথম উপন্যাস *নোটন নোটন পায়রাগুলি*-তে (১৯৮৩, *দেশ*-এ ধারাবাহিক প্রকাশ ১৯৮১-৮২-তে) বিভিন্ন সংস্কৃতির মেয়েদের আত্মবিবৃতি ধরিয়ে দেওয়া আছে। এর পর বিভিন্ন সংস্কৃতির মেয়েদের বহির্জীবন আর অন্তর্জীবন সম্পর্কে আমার সেই উদ্রিক্ত এবং চলমান কৌতূহলের ধাক্কা আমাকে ঠেলে দিয়েছিলো ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর জীবন আর ব্যক্তিত্বকে ঠিক ক'রে বুঝে নেওয়ার দিকে— শুধুই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আদানপ্রদানের প্রেক্ষাপটে নয়, তাঁর নিজস্ব আর্জেন্টাইন সামাজিক জগতের পরিপ্রেক্ষিতে। ছয় খণ্ডে তাঁর আত্মজীবনী *আউতোবিওগ্রাফিয়া*-র (সুর, বুয়েনোস আইরেস) পাঠ, তা ছাড়া তাঁর প্রবন্ধসংগ্রহের বিভিন্ন খণ্ডের পাঠ আমার বই পড়ার জীবনে একটা মাইলফলকের মতো। এটা লক্ষণীয় যে তাঁর প্রবন্ধসংগ্রহকে তিনি বলেছেন তাঁর *তেস্তিমোনিয়োস্*, অর্থাৎ সাক্ষ্যদানসমূহ অথবা জবানবন্দিসমূহ। তাঁর বহু প্রবন্ধেই এক জাতের বিবৃতি দেখতে পাওয়া যায়, যাকে বলা যায় আত্মজৈবনিক আঙ্গিকের সম্প্রসারণ, যেখানে কোনো বিষয়ে তাঁর যে-বক্তব্য, সেটা প্রথম দফায় তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িয়ে বেরিয়ে আসে। পরে তার সঙ্গে অন্য জাতের বিশ্লেষণ বা আলোচনা যুক্ত হতে পারে, কিন্তু প্রাথমিক উৎসারণে তার একটা সম্পর্ক থাকবে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে। সেই সম্পর্ক তাঁর লেখাকে খাঁটিত্বের একটা নির্ভুল স্বাদ দেয়। কোনো সাহিত্যিক থিওরি নয়, পরিভাষাকণ্টকিত কোনো পর্যালোচনা নয়, কোনো বই বা ব্যক্তিত্ব তাঁকে সরাসরি যেভাবে ছুঁয়েছে বা আলোড়িত করেছে সেটাই তাঁর লিখনের আদি উৎসমুখ। ওখানে আমি তাঁর সঙ্গে একটা সমধর্মিতা অনুভব করি, এবং তা থেকে একটা আশ্বাস পাই।

তবু তাঁর মতো একজন বড় মাপের নারীও রক্ষণশীল ক্যাথলিক সমাজে নিজের তরফে আত্মবিবৃতিদানের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য আদায় ক'রে নিতে পারেন নি। তাঁর আত্মচরিতে সমাজবিরুদ্ধ প্রণয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে ব'লে জীবৎকালে সেটি প্রকাশ করতে চান নি তিনি। খণ্ডে খণ্ডে সেগুলি বার হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পরে। ভিক্তোরিয়ার আত্মজীবনীর যথার্থ এবং পূর্ণাঙ্গ টেক্সটগত ইতিহাস খুঁড়ে দেখা আমার এক্তিয়ারের বাইরে ছিলো, কিন্তু যেহেতু চতুর্থ খণ্ডটিতে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ এবং এল্‌ম্‌হার্স্টপ্রসঙ্গ আছে, তাই এ বিষয়ে আমাকে একটু ভাবতে হয়েছিলো। অনেক সময়ে তাঁর রচনার প্রথম খসড়া তিনি ফরাসীতে করতেন। চতুর্থ খণ্ডের ক্ষেত্রে টাইপ-করা ফরাসী খসড়াটাই আসল আকর, এবং এই ফরাসী খসড়ার ফাইলটি আমি

দেখেছিলাম। খোঁজ নিয়ে যতদূর জেনেছি, এই খণ্ডটির কোনো স্প্যানিশ রূপ ভিক্তোরিয়া নিজে তৈরি ক'রে গেছিলেন ব'লে মনে হয় না। রবীন্দ্র-ওকাম্পো-বিষয়ক আমার ইংরেজী বইটি (*ইন ইওর ব্লসমিং ফ্লাওয়ার-গার্ডেন*, ১৯৮৮) যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানবেন, ফরাসী খসড়াটির কোনো কোনো অংশ প্রকাশিত স্প্যানিশ সংস্করণে বর্জিত হয়। রবীন্দ্রনাথ-এলম্‌হার্স্ট-ভিক্তোরিয়ার ত্রিভুজ সম্পর্ককে বোঝানোর জন্য সেই অংশগুলি আমি ইংরেজী তর্জমায় আমার বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। তার জন্য শুচিবায়ুগ্রস্ত সমালোচকদের কিছু সমালোচনাও আমাকে সহ্য করতে হয়েছিলো। উদারতর, বিদগ্ধতর আবহে বর্জিত অংশগুলি অনায়াসে ভিক্তোরিয়ার মুদ্রিত আত্মজীবনীতে স্থান পেতে পারতো। আমার খবর অনুযায়ী, তাঁর উত্তরজীবনের একজন অনুগত শিষ্যার হস্তক্ষেপই এই গোঁজামিলের কারণ। সেই শিষ্যাই সর্বশেষ স্প্যানিশ রূপটি তৈরি করেছেন, ভারতীয় গুরুদেবের সঙ্গে এবং তাঁর সচিব-সুহৃদ ইংরেজ ব্যক্তিটির সঙ্গে তাঁর গুরুস্থানীয়ার সম্পর্কের কাহিনীটাকে নিষ্কলঙ্ক পর্যায়ে রেখে দেবার মতলবে কতগুলো কাটছাঁট করেছেন।

মেয়েরা শূন্যে বাস করে না, বাস করে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের জালের ভিতরে। তাদের অবস্থান বুঝে নেওয়া মানে সেই জালটাকেও কমবেশী বুঝে নেওয়া। যেহেতু অধিকাংশ মেয়ে কোনো এক প্রকারের পিতৃতন্ত্রশাসিত সমাজের অভ্যন্তরে বাস করে, তাই সেই সমাজের দড়িদড়ার সঙ্গে তাদের টানাহেঁচড়ার কাহিনীকে বাদ দিয়ে তাদের জীবনের বৃত্তান্ত এগোয় না। যেখানে মেয়েরা মায়েদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিণী সেখানেও আসল বিদ্রোহ পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থারই বিরুদ্ধে, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মায়েরা ঐ ব্যবস্থার নিয়মকানুনকে আত্মস্থ ক'রে নিয়েছেন। ভিক্তোরিয়ার আত্মবিবৃতিকে সেন্সরশিপের অধীন করার তাগিদও একজন স্ত্রীজাতীয়ার ভিতর থেকেই এসেছে, কারণ তিনিও সামাজিক নিষেধগুলিকে অন্তর্গূঢ় ক'রে নিয়েছেন।

পক্ষান্তরে অধিকাংশ সাবালক পুরুষ তাদের জীবনে নারীপ্রবর্তিত নিয়মের শাসন তেমন তীব্রভাবে অনুভব করে না, তাই তাদের আত্মবিবৃতিদানে মেয়েরা তাদের কিভাবে নিয়ন্ত্রিত-সংকুচিত করেছে সেই ব্যাপারটা কদাচিৎ গুরুত্ব পায়। সম্ভবতঃ তার কোনো গুরুত্ব স্বীকার করতে তাদের অহংবোধেও বাধবে। তবে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্কে বর্তমান সময়ে এমন কিছু অভাবিতপূর্ব অদলবদল আসছে যার ফলে ভবিষ্যতে এই এলাকাটাতেও একটা পরিবর্তন আসবে ব'লে মনে হয়।

অক্সফোর্ডের কলেজে আমার সহপাঠিনীরা যে-ত্রিধারা স্কুলব্যবস্থা থেকে তালিম পেয়ে এসেছিলো সে-সম্পর্কে আমার জ্ঞান তৎকালে স্বাভাবিক কারণেই সীমাবদ্ধ ছিলো। ক্রমে ক্রমে তার স্বরূপ বুঝেছি। এখন বুঝি, মায়েদের বিরুদ্ধে যারা সর্বাধিক নালিশ করতো তারা হলো অভিজাত বোর্ডিংস্কুলে পড়া মেয়ে। সেকালের ইংল্যান্ডে মেয়েদের বোর্ডিংস্কুল যে কিরকম নিয়ন্ত্রণপ্রবণ এবং ব্যক্তিত্বসংকোচনকারী ছিলো তার একটা যথার্থ ছবি সম্প্রতি পেলাম একজন মেয়ের লেখা প্রতিবেদনে, যাঁকে অক্সফোর্ডে চিনতাম— আমার থেকে এক ক্লাস নীচে ছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে আমার আবার সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। জুডিথ

ওক্‌লি সামাজিক নৃতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ এবং তাঁর প্রতিবেদনটি লিখেছেন নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, আত্মজৈবনিক উপাদান আর সমাজবিজ্ঞানের মিশালে। স্মৃতিচারণার সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের মাত্রা যুক্ত হওয়ায় অনেক খুঁটিনাটি স্বচ্ছ হয়ে আসে। মেয়েদের আত্মবিবৃতিদানের ইতিহাসে এই ধরণের মিশ্র রীতির রচনারও বিশেষ গুরুত্ব আছে ব'লে মনে হয় আমার।[২]

আজকাল প্রচুর মেয়ে আত্মচরিত লিখছেন। যাঁরা নিজেরা লিখছেন না তাঁদের আত্মবিবৃতিও সাহিত্যে প্রবেশ করছে ভিন্ন খাতে— অন্য মেয়েদের লেখা বইয়ের মাধ্যমে, ঔপন্যাসিক বা সমাজবৈজ্ঞানিক মাত্রার সঙ্গে অন্বিত হয়ে। সাম্প্রতিক কালে তসলিমা নাসরিনের আত্মজীবনী সঙ্গত কারণেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। আমি প্রথম দুটি খণ্ড পড়েছি।[৩] তৃতীয় খণ্ডটির প্রচার নিষিদ্ধ হবার পর সেটি অন-লাইন পড়ার চেষ্টা করেছিলাম; সেটিকে প্রথম দুই খণ্ডের মতো মনোযোগ-আকর্ষক মনে হয় নি। একটি চতুর্থ খণ্ডও বেরিয়েছে জানি, সেটি আমি এখনও দেখি নি। আমার বক্তব্য প্রথম দুই খণ্ডের ভিত্তিতেই বলবো।

আত্মবিবৃতিদান কারও পক্ষেই কেবল নিজের কথা বলা নয়, পরিবেশের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া এবং ধাক্কাধাক্কির বিবরণ তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আরও মনে রাখা দরকার, আত্মজীবনী রচনায় সর্বদাই স্মৃতি হাতড়ে পুনরুদ্ধার, অতীত ঘটনার পুনর্নির্মাণ, অর্থাৎ এক ধরণের ঔপন্যাসিক কারুশিল্প কাজ করে। অতীতের সংলাপ কারও অক্ষরে অক্ষরে মনে থাকে না, সেগুলো স্মৃতি আর কল্পনাশক্তির মিশালে একজন কথাসাহিত্যিকের মতো বানিয়ে তুলতে হয়। পশ্চাদ্দৃষ্টিতে কিছু খুঁটিনাটি জেগে ওঠে, কিছু ম্লান হয়ে যায় বা মুছে যায়, কিছু আবার সচেতনভাবে বাদ দেওয়া হয়। অতীতের কাহিনীগুলিকে মনে আনা আর তাদের লিপিবদ্ধ করার প্রক্রিয়ায় অনিবার্যভাবেই নানারকমের আত্মছলনা এবং অধ্যাস সক্রিয় হয়ে ওঠে। স্মৃতিরা ক্রম মেনে আসে না, উল্টোপাল্টাভাবে আসে— কখনও হুড়মুড় ক'রে, কখনও বা শ্লথ ভঙ্গিতে। কিছু আপাতদৃষ্টিতে গৌণ ডিটেল নাছোড়ভাবে লম্বা গাছের মতো দিগন্তে দাঁড়িয়ে থাকে,— হয়তো তারা আমাদের সংবেদন সম্বন্ধে মূল্যবান কোনো সংকেত দিতে চায়,— আবার স্মৃতিদের ভিড়ে কিছু-কিছু দুর্মূল্য কণা হারিয়েও যায়। সেগুলো অনেক সময় অন্যদের মনে থাকে। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমরা প্রায়ই দেখি, এমন অনেক ডিটেল তাদের মনে আছে, যাদের রঙ আর আলোছায়া আমাদের মন থেকে মুছে গেছে। তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলো যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ততটা ছিলো না। স্মৃতিচারণা তাই কখনোই শতকরা একশো ভাগ নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নয়। প্রামাণিক ইতিহাস তৈরি করতে হলে সমসাময়িক অন্যান্য সাক্ষ্য অবশ্যই জড়ো করতে হয়। তসলিমার ক্ষেত্রে এই কথাগুলি বিশেষভাবেই মনে রাখতে হবে, যেহেতু তাঁর সাক্ষ্যদানে তিনি বাড়ির প্রায় সকলকেই, চেনাজানা অজস্র মানুষকেই একেবারে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। সেই মানুষগুলি আত্মবিবৃতি দিতে বসলে নিশ্চয় অন্যভাবে কথা বলতেন।

তসলিমার স্মৃতিচারণার যে-মূল্য কারও পক্ষে কেড়ে নেওয়া সম্ভব নয় তা হলো তাঁর অতীত বিষয়ে সাক্ষ্যদানকারী অন্যতম দলিল হিসেবে। তাঁর অতীত সম্পর্কে এটিই একমাত্র দলিল হতে পারে না, তবে এটি একটি অপরিহার্য এবং গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর অনুসরণে বলা যায়, এখানে আছে তসলিমার দুঃখ পাওয়ার, সংগ্রাম করার, আত্মপ্রকাশ খোঁজার দস্তখৎ। তিনি কেন যে এত বিদ্রোহিণী, স্বাধীনতা সম্বন্ধে এমন চূড়ান্তভাবে আবেশগ্রস্ত, তাঁর আত্মবিবৃতি আমাদের তা বুঝিয়ে দেয়। বিশ শতকের পূর্বপাকিস্তানে এবং বাংলাদেশে একটি মেয়ের বড় হয়ে ওঠার এই কাহিনী অনেকাংশে মর্মবিদারক। তসলিমার বড় হয়ে ওঠা যে একের পর এক 'ট্রমা' দ্বারা গঠিত সে-কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। সত্যি বলতে কি, তার বিবরণ পড়াও একটি 'ট্রমাটিক' অভিজ্ঞতা। সাংস্কৃতিক 'ভিন্নতা'র যে-বোধ অপরের আত্মবিবৃতি শোনার জন্য আমাদের একরকমের প্রস্তুতি দেয়, যার কথা গোড়ায় বলেছি, সেটা আমি বারবারই অনুভব করেছি তসলিমার আত্মজীবনী পড়তে গিয়ে। আমার নিজের পারিবারিক শিকড়বাকড় পূর্ববঙ্গীয়, অনেক বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজনেরও তাই, তসলিমার আখ্যানে ময়মনসিংহের কথ্য ভাষায় দেওয়া সংলাপগুলি অনুসরণ করতে কোনো কষ্ট হয় না, ঐ অঞ্চলেও আত্মীয়কুটুম্বরা ছিলেন ব'লে জানি, বদমেজাজী এবং রুক্ষ ব'লে 'বাঙাল'দের যে একটা বদনাম আছে তাও অজানা নয়, তবু আমি অনুভব করেছি যে লালনের বিচারে আমি এক ভিন্ন দুনিয়ার জাতক। অক্সফোর্ডে আমার বোর্ডিংস্কুলে পড়া সহপাঠিনীদের কাছ থেকে মায়েদের বিরুদ্ধে যা-কিছু নালিশ শুনেছিলাম, বা পরবর্তী জীবনেও নানা গোত্রের বিদেশিনীদের মুখ থেকে যেসব আত্মবিবৃতি শুনেছি, তাদের কোনোটাই আমার মনে এতটা আহত বিস্ময় এবং 'ভিন্নতা'র বোধ সঞ্চারিত করতে পারে নি, যেমন করেছে ময়মনসিংহের এই বৃত্তান্ত।

এমন এক গোষ্ঠীর ভিতরে মানুষ হয়েছেন তসলিমা, যেখানে 'বুলিয়িং'-এর কালচার ব্যাপক এবং বদ্ধমূল, যেখানে কেবল ঘরের ভিতরে এবং পাবলিক স্পেসে নারীর অশ্লীল অপমান অবধারিত নয়, যেখানে যারই হাতে কোনো ক্ষমতা আছে সে প্রায় নিয়ম ক'রে অধস্তন ব্যক্তির উপর শারীরিক-মানসিক অত্যাচার চালায়। এই বৃত্তে শারীরিক প্রহার এবং গালিগালাজ শাসনের অপরিহার্য অঙ্গ। স্বামী স্ত্রীর উপর, বাবা-মা ছেলেমেয়েদের উপর, একজন বৌদি তার ননদের উপর, মনিবরা দাসদাসীদের উপর, শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের উপর যেভাবে অবাধে মারপিট চালায় এবং কুবাক্য বর্ষণ করে তার বর্ণনা পড়লে স্তম্ভিত হতে হয়। তা ছাড়া এই পরিবেশে রয়েছে মামাকাকাদের হাতে বালিকাদের যৌন লাঞ্ছনা, পারিবারিক সভ্যদের অনবরত পরস্পরের টাকা এবং জিনিস চুরি, ব্যাপক অসাধুতা ও মিথ্যাচার, কপটতা, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, ভিন্নধর্মাবলম্বীর প্রতি বিদ্বেষ, ভিন্নমতাবলম্বীর প্রতি অসহিষ্ণুতা, ধর্মের এবং সামাজিক সংহতির নাম ক'রে ভড়ং এবং গর্হিত অনাচার: সংক্ষেপে সভ্যতার বদলে অ-সভ্যতা, বর্বরতা।

তসলিমার অস্বাস্থ্যকর পারিবারিক পরিবেশের একেবারে কেন্দ্রে রয়েছে লেখিকার বাবার রহস্যময় চরিত্রটা। কৃষকপরিবার থেকে ডাক্তার-হওয়া রজব আলী একজন 'বুলি', অত্যাচারী

প্রকৃতির মানুষ। কৃষক-শ্রমিক-পরিবার থেকে বেরিয়ে উচ্চশিক্ষা পেয়ে পদমর্যাদায় 'উন্নততর' পেশায় পৌঁছেছেন দেশে দেশে এমন মানুষের অভাব নেই, এবং সেই প্রক্রিয়ায় 'বুলি' ব'নে যাওয়া মোটেই অবশ্যম্ভাবী নয়। চার সন্তানের জননী তাঁর স্ত্রীর প্রতি রজব আলীর হীন আচরণ বহু দেশেই দণ্ডনীয় অপরাধ ব'লে বিবেচিত হবে। তাঁর সেই আচরণের কিয়দংশ যদি-বা ঐতিহ্যিক ধর্মীয় অনুশাসনের প্রশ্রয়ে হয়ে থাকে, পুরোটার অনুমোদন শাস্ত্রবাক্যে মিলবে না ব'লেই আমার বিশ্বাস, ওখানে রজব আলীর নিহিত স্বভাবও সক্রিয়। তসলিমার আঁকা ছবি আমাদের বলে যে রজব আলী ধর্মান্ধ ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন আত্মকেন্দ্রিক, আত্মপোষণের এবং আত্মতুষ্টির অন্বেষণে সুবিধাবাদী এবং অপরের প্রতি নির্মম।

তিনি সত্যিই স্ত্রী জীবিত থাকতে আবার বিয়ে করেছিলেন কিনা সেই ব্যাপারটা খোলসা হয় না। বই-দুটি পড়বার সময়ে আমি বারবারই অবিভক্ত বাংলায় আমার নিজের বড় হয়ে ওঠার স্মৃতির সঙ্গে এটা-সেটা মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করছিলাম। স্বাধীনতাপূর্ববর্তী মফস্বলের জীবনে আমার বাবার মুসলমান সহকর্মীদের স্ত্রীরা আমার মায়ের কাছে চা খেতে আসতেন, তাঁদের মেয়েদের সঙ্গে আমি খেলা করতাম। আমি নিজে তাদের আর আমার মধ্যে কোনো বড় রকমের তফাৎ বুঝি নি, তবে মা একবার বলেছিলেন, ঐ মহিলারা বাপের বাড়ি যেতে ভয় পান, যদি ফিরে এসে দেখেন যে স্বামী অন্য স্ত্রী ঘরে এনেছেন। আমি অবশ্য ততদিনে রূপকথা আর রামায়ণ-মহাভারত মারফৎ জেনে গেছি যে রাজাদের একাধিক রানী থাকতে পারে, কিন্তু তেমন ঘটনা যে বইয়ের জগতের বাইরে বাস্তব জীবনেও ঘটতে পারে তা শুনে খটকা লেগেছিলো।

এটা স্পষ্ট হয় যে নারীসংসর্গে আসক্ত রজব আলী তাঁর স্ত্রীকে মানুষ ব'লে গণ্য করতেন না। মহিলাটি বড় ছেলে আর তার বৌকে বরণ করবার জন্য দরজায় দাঁড়িয়ে, অথচ তাঁকে কনুই দিয়ে ঠেলে সরিয়ে রজব আলী এক সোনার গয়নায় মোড়া ধনী গৃহিণীকে অনুরোধ করলেন কাজটি করতে— এ কি ভাবা যায়? তেমনি, তিনি চাইতেন তাঁর ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষিত হোক, কিন্তু সেটা শিক্ষার প্রতি তাঁর প্রকৃত শ্রদ্ধাবশতঃ নয়। শিক্ষার সঙ্গে জড়িয়ে কোনো সদর্থক মানবিক মূল্যবোধ তাঁর সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেন নি তিনি। তাঁর দৃষ্টিতে উচ্চশিক্ষার একমাত্র মূল্য ছিলো এই যে তা ধনাগমের পথ, বড়লোক হবার উপায়। তাই ডাক্তারির প্রতি তাঁর ঝোঁক প্রবল, আর শিল্পসাহিত্যের কাজ তাঁর কাছে অর্থহীন। চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষক হিসাবে তিনি যোগ্য ছিলেন, কিন্তু তসলিমা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে অর্থের অন্বেষণে তিনি প্রচ্ছন্ন অসাধুতা অবলম্বন করতে পারতেন, হয়তো বা ঘুষও নিতেন।

তসলিমা অবশ্য শিল্পসাহিত্যের চর্চায় তাঁর দুই দাদার কাছ থেকে কিছু প্রাথমিক উৎসাহ ও সহায়তা পেয়েছিলেন। সেই আভিমুখ্যে তিনি বাংলার আধুনিক সংস্কৃতির মূলধারার শরিক, কিন্তু সামগ্রিক বিচারে তিনি এমন এক পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছেন, যাকে বলতে হয় 'অস্বাভাবিক', ইংরেজীতে যাকে বলে 'ডিস্‌ফাংশনাল'।

গৃহকর্তার নিষ্ঠুরতা থেকে বৃত্তের ব্যাসার্ধের মতো বেরোয় মায়ের প্রতি ছেলেমেয়েদের

অবহেলামূলক, এমন কি নিষ্ঠুর ব্যবহার। আমরা দেখি, তসলিমাদের পরিবারে ছেলেমেয়েরা মায়ের সেবাযত্ন স্নেহ নিংড়ে নেয়, কিন্তু মাকে সম্মান করে না, তাঁর যত্ন নেয় না, তাঁর কল্যাণের দিকে তাদের দৃষ্টি নেই। তসলিমার পরিবেশে শারীরিক সৌন্দর্যকে নিয়ে রীতিমতো একটি কাণ্ট ছিলো। গায়ের রঙ ফর্সা না ময়লা তা নিয়ে মানুষ মাথা ঘামায় এ আমিও আমার শৈশবকৈশোরে দেখেছি, কিন্তু ছেলেমেয়েরা মায়ের রূপ নিয়ে ব্যঙ্গ করে তা কস্মিন্ কালে দেখি নি। তসলিমার আত্মজীবনীতে এ বিষয়ে বিবৃতি প'ড়ে হতবাক্ হয়েছি। স্কুলজীবনে ভালো ছাত্রী ছিলেন ঈদুন ওয়ারা, বিয়ের পরে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু স্বামীর সম্মতি পান নি। পরে এ ব্যাপারে তাঁর ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে সহযোগিতা প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু তারাও তাঁকে সাহায্য করতে চায় নি, বিদ্রূপ করেছে কেবল। সন্তানরা মায়ের বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে, এটাও আমার অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত। আমার বহু প্রবীণা আত্মীয়ার আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা ঈদুন ওয়ারার চাইতে বেশী ছিলো না, কিন্তু তাঁদের সন্তানরা (বা স্বামীরা) তাই নিয়ে খোঁটা দেবেন এটা কল্পনাতীত। ঈদুন ওয়ারার যখন অন্ত্র থেকে রক্তপাত আরম্ভ হলো, তখন সবাই তাঁকে বোঝালো, এ হচ্ছে অর্শ, এর কোনো চিকিৎসা নেই। আসলে নিছক অর্শ নয়, কঠিনতর অসুখের প্রথম সংকেত ছিলো সেই রক্তক্ষরণ, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, কেউই তাঁর চিকিৎসায় মনোযোগী হলো না,— না তাঁর ডাক্তারিতে খ্যাতিমান রোজগেরে স্বামী, না তাঁর সাবালক পুত্রেরা, না তাঁর ডাক্তারি-পড়তে-থাকা কন্যা তসলিমা। রক্তপাতে দুর্বল মহিলাটি তাঁর দুর্বলতার সঙ্গে যুঝবার জন্য একটু পুষ্টিকর খাবার খেতে চাইতেন, একটু দুধ, কয়েকটা কলা আর ডিম। পরিবারটি তেমন গরীব ছিলো না যে বাড়ির গৃহিণীকে একটু দুধ-ডিম-কলা খাওয়াতে পারবে না। এমন নয় যে তখন মহামন্বন্তর চলছে, পরিবারের মানুষ অন্নের জন্য রাস্তায় ভিক্ষা করছে। রাস্তায় ভিখারীরা সর্বদাই ছিলো বৈকি, কিন্তু আমরা দেখি যে তসলিমাদের বাড়িতে মাছমাংস রান্না হয়, উৎসবে পোলাও-কোর্মাও হয়। *উতল হাওয়া* যখন প্রথম পড়েছিলাম, অসুস্থতার সময়ে একটুখানি দুধ-ডিম-কলার জন্য তসলিমার মায়ের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার বিবরণ আমার চোখে আক্ষরিক অর্থে জল এনেছিলো। আমি জানি না এই পরিবারের মানুষরা আয়নায় নিজেদের মুখ কিভাবে দ্যাখে, তসলিমার বিবৃতি কি তারা পড়েছে? প'ড়ে থাকলে তাদের কি অপরাধবোধ জন্মায় না? আমরা জানি শেষ পর্যন্ত তসলিমা-জননী অন্ত্রের ক্যান্সার থেকে মৃত্যুবরণ করেন। অপরাধবোধের প্রায়শ্চিত্তে তসলিমার আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডটি মাকে উৎসর্গিত।

তাঁর আত্মবিবৃতিতে তসলিমা যেমন কাউকে রেহাই দেন নি, তেমনি যাবতীয় দোষত্রুটি-অধ্যাস-অহমিকা-স্ববিরোধসহ নিজেকেও নিরাবরণ করেছেন। অশ্লীল, বর্বর এক সমাজের ভিতরে পদে পদে নিষেধের বেড়া দিয়ে বাঁধা বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে রোম্যান্টিক সাহিত্য পাঠের মিশালে তাঁর মধ্যে জারিত হয়েছে প্রেম ও যৌনতা সম্পর্কে অলীক ধারণাপুঞ্জ। খানিকটা তাঁর চাকমা বান্ধবী চন্দনার প্রভাবে তসলিমা পুরুষকে ভালোবাসতে চেয়েছেন পুরুষের অস্তিত্বের শরীরী দিকটা বাদ দিয়ে, যেহেতু সেই দিকটাকে তাঁদের নোংরা মনে

হয়েছে। বিপরীত লিঙ্গ সম্পর্কে এই অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির ফলে তসলিমা ধরা পড়েছেন রুদ্রর ফাঁদে। রুদ্র তসলিমাকে একটা কাগজ ধরিয়ে দিয়ে সই করতে বললেন, তসলিমা সই করলেন; ব্যস্, তাঁদের নাকি বিয়ে হয়ে গেলো— কোনো সাক্ষীসাবুদ ছাড়াই। আসলে দলিলটা ছিলো মিথ্যাভিত্তিক, ওখানে উকিলের উপস্থিতির কথা বলা ছিলো, কিন্তু উকিল উপস্থিত ছিলেন না। ধ'রে নেওয়া যাক, কাগজপত্র অপ্রাসঙ্গিক, ওঁরা দুজনে আধুনিক রীতিতে সহবাস করছেন। কিন্তু তার পরিণাম শোচনীয়। নিজের যৌন ব্যাধি আছে জেনেও রুদ্র তসলিমার সঙ্গে শুয়ে তাঁকে সংক্রামিত করলেন— রুদ্রর এই আচরণও বহু দেশের আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ।

তসলিমার আত্মবিবৃতি সমাজবিজ্ঞানীদের আর মনোবিজ্ঞানীদের সামনে প্রসারিত একটি জটিল কেস স্টাডি। একদিকে এই বিবৃতি যেন তাঁর সমস্ত অন্তরঙ্গ মানুষদের বিরুদ্ধে নেওয়া এক বিশাল প্রতিশোধ: আমরা জানি, প্রতিশোধের থীমটি তাঁর অন্যান্য রচনাতেও বড় জায়গা অধিকার ক'রে আছে। অন্যদিকে তাঁর স্ববিরোধছিন্ন দ্বন্দ্বদীর্ণ কমপ্লেক্সজর্জরিত মানসতাকে তিনি একেবারে মেলে ধরেছেন, যেন থেরাপির আশায়। পুরুষের শরীরকে নোংরা মনে করলেও তাঁর নিজের রচনাশৈলী শরীরসংক্রান্ত নোংরা খুঁটিনাটির ফিরিস্তি দিতে ভালোবাসে। জীবনের কফ-থুতু-মলমূত্র-পুঁজরক্ত-স্বেদ-ক্লেদের উল্লেখ তাঁর রচনায় প্রায় আবেশিক। পাঠকের বিবমিষা জাগাতে তিনি ভালোবাসেন। এটা উল্লেখযোগ্য যে তাঁর আত্মজীবনীতে শান্তিসৌন্দর্যের মুহূর্তগুলি বিরল, এবং শ্রদ্ধা করা যায় এমন মানুষের আলেখ্যও খুব কম। তাঁর গদ্যের একটি স্বকীয় স্টাইল আছে, তার একটি নিজস্ব জোর আছে, তবে তিনি সাধারণতঃ অগ্রসর হন স্টেটমেন্টের পর স্টেটমেন্ট সাজিয়ে, কুঠারাঘাতে কাঠ কাটার ভঙ্গিতে, বিশ্লেষণের অভিমুখে বড় একটা যান না। কখনও কখনও দেখতে পাই, কারও সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে তাঁর বিদ্রূপ চিহ্নিত হয় কোনো একটা শারীরিক বা দৃশ্য বৈশিষ্ট্যকে মানুষটির শর্টহ্যান্ড বানিয়ে ফেলে— 'সাফ সুতরো হয়ে ঘরে ফিরেছে হলুদ দাঁত', 'সবুজ লুঙ্গি গলা তুলে বলেন' ইত্যাদি। এটাকে বলা যায় কার্টুন-ক্যারিকেচরের টেকনিক।

তাঁর আত্মবিবৃতি তাঁর স্থানকালের সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে জড়িত যে তিনি যখন তাঁর *ফরাসি প্রেমিক* উপন্যাসে (আনন্দ, ২০০১) আত্মজৈবনিক উপাদান অভিক্ষেপ ক'রে নায়িকা-চরিত্র আঁকেন, অথচ সেই নায়িকাকে কলকাতার হিন্দু বাড়ির মেয়ে হিসেবে এবং একজন ডাক্তারের কন্যারূপে কল্পনা করেন, তখন সেই মেয়েটি আধুনিক কলকাতার ডাক্তারকন্যার প্রতিকৃতি হিসেবে মোটেই ফোটে না। এ বিষয়ে আমি অন্যত্র বিস্তৃতভাবে লিখেছি, তাই এখানে আর কথা বাড়াতে চাই না।[৪]

তসলিমার জীবনে 'ডিসফাংশনাল' পরিবেশের উত্তরাধিকার প্রকট। প্রশ্ন উঠতে পারে, এবং তসলিমা চান যেন প্রশ্ন ওঠে: সেই 'ডিসফাংশন'-এ ধর্মের ভূমিকা কী? তাঁর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধর্মীয় ঐতিহ্যকে তিনি রাখ্-ঢাক্ না ক'রে ঠুকেছেন, যেজন্যে তাঁর

অনেক বই বাংলাদেশে অপ্রকাশ্য। সেখানে তাঁর মাথার উপরে ফতোয়া এখনও ঝুলছে, এমন কি তাঁর আত্মজীবনীর কলকাতা-সংস্করণেও ছাড়চিহ্ন ইঙ্গিত দেয় যে কিছু শব্দ বাদ দেওয়া হয়েছে। তসলিমা যদি কেবলই বাংলায় প্রচারিত হতেন, তা হলে ব্যাপারটা একরকম হতো, কিন্তু যেহেতু তিনি এখন একজন আন্তর্জাতিক 'সেলিব্রিটি', যেহেতু তাঁর বইগুলো অন্যান্য ভাষায় প্রচারিত হচ্ছে, তাই এখনকার 'বিশ্বায়িত' পরিস্থিতিতে তাঁর আত্মবিবৃতির বিচারবিশ্লেষণের কাজ আন্তর্জাতিক ধর্মীয় রাজনীতির মাত্রাকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। *যে-মুহূর্তে আমার মেয়েবেলা*-র মার্কিন সংস্করণের নাম রাখা হলো *মেয়েবেলা/মাই বেংগলি গার্লহুড/আ মেমোয়ার অফ গ্রোয়িং আপ ফিমেইল/ইন আ মুসলিম ওয়ার্ল্ড*, সেই মুহূর্তেই স্পষ্ট হলো যে তাঁর মার্কিন প্রকাশকেরও একটা কর্মসূচী আছে, যার অনুসরণে বইটির রাজনৈতিক দিকটাকে কায়দা ক'রে উদ্ব্যক্ত করা হয়েছে। এই নামকরণের দ্বারা 'বাঙালী' আর 'মুসলিম' এই দুটিকে একশ্রেণীভুক্তরূপে চিহ্নিত করা হলো। অ-মুসলিম বাঙালীও যে হয়, সেই ব্যাপারটা ঝাপসা ক'রে দেওয়া মার্কিন প্রকাশকের অভিপ্রেত। তসলিমার আত্মবিবৃতি কি ধর্মনির্বিশেষে রাষ্ট্রনির্বিশেষে সামাজিক-অর্থনৈতিক-শ্রেণীনির্বিশেষে সব বাঙালী মেয়ের বড় হয়ে ওঠার জাতিরূপ হতে পারে? না, তা হতে পারে না। তাঁর বিবৃতির প্রবল সাংস্কৃতিক 'ভিন্নতা' আমার চেতনাকে কণ্টকবিদ্ধ করেছে। কিন্তু 'ভিন্ন' হলেও তাঁর বিবৃতি এই পৃথিবীর মানবসমাজেরই কাহিনী, আরও অনেক মেয়েই নিশ্চয় কম-বেশী তার অংশীদার, তাই তাকে মনে করি অনুধাবনীয়। মুসলিম দুনিয়ায় একজন মেয়ের বড় হয়ে ওঠার প্রতিবেদন হিসেবে তার মূল্যায়ন কিভাবে করতে হবে, সেই প্রশ্নটির উত্তর দিতে গেলে নানাভাবেই আন্তর্বিদ্য, আন্তর্জাতিক, তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিত অবলম্বন করতে হয়।

অন্য দুজন লেখিকার বই সম্প্রতি পড়েছি, যাঁদের জবানবন্দি এ ব্যাপারে আমাকে কিছুটা দিশা দেয়। দেশে দেশে ইসলাম-ধর্মের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিতে তারতম্য আছে। কতগুলি মূল টেক্সটকে সর্বত্র আনুষ্ঠানিকভাবে মাননা করা হলেও তাদের ব্যাখ্যাদানে, তাদের উপর টীকাটিপ্পনী রচনায়, মানুষের সামাজিক জীবনের চালচলনের উপর ধর্মের যে-ছায়া পড়ে তার দর্পণে কিছু কিছু তফাৎ অবশ্যই লক্ষিত হয়। মরক্কোর প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ফতিমা মের্নিস্‌সি আমার প্রজন্মের মেয়ে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জ'ন্মে মরক্কোর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ছায়ায় বড় হয়ে ওঠেন। তাঁর নাম নারীবিষয়ক বহু সেমিনারে শ্রদ্ধাসহকারে উচ্চারিত হতে শুনেছি। তাঁর দুটি বই পড়লাম; বই-দুটিকে আমার পরস্পরের পরিপূরক ব'লে মনে হয়েছে। মরক্কোর উচ্চশিক্ষিতরা ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের সূত্রে সাধারণতঃ যে-ইয়োরোপীয় ভাষাটিতে বিদগ্ধ হয়ে থাকেন তা হলো ফরাসী, তবে এই বই-দুটি যে প্রথমে ফরাসীতে লিখিত হয়ে পরে ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে এমন কোথাও বলা হয় নি, তাই অনুমান করি যে শ্রীমতী মের্নিস্‌সি এদের ইংরেজীতেই রচনা করেছেন। তাঁর উচ্চশিক্ষা তিনি মরক্কোতে শুরু ক'রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাপ্ত করেন, কাজেই এটা হতেই পারে যে ইংরেজী লিখনে তিনি সিদ্ধহস্ত।

একটি বই মূলতঃ আত্মজৈবনিক: *ড্রীম্‌স্ অফ ট্রেস্‌পাস্: টেইল্‌স্ অফ আ হারেম গার্লহুড*।[৫] ইন্টারনেটে প্রাপণীয় আলোচনা থেকে জানতে পারছি যে কেউ কেউ বইটিকে উপন্যাস হিসেবে নিয়েছেন, তবে এটি পড়লে বোঝা যায় যে প্রধানতঃ স্মৃতিচারণার উপাদানেই গঠিত এই বই, এর সারপদার্থ বাস্তবভিত্তিক। শৈশবে যে-পরিবেশে লেখিকা বড় হয়ে উঠেছিলেন, তাকে অনুপম সাহিত্যিক কলানৈপুণ্যের সঙ্গে পুনর্নির্মাণ করেছেন। 'হারেম' শব্দের অনেক অর্থ এবং ভাবানুষঙ্গ আছে, সেসব এই বইয়ে বারবার আলোচিত হয়েছে। এই বইয়ের 'হারেম' সুলতানদের হারেম নয়, বরং একটি বিরাট, একান্নবর্তী, উচ্চমধ্যবিত্ত, নগরবাসী পরিবার, যার ভিতরে নারীপুরুষের অধিকারগুলি ভিন্ন। মেয়েদের কিছু কিছু অধিকার এখানে স্বীকৃত, তবে অধিকারের সীমানাও নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া আছে। অবাধে বাইরে বেরোনো মেয়েদের বারণ, তবে সময়টা যেহেতু যুগসন্ধিক্ষণ, তাই পারিবারিক সম্পর্কের টানাপড়েনে এবং স্বাধিকার ঘোষণার তথা আদায় ক'রে নেওয়ার চেষ্টাচরিত্রে নানা টেনশন সক্রিয়। ফতিমার পিতামহী প্রাচীনপন্থী, ঐতিহ্যিক ব্যবস্থার সমর্থক; পিতার আভিমুখ্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথ ধ'রে আধুনিকীকরণের দিকে; ফতিমার মা চান যৌথ পরিবারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে স্বামী-স্ত্রী-সন্তানের কোষ-পরিবার; তালাকপ্রাপ্ত 'আন্ট হাবিবা'র পক্ষে যৌথ পরিবার একটি আশ্রয়: তিনি প্রয়োজন বুঝে পিতৃতান্ত্রিক নিয়মকানুনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলেন, কিন্তু তাঁর অন্তরের ভিতরে সর্বদা প্রজ্বলিত থাকে তাঁর স্বাতন্ত্র্যবোধের এবং স্বেচ্ছার শিখা, যা তিনি প্রকাশ করেন তাঁর গল্প বলায় এবং হস্তশিল্পে। নগরবাসী পরিবারে মেয়েদের মোটের উপর অন্তঃপুরচারী জীবন যাপন করতে হয়, কিন্তু মেয়েরা সব সময়েই স্বপ্ন দ্যাখে সীমানা লঙ্ঘনের। সদর দরজার বাইরে যে-জগৎটা, সেটাই তাদের অবসেশন। ফতিমা বলেন যে তাঁর শৈশব সুখী ছিলো এই কারণেই যে তখন সীমানাগুলো খুব স্পষ্ট ছিলো, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সীমানার অনুসন্ধান তাঁর জীবনের কাজ হয়ে দাঁড়ায়। 'আমার শক্তিহীনতার ব্যবস্থাপত্র লিখে দিচ্ছে জ্যামিতির যে-রেখা, সেটার অবস্থান যে ঠিক কোথায় সেটা যখনই আমি বুঝে উঠতে পারি না, তখনই উৎকণ্ঠা আমাকে কুরে খায়।'

ফেজ শহরের অন্তঃপুর থেকে মধ্যে মধ্যে ছাড়া পাওয়া যেতো মাতামহ-মাতামহীর খোলামেলা গ্রামের বাড়িতে গিয়ে। সেই সংসারটি ছিলো কৃষিভিত্তিক, সেখানে ছিলো ক্ষেত, ফলের বাগান। মাতামহের একাধিক স্ত্রী ছিলো। ফতিমার আপন মাতামহী ছিলেন দুর্দান্ত ব্যক্তিত্বের নারী। দুই সংসারেরই এমন সরস ও আনুপুঙ্খিক বর্ণনা দিয়েছেন লেখিকা, যে জীবনযাত্রার দৃশ্যগন্ধশব্দস্পর্শস্বাদ একেবারে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। দু'-একটি ব্যাপারে তসলিমার জগতের সঙ্গে ঈষৎ সাদৃশ্য মেলে, যেমন শহরের বাড়িতে ছাদে ওঠার লোভ, কিংবা সে-সময়কার নতুন যন্ত্র রেডিও শোনার জন্য মেয়েদের আকুলতা, কিন্তু মোটের উপর মরক্কোর ফেজ শহরের উচ্চমধ্যবিত্ত জীবনযাত্রার সংযম, সুরুচি, শালীনতা অনেক বেশী লক্ষণীয়। এখানে মারপিট বা কুৎসিত গালিগালাজ নেই, অশ্লীল যৌন ইঙ্গিতের মুখোমুখি হতে হয় না বালিকা ফতিমাকে। বরং এখানে আছে কিছু আনন্দ আর অ্যাডভেঞ্চার,

কখনও শহরের বাড়িতে ছাদে ব'সে চাঁদের আলোয় পিকনিক স্টাইলে নৈশ আহার, কখনও গ্রামের বাড়িতে সব মেয়েরা মিলে নদীর জলে বাসন ধোয়া, কখনও হামামে স্নান করতে যাওয়া, কখনও আন্ট হাবিবার মুখ থেকে গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়া। আমরা ইঙ্গিত পাই যে এই জগতে সমস্যা থাকলেও তার সমাধানের জন্য ভাবনা এবং আলোচনা সম্ভব।

এমন এক গার্হস্থ্য নীড় থেকে বেরিয়ে ফতিমা মের্নিস্‌সি যথাসময়ে স্কুলে আর বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছেন। তাঁর উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত হয় বস্টন ম্যাসাচুসেট্‌সে। তাঁর অন্য যে-বইটি সম্প্রতি প'ড়ে উঠলাম সেটি অনেক দিন ধ'রেই সমাজবিজ্ঞানের একটি স্বীকৃত ক্ল্যাসিক, বিস্তর পড়াশোনা ক'রে, অজস্র আরবী-ইংরেজী-ফরাসী বই ঘেঁটে লেখা হয়েছে: *বিয়ণ্ড দ্য ভেইল: মেইল-ফিমেইল ডাইনামিক্‌স্ ইন মুসলিম সোসাইটি*।[৬] বইটিকে বিদ্যাজগতের গবেষণার ফল ব'লেই মনে হয়; এটি সম্ভবতঃ তাঁর গবেষণাপত্রের ভিত্তিতে রচিত। এখানে অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু হলো মুসলিম সমাজে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্কের তাত্ত্বিক ভিত্তি আর তার ব্যবহারিক ফলশ্রুতি। আলজেরিয়ার মতোই মরক্কোর মানুষরা রক্তের বিচারে বিশুদ্ধ আরব নন। তাঁদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে আছে উত্তর আফ্রিকার 'বের্‌বের' জাতির উত্তরাধিকার। ইসলাম-ধর্ম তাঁরা পরে পেয়েছেন আরবদের কাছ থেকে। এক অর্থে সেটি এক ধরণের ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার, যদিও কথাটা সাধারণতঃ ওভাবে বলা হয় না। রক্তে আরব নয় এমন অধিকাংশ মুসলমান গোষ্ঠীর পক্ষেই এ কথা সত্য। আরবদের নিজস্ব প্রাক্-ইসলামী পর্যায় থেকে কিভাবে ইসলামী পর্যায় তৈরি হয়ে উঠলো তার একটা ইতিহাস এই বইটিতে ধরিয়ে দেওয়া আছে, সেই বিবর্তনের মূল সূত্রগুলি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং মরক্কোর শিক্ষিত সমাজে পাশ্চাত্য প্রভাবে 'আধুনিকীকরণ' ঘটার পর নারী আর পুরুষের সম্পর্ক চালনায় কী কী দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে সেই ব্যাপারটা খুঁটিনাটিসহ আলোচিত হয়েছে।

মোদ্দা কথাটা হলো এই, ইসলামী দৃষ্টিতে নারীর যৌনতা একটি বিরাট শক্তি, নারীই যৌনতার মূল আধার। সে-কারণে পুরুষের পক্ষে, পুরুষরচিত সভ্যতার পক্ষে নারী মূর্তিমতী বিপদ। নারীর স্বাধীনতাকে পুরুষ তাই নিয়ন্ত্রণ করা দরকারী মনে করে, নয়তো তার সভ্যতা রসাতলে যায়। এই তত্ত্বটার কথা আমি আগে মিশরী নারীবাদী নওয়াল এল সাদাউয়ির রচনায় পড়েছি এবং নানা আন্তঃসাংস্কৃতিক সেমিনারেও শুনেছি। পরিশীলিত কৌতুকের সঙ্গে ফতিমা মের্নিস্‌সি বোঝান, মুসলিম বিশ্ববীক্ষায় বিপদ দুটি: ঘরের বাইরে কাফের আর ঘরের ভিতরে নারী। ইসলামের ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ে কিছু মেয়ে এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে কিভাবে তীব্র প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিলেন তার সূত্রও এই বইয়ে ধরিয়ে দেওয়া আছে।

মানুষের যৌনতার দায়টা পুরোপুরি মেয়েদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার পরিণামে পুরুষ তার নিজস্ব যৌনতার সঙ্গে প্রাজ্ঞভাবে বোঝাপড়া করার পন্থা হারায়। ফতিমা মের্নিস্‌সি তাঁর শিক্ষিত বাপের বাড়িতে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় না পেয়ে থাকলেও সমাজবৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে তার অজস্র নমুনা সংগ্রহ করেছেন। যেমন, বেকারত্বপীড়িত পাড়াগাঁয়ের উঠতি বয়সের দরিদ্র ছেলেরা ভেবে পায় না তারা কিভাবে তাদের উন্মেষশালী যৌনতার

সঙ্গে বোঝাপড়া করবে। গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে মেলামেশা করার উপায় নেই, দৈবাৎ কাউকে ভালো লেগে গেলে সেই মেয়েটি যদি সুন্দরী হয় তাকে বিয়ের জন্য ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যায় কোনো চাকরিওয়ালা পুরুষ। ছেলেদের জন্য থাকে আত্মরতি, সমরতি, অজাচার, শহরের গণিকালয়, সেখানে যাবার জন্য দরকার হলে টাকা চুরি করা। এই বিশ্লেষণের আলোয় তসলিমা নাসরিনের আঁকা তাঁর পরিবেশের ছবিটা অনেকটা বোধগম্য হয়ে আসে।

এটা ঘটনা যে যেসব কথা বিদ্যাজগতের খাতে বলা তেমন বিপজ্জনক নয়— কট্টরপন্থী ধর্মান্ধদের ওরকম বই পড়ার সময় নেই, প্রবৃত্তিও নেই— সেগুলি শিল্পের মাধ্যমে বলতে গেলে মাথার উপর সর্বনেশে খাঁড়া নেমে আসতে পারে। এর একটি ভালো উদাহরণ অয়ান হির্সি আলি, যাঁর কথা কেউ কেউ খবরের কাগজে নিশ্চয় পড়েছেন। তসলিমার অবস্থার সঙ্গে এঁর অবস্থার কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে— এঁরও ব্যক্তিগত জীবনের তহবিলে বেশ কিছু ভয়ংকর অভিজ্ঞতা জমা পড়েছে, এঁরও নির্বাসিত হওয়ার অভিজ্ঞতা আছে, ইনিও বর্তমানে 'সেলিব্রিটি'। একুশ শতকে প্রকাশিত এঁর দুটি বই প'ড়ে উঠলাম, এবং সে-দুটি এই প্রবন্ধের পাঠকপাঠিকাদের প'ড়ে দেখতে অনুরোধ করি: *দ্য কেইজ্ড় ভার্জিন* এবং *ইনফিডেল*।[৭] দুটি বইয়েই জ্বালাময়ী বাগ্মিতার সঙ্গে মেশানো আত্মবিবৃতি আর বিশ্লেষণ আছে, তবে দ্বিতীয়টি পূর্ণ অর্থে আত্মজৈবনিক এবং একটি অসামান্য বই। তসলিমার চাইতে বছর সাতেকের ছোট দীপ্ত ব্যক্তিত্বের এই মহিলা সোমালিয়ায় জন্মগ্রহণ ক'রে সোমালিয়া, সৌদি আরব, ইথিওপিয়া আর কেনিয়ায় বড় হয়ে ওঠেন। গৃহযুদ্ধ, দারিদ্র্য, মায়ের হাতে মার খাওয়া, মায়ের প্রতি বাবার অবহেলা, কোনোটাই তাঁর অজানা নয়। বাইশ বছর বয়সে তিনি প্রথম ইয়োরোপে আসেন। পিতৃব্যবস্থাপিত বিবাহ থেকে পালিয়ে গিয়ে হল্যান্ডে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে সেখানকার ভাষা শিখে সেখানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। বর্তমান ইয়োরোপের নানা দেশের মতো হল্যান্ডেও বহিরাগত মুসলিমরা একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর মেয়েরা অনেকেই কড়া ইসলামী নারীনিয়ন্ত্রণের শিকার। নিজের অভিজ্ঞতার নিরিখে আর সেই মেয়েদের জন্য কল্যাণমূলক কাজ করতে করতে অয়ান রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। নির্বাচনে দাঁড়িয়ে, জিতে পার্লামেন্টের সদস্য হন। বিপদ আসে যখন তিনি ওলন্দাজ ফিল্মনির্মাতা থিও ভ্যান গখ্-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে একটি ছোট ফিল্ম তৈরি করেন; এর স্ক্রিপ্টটি লিখেছিলেন অয়ান। ইংরেজী প্রতিবেদনে ফিল্মটির নাম দেওয়া হয়েছে *সাবমিশন*, নিশ্চয় মূলে নামটা ওলন্দাজ ভাষাতেই ছিলো।

অনেকে মনে করেন, 'ইসলাম' শব্দটির অর্থ 'শান্তি'। ঠিক তা নয়। আরবী শব্দটির প্রকৃত অর্থ ঐ সাবমিশন, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, নতিস্বীকার, বশ্যতাস্বীকার। নিঃশর্তভাবে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সঁপে দিতে পারলে তবেই না আসে শান্তি। হল্যাণ্ডে সম্প্রচারিত অয়ানের ফিল্মটির পুরোটা দেখার সুযোগ আমার ঘটে নি, টেলিভিশনের খবরে ছোট ছোট ক্লিপ দেখেছি মাত্র। তবে সেগুলি দৃশ্যগতভাবে খুব নতুন ধরণের ছিলো। কয়েকটি মেয়ে

ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণতঃ আত্মসমর্পণ না ক'রে মুখ তুলে চেয়ে তাঁর সঙ্গে সংলাপ আরম্ভ করতে চায়। একজন মেয়ে ব্যভিচারের জন্য চাবুকের মার খেয়েছে, আরেকজনকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এক ঘৃণিত ব্যক্তির সঙ্গে, আরেকজনকে তার স্বামী নিয়মিত মারে, আরেকজনকে তার আপন কাকা ধর্ষণ করেছে এবং সে-খবর পেয়ে মেয়েটির বাবা তাকে ত্যাগ করেছে। প্রতিটি অত্যাচারের সমর্থনেই শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করা যায়; তাদের ত্বক্ কোরানের সেই সেই বাক্য দিয়ে উলকি-কাটা।

থিও ভ্যান গখ্ অসীম সাহসে ফিল্মটি বানিয়েছিলেন, এবং সেটি দেখাতে পেরেছিলেন এইজন্যে যে হল্যাণ্ডে চিন্তার এবং আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতার এক বিরাট ঐতিহ্য আছে। ইয়োরোপের এনলাইটেনমেন্টে ওখানকার মানুষ অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু তিনি রক্ষা পান নি, ১৯৭৯-এর নভেম্বরে আমস্টারডামে প্রকাশ্য দিবালোকে একজন আততায়ীর হাতে নিহত হন। সেই আততায়ী, মুহম্মদ বুয়েরি, ফতিমা মের্নিস্সির দেশের মানুষ, অর্থাৎ মরক্কোর মানুষ। ভ্যান গখের বুকে ছুরি দিয়ে একটি লম্বা ভয়-দেখানো চিঠি বেঁধানো ছিলো— সেটি অয়ানের উদ্দেশে।

পার্লামেন্টের সদস্য অয়ান প্রথমে ওলন্দাজ সরকারের কাছ থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা পেয়েছিলেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেই সরকারী আনুকূল্য হারাতে থাকেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যালঘুরা এমনিতেই এক বিশেষ ধরণের রাজনৈতিক দর-কষাকষি করার ক্ষমতা ধরে, তার সঙ্গে একুশ শতকে যুক্ত হয়েছে ধর্মীয় সন্ত্রাসের ভয়। আপাততঃ মুসলিমদের না চটানো এবং সন্ত্রাসবাদীদের হামলা এড়ানো ওলন্দাজ সরকারের দুটি প্রধান লক্ষ্য। এনলাইটেনমেন্টের মহনীয় উত্তরাধিকারে নাগরিকদের বাক্স্বাধীনতা রক্ষা করা খানিকটা গৌণ হয়ে গেছে। মাঝখানে অয়ান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয়গ্রহণ করলেন। সেখানে একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ জোটালেন। ওলন্দাজ সরকার বললেন, অয়ান যদি দেশের বাইরে থাকেন, তা হলে তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব তাঁরা নিতে পারবেন না। জল্পনাকল্পনা চললো, মার্কিন সরকারই কি শেষ পর্যন্ত তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন? দেখা গেলো, তা-ও না। শেষ খবর এই যে অয়ান হল্যাণ্ডে ফিরে এসেছেন, সেখানে একটা গুপ্ত ঠিকানায় গা-ঢাকা দিয়ে থেকে মার্কিন প্রতিষ্ঠানটির জন্য কাজ ক'রে যাচ্ছেন, ওলন্দাজ সরকার তাঁর নিরাপত্তার ভার নিয়েছেন। আপাততঃ অবস্থা এই, ভবিষ্যতে কী হবে কে বলতে পারে?

যাঁরা অয়ানের আর তসলিমার আত্মবিবৃতি পাশাপাশি রেখে পড়বেন, তাঁরা বুঝবেন মিল-অমিলগুলি কোথায় কোথায়। দুজনেই ক্রুদ্ধ নারী— সঙ্গত কারণেই ক্রুদ্ধ; তবে তসলিমা তাঁর ঘৃণার প্রকাশে আরও বেশী সোচ্চার। অয়ানের মধ্যে একটা স্নিগ্ধ কৌতুকবোধও আছে, যা তসলিমার লেখায় বিরল। অয়ানের বাবা হির্সি মাগান আধিপত্যপ্রয়াসী, একাধিকবার বিয়ে করেছেন, স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন, এবং অয়ানের মায়ের প্রতি তাঁর আচরণকে মধুর বলা যায় না, তবে তিনি রজব আলীর মতো হৃদয়হীন নন। তিনি নিজেও প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী পুরুষ, এবং তাঁর দেশের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কন্যার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে, আবার জোড়াও লেগেছে। অয়ান তসলিমার মায়ের মতো একটি

আবেশিক ধর্মীয় পর্যায়ের ভিতর দিয়ে যান, তার পর তার জাল ছিন্ন ক'রে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসেন। তসলিমার মতো যৌন ব্যাধির অভিজ্ঞতা অয়ানের নেই, কিন্তু আছে অন্য একটি মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা: শৈশবে যৌনাঙ্গের কাটাছেঁড়া। মেয়েদের বেলায় এই ভয়াবহ ব্যাপারটা ইসলামের নাম নিয়ে আফ্রিকার যেসব দেশে চলে সোমালিয়া তাদের অন্যতম।

ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো বালিকাবেলায় ক্যাথলিক পরিবেশে বড় হয়ে যৌবনে চার্চের অনুশাসন সবলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ফতিমা মের্নিস্সি অনেক দিন ধ'রেই সেক্যুলার বুদ্ধিজীবী হিসেবে স্বীকৃত। তসলিমা নাসরিন আর অয়ান হির্সি আলি চাইছেন মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে বুদ্ধির মুক্তি ঘটুক, যুক্তির মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হোক। নারীর জীবনের উপরে প্রসারিত অভিশাপ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের থাবাকে ঠেলে সরিয়ে দেবার জন্য তাঁরা লড়ছেন। এই বিশেষ লড়াইটি যে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে কোনোদিন লড়তে হয় নি, তার জন্য বাংলার নবজাগরণের মনীষিতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

সুমনা দাস সুর

অবরোধবাসিনী থেকে সবলা: নারী ঔপন্যাসিকের চোখে নারীর আত্মপরিচয়ের সন্ধান

'মেয়েরা এত গরিব কেন?' প্রশ্নটা করেছিলেন ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্। অক্সব্রিজের লাইব্রেরিতে বসে এলোমেলো বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে এমনই এক ঝাঁক প্রশ্ন ভিড় করে আসে তাঁর মনে— "Why did men drink wine and women water? Why was one sex so prosperous and the other poor? What effect has poverty on fiction? What condition are necessary for creation of works of art?"[১]

প্রশ্নগুলি আপাতদৃষ্টিতে অসংলগ্ন মনে হতে পারে, এমনকী অর্থহীন। কেন না, 'গরিবি' বিষয়টিকে অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে দেখাতেই সাধারণ ভাবে অভ্যস্ত আমরা। কিন্তু এখানে 'গরিব' শব্দটি বহুমাত্রিক তাৎপর্যবাহী, পৃথিবীর আদিতম শ্রেণিদ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত— সেই দ্বন্দ্ব নারী এবং পুরুষের অবস্থানগত সংঘাত। সমাজে পুরুষ এবং নারীর অস্তিত্ব নির্ভর করে পারস্পরিক অন্যোন্য নির্ভরতায় নয়, পিতৃতন্ত্রের নিজস্ব সংজ্ঞায় তাকে নির্মাণ করা হয়— এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতনতা বোধ গড়ে ওঠে ইউরোপে বিংশ শতকের গোড়ায় কয়েকজন নারী ভাবুকের মননে চিন্তনে। এঁদের মধ্যে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছিলেন দু'জন— ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ (১৮৮২-১৯৪১) এবং সিমোন-দ্য-বোভেয়ার (১৯০৮-১৯৮৬)। এঁরাই প্রথম লক্ষ করেন যে পুরুষ লেখকদের সৃজনে নারীর বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ জীবনের যে ছবি উঠে আসে তাতে পিতৃতন্ত্রের একটা চালাকি থেকে যায়। নারীদের তাঁরা সেইভাবে দেখান যেভাবে তাঁরা তাদের দেখতে চান, অন্তত্তপক্ষে নিজস্ব ভাবমূর্তি যেন কোথাও টোল না খায়। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ বলেন পুরুষের তৈরি নারীচরিত্রেরা যেন স্বতন্ত্র মানুষ নয়, সুদৃশ্য কতগুলি আয়না যাতে প্রতিফলিত অতিকায় মূর্তি পুরুষদের তৃপ্ত করে, "Women have served all these centuries as looking glasses possessing the magic and delicious power of reflecting the figure of man at twice its natural size. Without that power probably the earth would still be swamp and jungle. The glories of all our wars would be unknown."[২] হেলেন

কিংবা দ্রৌপদীর মতো মহার্ঘ আয়নায় নিজেদের বহুগুণিত পৌরুষকে না দেখলে সত্যিই কি হোত ট্রয় বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ! সিমোন-দ্য-বোভেয়ার বিষয়টিকে শারীরবৃত্তীয় থেকে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পৌরাণিক বিভাজনের কোঠায় ফেলে দেখতে চাইলেন। নারীর অস্তিত্বের প্রকৃত সংজ্ঞা কী? (What is a woman?) সে কি গর্ভধারণে সক্ষম এক যন্ত্র বিশেষ! সে কি কতগুলি যৌন অঙ্গের সমষ্টি! নাকি প্লেটনিক ভাবুকতার রঙিন মায়া! বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের বর্ণনায় আছে আদমের সঙ্গিনীরূপে ইভকে গড়া হয়েছিল আদমেরই বুকের হাড় থেকে। শ্রীমতী বোভেয়ার দেখান সেই সময় থেকে শুরু করে, কিংবা অ্যারিস্টটলের বহুশ্রুত ঋষিবচন, "The female is a female by virtue of a certain lack of qualities"-এর কাল থেকে আজ পর্যন্ত নারীর অবস্থান পুরুষের পিছনে, দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকরূপে। সাধারণ ভাবে প্রচলিত প্রয়োগে 'মানুষ' (human) এবং পুরুষ (man) সমার্থক। কিন্তু নারী! সামাজিকভাবে সে হল 'অপর' (other)। প্রতিষ্ঠিত এবং মহিমান্বিত 'Eternal feminine'-এর বুক চিড়ে বোভেয়ার দেখান স্ত্রীলিঙ্গ কেবল অর্জিত নয়, নির্মিতও হয় দ্বিতীয় লিঙ্গরূপে। পুরুষ এবং নারী— এই দুই লিঙ্গের অবস্থানগত যে রাজনীতির ইঙ্গিত[৩] উল্‌ফ্ কিংবা বোভেয়ার-এর রচনায় আমরা পেয়েছিলাম তাকেই একটি তাত্ত্বিক কাঠামো দিলেন ষাটের দশকে Kate Millett তাঁর *Sexual Politics* গ্রন্থে। তিনি দেখান সামাজিক এবং পারিবারিক শিক্ষার ফলে একটি শিশুর মনে ধীরে ধীরে নিজস্ব যৌন পরিচয়ের বোধগুলি গড়ে ওঠে— পুরুষ হবে আগ্রাসী, আক্রমণাত্মক আর নারী মানেই অন্তর্মুখী, নিষ্ক্রিয়।[৪]

লেখিকার মতে পিতৃতন্ত্রে বিবাহ একটি অর্থনৈতিক চুক্তি বা জোট মাত্র এবং রোমান্টিক প্রেমে নারীর অবস্থান গৌরবজনক মনে হলেও সেটি একটি মুখোশ বই কিছু নয়। কারণ সেখানেও নারীর জন্য আচরণবিধি সুনির্দিষ্ট যা এতটুকুও ভিন্নতা সইতে পারে না। ঠিক যেমন কোনও কালো মানুষ শিক্ষায়, কর্মক্ষেত্রে উন্নত হলেও সমাজে জাতিগত বিচারে সাদাদের চাইতে নিচু, তেমনই পিতৃতন্ত্রে মেয়েদের অবস্থান। পৌরুষের কাছে তার সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব মাথা নোয়াতে বাধ্য। শ্রীমতী মিলেট দেখান সব চাইতে মারাত্মক পরিণতি এই যে, নারী যুগ যুগ ধরে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত থেকেছে পুরুষের হাতে খেলার পুতুল হয়ে। পিতৃতন্ত্র সুচতুর ভাবে তাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাঁটা গেঁথে দিয়েছে। গৃহবধূ এবং বারবণিতার চূড়ান্ত অবস্থানগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে শুরু করে (পাঠকের মনে পড়বে শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তম উপন্যাস *দেবদাস*-এর পার্বতী এবং চন্দ্রমুখী চরিত্রের কথা) গৃহবধূ এবং কর্মরতা কিংবা যুবতী এবং বিগতযৌবনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বঙ্গসমাজের প্রেক্ষিতে বিষয়টিকে আরও একটু টেনে নেওয়া যায় পুত্রবধূ-শ্বশ্রূমাতা, ভ্রাতৃবধূ-ননদিনী কিংবা দুই জা-এর অন্তর্গত প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। লেখিকার তাই সোচ্চার ঘোষণা পিতৃতন্ত্রকে অস্বীকার না করলে সমাজে নারীর অবস্থানগত কোনও সামগ্রিক পরিবর্তন সম্ভব নয়।

কেট মিলেটের মতবাদকে কিছুটা একরোখা এবং কট্টরপন্থী মনে হলেও তাঁর থিসিসগুলি অনেকাংশেই সত্য। তাঁরই প্রদর্শিত পথে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যের টেক্সটগুলির

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেন অধ্যাপিকাদ্বয় Sandra Gibert এবং Susan Gubar তাঁদের *The Madwoman in the Attic* (1979) বইতে।

১৯ শতকের কয়েকটি নারী রচিত উপন্যাসকে তাঁরা বেছে নেন ভাবনার উৎসরণ ভূমি রূপে। এঁদের মধ্যে আছেন জেন অস্টেন, মেরি শেলি, শার্লট ও এমিলি ব্রন্টি, জর্জ এলিয়ট এবং এমিলি ডিকিনসন্। গিলবার্ট এবং গুবার তাঁদের বইয়ের নামটি দিয়েছেন শার্লট ব্রন্টির *জেন আয়ার* উপন্যাসের চিলেকোঠায় বন্দিনী বার্থা রচেষ্টার-এর চরিত্রটি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে। লেখিকাদ্বয় দেখান ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে অনেক দূরের মানুষ হলেও নারীদের লেখায় কিছু কিছু পুনরাবর্তিত থিমের চিত্রকল্পের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এরই একটি মানসিক বিকৃতি, উন্মাদরোগ। এই অসুস্থতা এবং অস্বাচ্ছন্দ কেবল নারী লেখকদের একটি থিম মাত্র নয় বরং এটি তাদের রচনার একটি মূলগত উপাদান, বুনোটের তন্তু। পিতৃতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সামাজিক এবং পারিবারিক অবস্থানে নারীর যে ভগ্ন, ক্ষুদ্রায়িত সত্তা, তার প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যে, এক অপ্রকৃতস্থ চৈতন্যের পুনরুদিত হওয়ায়। এই অপ্রকৃতস্থ চরিত্রায়ণের মধ্যে প্রকাশ পায় লেখিকার দ্বৈত সত্তা, অন্তর্গত এক অনিশ্চয়তা বোধ (anxiety of authorship)। *জেন আয়ার*-এর যে উন্মাদিনীকে চিলেকোঠায় বন্দি করে রাখা হয় সে যেন সমস্ত নারীর অন্তর্গত বন্দিনীসত্তার প্রতিনিধিত্ব করে। সেই বন্দিনীকে মুক্তি দিতেই মেয়েরা লেখে। সুতরাং পুরুষ লেখক যখন নব নব আবিষ্কারের নেশায় বিভোর, নারী লেখনী তখন প্রকাশ করতে চায় পদানতের স্তব্ধতা কিংবা নিষ্কলুষ সৌন্দর্যের ভাবমূর্তিতে চাপা পড়ে থাকা তার ক্রোধ এবং হতাশাকে। ফলত, নারীসত্তার অন্তর্গত একাধিক পরস্পর বিরোধী স্তর, অনিঃশেষ দোলাচলতা শুধুমাত্র তাদের রচনার বিষয় হয়ে ওঠেনি, পাঠের সর্বস্তরে প্রবেশ করেছে। নারীর রাষ্ট্রিক, সামাজিক, পারিবারিক জটিল অবস্থান, ক্রমাগত নিষ্পেষণ গোপন রোগের মতো সংক্রামিত হয় তার রচনায়, তার অ-সুখ, যন্ত্রণা মিলেমিশে তৈরি হয়ে ওঠে এক স্বতন্ত্র ভাষা। গিলবার্ট এবং গুবার মনে করেন উনিশ শতকের নারী লেখকদের রচনায় নির্ভুল ভাবে পাওয়া যায় নিজস্ব এক সংস্কৃতি, সমাজচেতনা এবং আত্মপরিচয়ের খোঁজ, সর্বোপরি সহলেখিকাদের সঙ্গে ভগিনীপ্রতিম এক একাত্মবোধ— "...nineteenth century literary women did have both a literature and a culture of their own– that, in other words, by the nineteenth century there was a rich and clearly defined female literary subculture, a community in which women consciously read and related to each other's work."[৫]

গিলবার্ট এবং গুবার যেভাবে সাহিত্যে বিধৃত নারী চরিত্রগুলির রক্তাক্ত চৈতন্য থেকে শলাকাবিদ্ধ করে তুলে এনে দেখালেন এক একটি সত্যকে তা মানবীচেতনার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য মোড়বদল। নারীবাদী চর্চা (feminist criticism) বদলে যায় নারীর নিজস্ব নান্দনিক চেতনায় (female aesthetics) এবং তারপর Elaine Showalter তাঁর *Towards a Feminist Poetics* (1979)-এ ব্যবহার করলেন নতুন একটি শব্দ Gynocriticism। শব্দটি ফরাসি la gynocritique থেকে গৃহীত। নারীর subculture নয় আর, নারীর সাহিত্য,

নারীর ভাষা, নারীর অভিজ্ঞতার জগৎ— যেখানে রয়েছে গৃহকর্ম, সন্তান পালন থেকে শুরু করে বৃহত্তর কর্মধারা— তারই মধ্যে এক পূর্ণাঙ্গ নারীসত্তার সন্ধান। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, শরীরতত্ত্বের গবেষণার মধ্য দিয়ে পিতৃতন্ত্রের স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণের বিপরীত এক যাত্রা। সুতরাং বিংশ শতকের প্রথম এবং দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে নারীভাবনা একটি সুনির্দিষ্ট উত্তরণের পথে এগিয়েছে। শোয়ালটার পুরো বিষয়টিকে বাদামের খোলায় পুরেছেন এই ভাবে— প্রথম স্তর 'feminine'-যখন নারী সম্পূর্ণরূপে পিতৃতন্ত্রের দ্বারা সুনির্দিষ্ট ছাঁচে ঢালা, দ্বিতীয় স্তর 'feminist'-যখন নারী তার প্রান্তিক অবস্থান থেকে প্রতিবাদের ভাষা খোঁজে এবং সর্বশেষ স্তর 'female' যেখানে পৌঁছে প্রবলতর লিঙ্গের সঙ্গে লড়াইয়ের পথ অতিক্রান্ত, শুরু নারীর নিজস্ব পরিচয় নিয়ে নিজের পথ চলা।

ইউরোপ এবং আমেরিকার মানবীবিদ্যার চর্চা যেমন ধারাবাহিকতায় এগিয়েছে বাংলা সমাজ, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঠিক তেমনটি ঘটেনি। তার মানে অবশ্য এই নয় যে আমাদের উদ্দেশ্য পাশ্চাত্য মডেলের ছাঁচে ফেলে বিষয়টির একটি সরলীকৃত সমাধান সূত্র খুঁজে নেওয়া। প্রকৃতপক্ষে এই ভাবনাগুলি এক একটি খোলা জানালার মতো যে পথে আসা আলোয় আমাদের সাহিত্যের চেনা মুখগুলিকেই আবার নতুনভাবে ফিরে দেখা যায়, পশমের কাজের উলটোপিঠের মতো মেয়েদের যে জীবন— যেখানে অজস্র রঙের মোটা ও মিহি সুতো মিলে মিশে আছে, সেই গ্রন্থিল জটিলতাকে উন্মোচিত করার পথ খুঁজে পাওয়া যায়। আর এ কথা তো সকল তাত্ত্বিকই স্বীকার করেছেন যে সর্বকালের সর্বদেশের মেয়েদের অবস্থানগত পার্থক্যের তুলনায় সাদৃশ্যই অধিক।

ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা উনিশ শতকে— সীমাবদ্ধ এবং স্ববিরোধী নবজাগরণের অব্যবহিত ফলস্বরূপ। ইংরেজি শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক, শিক্ষিত পুরুষদের একটি অংশে মহিলাদের বিষয়ে এক ধরনের সচেতনতা জন্ম নেয়। এর একটি বড় কারণ, ইউরোপের আয়নায় নিজেদের দেখাটাই ছিল সেই সময় আধুনিকতার অপর নাম। তাঁরা দেখেন, ইউরোপীয় শিক্ষিত এবং রুচিশীল সমাজে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা, নাচগান প্রভৃতি সাংস্কৃতিক গুণাবলিকে যথেষ্ট উৎসাহই দেওয়া হয়। এই উদাহরণ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে উনিশ শতকের প্রথম-দ্বিতীয় দশকে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ শিক্ষিত এবং আলোকপ্রাপ্ত বাঙালিরা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হন। কিন্তু টাকার উলটোপিঠের মতো এই উদ্দীপিত উদ্যোগগুলির গভীরে অন্য একটি গল্পও ছিল। অধিকাংশ শিক্ষাদ্যোগীই মনে করতেন মেয়েদের পড়াশোনা শেখার প্রয়োজন, কিন্তু তা হবে একটি সীমিত পরিসরের মধ্যে। কেশব সেনের মতো প্রগতিশীল মানুষও মনে করতেন, মেয়েদের 'জ্যামিতি', 'দর্শন' প্রভৃতি 'পুরুষালি' বিষয় পড়া অনাবশ্যক। এমনকী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে লেখা হয়, "...আমরা স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার বিরোধী নহি।... যে সমস্ত পুস্তক পাঠ করিলে স্ত্রীজাতি উৎকৃষ্ট গৃহিণী ও মাতা হইতে পারে তাহাই তাহাদের বিশেষ পাঠ্য"[৬]। অর্থাৎ শিক্ষিত পুরুষদের পরিবর্তিত জীবনধারার উপযুক্ত হয়ে ওঠার জন্য কিছুটা

লেখাপড়া শেখা প্রয়োজন ঠিকই কিন্তু তা ঠিক ততটাই যতটা পুরুষেরা চাইবেন, তা হবে পিতৃতন্ত্রের কড়া অভিভাবকত্বে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, যে সমস্ত ইউরোপীয় শিক্ষিত নারীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন, তাঁদের অবস্থানও এর চাইতে পৃথক ছিল না। বাইরে থেকে সুখী এবং তৃপ্ত মনে হলেও তাঁরা যেন বাস করতেন এক একটি কাচের ঘরে, এবং সেই স্বচ্ছ চারটি দেওয়াল তাঁদের তথাকথিত স্বাধীনতাকে নির্মমভাবে ব্যঙ্গ করত। শার্লট ব্রন্টির জেন আয়ার সামান্য সুযোগ পেলেই বুক ভরে নিশ্বাস নিতে উঠে আসত ছাদে। দিগন্ত রেখার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার বুকের পাঁজরে ডানা ঝাপটাত একের পর এক ক্ষুব্ধ, উত্তরহীন প্রশ্ন। কেন মেয়েদের সব সময় শান্ত হয়ে থাকতে হবে! কেন তাদের কর্মজগৎ সীমাবদ্ধ থাকবে পুডিং বানানো, মোজা বোনা, পিয়ানো বাজানো কিংবা ব্যাগে ফুলপাতা তোলায়! কেন তারা তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট যা কিছু তার বাইরে হাত বাড়াতে পারবে না! তারা যে পুরুষের মতোই অনুভব করতে পারে এ কথা কেন সকলে বুঝবে না!

সুতরাং 'মেয়েদের স্বাধীনতা' বিষয়টি আপেক্ষিক, শর্ত নির্ভর এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে জটিল; সমস্ত দেশে, সকল সমাজের প্রেক্ষিতে। উনিশ শতকে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কালে এই দোলাচলতা ছিল আরও অধিক মাত্রায়। কারণ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিচারে একই সঙ্গে একাধিক যুগ সহাবস্থান করছিল সেই সময়। সামন্ততন্ত্র সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়নি, আসেনি ধনতন্ত্র— সমাজ এই দুই-এর মাঝে পড়ে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় ছিল বহুকাল। ফলত, পিতৃতন্ত্রে নারীর অবস্থানগত যে সচেতনতাবোধ থেকে হাহাকার করে জেন আয়ার, সেখানে পৌঁছতে বাঙালি নারী ঔপন্যাসিকের আরও বেশ কিছু পথ হাঁটতে হয়েছে।

১২৭৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত রাসসুন্দরী দেবীর *আমার জীবন* একটি আশ্চর্য বই। সে যুগে যখন পল্লীগ্রামে মেয়েদের লেখাপড়ার চর্চা কল্পনাতীত ছিল, সেই সময়ে স্মৃতি হাতড়ে হাতড়ে শৈশবে চেনা অক্ষর পরিচয় পুনরুদ্ধার করে রন্ধনশালার নির্জন অবসরে একহাত ঘোমটার তলায় লুকিয়ে আনা চৈতন্যভাগবতের পুঁথি পড়ার যে বর্ণনা আমরা পাই তাকে প্রায় গল্পকথা বলে মনে হয়। তবে রাসসুন্দরী ভক্তিমতী নারী ছিলেন, সেই ভক্তিই তাঁর অদম্য চেষ্টার রসদ। জীবনের সিংহভাগ একগলা ঘোমটার তলায় কাটাতে হল বলে ক্ষুব্ধ বা ক্রুদ্ধ নন তিনি, অপরিসীম ধৈর্যে সমস্ত কিছুকে শান্তভাবে গ্রহণ করেন। হয়তো তাঁর আস্তিক্যবোধ তাঁকে এ বিষয়ে সহায়তা করেছিল। রাসসুন্দরী লেখেন, "আমার অদৃষ্টক্রমে তখন মেয়েছেলেতে লেখাপড়া শিখত না। তখনকার লোক বলিত, বুঝি কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এখন বুঝি মেয়েছেলেতেও পুরুষের কাজ করিবেক।"[৭] লেখিকার স্বামীও এই দলের বাইরে ছিলেন না। কোনও দিন মুখ ফুটে মনের একান্ত ইচ্ছার কথা, তাঁকে জানাতে পারেননি। তবু রাসসুন্দরীর চোখে তিনি ছিলেন 'বেশ লোক'।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা উপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রেক্ষাপট অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাংলার উনিশ শতকের অন্যতম বিখ্যাত এবং সংস্কৃতিমনস্ক পরিবারের সন্তান তিনি। তাঁর দিদি সৌদামিনী দেবী ছিলেন বেথুন স্কুলের প্রথম ছাত্রীদের একজন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের

পরিবারের অন্তঃপুরে প্রবল পর্দা প্রথা চালু থাকলেও মেয়েদের লেখাপড়া চর্চায় কোনও বাধা ছিল না। স্বর্ণকুমারীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল ঠাকুরবাড়ি প্রথা অনুসারে শ্বশুরগৃহে বসবাস করতে আপত্তি জানান। তাঁর স্বাতন্ত্র্য এবং আত্মমর্যদাবোধ নিঃসন্দেহে স্বর্ণকুমারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করেছিল। মাত্র বারো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল তাঁর, আঠেরোর মধ্যে চার সন্তানের জননী হয়েছিলেন। কিন্তু জায়া এবং জননীর ভূমিকায় সীমাবদ্ধ রাখেননি নিজেকে। নিজেকে শিক্ষিত করে তুলেছেন সংস্কৃত এবং ইংরেজি ভাষার চর্চার মধ্যে দিয়ে। মাত্র চোদ্দো বছর বয়সে, যখন তিনি দুই সন্তানের মা, তখন তাঁর স্বামী নিজে উদ্যোগ নিয়ে তাঁকে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে বোম্বাইতে পাঠিয়ে দেন যাতে তাঁর ইংরাজি ভাষার শিক্ষা সুসম্পূর্ণতা পায়। তাঁর কর্মধারা শুধুমাত্র সাহিত্যচর্চাতেই শেষ হয়ে যায়নি। জানকীনাথ ইন্ডিয়ান থিওসফিকাল সোসাইটির উৎসাহী সদস্য ছিলেন। স্বর্ণকুমারী হয়েছিলেন এর মহিলা শাখার সভানেত্রী। জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনেও অংশ নিয়েছেন তিনি। অসহায়, অনাথ মহিলাদের সাহায্যার্থে স্থাপন করেছেন 'সখীসমিতি', এবং সমিতির জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আয়োজন করেছেন 'মহিলা শিল্পমেলা'র। কাদম্বরী দেবীর অকাল মৃত্যুতে যখন *ভারতী* পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যেতে বসেছিল তখন তিনি এর সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে একজন মহিলার এমন বহু বিচিত্র কর্মজগৎ প্রায় কল্পনাতীত। কিন্তু জীবনে কিছু পেতে গেলে বা করতে হলে মূল্য তো কিছু দিতেই হয়। স্বর্ণকুমারী তাঁর নিজের সন্তানদের তেমন ভাবে সময় দিতে পারেননি, যেমন আর পাঁচজন মা দিয়ে থাকেন। কন্যা সরলা দেবীর স্মৃতিচারণায় ঝড়ে পড়ে এ নিয়ে অভিমান এবং ক্ষোভ।[৮]

তবে সামগ্রিক বিচারে মনে হয় স্বর্ণকুমারীর আপাত উদাসীনতার কারণ হৃদয়হীনতা নয়। তাঁর সাহিত্যই প্রমাণ করে তিনি যথেষ্ট সংবেদনশীল নারী ছিলেন। সন্তানদের প্রতি দায়িত্বপালনেও ত্রুটি ছিল না তাঁর। সম্ভবত তাঁর কাছে মাতৃত্বের সংজ্ঞা এবং তার প্রকাশ ছিল কিছুটা ভিন্ন গোত্রের। অন্তঃপুর এবং কর্মজগতের মধ্যে সময় ও মনোযোগ ভাগ করে নিতে হলে সমঝোতা তো কিছুটা করতেই হয়, আর বাঙালি মায়ের ভাবমূর্তি তাতে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হবে এও স্বাভাবিক। যে সমস্যা আরও বহুদিন পরে বিংশ শতকের তৃতীয়, চতুর্থ দশক থেকে মূলত অর্থনৈতিক কারণে কাজের জগতে পা বাড়ানো মহিলাদের জীবনে আসতে শুরু করেছিল, স্বর্ণকুমারী বহু দিন আগে স্বেচ্ছায় তা বেছে নিয়েছিলেন। আর নিয়েছিলেন বলেই উনিশ শতকের শেষ পর্বে এক আলোকপ্রাপ্ত প্রতিভাদীপ্ত উজ্জ্বল নারীব্যক্তিত্ব রূপে আমরা তাঁকে পেলাম।

স্বর্ণকুমারীর মোট উপন্যাসের সংখ্যা আট। *দীপনির্বাণ* (১৮৭৬), *মিবাররাজ* (১৮৮৭), *হুগলির ইমামবাড়ি* (১৮৮৮), *বিদ্রোহ* (১৮৯০), *স্নেহলতা বা পালিতা* (১৮৯২-৯৩), *ফুলের মালা* (১৮৯৫), *কাহাকে* (১৮৯৮)। বঙ্কিমচন্দ্রের *দুর্গেশনন্দিনী* প্রকাশের মাত্র এগারো বছর পরে এক সদ্য তরুণী লেখিকার সর্ব প্রথম উপন্যাস *দীপনির্বাণ*। স্বভাবতই বঙ্কিম বা রমেশচন্দ্রের প্রভাব ছিল এই ঐতিহাসিক উপন্যাসে। শুধু তাই নয়, এর ভঙ্গিও ছিল কিছুটা পুরুষালি।

নামহীন উপন্যাসটি খুব কাছের মানুষের মনেও বিভ্রম জাগিয়েছিল। জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরন্ময়ী লেখেন, "মেজমামা পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ বিদেশে এই বইখানি হাতে পাইয়া ভাবিলেন, নতুন মামার লেখা। তিনি লিখিলেন জ্যোতির জ্যোতি কি প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে?"[৯] এই পুরুষালি ভঙ্গি স্বর্ণকুমারীর নিজস্ব স্টাইল নয়, বরং স্টাইলের অভাব। নারীর অভিজ্ঞতার জগৎ যে স্বতন্ত্র এবং তাকে প্রকাশের জন্য চাই আলাদা ভাষা— এই উপলব্ধি তখনও তাঁর জাগেনি। কিন্তু পরবর্তী উপন্যাস *ছিন্নমুকুল*-এ জাঁকজমকপূর্ণ অতীত যাত্রা ছেড়ে তিনি যখন নেমে এলেন সাধারণ সংসারের আঙিনায় তখন নারীর অনুভূতির জগৎ, এবং পুরুষের হাতে ব্যবহৃত হওয়ার যন্ত্রণা ভাষা পেল তাঁর লেখনীতে। *ছিন্নমুকুল*-এ নায়িকা কনক-এর একদিকে ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা এবং কর্তব্যবোধ আর অন্য দিকে নিজের পছন্দের পুরুষটিকে না পাওয়া— এই দুই-এর টানাপোড়েনে রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত হয় তার অন্তর। আবার *স্নেহলতা* বা *পালিতা* উপন্যাসের নায়িকা স্নেহলতাকে আত্মঘাতী পরিণতির দিকে ঠেলে দেয় পুরুষের প্রেম এবং প্রতারণা। বিধবা বিবাহ বা বিধবার প্রেম ততদিনে আর বাংলা উপন্যাসে কোনও নতুন বিষয় নয় এবং বঙ্কিমের কুন্দনন্দিনী বা রোহিনীর চাইতেও আলাদা নয় স্নেহলতার পরিণতি। পার্থক্য লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিতে। কুন্দনন্দিনীকে যে তার নবীন যৌবনে বেঁচে থাকার আকণ্ঠ পিপাসা নিয়েও বিষ খেতে হল কিংবা রোহিনী যেমুহূর্তে গোবিন্দলালের রক্ষিতার জীবন থেকে মুক্তি চাইল তখনই তাকে মরতে হল বন্দুকের গুলিতে— এর দায় কার! যে মেয়েগুলি জীবন দিয়ে প্রেমের, বিশ্বাসের মূল্য শোধ করল শুধু তাদেরই কী! বঙ্কিমের উপন্যাসে তার উত্তর মেলে না। বরং নগেন্দ্রনাথ এবং গোবিন্দলাল যে তাদের স্ত্রীদের কাছে ফিরে গেলেন— সেই ঘটনাই সমর্থিত হয় উপন্যাসিকের ঔচিত্য বোধ দ্বারা। মাঝের অধ্যায়টি শুধুই যেন একটি ভুল যা মানুষ মাত্রই করে থাকে। *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসের নামকরণ এবং সমাপ্তিতে লেখকের উচ্চারিত সাবধান বাণী কি বাইবেলে বর্ণিত শয়তানের গাছটির কথাই মনে করিয়ে দেয় না যার ফল খেতে নারীই পুরুষকে প্রলুব্ধ করেছিল! সুতরাং পুরুষের স্খলনের জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী নারী— এই ঋষিবচন আরও একবার সমর্থিত হয় বঙ্কিমের উপন্যাসে। আর এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নেই আলাদা হয়ে যান স্বর্ণকুমারী। জগৎবাবুর বাড়িতে আশ্রিতা অকালবিধবা স্নেহলতার প্রতি জগৎবাবুর পুত্র বিপত্নীক চারুর সাময়িক উন্মাদআকর্ষণ এবং পরে একটি কুমারীকে বিবাহ করে নিজেকে ত্রুটিমুক্ত প্রমাণ করতে হিন্দু ধর্মের বিশুদ্ধতার বুলি আওড়ানো— এর মধ্যে যে একটা ভয়ংকর ভণ্ডামি আছে— যা নাকি পিতৃতন্ত্র দ্বারা সমর্থিত— তাকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন লেখিকা। কেট মিলেট তার *Sexual Politics* গ্রন্থে দুই লিঙ্গের অন্তর্গত যে-রাজনীতির কথা বলেছেন সেই চেহারাটাকে দিনের আলোয় উন্মোচিত করে দেখান স্বর্ণকুমারী। শুধু তাই নয়, পিতৃতন্ত্রের ছাঁচে ঢালাই হয়ে নারীরা তাদের অন্তর্গত যে ভয় এবং অসহায়তাবোধের কারণে পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয় তারও ছবি তিনি এঁকেছেন এখানে। স্নেহলতাকে আশ্রয়চ্যুত করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নেন জগৎবাবুর স্ত্রী, চারুর মা— নিজ পুত্রের কৃতকর্ম সম্পর্কে তিনি অন্ধ। চারু সমগ্র পুরুষ সমাজের একমাত্র প্রতিনিধি নয়। জগৎবাবু বা জীবনের মতো দরদি মনের মানুষেরাও আছেন। কিন্তু তাদের

শুভবোধ বা সৎ চেষ্টাও বাঁচাতে পারে না স্নেহলতাকে। মেয়েদের পায়ের তলার জমিটি সুরক্ষিত রাখার জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা যে একান্ত প্রয়োজন— অত্যন্ত আধুনিক এই চিন্তাটির উল্লেখ আছে এই উপন্যাসে।

কনক কিংবা স্নেহলতা পুরুষের হাতে ব্যবহৃত হতে হতে, ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে এক সময় নিঃশেষ হয়ে গেছে। সেই পুরুষ কখনও ভাই, কখনও স্বামী, কখনও প্রেমিক। কিন্তু এরা প্রতিবাদ করেনি কখনও। এদের নীরব সহিষ্ণুতাই ভাষা পেল *কাহাকে?*-র মৃণালিনী ওরফে মনি চরিত্রে এসে। এর অনেক বছর পরে লেখা একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ একটি 'সাধারণ মেয়ে'-র গল্প বলবেন (*পুনশ্চ* কাব্যগ্রন্থ)। সেই 'সাধারণ মেয়ে' মালতী অসাধারণ হয়ে উঠতে চেয়েছিল যাতে সে তার আত্মম্ভরী, কৃতঘ্ন প্রেমিকটিকে তুচ্ছ করতে পারে, 'না' বলতে পারে। পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় নারীর 'না' বলার অধিকার নিঃসন্দেহে একটি বড় ঘটনা যে ঘটনাটি স্বর্ণকুমারী ঘটান তাঁর *কাহাকে?* উপন্যাসে।

আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে এই কাহিনিতে অভিনবত্ব তেমন কিছু নেই, নিছকই রোমান্সধর্মী আখ্যান। বাল্যের সহপাঠী ছোটুর স্মৃতি তার মুখের শোনা একটি গানের কথা ও সুরের মধ্যে দিয়ে বাহিত হয়ে সঞ্চিত ছিল মনির হৃদয়ে। যৌবনে পৌঁছে জীবনসঙ্গী নির্বাচনের সময়েও সেই গানের স্মৃতি দ্বারা তাড়িত হয় সে। অনেক ভুলভ্রান্তির পর ছোটুকেই ফিরে পায় নবরূপে। এই হল কাহিনির চুম্বক। কিন্তু এর ভাঁজে ভাঁজে লুকনো আছে এমন অনেক ইঙ্গিত যা পাঠকের ভাবনাকে উসকে দেয়, ছুড়ে দেয় নারীর অস্তিত্ব এবং অবস্থানগত বেশ কিছু প্রশ্ন।

জীবনের প্রদোষলগ্নে পাঠশালার সঙ্গী ছটুকে ভালবেসেছিল মনি, তাকে উপহার দিত নিজের হাতে তোলা বাগানের ফুল। সেই স্মৃতি ভোরের ফুলের মতোই অপাপবিদ্ধ এবং সতেজ ছিল তার মনে। যৌবনে দিদির বাড়ির টেনিস পার্টিতে আলাপ হয় বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার রমানাথ ঘোষের সঙ্গে। প্রথম আলাপেই রমানাথের মন্তব্য "এমন মনিকে আপনি এতদিন খনির মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন?"[১০] তার মনকে যেন প্রতিহত করে— "...এই প্রশংসার মধ্য হইতে কেমন একটা বেতর বেসুর স্বর খট করিয়া কানে বাজিল।" রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে' কবিতার মালতীর প্রেমিক নরেশ বলেছিল, "কথাগুলো যদি বানানো হয় দোষ কী,/কিন্তু চমৎকার/হীরে বসানো সোনার ফুল কি সত্য, তবু কি সত্য নয়।" মনি নারী হলেও 'হরে বসানো সোনার ফুলে'র মতো বানানো প্রশংসার অলংকার অঙ্গে ধারণ করতে নারাজ। সে আধুনিকা হলেও এটিকেট মানা ভদ্রলোকের নোনতা মিষ্টি স্বাদের ফ্লার্ট তাকে আনন্দ নয়, পীড়া দেয়। কারণ সমস্তটার মধ্যে একটি মিথ্যেকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলার চেষ্টা থাকে। কিন্তু এই রমানাথেরই মুখে শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত গানটি শুনে তার মন জোয়ারের মুখে ঘাটে বাঁধা নৌকার মতো চঞ্চল হয়ে ওঠে। মনির মনের বিভোর অবস্থার মধ্যেই তাদের সম্পর্ক দ্রুত এগোয় এবং আত্মীয়স্বজনেরাও এই কোর্টশিপের বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। প্রাথমিক দ্বিধা কাটিয়ে উঠে রমানাথকেই জীবনসঙ্গী রূপে গ্রহণ করতে মনি যখন মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে

তুলেছে সেই সময় একটা ঘটনা ভেঙে চুরমার করে দেয় তার স্থিত ভুবনটি। সে জানতে পারে বিলেতে থাকাকালীন এক বিদেশিনীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল রমানাথের, এমনকী বিবাহের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু দেশে ফিরে রমানাথ তাঁর সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগই রাখেননি। এই খবরটিতে যেন একটা আড়াল সরে যায় মনির চোখের উপর থেকে, তার প্রেমিকের চেহারাটি বদলে যায় সম্পূর্ণ। যেন শেক্সপিয়ারের Midsummer Night's Dream-এর মতো নিদাঘ রজনীর মায়ায় সে এতকাল সুন্দর কুৎসিতের পার্থক্যটাই ভুলে ছিল। কিন্তু ভুল ভাঙার পর যখন সে রমানাথ ঘোষের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে দিতে চায় তখন পরম বিস্ময়ে দেখে, সমাজ রমানাথের কৃতকর্মের মধ্যে অন্যায় কিছু দেখে না বরং তার সিদ্ধান্তটাই সকলের কাছে অর্থহীন, অদ্ভুত বলে মনে হয়। এমনকী তার আধুনিকা, ইংরেজি বুকনি ঝাড়া, মধ্যরাত্রি পর্যন্ত পার্টিতে হুল্লোর করা দিদি পর্যন্ত বলেন, "তুই ক্ষেপেছিস নাকি, এই সামান্য কারণে বিয়ে বন্ধ হবে! ও কথা মনেও আনিস না, তা হলে সমাজে কি কলঙ্কের সীমা থাকবে?" রমানাথের কৃতকর্ম নিয়ে কিন্তু তিনি আদৌ ভাবিত নন, "বিলাতের মেয়েদের কুহক তো প্রসিদ্ধ কথা, আমার মনে হচ্ছে নেহাৎ কোনও রূপ একটি পাকেচক্রে পড়ে বেচারার এমনতর বিভ্রাট ঘটেছিল।" অর্থাৎ যে সমাজে মেয়েরা তথাকথিত অর্থে মুক্ত— তারা পুরুষদের সঙ্গে টেনিস খেলে, পার্টিতে যায়— সেই সমাজও এতটুকু চ্যুতি সইতে পারে না। মেয়েদের স্বাধীনতা সেখানে ডিমের শক্ত খোলাটার মতো, সামান্য টোকা লাগলেই ভেঙে যায়। অর্থাৎ মেয়েরা ততটুকু পা বাড়াতে পারে সমাজ তাদের জন্য যতটুকু সীমানা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু স্বাধীন মত প্রকাশ, একজন সক্ষম পাণিপ্রার্থী পুরুষকে 'না' বলা— সে তো নিয়ন্ত্রণরেখার সীমানার বাইরে পা বাড়ানো! শিক্ষিত, কালচারড্ এই সমাজে মেয়েরা নিশ্চয়ই ক্রীতদাসী নয়, কিন্তু তারা ফুলদানিতে সাজানো রঙিন ফুলের মতো— গৃহের শোভাবর্ধনই যাদের কাজ। এই সুশোভন অবস্থান থেকেই না হাহাকার করেছিল জেন আয়ার! মনিও মনে মনে ফোঁসে হতাশ ক্রোধে, "যেন ভালবাসিলে লোকে ন্যায় অন্যায় জ্ঞান পর্যন্ত হারাইয়া ফেলে, অন্যায়কে— দোষকে পূজা করাই যেন ভালবাসা। আমি তাহাকে যেরূপ ভাল লোক মনে করিয়া ভালবাসিয়াছিলাম, তিনি যে তাহা নহেন, সে যেন আমারি দোষ! তিনি যে আপনাকে আমার আদর্শরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে আমারি ছলনা বটে! কী চমৎকার যুক্তি-চাতুরী। আমার এত দূর ক্রোধ হইল যে, তাহার একটি স্ফুলিঙ্গকণাও বাহিরে আসিয়া পড়িলে যেন সমস্ত বিশ্বকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে পারে।" কিন্তু মনি জানে তার ক্রোধ অপ্রকাশ্য, কেউ তাকে বুঝবে না। "রমণীতে এরূপ পৌরুষিক হৃদয়ভাবের কি সহানুভূতি আছে? তাই নিরুত্তর হইয়া গেলাম।"

সমস্যাটি যেভাবে ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল সেই গুরুত্ব অবশ্য অটুট থাকে না উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত। মনির জীবনে দ্বিতীয় পুরুষরূপে বিলেতফেরত ডাক্তার বোসের আবির্ভাব এবং সে-ই মনির বাল্যসঙ্গী ছোটু— এই সত্য আবিষ্কৃত হওয়া নিঃসন্দেহে এক সরলীকৃত সমাধান। কিন্তু এই প্লটগত দুর্বলতাকে মেনে নিয়েও বলা যায় *কাহাকে* উপন্যাসে নারীভাবনার

কিছু কিছু উৎসমুখ উন্মোচিত হয়। একাদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত মনির ভগ্নিপতির বাড়িতে ডিনার পার্টিতে ডাক্তার এবং অন্যান্যদের কথোপকথনের মধ্যে এমনই কিছু চিন্তার রসদ জুগিয়ে দেন লেখিকা। আলোচনা চলে ইংরাজি সাহিত্য নিয়ে। জর্জ এলিয়টের উপন্যাসের প্রসঙ্গ উঠলে ডাক্তার বলেন, "মানুষের সামান্য অসামান্য প্রত্যেকটি কার্য, তার আন্তর স্বভাবের কিরূপ সূক্ষ্মতম ভাব থেকে প্রসূত, তিনি যেন তা চুল চিরে দেখিয়েছেন, এমন কোনও পুরুষ নভেলিস্ট পেরেছেন কি?" বলা বাহুল্য এই উপলব্ধি স্বয়ং লেখিকার। নারী এবং পুরুষের অভিজ্ঞতার জগৎ, তাকে দেখার দৃষ্টি এবং প্রকাশের ভঙ্গিমা যে আলাদা সে কথা আমরা এই প্রথম শুনলাম বাংলা উপন্যাসে। নিঃসন্দেহে জর্জ এলিয়ট সহ ব্রন্টি ভগিনীদ্বয়, জেন অস্টেন প্রমুখ উনিশ শতকের বিখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিকদের প্রভাব রয়েছে এতে। কিন্তু একটি ভাবনার শিখা থেকেই তো আমরা নিজেদের প্রদীপগুলি জ্বালিয়ে নিই। আরও একটি অত্যন্ত ঔৎসুক্যকর প্রসঙ্গের অবতারণা হয় এই আলোচনায়। শেক্সপিয়ারের প্রতিভার স্ফূরণ কী কোনও নারী লেখকের মধ্যে সম্ভব? ডাক্তার মনে করেন অবশ্যই সম্ভব। কিন্তু মনির ভগ্নিপতি অসহ বিস্ময়ে এবং বিরক্তিতে বলেন, "What a monstrous proposition! Quite blasphemous to my mind. I never heard of such a ridiculous comparison!" এতো সেই বিখ্যাত বিতর্ক যা উত্থাপন করেছিলেন ভার্জিনিয়া উলফ্ তাঁর *A Room of One's Own*-এ, তৈরি করেছিলেন জুডিথ শেক্সপিয়ারের মিথ। উল্‌ফ্ কল্পনা করেন জুডিথ নামে শেক্সপিয়ারের এক ভগিনীকে যিনি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের সমপ্রতিভাসম্পন্না। জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো যদি একই ভাবে তারও সামনে আসত, সেও যদি নাটকের অদম্য আকর্ষণে পাড়ি দিত লন্ডনের পথে তবে সে কি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার হতে পারত! উল্‌ফ্ দেখান, তা হত না। তাকে হয়তো কোনও অভিনেতা—ব্যবস্থাপকের লোভের শিকার হতে হত, তারপর এক শীতের রাতে চূড়ান্ত হতাশার ভার সইতে না পেরে সে আত্মহত্যা করত। অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনও নারীর তথাকথিত 'পুরুষালি' প্রতিভার সম্যক বিকাশ অসম্ভব। তবে ভাবলে আশ্চর্যবোধ হয় স্বর্ণকুমারীর উপন্যাস উল্‌ফ্-এর বইটির (১৯২৯) তিরিশ বছরেরও বেশি আগে লেখা। সুতরাং মিথটি ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্-এর একার সৃষ্টি নয়, পিতৃতন্ত্রের শাসনাধীন যে সব নারী তাঁদের প্রতিভাকে খাঁচা খুলে খোলা আকাশে মুক্তি দেওয়ার স্বপ্ন দেখতেন তাঁদের সকলের বুকের মধ্যেই ছিল একজন করে জুডিথ শেক্সপিয়ার।

উনিশ শতকের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে আগামী শতাব্দীর মেয়েদের কণ্ঠে কথা বলে মনি এবং এ কথা স্বীকার করতেই হয়, সে তার যুগের প্রতিনিধিত্ব করে না। মনির জগৎ এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বাংলা দেশের শতকরা নিরানব্বই শতাংশ মেয়ের চাইতে আলাদা। শুধু তাই নয়, উপন্যাসটির পরিসরও যথেষ্ট সীমাবদ্ধ। তবে আধুনিক কিছু ভাবনার উৎসারণভূমিরূপে এই উপন্যাসটির একটি স্বতন্ত্র মূল্য রয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে অন্তঃপুরের মেয়েরা যখন সামান্য অক্ষর পরিচয়টুকু সম্বল করে কাগজ এবং কলমের 'নিষিদ্ধ' আকর্ষণে একটু একটু করে মজতে শুরু করেছেন তখন তাঁরা উপন্যাসের চাইতে

আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা বা ডায়রিই লিখেছেন বেশি। একটি বিষয় লক্ষ করলে দেখা যাবে, রাসসুন্দরী বা কৈলাসবাসিনীরা জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় পৌঁছে যখন সাংসারিক দায়দায়িত্ব থেকে খানিকটা মুক্তি পেয়েছেন তখনই বসেছেন স্মৃতিকথা বা আত্মকথা লিখতে। তাঁরা লিখেছেন সারা জীবনের অজস্র না বলা কথাকে প্রকাশ করার আনন্দে বিভোর হয়ে। তাঁদের লেখা বই হয়ে বেরোবে এবং লোকে তা কিনে পড়বে এমন ভাবনা তাঁদের মনের ত্রিসীমানাতেও উদিত হত বলে মনে হয় না। পক্ষান্তরে, জর্জ এলিয়ট, জেন অস্টেনরা সকলেই ছিলেন পেশাদার লেখিকা। প্রকৃতপক্ষে, অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ থেকেই ইউরোপের নারী লেখকরা লিখে রোজগার করার ক্ষেত্রে বেশ পাকাপোক্ত হয়ে ওঠেন। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ মেয়েদের সাহিত্য চর্চাকে স্বনির্ভরতার বাহন করার ঘটনাটিকে 'ক্রুসেড' বা 'গোলাপের যুদ্ধ'-র চাইতেও ঐতিহাসিক ভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। আর এ কথা তো যে কেউই স্বীকার করবেন যে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিপণনযোগ্যতার প্রতিতুলনায় উপন্যাসের স্থান প্রথম সারিতেই। এই 'অন্তঃপুরের আত্মকথা'গুলি উনিশ শতক এবং বিশ শতকের প্রারম্ভের উপনিবেশিক বাংলার সমাজজীবনের এক বিকল্প ইতিহাস রচনা করে চলে। লক্ষণীয় বিষয়, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী পুরুষের জীবনে সদর এবং অন্দরের মধ্যবর্তী দরজাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বন্ধই থেকেছে। পার্থ চ্যাটার্জি তাঁর *Nationalist thought and the Colonial World: A Derivative Discourse?* বইতে দেখান, ঔপনিবেশিক আত্মপরিচয়ের এক অনিশ্চয়তাবোধ থেকে উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি তার অন্দরমহলের বর্ষপ্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কারকে রক্ষা করে চলতে চেয়েছে। ভিক্টোরীয় রীতি মেনে public-private বিভাজনের সঙ্গে একে ঠিক একই কোঠায় ফেলা চলে না।

তবে দরজা বন্ধ থাকলেও খোলা জানালার পথে আসা আলোবাতাস থেকে অনেক ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হয়নি অন্তঃপুরের জগৎ। কোনও কোনও উদার মনস্ক পুরুষ তাঁদের স্ত্রীদের শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন। যদিও, আবারও বলতে হয়, সেই শিক্ষা সীমিত পরিসরে, মহিলাদের জন্য যতটুকু তাঁরা 'উপযুক্ত' মনে করেছেন, ঠিক অতটুকুই।

গিরিবালা দেবীর *রায়বাড়ি* আত্মকথা এবং উপন্যাসের এক মেলবন্ধন। একে স্মৃতিকথামূলক উপন্যাস বলা যেতে পারে। শ্রীকান্তের মধ্যে শরৎচন্দ্র যতখানি আছেন কিংবা অপুর মধ্যে বিভূতিভূষণ, *রায়বাড়ি*-র কেন্দ্রীয় চরিত্র বিনুর মধ্যে স্বয়ং গিরিবালা আরও অধিক মাত্রায় উপস্থিত। তাঁর লেখিকা কন্যা বাণী রায় জানান, তাঁর বাবা-জ্যাঠা-কাকা থেকে শুরু করে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা কল্পিত চরিত্রনামের আড়ালে স্বমহিমায় উপস্থিত।

গিরিবালা দেবীর জন্ম উনিশ শতকের শেষ দশকে (১৮৯০-১৯৮৩ খ্রি.) উত্তরবঙ্গের এক বনেদি ব্রাহ্মণ পরিবারে। সে যুগের নিয়ম অনুসারে দশ পেরোতেই তাঁর বিয়ে হয় নিকটবর্তী গ্রামের এক জমিদারবাড়িতে। জীবনের প্রান্তসীমায় পৌঁছে স্বামীর মৃত্যুর পর শোক এবং একাকিত্ব কাটিয়ে ওঠার জন্য লিখতে শুরু করেন। উপন্যাসটির খসড়া *প্রবাসী*

পত্রিকার ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন এবং চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয় যথাক্রমে 'হীরাসাগরে কথা' (সেকালের কাহিনি) এবং 'হীরাসাগরে কথা' (তটিনী) নামে। পরের বছর থেকে একই পত্রিকায় *রায়বাড়ি* ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে।

রায়বাড়ি উপন্যাসের দুই খণ্ডে বিধৃত কয়েক মাসের কাহিনি। বালিকাবধূ বনলতা ওরফে বিনুর নতুন বউ হয়ে যায় বাড়িতে প্রবেশের পর শারদীয় দুর্গোৎসব থেকে দোলযাত্রা পর্যন্ত। সময়ের বা কালের বিচারে বিস্তার অতি সীমিত, এই উপন্যাসের আসল বিশেষত্ব ঘন বুনোটের বর্ণনায়। বিংশ শতকের গোড়ায় পল্লীগ্রামের সম্ভ্রান্ত বাঙালি পরিবারের অন্তঃপুরের পূজাপার্বণ, ব্রতপালন, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ এই সমস্ত কিছুর এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন লেখিকা যে তা কেবল সাহিত্য নয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিচারেও অর্থবহ। সমাজ-নৃতত্ত্বে ডিটেলের জমাট কাজকেই সম্ভবত 'thick description' বা 'ঘন বর্ণনা' বলা হয়। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে *রায়বাড়ি* প্রকাশের সময় তার ভূমিকায় লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য লেখেন, "আমাদের দেশে দাস-দাসী, আত্মীয়-অনাত্মীয়, অতিথি-কুটুম্ব পরিবৃত হইয়া একটি বৃহৎ যৌথ পরিবার যে কীভাবে পরিচালিত হয়, তাহার একটি নির্ভরযোগ্য দলিল এই উপন্যাসখানিতে পাওয়া যায়।... আমাদের দেশে সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা এখনও ইহার যোগ্য মর্যাদা লাভ করে নাই সত্য, তথাপি একদিন যখন এই বিষয়ের প্রতি আমাদের ঔদাসীন্য দূর হইবে, সেইদিন এই উপন্যাসখানি তাহার নির্ভরযোগ্য তথ্যসরবরাহক (source book) গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।"[১১] এই ঘন বর্ণনার ফলে উপন্যাসের গতি কিছুটা শিথিল হয়েছে কিংবা খাদ্যখাদ্যের বিস্তৃত বিবরণ খানিকটা একঘেয়ে মনে হয় একথা সত্যি। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে *রায়বাড়ি* যতখানি উপন্যাস তার চাইতে বেশি স্মৃতিকথা।

সদরের গণ্ডি পেরিয়ে অন্তঃপুর সম্পূর্ণ এক ভিন্ন পৃথিবী। একই সময়ে সূর্য চন্দ্রের উদয় অস্ত হলেও সেই জগৎ আবর্তিত হয় নিজস্ব নিয়মে। সেখানে দুর্গোৎসব, লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজা, কার্তিক পূজা, রটন্তী পূজা, নবান্ন, পৌষপার্বণ, সরস্বতী পূজা, দোলযাত্রার পাশাপাশি গারসী পূজা, নাটাইচণ্ডী ব্রত, উষামঙ্গলচণ্ডী ব্রত, পটাই ব্রত, পাষাণ চতুর্দশী, মূলাষষ্ঠি, ইটাকুমুড় পূজা, শিবরাত্রি ব্রত প্রভৃতি কিছু প্রচলিত কিছু অধুনালুপ্ত বারোমাসে তেরোপার্বণের সমাহার। এই অনুষ্ঠানগুলি পালন-উদযাপনের জন্য অন্তঃপুরিকাদের হৃদয়, মনোযোগ, পরিশ্রম সমস্ত কিছু সমর্পিত। এরই মাঝে মাঝে চলে সন্তান পালন, অতিথি সেবা, কুটুম্বিতা রক্ষা প্রভৃতি। সেই অন্তঃপুরের আছে নিজস্ব নিয়ম এমনকী শ্রেণিবিন্যাস। শুদ্ধাচার, উপবাস, ছোঁয়াছুঁয়ি— এর এতটুকু ব্যত্যয় ঘটলে সেখানে পৃথিবী রসাতলে যায়। আছে বিধবা, বিবাহিতা এবং কুমারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট আচরণ বিধি— যেখানে কোনও চ্যুতি ঘটলে তিরস্কারের বন্যা বয়ে যায়। এই রায়বাড়ির অন্তঃপুরেই বাড়ির বড় ছেলে প্রসাদের বউ হয়ে প্রবেশ করে তেরো বছরের বালিকা বিনী। তার বাপের বাড়ির গ্রাম পাথরকুচি থেকে শ্বশুরবাড়ি হরিণহাটার দূরত্ব সামান্যই কিন্তু দুই জগতের ব্যবধান যেন

কয়েক আলোকবর্ষের। 'বিবাহ' তো কেবল মাত্র একটি মানুষের সঙ্গে নয়, একটি গোটা পরিবারের সঙ্গে এবং একটি মেয়ে যখন তার আজন্মের স্নেহপ্রীতির বন্ধন ছিঁড়ে এসে পড়ে সম্পূর্ণ অন্য একটি পরিবারের অন্তঃপুরে তখন মাধ্যাকর্ষণ হারিয়ে মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতোই নিরলম্বন অবস্থা হয় তার। বাবা-মা, ঠাকুর্দা-ঠাকুমার আদরের দুলালী বিনুর গাছে চড়া থেকে নদী সাঁতরে এপার-ওপার করা কোনও কিছুতেই এতকাল বাধা ছিল না। কিন্তু মাথার কাপড় ফেলে রায়বাড়ির পুকুরে সাঁতার দিলে তাকে শুনতে হয়, "তুমি হলে রায়গোষ্ঠির কলঙ্ক, তোমার বেহায়াপনায় আমি পাড়ায় মুখ দেখাতে পারি না। আমার কপালে এমন জন্তুও জুটেছে। কলকাতার পাকা জুয়াচোর বাপ, গেঁয়ো ভালোমানুষ পেয়ে একটা বদ্ধ পাগল জুটিয়ে দিয়েছে।..."[১২] অনেক চোখের জল ফেলে, অভিমান ভরে না খেয়ে থেকে বিনু ধীরে ধীরে নিজেকে মানিয়ে নিতে শিখেছে। অন্ধকার চোখে সয়ে গেলে যেমন চারপাশের অনেক কিছুই ক্রমশ আবছা ভাবে দৃশ্যমান হতে থাকে, তেমন বিনুও চিনতে-বুঝতে শেখে এই অচেনা মানুষগুলিকে। তাদের হর্ষ-বেদনা, প্রাপ্তি-বঞ্চনা, লোভ কিংবা ঈর্ষার সূক্ষ্ম টানাপোড়েন। এই পরিবারে যিনি সর্বাপেক্ষা বর্ষিয়সী এবং সম্মানের অধিকারিণী সেই ঠাকুমা শিবসুন্দরী এই সংসারে ব্রাত্য। তাঁর ভিমরতি ধরেছে, এঁটোকাটা-ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার ভুলে যান— এই অজুহাতে তাঁকে কোনও কাজে ডাকা হয় না— কিন্তু এর গভীরতর কারণ পুত্রবধূর সঙ্গে তাঁর বহুযুগের বিবাদ। মনোরমার পিতা কৌশলে শিবসুন্দরীর পুত্র মহেশ বাবুর সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। শিবসুন্দরী তাঁর 'চাঁদে'র মতো ছেলের পাশে 'শেওড়া গাছে পেত্নী'-র মতো বউ দেখে বধূবরণ পর্যন্ত করেননি। সেই অপমানের জ্বালা কোনও দিনও ভুলতে পারেনি মনোরমা এবং তিনি সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী হওয়ার পর তাঁর প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাতেই শিবসুন্দরীকে সরে যেতে হয়েছে একপাশে। এমনকী স্বামী মহেশবাবু যখন শ্যামবর্ণা বিনুকে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বধূরূপে পছন্দ করে নিয়ে আসেন তখনও মনোরমা বহুকালের চাপা অভিমানে গুমরে ওঠেন, "যে শ্যামবর্ণের প্রতি তোমাদের ঘৃণা তাচ্ছিল্যের সীমা ছিল না, সেই শ্যামলাকেই তো নিজে পছন্দ করিয়া গৃহে আনিয়াছ। তখন তোষ হইয়াছিল, এখন দোষ হয় না?" অবশ্য মনোরমার হৃদয় স্নেহশূন্য নয়, পুত্রবধূর প্রতি বিরূপতার ঘন মেঘের পিছনে স্নেহের রূপালি আলোও দৃশ্যগোচর হয়। মনোরমার তিন কন্যা ভানুমতী, সরস্বতী এবং মধুমতী যেমন মুখরা, তেমন কর্মপটু। এর মধ্যে ভানুমতী, মধুমতী বিবাহিতা, উৎসব উপলক্ষে তাদের পিতৃগৃহে আগমন। রন্ধনশালার বিশাল কর্মযজ্ঞ দু'হাতে সামলানোর সময় তাদের মেজাজে রৌদ্রছায়ার আনাগোনা। স্বামী সমাগমে তারা খুশি, বিরহে বিষণ্ণ, আমার দাম্পত্য কলহ হলে তারও ছাপ পড়ে ব্যবহারে। একমাত্র অকালবিধবা সরস্বতীর জীবন বৈশাখের শস্যহীন ফাটলধরা মাঠের মতো রিক্ত, শূন্য। সেই শূন্যতার কারণেই সে ছিদ্রান্বেষী, তার তিক্ততা কখনও ঘোচে না, ভ্রাতৃবধূ এবং ভগিনীদের স্বামী সম্মেলন সে সহ্য করতে পারে না এবং নিজে আঁকড়ে ধরে থাকে বিধবার শুচিতা এবং আচার নিষ্ঠা। "মনোরমা অনাথ মেয়ের অন্যায় অবিচার নিঃশব্দে সহ্য করিয়া যান। তাহার পরিপূর্ণ সুখের সংসারে সরস্বতী মূর্তিমতী অশান্তি, শান্তির কুঞ্জকাননে দুঃখের

দাবানল।" এই সংসারে আর একজন আশ্রিতা বিধবা মহেশবাবুর কাকিমা নিঃসন্তান তুলসী ঠাকুরানি। অতি অল্প বয়সে বিধবা হওয়ার পর থেকেই এই পরিবারের সন্তান পালন থেকে রন্ধন পর্যন্ত বিভিন্ন কাজে সঁপে দিয়েছেন নিজেকে। অনাথা বৃদ্ধাটি যেন নিজের ভাত কাপড় এবং আশ্রয়ের মূল্য শোধ করে চলেন প্রতিদিন।

বিনুর চোখ দিয়ে রায়বাড়ির বাইরেও পল্লীগ্রামের নারীজীবনের কিছু ছবি আমরা দেখি এই উপন্যাসে। মাতামহের গ্রাম হরিরামপুরে গিয়ে সেখানকার অতিশয় সমৃদ্ধশালী জমিদার চৌধুরীদের অন্তঃপুরে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে প্রবেশ করে বিনু। দেখে জমিদারের অপরূপ রূপসী দুই স্ত্রীকে, কিন্তু এক বিষাদ বলয় যেন ঘিরে রেখেছে তাদের। পরে সে শোনে বজরায় চড়ে জমিদারবাবুর বাগানবাড়িতে নৈশ অভিসারের কথা। এও জানতে পারে এই 'অন্য নারী'দের অনেকেই হয়তো গৃহস্থ ঘরের অল্পবয়সি বিধবা। তারা কেউ অনিচ্ছায়, আবার কেউ বা দেওর ভাসুরের সংসারে দাসীবৃত্তি থেকে রেহাই পেতে স্বেচ্ছায় বাবুর বাগানবাড়িতে গিয়ে ওঠে। পিতৃগৃহ পাথরকুচিতে গিয়ে বিনু জানতে পারে তার শৈশবের সঙ্গিনী বিকলাঙ্গ আকাশির বিবাহ স্থির হয়েছে। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ টাকা নিয়ে আকাশির কুমারী নাম ঘোচাতে রাজি হয়েছে— উদ্দেশ্য এই টাকায় একটি সুস্থ স্বাভাবিক মেয়েকে বিয়ে করে সংসার পাততে পারবে সে। আকাশি জানে কোনও দিন স্বামীর সংসার করা হবে না তার। তবু সে সুখী পিতার দুর্নাম ঘোচাতে পেরে, ছোট বোনের বিয়ের পথ বাধামুক্ত করতে পেরে। এইভাবে আসেন জীবন্ত কিংবদন্তিতে পরিণত ঠাকুর কন্যার কথা যিনি বিরাট ধনী জমিদার বংশের বধূ হয়েছিলেন, বিধবা হয়ে পিতৃ পরিবারে ফিরে আসেন প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে। অর্থের লোভে পরিবারের সকলে মাথায় করে রাখে তাঁকে। আর তিনি নিজে গ্রামের সকলের তত্ত্বতলাস নিয়ে এবং দান ধ্যান করে বেড়ান। বিনুর চোখের সামনেই একদিন তাদের প্রজা এবং প্রতিবেশী মথুর দত্তের দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী ললিতা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। সন্তান কামনায় দ্বিতীয় বিবাহ করেছিলেন মথুর দত্ত, স্ত্রীকে মাথায় করে রাখতেন। তবু কে বলতে পারে অপর্যাপ্ত বস্ত্রালঙ্কার, নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে ললিতা কেন পা বাড়াল অজানা পথে! যৌবনের রঙ্গরসে পরিপূর্ণ মেয়েটির কাছে কেন অসহ্য বোধ হয় প্রৌঢ় স্বামীর গৃহ!

এমনই বহু বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ উপন্যাসে বর্ণিত এই নারীবিশ্ব। পুরোটাই দেখা হয়েছে বিনুর চোখ দিয়ে, ফলে অসম্পূর্ণ থেকে গেছে কোনও কোনও ছবি, কোনওটির বা শুধুই আভাসটুকু মেলে। কিন্তু একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট। অন্তঃপুরের এই জগতের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর যোগাযোগ অত্যন্ত ক্ষীণ, এ চলে তার নিজস্ব নিয়মে। কিন্তু পিতৃতন্ত্র অদৃশ্য বিধাতার মতো নিয়ন্ত্রণ করে এই জগতের মানুষগুলিকে। নিঃসম্বল বিধবা থেকে জমিদার গৃহিণী, বালিকা থেকে বৃদ্ধা সকলের ভাগ্যই তাদের অভিভাবক পুরুষটি— তিনি পিতা হোন বা স্বামী কিংবা পুত্র— তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছা বা আচরণের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। শাশুড়ি-বউ-এর রেষারেষি কিংবা ভ্রাতৃবধূ-ননদিনীর পারস্পরিক ঈর্ষার প্রকৃত কারণ, পুরুষের উপর অসহায় নির্ভরতা থেকে উদ্ভূত এক মূলগত অনিশ্চয়তাবোধ। বিনুও যে তার শ্বশুরগৃহে শত বিরূপতার এবং তিরস্কার সহ্য করে ধীরে ধীরে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, তার

কারণ প্রসাদ— তার রূপবান, গুণবান, অনুরাগী স্বামী— "শ্যামল বনান্তর হইতে ক্ষুদ্র পাখিটিকে ধরিয়া আনিয়া সোনার খাঁচায় আবদ্ধ করা হইয়াছে। পিঞ্জরের সুতীক্ষ্ণ শলা তাহার সর্বাঙ্গে খচ খচ করিয়া বিঁধিতেছে। তবু এই অন্ধকার পিঞ্জরে এক হীরক প্রদীপ মৃদুমধুর জ্বলিতেছে, সে হইল প্রসাদ, যাহার করপল্লবে একদিন বিনুর বাবা তাহার কম্পিত হস্তখানি তুলিয়া দিয়াছিলেন।" কলকাতার কলেজে পড়ে প্রসাদ। ছুটিতে বাড়িতে এলেও রাতের নিরালা কয়েকটি ঘণ্টার বাইরে বিনু তার স্বামীকে কাছে পায় না। তবু সে তার কাছে একটি খোলা জানালার মতো। প্রসাদ স্ত্রীর শিক্ষায় আগ্রহী। তাই সে ইংরেজি-বাংলা পাঠ্যবই-এর প্রথম ভাগ নিয়ে আসে। পূজার উপহার দেখে বিনুর মুখ ভার হয়। এর চাইতে বরং সাহেব-মেম পুতুল আনলে সে অনেক খুশি হত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অপূর্ব রসলোকের আভাসে মধুভাণ্ডে মক্ষিকার মতো মজা যায় তার মন। প্রসাদের আনা গ্রামোফোনে রবীন্দ্রনাথের গান শুনে তার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ফিরে যাওয়ার আগে প্রসাদের প্রশ্নের উত্তরে সে বলে পরের বার তার জন্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই আনতে।

উপন্যাসের প্রথমে বিনুর পরিচয় দিতে গিয়ে লেখিকা বলেন, "হিসাবে তাহার বয়সের গাছ পাথর না থাকিলেও আসলে তাহার বয়স বারো উত্তীর্ণ হইয়া তেরোয় চলিতেছে। পল্লিগ্রামের বিচারে বয়সটা তেমন কাঁচা বলা চলে না। সাধারণত এ বয়সের মেয়েরা ইঁচরে পাকিয়া ঝানু হইয়া যায়, কিন্তু বিনু তেমন নহে, কেমন যেন ছিটগ্রস্ত।" বিনু যে 'পেকে ঝানু' হয়ে যায়নি অন্তঃপুরের কঠিন অনুশাসনে বাঁধা পড়েও, তার কারণ তার সৃজনী শক্তি। এবং সেই কারণেই তাকে মনে হয় 'ছিটগ্রস্ত'। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের কেন্দ্রে যে পরিবার সেখানে মেয়েদের এমন সব 'বাতিকে'র কোনও স্থান নেই। প্রসাদের এনে দেওয়া বইগুলি— বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস, মধুসূদনের কাব্য পড়তে পড়তে বিনুর চোখের সামনে খাঁচার দরজাটা যেন একটু একটু করে খুলতে থাকে। কিন্তু সত্যিই কি মুক্তি সম্ভব! পায়ের শিকল কাটবে কি এত সহজে! হাতের লেখা মক্সো করার খাতায় স্ত্রীর স্বরচিত কবিতা স্নিগ্ধ কৌতুকে উপভোগ করলেও প্রসাদের মনে কিন্তু স্ত্রীকে শিক্ষাদান সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট ছাঁচ ছিল, "তুমি লেখাপড়া শিখলে পরে জানতে পারবে শিক্ষার উপযোগিতা। আজ ছোট আছে, চিরকাল তা থাকবে না। তোমার জন্য গৃহিণীর পদ, জননীর পদ অপেক্ষা করে রয়েছে। ধর্মে কর্মে তোমাকে উন্নত হতে হবে। আমরা করে যাব দেশের সেবা। আমাদের সন্তানদের শিক্ষা দিয়ে প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হবে।"

অর্থাৎ, কিছুটা সনাতন হিন্দু ঐতিহ্যবাহী, কিছুটা ইংরেজি ভিক্টোরীয় গার্হস্থ্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বদেশিযুগের ভদ্রলোকেরা তাঁদের স্ত্রীদের তৈরি করে নেওয়ার কথা ভাবতেন। সাবেকিয়ানা এবং ঔপনিবেশিকতার টানাপোড়েনে অন্তঃপুরে মেয়েদের 'উপযুক্ত শিক্ষালাভ' বিষয়টিই হয়ে দাঁড়ায় এক জটিল প্রক্রিয়া। এই উপন্যাসে তাই আমরা দেখি সারাদিন সংসারের যাঁতায় পিষ্ট হওয়ার পর গভীর রাত পর্যন্ত ঘুমের সঙ্গে লড়াই করতে করতে বালিকা বধূটিকে স্বামীর কাছে পাঠ নিতে হয়। আবার ভোর হতে না হতে তার স্বামীই তাকে ঠেলে তুলে দেয় গৃহকর্মের জন্য। বিনু কিন্তু জেন আয়ারের মতো মুক্তির জন্য

হাহাকার করে না। তার কাছে বইপড়া বা কবিতা লেখা রান্নাবান্না, ব্রতপালন, পশম বোনা পড়াশোনার বিকল্প নয়, পরিপূরক রূপে প্রতিভাত হয়। এই ভাবেই গড়ে উঠেছিল স্বদেশি যুগে নারীত্বের আদর্শ। *The Madwoman in the Attic* বইতে গিলবার্ট এবং গুবার এডোয়ার্ড সঈদের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করে দেখান যে 'author'-এর সঙ্গে 'authority'-র এক অন্তরঙ্গ যোগসূত্র আছে। পুরুষই সমাজে ক্ষমতার কেন্দ্রে এবং তার লেখনিও সেই ক্ষমতারই বাহক। সেই কারণেই নারী-লেখকদের মধ্যে দেখা যায় 'anxiety of authorship'। গৃহকর্ম, সাংসারিক দায়িত্ব পালন এবং সৃজনশীলতা এই দুই-এর মাঝে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাওয়া নারীসত্তার কথা বলেন লেখিকাদ্বয়। বিনুর মধ্যে আমরা এই দ্বন্দ্বকে দেখি না। যে দোলাচলতা কিয়ৎ পরিমাণে চারুলতা বা বিমলার মধ্যে দেখিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, বিনুতে তাও পাওয়া যায় না।

এই উপন্যাসে ঠাকুমা শিবসুন্দরী যেন বিনুর অপর সত্তা বা alter ego। তিনিও স্বভাবকবি, মুখে মুখে অনর্গল ছড়া কাটেন। "তাঁহার প্রতি কথায় ছড়া-পাঁচালির ফুলঝুরি ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িত। সে ছড়ার কতক প্রচলিত, কতক স্বরচিত।" কিন্তু পরিবারের সদস্যদের চোখে এর মূল্য নেই। তারা তাঁকে এড়িয়ে চলে 'বকবকানি' শোনার ভয়ে, আড়ালে টিপ্পুনি কাটে। কিন্তু বিনু কোথাও যেন মায়া অনুভব করে বৃদ্ধার জন্য, তাঁর আবদারগুলি যথা সম্ভব মেটানোর চেষ্টা করে। ঠাকুমা আদর করে নাতবউকে ডাকেন 'মনিমালা'। তাঁর হাতে তুলে দেন সযত্নে লুকিয়ে রাখা লক্ষ্মীর কৌটা। এই কৌটাটি যেন তাঁর প্রতীক। শুধুমাত্র রায় বংশের ধনসম্পদ নয়, তাঁর হৃদয়ের অন্তঃসলিলা কবিত্বশক্তির উত্তরাধিকারও যেন তিনি দিয়ে যান উত্তর প্রজন্মকে।

গিরিবালা দেবীর চাইতে বয়সে চার বছরের ছোট জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৪-১৯৮৮ খ্রি.)। তবে সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব গিরিবালার প্রায় তিরিশ বছর আগে। মাত্র দশ বছর বয়সে বিবাহ হয় বাংলা দেশের হুগলি জেলায়। পঁচিশ বছর বয়সে যখন বিধবা হন তখন জ্যেষ্ঠ সন্তানের বয়স নয়, সর্ব কনিষ্ঠটি তিন মাসের। ছ'টি নাবালক পুত্র কন্যাকে নিয়ে ফিরে যান পিতৃগৃহে। হিন্দু সমাজের উচ্চঘরের বিধবার জন্য নির্দিষ্ট পালনীয় যা কিছু নির্বিবাদে মেনে নেন। কিন্তু সে তো অভ্যাসের ধর্ম। হৃদয় এবং মস্তিষ্কের খাদ্য হিসাবে তা তাঁর কাছে যথেষ্ট হয়নি। মনন জগতের তীব্র নিঃসঙ্গতা বোধ থেকে মুক্তি পেতে নেমে আসেন সাহিত্যের আঙিনায়। অজস্র পড়তেন, মহাকাব্য-পুরাণ-ভক্তিসাহিত্য থেকে শুরু করে বের্গসঁর দর্শন কিংবা ইবসেনের নোরাকে নিয়েও মাথা ঘামাতেন। আবার খবরের কাগজ থেকে অসীম কৌতূহল ভরে খুঁটিয়ে সংগ্রহ করতেন রাজনীতির হাল হকিকত। সমকালীন গিরিবালা দেবীর সঙ্গে প্রতিতুলনায় বলা যায়, গিরিবালার ভাবনার গতি যদি উল্লম্ব হয় তবে জ্যোতির্ময়ীর একই সঙ্গে উল্লম্ব এবং আনুভূমিক। অর্থাৎ গিরিবালা মনোনিবেশ করেছেন পল্লীগ্রামের অন্তঃপুরের খুঁটিনাটি বর্ণনায় এবং সেই জমাট বিবরণের মধ্যে থেকে উঠে এসেছে নারীজীবনের একটা নকশা। আর অন্য দিকে জ্যোতির্ময়ীর লেখনী দেশভাগের ট্রাজেডি, রাজস্থানের প্রত্যন্ত প্রদেশে নারীর জীবন, বারাণসীর হিন্দু বিধবা থেকে

পতিতালয়ের নারীদের জীবন, হরিজন সম্প্রদায়ের অবস্থা প্রভৃতি বহু বিচিত্র ও বিস্তৃত পরিসরে ঘোরাফেরা করেছে। নিজে নিষ্ঠাবতী বিধবার জীবনযাপন করলেও নারীর জন্য নির্ধারিত পিতৃতন্ত্রের অনুশাসনগুলি যে কত বড় ফাঁদ তা তিনি বুঝে নিয়েছিলেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র আঠাশ-উনত্রিশ বছর সেই সময় ১৩২৮ সালের আষাঢ় মাসের *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর 'নারীর কথা'। এখানে তিনি লেখেন, "মহিলা শিক্ষার কথা উঠলেই পুরুষেরা ভয় পেয়ে যান— পাছে ওই উৎপীড়িতারা উৎপীড়ন বুঝতে পারেন, পরে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন, যথেচ্ছাচার সহ্য না করেন। তাই কত রকম করে বলা হয় ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমরা পবিত্র ভারতবর্ষের পুণ্য আদর্শ থেকে বিচ্যুত হচ্ছি। সৌভাগ্যক্রমে মহিলারা এখনও পাশ্চাত্য শিক্ষা পাননি, তাই সনাতন ধর্মের কঙ্কালটা আছে (কঙ্কালই বটে)। অতএব তোমরা আর শুদ্ধান্তঃপুরে স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিও না।"[১৩] ভাবতে আশ্চর্য লাগে একজন নারীর এই উপলব্ধি বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে দাঁড়িয়ে। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে কেট মিলেট *Sexual Politics* লেখার বহু আগেই সমাজে নারী পুরুষের অবস্থানগত রাজনীতির চেহারাটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন জ্যোতির্ময়ী। শুধু তাই নয়, বাইরে পাশ্চাত্য শিক্ষার পালে ভর করে আধুনিকতার ধ্বজা উড়িয়ে চলা আর অন্তঃপুরে ঐতিহ্য এবং সংস্কারের নামে অশিক্ষার মধ্যযুগীয় অন্ধকারকে কায়েম রাখা ঔপনিবেশিক বাঙালির পশ্চাৎঅপসরণকেও চিনে নিতে ভুল হয়নি তাঁর।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর দৃষ্টিতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে তা হল মেয়েদের আর্থিক স্বনির্ভরতা যা তাদের আত্মমর্যাদা বোধের অঙ্গ হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন। যা মেয়েদের কাদায় তৈরি মাটির পুতুল থেকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ করে তোলে। জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর প্রথম উপন্যাস *ছায়াপথ*-এ এই বিষয়টিকে স্থান দিয়েছেন। নায়িকা সুপ্রিয়া পণপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় আবার প্রেমিকের অনুরোধে নিজের যত্নলব্ধ স্কুলের চাকরিটি ছেড়ে দিতেও রাজি হয় না। পারিবারিক সংহতি রক্ষার জন্য সমঝোতার দায় কি একা মেয়েদের! সকলের চোখে 'ভাল মেয়ে' নাম কিনতে কেন নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছার কণ্ঠরোধ করতে হবে বারংবার! একই ভাবে *বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ* উপন্যাসে বিয়ের বাজারে পেছনের সারিতে থাকা 'কালো মেয়ে' বীণা স্বোপার্জিত অর্থে জীবনধারণের স্বাদ নিতে নিতে নিজের ব্যক্তিত্বকে নতুন ভাবে গড়ে তোলে। তার প্রশ্ন, জীবনে সফলতা পেতে হলে দাম দিতে হয় নারী-পুরুষ উভয়কেই, তবে নারী কেন বঞ্চিত হবে সেই সাফল্যের স্বীকৃতি থেকে! সে এও বুঝিয়ে দেয় 'নারী সুলভ' আচরণ পরিহার করার অর্থই 'সুলভ নারী' হয়ে যাওয়া নয়।

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা উপন্যাসে জ্যোতির্ময়ী দেবীর এই ভাবনারই সম্প্রসারণ ঘটেছে আরও ব্যপ্ততর প্রেক্ষিতে। মানুষের সভ্যতা বহু যুদ্ধ, বহু হত্যা, সময়ের বহু আগ্নেয় স্রোত পেরিয়ে বর্তমানে এসে পৌঁছেছে। পুরাণে, মহাকাব্যে, ইতিহাসে বিধৃত আছে সেই কাহিনি। কিন্তু সবটাই কি বলা হয়েছে তাতে! নাকি কিছু কথা যুগ যুগান্ত ধরে চাপা পড়ে থেকেছে মাটির তলায়, বিস্মৃতির অতলে! জ্যোতির্ময়ী তাঁর উপন্যাসে তুলে আনতে চান মহাকাব্যে-ইতিহাসে উপেক্ষিত সেই 'স্ত্রী পর্ব'কে। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর 'স্ত্রী পর্ব' নামে

একটি অধ্যায় আছে। যেখানে শতপুত্র হারিয়ে ক্রুদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র ভীমসেন ভ্রমে লোহার ভীম চূর্ণ করেন, গান্ধারী কৃষ্ণকে অভিশাপ দেন। সেখানে আছে ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী সহ অন্যান্য কৌরবপক্ষীয়দের শোক জ্ঞাপনের প্রসঙ্গ। কিন্তু নেই সেই সব অগণিত নারীর কথা যারা এই মহাযুদ্ধে স্বামী, সন্তান কিংবা পিতাকে হারিয়ে নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, মহাভারতকার একটি শ্লোকও ব্যয় করেন না সেই সব যাদব রমণীদের জন্য যাদের অর্জুনের চোখের সামনে থেকে লুঠ করে নিয়ে গিয়েছিল অর্বাচীন দস্যুদল। কেমন ছিল সেই বিধবা, পুত্রহীন বা লুণ্ঠিতা নারীদের পরবর্তী জীবন! মহাকবির কলম তার সীমানাতে এসেই থমকে যায়। শুধুমাত্র মহাকাব্য নয়, যুদ্ধ বা রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাসও এই 'স্ত্রী পর্ব' নিয়ে নীরব। জ্যোতির্ময়ী দেবী সেই অনুচ্চারিত অধ্যায়কে ভাষা দিতে চান। ১৯৪৬-এর দাঙ্গা এবং '৪৭-এর দেশভাগ ও স্বাধীনতার পটভূমিতে লেখা *এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা* উপন্যাসের নাম তাই প্রাথমিক ভাবে তিনি দিয়েছিলেন 'ইতিহাস স্ত্রী পর্ব'। উপন্যাসের ভূমিকা 'আমার কথা'-তে জ্যোতির্ময়ী লেখেন, "সে কথা লেখেননি ব্যসদেব। কোন কালি কোন ধূর্জপত্রে সে কথা কোন পুরুষ কবি লিখবেন? সে কালি, কাগজ, লেখনীর আজও পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি। মহাকবি হলেও পুরুষ, কাপুরুষের নারীদেহের ওপর সেই অত্যাচারের বর্বর লাঞ্ছনার কাহিনি লিখতে পারেন না। লজ্জা ধিক্কারে তাঁর লেখনী অভিভূত মূক স্তব্ধ হয়ে যায়। তাই পুরুষ-কবি সে কথা লেখেননি। কাপুরুষতো ইতিহাস লেখে না! নারীকবি মহাকবি নেই। থাকলেও নিজেদের মান, লজ্জা, মর্যাদা, সম্ভ্রমহানির কথা লিখতে পারতেন না। সে ভাষা আজও পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি। তাই স্ত্রী পর্বের কোনো ইতিহাস নেই।"[১৪]

বঙ্গভূমির ইতিহাসে সব চাইতে ভয়ংকর সময় চল্লিশের দশক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, নোয়াখালি-কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা— এত হত্যা, এত রক্ত মধ্যযুগও দেখেনি কখনও। তারপর ১৯৪৭-এ বহু স্বপ্নের এবং স্বপ্নভঙ্গের স্বাধীনতা। সে কি সুখের সময়! সে কি দুঃখের সময়! কে বলতে পারে! একদিন যারা উন্মাদ আক্রোশে পরস্পরকে হত্যা করেছে, ঘর জ্বালিয়েছে, ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্ত্রী-কন্যাদের তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছে তারাই দেশভাগ ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগঠনের পর নিজের ঘর গোছাতে আর সিন্দুক সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। খবরের কাগজে বিবৃতি বেরিয়েছে— সব কিছু স্বাভাবিক, শান্ত, নারকীয় হত্যালীলার উপর নেমে এসেছে যবনিকা। জ্যোতির্ময়ী তাঁর উপন্যাসে সেই যবনিকা উত্তোলন করেন— ইতিহাসে উপেক্ষিত স্ত্রী পর্বের একটি চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয় পাদপ্রদীপের আলোয়— সুতারা।

নোয়াখালির দাঙ্গায় কিশোরী সুতারা তার বাবা, মা এবং বিবাহিতা দিদিকে হারিয়েছিল। তাদের বাড়িতে খেয়েপরে মানুষ দুই ভৃত্য রহিম এবং করিমই পথ দেখিয়ে দিয়েছিল হত্যাকারীদের। তার বাবা নির্বিরোধী স্কুলমাস্টার গোপালবাবু ঘাতকের ছুরির আঘাতে প্রাণ হারান, মা ঝাঁপ দেন খিরকি পুকুরে, দিদিকে তুলে নিয়ে যায় কোথায় কেউ জানে না। সুতারা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল একপাশে, তাকে উদ্ধার করে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেন তাদের আজন্মকালের প্রতিবেশী পিতৃবন্ধু তামিজুদ্দিন সাহেব। তামিজুদ্দিন সাহেবের কন্যা

সাকিনা সুতারার সহপাঠিনী, খেলার সাথী। তাঁর স্ত্রী কন্যাসমা হতভাগ্য মেয়েটিকে বুকে আগলে রাখেন, শুশ্রূষা করেন তার শরীর এবং মনের ক্ষতগুলির। ইতিমধ্যে কলকাতায় সুতারার তিন দাদা এবং ভগ্নিপতির কাছে খবর যায়। তাদের দিক থেকে তেমন আগ্রহের সাড়া না মিললেও তামিজুদ্দিন আপন দায়িত্ববোধ থেকে সুতারাকে পৌঁছে দেন কলকাতায় আত্মীয়দের কাছে। আর তারপর থেকেই প্রতি মুহূর্তের স্বপ্নভঙ্গ নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই শুরু হয় সুতারার। বিগত ছয় সাত মাস সেই ভয়ংকর রাত্রির স্মৃতি যেন তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আর তাকে স্নেহে, ভালবাসায়, যত্নে আগলে রেখেছিলেন তামিজুদ্দিন সাহেবের পরিবারের সকলে মিলে। কিন্তু দাদা সনতের শ্বশুরবাড়িতে পদার্পণের মুহূর্ত থেকে তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় সে অনাকাঙ্ক্ষিত। শুধু তাই নয়, বাড়ির বর্ষীয়সী মহিলাদের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য নানা মন্তব্য বুঝিয়ে দেয় দাঙ্গায় বাপ-মা খোয়ানো, মুসলমানের বাড়িতে দিন কাটিয়ে আসা মেয়ে না জানি কী ভয়ংকর জীব! তাকে বাড়িতে স্থান দেওয়ার অর্থ নিজেদেরই বিপদ ডেকে আনা। তাঁদের কেউ বলেন, "...এতদিন ধরে মুসলমানের ঘরে পড়েছিল। এক-আধদিন নয়, ছ'মাসের ওপর। তাতে কি আর মেয়ে মানুষের জাত জন্ম থাকে।..." আবার কারও বা মন্তব্য, "ছুঁড়িকে আনতে বললে কে? থাকতো সেখানেই। যা হয় হতো, যখন ওর কপালে এমন ঘটনা হলোই। আকছার অমন মেয়েরা ও দেশে পড়ে থাকছে। কে আর নিজের ঘরে ওদের এনে নোঙরা করবে!" সেই দুর্যোগের রাত্রিতে হামলাকারীদের নজর এড়িয়ে যেতে পেরেছিল সুতারা কিন্তু 'শত্রুপুরী' ছেড়ে 'আপনজনেদের' কাছে আসার পর প্রতিদিন, মুহূর্তে তাকে মানসিক ভাবে ধর্ষিত হতে হয়। লক্ষণীয় এই সমস্ত ক্ষেত্রে মেয়েরাই মেয়েদের সবচাইতে বড় সমালোচক হয়ে দাঁড়ায় এবং এখানেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। দাদা সনতের শ্বশ্রূমাতার চোখে সুতারা হয়ে দাঁড়ায় সুখের সংসারের মাঝে মূর্তিমতি বিঘ্নস্বরূপ, সাত ঘাটের জল খেয়ে আসা একটি মেয়ে। যাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেওয়া যায় না, নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশতে দেওয়া যায় না, যে বাড়িতে থাকলে অন্যান্য মেয়েদের বিয়ে দেওয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। হয়তো স্বভাবের এই ক্ষুদ্রতার কারণ সেই গভীর গোপন অনিশ্চয়তা বোধ। বাইরের পৃথিবীটা সংকীর্ণ বলেই মেয়েরা এমন আত্মসর্বস্ব স্বার্থপরতায় আঁকড়ে ধরতে চায় নিজের সংসারটুকুকে। গৃহকর্তা অমূল্যবাবু অসহায় মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে হৃদয়ে করুণার আলোড়ন অনুভব করলেও বয়সের অভিজ্ঞতা দিয়ে বোঝেন সুতারাকে বাড়িতে রাখতে চাইলে অশান্তিই শুধুমাত্র বেড়ে চলবে। সবদিক বজায় রাখতে সুতারাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মিশনারি হস্টেলে। যেন প্রায় বেড়াল পার করার মতো করে আপদ বিদায় করা হয়। হস্টেলে থেকেই সুতারা স্কুল ছাড়িয়ে কলেজে ঢোকে সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়। মাঝের বছরগুলিতে ছুটিছাটাতে আত্মীয়স্বজনেরা কেউ ডাকে না বাড়িতে, নানা অজুহাতে এড়িয়ে যায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের এই অবাঞ্ছিত অস্তিত্বটাকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিতে শেখে সুতারা। পড়াশোনা শেষ হওয়ার পর প্রথম সুযোগেই চাকরি নিয়ে চলে যায় দিল্লির কাছে যাজ্ঞসেনী মহিলা কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপিকা হয়ে। আর্থিক স্বনির্ভরতা হয়তো কিছুটা স্বস্তি দেয় তাকে, কিন্তু সুখ! সে তো

ইন্দ্রধনু ধরার মতোই অলীক। সুতারার অনিকেত অস্তিত্বের ঠাঁই বদল হয় না। কলেজের স্টাফ কোয়ার্টার তো কারও ফিরে যাওয়ার ঘর হতে পারে না। স্রোতের শ্যাওলার মতো ভেসে বেড়াতে বেড়াতে সে ভুলতে বসে তারও স্বজন থাকতে পারে, হতে পারে একটি নিজস্ব সংসার। তবে বাংলা দেশের সীমানা ছাড়িয়ে দূরে চলে আসায় সুতারার অভিজ্ঞতার পরিধি কিছুটা বিস্তার লাভ করে। সে দেখে বাংলা দেশের মতোই বিভক্ত পাঞ্জাবের বহু পরিবার তাদের স্বজনদের হারিয়েছে। সেই ক্ষত থেকে এত বছর পরেও রক্তক্ষরণ হয়। স্বাধীন রাষ্ট্রের আত্মস্থ, তৃপ্ত মুখের আড়ালে এ অন্য এক মুখ। এমন ভাবেই নিঃসঙ্গতার গণ্ডি ভেঙে নিজেকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করেছিল সুতারা আরও অনেক মানুষের অব্যক্ত ব্যথার শরিক রূপে। কিন্তু দুটি ঘটনা তার একার পৃথিবীটাকে হঠাৎই এলোমেলো করে দিয়ে যায়।

তামিজুদ্দিন সাহেবের মেয়ে সাকিনা স্বামীসহ দেখা করতে আসে সুতারার সঙ্গে একটি অভিনব প্রস্তাব নিয়ে। তার মা পুত্রবধূ রূপে পেতে চান সুতারাকে। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আজিজুদ্দিন ভাল চাকরি করে করাচিতে, সে উপযুক্ত, উচ্চশিক্ষিত। এই প্রস্তাবে সুতারার অন্তরাত্মা পর্যন্ত শিউরে ওঠে। তামিজসাহেবের পরিবারের সকলে তার আত্মীয়ের অধিক, তাঁদের ঋণ জীবনে শোধ হবার নয়। কিন্তু কীভাবে সে ভুলে যাবে বাবা, মা, দিদির মর্মান্তিক মৃত্যুকে! বিবাহ মানে তো সেই সম্প্রদায়ের রক্ত-মাংস-মজ্জায় মিশে যাওয়া, তার সন্তান তো এদেরই পরিচয় বহন করে বড় হবে! আর তার স্বজন হারানো, এতগুলো বছরের লড়াই সব মিথ্যে হয়ে যাবে, মুছে যাবে পৃথিবী থেকে! সুতারা তা সহ্য করবে কীভাবে! এই সংকট সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে ওঠার আগেই আসে প্রমোদ— দাদা সনতের শ্যালক। প্রমোদ তার কিশোর বয়সে সুতারাকে দেখেছে তাদের বাড়িতে। বয়স অল্প হলেও অনাশ্রিত মেয়েটির লাঞ্ছনা, অপমান বুঝতে ভুল হয়নি তার। ক্রমশ সুতারার আর্ত, অসহায় মুখটি প্রমোদের হৃদয়ে গভীর রঙে আঁকা হয়ে গেছে। প্রমোদ জানে না একে ভালবাসা বলে কিনা। কিন্তু অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে সে জেনেছে দেশ ভাগের ইতিহাস, দেখেছে রাষ্ট্রিক চক্রান্তের ফাঁদে পড়ে কীভাবে অগণিত মানুষ তাদের সর্বস্ব হারিয়েছে— আর এদের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে স্মৃতিপটে বিধৃত আরও একটি বিষণ্ন মুখ। প্রমোদের বিবাহের প্রস্তাবে নতুন ভাবে আলোড়িত হয় সুতারা। এক অজানা আবেগ প্লাবিত করে তার হৃদয়ের স্বরূপ। শুধুমাত্র প্রমোদের মুখ, তার আশ্বাসে ভরা কথাগুলি দিকচিহ্নহীন অন্ধকার সমুদ্রের মাঝে সুদূর এক বাতিঘরের আলোর মতো দুলতে থাকে সুতারার চোখের সামনে।

এই উপন্যাসে সুতারা স্বয়ং যেন প্রচ্ছন্ন স্বদেশ। তাকে কেউ নিজের স্বার্থে দ্বিখণ্ডিত করে আর কেউবা বা লাঞ্ছিত, আশ্রয়হীন। আবার একই সঙ্গে সে সীতা, দ্রৌপদী, অম্বা, লুণ্ঠিতা দ্বারকা রমণীরা কিংবা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মৃত সৈনিকের স্ত্রী অথবা কন্যাদেরও একজন। জ্যোতির্ময়ী যেন এক বাহু দিয়ে ইতিহাসকে ছুঁয়েছেন। দেখিয়েছেন রামায়ণ মহাভারতের কাল থেকে শুরু করে আজকের সময় পর্যন্ত পুরুষশাসিত রাষ্ট্রব্যবস্থার গভীরে সমাহিত থেকেছে উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত এক একটি স্ত্রী পর্ব।

বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করে বলেছিলেন বাঙালির ইতিহাস নেই। সেই ইতিহাসের খোঁজেই তাঁর উপন্যাসের বারংবার অতীতযাত্রা। তথ্যের খুঁদকুড়োর সঙ্গে কিংবদন্তি এবং কল্পনাকে মিশিয়ে *মৃণালিনী*, *দেবী চৌধুরানী*, *আনন্দমঠ*, *সীতারাম*-এ তিনি পুনর্নির্মাণ করার চেষ্টা করেছেন এক বর্ণময় কল্প ইতিহাসের। বঙ্কিম অনুসারী ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র ভারতের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের চারটি অধ্যায়কে অবলম্বন করে লিখেছেন চারটি উপন্যাস যা একত্রে 'শতবর্ষ' নামে পরিচিত। এই প্রবণতার পেছনে কাজ করেছে এক উনিশ শতকীয় ঔপনিবেশিক পিছুটান। পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে মহিমাময়, গৌরবোজ্জ্বল অতীতে ফিরে যাওয়া। বিংশ শতকের প্রথম দশকে রবীন্দ্রনাথের *গোরা*-তে আমরা পেলাম ঔপনিবেশিক সংকীর্ণতা মুক্ত এক বিশ্ববীক্ষা, এক অভিনব 'ভারতবোধ'-কে। নিঃসন্দেহে এই উপন্যাসগুলির মধ্যে দেশ, কাল, সমাজ এবং বাঙালি চেতনার বিবর্তনের এক ইতিহাস ধরা আছে। একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষার দান উদারনৈতিক মানবতাবোধ অন্য দিকে পরাধীনতার গ্লানি— এই দুইয়ের মাঝে এক দ্বান্দ্বিক অবস্থানে থেকে নিরন্তর অভিযোজন প্রক্রিয়া চালাতে চালাতে অভিব্যক্ত হয়েছে বাঙালির মৌলিক চিন্তা। কিন্তু আমরা এখানে যা পাই না তা হল নারীর চেতনা এবং অবস্থানগত বিবর্তনের ইতিহাস। এক একজন ইন্দিরা, ভ্রমর, রোহিনী কিংবা বিনোদিনী, সুচরিতা, বিমলা, দামিনীরা হিমশৈলের ভাসমান অংশের মতো। তাদের দীপ্তিময় উপস্থিতির তলায় নিমজ্জিত, অকথিত থেকে যায় নারী জীবনের বহু বলা না বলা কথা। রাসসুন্দরী বা গিরিবালাদেবীদের রচনাকে বিন্দুমাত্র খর্ব না করেও বলতে হয় সেগুলি খণ্ডচিত্র মাত্র। লেখিকাদের ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আশাপূর্ণা দেবী প্রথম উপন্যাসের ক্যানভাসে আঁকলেন দীর্ঘ এক কালপর্ব জুড়ে নারী জীবনের আলেখ্য।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিক আশাপূর্ণা দেবীও (১৯০৯-১৯৯৫ খ্রি.) কোনও দিন প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ পাননি। সম্ভবত তিনিই রাসসুন্দরীদের কালের শেষ প্রতিনিধি। কোনও দিন স্কুলে না গেলেও অদম্য ইচ্ছায় এবং মায়ের 'প্রকাণ্ড ট্রাঙ্ক ভরা বই'-এর সাহায্যে স্বশিক্ষিত হয়ে ওঠেন। নিতান্ত পুতুল খেলার বয়সে কবিতা লেখা দিয়ে সাহিত্য সাধনার হাতেখড়ি। কিছুদিন ছোটদের জন্য লিখে হাত পাকানোর পর প্রথম বড়দের উপন্যাস *প্রেম ও প্রয়োজন* প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে শারদীয় *আনন্দবাজার পত্রিকায়*। প্রথম উপন্যাসই লেখিকার স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবনার সাক্ষ্য বহন করে। এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র আরতি তার অপদার্থ, দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বামীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে দেওরের বন্ধুর সঙ্গে নতুন করে সংসার পাতে। সমাজ-সংস্কারের ভয়কে উপেক্ষা করে মিথ্যা দাম্পত্যের শিকড় উপড়ে বেরিয়ে আসার মধ্যে আরতির যে আত্মমর্যাদা বোধের প্রকাশ ঘটেছে তার পরিণতি কুড়ি বছর পরে লেখা ট্রিলজি *প্রথম প্রতিশ্রুতি* (ফাল্গুন, ১৩৭১) *সুবর্ণলতা* (চৈত্র, ১৩৭৩) এবং *বকুল কথা* (চৈত্র, ১৩৮০)-এর মধ্যে। তিনটি পর্বে তিনটি প্রজন্মের কথা লেখা হলেও অন্তর্গত এক ঐক্যের সূত্রে এরা এক এবং জৈব যৌগের মতো সংহত এবং দৃঢ় নিবদ্ধ। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু করে বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত প্রায় একশো বছরের বিস্তৃত পটভূমিতে বিধৃত নারী জীবনের ঘর ও বাহিরের

গল্প বলবেন, লিখবেন এক অন্য 'শতবর্ষ'— এই ভাবনা লেখিকার মনে শুরু থেকেই ছিল। সেই কারণে *প্রথম প্রতিশ্রুতি* আরম্ভ হয় বকুলের কথা দিয়ে। সত্যবতীর কন্যা সুবর্ণলতা এবং সুবর্ণলতার কন্যা বকুল তার নিজের কথা বলতে গিয়ে 'মা দিদিমা, পিতামহী আর প্রপিতামহীদের সংগ্রামের ইতিহাস' দিয়ে কাহিনি শুরু করে। লেখিকা *প্রথম প্রতিশ্রুতি* গোড়াটা যেভাবে বেঁধেছেন তা থেকেই বোঝা যায় যে সত্যবতীর শৈশব থেকে যে কাহিনির শুরু তার বৃত্ত সম্পূর্ণ হবে পৌত্রী বকুলের জীবন কথায় এসে। তিন খণ্ডে বিভক্ত হলেও অন্তর্বয়ানে রয়েছে এক অখণ্ড রূপ। এই তিনটি উপন্যাসকে একত্রে বলা যেতে পারে আশাপূর্ণা দেবীর সমগ্র সৃষ্টি কর্মের magnum opus। লেখিকা নিজেও বলেন, "তিন যুগের পৃষ্ঠপটে আঁকা এই তিন কন্যার ছবিই আমার এই সাহিত্য জীবনের প্রধান ফসল।"[১৫]

প্রথম প্রতিশ্রুতি উপন্যাসের কাহিনি সত্যবতীর ন' বছর বয়সে শুরু হয়ে সুবর্ণলতার ন' বছর বয়সে শেষ। এর পটভূমি সত্যবতীর পিতৃগৃহ ও শ্বশুর গৃহ নিত্যানন্দপুর ও বারুইপুর গ্রাম এবং কলকাতা শহর। উপন্যাসে সময়ের যেটুকু ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় স্বামী সন্তানসহ সত্যবতী কলকাতায় এসে বসবাস করতে আরম্ভ করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। কেন না তখন মহারানি ভিক্টোরিয়ার আমল (১৮৫৭ খ্রি.-এর পর) এবং বিধবা বিবাহ (১৮৫৬ খ্রি.) বেশ কিছুদিন চালু হয়ে গেছে। উপন্যাসের শুরুতে সত্যবতী ন' বছরের বালিকা হলেও তত দিনে তার বিবাহের বছর ঘুরে গেছে। আট বছরের কন্যাকে গৌরীদান করে পুণ্য সঞ্চয় করেছিলেন সত্যবতীর পিতা রামকালী চট্টোপাধ্যায়। রামকালী প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দৃঢ় চরিত্রের এক মানুষ, সমগ্র উপন্যাস জুড়ে সত্যবতীর মানসপটে সর্বদা তিনি উপস্থিত। জীবনের কোনও সংকটের মুহূর্তে, কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দ্বিধাবোধ করলে সত্যবতী স্মরণ করেছে তার 'জীবনের ধ্রুবতারা' স্বরূপ পিতাকে। কিন্তু কোনও মানুষের শ্রেষ্ঠত্বই দেশ কালের সীমানার ঊর্ধ্বে নয়। তাই রামকালী আপন কন্যা সন্তানের স্বাতন্ত্র্যকে অনুভব করলেও তার মুক্তির সোপান হতে পারেন না। কেন না তিনিও ভাবেন, "আশ্চর্য! এতটুকু মেয়ে, এত তলিয়ে ভাবে কি করে? আহা মেয়েমানুষ, তাই সবই বৃথা।"[১৬] কিন্তু সত্যবতী 'মেয়ে মানুষ' হলেও সে নিজের জীবনটাকে 'বৃথা' হয়ে যেতে দেয় না। যে মুখরা বালিকাটি তার খেলার সাথীদের ঝাঁঝের সঙ্গে একদিন বলেছিল, "মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষ যেন মায়ের পেটে জন্মায় না, বানের জলে ভেসে আসে। অত যদি মেয়েমানুষ-মেয়েমানুষ করবি তো আমার সঙ্গে খেলতে আসিস নে।" সে শ্বশুরবাড়িতে এসেও অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করে এবং শত অত্যাচারেও নিজের সিদ্ধান্ত থেকে এতটুকু টলে যায় না।

শ্বশুরের রাতে বাগদিনীর বাড়ি যাওয়ার খবরে তীব্র ঘৃণার সঙ্গে সে জানায়, এমন মানুষের শ্রদ্ধা পাওয়ার কোনও যোগ্যতা নেই— সে তাঁকে আর প্রণাম করবে না। অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসার জন্য শহর থেকে সাহেব ডাক্তার আনানো কিংবা গ্রামের বাড়ি ছেড়ে স্বামী পুত্র সহ শহরবাসের সিদ্ধান্তও সে যুগের বিচারে রীতিমতো বৈপ্লবিক ঘটনা। সত্যবতীর স্বামী নবকুমার পড়াশোনা শিখেছে, শহরে এসে চাকরি করেছে, পরিবার প্রতিপালন করেছে

কিন্তু কোনও দিনই তার ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠেনি, গড়ে ওঠেনি নিজস্ব কোনও জীবনভাবনা কিংবা মূল্যবোধ।

সত্যবতী প্রখর বুদ্ধিবলে চিরকাল চালনা করেছে স্বামীকে, অনিমেষ দৃষ্টি রেখেছে যাতে কখনও স্বামী পুত্রদের নৈতিকতায়, ব্যবহারে, কোনও চ্যুতি না ঘটে। কিন্তু তাদের কেউই সত্যবতীর মনের কাছাকাছি পৌঁছতে পারেনি। কখনও তার শৈশবে হারিয়ে যাওয়া জ্যাঠতুত ভাই নেড়ু স্মৃতির গভীর থেকে ভেসে উঠেছে হঠাৎ, শুনিয়েছে তার ভবঘুরে জীবনের গল্প। কিংবা নবকুমারের শিক্ষক ভবতোষবাবুর চোখে সে প্রথম দেখেছে তার প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা এবং তার অনেক গভীরে হয়তো পুরুষের অনুরাগও। কিন্তু এই মানুষগুলি ঢেউ হয়ে এসে তার জীবনের নৌকটাকে একটু দুলিয়ে দিয়ে গেছে মাত্র। ব্যক্তিগত জীবনে সত্যবতীর একাকিত্ব কোনও দিন ঘোচেনি। ভরা সংসারের মাঝে বসে বড় ছেলের বিবাহের প্রস্তুতি নিতে তাই সে হঠাৎই উদাস হয়ে যায়— "কেন মনে হচ্ছে তার কেউ কোথাও নেই, চিরদিন সে একা, চিরদিন নিঃসঙ্গ। তার উপর কারও মায়া নেই, মমতা নেই, ভালবাসা নেই। সে স্নেহ ভালবাসাহীন রুক্ষ মরুভূমির পথ ধরে একা সে চলেছে আর চলেছে।..."

এই উপন্যাসে সত্যবতী-নবকুমার ছাড়াও আরও কয়েকটি দাম্পত্য সম্পর্কের ছবি উঠে এসেছে। বালিকা বয়সে পিতৃগ্রাম নিত্যানন্দপুরে থাকার সময়েই সে দেখেছিল বড় জ্যাঠতুত দাদা রাসুর স্ত্রী-পুত্র থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিবাহ এবং যে বিবাহের হোতা ছিলেন স্বয়ং রামকালী চাটুয্যে। বিবাহ পথ যাত্রী বরের চেহারায় মৃত্যুরোগের লক্ষণ স্পষ্ট দেখে কবিরাজ রামকালী আপন ভ্রাতুষ্পুত্রকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন বিবাহ আসরে। কিন্তু পিতার সামাজিক ঔচিত্যবোধকে মেনে নিতে পারেনি সত্যবতী। সেই বয়সেই সত্যবতীর মনে হয়নি একটি নারীর নিঃসপত্ন অধিকারের চাইতে ব্রাহ্মণের কুলরক্ষার প্রয়োজনটাই বড়। প্রতিবাদ করার জন্য তিরস্কৃত হয়েছে পিতার কাছে কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করতে পারেনি পুরুষশাসিত সমাজের একপেশে বিচার। রাসুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী সারদার মতো অপমানের ধিকি ধিকি আগুন বুকে নিয়ে আজীবন মুখ বুজে কর্তব্য করে যায় কত মেয়েরা কে তার খবর রাখে!

নবকুমারের শিক্ষক ভবতোষের সঙ্গে সত্যবতীর সংসারে আশ্রিতা সুহাসিনীর বিবাহ এই উপন্যাসে সব চাইতে অসম অথচ সর্বাপেক্ষা সার্থক সম্পর্ক। কুলত্যাগিনী মায়ের সন্তান বেথুন স্কুলে পড়া সুহাস এবং আদর্শবাদী ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ভবতোষের বিবাহ সমাজের বিধিবিধানের বিরুদ্ধে একটি তীব্র প্রতিবাদ। নারী-পুরুষের যৌন জীবনের ঊর্ধ্বে এক বৌদ্ধিক আকর্ষণ এক্ষেত্রে সক্রিয় থেকেছে। সুহাসের মা ঘর ছেড়েছিল যৌবনের অদম্য তাড়নায়, সুহাসিনীও স্বয়ং নির্বাচন করে আপন জীবনসঙ্গী কিন্তু তার অবস্থান বিপরীত কোটিতে। আর এই বিবাহে অনুপস্থিত থাকলেও এর আসল পুরোহিত সত্যবতী, কারণ সে-ই সুহাসিনীকে ক্লেদাক্ত পরিবেশ থেকে তুলে এনে নবজন্ম দিয়েছিল।

উপন্যাসে খুব বেশি জায়গা জুড়ে না থাকলেও সত্যবতীর মনের আয়নায় ছায়া ফেলে যায় নবকুমারের স্বামী পরিত্যক্তা দিদি সৌদামিনীর স্বামীর ঘরে ফিরে আসা কিংবা নবকুমারের

বন্ধু নিতাইয়ের স্ত্রী ভাবিনীর নাবালিকা বোন পুঁটির দাম্পত্য সহবাস সহ্য করতে না পেরে অকালমৃত্যু। সত্যবতী তার সাধ্যমত প্রতিক্রিয়া জানায় বা এর প্রতিবাদ করে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে। তাতে সমাজের জগদ্দল পাথর প্রত্যক্ষ একচুল না সরলেও হয়তো তার ভিত কিছুটা আলগা হয় সকলের অগোচরে— যদিও তাকে সম্পূর্ণ উৎপাটিত করার জন্য প্রয়োজন আরও অনেক যুগের সঙ্ঘবদ্ধ লড়াই। কিন্তু উপন্যাসের শেষে সর্বকনিষ্ঠ সন্তান সুবর্ণলতার বিবাহ সত্যবতীর সবচাইতে বড় পরাজয়। বড় দুই পুত্র-সন্তানের পর সুবর্ণলতাকে পৃথিবীতে আনতে অনেক দ্বিধা, অনেক অনিচ্ছা ছিল সত্যবতীর। কিন্তু সুবর্ণ বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তারই মধ্যে যেন নিজের আজীবনের অপূর্ণ স্বপ্নকে অবয়ব লাভ করতে দেখে সত্যবতী। কিন্তু সেই সব যত্ন লালিত ইচ্ছা ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মতো উড়ে যায় এক নিমেষে যখন বেথুন স্কুলে পড়া নয় বছরের সুবর্ণলতাকে তার মায়ের অনুপস্থিতিতে ঠাকুমা এবং বাবা মিলে বিয়ে দিয়ে দেয় নিজেদের গ্রামের বাড়িতে। সত্যবতীর শাশুড়ি এলোকেশীকে পুত্রবধূর উপর আধিপত্য করতে না পারার জ্বালা সহ্য করতে হয়েছে আজীবন— এই সুযোগে তিনি যেন মরণকামড় দিয়ে যান। আর স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও দিন মাথা তুলতে না পারা নবকুমারের নির্বীর্য পৌরুষ মায়ের ইন্ধন পেয়ে নরম মাটিতে লেজ আছড়ে আত্মতৃপ্ত হতে চায়। মাতা-পুত্রের হয়তো ধারণা ছিল একবার বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলে গুমরে, মাথা খুঁড়েও সত্যবতী শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে বাধ্য হবে। কিন্তু সত্যবতী যখন গ্রামের বাড়ির ছাদনাতলায় কল্কাদার বেগুনি বেনারসি আর জবরজং জ্যাকেট পরা নিজের ন' বছরের মেয়েকে দেখে তখন এক মুহূর্তে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে তার গোটা পৃথিবী। সে নিজে যেখানে ছিল সেইখানটিতেই এসে দাঁড়িয়েছিল সুবর্ণলতা, একচুল বদলায়নি কোনও কিছু। তবে তার সারা জীবনের এত লড়াই, এত আত্মত্যাগ সব ব্যর্থ হয়ে গেল! সত্যবতী মুখ ফিরিয়ে নেয় বিবাহ মণ্ডপ থেকে এবং সংসার থেকেও। তার সংসার ত্যাগ যেন সীতার পাতাল প্রবেশের ছবি মনে আনে— তেমনই অভিমানী এক নিষ্ক্রমণ।

সুজান গিলবার্ট এবং সান্ড্রা গুবার তাঁদের *The Madwoman in the Attic* বইতে বলেন, বাইবেলের যে কাহিনি অবলম্বনে মিল্টন *Paradise Lost* লিখেছিলেন তাতে নারীকে দেখানো হয়েছিল সমস্ত পাপের ও স্খলনের উৎস রূপে। সেই 'আদি পাপ' থেকে দূরে রাখতে মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে সহনশীলতা এবং নিষ্ক্রিয়তার আদর্শ। শুধু তাই নয়, সমাজে এবং সাহিত্যে মেরুকরণ করা হয়েছে ভাল (angel) এবং খারাপ (monster) মেয়ের মধ্যে, দুয়ের মাঝে কঠোর নিয়ন্ত্রণরেখা। কিন্তু ভালত্বের মহিমান্বিত মুখোশের আড়ালে যে মন্দ মেয়েটা দেওয়াল আঁচড়েছে— আসলে তারা যে অভিন্ন সত্তা। ভার্জিনিয়া উলফ্-এর অনুসরণে গিলবার্ট ও গুবার একে বলেছেন Milton's bogey বা মিলটনের প্রেতাত্মা। নারী লেখক সেই অতৃপ্ত আত্মাকেই মুক্তি দিতে চান— "...a woman writer must examine, assimilate, and transcend the extreme images of 'angel' and 'monster' which male authors have granted for her."[১৭] বাঙালি সমাজ খ্রিস্টীয়

পাপপুণ্য বা ভিক্টোরীয় নীতিবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হলেও ভাল-মন্দের ভেদ জ্ঞাপক মডেলটি প্রায় এক। সত্যবতী-সুবর্ণলতারা কোনও দিনই তথাকথিত 'ভাল মেয়ে' নয়। তাদের প্রতিবাদে, স্বাধীন মত প্রকাশে লোকনিন্দা এবং তিরস্কারের ঢেউ উঠেছে চতুর্দিকে। কিন্তু *প্রথম প্রতিশ্রুতি*-র দুটি চরিত্রের মধ্যে দিয়ে আশাপূর্ণা দেখান প্রদীপের তলাতেই অন্ধকার জমে সবচাইতে বেশি। শুদ্ধাচার এবং পদস্খলন একই টাকার এপিঠ ওপিঠ। চরিত্র দুটি রামকালীর সংসারে আশ্রিতা দুই বিধবার। একজন তার পিসি মোক্ষদা, অন্যজন দুঃসম্পর্কিত ভাগীনেয় বধূ শঙ্করী। স্বাস্থ্যবতী, কর্মকুশলা বালবিধবা মোক্ষদা ছিলেন রামকালীর সংসারের পবিত্রতার পাহারাদার। তাঁর ছিদ্রান্বেষী দৃষ্টির সামনে আচার-বিচার, নিয়ম-নিষ্ঠার একচুল এদিক ওদিক হওয়ার উপায় ছিল না। সেই আচার সর্বস্বতা বাড়তে বাড়তে এক ভয়ংকর শুচিবায়ুগ্রস্ততায় পর্যবসিত হয় এবং এক সময় ভেঙে যায় খান খান হয়ে। যে মোক্ষদা আমিষকে শত হস্ত দূরে রেখেছিলেন আজীবন তিনিই তার জন্য লালায়িত হয়ে ওঠেন, এমনকী লুকিয়ে, চুরি করে মাছ খেতে শুরু করেন। অন্য দিকে উনিশ বছরের উদ্ধত যৌবনকে বিধবার শ্বাসরোধকর নিয়মের জালে বাঁধতে না পেরে কুলত্যাগ করেছিল শঙ্করী। তার প্রেমিক একটা লোক দেখানো বিয়ের অভিনয় করলেও এক সময় তাকে এঁটো পাতার মতো ফেলে পালায়। শঙ্করী তার কন্যা সন্তানটিকে নিয়ে বড়লোকের বাড়িতে ঝি-গিরি করে পেট চালায় এবং শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে। ঘটনাচক্রে শঙ্করী এবং তার কন্যা সুহাসিনীর দেখা সত্যবতী যখন পায় তখন তার চোখে মোক্ষদা এবং শঙ্করীর জীবন একটি রেখায় এসে মিলে যায়। হিন্দু বিধবার জীবনের দিকচিহ্নহীন রিক্ততা, নিঃসীম হতাশাবোধ এদের একজনকে করে তুলেছিল শুচিবায়ুগ্রস্ত, অন্যজনকে কুলত্যাগিনী। স্বভাবের বিপরীত আচরণের দাম দিতে হয়েছিল উভয়কেই। কিন্তু এর দায় কার! ব্যক্তির না সমাজের! শঙ্করী যেন সত্যবতীর দ্বৈত সত্তা, যে উড়তে না শিখেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ঝাঁপ দিয়েছিল মহাশূন্যে। তথাকথিত 'মন্দ মেয়ে'র মিথ ভেঙে সুহাসিনীকে নিজের হাতে গড়ে তোলে সত্যবতী যা তার জীবনে সবচেয়ে বড় সাফল্য।

সুবর্ণলতা নিতান্ত বালিকা বয়স থেকেই ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার। সত্যবতীর জীবনে নিশ্চল ধ্রুবতারার মতো যেমন ছিলেন রামকালী তেমন কোনও আশ্রয়স্থল তো তার ছিলই না উপরন্তু মায়ের গৃহত্যাগে পিতৃপরিবারের দরজাও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মাত্র ন' বছর বয়সে বিবাহ বিভ্রাটের পর সুবর্ণলতা নিক্ষিপ্ত হয় খাস কলকাতার এমন একটি সংসারের অন্দরমহলে যেখানে পুরুষেরা গামছা পরে রোয়াকে বসে তেল মাখে, প্রকাশ্য কলতলায় দাঁড়িয়ে স্নান করে, রাত দুপুর পর্যন্ত তাস খেলে এবং মেয়ে জাতটি সম্পর্কে যাদের ধারণা, "মেয়েমানুষ পরচর্চা করবে, কোঁদল করবে, ছেলে ঠেঙাবে, ভাত রাঁধবে আর হাঁটু মুড়ে বসে এক কাঁসি চচ্চড়ি দিয়ে এক গামলা ভাত খাবে, এই তো জানা কথা।"[১৮] এর সঙ্গে স্বামী প্রবোধচন্দ্রের সন্দেহবাতিক যুক্ত হয়ে সুবর্ণলতার জীবনের অঙ্কটাকে আরও জটিল করে তোলে। সত্যবতীর স্বামী নবকুমার ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ হলেও তার চরিত্রে কদর্যতা ছিল না। নিজের ধরনে হয়তো একরকম তাকে ভালও বাসত সত্যবতী— অন্তত সুবর্ণলতার

বিবাহজনিত বিশ্বাসঘাতকতার আগে পর্যন্ত। কিন্তু অধিকার সর্বস্ব, রুচিহীন স্বামীর জন্য ভালবাসার কোনও শ্যামল ওয়েসিস তৈরি হয় না সুবর্ণলতার হৃদয়ে। সে ঘৃণা করে তার সন্তানদেরও যাদের জন্ম সুবর্ণলতার শরীরটার উপর প্রবোধচন্দ্রের অপরিসীম লোভের মূল্য চোকাতে এবং যাদের মধ্যে পিতৃবংশের লক্ষণগুলি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকট হয়ে ওঠে। সংসারের মাঝে তার মায়ের চাইতেও একা সুবর্ণলতা। তার একমাত্র আশ্রয়স্থল গোপন লেখার খাতাটি।

বালিকা সত্যবতীর মুখে মুখে ছড়া কাটার মধ্যে তার কবিত্ব শক্তির একটা ঝলক আমরা দেখেছিলাম। কিন্তু পরবর্তী সময়ে নিজের সংসার, সুহাসিনীর লালন-পালন, পাড়ার সর্বমঙ্গলা তলায় বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষাদান প্রভৃতি বহু কাজের ভিড়ে চাপা পড়ে গিয়েছিল সেই সৃষ্টিশীলতা। কিন্তু সুবর্ণলতার সংসারে কোনও সক্রিয় ভূমিকা নেই, কলের পুতুলের মতো সে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে আর রাতের নিভৃতিতে নিজেকে উজাড় করে দেয় তার খাতাটির কোলে। এই তাড়নাতেই সে ননদ সুবালার 'স্বদেশি' করা দেওর অম্বিকার নির্জন ঘরে ছুটে গিয়েছিল। অম্বিকার স্বরচিত কবিতা শোনার আশায়। আর এই জন্য সর্বসমক্ষে স্বামীর হাতে চূড়ান্ত নিগৃহীত হতে হয় তাকে। সুবর্ণলতার সাধ ছিল বাড়িতে একটা দক্ষিণের বারান্দা থাকবে। থাকবে খোলা বইয়ের পাতার মতো একটুকু খোলা আকাশ। প্রবোধচন্দ্র মিথ্যা স্তোক বাক্যে তাকে ভোলায় কিন্তু তার কথা রাখে না। এমন মেয়ের জীবনে লেখিকা হওয়ার স্বপ্নও কি পূরণ হওয়ার!

গিলবার্ট এবং গুবার দেখান পিতৃতন্ত্রে লেখকসত্তা পুংলিঙ্গেরই সদম্ভ বহিঃপ্রকাশ। সামাজিক লিঙ্গ নির্মাণে যা সহায়তা করেছে— "...a literary text is not only speech quite literally embodied, but also power mysteriously made manifest, made flesh. In patriarchal Western culture, therefore, the text's author is a father, a progenitor, a procreator, an aesthetic patriarch whose pen is an instrument of generative power like his penis."[১১] সুতরাং পিতৃতান্ত্রিক বিধান অনুসারে সুবর্ণলতার মতো মেয়েদের লেখক হওয়ার কোনও অধিকার নেই। নিজের সযত্ন রক্ষিত খাতাগুলি সে তার সম্পর্কে ভাসুর অকৃতদার, আপনভোলা জগন্নাথের হাতে দিয়েছিল ছাপতে, কারণ তাঁর নিজস্ব ছাপাখানার ব্যবসা। গোপন প্রেমের উত্তেজনার মতো চাপা আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য নিয়ে কিছুদিন কাটানোর পর একদিন মুটের মাথায় চাপিয়ে বই সুবর্ণলতার বাড়িতে পৌঁছে দিলেন জগন্নাথ। "পয়সায় দুখানা বর্ণ পরিচয়ে'র কাগজে ভাঙা টাইপ আর পুরু কালিতে পাঁচশ কপি 'সুবর্ণলতার স্মৃতিকথা' ছেপে এনেছেন তিনি। সেই ভুলে ভরা কুৎসিত দর্শন বই বাড়িশুদ্ধু লোকের হাসির খোরাক হয়। যেন সুবর্ণলতাকেই সং সাজিয়ে বাঁদর নাচানো হচ্ছে হাজার চোখের সামনে। সেই দিনই ছাদে আগুন জ্বালিয়ে সমস্ত বই, সেই সঙ্গে কৃপণের সঞ্চিত ধনের মতো খাতাগুলি পুড়িয়ে ফেলে সুবর্ণলতা। তার আজীবনের সমস্ত সুখ দুঃখের, আবেগ অনুভূতির মুহূর্ত, বাঁচার শেষ সম্বল ভস্মীভূত হয়ে যায়। সুবর্ণলতার যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও সেই ভস্ম অপমান শয্যা থেকে ফিনিক্স পাখির

মতো জেগে ওঠে বকুল— বহু সন্তানবতী সুবর্ণলতার শেষ সন্তান। সুবর্ণলতা যার দিকে ভাল করে তাকিয়েও দেখেনি কখনও সেই ভীরু, দুর্বল, অন্তর্মুখী বকুল কালক্রমে হয়ে ওঠে বিখ্যাত লেখিকা অনামিকা দেবী। প্রথম যৌবনের প্রেমে ব্যর্থ হওয়ার পর আজীবন অবিবাহিত থেকে যাওয়া বকুল চারপাশে বদলে যাওয়া সময়টাকে প্রত্যক্ষ করে। দেখে তরুণ প্রজন্মের আত্মসর্বস্ব স্বেচ্ছাচারিতা কিংবা সততার সাহস। দেখে দাম্পত্যের ভাঙন— এক যুগে যা ছিল লোহার শৃঙ্খল আর এক যুগে তাই-ই হয়ে গেছে কাচের বাসনের মতো ঠুনকো। এই সব কিছুরই ছায়া পড়ে তার সাহিত্যে। কিন্তু নিজের কথা লেখার দ্বিধা আর সে কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না। কারণ সেই কথার তো শুরু বহুকাল আগে তার দিদিমা-মায়ের আমল থেকে। সেই লড়াই, সেই জটিলতা, সেই দ্বন্দ্বের ইতিহাস ব্যক্ত করা তো সহজ নয়! তার চাইতেও বড় কথা এর পরিণতি কোন পথে! এই প্রশ্ন বকুলের এবং স্বয়ং লেখিকার— "এখন আর শতবর্ষ পূর্বের সেই গ্রামীণ সমাজ নেই, নেই শহরজীবনের সেই দেওয়াল মোড়া সমাজ, অতএব সে সব সমস্যাও আর নেই।... লৌহ যবনিকার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে পরা মেয়েরা আজ স্থলে আকাশে অন্তরীক্ষে বিজয় পতাকা উড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তার সমস্যার কি সত্যিই শেষ হয়েছে? অবস্থার কি সত্যিই অবসান হয়েছে"?[২০] সত্যবতী বা সুবর্ণলতার প্রার্থিত জমিটি হয়তো জেতা হয়েছে, কিন্তু সামনে বাকি আরও বহু লড়াই— পরিপার্শ্বের সঙ্গে এবং নিজের সঙ্গেও।

বাংলা সাহিত্যের নারী উপন্যাসিকদের মধ্যে সর্বাধিক ব্যাপ্ত পরিসরকে কলমের পরিধিতে এনেছেন মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬ খ্রি.)। অবশ্য তাঁর ক্ষেত্রে 'নারী উপন্যাসিক' অভিধাটি ব্যবহার করা হয়েছে সংকীর্ণ অর্থে নয় গভীরতর এক তাৎপর্যে। মহাশ্বেতা দেবী এমন একজন মানুষ যিনি নিজের জীবনের উদাহরণ দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দেন মানুষের কর্মজগৎ কত বিস্তৃত হতে পারে। শিক্ষকতা সহ বিভিন্ন চাকরির পাশাপাশি আজীবন অজস্র জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। বিশেষত নিম্নবর্গীয় আদিবাসী সমাজের উন্নতির জন্য লড়াই চালিয়েছেন বিভিন্ন স্তরে। এর পাশাপাশি লিখেছেন প্রায় চার দশক জুড়ে। যে সাহিত্য তাঁর বিভিন্ন ভাবনা ও কর্মজগতেরই একটি স্বতন্ত্র প্রকাশ ভঙ্গিমা। কেন না তিনি মনে করেন, "মানুষ হিসাবে যদি আমি সততা, প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা প্রতিবাদে বিশ্বাসী হই, সাহিত্যে কি করে আমি অন্য কথা বলি, মুখ ফিরিয়ে থাকি।"[২১] এই 'সততা' এবং 'প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা'র কারণেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে যেমন বদলেছে মহাশ্বেতার অন্তর্ভুবন, তেমনই মোড় বদল ঘটেছে তাঁর সাহিত্যেও। জনপ্রিয়তার পিছুটানে সমঝোতা করেননি কখনও, নিজের পক্ষে আরামদায়ক কোনও বিষয়ের পুনরাবৃত্তির লোভনীয় হাতছানি উপেক্ষা করে গেছেন।

মহাশ্বেতা মনে করেন একজন সাহিত্যিকের থাকা উচিত সময়ের প্রতি, ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতা: "লেখায় আমি আপাত ঘটনাকে বিশ্লেষণ করায়, বিচার করায়, সময়কে দলিলীকরণে বিশ্বাস করি। কেননা, একমাত্র সেভাবেই আমার মতে, উত্তরণ সম্ভব বৃহত্তর, আরো মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ কোনো আকাশে। আমি বিশ্বাস করি, ঘন ও সমাজজীবন আশ্রিত

ইতিহাসচর্যায়। ইতিহাসচর্যা, আমার মতে, সাহিত্য স্রষ্টার পক্ষে আবশ্যিক, মূল শিক্ষা।[২২] এই 'ইতিহাসচর্যায়' উপেক্ষিত নয় নারীবিশ্বও। প্রথম উপন্যাসের জন্যই তিনি বেছে নিয়েছিলেন ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে এক ঐতিহাসিক নারী ব্যক্তিত্ব ঝাঁসির রাণি লক্ষ্মীবাঈকে। এরপর বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন সমাজের ও সময়ের মেয়েরা উঠে এসেছে তাঁর লেখনীর মুখে— কখনও তারা মিছিলের অগ্রভাগে— কখনও প্রস্তরযুগের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণোদ্যত আবার কখনও বা পুলিশ লক আপে ধর্ষিত, রক্তাক্ত। ইতিহাস থেকে পুরাণ পর্যন্ত এক বিস্তৃত ক্যানভাসে আঁকা অতীত থেকে বর্তমানকে ছুঁয়ে ভবিষ্যৎমুখী যাত্রা এই স্ত্রী চরিত্রদের। সেই বিপুল চরিত্রশালা থেকে দুটি চরিত্রকে আমরা বেছে নেব লেখিকার নারীভাবনার স্পন্দনকে বুঝে নিতে— একজন *হাজার চুরাশির মা*-এর সুজাতা আর অন্যজন *স্তনদায়িনী*-র যশোদা।

প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নিজস্ব সি.এ ফার্মের কর্ণধার দিব্যনাথের স্ত্রী সুজাতা কোনও দিন প্রতিবাদের ভাষা শেখেননি। বিবাহিত জীবনের প্রথম পর্যায়ে মেনে নিয়েছিলেন শাশুড়ির আধিপত্য, তারপর স্বামীর এবং পুত্র কন্যার বড় হয়ে ওঠার পর তাদেরও। সন্তান উৎপাদন ছাড়া স্ত্রীর আর কোনও বিষয়ে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন এমন কথা দিব্যনাথ ভাবেননি কখনও। এবং সেই সন্তানের জন্ম দিতেও সুজাতা প্রতিবার একা গেছেন নার্সিং হোমে নিজের প্রয়োজনীয় সামগ্রীটুকু গুছিয়ে নিয়ে। এমন দাবি করেননি যে পিতা হিসাবে দিব্যনাথেরও একটা দায়িত্ব বর্তায়। ঠিক যেমন তিনি মেনে নিয়েছিলেন স্বামীর পরনারীগমনের অভ্যাস। সুজাতার গর্ভজাত সন্তানদের মধ্যেও বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিব্যনাথ চ্যাটার্জির পরিবারের ছাঁচটাই প্রকট হয়ে উঠেছে। বড় ছেলে জ্যোতি তার বাবার মতোই প্রখর ব্যবসায়িক বুদ্ধিসম্পন্ন— হিসেবের কড়ি বুঝে নিতে পটু। তার স্ত্রী বিনি সাংসারিক রাজনীতিতে বিশেষ পারঙ্গম, মেয়েলি ছলাকলাকে প্রায় শিল্পে পরিণত করেছে। বড় মেয়ে নীপা বিবাহিতা কিন্তু সেই বিবাহের সীমানায় নিজেকে আবদ্ধ রাখতে তার রুচি নেই, পিসতুতো দেওরের সঙ্গে প্রায় প্রকাশ্যেই সহবাস করে। ছোট মেয়ে তুলি পেয়েছে তার ঠাকুমার আদল— প্রবল কর্তৃত্বপরায়ণ। এমনকী তার বাবা নিজের গোপন সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাকে দূতী নিয়োগ করায় সে এক প্রকার কর্তৃত্বজনিত আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এদের সকলের মাঝে সুজাতা বেঁচে থাকে একটি নিঃসঙ্গ দ্বীপের মতো। একমাত্র ছোট ছেলে ব্রতীর সঙ্গে কখনও কখনও গল্প করেন, তার পড়াশুনার খোঁজ নেন। এই ছেলেটি তার মনের একটি নরম জায়গা জুড়ে আছে। স্বপ্ন দেখেন, ছোট ছেলে প্রতিষ্ঠিত হলে একদিন তাকে নিয়ে দিব্যনাথের বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন। কিন্তু ব্রতীর জগৎকে যে তিনি আদৌ চিনতেন না সে কথা উপলব্ধি করেন সুজাতা যেদিন মধ্য রাতে আর্তস্বরে বেজে ওঠে টেলিফোন। থানা থেকে খবর আসে পুলিশের গুলিতে নিহত নকশাল আন্দোলনকারীদের মধ্যে একজন ব্রতী চ্যাটার্জি। খবর পেয়ে দিব্যনাথ ছোটেন বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের মুখ বন্ধ করতে কারণ তাঁর ছেলে সরকারবিরোধী নাশকতায় যুক্ত এ কথা প্রকাশ পেলে সমূহ বিপদ। জ্যেষ্ঠপুত্র পিতার পদানুসরণ করে। সুজাতা একা ছোট মেয়ে তুলিকে সঙ্গে নিয়ে

যান মর্গে— সেখানে হাজার চুরাশি নম্বর মৃত দেহটি ব্রতীর। তার ক্ষতবিক্ষত মুখে আঙুল ছুঁইয়ে সুজাতা যেন বুঝতে চান এই কি তাঁর সেই ছেলে যে বিকেলে তাঁর সঙ্গে গল্প করেছে, যার হাস্যোজ্জ্বল মুখটি এখনও তাঁর মনের আয়নায় ভাসছে! মর্গ থেকে শ্মশান এবং তারপরও ব্রতী সুজাতার সঙ্গেই থেকে যায়। কেবল স্মৃতিমাত্র নয়, এ যেন এক অন্বেষণ। গোপনে তিনি খোঁজেন ব্রতীর সেই জগৎকে যা চিরকাল তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থেকে গিয়েছিল। ব্রতীরই মতো পুলিশের হাতে খুন হওয়া সমুর মা'র সঙ্গে দেখা করেন তাদের বস্তিতে গিয়ে। জানতে পারেন বিজিত, লালটু এবং আরও হাজার হাজার যুবকের কথা যারা একটা স্বপ্ন দেখেছিল— সমাজ বদলের স্বপ্ন। দিব্যনাথ-জ্যোতিদের মতো মানুষেরা যে সমাজের গদিতে আসীন সেই সমাজটাকে গুঁড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল ওরা। শুধু চায়নি, তার জন্য জীবন পর্যন্ত বাজি রেখেছিল। ব্রতীর বান্ধবী এবং একই পথের পথিক নন্দিনী সলিটারি জেল থেকে মুক্তি পেয়ে এলে তারও সঙ্গে দেখা করেন সুজাতা। নন্দিনীর কাছে তিনি শোনেন একমাত্র তাঁর জন্যই ব্রতী বাড়ি ছেড়ে চলে যায়নি, এমনকী সে তার বাবাকেও অন্য মহিলার সঙ্গে সম্পর্কের জন্য শাসিয়েছিল। সুজাতা ক্রমশ অনুধাবন করেন ব্রতীদের সমষ্টিগত প্রতিবাদে ব্যক্তি উপেক্ষিত নয়— এমনকী তিনিও এর মধ্যে আছেন। তাঁরও জন্য লড়াই করেছিল ব্রতী। তাঁর নীরব সহিষ্ণুতা ব্রতীর মুখে ভাষা খুঁজে পেয়েছিল। সমস্ত উপন্যাস জুড়ে আমরা দেখি সুজাতা মুখ বুজে সহ্য করেন অ্যাপেন্ডিক্স-এর ব্যথা, যেমন করে তিনি প্রসববেদনা সইতেন। এই ব্যথা এবং ব্রতীকে হারানোর যন্ত্রণা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

ব্রতীর মৃত্যুর দিনটিতেই ছোট মেয়ে তুলির এনগেজমেন্ট পার্টিতে বিনা আপত্তিতে যোগ দেন সুজাতা কারণ ব্রতীর জন্য দুঃখ শুধু তাঁর একার। তিনি চান না তাঁর বুকের সেই বন্ধ দরজাটি এরা কেউ খুলুক, তাতে যেন সেই দুঃখের পবিত্রতা নষ্ট হবে। কিন্তু নিজের চারপাশে তাঁর তথাকথিত আপনজনদের মাতাল হাসি আর উন্মত্ত প্রলাপ শুনতে শুনতে এক সময় সুজাতার মনে হয়, "সব যেন কীটদষ্ট, ব্যাধিদুষ্ট, পচাধরা, গলিত ক্যানসার।... এরা ভ্রূণ থেকেই দুষ্ট, দূষিত, ব্যাধিগ্রস্ত। যে সমাজকে ব্রতীরা নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছিল সেই সমাজ বহুজনের ক্ষুধিত অন্ন কেড়ে নিয়ে এদের সযত্নে রাজভোগে লালন করে, বড় করে।"[২৩] সুজাতার মনে হয় এদের হাতে পৃথিবীটাকে তুলে দেবে বলেই কি মরেছিল ব্রতীরা? সহিষ্ণুতা এক সময় কুল ছাপায়— তাঁর গর্ভস্থ অ্যাপেন্ডিক্সটি সেই তিল তিল করে জমে ওঠা যন্ত্রণার প্রতিভূ হয়ে বিদীর্ণ হয়ে যায়। যেন পুনরায় ফিরে আসে ব্রতীর জন্মমুহূর্তের প্রসববেদনা। আহত জন্তুর মতো তীব্র, শরীরী এক চিৎকারে জীবনে প্রথমবার প্রতিবাদের স্বর খুঁজে পায় সুজাতা— "সুজাতার দীর্ঘ আর্ত হৃদপিণ্ড চেরা বিলাপ বিস্ফোরণের মতো, প্রশ্নের মতো ফেটে পড়ল, ছড়িয়ে গেল কলকাতার প্রতি বাড়ি— শহরের ভিতের নীচে ঢুকে গেল... প্রত্যেকটা সুখী অস্তিত্বের সুখ ছিঁড়ে গেল।" একজন এবং আরও অনেক ব্রতীদের সম্মিলিত প্রতিবাদের সঙ্গে মিশে যায় সুজাতার চিৎকৃত প্রতিবাদ।

স্তনদায়িনী গড়ে উঠেছে কৃষ্ণ জননী যশোদার মিথ ভেঙে। বসুদেব এবং দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান শিশু কৃষ্ণকে আপন সন্তান জ্ঞানে স্তনদুগ্ধে লালন করেছিলেন বৃন্দাবনের গোপবধূ যশোদা। সে দিন তিনি জানতেনও না এই শিশু একদিন জগতের ত্রাতা হবেন কিন্তু আর কখনও ফিরে আসবেন না মাতৃক্রোড়ে। নিজের অন্তিম পরিণতি জানত না কাঙালীচরণের স্ত্রী যশোদাও। স্বামী দুর্ঘটনায় পা হারানোর পর যখন হালদারদের বিশাল পরিবারে দুধ মা-এর পদটি সে পায় তখন নিজেকে সৌভাগ্যবতীই মনে করেছিল। নিজের স্তনদুগ্ধের বিনিময়ে স্বামী সন্তানদের প্রতিপালন করতে পেরে গর্বিত ছিল সে। কিন্তু সময়ের নিয়মেই এক সময় তার প্রয়োজন ফুরায়। দুগ্ধদানের মহিমায় এতদিন বিভোর ছিল সে। এখন সংবিৎ ফিরে পেয়ে দেখে তাকে আশ্রয় দেওয়ার কেউ নেই পাশে। মনের জ্বালা নীরবে সহ্য করে হালদার বাড়িতেই রাঁধুনির চাকরিতে নতুন ভাবে বহাল হয়। আর তারপর তার প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী স্তনে ক্যানসার দেখা দেয়। রোগের লক্ষণ বৃদ্ধি পেলে হালদার কর্তারা উদ্যোগ নিয়ে তাকে ভর্তি করে দেন হাসপাতালে। যশোদা সেখানে পচন ধরা স্তনের অমানুষিক যন্ত্রণা নিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে একা— তার স্বামী, আপন স্তন্যপালিত পঞ্চাশটি শিশুর কেউ সেদিন উপস্থিত থাকে না তার পাশে। "যন্ত্রণা, ভীষণ যন্ত্রণা, অ্যাট দি একসপেনস্ অফ দি হিউম্যান হোস্ট ক্যানসার সংক্রামিত হচ্ছে। ক্রমে যশোদার বাম স্তন ফেটে আগ্নেয়গিরির ক্রেটার- সদৃশ হল। পুতিগন্ধে কাছে যেতে কষ্ট হয়।"[২৪] যশোদা যেন স্বয়ং পৃথিবী। যে পৃথিবী মানুষকে ধারণ করে, লালন করে আর মানুষ তাকে ধ্বস্ত করে অপরিসীম নিষ্ঠুরতায়। পারমাণবিক যুদ্ধ এবং আরও অনেক প্রত্যক্ষ ও গোপন হত্যায় রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত ধরিত্রী মাতা যশোদা মৃত্যুর পর বেওয়ারিশ লাশ রূপে চালান হয়ে যায় মর্গে।

এমন ভাবেই নারী শরীরকে ভাষা দেন মহাশ্বেতা। সন্তান ধারণ এবং পালনের অতি সাধারণ নারীসুলভ প্রক্রিয়াটিকে নিয়োগ করেন মানব ইতিহাসের নবভাষ্য রচনায়। পিতৃতন্ত্রের বর্ষপ্রাচীন অনুশাসন ভেঙে নারী কি খুঁজে পাবে স্বতন্ত্র ভাষা, স্বতন্ত্র কাব্যতত্ত্ব! উত্তর খুঁজেছিলেন গিলবার্ট এবং গুবার, "Where does such an implicitly or explicitly patriarchal theory of literature leave literary woman? If the pen is a metaphorical penis, with what organ can females generate text?"[২৫] প্রাচীন লাতিন প্রবাদ বলে Woman is nothing but womb.[২৬] সেই শরীর সর্বস্বতাকে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে ব্যবহার করে নারী-ভাবুকেরা বলেন সেখান থেকেই তারা সৃষ্টি করবে— "...out of my Womb thou shalt be brought..."[২৭]

উনিশ শতকের শেষার্ধে যাত্রা শুরু করে শতবর্ষের অধিক সময় ধরে পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পথে এগিয়েছে নারী ঔপন্যাসিকের কলমে নারী চরিত্রদের এক পূর্ণতার সন্ধান। আলোচনার এই সীমিত পরিসরে হয়তো বাদ থেকে গেলেন অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শৈলবালা ঘোষজায়া, শান্তা দেবী, সীতা দেবী, বেগম রোকেয়া, আশালতা সিংহ, সাবিত্রী রায়, বানী রায়, সুলেখা সান্যাল, প্রতিভা বসুর মতো আরও

অনেকে। এঁদের অবদান কোনও অংশে ন্যূন নয় এবং তা দাবি রাখে বিদগ্ধ ও সংবেদী আলোচনার। এবং এই লেখিকাদের আত্মপ্রকাশের পেছনে সমাহিত আছে সুবর্ণলতা বা জুডিথ শেক্সপিয়ারের মতো বহু মেয়ের মূক যন্ত্রণা ও হাহাকার। নারী ঔপন্যাসিকেরা সেই অকথিত ইতিহাসেরই পুনর্নির্মাণ করে চলেছেন যে কথা ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ বলেছেন তাঁর *A Room of one's own* গ্রন্থের উপসংহারে— "Now my belief is that this poet (Judith Shakespere) who never wrote a word and was buried in the cross-roads still lives. She lives in you and in me, and in many other women who are not here tonight, for they are washing up the dishes and putting the children to bed. But she lives; for great poets do not die;..."[২৮]

সুমিতা চক্রবর্তী

জনপ্রিয় উপন্যাস ও নারী-প্রতিমা নির্মাণ

'উপন্যাস'— একটি সাহিত্য-সংরূপ। 'জনপ্রিয়তা'— একটি সামাজিক পরিস্থিতি। বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন সময়ে কোনও ব্যক্তি, কোনও বস্তু, কোনও তত্ত্ব, কোনও নির্মাণ হয়ে উঠতে পারে একটি নির্দিষ্ট সমাজের অধিকাংশ মানুষের কাছে আকর্ষক। সেই 'অধিকাংশ মানুষ'-এর অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গ সেই জনপ্রিয় উপাদানটিকে পছন্দ করেন, বিষয়টিকে জানবার চেষ্টা করেন; বিষয়টি কোনও বস্তু হলে নিজের আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে সেটিকে করায়ত্ত করার চেষ্টা করেন।

এই জনপ্রিয়তা কেন ঘটে তার ব্যাখ্যা কিছুটা দুরূহ। মোটামুটিভাবে বলা যায় একটি সমাজের সেই জনগোষ্ঠী— যার অন্তর্গত সদস্যরা কোনও দিক থেকেই 'বিশেষ' নন, সব দিক থেকেই গড় মানসিকতার অধিকারী— তাঁদের কাছে আকর্ষক হবার লক্ষণগুলির সমাহারকেই জনপ্রিয়তা বলা যায়। সমাজের এই সাধারণ মানুষ— যাঁদের ইংরেজিতে বলা যায় 'পাবলিক'— তাঁদের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠাই জনপ্রিয়তা।

প্রসঙ্গটি, বস্তুত, ততটা সাহিত্য-সংক্রান্ত নয়, যতটা সমাজতত্ত্ব-সংক্রান্ত। প্রথমেই সেই সমাজ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল আমাদের স্বীকার করে নিতে হচ্ছে যেখানে 'জনপ্রিয় উপন্যাস' নামে একটি উপন্যাস-শ্রেণির অস্তিত্ব আছে। সেই শ্রেণির উপন্যাস যেহেতু সংজ্ঞার্থেই 'জন' বা পাঠক-সাধারণ অভিধেয় এক গোষ্ঠী সম্পর্কে নিয়ত-সচেতন সেহেতু আমাদের আরও ভাবতে হবে সমাজের সেই শ্রেণির উপন্যাস-পড়ুয়া পাঠকদের কথা— নানা কারণে যাঁদের নির্দিষ্ট কিছু চাহিদা আছে উপন্যাসের কাছে। সেই পাঠকেরা সমাজের একটি বিশেষ অংশ। তাঁদের শিক্ষা, রুচি, অর্থনৈতিক সামর্থ্য, পারিবারিক পরিবেশ থেকেই উঠে আসে তাঁদের বিনোদন ও নান্দনিকতার ধারণা।

বিশেষ একটি পাঠকগোষ্ঠীর চাহিদা সম্পর্কে অবহিত থেকে সেই পাঠকদের কাছে বিক্রীত হবার জন্য যে-সব উপন্যাসের পরিকল্পিত নির্মাণ, তাদেরই বলা যেতে পারে জনপ্রিয় বা 'পপুলার' উপন্যাস।

সব শিল্পীই চান সংবেদনশীল, অনুরাগী এবং সহমর্মী উপভোক্তা। কিন্তু সেই চাওয়া

যখন একটি বিপণন-সম্ভাবনাকে হিসেবের মধ্যে রেখে প্রথম থেকেই আকার নেয় তখন তাকে বলি উৎপাদিত শিল্প।

সাহিত্যের জনগ্রাহ্যতা পাঠক-চিত্তের গ্রহণ-ক্ষমতা সাপেক্ষ। পাঠকের সামাজিক অবস্থান, শিক্ষা, রুচি, পরিবেশ, সংস্কার-বিশ্বাস এবং ক্রয়ক্ষমতাই জনপ্রিয় সাহিত্যের মাননির্ধারক। প্রকাশনা-সংস্থার বিজ্ঞাপনের একটি প্রভাব আছে পাঠক-চিত্তের ওপর, কিন্তু তার অতিরিক্ত কোনও ব্যবহারিকতার দায় সাহিত্য বহন করে না।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে জনপ্রিয় উপন্যাস ও শুদ্ধ উপন্যাস বলে সীমারেখা টেনে দিয়ে দুটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী নির্দেশ করাও কঠিন। কোনও কোনও লেখক থাকেন যাঁরা নিজের জীবনবোধের সততা থেকে শিল্পসৃষ্টি-মানসে সাহিত্য রচনা করেন। সেখানে তাঁদের যদি কিছু আপস থাকে তা নিজেরই সামাজিক মনের সঙ্গে শিল্পীমনের আপস। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে এমন দেখা গেছে অনেক। কখনও কখনও তাঁরা পাঠকের ভাল লাগার কথা ভেবেও কিছু কিছু আপস করেছেন, কিন্তু তা সম্পূর্ণত ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। অগভীর-শিক্ষিত পাঠকের কাছে পৌঁছনোর প্রত্যাশা তাঁদের ছিল না। কিছু সংখ্যক বিদগ্ধ, সাহিত্যমনস্ক, সহমর্মী পাঠকই ছিলেন তাঁদের লক্ষ্য। কিন্তু সেই সহমর্মী পাঠক-গোষ্ঠীর যে রুচি-বৈশিষ্ট্য সামাজিক অবস্থান-জনিত কারণে গড়ে উঠেছিল সেদিকে দৃষ্টি না রেখে তাঁরাও লিখতে পারেননি। শিল্প-সৃষ্টির পদ্ধতিটাই এমন যে, সেখানে একজন স্রষ্টার সামনে থাকেন বেশ কিছু সংখ্যক শিল্পরসিক। তাঁদের কাছে গৃহীত হবার বাসনা শিল্পীর চিত্তে থাকেই। সব সময়ে সেই দেওয়া-নেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে টাকার অঙ্কটা সর্বাধিক প্রাধান্য না পেলেও তা-ও এক ধরনের বিনিময়। আর, বিনিময় মানেই সেখানে বাণিজ্য-বুদ্ধির কিছু অনুপ্রবেশ থাকবেই।

'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর অন্তর্গত 'বড় বাজার' রচনাটিতে বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্ব-সংসারকে বলেছেন একটি 'বৃহৎ বাজার'। পরিহাসের মোড়কে হাস্যরসিক সত্যকেই উন্মোচন করেন। মানব সভ্যতাকে বাজারের সঙ্গে তুলনা করাটা অযৌক্তিক হয়নি। কিংবা বলা যায়, ব্যাপারটা আসলে তুলনা নয়— বাস্তব সত্য।

বাণিজ্য-বুদ্ধি মানব-সমাজের আদি চালক শক্তিগুলির একটি। কোনও এক সময়ে মানুষ ভেবেছিল— আমার উদ্বৃত্তের বিনিময়ে অন্যের উদ্বৃত্ত আমি গ্রহণ করব যা আমার কাছে প্রয়োজনীয়। যুদ্ধ করে কেড়ে নেওয়াও একটা পদ্ধতি বটে, কিন্তু তাতে আনুষঙ্গিক সমস্যা অনেক। শান্তিপূর্ণ বিনিময় প্রথা সবদিক থেকেই লাভজনক।

মুদ্রার প্রচলন বাণিজ্যিক বুদ্ধিকে একটি সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক এবং আন্তর্জাতিক মাত্রা দিয়েছে। টাকার জন্যই মানুষ সব কাজ করে— এমন নয়। কিন্তু টাকার জন্য না করলেও একটা বিনিময়-প্রত্যাশা মানুষের সব কাজের মূলেই থেকে যায়।

শিল্পী কেবলই অর্থপ্রাপ্তি প্রত্যাশা করেন— এমন সিদ্ধান্ত এই ভয়ংকর বাণিজ্যিক যুগেও সর্বাঙ্গীন সত্য নয়। কিন্তু অল্প হলেও, শিল্পীর একটা খ্যাতির প্রত্যাশা থাকে; থাকে পাঠকের চিত্তে নিজের ভাবনাটি প্রোথিত করবার কামনা।

ভাষা-শিল্পীও পাঠকের কাছে তাঁর লেখাটি পেশ করবার বিনিময়ে কিছু-না-কিছু চান। কখনও চান কেবলই পাঠকের মনোরঞ্জন করতে; কখনও চান যে তাঁর লেখায় পাঠকের মনে কিছু ভাবনা ও চেতনা জেগে উঠুক। দুটি উদ্দেশ্যই সাহিত্যসৃষ্টির মূলে ক্রিয়াশীল থাকে— অনেক সময়ে দুটি উদ্দেশ্য মিলিতভাবেও থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সাহিত্যরচনার উদ্দেশ্য কী ছিল তা মোটের ওপর আমাদের অজানা নয়। পূর্বোক্ত 'বড় বাজার' রচনাটিতে বাংলা সাহিত্য কেনাবেচার একটি বর্ণনা করেছেন তিনি। —"সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। দেখিলাম বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃত ফল বেচিতেছেন; বুঝিলাম ইহা সংস্কৃত সাহিত্য।" —এইভাবে আঙুর, আনারস, পীচ, পেয়ারা-র বাজারকে তিনি বলেছেন পাশ্চাত্য সাহিত্য। একটি দোকানের পণ্য 'বাঙ্গালা সাহিত্য'— যেখানে ক্রয়-বিক্রয় করছে শিশু এবং অবলাগণ— "বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম— খবরের কাগজে জড়ান কতকগুলি অপক্ক কদলী।"

পরিহাসকে পরিহাস বলেই নেওয়া ভাল। বিশেষত, এ যখন অনেকখানি আত্মপরিহাস। ১৮৭৫-এ *কমলাকান্তের দপ্তর*-এর গ্রন্থাকারে প্রকাশ। এর মধ্যে প্রকাশিত হয়ে গেছে বঙ্কিমের *চন্দ্রশেখর* পর্যন্ত উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র তখন কেবল বাংলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকই নন, বাংলার সারস্বত সমাজের প্রধান ব্যক্তিত্ব। ১৮৭২-এ প্রকাশিত *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময়ে যেন বাংলা সাহিত্যের অনেকটা অভিভাবকও। 'অপক্ক কদলী'-কে সোনার ধানে পরিণত করবার সাধনায় মগ্ন।

কিন্তু সেই স্বর্ণফসলও পাঠকের মনের দিকে, রুচির দিকে, সামাজিক ও পারিবারিক সংস্কারের দিকে তাকিয়ে উৎপাদিত হয়েছিল যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে।

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র— এই তিন লেখককে আমরা উনিশ শতকীয় বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের রূপকার বলব। এই প্রবন্ধের পাঠকেরা সংগতভাবেই বলবেন যে শরৎচন্দ্রকে ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিক বলা যাবে না। তাঁর সৃষ্টিকর্মের সময় বিস্তার ১৯১৩ থেকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। কিন্তু আমরা এখানে বিশেষ এক ধরনের মানসিকতাকে নির্দেশ করতে চাই যেখানে প্রথম মহাযুদ্ধ-উত্তরকালীন সংশয়, দ্বিধা, প্রথাসিদ্ধ অনুশাসনের প্রতি প্রশ্নবিদ্ধ অ-স্বীকার প্রধান হয়ে ওঠেনি। যেখানে বাঙালির উনিশ শতকীয় নবজাগরণ-সঞ্জাত সামাজিক সংস্কারগুলির স্বীকৃতি ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল সামাজিক ও পারিবারিক গঠনে মনু-শাসিত সূত্রগুলিও। তার কারণ মধ্যবিত্ত বাঙালির মনে পারিবারিক বিন্যাসের সেই রক্ষণশীলতা ছিল অনেকখানিই অপরিবর্তিত।

সামাজিক মনের রক্ষণশীলতা অনেকটাই অনড় ছিল নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিন্যাসের ধারণা বিষয়ে। নারীকে কিছুটা লেখাপড়া শেখানো বিষয়ে এই লেখকেরা তথাকথিত উদারপন্থী ছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে নারীর কর্মক্ষেত্রে পদক্ষেপ বিষয়ে তাঁরা ছিলেন প্রায় সম্পূর্ণই নীরব। নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নটি এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকার সংকট সম্পর্কে তাঁদের ভাবনার গতিমুখ আমরা বুঝতে পারি না। এখানেই মহাযুদ্ধ-উত্তরকালীন ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে— নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শৈলবালা ঘোষজায়া, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়,

জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের প্রধান পার্থক্য। এ কথাও বলতে হবে যে তারাশঙ্কর মানিকের সমকালীন হয়েও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নারী সম্পর্কিত ধারণাকে প্রায় উনিশ শতকীয় বলা যায়।

সেই ধারণাটি হল নারী হবে স্বামীনিষ্ঠ, সেবাপরায়ণা, গৃহরক্ষয়িত্রী এবং সন্তানের জন্যে সর্বস্ব উৎসর্গ করা জননী। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বজয়া ইমেজ খুবই লক্ষণীয়।

কিন্তু উপন্যাসের জনপ্রিয়তার সঙ্গে এই ধারণার সম্পর্ক কী? সম্পর্ক এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং সেই সঙ্গে রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবীর উপন্যাসের পাঠককুল সেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা নারীকে পূর্বোক্ত পারিবারিক অবস্থানের মধ্যেই দেখতে চান। উপন্যাসে যদি মেয়েদের দেখা যায় ভিন্নতর অবস্থানে তা হলে সাধারণ বাঙালি পাঠক সেই উপন্যাস গ্রহণ করবে না। ফলে সেই উপন্যাসের জনপ্রিয়তা হবে বিঘ্নিত। যে একটি বিষয়ে এই ঔপন্যাসিকেরা মধ্যবিত্ত বাঙালির পারিবারিক রক্ষণশীলতাকে নারী সংক্রান্ত প্রশ্নে নাড়া দিতে চেয়েছিলেন তা হল বিধবা নারীর প্রেম-আকাঙ্ক্ষা তথা জীবন-আকাঙ্ক্ষা। সেখানেও মনে রাখতে হবে বিশ শতকের প্রথম দিকে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত বাঙালি অনেকটাই একমত। ফলে বালবিধবা এবং তরুণী বিধবা নারীদের সম্বন্ধে মধ্যবিত্ত সমাজে তখন এই প্রশ্নটি জেগে উঠেছে। তা সত্ত্বেও স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের *চোখের বালি*, শরৎচন্দ্রের *চরিত্রহীন* সম্পর্কে পাঠক সমাজের এক অংশের বিরূপ প্রতিক্রিয়া।

বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মধ্যবিত্ত রুচি ও রক্ষণশীলতার প্রতি মান্যতা তিনটি ক্ষেত্রে খুব স্পষ্টই লক্ষ করা যায়। প্রথমটি হল নারী চরিত্রগুলির রূপবর্ণনায় কোনও নায়িকাই অসুন্দরী নয়। বিশেষ যত্নের সঙ্গে প্রত্যেকের রূপের খুঁটিনাটি তুলে ধরায় লেখকদের আগ্রহ বেশ অনুভব করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় দাসী চরিত্রগুলিও রূপবতী। আমরা *দেবী চৌধুরানী* উপন্যাসের প্রফুল্লকে মনে করতে পারি। আপাতদৃষ্টিতে দস্যুনেত্রী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দরিদ্রের রক্ষক এবং প্রায় দেশনেত্রী প্রফুল্ল দেবী চৌধুরানী রূপে যেন অনেকটা মাতৃকল্প। তার অনুচরেরা তাকে মাতৃ সম্বোধনই করে। কিন্তু সকলের কাছে মা রূপে প্রতিভাত এই নারী অপরূপ সুন্দরীও বটে। ত্রিস্রোতার জলের উপর বজরার ছাদে, বহুরত্নমণ্ডিতা, জ্যোতির্ময়ী, পরম রূপসী— জ্যোৎস্না ঝলমল রাত্রে বীণা বাজিয়ে চলেছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জরির ফুলতোলা, মিহি-ঢাকাই শাড়ির ভিতর 'হীরা মুক্তা খচিত কাঁচলি ঝকমক করিতেছে'— এটাও দেখাতে ভোলেননি। এই রূপের দিকে চেয়ে পাঠক চোখ ফেরাতে পারেন না। বোঝা যায় সত্যজিৎ রায় *দেবী চৌধুরানী*-কে চলচ্চিত্রায়িত করবার ইচ্ছায় দেবীর ভূমিকায় কেন সুচিত্রা সেনকেই চেয়েছিলেন। এবং সুচিত্রা সেন রাজি না হওয়ায় সত্যজিতের *দেবী চৌধুরানী* আর আকারই পায়নি।

নারী সম্পর্কে মধ্যবিত্ত বাঙালির পারিবারিক রক্ষণশীলতার আর একটি অভিব্যক্তি হল নারীকে সেবিকারূপে দেখা। *দেবী চৌধুরানী* উপন্যাসটিকে আবার আমরা মডেল রূপে গ্রহণ করছি। আমরা মনে রাখি প্রমথনাথ বিশী তাঁর *বঙ্কিম সরণী* নামক আলোচনা গ্রন্থে লিখেছিলেন— "জনপ্রিয় হয়ে ওঠবার সমস্ত লক্ষণ আছে এতে।"— এই জনপ্রিয়তার

আর একটি শর্ত হল নারীকে গৃহধর্ম পালনে ব্যাপৃত রাখা বিষয়ে মধ্যবিত্তের ধারণার সমর্থন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অসামান্য উপন্যাস-বিশ্লেষক হলেও বেশ কিছুটা রক্ষণশীল ছিলেন। তাই তিনি *দেবী চৌধুরানী* সম্পর্কে লিখেছিলেন— "দেবী চৌধুরানী তাহার সমস্ত রানীগিরির ঐশ্বর্য ও দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রীর উচ্চপদ ত্যাগ করিয়া আবার গৃহধর্ম পালনের জন্য হরবল্লভের সংকীর্ণ অন্তঃপুর-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার নিষ্কাম ধর্মের শিক্ষাদীক্ষা এই নূতন ক্ষেত্রে নিয়োজিত করিয়া তাহাকে পরম সার্থকতায় মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।" (*বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ন বুক এজেন্সি, চতুর্থ পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৯৬২, পৃ. ৯১)। কিন্তু তাঁর এই অভিমত গৃহীত হয়নি অধিকাংশ বঙ্কিম-অনুরাগীর কাছে। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তও খানিকটা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যুত্তরেই বলেছিলেন,— "বাসনমাজা ও দেবীনিবাস নির্মাণ ছাড়া এই অভিনব গৃহধর্মের কোন প্রত্যক্ষ চিত্র পাই না।" (*বঙ্কিমচন্দ্র*, এম. সি. সরকার, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৭১, পৃ. ১৬৪)। আর একজন সত্যবাদী সাহিত্য-বিশ্লেষক বলেই ফেলেছেন— "ভবানী পাঠকের দশ বৎসরের শ্রম ও শিক্ষার মূর্তিমতী ব্যর্থতা দেবী চৌধুরানী।" (*বঙ্কিম-সরণী*, প্রমথনাথ বিশী, মিত্র ও ঘোষ, দ্বিতীয় মুদ্রণ; ১৯৭৭, পৃ. ২১৬)।

আমাদের মনে পড়বে, যে-বিনোদিনীর চরিত্র নির্মাণ নিয়ে বিরূপ সমালোচনা শুনতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে, তাকে তিনি অতীব গৃহকর্ম নিপুণা এবং সেবাময়ী রূপে দেখিয়েছেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মেয়েরা খাবারের থালা এবং হাতে পাখা নিয়ে প্রায়শই পুরুষের সামনে দেখা দেন বলে তাঁর সম্পর্কে চালু আছে রসিকতা। নারীকে এই অবয়বে দেখার মধ্যেও নিহিত আছে উপন্যাসকে পাঠক-প্রিয় করে তোলার অভিপ্রায়। কাজ করেছে জনপ্রিয় উপন্যাসের ধারণা।

সর্বাধিক রক্ষণশীলতা দেখা দেয় মাতৃ চরিত্রের রূপায়ণে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্রগুলি— সধবা বা বিধবা— যা-ই হোক না কেন— তারা নিঃসন্তান। এ বিষয়ে প্রশ্নও মাঝে মাঝে উঠেছে। উত্তরটি খুবই স্পষ্ট। কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রগুলি প্রায়শই স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষ সম্পর্কিত মানসিক দৌর্বল্যে বিচলিত হয়েছে। বাঙালি লেখকরা যেন ভাবতেই পারেননি— কোনও সন্তানের মা পরিবারে থেকে স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষকে চিত্তে স্থান দেবে। সন্তানের জননী হলে বাড়িতে থেকে অপত্যস্নেহ সঞ্চার করা ছাড়া নারীর আর কোনও কাজ প্রধান হবে না— এমনই ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির পাঠকের চাহিদা। তাই সন্তান নেই সূর্যমুখীর, শৈবলিনীর, রোহিণীর। সন্তান নেই বিনোদিনীর, দামিনীর, বিমলার, চারুলতার। অনেক দিন বিবাহিত থেকে এবং সন্তোষজনক দাম্পত্য জীবন (রবীন্দ্রনাথ তেমনই দেখিয়েছেন) যাপন করেও চারুলতা ও বিমলার সন্তান নেই কেন— এ প্রশ্নের কোনও উত্তরও পাওয়া যায় না আখ্যানের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের উত্তরটি পাওয়া যায় *যোগাযোগ* উপন্যাসে। যখনই সন্তান সম্ভাবিতা হল কুমু, তখনই বিপুল বিরাগের বাধা ঠেলে তাকে ফিরে যেতে হল স্বামীগৃহে। সন্তানকে নিয়ে নারী থাকবে স্বামীর ঘর থেকে আলাদা— এ যেন অকল্পনীয়। জননী মাত্রেই সতী!

লিও তলস্তয় লিখেছিলেন *আনা কারেনিনা*। সম্ভ্রান্ত পুরুষ এবং স্বামীকে ত্যাগ করে তরুণ প্রেমিকের সঙ্গে ঘর ছেড়েছিল আনা। ছেড়ে গিয়েছিল দশ বছরের বালক পুত্রকে। এখানেই পার্থক্য ঘটে যায় হিন্দু বাঙালি মধ্যবিত্ত পাঠকের রুচির সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের পাঠকের মনোভুবনের। এখানেই বোঝা যায়, উপন্যাসের জনপ্রিয় হবার এবং পাঠকের কাছে গৃহীত হবার শর্ত কতটা কার্যকরী হয়ে আছে লেখকদের মনে। জননী নারী এবং বিধবা নারী সম্পর্কে এই সংস্কার এ কালের উপন্যাসেও যথেষ্ট স্পষ্ট।

জনপ্রিয় উপন্যাসের আর এক আবশ্যিক শর্ত হল গল্প-নির্ভরতা। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় সেই আখ্যানটি শতকরা আশি ভাগ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সম্পর্ককে কেন্দ্র করে আবর্তিত। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্রের কাল পর্যন্ত এই ব্যাপারটিকে আমরা স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারি। কিন্তু আজকের বাংলা উপন্যাসেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই ধারাই. যেন বহমান।

বিগত তিরিশ-চল্লিশ বছরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় উপন্যাসের একটা মোটামুটি ছাঁচ তৈরি হয়ে উঠেছে (সব যুগেরই নিজস্ব ছাঁচ থাকে। আমরা এখানে সাম্প্রতিকতম ছাঁচটির কথা বলছি।) সে ছাঁচের মূল কথা হল— পাঠকদের বিনোদন সৃষ্টির লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হলে চলবে না। জীবন-সত্যের উদ্ভাসন সেখানে থাক বা না-ই থাক। সেই পাঠকেরা মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের মানুষ। তাঁরা নানা ধরনের পেশায় নিযুক্ত, তবে শিক্ষক (সর্বস্তরের) এবং করণিকের সংখ্যা বেশি। একটি বিশাল অংশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। সুবিশাল একটি অংশ হলেন গৃহবধূ এবং নানা পেশায় নিযুক্ত মেয়েরা। সাধারণত দেখা যায় একজন সফল পুরুষ উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা অ্যাকাউন্ট্যান্ট যতটা বাংলা উপন্যাস পড়েন— সেই পদে বা কর্মে নিযুক্ত মহিলারা পড়েন তার অনেকগুণ বেশি। এই পাঠকগোষ্ঠীর গড় শিক্ষাগত মান উচ্চমাধ্যমিক থেকে স্নাতক শ্রেণির মধ্যে। সাধারণভাবে তাঁরা বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসলগুলির সঙ্গে পরিচিত নন। আমাদের দেশে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে এই পাঠকশ্রেণি বিপুলভাবে বেড়েছে। এঁদের চাহিদা সৃষ্টি করে এবং সেই চাহিদামতো বিনোদনের জোগান দেয় জনপ্রিয় উপন্যাস। এঁদের ইচ্ছাপূরণের ছবিই আমরা জনপ্রিয় উপন্যাসে পাই।

অতএব লেখকদের লক্ষ্য সেই পাঠক-গোষ্ঠী যাঁরা বহির্জগতের কোনও পেশায় যুক্ত নন অথবা এমন পেশায় নিযুক্ত যেখানে বড় মাপের কোনও দায়, ঝুঁকি বা সংকট সৃষ্ট হয় না। যাঁরা মোটামুটিভাবে নিস্তরঙ্গ জীবনযাপন করেন। স্বজন-সম্পর্কভিত্তিক সংকটই যাঁদের প্রধান সংকট। বাংলায় কিছু কিছু তথ্যনির্ভর উপন্যাস লিখেছেন শংকর। অনেকের লেখাতেই আজকাল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সর্ব ক্ষেত্রেই প্রায়-পারিবারিক উপন্যাসের কাহিনি-বৃত্তটির কেন্দ্রীয় সংস্থান বজায় রাখা হয়।

এরপর যদি আমরা জনপ্রিয় উপন্যাসে মেয়েদের কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তা বিচার করি তা হলে গোড়াতেই মেনে নিতে হয় যে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে মেয়েদের যে-স্থান ও ভূমিকা সংগত বলে স্বীকৃত সেই ধারণা ও বিশ্বাসেরই ছায়াপাত ঘটবে সেখানে। জননীর

চরিত্র-অঙ্কনে সন্তানস্নেহই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়, কারণ জননীর সেই স্নেহময়ী রূপটিই সমাজে প্রত্যাশিত। অনেকটা সত্যও, কারণ দীর্ঘকালীন মানসিক অভ্যাসে মেয়েরা নিজেরাও সেই রূপটিই কাম্য বলে জানেন। একেবারে খেটেখাওয়া সমাজের রমণী কখনও কখনও শিশুকে ফেলে রেখে অকাতরে প্রেমিকের সঙ্গে চলে যান। মধ্যবিত্ত সমাজের তুলনায় নিম্নবিত্ত সমাজে এ-ধরনের ঘটনা নানা কারণে কিছু বেশি ঘটে। কিন্তু তাঁরা বাংলা উপন্যাসে উল্লেখিত হলেও বিশ্লেষিত হন না। এই প্রত্যাশার সমস্যা এড়াতেই বঙ্কিম থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত সধবা বা বিধবা রমণীরা যখন ভিন্ন পুরুষে আসক্ত হয়েছেন তখন তাঁদের করে রাখা হয়েছে সন্তানহীনা। বাংলা উপন্যাসে কোনও আনা কারেনিনা নেই। আজও মোটের ওপর বাংলা উপন্যাসে এই ধারাই চলছে। ব্যতিক্রম, সমাজে নেই তা নয়, কিন্তু খুবই কম। সাহিত্যে আরও কম।

এ রকম একটি প্রশ্ন দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি— এখনকার জনপ্রিয় উপন্যাসে মেয়েদের যে-ভূমিকায় আমরা দেখি তা কি লেখকেরা চাপিয়ে দেন অথবা মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের স্বাভাবিক ছবিটিই লেখক প্রতিফলিত করেন? সমরেশ মজুমদারের *কালপুরুষ* উপন্যাসে বৃদ্ধা বিধবা পিসিমার উক্তি— "বিধবার শাড়ি কাউকে দিতে আছে?" এর মধ্যে যদি বৈধব্যের প্রতি লেখকের রক্ষণশীল মনোভাবের চিহ্ন খুঁজি তাহলে তা হবে অ-ন্যায্য। পিসিমার চরিত্রটি স্বাভাবিক ও সংগত হয়েই ফুটেছে এই উক্তিতে।

বঙ্কিমচন্দ্র *বিষবৃক্ষ* উপন্যাসে বিধবার বিয়ে দিয়েছিলেন একশো বছরের বেশি হল। সমাজে তো বিদ্যাসাগর তা সম্ভব করেছিলেন আরও আগে, কিন্তু আজও বাংলা উপন্যাসে বিধবা রমণীর রঙিন শাড়ি পরা ও মাছ খাওয়া নিয়ে আলোড়ন উপস্থিত হতে দেখি। বাণী বসুর *শ্বেত পাথরের থালা* দ্রষ্টব্য। অস্বীকার করতে পারি না যে, আমাদের সমাজে আজও এ রকমই হয়। ঔপন্যাসিক সেই সত্যটিকে তুলে ধরেন। একথা কখনওই বলা যাবে না যে ব্যবসায়িক বাংলা উপন্যাসে বৈধব্যনিষ্ঠা, পণপ্রথা বা স্ব-বর্ণ বিবাহ-সংক্রান্ত সামাজিক চাপকে সমর্থন করা হয়। মোটের ওপর এই অতিস্পষ্ট সামাজিক বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলিতে বৈষম্য দূরীকরণের প্রতিই সমর্থন লক্ষ করি তাঁদের লেখায়। ব্যতিক্রম হিসেবে একটু শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নাম করা যায়, যিনি সরাসরি না বললেও তাঁর উপন্যাসে স্ব-বর্ণ বিবাহের ব্যতিক্রম কখনও দেখান না। আজকাল যেন বিশেষ ভাবে নারী-পুরুষের বিবাহের বয়স-পার্থক্য আট-দশ বা তারও বেশি হওয়াটা বেশ স্পষ্টভাবে প্রীতিকর বলে তুলে ধরছেন। কিন্তু অন্য ঔপন্যাসিকেরা এ রকম কোনও ইঙ্গিত করেন না।

এই ধরনের পুরনো সংস্কারের ব্যাপারে নয়— কিন্তু ভিন্নতর উপায়ে জনপ্রিয় উপন্যাসে মেয়েদের যে ভাবমূর্তি তৈরি হয়ে ওঠে তা মেয়েদের একটি নিম্নতর সামাজিক ভূমিতে ঠেলে দেয় সূক্ষ্মভাবে।

ইদানীংকালের কয়েকটি জনপ্রিয় উপন্যাসকে মডেল হিসেবে নেওয়া যাক— শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের *দূরবীন*, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *পূর্ব পশ্চিম* ও সমরেশ মজুমদারের *কালপুরুষ* ও *সাতকাহন*। প্রথমেই দেখি যতগুলি নায়িকা ও নায়িকার সহচারিণী মেয়ে আছে

উপন্যাসগুলিতে তারা সকলেই কমবেশি সুন্দরী। মাঝে মাঝেই পুরুষের মুগ্ধ চোখে তাদের রূপ বর্ণিত হয়েছে। সেখানে শাড়ি-জামার রং, প্রসাধন, কেশ-বিন্যাস, অলংকার ইত্যাদিরও উল্লেখ থাকে কিছু কিছু। অস্বীকার করব না যে, বঙ্কিমও এই রীতিতে রূপবর্ণনা করতেন, রবীন্দ্রনাথ তা থেকে কিছুটা সরেছিলেন, কিন্তু নারী-রূপ বর্ণনায় প্রকৃত ভিন্নতর মাত্রা আরোপ করেছিলেন শরৎচন্দ্র। কেবলমাত্র *চরিত্রহীন* উপন্যাসের রমণীদের বর্ণনা অনুসরণ করলেই তা বোঝা যায়। তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণের লেখাতেও লেখকদের প্রিয় রমণী-রূপের 'টাইপ' লক্ষ করি। তারাশঙ্করের 'টাইপ'টি মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে বেরিয়ে এসেছে কিছুটা। কিন্তু সতীনাথ, বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ-ধরনের 'টাইপ' রূপ-বর্ণনা করেননি বললেই হয়।

রমণীর দৈহিক ও প্রসারিত সৌন্দর্যকে নানা ভাবে, নানা রুচিতে বেশ সচেতন ভাবে আরও যাঁরা তুলে ধরেছেন জনপ্রিয় বাংলা উপন্যাসে তাঁদের মধ্যে বিশেষ ভাবে ছিলেন ও আছেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, বুদ্ধদেব গুহ, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। আরও আছেন অনেকেই। বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সুবোধ ঘোষ, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসেও ছিল এ জিনিস। তুলনায় সন্তোষকুমার ঘোষ বা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ধরন ও উদ্দেশ্য ছিল ভিন্নতর।

নারীদেহ-রূপের এই বর্ণনায় লেখকেরা সাধারণ ধারণানুযায়ী রুচিসুন্দর রূপের বর্ণনাও যেমন করেছেন তেমনি তা ধাপে ধাপে চলে গেছে উদ্দেশ্যমূলক যৌন-আবেদন-বিশিষ্ট কামোদ্দীপক বর্ণনায়। মেয়েদের শরীর-সৌন্দর্য এবং কেবল শরীরও যে পুরুষের চোখে অন্যতম আকর্ষণের বস্তু— এই সত্যটির স্বীকৃতি উপন্যাসগুলির সর্বাঙ্গে। এভাবে উপস্থাপিত হবার ফলে নারী-পুরুষ সম্পর্কের মধ্যে পণ্যভোগ্যতার দিক চলে আসে, যা সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর এবং নারীর পক্ষে বিপজ্জনক ভাবে ক্ষতিকর। পুরুষ নারীকে সজ্জিত-সুন্দর দেখতে চায় এবং নারীও নিজেকে সজ্জিত-সুন্দর এবং আকর্ষক রূপে দেখাতে চায়— এই ব্যাপারটির ব্যাপক সমর্থন থাকে জনপ্রিয় উপন্যাসে।

লেখকদের এ রকম করা উচিত কিনা এ প্রশ্নে বা অভিযোগে যাবার আগে আমাদের স্বীকার করতে হবে একটি সত্য। সত্যটি এই যে, মেয়েদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষেই এই রূপ-সচেতনতা আছে। অনেকটা সেভাবেই আছে যেভাবে দেখান লেখকেরা।

এর মূলে অবশ্যই আছে বহু-প্রজন্ম-বাহিত এক সুদীর্ঘ সমাজব্যবস্থা— যে ব্যবস্থার মূলে আছে শরীরতত্ত্বগত একটি বাস্তবতা। নারী সন্তান উৎপাদন করে। মানুষ যখন ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে বাস করত তখন এক একটি গোষ্ঠীর শক্তি নির্ভর করত অনুগত ব্যক্তিবর্গের উপর। সন্তানদের ওপরেই প্রথমে চাপে সেই আনুগত্যের দায়, কারণ অসহায় শৈশবে তাকে রক্ষার দায়িত্ব নেয় গোষ্ঠীপতি-পিতা। গোষ্ঠীশক্তি বাড়াবার কাজে নারীর সন্তান-উৎপাদন ক্ষমতাটি প্রয়োজনীয় বলে সুদূর অতীত থেকেই নারীকে অধিকারে রাখার উপায় করেছে পুরুষ। কাজটা কঠিন হয়নি। কারণ সন্তানধারণের উপযোগী দেহগঠন বলে প্রাকৃতিক কারণেই নারী পুরুষের তুলনায় শারীরিকভাবে কিছু দুর্বল। সন্তান-জন্মের সময়ে এবং তার অব্যবহিত আগে ও পরের কিছু সময়ে সে কিছুটা অশক্তও হয়ে পড়ে। ফলত,

যে গোষ্ঠীপতিকে সে সন্তান দিয়েছে তার ওপর সে খাদ্য-সংস্থানের জন্য সাময়িকভাবে হলেও কিছুটা নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আপাতভাবে পুরুষের দয়ায় তাকে জীবনধারণ করতে হচ্ছে এ রকম একটা ধারণা নারী ও পুরুষ উভয়েই এভাবে গ্রহণ করেছে বহু প্রাচীনকালেই। তাই পুরুষ-জাতিকে তৃপ্ত রাখার একটা প্রয়োজনভিত্তিক ইচ্ছেও রমণীর জেগেছিল কারণ পুরুষ তুষ্ট না থাকলে তার আহার্য ও আশ্রয় হয়ে পড়ে বিপন্ন। পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য নিজেকে সাজাতে শুরু করে রমণী। পুরুষও নারীর উৎপাদনক্ষমতাকে স্বনিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজনে নারীর এই প্রয়াসকে অমিত প্রশ্রয় দিয়েছে। ভারতে নারীর পাতিব্রত্য, পুনর্বিবাহে বাধা ইত্যাদি যাবতীয় সংস্কারের মূলে এই বাস্তব পরিস্থিতির অস্তিত্ব অনুভব করা যায় বিশ শতকের প্রথম চার দশক পর্যন্তও। রমণী খানিকটা সামাজিক সংস্কারে এবং অনেকটা জীবিকার দায়ে পুরুষের মন জুগিয়ে চলেছে। যতদিন না আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস এবং শিক্ষার প্রসারের ফলে সে খানিকটা দাঁড়াতে পেরেছে নিজের পায়ে। অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ম্ভর নন এমন বহু রমণীই নিরুপায় হয়ে পতিব্রতা থাকেন— এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু রক্ত-সংস্কার বাহিত সেই পুরুষ-মনোরঞ্জনী প্রবৃত্তি নারীর মধ্যে থেকে গেছে অনেকটা। থেকে গেছে রূপগর্ব, দৈহিক সৌন্দর্যে পুরুষের চোখে কাঙ্ক্ষিত হবার বাসনা। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অনেক উপন্যাসেই লেখকেরা নারীর মনে এই আকাঙ্ক্ষার সচেতন সঞ্চার এবং তদনুযায়ী সক্রিয়তা দেখিয়েছেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শেষের দিকের উপন্যাসগুলিতে নারী-পুরুষ সম্পর্ক-দৃশ্যগুলিতে খুবই অ-শৈল্পিকভাবে প্রলোভন-সৃষ্টির কাজটি করা হত। প্রফুল্ল রায়ের উপন্যাসেও আমি এ রকম একটা কৌশলের পরিচয় পাই। তিনি যে-সব উপন্যাসে বিহারের সামাজিক পরিবেশ, জাতপাতের সংঘাত, রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ ও নির্বাচন, সামন্ততান্ত্রিকতার সঙ্গে গণতন্ত্রের সংঘাত ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লিখেছেন সেখানেও কিন্তু খুব হিসেবি প্ররোচনায় রমণী-দেহকে ব্যবহার করেছেন। *রামচরিত্র* উপন্যাসে রামচরিতের সঙ্গে অচ্ছুৎ দেহজীবিনী রতিয়ার মিলন দৃশ্যটি বা উপন্যাসের সর্বত্রই রতিয়ার শরীর-বর্ণনার ধরনটি উপন্যাসের গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ করেছে। রামচরিতের চরিত্রায়ণ হয়েছে দুর্বল আর রতিয়ার অন্তর-পরিচয় উদঘাটনের কোনও চেষ্টাই নেই। যেভাবে রতিয়ার দেহ বর্ণনা করেছেন প্রফুল্ল রায় (শুরু হয় 'মাজা কাঁসার মতো গায়ের রং, পাহাড়ের মত বুক...' এই ভাবে) সেটি তাঁর একটি টাইপ-বর্ণনা। নিম্নবর্ণ দরিদ্র রমণীর দেহ-বর্ণনায় এই টাইপটি তিনি বসিয়ে দেন। অনেকগুলি উপন্যাসেই পাওয়া যাবে। ধনী-ঘরের আধুনিকা 'মড' মেয়েদেরও একটা টাইপ ছিল তাঁর। এক সময়ে খুব ব্যবহার করতেন। আলাদা করে প্রফুল্ল রায়ের উদাহরণ দিলাম কিন্তু ব্যাপারটা কম-বেশি অনেক ঔপন্যাসিকই মেনে চলেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শ্যামবর্ণা, সুগঠনা, যৌবনবতী, খর-ব্যক্তিত্বময়ীরা আর একটা টাইপ। আরও একটা টাইপ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সুশ্রী, বুদ্ধিদীপ্ত অথচ আবেগময়ী, ঈষৎ রহস্যময়ী তরুণীরা।

বুদ্ধদেব গুহ বা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে আমরা আর যাব না। তাঁদের অধিকাংশ রচনার কেন্দ্রবিন্দুই হল নানা ভাবে নারী ও নারী-শরীরের এবং নারী-পুরুষের শারীর-নৈকট্যের প্রলোভনময় চিত্র উপস্থিত করবার ইচ্ছা। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের সর্বভাব-প্রকাশক্ষম লিখন-দক্ষতা এবং বুদ্ধদেব গুহর প্রকৃতিদৃষ্টির সূক্ষ্মতা কোনও দিনই এই ব্যবসায়িক অভিপ্রায়টির জন্য শৈল্পিক মূল্য পেল না। যদিও ব্যবসায়িক মূল্য পেয়েছে প্রচুর। নানা রকম চটকদার বর্ণনা পড়তে পারবেন বলেই তাঁদের লেখা পড়েন পাঠক। কতদিন পড়বেন সে-প্রশ্ন আলাদা। মনে হয় যতদিন টাটকা জোগান পাবেন ততদিনই পড়বেন।

শরীর-প্রসঙ্গ ছেড়ে নারীর সামাজিক অবস্থান কীভাবে জনপ্রিয় উপন্যাসে রূপায়িত হচ্ছে তা দেখতে গেলে মনে হবে দুটি প্রত্যাশা সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে। এক, সন্তানের জননীত্বকে দান করা হয়েছে বিশেষ মহিমা। দুই, রমণীর একনিষ্ঠাকে— স্বামী বা প্রেমিকের প্রতি— অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে। সমরেশ বসুর *গর্ভধারিণী*-তে গর্ভধারণ ও সন্তান-জন্মদানকে দেওয়া হয়েছে একটি বিশাল ও পবিত্রতাব্যঞ্জক প্রেক্ষাপট। *দূরবীন* উপন্যাসে শিশুর আবির্ভাবে সংশয়াতীতভাবে সংবদ্ধ হয়েছে ধ্রুব ও রেমির দাম্পত্য-বন্ধন। *পূর্ব-পশ্চিম*-এর প্রতিটি জননী চরিত্রই একান্ত ভাবে জননী। সন্তানের মঙ্গলকামনাই তাঁদের চারিত্র্য।

একনিষ্ঠাও এই ভাবেই স্থান পেয়েছে উপন্যাসগুলিতে। *দূরবীন*-এর রেমি শত অত্যাচারে ও অপমানেও ধ্রুব ছাড়া আর কাউকে ভালবাসেনি। অথচ ধ্রুব স্বচ্ছন্দেই অন্য-রমণী-বিহার করেছে। *পূর্ব-পশ্চিম*-এর অতীন সামান্য প্ররোচনাতেই শর্মিলার প্রতি দুর্বল হয়েছে, বিশ্বাস ভেঙেছে অলির প্রতি। কিন্তু অলির জীবনে আসেনি অন্য কোনও পুরুষ। দুই ঔপন্যাসিকই এমন ভাবে বিষয়টি রেখেছেন— যেন, পুরুষের দ্বিচারিতা যেমন স্বাভাবিক তেমনই স্বাভাবিক নারীর একচারিতা। শীর্ষেন্দু কোনও কোনও উপন্যাসে রমণীর জীবনে একাধিক প্রেমের অস্তিত্ব দেখিয়েছেন কিন্তু এমন প্রায় কখনওই দেখাননি যে নারী ভেঙেছে বিবাহ-বন্ধন।

জনপ্রিয় উপন্যাসে রমণী সম্পর্কিত প্রসঙ্গে কয়েকটি দিকের চিত্রণ খুবই কম দেখা যায় অথচ আজ মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের মেয়েদের মধ্যে তেমন দিক বিরল নয়। উপন্যাসের মেয়েদের অস্তিত্ব প্রায়ই দেখানো হয় পুরুষ-সাপেক্ষভাবে। কর্মসাফল্যের দীপ্তিতে অথবা কাজের জগতে অসাফল্যের ম্রিয়মানতায় প্রায়ই তাঁদের দেখানো হয় না। হৃদয় দেওয়া-নেওয়ার সমস্যাই যেন জীবনের প্রধান কেন্দ্র, পুরুষের প্রেম পাওয়া আর না-পাওয়ার মধ্যে যেন বিশাল অস্তিত্বসংকট— এরকমভাবেই রমণীকে দেখতে অভ্যস্ত আমরা জনপ্রিয় উপন্যাসে। বৃহৎ বহির্বিশ্বে মানুষ হিসেবে নিজের স্থান খুঁজে পাওয়া এবং পেয়ে পরিপূর্ণভাবে তৃপ্তি বোধ করা— এরকম খুব কমই পাই। রবীন্দ্রনাথের কালে অবস্থাটি এমনই ছিল— সেটা অস্বাভাবিক নয়। তবু রবীন্দ্রনাথ *স্ত্রীর পত্র* বা *পয়লা নম্বর* লিখেছিলেন। কিন্তু *সাতকাহন* উপন্যাসের দীপা সম্পূর্ণ স্বয়ম্ভর হয়েও যথেষ্ট কারণ আছে বলে স্বামী ত্যাগ করে এসেও শেষ পর্যন্ত স্বামীর বুকে মাথা রেখে শান্তি পায়— এমনই দেখান সমরেশ মজুমদার। *কালপুরুষ*-এর মাধবীলতার ক্ষেত্রেও পরিণতি একই। একটি সুস্থ বিবাহ-বিচ্ছেদ বা স্বামী

পরিত্যাগের ঘটনাকে সাধারণতই কেন্দ্রীয় ঘটনা হিসেবে রাখা হয় না। তবে ব্যতিক্রম আছে আশাপূর্ণা দেবীর কিছু উপন্যাসে। নারী সেখানে পুরুষের সঙ্গিনী হওয়াকেই সর্বোত্তম সার্থকতা ভাবেনি। সংস্কারসিদ্ধ বন্ধনের অতিরিক্ত হৃদয়-সংবেদী প্রেম-সম্পর্ক অবশ্য আজকাল অনেক উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সাম্প্রতিককালে কোনও কোনও উপন্যাসে রমণীর এক-পুরুষ-অনুগমনের অনড় মহিমার ধারণাটিকে অস্বীকার করেছেন অথচ নারীর প্রতি সেখানে অসম্মানের দৃষ্টিতে তাকাননি, তার ভালবাসার অধিকারকে দিয়েছেন স্বীকৃতি।

জনপ্রিয় বাংলা উপন্যাসে এখনও সেই শ্রেণির রমণীকে দেখি না যাঁরা উদয়াস্ত কায়িক শ্রমের মধ্যে দিয়ে দিনান্তের অন্ন সংস্থান করেন। তাঁদের শ্রেণির রমণীদের যে বিশ্বাস-সংস্কার-অধিকারবোধ-পাপবোধ-অর্থনৈতিক সমস্যাবলী তার যথার্থ প্রতিফলন এখনও আসেনি এ জাতীয় উপন্যাসে। পরিচারিকা যাঁরা রাখেন তাঁরাই এখনও জনপ্রিয় বাংলা উপন্যাসের নায়িকা, পরিচারিকারা নন। পরিশেষে, সেই সিদ্ধান্তেই আমি আবার ফিরে যেতে চাই— আজকের জনপ্রিয় বাংলা উপন্যাসে মেয়েদের যেভাবে দেখানো হয় তা মোটামুটিভাবে আজকের বাঙালি সমাজে মেয়েদের যেভাবে দেখা হয় তারই প্রতিফলন। উদ্দেশ্যমূলক অবনমনের ক্ষেত্রও আছে। তিন-চারজনের লেখার মধ্যে তা প্রধানত সীমাবদ্ধ। কিন্তু জনপ্রিয় উপন্যাসের প্রচার মাধ্যমের অন্তর্গত থেকেও অনেক ঔপন্যাসিকই সমদৃষ্টি বজায় রাখারও চেষ্টা করেন— যতটা সমদৃষ্টি এই সমতাহীন সমাজে রাখা সম্ভব। আমাদের সমাজেই এখনও সেই সমতা প্রতিষ্ঠিত নয় এবং এই অ-সাম্যময় স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ব্যাপারে মেয়েরাও দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। জনপ্রিয় উপন্যাসে সম্পূর্ণভাবে সেই সমতা এ রকম ক্ষেত্রে আসতেই পারে না। আসেনি পৃথিবীর কোনও দেশেই।

তা হলে কী এই পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হবে না। কোনও কিছুরই নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। তবুও মোটের উপর বলা যায়, পুরোপুরি পরিবর্তন হওয়া কঠিন। কারণ, বিষয়টি নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির উপরেও ঠিক নির্ভরশীল নয়। বিষয়টি নির্ভর করছে বিনোদন এবং উপভোগের মানসিকতা এবং ক্রয়ক্ষমতার উপর। এই বিনোদন ও উপভোগের অনেকটা অংশই কিন্তু শরীরনির্ভর। নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। সেই সঙ্গে বিশ্বায়ন প্রসারিত হবে, প্রসারিত হবে বিশ্ববাণিজ্য। সেখানে এই কেনাবেচার জগতের অনেকটা অংশই চলে আসবে নারীর হাতে। নারী সেখানে নিজেকে নিম্নবর্গ হিসেবে দেখবে না। জনপ্রিয় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি ভিন্ন হবার কারণ নেই। এইটুকু পার্থক্য ঘটতে পারে যে— জনপ্রিয় উপন্যাসে নারীর সামাজিক অবস্থান এবং শরীরের সঙ্গেই পুরুষের সামাজিক অবস্থান এবং শরীরকেও একই বিনোদনের বৃত্তে এবং ভোগ-দৃষ্টির 'ফোকাস'-এর মধ্যে নিয়ে আসা হবে। মডেলিং-এ, বিজ্ঞাপন জগতে এবং চলচ্চিত্রে এখনই তার লক্ষণ কিছু কিছু পরিস্ফুট।

যশোধরা রায়চৌধুরী

বাংলা আধুনিক কবিতার নারী-উপনিবেশ: অর্ধেক পৃথিবীর দিকে?

১. অন্তঃপুরপর্ব

> 'আমার মা শ্রীযুক্ত কুসুমকুমারী দেবী... তাঁর কয়েকটি অপ্রকাশিত কবিতা ছাড়া অন্য কোনো লেখা আমাদের কারো কাছে নেই।... তখনকার দিনের সেই অস্বচ্ছল সংসারে একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়ে উঠল না আর... কবিতা লেখার চেয়ে কাজ ও সেবার সর্বাত্মকতার ভেতরে ডুব দিয়ে তিনি ভালোই করেছেন হয়ত'
>
> —জীবনানন্দ দাশ

বাংলা আধুনিক কবিতার বহুমান্য এক দিগ্‌দর্শককে প্রথমেই বেছে নিয়েছি বেশ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই। ১৮৯৯-এর জাতক, বিষণ্ণ এক বরিশালসন্তান, সমস্ত পরবর্তী বাংলাভাষার কবির কাছে স্বীকৃত ও চেষ্টা-অস্বীকৃত ধ্রুবতারা, এই অমোঘ কবির মাতৃদেবী যে একজন কবি, কবিই, ছিলেন, ক'জন জানি আমরা, বাংলা ভাষার পাঠক? কবির শৈশবে, রান্না করতে করতে উনুনের ধারে বসে জোরে জোরে পাঠ্য কবিতার আবৃত্তি বা অন্য কোনও পড়া নিচ্ছেন কুসুমকুমারী, আগুনের আঁচে মুখ লালচে, স্বেদাক্ত। শিশুকবির অক্ষরজ্ঞানও, বোধকরি, ওই অসামান্যার হাতেই, যিনি সে যুগের বাঙাল মেয়েদের অনেকের মতোই, নিজে লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু সংসার। তাই অন্তরালবর্তী কুসুমকুমারী হয়তো *বামাবোধিনী*-র মতো পত্রিকায় কবিতা-পদ্য লিখতে পারেন, নিজের রুলটানা খাতাটিতে অবসরকালে, রান্নার ফাঁকে ফাঁকে, কবিতা লিখে রাখেন, কিন্তু সংসারের কাজ ও সেবার সর্বগ্রাসিতার জন্যই, তাঁর কবিকৃতি অবারিত হতে পারে না। জীবনানন্দের জীবনে কবিতার প্রথম শিখাটি জ্বালিয়ে ধরার জন্য, তাঁর প্রতি ঋণস্বীকার করবে, বাংলাভাষার এমন সৌভাগ্য নিশ্চয়ই হয়নি! কিন্তু বাংলা ভাষা যে হারাল এক কবিকেও! কেন না তিনি তো প্রধানত মাতা ও গৃহিণী। যে ধরনের প্রশ্রয় পেলে একজন মানুষ কবি হয়ে উঠতে পারে, সে অবসর নারীরা পাবেন কোথায়?

অপূর্ণতা, অর্ধমনস্কতা, কবিকৃতি সম্পূর্ণ করতে না পারার প্রবল অতৃপ্তি, বঙ্কিম কথিত সেই মেয়েলি পাণ্ডিত্যের আধা বই পুরা দেখিলাম না-র মতোই, এই খণ্ডিতের নিয়তি বাংলা ভাষার মেয়ে কবিদের পিছু পিছু ফেরে দীর্ঘ দীর্ঘ কাল।

প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভাল, সম্পূর্ণ নিরাসক্ত কোনও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধরচনা এই লেখকের লক্ষ্য নয়। একশো শতাংশ বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করে পৃথিবীতে কোনও লেখা লেখা হয়নি, হবার ধারণাটাও একটা পুরুষতান্ত্রিক মিথ বলে মনে হয়। আমার পক্ষে এ লেখা হবে বাইরে থেকে লেখা নয়, ভেতর থেকে লেখা। তথ্য অবিকৃত রাখার চেষ্টা করলেও, কিছুটা সংক্ষোভ, কিছুটা মর্মবেদনা এ লেখায় বার বার ফুটে উঠবেই। এ লেখায় নারীর কবিতাচারণ বিবৃত হয় নারীরই অস্তিত্বসারাৎসারের অনুধাবনের চেষ্টায়। সময়ের সাথে সাথে যা বদলে যায়, পালটে ফেলে নিজেকে।

> 'আমার শৈশব হইতেই দেখিয়া আসিয়াছি যে মা মাঝে মাঝে নানা বিষয়ে কবিতা লিখিতেন।... নানা সাংসারিক ঝঞ্ঝাট ও বৃহৎ বাঙালি পরিবারের কর্ত্রী গৃহিণীর কাজকর্মের ঝামেলা সত্ত্বেও, কবিতা লেখা কখনো তিনি একেবারে ছাড়িয়া দেন নাই।'

না, উপরের এই লেখাটি জীবনানন্দ দাশের নয়। কবি অন্নদাসুন্দরী ঘোষের *কবিতাবলীর* ভূমিকায় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবপ্রসাদ ঘোষের। যেখানে তিনি জানাচ্ছেন, 'মাতৃদেবীর নিকট ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ফুলস্কেপ সাইজের প্রকাণ্ড একখানা সেন্স্ ডায়েরির খাতা ছিল। তাঁহার অভ্যাস ছিল যখন যাহা রচনা করিতেন তাহাই নিজ হস্তে উক্ত ডায়েরির খাতাতে নকল করিয়া রাখিতেন।'

১৮৭৩-এ জন্ম অন্নদাসুন্দরীর। কুসুমকুমারীরই সমসাময়িক বলা চলে। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে তারপর থেকেই। ডায়েরির দুই মলাটের ভেতরে নিজের অস্তিত্বকে পুরে, গোপনীয়তায় মুড়ে, প্রাণভোমরার মতো তাকে আগলে রাখার ট্র্যাডিশন। বাড়িবদলে, ঠাঁইবদলে, হারিয়ে যাবার বিপদ থেকে বাঁচিয়ে, অবাঞ্ছিত চক্ষু বা হাসিঠাট্টা থেকে লুকিয়ে, বয়ে বেড়ানো ধনরত্ন। ১৯-২০ বছর বয়সে কবিতা লিখতে শুরু করেও ৬৭ বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা, কাব্যগ্রন্থে গ্রথিত হয়ে জনসাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করতে। স্বামী বা সন্তানের উৎসাহের মুখাপেক্ষী থাকা। আর শেষত, *বঙ্গের মহিলা কবি* গ্রন্থে, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের আলোচনায় স্থান পাওয়া।

এই অন্তঃপুরের আড়াল থেকেই উনিশ শতক থেকে বিংশ শতকের দিকে হেঁটে আসেন মেয়েরা, আর সব ক্ষেত্রের মতোই কবিতার ক্ষেত্রেও, লিঙ্গ রাজনীতির সাথে নানান সমঝোতা করেই। পুরুষের অসচেতন উপেক্ষার সাথেও নীরবে লড়াই চলে। ১৮৬৩ থেকে প্রকাশিত *বামাবোধিনী* পত্রিকাতে লিখেছেন কুসুমকুমারী-অন্নদাসুন্দরীর মতোই, কামিনী রায়, সৌদামিনী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীরাও। বাংলা কবিতার দিগ্বলয় আর একটু প্রসারিত হয়েছে। এ সময়ের উপন্যাসকার, নাট্যকার ও কবি, এক অর্থে প্রথম আধুনিক ও সম্পূর্ণ সাহিত্যিক স্বর্ণকুমারী দেবীর *গাথা* কাব্যগ্রন্থটি বেরোয় ১৮৮০-তে। দীর্ঘকাল পরে বের হয় তাঁর *কবিতা ও গান* (১৮৯৫)। কামিনীসুন্দরী দাসীর ১৮৮১-তে

প্রকাশিত *কল্পনাকুসুম*, বিরাজমোহিনী দাসীর *কবিতাহার* (১৮৭৬), প্রথম যুগের কাব্যগ্রন্থ হিসেবে উল্লেখের দাবি রাখে। তখনকার মেয়েদের অনেকেই নিজের নামে লিখতে পারতেন না সমাজভয়ে। তাই অনেক অ-নামাঙ্কিত লেখারই সঠিক চিহ্নিতকরণ ঘটে না, হারিয়ে যায় কালের অতলে। এর পরের দিকে কামিনী রায় বা মানকুমারী বসুর নাম অবশ্য উল্লেখ্য। মানকুমারী ছিলেন প্রধানত কবিই, স্মরণ করব তাঁর *কাব্যকুসুমাঞ্জলি* (১৮৯৩), *কনকাঞ্জলি* (১৮৯৬) আর *বীরকুমার বধ* (১৯০৩)। গিরীন্দ্রমোহিনীর অশ্রুকণা (১৮৮৭), *আভাষ* (১৮৯০)। প্রসন্নময়ীর *নীহারিকা* (১৮৮৪)। ষোড়শীবালা দাসীর *পুষ্পপুঞ্জ* (১৮৮৪), কামিনী রায়-এর *আলো ও ছায়া* (১৮৮৯)। বিনয়কুমারী ধর-এর *নির্ঝর* (১৮৯১)। ব্রজমোহিনী দেবীর *কবিতামালা* (১৮৯০)। মৃণালিনী দেবীর *প্রতিধ্বনি* (১৮৯৪), *নির্ঝরিণী* (১৮৯৫), *কল্লোলিনী* (১৮৯৬) বা *মনোবীণা* (১৯০০)।

ঈশ্বরের কাছে মূলত প্রার্থনার কবিতা দিয়েই এই নারীদের কবিতার পথচলা শুরু। বহু পরে রাধারাণী দেবী লিখেছিলেন: 'পাপী তাপীর প্রার্থনা, দুঃখবিদগ্ধের, শোকার্তের, অনুতপ্তের, ধার্মিকার, ভক্তিমতীর— ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ভগবৎসমীপে প্রার্থনা ও নিবেদন'। বলেছিলেন এসব কবিতার আড়ষ্ঠতা ও নিষ্প্রাণতার কথাও।

যদিও লিঙ্গ রাজনীতির অবরোধের মধ্যে থেকেই এইসব নারীর পদযাত্রার শুরু, তবু, কবিতার বিষয় চয়নের মধ্যে কেউই যেন লিঙ্গ বা নিজের নারী অস্তিত্ব নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলেন না। তাঁদের বিষয় নির্বাচন আবদ্ধ থাকে মানবতা, দেশপ্রেম ঈশ্বরপ্রীতি এবং নরনারীর মধুরভাবে। বড়জোর কখনও বাৎসল্য আসছে, কখনও বা স্বামীসোহাগিনীর বিরহযাতনা। এক আধটি অন্য রকমের কবিতাও আছে, যেখানে কুমারীজীবনের প্রতি হাহুতাশ দেখা যায়। এমনই কোনও একমাত্রিক ধারণা সম্ভব, যে এই নারী কবিদের নারীত্ব সচেতনতায় কোথায় যেন পুরুষনির্ভরতা খুব বেশি। তা বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে ছন্দ ও বাচনেও। এই প্রাক্-আধুনিক পর্যায়ের নারীকবিদের বিষয়ে বস্তুত এমনই এক ঔদাসীন্য থেকে গেছে আমাদের, পরবর্তী প্রজন্মের মেয়েদের। আধুনিক পর্বের শুরুতে প্রথম দিকের বিদ্রোহিনী মেয়ে কবিরাও যেন তাই সরাসরিভাবে এইসব পূর্বসূরির ঋণস্বীকারে দ্বিধাগ্রস্ত। সে তিনি বাংলা লিরিক কবিতার সুষমাকে সম্পূর্ণ বজায় রাখা, ছন্দে আত্মস্থ এক সফল ও জনপ্রিয় পদ্যকার হলেও!

এই আপাত সন্দেহেরই একটা চমৎকার উত্তর খুঁজে পেয়ে যাই সাম্প্রতিক এক প্রবন্ধে, বল্লরী সেনের কলমে। যেখানে তিনি একটি ছকের সাহায্য নিয়ে সহজেই বুঝিয়ে দেন, এ ক্ষেত্রে আমাদের মননের পুরুষতান্ত্রিক একমুখিতা, একমাত্রিকতা, সীমাবদ্ধতা। তিনি লক্ষ করেন, সাহায্য করেন আমাদের লক্ষ করতে যে এখানে নারীর মননে দুটি সক্রিয় ও বিপরীত ক্রিয়া বর্তমান। খাঁচায় যে পাখি বন্দি হয়ে থাকে, সে স্বেচ্ছায় বন্দিত্ব স্বীকার না করলেও দিনে দিনে পোষ মানে। এবং পোষ মানলেও, নিয়মিত আহার জুটে গেলেও, সে ডানা মেলেই উড়তে চায়। এই দ্বিমুখী টান ওই পর্যায়ের কবিতায় খুঁজে পাওয়া সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরব অন্নদাসুন্দরীর একটি কবিতা। প্রথম দিকের ছন্দোবদ্ধ পঙ্‌ক্তিগুলি

কবির স্বামীর প্রতি গভীর প্রেম ও আনুগত্য (যাঁর সে কটাক্ষ মাত্র/শিহরে শিথিল গাত্র/হৃদে খেলে শরতের জ্যোছনা বাহার/সুখ-স্বার্থ বিসর্জিয়া/প্রাণের সর্বস্ব দিয়া/হৃদয় আসনে নিতি পূজা করি যাঁর) জ্ঞাপন করলেও, শেষ পঙ্‌ক্তিটি জানায় এক সন্দেহ ও প্রশ্নের আকুতি: 'পরাণের দেবতা যে, সংসারের সার।/এত অবিশ্বাস ভরা হৃদয় তাঁহার?' কবিতাটির নামটিই অনেক না বলা বাণীকে বলে দেয়: যা কবিতায় অনুক্ত: 'ভালবাসি না তাঁহায়?' প্রশ্নের কাঁটা, তবে কি, এইভাবেই ধীরে ধীরে বিদ্ধ করতে শুরু করেছে আকাশের বিস্তৃতির দিকে তাকিয়ে থাকা খাঁচার পাখিটিকে?

২. আত্মপ্রকাশপর্ব

ঊনবিংশ শতাব্দীর পুরুষ সম্পাদিত পত্র-পত্রিকায় নারীর পদ্যরচনার অবকাশ ছিল খানিকটা পিতৃতান্ত্রিক উৎসাহদানের মতো করেই। কারণ নারী স্বভাবত কোমল ও সুকুমার প্রবৃত্তির আধার, এবং কাঁথা সেলাই বা হস্তশিল্পের মতো কবিতাও এক প্রকার কারুশিল্প। হয়তো অবকাশ ছিল না মননশীল প্রবন্ধ বা উপন্যাস রচনার। কিন্তু ১৯২০ থেকে ১৯৪০-এর মধ্যে গোটা চিত্রটাই পালটে গেল। বিশেষত বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে মেয়েদের ভূমিকা যে অর্ধেক আকাশের হয়ে উঠতে থাকল, সেই ক্ষমতায়নের পিতৃস্থানীয় অশ্বিনী দত্ত বা সতীন্দ্র সেনের মতো ব্যক্তিত্বরা, আর অগ্নিযুগের অরবিন্দপন্থী বা পরের সময়ের সূর্য সেনের অনুগামিনীরা তার প্রমাণ। আর মেয়েদের ভূমিকাকে অনেকটাই অনস্বীকার্য করে তুললেন গান্ধীও, সরলা দেবী সরোজিনীদের মতো নেত্রী গড়ে তুলে, অসহযোগ অহিংসার মডেলে এ যাবতের সর্বংসহাদের অন্তর্ভুক্ত করার আপাতসরল কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে গভীর অনুধাবনযোগ্য কাজটি করে। ফলত আমরা পেলাম অজস্র মেয়েকে, প্রথমে কংগ্রেসে ও পরে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষিতে। তাঁদের অনেক অনেক লেখা, মূলত মননশীল নিবন্ধ, প্রতিবাদ, আলোচনা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাসও। শুধু ভারতবাসী নয়, এই কালখণ্ড যেন মেয়েদেরও সমাজ শিক্ষা রাজনীতি অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে বন্ধনমুক্তির আকাঙ্ক্ষার যুগ। আবার দেশগত কালগত অভাবনীয় বিপর্যয় আর উদ্বর্তন, মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তনচিহ্নিত এই সময়খণ্ডই আবার, বাংলা আধুনিক কবিতার জন্মলগ্ন। রবীন্দ্র উত্তর, রবীন্দ্রশাসিত এই সময়ে *কল্লোলের* বৈপ্লবিক উন্মাদনা আমরা দেখি, কিন্তু লক্ষ করি না বহু সংখ্যক নারীকে কবি হিসেবে তুমুল আলোচনায় কেন্দ্রিত হতে। তবু তারই মধ্যে রাধারাণী দেবী ওরফে অপরাজিতা দেবীর *বুকের বীণা* (১৯৩০), ১৯২১-এ কনকলতা ঘোষের *অনুরাগ* উল্লেখযোগ্য।

অপরাজিতা দেবী নামের আড়ালে ১২ বছর নিজেকে গোপন করে রেখেছিলেন রাধারাণী দেবী। তৈরি করেছিলেন এক স্বকীয় ভাষা। জীবনের শুরুতে ছিল রবীন্দ্র অনুসারী কাব্যদীক্ষা, তার প্রমাণ রয়ে গেছে *লীলাকমল* (১৯২৯) *সিঁথিমৌর* (১৯৩২) ও *বনবিহগী* (১৯৩২)-তে। কলমের জোরে সে যুগের প্রধান রবিঅনুসারী কবিদের মধ্যে একজন হয়ে ওঠেন তিনি। তখনও তিনি নিবিড় ভাবে ব্যক্তিগত, প্রেম ও মিলনের প্রতি সে যুগের রক্ষণশীলতার

নিরিখে যথেষ্ট নির্ভীক ও অলজ্জভাবে আকাঙ্ক্ষাময়। সংরাগ ভরা কবিতা লিখছেন নিখুঁত ছন্দে (গভীর নিশীথে কান পেতে কভু শুনেছ তুমি/অন্ধকারের আকুল কান্না নিশুতি তলে/স্তব্ধ আকাশে যখন কেবল তারারা জ্বলে)। প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও তাঁর পদচারণা ছিল সাবলীল। তবু, দাম্পত্য-কলহান্তরিত গৃহবধূর খুনসুটিময় দৈনন্দিন জবানিতে লেখা, ইংরিজি বা অ-তৎসম শব্দের প্রাচুর্যে রীতিমতো সমকালীন ও স্মার্ট কবিতায় যে পরীক্ষামূলক কবিতা সৃষ্টি করলেন অপরাজিতা ওরফে রাধারাণী, তা সকলকে চমকে দিল:

'কাল আমাদের ঝগড়া হয়েছে। সে ভারি মজার শোন
কিছুতে কথায় না পেরে শেষটা চটে গেল একজন।
মানলে না তবু হার— দোষ বল তবে কার?
হার যদি ভাই মানতো তা হলে মিটিয়ে নিতুম ঠিক
আমার সঙ্গে সমানে তর্ক? ফল তার বুঝে নিক।'
অথবা
'বেশ করেছি, খুব— তোমার তাতে কি?
দেখতে তোমায় দেবই নাকো আমার হাতে কি!
....
বেশ করবো ড্রয়ার খুলে করবো চুরি সব!
পেন পেনসিল ডায়রি এই ভা-রি-তো বৈভব।
বেশ করেছি,— করছি চুরি— পুলিশ ডাকো গে!
শাস্তি দেবার প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন করতে থাকো গে।
....
আলবৎ! ফের বলব আবার বর নয় বর্বর!
যখন তখন জবর জবাব করবো মুখের পর।'

ছদ্ম যুদ্ধের এই নির্মিত স্টাইলে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিলেন অপরাজিতা দেবী নামের আড়ালে রাধারাণী। নিন্দিতও হতে হয় তাঁকে। লঘু ও চপল বলে, 'অনারীসুলভ' অপবাদে তিরস্কৃত হচ্ছেন একদিকে, অন্যদিকে তাঁর অনুকরণে পুরুষরাও 'অনুরাধা দেবী' নামে লিখতে শুরু করেন। জগদীশ ভট্টাচার্য 'অপরাজিত' 'কলেজ বয়' সিরিজ লেখেন। এই নতুন ধরনের কথ্যভঙ্গির কবিতার ঘরানা প্রতিষ্ঠা সে অর্থে রাধারাণী দেবীরই। বাণী বসু সাম্প্রতিক এক আলোচনায় বলেন: "কোনও লেখক সাহিত্যের নানা শাখায় বিচরণ করলে বুঝতে হবে ফর্মকে তিনি খুবই মূল্য দেন।... রবীন্দ্র-অনুসারী হয়েও আবার সম্পূর্ণ উলটো চালের কবিতা লিখেছিলেন।... অন্য মানুষকে কথা বলানোর এই পরীক্ষা থেকে বোঝা যায় তাঁর সাহিত্য-সম্ভাবনার মধ্যে নাটকও ছিল, এবং ছিল ছোটগল্প।"

'প্রেম যদি খেলা হত ভাল হত তবে/এ জীবন কেটে যেত নিশ্চিন্ত নীরবে' লিরিকধর্মী এই কবিতার কবি এই সময়ের আর এক বিশেষ রবীন্দ্রভাবাশ্রিতা দুঃখবাদী কাব্যব্যক্তিত্ব

প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫)। আলাদা করে তাঁর কাব্যবৈশিষ্ট্য তেমন ভাবে আলোচিত না হলেও, আলোচনায় এ কথা আসে যে এই কবি সমাজসেবা ও কাব্যচর্চায় আত্মবিনিয়োগ করেন বৈধব্য ও সন্তানের অকালপ্রয়াণের পরবর্তী শূন্য জীবনের ব্যথা ভুলতে, অন্তত তাঁর জীবনীকারদের কাছে তাঁর কবিতা লেখবার পটভূমিটি এমনই ব্যক্তিগত। বিশ শতকের গোড়ার দিকের এই কবির রচনা সঠিক ছন্দ ও সুন্দর ভাষাবন্ধনের গুণে কয়েকটি সংকলনে প্রবিষ্ট হয়। *রেণু, তারা, পত্রলেখা, অংশু, চম্পা ও পাটল* গ্রন্থের রচয়িত্রী প্রিয়ম্বদা।

এই সময় দ্রুত পালটে যাচ্ছে। ১৯৩১ সালেই প্রথম লীলা নাগের সম্পাদনায় *জয়শ্রী* পত্রিকা প্রকাশ পায়, মূলত মহিলাদের রচনা প্রকাশের পরিসর তৈরি করতে। নারীর পক্ষে গল্প উপন্যাস কবিতা প্রবন্ধের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের আর কোনও বাধা থাকে না। *বামাবোধিনী* বা *অন্তঃপুর* পত্রিকার সেই পদ্য লেখবার দিনগুলি পালটে গেছে দ্রুত। *প্রবাসী*-তে লেখা পাঠাবার পর দুরুদুরুবক্ষে অপেক্ষায় থাকেন না অন্তরালবর্তিনীরা। শক্তিশালী কয়েকটি শিক্ষিত কলম একে একে উঠে আসেন। তবু ঈষৎ প্রশ্নচিহ্ন নিয়েই যেন বিচার্য হয় মূলস্রোতের কাছে এই 'মহিলা-কবি'দের ভূমিকা। বক্রদৃষ্টি পিছু ছাড়ে না। প্রশ্নটা বোধহয় মূলস্রোত সাহিত্যের গেটপাস নিয়ে। যে জন্যে কোনও সমসাময়িক সংকলনে স্থান করে নেওয়া মহিলাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য থেকে যায়। প্রথম সারির কবিদের নামোল্লেখের সময়েও কদাচিৎ উল্লিখিত হন কোনও নারী। কারণ প্রথমে মহিলা, তারপরে কবি, এমনই এক পূর্বনির্দিষ্ট ধারণায় ঠেলে দেওয়া হয় লেবেল সেঁটে, পৃথক পঙ্‌ক্তিতে। এই উপেক্ষার পরিমণ্ডলের প্রতি বিশেষ সচেতনাবশতই ১৯৪০ দশকের পর থেকে স্বাধীন ভারতের আলোকস্নাতা নতুন তরুণীরা 'আগে মানুষ, তারপরে নারী' এই রকম এক অর্জনের লড়াইতে নামলেন।

৩. সংগ্রামপর্ব: স্ত্রীলিঙ্গ পুনর্নির্মাণ

এই বিন্দু থেকেই আমরা উড়ান দিতে পারি 'আধুনিক' বাংলা কবিতার দিগ্বলয়ে। মেয়েরা এখন নিজেদের লেখা ডাকযোগে পাঠান সম্পাদকের দপ্তরে। এবং নিজের কবিকৃতির দায়িত্বও নেন। মহিলা বলে কোনও পৃথক মনোযোগের দাবি না করেই এক পুরুষপ্রধান, পুরুষনিয়ন্ত্রিত কবিতাবিশ্বে জায়গাজমি দখলের লড়াইতে নামেন, সমানে সমানে। কোনও বিশেষ সংরক্ষিত আসনে বিশ্বাস করেন না এঁরা। একজন সম্পূর্ণ মানুষ, একজন সম্পূর্ণ কবি হিসেবে মর্যাদার যুদ্ধ এটি।

আর কোনও অপেক্ষা নেই এই পর্বে। অপেক্ষা নেই পুত্র, স্বামী, প্রেমিক বা কোনও সম্পাদকের অনুকম্পার। যদিচ গল্প ও কথামালায়, মিথে ও গুজবে, কান পাতলে এখনও অধিক চর্চিত হয় মেয়েকবির কাব্যকৃতি তত না, যতটা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন। ওঁরা দাগি হয়ে যান 'অন্যরকম' হিসেবে, চর্চিত হয় তাঁদের একাধিক প্রেম, অপ্রথাগত জীবনযাপন বা ধূমপানের ইতিবৃত্তই।

তবু, অন্তত গোপন নীরব খাতা থেকে বের হয়ে আসতে থাকে স্পর্ধিত অক্ষরেরা, বেশ কয়েকজন 'অন্যরকম' মেয়ের কলম থেকে। পঞ্চাশ ও ষাটের কবিদের হাত ধরে। যদিও দশকের চিহ্ন নিয়ে আমরা এ মুহূর্তে নিজেদের খুব ব্যস্ত রাখছি না, তবু ইতিহাসক্রম বজায় রাখার একটা চেষ্টা অন্তত থাকবে। রাজলক্ষ্মী দেবী, শিপ্রা ঘোষ, সাধনা মুখোপাধ্যায়, নবনীতা দেব সেন, কবিতা সিংহের আবির্ভাব আধুনিক বাংলা কবিতার সবচেয়ে স্বর্ণময় দশক, পঞ্চাশে, আর ষাট জুড়ে থাকবেন দেবারতি মিত্র, বিজয়া মুখোপাধ্যায়রা। সকলেরই পদচারণা অল্পবিস্তর *কৃত্তিবাস* ও *দেশ* পত্রিকার পাতায়, সুনীল-শক্তি-শরৎকুমার-বেলাল-শঙ্খ-সমরেন্দ্র-তারাপদ-র পাশাপাশিই, এবং সকলেই তুমুল জনপ্রিয় নাম। সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এ সময়ে নারীর চলাচল অবাধ ও গতিময়। সমাজতাত্ত্বিক প্রবন্ধে, গম্ভীর বিদ্যাচর্চায় বিশেষত বিজ্ঞান শাখায়, প্রযুক্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় উপচে পড়ছে মেয়েদের মেধা ও মনন। রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁদের সোচ্চার উপস্থিতি। সামগ্রিক ভাবে এই সময়টাই মেয়েদের ক্ষমতায়নের। উপস্থিতির স্পষ্টতা ও দৃঢ়তায় বোঝা যায়, কবিতায় মেয়েরা পরিশ্রম ও বুদ্ধিজীবিতায় যেন এক দেড় প্রজন্মের তফাৎ নয়, প্রায় এক কোয়ান্টাম উল্লম্ফনের সাক্ষ্য দিলেন।

রাজলক্ষ্মী দেবী যাপনে ও কবিতায় প্রথাভাঙা, সাহসী মানুষ। ১৯৫৭-তে *হেমন্তের দিন* কাব্যগ্রন্থে যে পথ চলা শুরু হয়েছিল, তা থামেনি ৯০ দশকেও। অসংকোচ আত্মস্বীকারোক্তির এক নিরাবেগ ও সংবেদনশীল পথে চলে তাঁর কবিতারা: 'জানি আমি একদিন বুড়ি হবো' এমন এক আটপৌরে চিন্তা থেকে চলা শুরু করে তিনি পৌঁছে যান এক তুমুলে:

> 'এমনি মেহগ্নি আলো বিকেলের জানালাকে ছোঁবে
> নরম চাঁদের বল ফের উঠে আসবে আকাশে
> বাতাস সাঁতার দেবে সবুজ ঢেউয়ের মত ঘাসে
> আকাশের বুক ভরে তারারা বিছানা পেতে শোবে।
> শাদা চুল, নেড়া দাঁত, আয়নার ভ্যাংচানো ছায়াকে
> তখনো বলবো আমি রাজচ্যুত রাজ্ঞীদের ভাষা
> 'জানিস, আমারো ছিল সে এক আশ্চর্য ভালোবাসা:
> তোর কী ক্ষমতা আছে, মিথ্যে করে দিবি সে পাওয়াকে?'

আর একটি কবিতায় তাঁর আত্মবীক্ষণ টানটান, শাণিত:

> পাখা উঠেছিল একটুক্ষণ।/আগে ইতিহাস অন্ধকার/পরে কাচে ঢাকা বন্ধ দ্বার/তবু পলভর পরাণপণ।/পাখা উঠেছিল মরতে, তাই/আগুনে ঝাঁপাবো ভালবেসে...

স্বকীয়তার কারণে রাজলক্ষ্মীই পরবর্তী যে কোনও সংকলনে এই পর্যায়ের এক অনিবার্য প্রতিভূদের মধ্যে অগ্রগণ্যা ও প্রথমা। এর পরই বাংলা কবিতার পাঠককে স্তম্ভিত করে দিয়ে অবিসংবাদিত স্পর্ধায় আবির্ভূত হন এক মূর্তিমতী প্রতিবাদ:

না আমি হব না মোম
আমাকে জ্বালিয়ে ঘরে তুমি লিখবে না
হব না শিমূল শস্য সোনালি নরম
বালিশের কবোষ্ণ গরম।

কবিতা লেখার পর বুকে শুয়ে ঘুমোতে দেব না
আমার কবন্ধ দেহ ভোগ করে তুমি তৃপ্ত মুখ
জানলে না কাটামুণ্ডে ঘোরে এক বাসন্তী অসুখ

লোনা জলে ঝাপসা হল চুপিসাড়ে চোখের ঝিনুক।

'না' বলে এই কবিতাটির মধ্যে দিয়েই কবিতা সিংহ যেন পূর্ণ ভাস্বরতা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ১৯৬৫-তে প্রকাশিত *সহজসুন্দরী*, ১৯৭৬-এ *কবিতা পরমেশ্বরী* আর ১৯৮৫-তে *হরিণা বৈরী*: এই তিন যুগফলকের স্রষ্টা কবিতা সিংহ, যাঁর অধিকাংশ কবিতাই থাকে অগ্রন্থিত, অতিপ্রসবের দোষ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য। নিজেকে নব নব আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই তিনি নিজের কবিপরিচয় প্রোথিত করেন, সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন 'মহিলা' তকমাকে। চালু ফেমিনিস্ট তত্ত্বকথার অধুনা বাজারচলতি ফর্মটি সাগরপার থেকে আমদানি হবার বেশ কিছুকাল আগেই নারীর এক পৃথক সক্রিয় সত্তা, পুরুষকবির মিউজ বা উদ্দীপন হিসেবে নিষ্ক্রিয়তা থেকে মুক্ত, সত্তার কথা লেখেন তিনি। খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করেন যৌনতা নিয়ে। তথাকথিতভাবে পুরুষালি তাঁর কলম।

প্রথম কবিতা সিংহই বাংলা কবিতার পাঠককে প্রাপ্তবয়স্ক ধরে নিলেন, এবং এই তথ্য জানালেন যে অশ্রু আর মূত্র একই উপাদানে গঠিত, শুধু তারা 'বিভিন্ন পাইপে যায় চক্ষু আর শিশ্ন অভিমুখে।' ভুলে গেলে চলবে না, এই সময়েই *কৃত্তিবাস*-এর পৃষ্ঠায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন, ''কিছুক্ষণ ডুবেছিল যোনির ভিতরে জিভ লবণের স্বাদ ছাড়া আর/কিছুই আনেনি তবু অসম্ভব ভালোবাসাবাসি হল অসম্ভব''। বাংলা কবিতার এক ভিন্ন কর্মসূচি এসে গিয়েছে, এটা ১৯৬২ সাল। ভুললে চলবে না ১৯৬৩-তে ভালেন্তিনা তেরেশকোভা মহাকাশে পাড়ি দিলেন বন্ধুরাষ্ট্র রাশিয়ায়। কাগজে কাগজে হই হই চলছে তা নিয়ে। ১৯৬৯ সালেই তো মানুষ পা রাখবে চাঁদে। ১৯৬৮-তে বেলাল চৌধুরী *কৃত্তিবাস*-এ লিখেছেন 'শরীর দিয়েই শরীর থেকে শব্দ এবং আগুন' নিষ্কাশন করার রহস্য। তাই ১৯৬৩-তেই যে কবিতা সিংহও লিখে ফেলবেন 'দারুণ সস্তায়' কোনও বিকল্প পুরুষ কিনে ফেলার একটা কল্পবৈজ্ঞানিক সম্ভাবনার কথা, এতে আশ্চর্য হই না আর। 'সেকেন্ড হ্যান্ড' বাজার থেকে, যা ''বাতিল স্বয়ংক্রিয় এবং যাতে একশো চুম্বন পাবে এই লাল সুইচ জ্বালালে/চারশত খোসামোদ, কবিতার উদ্ধৃতি সমেত/আলিঙ্গন/যৌনক্রিয়া/মুগ্ধচোখে চেয়ে থাকা খয়েরি গোলাপি নীল এইসব বিবিধ বোতামে'' পাওয়া যাবে।

নবনীতা দেব সেন সাম্প্রতিক মেয়েদের এক সাম্প্রতিক কাব্যসংকলনের শুরুতে উৎসর্গপত্রে লেখেন, ''আমাদের প্রিয় পূর্বসূরী/কবিতা সিংহকে/যিনি সময়ের আগেই/পৌঁছে

গিয়েছিলেন।" কোনও ঢাক ঢাক গুড় গুড় ছাড়াই, কোনও কপটতা, আলতো প্রশস্তি ও কুসুমপ্রস্তাব ছাড়াই অনাড়ম্বর গভীর উচ্চারণে কবিতা সিংহ নারীকে তার সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করালেন।

ক্রুদ্ধ বা প্রতিবাদী না হয়েও একক ও স্বাধীন কবিসত্তার অধিকারিণী এক অন্য ঘরানার কবি নবনীতা দেব সেন। বিশুদ্ধ কবিতার কাছাকাছি তাঁর কবিতাদর্শ। আপাত ভাবে সব রকমের নারী-ভাষা-অভ্যাস বর্জিত। অথচ 'আমি আর চাঁদ সমানবয়সী বন্ধু/সময়ের বুক চিরে চিরে ছুটে চলছি/কুমারী আকাশে আমরা একক সৃষ্টি/পৃথিবীর শুরু পৃথিবীর শেষ আমাতে'— রাত্রির ট্রেন ভ্রমণের পরিণতিতে কোনও এক জেগে থাকা নারীপরিব্রাজকের এই উত্তরণ হলে, ধরে নেওয়া যায়, খুলে গেছে সেই আত্মার তৃতীয় নয়ন, যে আত্মা স্বতই লিঙ্গবিহীন। এখানে ব্যক্তি কোনও নারী বা পুরুষ নন আর, এক স্বয়ম্ভু মানুষ। 'এবার নিজেকে পেলে' এই সদর্প উচ্চারণে অপরের প্রতি ক্রোধ-ক্ষোভ নেই, আছে নিজেকে খুঁড়ে তোলার আত্ম-প্রতিবিম্বন-স্পর্ধা। 'চুলের ভেতরে চ্যুইং-গাম হয়ে আটকে আছে চোদ্দ বছর বয়েস/...বুকের ভেতরে এই ষাট মাইল নির্জন নির্যাস মঞ্জরিত শালবীথি/চোয়ালের ভেতরে পর্বত' এমনই এক নিরবলম্বন আত্মস্থতা অর্জন করেছিলেন নবনীতা। "এবার আমাকে তবে গ্রহণ করো, কলকাতা/আমিই তোমার প্রেম, তোমার পৃথিবী।/ব্যূহ ভেঙে এই তো ফিরেছি, 'মৃতবৎসা, সসাগরা'/শূন্যকোল/অথচ দুধের ভারে অবনতস্তনী/এই দ্যাখো তলহীন লবণাম্বুরাশি দুই চোখে।" নিজেকে চিরে ফেলার, অকরুণ হবার অভ্যাস লালন করেছেন তিনি। নিজের কবিতার জন্য রচনা করেছেন এক নিরিবিলি প্রাইভেট স্পেস। নবনীতা দেব সেন মেয়েদের কবিতা নিয়ে লিখতে গিয়ে বলেছিলেন, "মেয়ে হয়ে কবিতা লেখার একটা মুশকিল হল মহিলা কবি বনে যাওয়া। কবিতাদি এই শব্দটিতে প্রচুর প্রতিবাদ জানিয়েছেন, কিন্তু ধারণাটি পাঠকচিত্তে বদ্ধমূল।... আমাকে অনেকবারই শুনতে হয়েছে— নবনীতা, এ সপ্তাহের 'দেশে' তোমার কবিতাটি বড় ভাল লাগল। আমাকে তখন সবিনয়ে জানাতে হয়েছে— এবারের 'দেশে' তো? ঐ কবিতাটি অবশ্য বিজয়া লিখেছে। ধন্যবাদ।"

সামান্য পরে কিন্তু প্রায় একই সাথে লিখতে এলেন দেবারতি মিত্র ও বিজয়া মুখোপাধ্যায়। দুজন সম্পূর্ণ দুই রকমের কবিতায় ঔজ্জ্বল্য আনলেন। দেবারতির কবিতা *অন্ধ স্কুলে ঘণ্টা বাজে* (১৯৬৭)-র যুগ থেকে আমাদের শোনায় এক অপরূপ অন্য পৃথিবীর কথা যা নিশ্ছিদ্র ও নিটোল। শোনায় 'কাচের মতন শান্ত হৃদয়ের' কথা, বা 'নির্জন হ্রদের ধারে জোড়া নীল পাহাড়ের/করবী উজ্জ্বল খাঁজে' সকাল হবার কথা। মনে পড়ে যায় ইমপ্রেশনিস্টিক ছবির কথা, মনে পড়ে যায় শরীরের কথাও। মৃত্তিকালীন, উদ্ভিজ্জ, নীরব কামময় এক শরীর এ যেন। নারীকেন্দ্রিক এক বিশ্বের পুরুষেরাও কত কোমল ও সুন্দর, গ্রিক দেবতাদের মতো! দেবারতিই প্রথম রচনা করলেন এই দৃশ্যপট, যেখানে 'প্রিয়তম পুরুষটি এক পা একটুখানি উঁচু করে' থাকলে তার 'সুকুমার ডৌলভরা মাংসল ব্রনজের উরু' 'হঠাৎ সচল হয়ে ডাকে তরুণীকে'। এই কবিতার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্‌যাপিত হল যেন প্রথম নরনারীর প্রেম, যেন পুনরাবিষ্কৃত হল পৃথিবী, স্বর্গীয় উদ্যানে আদম ও ঈভের জুটি।

এক ঝলক তাজা বাতাস যেন বয়ে গেল যৌনতার অতিচর্চিত তল্লাটে, যখন মেয়েটি 'অসম্ভব অনুরক্ত শিশুসুলভতা নিয়ে/অচেনা আশ্চর্য এক লালচে কিসমিসরঙা/ফুলের কোরক মুখে টপ করে পোরে,/মাতৃদুধের মত স্বাদু রস টানে।/ক্রমে তার মুখে আসে/ঈষদচ্ছ অনতিশীতোষ্ণ গলা মোম/টুপটাপ মুখের গহ্বরে ঝরে পড়ে/পেলিকান পাখিদের সদ্যোজাত ডিম ভেঙে জমাট কুসুম নয়,/একটু আঁষটে নোনতা স্বচ্ছ সাদা জেলি'। কবিতার জন্য এক পৃথক জগৎ নির্মাণ করেন দেবারতি, তৈরি করেন মেয়েদের বোধের এক নতুন বাচন।

তৎসম বাংলার স্পর্শ-উজ্জীবিত এক নিজস্ব ভাষাবয়ন করেছিলেন বিজয়া মুখোপাধ্যায়। দৃঢ় বাঁধুনিতে বাঁধা ছন্দ-গম্ভীর এই শৈলীতে তিনি পরিণত ছিলেন প্রথম কাব্যগ্রন্থ *আমার প্রভুর জন্য* (১৯৬৭) থেকেই। 'আমাকে আমার প্রভুর জন্য পবিত্র থাকতে দাও/সূর্যসংবেদনে বজ্রে/আমাকে উৎকীর্ণ করো না।' তিনি নিঃসংশয়, স্পষ্টবাদী, মেধাশীল। কিছুটা বা শ্লেষাত্মক।

> 'বিশ্বের সমস্যাপূরণের ভার/তোকে দেওয়া হয়নি, পুঁটি।/ভারতবর্ষ বোমা বানাবে কিনা/আমেরিকা ভিয়েতনাম ছাড়বে কবে/অটোমেশনের বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষর জরুরি/এসব ভাবনা তোর নয়।/বিকেলে গা ধুয়ে তুই খোঁপা বাঁধ/লক্ষ্মীবিলাস তেল দিয়ে/...মনে রাখিস, পুঁটি/এই তোকে ছেলে মানুষ করতে হবে/ধিঙিপনা তোকে কি সাজে, ছি।'

এই কবি অতএব, নারীর সত্যকে যেমন ভেতরে থেকে দেখেন, তেমনি তার সত্যকে প্রকাশ করতে পারেন বাইরের দিকে গিয়ে, নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও নিস্পৃহ করে রেখে। বিজ্ঞাপন দেখে লক্ষ করেন 'গর্ভপাত তাহলে সম্ভব পাঁচবার।' অকপট হতে পারেন: 'ভেতরে যাকে লালন করি/সে আসলে অহংকার/আমার বেড়ালছানা।' বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় কোথাও আছে একটি নীতিবোধ, সত্যের প্রতি এক ধর্মীয় আনুগত্য, যার সাথে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম সংযুক্ত নয়। রাজনৈতিক, এবং মানবিক ভাবে সঠিক কবিতা রচনা করেন তিনি।

কৃত্তিবাস আন্দোলনের সময়ের আর যে ক'জন কবিকে আমরা এ সময়ে চিনে নিয়েছিলাম তার মধ্যে ছিলেন অকালপ্রয়াতা মঞ্জুলিকা দাশ, সাধনা মুখোপাধ্যায় (বেশ কিছু শহুরে ও চমকপ্রদ স্মরণযোগ্য পঙ্‌ক্তি দিয়েছেন আমাদের: 'খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসে জন্মদিন/বুড়িয়ে বুড়িয়ে যায় দেহ/ফুরিয়ে ফুরিয়ে যায় আয়ু/জড়িয়ে জড়িয়ে যায় স্নেহ'), অধুনা প্রবাসস্থিত কেতকী কুশারী ডাইসন (আমি তো মিশরের মেয়ে নই/আমি তো সুদানের মেয়ে নই/আমি বাংলার মেয়ে/আমাকে সুন্নৎ দেওয়া হয়নি/আমার সম্পূর্ণ সত্তাই/সাক্ষ্য দিচ্ছে।/)। কেতকী তাঁর এক কবিতায় জানিয়েছিলেন রদ্যাঁর বান্ধবী কামিল ক্লোদেলের কাহিনি, যিনি নিজেও ছিলেন এক অসামান্য ভাস্কর, কিন্তু, 'সমালোচকেরা বলেছিলেন যে কোনো মহিলার পক্ষে/দুটি আলিঙ্গনরত নগ্ন মূর্তি তৈরি করা/অমার্জনীয় ধৃষ্টতা, ছিঃ, লজ্জার বিষয়।'

৪. ভাষার পৃথিবী: রান্নাঘর, আঁশবটি

পঞ্চাশ ও ষাট পেরিয়ে আমাদের এই লেখা এখন এসে থেমেছে ৭০ দশকে, যদিচ নিখুঁত দশকের ভাগে মেয়েদের ঠেলে দিতে পারিনি আমি। ৭০ শুনলেই বাঙালির মনন আর্দ্র

হয়ে ওঠে 'মুক্তির দশক', গর্জন সত্তর প্রমুখ ভাষা অনুষঙ্গে। লক্ষণীয়, এই দশক বিশেষ ভাবেই পুরুষপ্রধান। যৌবনের শক্তি ও দুর্ধর্ষতায় মাখানো, রক্তাক্তও কখনও বা। ভুললে চলবে না এর অভিঘাত। '৬৮ সালেই ফরাসি যুব আন্দোলন ঘটে গেছে, আমেরিকা দেখেছে ছাত্র আন্দোলন, হিপি আন্দোলন। কৃষ্ণা বসু ও গীতা চট্টোপাধ্যায়: এই দশকের দুটি নাম উঠে আসে, আশ্চর্য ভাবে দুই কবিই নারীর নিজস্ব বিশ্বের প্রতি সচেতন। একজন অন্তর্মুখী ও চিরায়ত, অন্যজনের কবিতা নারীবাদে উদ্দীপিত ও সমাজপরিবর্তনের দিকে ফেরানো।

আসলে এখানে প্রশ্ন উঠতেই পারে ক্রমবিকীর্ণ রাজনীতিকরণের ভেতরে, বাংলার বাম-অতিবাম-অতিদক্ষিণ, প্রগতিশীল-প্রতিক্রিয়াশীল এই সব রকমের রাজনৈতিক রঙের মাঝখানে মেয়েদের কবিতাগুলির রংবিভাজন কীভাবে করছি। এ ক্ষেত্রে বোধহয় এই নিবন্ধ লেখকের অবস্থানটা স্পষ্ট করে নেওয়াই ভাল। যে নারীবাদের প্রতি পুরুষের অভিযোগ রয়ে যায় পুরুষবিরোধী একজাতীয় মৌলবাদের, তাকে নস্যাৎ করেই বলা যায়, নারীর নিজস্ব আত্মপ্রকাশের ভেতরে যে সদর্থক শক্তি আমরা খুঁজে পেতে শুরু করেছি ষাটের দশক থেকে, তাকেই আমরা রাজনৈতিক অবস্থান বলে মনে করছি। আমরা জানি, যা কিছু ব্যক্তিগত, তাই পবিত্র। বুদ্ধদেব বসুর ওই কথাগুলি শুধু মেনেই নিইনি আমরা, তার পরেও স্বীকার করেছি, যা কিছু ব্যক্তিগত, তাই-ই রাজনৈতিকও। একটি মেয়ের সামাজিক অবস্থানের ভেতরে থেকেই, তাকে অস্বীকার না করেও, নিজের জন্য নিজের একটি কবিতা লিখে উঠতে পারা, এমনকী তার প্রথমবার কাগজে কলমের আঁচড় দেবার ঘটনাটিও একটি রাজনৈতিক ক্রিয়া বলে আমরা মনে করি, আমাদের সমাজে সচেতন একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ। কারণ কবিতার উপনিবেশ প্রথাগত ভাবেই পুরুষের একচেটিয়া এবং মেয়েদের ভূমিকা সেখানে হয় বিষয়ের, ভোগ্যের, উদ্দীপনের, মিউজের, অথবা বহিরাগতের।

৭০ ও ৮০, এই দুই দশক ধরে এক পরীক্ষিত ভাষাসত্যে উপনীত হবেন বাংলা আধুনিক কবিতার অতিপরিণত এই ক্ষেত্রটির মেয়েরা। সচেতন কারুবাসনায়, জটিল মননে, বহু পাঠে সূক্ষ্মতর হয়ে উঠেছে কবিতার বোধ, পুরুষনারীনির্বিশেষে। মেয়েরা কবিতায় যেন অর্জন করেই ফেলেছেন সেই সফলতা, যা এখন কেবল জীবনের যন্ত্রণাকে ছুঁয়ে ছেনে নানা অপরূপ ভঙ্গিতে দেখে চলবে। স্বাভাবিকতার চেয়ে প্রাধান্য দিলেন শৈলী ও শিল্পে তন্নিষ্ঠতাকেই, ভাষাবিশ্বে বুঁদ একদল মেধাবী এবং প্রতিশ্রুতিময় কবি। জীবনযাপনে মুক্ত, ভাষায় সংবেদনশীল, স্পর্শকাতর। আগের ২-৩ দশকের মেয়েদের মতো, পুরুষের সাথে সমকক্ষ হবার চেষ্টাকৃত পুরুষালি বাচন নয়, নারীপরিচয়ের ভেতরে থেকে নারীর জন্য পৃথক শব্দভাণ্ডার, সম্পূর্ণ ও আত্মস্থ এক ইউনিভার্স অফ ডিসকোর্স রচনার প্রয়াস পেলেন।

গীতা চট্টোপাধ্যায় দার্ঢ্যগুণসম্পন্ন অথচ নির্জন। বঙ্গসংস্কৃতির আদি ধারায় আস্থাশীল, আবার সমালোচকও। 'উঠোনে ধানের রাশি খেয়ে যায় মহিমায় ঘোড়া/কর্তার ঘোড়ার সামনে কী করে বা যেতে পারে নারী।' নির্মাণে স্বয়ংসিদ্ধা গীতার খ্যাতি আর এক বিশেষ কারণে, তিনি সম্পূর্ণ অন্তরালবর্তিনী। অব্যর্থ ছন্দকুশলতায় এক আলোছায়াময় কৌম ও প্রাচীন পৃথিবী ফুটে ওঠে তাঁর লেখায়। " 'আর তুই পুতুল খেলবি'?/কপালে দিলেন লাল

দাগা।/'আর তুই চৌকাঠ ছাড়াবি'?/হাতে দেন রাঙারুলি শাঁখা।/'ঘাটে গিয়ে দেরি হবে তোর?'/দু'পায়ে আলতার শক্ত ডোর।/বেদনা আরম্ভ তারপরে/অন্ধকার শিল্পের ভেতর।"

'মৎস্যমিথুনের গান', 'অন্নব্রহ্ম' ('সাদা ভাত, জুঁইফুল সাদা ভাত, ঘরে ঘরে ফুটে ওঠো। ঝাঁ ঝাঁ খিদের সময়, খাক বিধবা মায়ের রোগাভোগা ছেলে। হাপুস হুপুস খাক ধানের মাটির গন্ধমাখা চাষা। ...সাদা ভাত, আহা ভাত, রক্তবীজ সৈন্যের মুদ্রায় হাজারে হাজারে এসো, লক্ষ কোটি অযুত নিযুত ভাত ঢেকে ফেলো তৃতীয় বিশ্বের এই কঙ্কাল শরীর।...') 'মেয়ে মানুষের লাশ' অথবা 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার গল্প' এই সব কবিতার জন্য কৃষ্ণা বসুকে মনে রাখবে বাংলাভাষা। তুমুল জনপ্রিয় কবি কৃষ্ণা একবার বলেছিলেন, তাঁর 'আঠারো আনার সত্য' কবিতাটি পড়ে একটি মেয়ে আত্মহত্যার কিনার থেকে ফিরে আসে, পরে সে কথা জানিয়েছিলেন সেই পাঠিকা। এ প্রাপ্তি কম নয়, বিশেষত আবৃত্তিযোগ্য, সহজ ও ছন্দোময় অসংখ্য কবিতার এই স্রষ্টা বাংলার বহু মেয়ের মনের খুব কাছাকাছি যেতে পেরেছেন।

গীতা চট্টোপাধ্যায়ের ভাববলয়ে যদি আমরা পাই পোড়াচোখ, কোরা শাড়ি, জোনাকিকাঁটার খোঁপা, কর্তা, ঘনবর্ষা, অবাধ ঘোমটা জাতীয় নারী-আনুষঙ্গিক শব্দমালার বিশেষ সুষমাময় প্রয়োগ, তাহলে এর পর পরই শিবরাত্রি, গমসুন্দরী, ঘোড়ারোগ, বেহুলা, ব্রতকথা প্রভৃতি শব্দচয়নে চিনে নেব সুতপা সেনগুপ্তকে। লক্ষ রাখতে হবে নমিতা চৌধুরী, সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, বুবুন চট্টোপাধ্যায়, রমা ঘোষ, অনিতা অগ্নিহোত্রী, অঞ্জলি দাস, কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়, অর্চনা আচার্যচৌধুরী, অহনা বিশ্বাস, মহুয়া চৌধুরীদের কবিতার দিকে। সমসময়ের নানা কবির লেখায় গ্রন্থনামকরণ থেকে আরম্ভ করে (ঠাকুরমার ঝুলির ভূমিকা, স্ত্রীর পত্র, বান্ধবীর ডায়রি থেকে, বসন্ত-উৎসব, বসন্ত-প্রকৃতি) কবিতার মুড তৈরির উপকরণে পৌনঃপুনিক কিছু ভাবনা বা থিমের ব্যবহারে, মিথ ও প্রতীকের ব্যবহারে এঁরা প্রত্যেকেই স্পষ্ট ও পৃথক জগতের অধিবাসিনী হলেও, কোথাও যেন একসূত্রে গাঁথা।

এ সময়ের কবিতার এই বিশেষ প্রবণতা, প্রতি কবির স্ব-স্ব ডিকশনের অনিবার্যতা সহই, আমাদের চিনে নিতে অসুবিধে হবে না শুধু উদ্ধৃতি থেকেই। 'কমলফুলের গন্ধে কতদিন বসেনি আসর/আটচালায়, মহামায়াতলা/পড়ে থাকে, বিজন মন্দিরে ঘাস, ফাটলে দুর্বার/নুন ঝরে' (কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়), 'কেরোসিন কিনি স্বপ্নে, গায়ে ঢালতে শীত করে খুব', 'চোখে সুরমা এঁকে আমি বেণীগুছি বুকে টেনে আনি', 'মেয়েছেলের অধম, বলে হেসে ওঠে গুঁফো দ্বিজনাথ', 'ঘুরপাক খেয়ে এসে থেমে যেতে হবে হাসিমুখে/প্যালা পড়বে, সেলামের ছল করে নিচু হয়ে টাকা/তুলে নিতে গিয়ে শুনব— আড়খেমটা ধরেছে শহর' (সুতপা সেনগুপ্ত)। 'সুখের রন্ধনশাস্ত্র শিখি নাই, রসায়ন ভেজাল আমার'— এমন রসিকতাময় সাধুভাষার প্রয়োগ একমাত্র সুতপার কলম থেকেই ঝরে, এমন শ্লেষ ও শীতল চাকুর মতো শব্দভেদের অনায়াস ভঙ্গিমা: তৎসমের সাথে আরবি ফারসি, তদ্ভব ও দেশিকে মিলিয়ে: জন্নত-এ-শৃঙ্গার-এর মতো শব্দবন্ধ রচনার সাহস।

জটিল হয়ে যাওয়া সময়ের আর এক জটিল হয়ে যাওয়া মেয়ে সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'লম্বা শাদা বস্তু করে, মেরে, তাতে লিখে রাখছে অনর্থ কবিতা/আঁচড়ে দিচ্ছে কলমের নখ দিয়ে রাত্তিরের ধারালো বাতিতে/নষ্ট করছে ছেলেবেলা ছিন্নপত্রে, মুখ গড়ছে কালো কলঙ্কের/এইসব ভয় আমি আমাকে দেখাই, আর কাকেই বা বলব, কাগজ!' এভাবেই নিজের নির্যাস ব্যক্ত করেন তিনি। শরীরের নুন, উনুন, রান্নাঘর অবলীলায় তাঁর লেখা নারীপৃথিবীর ভূগোল এভাবেই চিহ্নিত করে। 'রান্নাঘর, আজ তুমি আমাদেরও খাবে?/শিলে পিষে, ঝালে নুনে জড়াবে আবার?/উদ্ভিদে পরখ করবে বঁটির কী ধার/হাঁড়ির বাষ্পের মুখে সুস্বাদ জাগাবে।'

বিষাক্ত জীবনবেদ লিখছেন এই এক সময়েই চৈতালী চট্টোপাধ্যায়। প্রথম বই *বিজ্ঞাপনের মেয়ে* (১৯৮৮) থেকেই স্বতন্ত্র, অথচ সময়ের মুখপাত্রী। এক টানটান সরু সুতোর উপর দিয়ে হেঁটে যাবার মতো টেনশন জড়িয়ে থাকে তাঁর আপাত নিরীহ শব্দচরাচরে। 'ডিমের কুসুমের মতো আলোজ্জ্বল রান্নাঘর, সমস্ত আমিষ।' বিষ, জল, ভয়, শব্দগুলি বারবার কুণ্ডলি পাকিয়ে থাকে কবিতায়। চৈতালীর নারী নিজের দুঃখময় জীবনের নিয়ন্ত্রণ রাখে নিজেরই হাতে। ছুটন্ত জীবনে সন্তানের টিফিন গুছিয়ে দেওয়ার উর্ধ্বশ্বাস ও স্বামীর অমনোযোগের কাঁটা ক্ষত করে একই সাথে। 'সর্ষের ঝাঁজ' যেখানে স্বামীর বন্ধুকে 'গল্প দেওয়া'র সমার্থক। 'যার কোন উত্থানপতন নেই, আমি সেই/ছাতাপড়া অঙ্গটিকে গড় না করতেই পারি,/যদ্যপি সে আমার স্বামীর।/শেষ জলবিন্দুটিকে, নিঃশেষ, না পাই, তো,/যাচ্ঞা করতে পারি অন্য মেঘ।/যদি অহল্যাও হই, ইন্দ্রের কাছে যাব, বারবার, পাষাণ হব না।' অথবা 'এ মুহূর্তে মেয়েটি নিজেকে ভুবনেশ্বরী বলে বোধ করে।/কেননা নিজেকে সে এইমাত্র একটি পুরুষকেন্দ্রে স্থাপন করেছে।/নাসাপথে ধুম ও আগুন, ললাটে স্বেদবিন্দু/এইবার সব তার নিয়ন্ত্রণমতো।'... ''যখন প্রেমিক ছিলে, 'চাঁপার কলির মতো আঙুল' বলতে,/যখন কর্তা হলে, আমার হাতের রক্তে/মাছের রক্ত মিশে বঁটি ধুয়ে গেলে,/আমাকে 'অকর্মা' ডেকে, আঙুল মুচড়ে ভেঙে দিলে'— চৈতালী মেয়েদের জীবনকে এভাবেই দেখেন, তার দৈনন্দিন অবমাননায় এবং সংগ্রামে।

এই সময়ের মেয়েদের লেখা পড়লে মনে হয়, কবিতাই কবিতার শেষ গন্তব্য। আরও চাপা গলায় আরও ভয়াবহ এই নারীবিশ্বের গল্প বললেন অঞ্জলি দাশ। তাঁর *চিরহরিতের বিষ* উৎসর্গ করা হয়েছে চুনি কোটালকে। চুনিকে নিয়ে তাঁর লেখায় পড়ি:

'ফর্সা হয়ে উঠেছে দেওয়াল, মাথা থেকে খুলে পড়ছে শাপ-/শাপান্তের মেখলা। চোখ বুজে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম সিন্দুকের চাবি।/পড়ে নিয়ো কতবার না না লেখা আছে ঠোঁটে, আর জিভ কেন/কৃষ্ণবর্ণ— ওটুকু জানাতে পারিনি শেষপর্যন্ত।/শুধু কপালের চামড়া সরিয়ে দেখাতে চাই, আরেকটি সবুজ/রঙের স্লেটে সোনার জলের ছবি। কত যত্নে মা লিখেছে/বড় হও, মা লিখেছে গাছের ছায়ার মত সত্যি হও।/জানাতে চাই, কতবার মাথা নুইয়ে তবে মহাশূন্যের সমস্ত ভর/সহ্য করেছি একা...। আজ ঘুম।'

অনুরাধা মহাপাত্র আর এক নির্জন কবি, কলমের কালো এক অন্ধকার মেয়েদের পৃথিবীতে মাখিয়ে নেন: 'ট্রেনের আকাশ থেকে মেয়েদের গলা শোনা যায়;/যেন বৃষ্টিতে ডেকে ওঠে ঘনস্বরে হাঁসিনীর দল/...ঠোটে ঠোঁট, চোখে চোখ মেয়েরা আকাশ গড়ে/আকাশের নিভৃত ভেতর;/মেয়েদের চেকপোস্ট, টিকিটের প্রয়োজন নেই।'

চল্লিশ চাঁদের আয়ু-তে নারীর আদিম পৃথিবীর কথা বার বার বলেও, নিজের ঘরানা বদলে নিয়ে, দুরূহ কবিতার খোলশ ছেড়ে সচেতনেই কম্যুনিকেশনকে বেছে নিয়েছেন আশির আর এক শক্তিশালী কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত। *আমি সিন্ধুর মেয়ে* (১৯৮৮) বা *অর্ধেক পৃথিবী*-তে (১৯৯৩) নিজের নারীপরিচয়ের ভেতর থেকেই 'ফ্রয়েডকে খোলা চিঠি' বা 'আপনিই বলুন, মার্কস'-এর মতো পুরুষতন্ত্রকে সরাসরি আঘাত করা কবিতায় নিজেকে করেছেন সহজ অথচ সত্য, মর্মবিদারী। 'নারীর জরায়ুজমি লাঙল চাইছে/যদি অসমর্থ হই, ভাড়া করে, নিয়োজিত করে/অথবা যে কোনোভাবে বীজ এনে দেব'। 'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে'-র মতো কবিতা বাংলা ভাষায় খুব বেশি নেই: 'পুরুষ জননী ছিল পুরুষ জনক/পুরুষ স্বয়ং লিঙ্গ এবং জরায়ু/আমরা হিস্ট্রি থেকে এ রকমই জানতে পেরেছি/আসলে হিজড়ে ছিল ইতিহাসবিদ।' কর্কটরোগশয্যায় শুয়েও উন্মুক্ত করেছেন জীবনবোধ: 'ওষুধে অসুখ সারে, তবুও সারে না/শুধু জানি ভালবাসা আমাকে বাঁচাবে/আমি মরে গেলে যারা খুশিতে উড়বে/তাদের সবার চেয়ে শক্তিমান সন্তানের চুমু।'

তসলিমা নাসরিনের উল্লেখ এখানে অনিবার্য হয়ে যায়, যদিচ এ-বাংলায় তাঁর পরিচিতি গদ্যকার হিসেবেই প্রধান। বাংলাদেশের এই লেখিকা মেয়েদের পণ্যায়নের কথা সোচ্চারে বলেন। অবদমনের একপিঠ তিনি লেখেন, অনবদমনের কথা লিখতে চাইলেও, আত্মজীবনীর পৃষ্ঠাতেই তা থাকে, কবিতায় ডানা মেলে বসে না। কিন্তু নারীর এই পুরুষশাসিত বাস্তবও যে সত্যি, তা আমরা ভুলতে পারি না। 'তাকে লাল রঙ জামা পরানো হয়/কারণ লাল একটি চড়া রঙ, সহজে চোখে পড়ে/...তার কান ছিদ্র করা হয়, একই সঙ্গে নাকও।/...তার হাতে চুড়ি পরানো হয়/অনেকটা হাতবেড়ি, অনেকটা শিকলের মতো এর আকার।.../একটি মানুষকে এভাবেই পণ্য করা হয়।'

অনিতা অগ্নিহোত্রী লেখেন লিরিকধর্মী কবিতা, কিন্তু পেছনে যে কণ্ঠটি কথা বলে, তা মানবতাবাদী। আদিবাসী জীবন, মৃত্তিকালীন জীবন, ভারতের কাঁকরে ভরা লালমাটির দেশের রোদেপোড়া মানুষের জীবন সেখানে প্রাধান্য পায়। 'আলো ঢলে আছে, সে কি আমাদের কেউ/ঝিয়ারী, দুহিতা কেউ, রাঙা বউ, ক্ষুধার্ত দিনমজুরের ছোট মেয়ে/দু মুঠো ভাতের জন্য ঢলানী হয়েছে'। জয়া মিত্রও এমনই এক নিপীড়িত জীবনের ঐশ্বর্য তুলে আনেন তাঁর লেখায়। প্রসঙ্গত, এঁদের বহুপঠিত গদ্যও অনেকটাই কবিতার মতো ভাষায় লেখা, মানব-প্রকৃতি-অনুকম্পায় জারিত। শবরী ঘোষ, মন্দার মুখোপাধ্যায়, চিত্রা লাহিড়ি, রূপা দাশগুপ্ত, ঈশিতা ভাদুড়ি, দীপশিখা পোদ্দারের নিজস্ব ভাষাবিশ্ব ও চিত্রকল্পে বলা হয় মেয়েদের জীবনের নানান দিক। বীথি চট্টোপাধ্যায় ঈষৎ দেরিতে আরম্ভ করেও লিখছেন তুখোড় রসবোধময় কখনও রসমেদুর, কখনও দুষ্টু কবিতা, যা একই সঙ্গে জনপ্রিয়ও বটে। স্বরের এই বহুলতায় এ সময় ঋদ্ধ হয়।

এই সমকাল, ১৯৮০ থেকে ১৯৯০-এর পথটুকু অমসৃণ। প্রযুক্তি ও তার সহায়তায় মানুষের ক্রমবিপণন ও বিভক্ততার দুঃসময়। ভাঙনের কাল। গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রোইকা, সমাজবাদী কমিউনিস্ট দেশগুলির ভগ্নতা, আদর্শের ক্রম বিনষ্টি। পার্সোনাল কম্পিউটারের জয়যাত্রা আর পাশাপাশি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ ও কন্যাভ্রূণ হত্যা। তাই একদিকে পেয়েছি আত্মস্থ কবিতা, অন্যদিকে চিৎকৃত প্রতিবাদ। একদিকে মূলে ফেরা, অন্যদিকে মহুয়া চৌধুরীর মতো কল্প বৈজ্ঞানিক, ভুয়োদর্শী, আন্তর্জাতিক কবিতা। এর পরপরই রাজীব গান্ধীর স্বপ্নের ভারতের প্রতিটি কোণে কোণে ছেয়ে যাচ্ছে এসটিডি আইএসডি লেখা বোর্ডসমেত ফোনবুথ, আর কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী জুড়ে যাচ্ছে কেবল টিভি, ইন্টারনেট, মোবাইলের নেট-ওয়ার্ক-এ। পৃথিবীটা ছোট হতে থাকছে, আর মানুষ, প্রবাদপ্রতিমভাবেই, একা-তর।

৫. অনবদমনের চোখ: নব্বই পরবর্তী

কোনও এক বর্ষীয়ান পুরুষ কবি একবার সকৌতুকে বলেছিলেন, প্রথম পর্যায় *কৃত্তিবাস*-এর তুলনায়, দ্বিতীয় পর্যায় *কৃত্তিবাস*-এর পাতায় ছেলে ও মেয়েদের সংখ্যার অনুপাত কষলে, দেখা যাবে গুটিকয়েক মহিলার জায়গায় এখন প্রায় ৩৫ শতাংশ কবিই মেয়ে! তবু ভালো, যে, পোড়া দেশে যেখানে লোকসভার আসনের ক্ষেত্রে এখনও ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণের লড়াই অমীমাংসিত, সেখানে ৯০ পরবর্তী কবিদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ও ওজন বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণের দাবি রাখে। যদিচ অনবধানবশত এখনও কারও কারও লেখায় সব কবির আলোচনাশেষে কেবল একটি অনুচ্ছেদ বরাদ্দ থাকে মেয়েদের জন্য! কেউ কেউ এমন উপদেশও দিচ্ছেন যে, কবিতা লেখার মতো দুঃখময় কাজে মেয়েরা কেন আসেন, যেখানে সংসার সন্তানে তাঁরা ইতিমধ্যেই জর্জরিত! অবশ্য এসব ব্যাপারে মেয়েরা যে কোনও কথাই কানে তুলছেন তা মনে হয় না। নিজেদের কিছুতেই না ফুরনো জীবন তাঁরা নিজেরাই লিখে ফেলবেন তাঁদের কবিতায়, এমনই মনস্থ করেছেন এই কবিরা: মনস্থ করেছি, আজ্ঞে হ্যাঁ, এই আমরা! আমরা, যারা সময়ের সহোদরা। পৌলোমী সেনগুপ্ত, রোশেনারা মিশ্র, মৌলি মিশ্র, মন্দাক্রান্তা সেন, মিতুল দত্ত, শ্বেতা চক্রবর্তী, সেবন্তী ঘোষ, চন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশ্রী চক্রবর্তী, সংহিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বল্লরী সেন, কাবেরী রায়চৌধুরী, সৌমনা দাশগুপ্ত, পারমিতা মুনসি, পাপড়ি ভট্টাচার্য, সুমনা সান্যাল, সুস্মেলী দত্ত, তৃপ্তি সান্ত্রা, তমালিকা পণ্ডা শেঠ, সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিলোত্তমা মজুমদার... এই তালিকা হয়তো অসম্পূর্ণ থেকে গেল। তবু, প্রধান নামগুলি উচ্চারণের চেষ্টা করেছি মাত্র।

কলমের আত্মবিশ্বাসে আমরা প্রত্যেকেই তুখোড় ও সক্রিয়। আমাদের লেখায় ব্যক্তিগত আর ব্যক্তিগত নেই। অবদমনময় শৈশবের হাঁটুকে ফ্রকে ঢেকে রাখার শিক্ষা পেয়েও আমরা প্রত্যেকেই প্রাপ্তবয়স্কতাপ্রাপ্ত, ইচ্ছাকৃতভাবে অনবদমিত, এবং আধো আধো বুলি বলতে একান্ত অপারগ। সচেতন প্রকল্পের মতো যৌনতাকে কবিতায় এনে আমরা নিন্দিত ও অভিনন্দিত। হবে না-ই বা কেন। গত দুই দশক তো আমাদের জীবনকে শুধু পণ্যায়িতই

করেনি, পুরুষনারী নির্বিশেষে আমাদের স্থাপনও করেছে এক মুক্ত বাজারের কেন্দ্রে, চড়া আলোর তলায়, নিঃসঙ্কোচে লক্ষ লোকচক্ষুর বিষয়ীভূত হতে। এক সাথে উপভোক্তা এবং ভুক্ত হতে। একই সাথে মুক্ত হয়েছে, বলা ভাল ছেৎরে পড়েছে আমাদের গোপনীয়, ব্যক্তিগত জীবন। পঞ্চাশের কবিদের মতো আমাদের আর স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা লিখতে হয় না। প্রাইভেট এখন পাবলিক।

অত্যাচারিতের, ভোগদখলীকৃত নিষ্ক্রিয় নারী জমিনের সাথে আত্মিকতা বোধ করাবার দিনকে পেছনে ফেলে, নয়া অর্থনীতির নতুন চাকুরিজীবী ভোগবাদী মেয়েরা, এখন লিখি রোদে জ্বলে যাওয়া এক বাসনাহীনতার কথা। ঠাট্টার শ্লেষ পুরে, কিছুটা হেলাফেলা সহ প্লেটে সাজিয়ে দিই যুবক প্রেমিকের কাটামুণ্ড।

তবু নব্বই পরবর্তী মেয়েদের কবিতাকে এখনও বুঝে উঠতে পারেনি পাঠক, পুরোপুরি। বোঝেনি, কীভাবে এই মেয়েরা এক হাতে নিখুঁত ছন্দোবোধ আর অন্য হাতে ছেনাল খেলুড়িপনা নিয়ে 'মাসকারা'র সাথে অবলীলায় মিলিয়ে দেন 'আশকারা'। বুঝতে পারেননি, এই উত্তেজনাময়, তীব্রগতির জীবনযাপন ক্রমশই প্রতিটি মেয়ে কবিকেও ঠেলে দিচ্ছে এক পাতালপথের দিকে। আর মেট্রোরেলের পাতাল গহ্বর থেকে বেরিয়ে সেই মেয়েরা উঠে আসছেন পাতালপ্রবিষ্ট সীতার বিপরীত মেরুতে, পৌলোমী বা তিলোত্তমার কবিতার হাত ধরে।

> 'কুসুমে কুসুম দিব পরাগের তরে দিব গান
> পথ যদি হারায়েছো কী প্রকারে করিবে প্রগাণ?'

বঙ্কিমবাবুর প্রতি গভীর কৌতুকময় তাচ্ছিল্যসহ সেবন্তী ঘোষ লেখেন:

> ভাসি ডুবি খাবি খাই পরোয়া করি না কারো আর
> এ জীবন হলিউড ধাঁধা চোখে দেখি সংসার।
> জোছনায় কাক হবো কোকিলেরে দিব নিজ ডিম
> হাকিমের মুখে ছাই রমণীরা এ যুগে স্বাধীন।
> ম্যাটিনির ডল হবো শরৎবাবুর দেবদাস
> এ জনমে দড়ি হবো পুরুষের তরে হবো ফাঁস।'

এই মেয়েদের কলমে তাই উঠে আসে 'মিথ-মিথ-মিথ-মিথ্যের' গল্প। মন্দাক্রান্তা সেনই বলেন, 'হয়েছি বেহায়া, হায়, এতদিনে নেচেছে কলম/লজ্জা ঘেন্না ভয় ছেড়ে জড়িয়েছি ইচ্ছে-ইচ্ছে ওম/ সে ইচ্ছে আমারই, কিন্তু আজো তাকে পুরোটা চিনিনি।' এত সত্য, এত অনিয়ন্ত্রিত ভাবে স্ব-নিয়ন্ত্রিত এই কণ্ঠস্বর, যে মনে হয় কেউ কানের কাছে কথা বলে উঠল। এই মেয়েই যে 'হৃদয়, অবাধ্য মেয়ে'-র কবি, তা আর বলে দিতে হয় না।

ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার ঘটে যায় কখনও বা কোনও কোনও মন্ত্রবৎ কবিতায়। যেমন ভণিতামঙ্গল, চন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সময়ের আদিকাব্য, স্বভাবে পুঁথির মতো, প্রবণতাময়। 'আমরা বঙ্গের নারী/ঘরকে দুয়ার করি/হু হু শব্দে ধরাই উনান/হাঁড়িতে উথলায়

শুধু জল।' এ এক নতুন মঙ্গলকাব্য। যেখানে মেট্রো রেল, হাড়কাটা গলি মিলেমিশে গেছে ফুল্লরার বারমাস্যায়। 'কূল ছিল মর্ত্যলোকে নদীর চড়ায়/ঘর ছিল পাঁচবেড়ে গেরামের মেয়ে/জল বহুদূর যায় মনুষ্য জীবন/ওঁ নরক তুমি স্বর্গ হাড়কাটা লেন'। অথবা, 'চিচিং চিচিং ফাঁক বলে/খুলে যাচ্ছে মেট্রো। আর ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে মানুষ'— চন্দ্রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা আদি অন্তহীন এক অধুনার কথা বলে।

পুরুষের সাথে সমঝোতা করেও একা হয়ে যান সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়: 'আমাকে যারা তোমার সঙ্গে মিলিত হতে দিল না/নিজেদের প্রত্যেকটা মিলনরাত্রে তারা/চমকে চমকে উঠবে।/চরমতা অসমাপ্ত রেখেই তাদের উঠে বসতে হবে/কাঁপতে কাঁপতে।' 'প্রতিটি মিলনই যৌনমার' এমন একদেশদর্শী বাচনও শেষ অবধি কবিতাই হয়ে ওঠে, যখন তিনি বলেন, 'আমি তবু তোমাকেই এক আধবার পাব ভেবে/এত সহ্য করি।' এই সময়ের শরীরসচেতন, অথচ বারে বারে বিষয় হতে অস্বীকার করা এক বিষয়ী বা সাবজেক্টের দম্ভ নিয়েই আমার কবিতাও বলে ওঠে: 'না, শরীর নিয়ে আমি তোর সঙ্গে পালাবো না/তুই এলে শুধু খুলে দেব পালানোর রাস্তা, কান্না, ভূত ভূত/কাজলমাখা নষ্ট মুখ, চোখের উজ্জ্বল কালো বিন্দু খুলে দেবো/...শাড়িসহ পালাবো কি করে/খুলে আসব, খুলে আসি?/পায়ের আলতাও খুলে আসি/আঙটায় টাঙিয়ে আসি বাঁকা ভুরু, নাভি ও ব্লাউজ/আর কাদা, তাল তাল কাদা, তবে স্তনও খুলে আসি...'।

'যেইদিন মরে যাব অতি আকস্মিক/সু-কাঁধ দেবার জন্য প্রয়োজন পড়বে ক'টি বলিষ্ঠ পুরুষ/আট দশটি প্রেমিকের সৃষ্টি করছি সেই কারণেই।' এই সচেতন বহুগমনের কবি শ্বেতা চক্রবর্তী। বিষাদাপ্লুত সামান্যীকরণ তাঁর: 'আজন্ম প্রেমিকা আমি/আমৃত্যু আনন্দে অধিকার'। আত্মঘোষণার এক নতুন উত্থান: 'যে সন্তান কোলে আসেনি, তাকে আমি সন্তান বলি না/ভ্রূণ সে অপ্রাণ/যে প্রেমিক শরীরে আসেনি/তাকে আমি প্রেমিক বলি না।'

এইসব বিধ্বংসী আত্মপ্রত্যয় বার বার, বার বার, আমাদের স্তম্ভিত করে।

আর অনন্ত হয়ে থেকে যায় মেয়েদের প্রচুর কবিতা, ছাপা ও না-ছাপা। যার কোনও তল হয় না, সীমা হয় না, শেষ হয় না। কলমের মুখে আত্মার কয়েক টুকরো বিঁধে থাকে, তা থেকে গড়ায় অশ্রু-রক্ত-বিষ, আর আলোয় ও অন্ধকারে লিখে চলেন মেয়েরা। 'অন্ধকারে/যার জন্য লিখবো বলে বসে আছি/সে আমার নয়/বেলুনের মত/দেহ উঠল ফুলে, দেহ-দানের ফি/এক পেয়ালা ধূমায়িত কফি/সপ্তায় ১ বার/কোনো এক নামজাদা রেস্তোরাঁয়/ফর্ক আর চামচের সৌজন্যে/কত সহজে/বংশ-পরম্পরায় পাল্টে গেছি/দুই চুমুকের বিনিময়ে' (বল্লরী সেন)।

এই রইল আমাদের পথচলার অসমাপ্ত কাহিনি...

মিমি ভট্টাচার্য

বাংলা চলচ্চিত্রে নারীচিত্রণে চার দশক

বাংলা চলচ্চিত্রে নারীচিত্রণ পরিবর্তমান আর্থসামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ক্রমবিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ার ধারায় নারীচিত্রণ এক সংজ্ঞা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন সংজ্ঞায় রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলা চলচ্চিত্রে নারীচিত্রণের এই মূল ধারার পরিবর্তনকে বুঝতে গেলে তাকে তৎকালীন আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিকাঠামোর প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করাই বোধ হয় সব থেকে সমীচীন হবে। অন্তত এই বিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে আমার সেরকমই মনে হয়েছে। ১৯৩০-এর দশকে সবাক চলচ্চিত্র আসার পর থেকে প্রথম চার দশক জুড়ে (অর্থাৎ ১৯৭০ পর্যন্ত) বাংলা চলচ্চিত্রে নারীচরিত্র কীভাবে চিত্রায়িত হয়েছে তারই একটা সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণধর্মী বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করব। তবে এক্ষেত্রে প্রথমেই একটা স্বীকারোক্তি প্রয়োজন যে, এই চার দশকের একেবারে নিখুঁত ইতিহাস তৈরি করতে পেরেছি, এমন দাবি আমি করতে পারি না। এর একটা প্রধান কারণ উপাদানের অভাব। সংরক্ষণের অভাবে তিরিশ ও চল্লিশ দশকের প্রায় বেশির ভাগ ছবিরই কোনও অস্তিত্ব নেই। চিত্র-সমালোচনায়ও সঠিক বিশ্লেষণী রচনাশৈলীও এই সময়ে সেভাগে গড়ে ওঠেনি। তখন চিত্র-সমালোচনা বলে যা সচরাচর প্রকাশিত হত তা হল চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত গল্পটির একটি সারাংশ। তার সঙ্গে থাকত ছবিটি নির্মাণে যুক্ত বিভিন্ন কলাকুশলী, গীতিকার, সুরকার, নির্দেশক, প্রযোজক ইত্যাদির একটা বিশদ তালিকা। এই টুকরো টুকরো তথ্য থেকে ওই সময়ের বাংলা চলচ্চিত্রে নারীচিত্রণের কোনও সামগ্রিক বিচার প্রায় এক কথায় অসম্ভব। তাই আমি গোড়াতেই জানিয়ে রাখতে চাই যে আমার আলোচনা কখনওই সম্পূর্ণ নয়। চলচ্চিত্র যেহেতু একটি অতি জটিল শিল্পসংরূপ, তার নিজস্ব ভাষায় প্রতিফলিত হয়ে নারীচিত্রণ ঠিক কীভাবে ঘটেছিল তার সম্পূর্ণ একটা প্রতিচ্ছবি কিন্তু এর থেকে তৈরি করা যায় না। তাই এক প্রকার বাধ্য হয়েই আমি আমার গবেষণাকে সীমিত করেছি আমার নিজস্ব দেখার অভিজ্ঞতার মধ্যে। যে সব ছবিগুলি এখনও দেখার মতো পরিস্থিতিতে আছে, যে-ছবিগুলির চিত্রনাট্য দেখারও সুযোগ আমি পেয়েছি এবং ছবিমুক্তির সময় প্রকাশিত তথ্য সংবলিত পুস্তিকা— এগুলোকেই আমার প্রধান উপাদান ও দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহার করে আমি

নারীচিত্রণের অস্পষ্ট চেহারাটাকে ধরবার চেষ্টা করেছি। আমার প্রয়াস ছিল তৎকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই প্রতিফলনকে বিশ্লেষণ করবার।

ভারতীয় তথা বাংলা চলচ্চিত্রের একেবারে গোড়ার দিকে নারীচিত্রণের কোনও নির্দিষ্ট, পরিকল্পিত প্রয়াস আক্ষরিক অর্থে সম্ভবত ছিল না। একেবারে অভিনব অথচ জটিল এই শিল্পমাধ্যমকে জনগণের মধ্যে গ্রহণযোগ্য করে তোলাটাই ছিল সেই সময়ের প্রধান লক্ষ্য। আর সম্ভবত এই কারণেই ওই সময়ের সিনেমার সঙ্গে জনপ্রিয় সাহিত্যের একটা গভীর সম্পর্ক তথা নির্ভরতার সূত্র তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তৎকালীন যে সমস্ত কাহিনি মানুষকে প্রভাবিত করেছে তারই নিরাপদ আশ্রয়ে নিজেকে স্থিত করবার একটা ঐকান্তিক প্রয়াস। বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্রের কাহিনি থেকে বহুশ্রুত পৌরাণিক কাহিনি, কিংবা মহাকাব্যের জনপ্রিয় অংশ-নির্ভর কাহিনি— এরই মধ্যে প্রায় সীমাবদ্ধ ছিল বাংলা সিনেমা। আর এভাবে খানিকটা অবচেতনে, খানিকটা অবধারিতভাবেই চলচ্চিত্র যুক্ত হয়ে গিয়েছিল একটা সামাজিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যেখানে নারীর সামাজিক অবস্থান একটি নির্দিষ্ট বলয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

একদিকে যেমন নিজেকে স্থিত করবার বা গ্রহণীয় করার একটা প্রয়াস, অন্য দিকে তৎকালীন অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সিনেমা নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে ভাবনাচিন্তা করবার অবকাশেও যথেষ্ট অভাব। তিরিশ ও চল্লিশ দশক মানে ভারতীয় রাজনীতির অত্যন্ত জটিল এক অধ্যায়। জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্ব এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশভাগের যন্ত্রণা নিয়ে বাংলার রাজনীতিতে এক উত্তাল পরিস্থিতি। তাই, খুব সংগত কারণেই এ সময়ের বাংলা চলচ্চিত্র গতানুগতিক পারিবারিক কাহিনি এবং পৌরাণিক কাহিনির বাইরে খুব একটা বিস্তার করছে না। এই সামাজিক চলচ্চিত্রের অতিমাত্রায় পরিবারকেন্দ্রিক হয়ে ওঠার পেছনেও অবশ্যই একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ছিল। ১৮৮০-র দশক থেকে বাংলা শহরে জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি তার প্রভাব এমন ভাবে বিস্তার করেছিল যে তা তৎকালীন বাঙালি মধ্যবিত্ত চেতনায় একটা তীব্র বৈপরীত্যের সৃষ্টি করে। বহির্জগতে পরাজিত জাতি যখন এক তীব্র রাজনৈতিক হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত, তখন পরিবার প্রতীক হয়ে দাঁড়াল জাতীয় মর্যাদাবোধের। ভারতীয় নারীর অবস্থানের পশ্চিমি বিরূপ সমালোচনাকে প্রতিহত করবার উদ্দেশ্যেই এ দেশের নবীন নেতৃত্ব সৃষ্টি করলেন এক অভিনব দ্বিমুখী ধারা। তার এক মুখ বর্তমানের পশ্চিমে, অন্য মুখ অতীতের ভারতে। তাঁরা একদিকে শুরু করলেন অতীত ভারতগৌরব কীর্তন, এবং দাবি করলেন যে প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগে নারীর অবস্থান ছিল সুউচ্চ। অন্য দিকে এঁরা পশ্চিমি সমালোচনাকে মেনে নিয়ে স্বীকার করলেন বিভিন্ন কারণে বর্তমান সমাজ সাময়িক রোগে আক্রান্ত, যার উপশম প্রয়োজন। তবে শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের প্রভাবেই যে বাংলায় সংস্কারের জোয়ার এ কথা লিখলে অতিসরলীকরণ হয়ে যায়। যাঁরা বিদেশি প্রভাবে ভেসে যাননি, এমন বহু মনীষী যেমন বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখ সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন আনয়নের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন এবং পরিবর্তনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। পশ্চিমের সঙ্গে এ দেশের ভাবের আদানপ্রদানের ফলেই এসেছিল সংস্কার ও পরিবর্তন। এই পরিবর্তিত

পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক কাঠামোয় আদর্শ নারীর এক নতুন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারিত হল। একদিকে মেয়েরা পাশ্চাত্যের মেয়েদের মতো শৃঙ্খলা মেনে কাজ করবে, সময়ের সদ্ব্যবহার করবে, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিশুপালন করবে, সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভে স্বামীকে সহায়তা করবে, অন্য দিকে আবার প্রাচীন আর্য নারীদের দৃষ্টান্ত অনুসারে পতিসেবা করবে, শিশুমানস গঠন করবে এবং আপন চরিত্রমহিমায় সমগ্র পরিবারধর্ম আলোকিত করবে। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে যখন সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে শুরু করেছে, তখন থেকেই পরিবারের ক্ষেত্রে এই গুরুত্ব আরও কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। জাতীয়তাবাদী আদর্শ এবার প্রচার শুরু করল যে পশ্চিমের সভ্যতা বস্তুতান্ত্রিক, আর ভারতীয় সভ্যতা আধ্যাত্মিক, আত্মিক। পশ্চিমের ক্ষমতার আস্ফালন বাইরের জগতে, ভারতের আধ্যাত্মিকতার মাহাত্ম্য পরিবারের অভ্যন্তরে। আর্যযুগ থেকে যে ধরা বয়ে চলেছে সেখানেই ভারতীয়দের যথার্থ স্বরূপ। এই আত্মিক ধর্মের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ পশ্চিমের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। আর্যধর্মভিত্তিক ভারতীয় স্বরূপতার এবং সুপ্রাচীন সুমহান সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল পরিবার। আর সেই পরিবারের একেবারে কেন্দ্রে নারীর অবস্থান। পশ্চিমের সঙ্গে সংঘাতের মুহূর্তে তাই জাতীয়তাবাদী নেতারা নারীদের ওপর ভার দিলেন ভারতীয়ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য, আত্মিক ধর্ম রক্ষণের, গৃহে ও পরিবারে। তাঁরা নির্দেশ দিলেন, আর্যপ্রণালীতে গৃহধর্ম পালন করতে হবে মেয়েদের। বিলাসী হলে চলবে না, চলবে না তাস খেলে বা গল্প পরিহাস বা নাটক নভেল পড়ে সময়ের অপব্যয়। আর্য মতে নারী হলেন 'গৃহলক্ষ্মী'। স্বর্গের দেবী লক্ষ্মীর মতো মর্ত্যের লক্ষ্মীরা গৃহে সুধাবর্ষণ করবেন। তাই আদর্শ ভারতীয় নারীর সংজ্ঞা আর একবার পুনর্নির্মিত হল। এই নবনির্মিত আদর্শ নারীর চিত্রায়ণে খুব সূক্ষ্মভাবে অতীতের প্রাচ্য ও বর্তমানের প্রতীচ্য রমণীদের পার্থক্যের মধ্যে দিয়ে তাঁদের শিক্ষিতা ও সংস্কৃতা করবার প্রকৃত উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট করে ধরা পড়ল। উদ্দেশ্য ছিল একটাই, ওই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নব পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় তাঁরা যাতে হয়ে উঠতে পারেন যোগ্য সুমাতা, সুভার্যা ও সুগৃহিণী। এরই অনুষঙ্গ হিসাবে উনিশ শতকের শেষার্ধে নারীর ভূমিকা এবং পরিবারে নারীর কর্তব্য নিয়ে বহু উপদেশমালা রচিত হয়েছিল। শুধুমাত্র নারীর পারিবারিক দায়িত্বাবলি নয়, নারীদের সমগ্র জীবন, তাদের সম্পর্ক, এমনকী তাদের গৃহস্থালির নিজস্ব জগৎ নির্ণয়ের ও নির্ধারণের একটা প্রচেষ্টা ছিল এই পুস্তিকা ও প্রবন্ধগুলির মধ্যে। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকত একটা আশঙ্কা। এতদিন অন্তঃপুরবাসিনী ছিল নারী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্তঃপুরের ঘেরাটোপই ছিল তার দৈনন্দিন জগৎ। কিন্তু এবার শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোয় যখন তারা এক সমান্তরাল জগতের সন্ধান পাবে, তখন তাদের মধ্যে এতদিনের তৈরি করা কর্তব্যবোধের ক্ষেত্রটি কি অবিচলিত থাকবে? এতদিনের অভ্যস্ত সামাজিক নিয়মকানুনগুলির মধ্যে অভ্যস্ত পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় ছন্দপতন ঘটবে না তো? সম্ভবত মিলিত মিশ্রিত এই নানা আশঙ্কা থেকেই নারীর একটা আদর্শরূপ চিহ্নিত করবার, প্রচার করবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখেছি যে ভারতীয় তথা বাংলার মাতৃত্বের জয়গানে মুখর হয়েছিলেন তৎকালীন রাজনৈতিক নেতা ও চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীদের

একটা বড় গোষ্ঠী এবং তৎকালীন প্রকাশিত বহু পত্র-পত্রিকা যেমন— *তত্ত্ববোধিনী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ*; এমনকী এর মধ্যে ছিল বহু নারীসম্পাদিত পত্রিকা যেমন— *ভারতী, অন্তঃপুর, ভারত মহিলা, বামাবোধিনী পত্রিকা* ইত্যাদি। তাদের লেখায়, তাদের প্রকাশে আদর্শ নারীর যে রূপটি ক্রমশ ফুটে উঠছিল, তা নিঃসন্দেহে আর্যধর্ম অনুসৃত, প্রাচীন আদর্শ অনুপ্রাণিত, শিক্ষিতা, স্নেহময়ী, সর্বংসহা অর্থাৎ— প্রাচীনা ও নবীনার সংমিশ্রণে সৃষ্ট এক নব আধুনিকার মূর্তি, যার জীবনের কেন্দ্রে রয়েছে তার স্বামী-সন্তান-পরিবার। পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের বিপ্রতীপে জাতীয়তাবাদী নিরিখে নারীধর্মের সংজ্ঞায়নে জোর পড়েছিল আরও একটি বিষয়ে— ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যপন্থী পাশ্চাত্য মানসে স্বাধীনতার প্রথম চেতনায় নারী যে তার পারিবারিক দায়ভার ঝেড়ে ফেলবেন, এটাই স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হল। সেখানেই ভারতীয় নারী তাঁর আদি ও নব্য দুই ভূমিকার যুগপৎ পালনে ভারতীয়ত্বকে মহিমময় করে তুলতে পারেন।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে যখন সবাক বাংলা চলচ্চিত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটছে, তখন বাংলা তথা সারা ভারত ওই নব্য-পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদেরকে অভ্যস্ত করবার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় খানিকটা বিপন্ন। শুধুমাত্র বহির্জগতেই নয়, এর প্রভাব এসে পড়েছিল মানুষের দৈনন্দিন অভ্যস্ত জীবনে, এমনকী তার একান্ত সম্পর্কের ওপরও। নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, ইংরাজ শাসনাধীন বাংলার সামাজিক রূপ বদলের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠেছিল, আবার অন্যদিকে এই নতুন পরিবর্তিত জীবনে জীবনযাত্রার সঠিক চেহারাটা ঠিক কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে একটা বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি করে। একটা বোধ অবশ্য স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছিল যে, এতদিন চলে আসা পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর এবার কিছুটা পরিমার্জন প্রয়োজন। এই পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থায় একেবারে কেন্দ্রে নারীর অবস্থান। তাই স্বাভাবিকভাবেই আর একবার এই পরিবর্তন ও বিভ্রান্তির দায় এসে পড়েছিল সেই নারীরই ওপর। চলচ্চিত্র যেহেতু একটা ব্যতিক্রমী শিল্পমাধ্যম সেখানে শিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে শিল্পপ্রযুক্তি, তাই চলচ্চিত্র-ইতিহাসের এই প্রারম্ভিক পর্যায়ে তার দর্শক বলতে সে অবধারিতভাবে চিহ্নিত করেছে ওই পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক গোষ্ঠীকে, যারা এই নতুন সামাজিক ব্যবস্থায় প্রাচীন ও নবীনের মেলবন্ধনে একটা সঠিক জীবনযাত্রার সন্ধান করছে। যদিও আক্ষরিক অর্থে এই নতুন শিল্পমাধ্যমটি তার বাণিজ্যিক ক্রিয়া শুরু করবার আগে দর্শক সম্পর্কে কোনও সমীক্ষা করেছিল এমন তথ্য নেই, তবে চলচ্চিত্র নির্মাতারা সাধারণভাবে তৎকালীন পরিস্থিতি বিচার করে সম্ভবত খানিকটা আন্দাজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যে কারা হবেন তাদের দর্শক। তাঁরা অনুমান করে নিয়েছিলেন যে, একটি বাণিজ্যিক প্রেক্ষাগৃহে প্রধানত চলচ্চিত্রের দর্শকরা হবেন পুরুষ এবং যদিও বা কোনও চলচ্চিত্র মহিলারা দেখতে আসেন, তারও নিয়ামক হবেন সেই পরিবারের পুরুষটি। তাই এই জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যমটিকে জনপ্রিয় করে তুলতে গেলে শুধুমাত্র সেটুকুই দেখাতে হবে যা এই সমাজের প্রভাবশালী শ্রেণি দেখতে চায়, দেখাতে চায়। আর এই জায়গা থেকেই খানিকটা অবধারিতভাবেই চলচ্চিত্র নারীর আদর্শভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা-প্রক্রিয়ার এক অন্যতম অংশীদার হয়ে ওঠে। গৃহলক্ষ্মীর ছাঁচে ফেলা ওই আদর্শ নারীকে জনপ্রিয় করে

তুলতে প্রাথমিক পর্যায়ের এই বাংলা ছবি তার প্রায় প্রতিটি সামাজিক কাহিনির মধ্যে একটা নির্দিষ্ট ছক ব্যবহার করে। তিরিশের দশকের প্রায় প্রতিটি সামাজিক কাহিনিচিত্রের মধ্যে (এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ছবিগুলির কাহিনির যে কাঠামো পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে লিখছি) ওই ছক বা একটা নির্দিষ্ট অলিখিত বিধির উপস্থিতি স্পষ্ট। এই নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে প্রধানা নায়িকা চরিত্রের প্রায় সকলেরই প্রায় প্রতিটি কাহিনিচিত্রের মধ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে। ছবিগুলি মূলত আবেগপ্রবণ সাংসারিক কাহিনিনির্ভর, যেখানে অযথা নির্যাতিত হতে দেখা যায় প্রধানা নারী চরিত্রটিকে। নির্যাতন, অপমান, লাঞ্ছনা, বঞ্চনার শিকার ওই নারীকে বহু ক্ষেত্রে তার স্বামী অন্য রমণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ত্যাগ করে। ছবিতে বার বার তার দারিদ্র বঞ্চনার চিত্র দেখিয়ে, দেখানো হয় কীভাবে পতিপ্রাণা সেই নায়িকা এত বঞ্চনা, কষ্টের মধ্যেও অবিচলিত রাখে তার পতিভক্তি ও পারিবারিক দায়। এবং তার ধৈর্য ও অবিচল পতিভক্তির জোরে একদিন তার স্বামী অনুধাবন করতে সমর্থ হয় যে এই গ্রাম্য সাধারণ গৃহলক্ষ্মীতেই তার যথার্থ আশ্রয়। প্রায় প্রতিটি ছবিতে এই প্রাধানা নারী চরিত্রের মধ্যে কিছু একই ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেমন— প্রায় সকলেই অত্যন্ত সাধারণ, সরল, সর্বংসহা, পতিপ্রাণা, আত্মত্যাগী এবং সীমিত লেখাপড়া জানা। আদর্শ নারীর জয়গান করতে গিয়ে তা যে কীভাবে নারীর সামাজিক মর্যাদা লঙ্ঘন করেছে তা একটা উদাহরণ দিলে হয়তো খানিকটা বোঝা যাবে। ১৯৩৪ সালে মুক্তি পায় পায়োনিয়র ফিল্মস-এর প্রযোজনায় *মা*— সেখানে মনোরমা (প্রধানা চরিত্র) এক দরিদ্র পরিবারের কন্যা, যার পিতা বরপণের সম্পূর্ণ অর্থ জোগাড় করতে ব্যর্থ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তার স্বামী নিজের পিতার প্ররোচনায় তাকে ত্যাগ করে এবং অচিরেই এক ধনী মহিলার সঙ্গে পুনর্বিবাহ করে। মনোরমা পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন তার স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের কথা জানতে পারে তখন দ্বিধাহীন ভাবে সে ওই দ্বিতীয় স্ত্রীকে মেনে নেয়। মৃত্যুপথযাত্রী অসুস্থ মনোরমা তার পুত্রটিকে সমর্পণ করে ওই দ্বিতীয় রমণীর হাতে, এবং মৃত্যুশয্যায় পুত্রটিকে তার শেষ নির্দেশ, সে যেন তার পিতার দ্বিতীয় স্ত্রীকেই তার অবর্তমানে মা বলে স্বীকার করে নেয়। আদ্যোপান্ত মেলোড্রামাটিকে এই ছবিটির কাহিনি একটু মনোযোগ দিয়ে ভাবলে, এর উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে গেলে বিস্মিত হতে হয়। মনোরমার এই অকালমৃত্যু এবং পুত্রকে অন্য রমণীর কাছে সমর্পণ এক অর্থে কিন্তু তার গ্লানি ও অপমানকর পরিস্থিতির মান্যতা প্রতিপাদন করে, এবং অন্যদিকে, পণপ্রথাকেই কোথাও একটা সামাজিক সমর্থন জোগায়।

সতীত্ব, পাতিব্রত্যকে কেন্দ্র করে আদর্শ নারী-চরিত্র সৃজনে গোটা তিরিশ ও চল্লিশ দশকের চলচ্চিত্রে যেন একটা পৃথক ধারা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। পৌরাণিক ছবিতে যেমন সরাসরি *সীতা* (১৯৩৩), *সাবিত্রী* (১৯৩৩)-এর মতো চিত্রায়ণ একাধিকবার হয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক কাহিনিচিত্রের মাধ্যমে এই একই ধারা অব্যাহত থেকেছে। *মা* (*পায়োনিয়র ফিল্মস, ১৯৩৪*), *খাসদখল* (*সোনোরে পিকচার্স, ১৯৩৫*), *প্রফুল্ল* (কালী ফিল্মস, ১৯৩৫), *মন্ত্রশক্তি* (পপুলার পিকচার্স, ১৯৩৫), *তরুবালা* (১৯৩৬), *জীবনসঙ্গিনী*

(ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স, ১৯৩৯), *প্রতিশ্রুতি* (নিউ থিয়েটার্স, ১৯৪০), *পতিব্রতা* (অরোরা ফিল্মস, ১৯৪২), *মাটির ঘর* (ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স, ১৯৪৪)। একই সময়ে এই নির্দিষ্ট ছকের বাইরেও বেশ কয়েকটি ছবি মুক্তি পায়, যাদের আপাতদৃষ্টিতে খানিকটা ব্যতিক্রমী বলে মনে হলেও, তারাও শেষ পর্যন্ত ভিন্ন সুরে সেই একই আদর্শ গৃহলক্ষ্মীর চরিত্রকেই মহিমান্বিত করছে। এই ধরনের ছবির মধ্যে পড়ে— *মুক্তি* (নিউ থিয়েটার্স, ১৯৩৭), *অভিনয়* (ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স, ১৯৩৮), *মায়া* (নিউ থিয়েটার্স, ১৯৩৬), *অধিকার* (নিউ থিয়েটার্স, ১৯৩১) ইত্যাদি। এই ধরনের ছবিতে একই বক্তব্য এসেছে এক ধরনের নেতিবাচক দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে। এই ধারার ছবির বৈশিষ্ট্যই হল যে এখানে প্রধানা নারী চরিত্র উচ্চশিক্ষিতা, সচেতনা ও স্বাবলম্বী। তাই চিত্রনাট্যে তাদের প্রতিহত হতে দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত নতজানু হতে হয় আদর্শ ঐতিহ্যময়ী ভাবমূর্তির সামনে। উদাহরণ হিসাবে *মুক্তি*-কে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ১৯৩৭ সালে নির্মিত *মুক্তি* সেই সময়ের ছকে ফেলা বাংলা চলচ্চিত্রের মধ্যে খানিকটা ব্যতিক্রমী ছিল নিশ্চয়ই। নব্যশিক্ষিত সমাজের প্রেক্ষিতে দাম্পত্য সম্পর্কের বিপন্নতা, বিচ্ছেদ— এমন সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে ছবি করার জন্য যে এক দুর্বিনীত সাহস প্রয়োজন ছিল সে সময়ে, তা অনস্বীকার্য। কিন্তু এই ছবিটিও শেষ পর্যন্ত যে ব্যতিক্রমী থাকে না, একই প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে ওঠে সেটা ছবির পরিণতি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। আধুনিক ইউরোপীয় উদার শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বেড়ে ওঠা নায়িকা চিত্রা দাম্পত্য সম্পর্কে পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে পারস্পরিক সমঅধিকার, নির্ভরতায় গড়ে ওঠা এক সম্পর্কের কথা বলেছিল। শিক্ষিতা চিত্রার মনে হয়েছিল অসম এই সম্পর্ককে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া এক চূড়ান্ত সামাজিক ভণ্ডামি। তাই সে ওই মিথ্যা সম্পর্ক থেকে মুক্তি চেয়েছিল। কিন্তু ছবিতে কাহিনির বিন্যাসে সূক্ষ্মভাবে নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থানের বৈপরীত্যকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়। যৌথ সম্পর্কে চিত্রার পারস্পরিক সম অধিকারের দাবি যে অপরাধ, ছবির শেষে তাই প্রতিপন্ন হয়। সরাসরি স্ত্রীশিক্ষা ও নব্য সংস্কৃতির বিরোধিতা করে, সেই পতিভক্তি-পতিবন্দনার ঐতিহ্যকেই মহিমান্বিত করা হয়েছে এখানে। স্পষ্ট করে দেওয়া হয় ভারতের তথাকথিত ঐতিহ্যের অবমাননার প্রাপ্য অনিবার্য শাস্তি। এই ছবিতে চিত্রার শাস্তি নির্মম বৈধব্যের। *মুক্তি*-র শেষ দৃশ্যে প্রশান্ত মৃত্যুর পূর্বে যে শেষ কথাগুলি উচ্চারণ করে, তা ছিল— 'চিত্রা, তুমি মুক্তি চেয়েছিলে... হয়তো তুমি নও, চেয়েছিল তোমার সংস্কৃতি, তোমার শিক্ষা, তোমার সমাজ'— এ যেন এক স্পষ্ট শাসন, যার মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে নব্য পিতৃতন্ত্রের বিপন্নতা, সতীত্ব-পাতিব্রত্যের ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে আর একবার মূল স্রোতে ফেরবার প্রাণপণ প্রয়াস।

এরকমই আর একটি উদাহরণ ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের *অভিনয়*— আপাতদৃষ্টিতে ব্যতিক্রমী হয়েও প্রাচীন মূল্যবোধের গুরুত্ব প্রতিস্থাপনই এ ছবির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। নায়িকা মনীষা এক অধ্যাপক পিতার সুন্দরী, শিক্ষিতা, আধুনিকা কন্যা। ছবির প্রথম দৃশ্যেই আমরা দেখি সে এক সুন্দরী প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে। মনীষার বিবাহ হয় এক ধনী জমিদারপুত্রের সঙ্গে। দুশ্চরিত্র স্বামীর দ্বারা লাঞ্ছিতা হয়ে আত্মমর্যাদাসচেতন মনীষা

গৃহত্যাগ করে। কিন্তু পিতৃগৃহে না ফিরে, সে তার এক বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষীর সাহায্যে এবং তার নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সফল অভিনেত্রী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৩৮-এ নির্মিত এই ছবিতে এক সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলার সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা এবং স্বামীর দ্বারা প্রতারিত হয়ে গৃহত্যাগ করে নিজেকে সসম্মানে এমন এক পেশায় প্রতিষ্ঠিত করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া যা সেই সময়ের প্রেক্ষিতে মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রচলিত পেশার তালিকার মধ্যে পড়ে না— অবশ্যই প্রযোজক-পরিচালকদের একটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণের পরিচয় দেয়। কিন্তু সমান্তরালভাবে গোটা ছবি জুড়ে বার বার নানা ভাবে কিন্তু সতীত্ব, পতিভক্তির বিষয়গুলোর প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন সমর্থন প্রকাশ পায়— কখনও বা কন্যার পতিগৃহে যাত্রার সময় পিতার উচ্চারিত শ্লোকে, কখনও মনীষার অভিনীত নাটকের নির্বাচিত অংশের মধ্যে— যেখান থেকে এক প্রকার নির্ধারিত হয়ে যায় ছবির পরবর্তী অংশ। প্রতিষ্ঠিত মনীষা তার যশ, প্রতিপত্তি, সর্বস্ব ত্যাগ করে স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়া মনস্থ করে। এখানেও তুলনামূলক ভাবে যথেষ্ট প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ছবিটি শুরু করে শেষ পর্যন্ত সেই চিরাচরিত পিতৃতন্ত্রনির্মিত কাঠামোর নিরাপদ আশ্রয়েই ফিরে আসে। দর্শকের রুচি, বিচার ও চাহিদার মূল্যায়নে অনিশ্চয়তার তাড়নাতেই এই দোলাচলতার উৎস ধরা যায়। প্রযোজক-পরিচালকেরা বুঝতে পারছেন, পুরাতন মূল্যবোধ পালটাচ্ছে, সমাজজীবনে নারী অন্য ভূমিকা গ্রহণ করছেন, কিন্তু দর্শকদের মধ্যে কতজন তা মেনে নিতে প্রস্তুত, তা তাঁরা স্থির করতে পারছেন না। তাই বিভিন্ন মতাবলম্বী দর্শককে টানবার জন্যই এই দ্বিচারিতা।

এই ব্যতিক্রমী ছবিগুলি যে সঠিক অর্থে কোনও প্রগতিশীল মতাদর্শের প্রতিফলন ছিল তা নয়, কিন্তু একই সময়ে 'গৃহলক্ষ্মী' চিত্রণের পাশাপাশি এই ভিন্ন ধরনের নারী চরিত্র নির্মাণের মধ্যে সামাজিক পরিবর্তনের একটা স্বীকৃতি নিহিত থাকে। সামাজিক প্রতিফলনের একটা ক্ষেত্র হিসাবে চলচ্চিত্রে তার প্রকাশ ঘটেছিল, আর এখানেই তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

পঞ্চাশের দশকে বাংলা চলচ্চিত্রে গৃহলক্ষ্মী চিত্রণে আবার কিছু নব সংযোজন লক্ষ করা যায়। স্বামী সন্তান নিয়ে সতীলক্ষ্মী সুলক্ষণা হয়ে থাকার সঙ্গে এবার যুক্ত হল যৌথ পরিবার পুনর্গঠনের দায়। এই সময় বাংলার আর্থসামাজিক পরিকাঠামোর পরিবর্তনের ফলে সমাজে যে নতুন ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছিল চলচ্চিত্রে ছিল তারই এক আংশিক প্রতিফলন। ঔপনিবেশিক আমল থেকেই জীবিকা উপার্জনে চাকরির একটা বড় ভূমিকা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ভূমি ব্যবস্থার উপর নির্ভরতা যত হ্রাস পাচ্ছিল, ততই মানুষ তাদের আদি বাসভূমি ছেড়ে চাকরির জন্য এসে শহরে বসবাস শুরু করল। এর ফলে বাংলার পারিবারিক কাঠামোয় একটা বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছিল। কর্মসূত্রে যৌথ পরিবার ভেঙে বেরিয়ে আসা বহু পুরুষ তাদের স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে শহরে এসে থাকতে শুরু করলেন। শুরু হল অণু পরিবার সংস্কৃতি। এই অণু পরিবারগুলিই যেমন একদিকে মহিলাদের স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের একটা ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছিল, আবার অন্য দিকে এই নতুন শহুরে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে ছোট পরিবারে গৃহিণীদেরও উপার্জনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। (দ্র. পূর্ণিমা বিশ্বাসের অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র, 'যৌথ পরিবারের ভাঙন ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের

বিকাশ: বিশ শতকের কলকাতা', যাদবপুর বিশ্বাবিদ্যালয়, ১৯৯৮)। স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর আর্থিক সংকট যখন আরও তীব্র হয়ে ওঠে, তখন শহরের বহু পরিবারেই স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকেও জীবিকার সন্ধানে পথে বের হতে হয়। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে এই সময় কর্মরতা মহিলাদের সংখ্যা বাংলায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এর থেকেও আর এক ধরনের সামাজিক জটিলতার সৃষ্টি হয়। দেখা যায়, একই পরিবারে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রেক্ষিতে দুই প্রজন্মের নারীর মধ্যে একটা বিরোধ তৈরি হয়। নতুন এই সামাজিক ব্যবস্থায় কোণঠাসা হয়ে পড়া প্রবীণারাই যেন সবচেয়ে বিপন্ন। এই বিপন্নতা একটা বিশেষ মানসিকতার প্রতিফলক। পারিবারিক কর্তৃত্ব পরবর্তী প্রজন্মের হাতে চলে যাওয়ার ভয়ে উদ্বিগ্ন বর্ষীয়সী মহিলারা। অন্যদিকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় আরও একটা প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে। রোজগেরে গৃহিণীরা তাদের গৃহকার্যের খুঁটিনাটি দায়িত্ব বহনে অস্বীকার করবে না তো? আর এই বিপন্নতা থেকেই সম্ভবত পঞ্চাশের দশকের আদর্শ নারী চরিত্রে অন্যান্য বহুদর্শিত গুণাবলীর সঙ্গে যুক্ত হল অণু পরিবারকে যৌথ পরিবারে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিশেষ তাগিদ বা দক্ষতা। *ভাঙ্গাগড়া* (১৯৫৪), *বিন্দুর ছেলে* (১৯৫২), *রামের সুমতি* (১৯৪৭) ইত্যাদি এমন বহু ছবি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই কাহিনিগুলির মধ্যে খুব সচেতনভাবে আর্থসামাজিক জটিল পরিস্থিতির একটা অতি-সরলীকরণ লক্ষ করা যায়। পরিবার খণ্ডিত হওয়ার যতই জটিল আর্থসামাজিক কারণ থাকুক না কেন, এখানে স্পষ্টত দায়ী করা হয় সেই নারীকেই। এর মধ্যেও একটা সূক্ষ্ম রাজনীতি থাকত। দায়ী করা হত এমন নারীকেই যাকে ওই নব্য পিতৃতান্ত্রিক সমাজের আর প্রয়োজন ছিল না বা যাদের সম্পর্কে সমাজ খানিকটা সতর্ক থাকার চেষ্টা করত। অতি শিক্ষিতা বা প্রবীণ কুসংস্কারাচ্ছন্না বৃদ্ধা— সাধারণত এই দু' ধরনের মহিলাদেরই এ ক্ষেত্রে চিহ্নিত করা হত। মহিলাদের অন্তঃপুরীয় সাংসারিক কলহ, পারস্পরিক বিবাদ ইত্যাদি অতি তুচ্ছ বিষয়ের মধ্য দিয়ে এমন জটিল এক সমস্যার বিশ্লেষণ যেন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে নারীকে এই বৃহৎ দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করবার এক প্রচ্ছন্ন সামাজিক প্রয়াস। তাই সচেতনভাবেই চলচ্চিত্রে তৈরি করে দেওয়া হল আদর্শ গৃহলক্ষ্মীর এক সংশোধিত ভাবমূর্তি যে নিরন্তর আত্মত্যাগ ও সহনশীলতার মাধ্যমে তার অন্যান্য নির্ধারিত ক্রিয়া ছাড়াও যৌথ পরিবারকে পুনর্গঠিত করবে এবং প্রবীণদের তাদের হৃত সম্মান ফিরিয়ে আবার তাদের সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করবে। *ভাঙ্গাগড়া*-র সুষমা যেন ছাঁচে ফেলা এই প্রতিমূর্তি।

তিরিশ থেকে পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত বাংলা চলচ্চিত্রে গৃহলক্ষ্মীর ভাবমূর্তির বিবর্তন যদি লক্ষ করা যায় তবে কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আলাদা করে চোখে পড়ে। একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ তিরিশের দশকে গৃহলক্ষ্মীদের যতটা গ্রাম্য, সরল, সাধারণ হিসাবে চিত্রায়িত করা হত, ক্রমশ কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পোশাক, বাচনভঙ্গি, চালচলনে একটা সূক্ষ্ম শহুরে ছাপ দেখতে পাওয়া যেত। অর্থাৎ ক্রমশ যেন পরিবর্তিত বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার জায়গা তৈরি হচ্ছিল। যদিও শিক্ষিতা শহুরে আধুনিকাদের সঙ্গে যে সমাজের একটা তীব্র বিরোধ ছিল তা নানা ভাবে বার বার ফিরে এসেছে চলচ্চিত্রে।

তাই বিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি দাঁড়িয়েও উনবিংশ শতকের সংস্কার নিয়ে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও, তার উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করে দেয় চলচ্চিত্র। শিক্ষিতা নারীর পূর্ণতা তার সংসারকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা, সঠিকভাবে সন্তান প্রতিপালন করা, পারিবারিক কলহের অবসান ঘটিয়ে যৌথ পরিবারকে সংরক্ষিত করা, পরিবারের প্রবীণদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা ইত্যাদি। তিরিশ থেকে পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত এক আদর্শ নারী কতখানি শিক্ষিতা হবেন তার পরিমাপে হয়তো সামান্য পরিবর্তন হলেও হতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য বদলায়নি এতটুকু। বরং অধিক শিক্ষার অপপ্রয়োগ যে এক নারীর জীবনে কত বড় চূড়ান্ত ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, চলচ্চিত্রে বার বার তার উদাহরণ তৈরি করা হয়েছে। তিরিশের দশকে *মুক্তি* থেকে চল্লিশের দশকে *অভিনয়*, এবং পঞ্চাশের দশকে *দুইবোন*-এ একই উপমানের পুনরাবৃত্তি।

আদর্শ গৃহলক্ষ্মীর ওই ভাবমূর্তিকে আরও সংবেদনশীল করে তুলতে বাংলা চলচ্চিত্রে 'বিরোধী' নায়িকার অবতারণা আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। দুই নারীকে চলচ্চিত্রে সচেতনভাবে উপস্থাপিত করা হত সংস্কৃতির দুই বিপরীত মেরুর প্রেক্ষিতে। চলচ্চিত্র তার নিজস্ব ফোকাস চিহ্নিত করে দিত কাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করবে সমাজ, আর কে হবে বর্জনীয়। উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এই বিভাজন অনেকটাই ইউরোপীয় চলচ্চিত্রেব নারীবাদী তাত্ত্বিকদের অন্যতম মলি হ্যাসকেল-এর ভাল মেয়ে খারাপ মেয়ের ধারণাকে মনে করিয়ে দেয়। (দ্র. Haskell, Molly, *From Reverence to Rape: The Treatment of Women in the Movies.* Second edition. Chicago: University of Chicago Press, 1987) মলি হ্যাসকেল মূলত হলিউডের সিনেমায়, নারী চরিত্র চিত্রায়ণের বিষয়ে যে তত্ত্বের অবতারণা করেছেন তার সঙ্গে খানিকটা মিলে যায় আমাদের বাংলা চলচ্চিত্রে ওই ধরনের চিত্রণের ভঙ্গিটি। হলিউডের মতো এখানেও ভাল ও খারাপ মেয়ের একটা স্পষ্ট বিভাজনরেখা টানা হয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বহমানতায় সুবিধাজনক নারী চরিত্রগুলিই হবে 'ভাল' আর এর অন্যথা মানেই সে 'খারাপ', শাস্তির যোগ্য। আবার সচেতনভাবেই এই বিভাজনরেখা মাথায় রেখে অভিনেত্রীদের মধ্যেও একটা পার্থক্য করা হয়েছিল— আদর্শ নায়িকার চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করতেন, যেমন কানন দেবী, ভারতী দেবী, পদ্মাবতী দেবী প্রমুখ, তাঁদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল 'বিরোধী' নায়িকা চরিত্রের অভিনেত্রীরা, যাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্যা ছিলেন চন্দ্রাবতী দেবী।

বাংলা চলচ্চিত্রের এই 'বিরোধী' নারী চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য একেবারে নির্দিষ্ট ছিল। যেমন এঁরা হবেন শিক্ষিতা, আধুনিকা, শহুরে। উনবিংশ-বিংশ শতকের নব্যশিক্ষিত পরিবারের নারীদের সঙ্গে এই বিরোধী নায়িকাদের মিলিয়ে দেওয়ার একটা যেন প্রচ্ছন্ন প্রয়াস থাকত। তাঁদের সাজপোশাক, শাড়ি পরার ধরন, পুরুষদের সঙ্গে একত্রে বসে সাহিত্য চর্চা— ইত্যাদি যেন তারই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত। আর তার সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে মিলিয়ে দেওয়া হত ঔদ্ধত্য, স্বেচ্ছাচারিতা, উগ্র আধুনিকতার মতো বিরোধী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বহু চলচ্চিত্রে আবার এই ধরনের চরিত্রদের বারবনিতা হিসাবে দেখানো হয়েছে যেমন— *প্রতিশ্রুতি* (১৯৪১), *গৃহলক্ষ্মী* (১৯৪৫) ইত্যাদি।

অন্যান্য ছবিতে বারবনিতা না হলেও এই ধরনের মহিলারা যে সমাজে কাঙ্ক্ষিত নয় তা স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া হত। এমন উদাহরণও অজস্র— তিরিশের দশকে *খাসদখল* (১৯৩৫) থেকে চল্লিশের দশকে *জীবনসঙ্গিনী* (১৯৪২) এবং পঞ্চাশের দশকে *দুই বোন*-এও (১৯৫৫) একই ধরনের চিত্রায়ণের যেন একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়।

আপাতদৃষ্টিতে 'ভাল-খারাপ মেয়ে'র বিভাজনটা খুব স্পষ্ট হলেও, এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি ছবিতেই যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে দেখলে একটা অন্য ইঙ্গিতও অনুভূত হয়; যা বাংলা চলচ্চিত্রের স্বতন্ত্রতার চিহ্ন। তৎকালীন আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে ক্রমশ নারীদের অবস্থানের একটা পরিবর্তন ঘটিয়েছিল এবং এক শ্রেণির নব্য শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা যে এই পরিবর্তনকে সমর্থন করেছিলেন তারই একটা সূক্ষ্ম আভাস মেলে। *জীবনসঙ্গিনী* (১৯৪২)-তে মলির চরিত্র যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে, যে ভাবে তাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে তার মাধ্যমে সমাজের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সাধারণ দর্শককে অবহিত করবারও একটা প্রচ্ছন্ন প্রয়াস সম্ভবত ছিল। মলি শিক্ষিতা, আধুনিকা। তার উগ্রতা, মানবিক বোধের অভাব যেমন একদিকে তাকে দর্শকের চোখে ঘৃণ্য করে তোলে আবার তারই মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের মতো বিতর্কিত বিষয়কে যথেষ্ট যুক্তি দিয়ে উপস্থাপিত করা হয়। বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গে এক আলোচনায় মলি যখন বলে যে, সে তার অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্বাস করতে শিখেছে যে, বিবাহ মানে আজীবন দাসত্ব, সারাজীবনের বন্ধন— তাই সে ব্যক্তিগতভাবে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটির ওপর আস্থাশীল নয়— তখন সহজেই অনুমান করা যায় যে, সমাজে নারীদের মধ্যে যে সচেতনতা তৈরি হচ্ছিল এ যেন তারই আভাস। এর থেকেই ব্যাখ্যা করা যায় কেন একটা আদ্যোপান্ত মেলোড্রামাটিক ছবিতে এমন একটা বিপরীতধর্মী চরিত্রকে তার যুক্তিগুলি ব্যাখ্যা করবার এমন অবকাশ দেওয়া হয়েছে। এই ছবিতেই একটি দীর্ঘ দৃশ্য রয়েছে যেখানে মলি ও নরেনের (নায়ক) মধ্যে মতান্তর ঘটছে এক অত্যন্ত আপাত সাধারণ, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে। নরেন মলির অবর্তমানে তার একটি চিঠি খুলে পড়ে। যদিও নব্যশিক্ষিত, ইউরোপীয় ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত এক পুরুষ হিসাবেই নরেনকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, কিন্তু নরেন তার কৃতকর্মের সপক্ষে যুক্তি দেয় যে, সে বিশ্বাস করে যে বিবাহের পর নারীর আর একান্ত ব্যক্তিগত বলে কিছু থাকতে পারে না। মলি খুব তীব্র ভাষায় এর প্রতিবাদ জানায়। সে বলে যে তার মতে লুকিয়ে অন্যের চিঠি পড়া চৌর্যবৃত্তির সমতুল্য অপরাধ। তার বক্তব্যে সে স্পষ্ট করে দেয় যে বিবাহিত হলেও সে এক স্বতন্ত্র মানুষ এবং সেই স্বাধীনতা সে বিসর্জন দিতে আগ্রহী নয়। বরং সে দৃঢ়তার সঙ্গে নরেনকে জানায় যে তারও অবহিত থাকা উচিত যে তার (নরেনের) অধিকারবোধেরও একটা সীমা রয়েছে। যদিও জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার মধ্যে মলিকে একটি উগ্র স্বার্থপর, ঘৃণ্য, স্বেচ্ছাচারী নারী হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়, কিন্তু বিভিন্ন দৃশ্যে মলির যুক্তির মধ্যে দিয়ে নব্যশিক্ষিত সমাজের সুবিধাবাদী, কপট দ্বিমুখীনতার প্রতি একটা সূক্ষ্ম ব্যঙ্গও প্রকাশ পায়।

প্রতিশ্রুতি (১৯৪১) এমনই আর একটি উদাহরণ। এই ছবিতে সুমিত্রা ('বিরোধী' নারী চরিত্র) যখন অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়ের অবতারণা করে তখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে সচেতনভাবে পরিচালক বা চিত্রনাট্যকার এই দ্বিতীয় নারীর মধ্যে দিয়ে একটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। *প্রতিশ্রুতি* ছবিতে একটি দৃশ্য রয়েছে যার সঙ্গে মূল কাহিনির কোনও যোগ সে অর্থে নেই। তবু ওই দীর্ঘ দৃশ্যটি যথেষ্ট যত্ন সহকারে দৃশ্যায়িত হয়েছে সম্ভবত সমান্তরাল এই ভাবনার একটা প্রভাব রেখে যাওয়ার জন্যই। সুমিত্রা এক বারবনিতা, কিন্তু সাধারণ দেহপশারিণী সে নয়। শুধুমাত্র শিক্ষিত, সাংস্কৃতিক বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী শ্রেণির মানুষদেরই আনাগোনা তার কাছে। ফলে তাদের সংস্পর্শে এসে ভাবে বুদ্ধিতে সেও যথেষ্ট পরিশীলিত। এমনই এক সন্ধ্যায় যখন সে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত তখন জমিদার ব্রজবল্লভ তার সঙ্গে দেখা করতে আসেন যার পুত্র তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। ব্রজবল্লভের সঙ্গে কথোপকথনের দীর্ঘ দৃশ্যে তথাকথিত আধুনিক সমাজের দ্বিচারিতার প্রতি ইঙ্গিত স্পষ্ট। আধুনিক সমাজের কপটচারিতা, শ্রেণি বৈষম্য ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে সচেতনভাবেই। সে খুব স্পষ্টতই জানিয়েছে যে অর্থবান মানুষদের ছেড়ে সে এখন সত্যিকারের শিক্ষিত সংস্কৃতিবান মানুষদের সঙ্গে মিশেছে, সে জেনেছে তার মতো নারীরা ঘৃণ্য নয় কখনই, কারণ তারা এই ভণ্ড সমাজব্যবস্থার একটা নির্মাণ মাত্র। সমাজের কপটচারিতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সে বলে যে, যে সমাজ তার মতো নারীদের থিয়েটারে সতী হতে দেখলে চোখের জল ফেলে, সেই সমাজই যখন বাস্তবে কোনও নারীকে সতী হতে দেখে, তখন অবলীলায় তা উপেক্ষা করে চলে যায়। এক অন্য গল্পের মধ্যে একটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ যে যথেষ্ট সচেতনভাবেই গ্রহণ করা হয়েছিল তা চিত্রনাট্যের বিন্যাস ও চরিত্র সৃজনের ধারাটিতে মনসংযোগ করলে স্পষ্ট হয়ে যায়।

অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের সঙ্গে চলচ্চিত্রের খানিকটা পার্থক্য আছে। চলচ্চিত্র শুধুমাত্র একটা শিল্পরূপ নয়। চলচ্চিত্র যতটা শিল্প, প্রায় ততটাই একটা শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এর নির্মাণ পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত থাকে বিভিন্ন শ্রেণির একাধিক মানুষ। বহুক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে প্রযোজক ও নির্দেশক দু'জন সম্পূর্ণ দু' শ্রেণির পৃথক দর্শনের মানুষ। প্রযোজকের অর্থেই ছবি তৈরি হয় তাই তার প্রভাবে নির্দিষ্ট হয় ছবির মূল কাঠামো। অন্যদিকে নির্দেশক সেই নির্দিষ্ট পরিকাঠামোর মধ্যেই তাঁর শিক্ষিত মননের এক সূক্ষ্ম আভাস রেখে যেতেন, দর্শকদের অবহিত করতেন একটা সমান্তরাল সামাজিক দর্শন সম্পর্কে।

একদিকে যেমন পরিবারমুখী আদর্শ গৃহবধূর ভাবমূর্তি জনপ্রিয় করে তোলার প্রয়াস বাংলা জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের একটা মূল বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল, কিন্তু পঞ্চাশের দশক থেকে একই সঙ্গে জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের আর এক অংশে পারিবারিক গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পেতে শুরু করেছিল। ৫০-এর দশকের রোমান্টিক ধর্মী চলচ্চিত্র যখন পারিবারিক গণ্ডির ঊর্ধ্বে দুটো ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কাহিনি তুলে ধরল, তার সঙ্গে অবধারিতভাবে পরিমার্জিত হল বাংলা চলচ্চিত্রে নারী চিত্রণের ধরন। পরিবার ও সংসারের নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে ক্রমশ বাংলা সিনেমায় নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের বিকাশ লক্ষ করা গেল। যদিও আক্ষরিক অর্থে এই

প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছিল পঞ্চাশের দশকেই, কিন্তু তার বেশ কয়েক বছর আগে, চল্লিশের দশকেই এ ক্ষেত্রে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন পরিচালক বিমল রায়, তাঁর *উদয়ের পথে* (১৯৪৪) চলচ্চিত্রে। বাংলা সিনেমার ইতিহাসে *উদয়ের পথে* এই প্রথমবার নারীকে তথাকথিত আদর্শ গৃহবধূ ভাবমূর্তির বাইরে এক ভিন্ন আর্থসামাজিক শ্রেণিদ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে উপস্থাপিত করে। ধনী কন্যা ও দরিদ্র শ্রমিক নেতার মধ্যে গড়ে ওঠা নিছক প্রেমের গল্পের মধ্যে দিয়েই পুঁজিবাদী শোষণে জর্জরিত আর্থসামাজিক জটিলতার একটা ভিন্ন চেহারা দর্শকদের কাছে তুলে ধরেন বিমল রায়। প্রথমবার বাংলার রূপালি পর্দা প্রত্যক্ষ করল এমন এক কাহিনিচিত্র যেখানে নায়িকা শুধুমাত্র এক সম্ভ্রান্ত সুন্দরী প্রেমিকা থাকে না, তার প্রেমিক যুবকের সংস্পর্শে এসে সে এক প্রতিবাদী ভিন্ন নারী হয়ে ওঠে, যে পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে তার পরিবারকেও ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত নয়। নিঃসন্দেহে এই প্রথম কোনও নায়িকাকে সংসার গৃহ পরিবার প্রেম অতিক্রম করে, এমনভাবে আর্থসামাজিক আন্দোলনের শরিক হতে দেখল সিনেমা। নারীচিত্রণের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে স্বীকার করতেই হয় যে *উদয়ের পথে* একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম।

পঞ্চাশের দশক বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ দশক। এই সময় থেকে বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে। নতুন নতুন বিষয়, নিত্য নতুন আঙ্গিক— বাংলা চলচ্চিত্রের পরিচিত স্বরূপে এক দ্রষ্টব্য বদল আনছে। ততদিনে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিও তুলনায় অনেকটা স্থিত। নতুন সংবিধান প্রাপ্তি, প্রজাতন্ত্রের উত্থান, প্রথম নির্বাচনের প্রস্তুতি— সব মিলিয়ে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্বের প্রয়োজন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। যদিও ঠিক তখনও পরবর্তী সামাজিক ব্যবস্থায় ঠিক কী ধরনের পরিবর্তন আসবে তার স্পষ্ট ধারণা স্বাধীন ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে তৈরি হয়নি, তবে সেই সময়ে নেহরুর ভবিষ্যৎ প্রকল্পে যে উদার, সাম্যবাদী, ধর্মীয় গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে যুক্তিবাদী, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি তৈরি হয়েছিল তার প্রচ্ছন্ন প্রভাবে হিন্দি-বাংলা উভয় ধরনের চলচ্চিত্রে কাহিনির পরিধি প্রসারিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্রের পাশাপাশি বিভিন্ন মনীষীদের জীবনীমূলক চলচ্চিত্র (*মাইকেল মধুসূদন*, ১৯৫০; *বিদ্যাসাগর*, ১৯৫০; *কবি চন্দ্রাবতী*, ১৯৫২), ঐতিহাসিক ঘটনা সমৃদ্ধ চলচ্চিত্র (*বিপ্লবী ক্ষুদিরাম*, ১৯৫১; *ছিন্নমূল*, ১৯৫১; *নীলদর্পণ*, ১৯৫২), শিশুদের জন্য নির্মিত চলচ্চিত্র (*খেলাঘর-বোধোদয়-ছুটির দিন*, ১৯৫১; *বাবলা*, ১৯৫১), কৌতুকধর্মী চলচ্চিত্র (*বরযাত্রী*, ১৯৫১, *পাশের বাড়ি*, ১৯৫২), ভ্রমণের মতো বিষয় নিয়ে চলচ্চিত্র (*মহাপ্রস্থানের পথে*, ১৯৫২), অপরাধ ও আতঙ্ককর বিষয়বস্তু নিয়ে চলচ্চিত্র (*কঙ্কাল*, ১৯৫০; *জিঘাংসা*, ১৯৫১, *হানাবাড়ী*, ১৯৫২)— এমন বিবিধ বিষয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হল। বিষয়ের এই বিস্তৃতি ক্রমশ বাংলা চলচ্চিত্রকে তার পরিবারকেন্দ্রিক সীমাবদ্ধতা থেকে বের করে এনে একটা উন্মুক্ত বিচরণের ক্ষেত্র দিল। চলচ্চিত্রে দৃষ্টিভঙ্গির এই বদলও সম্ভবত স্বাধীনোত্তর জটিলতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। স্বাধীনতাযুদ্ধ, দেশভাগ, উদ্বাস্তু জীবন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এক অস্থির মানসিকতার জন্ম দিল। মানুষ অনুভব করল যে তাদের পৃথিবী আর চার দেওয়ালের সুখী গৃহকোণে সীমাবদ্ধ নেই, বাহির ও ভিতর জগৎ মিলেমিশে তাদের পৃথিবীর

গণ্ডিকে বিস্তৃত করেছে। আর চলচ্চিত্রও এই বিস্তৃত ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এক অন্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অনেক জটিল বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করছে। নারীচিত্রণের ক্ষেত্রেও এর একটা প্রভাব পড়ছে। বাংলার জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের মধ্যেও এই প্রভাব যথেষ্ট স্পষ্ট। এই সময় রোমান্টিক জুটি নিয়ে যে একটা অন্য ধারা জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছিল সেখানে নারী কিন্তু চিরাচরিত গ্রাম্য-গৃহলক্ষ্মী ভাবমূর্তি থেকে সম্পূর্ণ অন্য এক ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। দুটি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, ভালবাসার মধ্যে থেকে তৈরি হয় একটা ভিন্ন ক্ষেত্র যা হয়তো সেই সময়ের নাগরিক জীবনের অণু পরিবারের প্রতিফলন। আমরা দেখতে পাই ক্রমশ পরিবার ও পারিবারিক মূল্যবোধ থেকে সরে এসে চলচ্চিত্র অনেক বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল, যেখানে নারীকে তার ব্যক্তিগত জীবন নির্বাচনের স্বাধীনতা দেওয়া হল। প্রয়োজনে পরিবারের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে গিয়েও সে তার জীবনসঙ্গী নির্বাচন করছে। *সাড়ে চুয়াত্তর* (১৯৫৩), *শেষের কবিতা* (১৯৫৩), *অগ্নিপরীক্ষা* (১৯৫৪), *সবার উপরে* (১৯৫৫), *শাপমোচন* (১৯৫৫), *চলাচল* (১৯৫৬), *একটি রাত* (১৯৫৬), *হারানো সুর* (১৯৫৭), *ইন্দ্রাণী* (১৯৫৮)— এমন অজস্র উদাহরণ রয়েছে। এই ধরনের ছবিতে শুধুমাত্র যে একটা মানসিকতার পরিবর্তন লক্ষ করা যায় তা নয়, পোশাকে আশাকে, শরীরী ভাষায় সেই গ্রাম্য সাধারণ গৃহলক্ষ্মীর বদলে আধুনিকা, সচেতন শহুরে এক অন্য নারীর ছবি তৈরি হতে থাকে।

ষাটের দশকে এসে এই চরিত্র চিত্রণের ধারাটি আরও পরিণত হয়। জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের বিষয়ের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয় এক অন্য বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ, যেখানে নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার একটা স্বীকৃত ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। *হসপিটাল* (১৯৬০), *স্মৃতিটুকু থাক* (১৯৬০), *ডাইনি* (১৯৬১), *সপ্তপদী* (১৯৬১), *ভগিনী নিবেদিতা* (১৯৬২), *উত্তর ফাল্গুনী* (১৯৬৩), *কিনু গোয়ালার গলি* (১৯৬৪)— এমন অনেক ছবি হচ্ছে যেখানে জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে নারীজীবনের নানা জটিলতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা, সম্পর্কের টানাপোড়েনে বিধ্বস্ত নারীর একটা সহমর্মী মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আমরা দেখতে পাই, যা নিঃসন্দেহে নারীচিত্রণের ইতিহাসের একটা নতুন পর্বের সূচক।

পঞ্চাশের দশক বাংলা চলচ্চিত্র ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ দশক। এই দশক বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রকে একটি ব্যতিক্রমী শিল্পমাধ্যম হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। মূল ধারার সিনেমায় বহু ব্যবহারে জীর্ণ বিষয়, যেমন সামাজিক অবিচার, অত্যাচার, বর্ণাশ্রমের নিগ্রহ, অর্থনৈতিক শোষণ, দুর্নীতি ইত্যাদি নানা বিষয় এক ভিন্ন প্রকাশভঙ্গিতে উপস্থাপিত হল। ১৯৫৫ সালে *পথের পাঁচালী* মুক্তি পাওয়ায় এক অভিনব আঙ্গিক-শৈলীর সঙ্গে পরিচিত হল বাংলা সিনেমা। কিরণময় রাহা অবশ্য 'ভারতীয় সিনেমার নতুন ধারা' (নির্মাল্য আচার্য ও দিব্যেন্দু পালিত সম্পাদিত *শতবর্ষে চলচ্চিত্র*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮) প্রবন্ধে লিখেছেন যে আক্ষরিক অর্থে 'নতুন ধারা'র সিনেমা বাংলায় শুরু হচ্ছে ১৯৬০-এর দশক থেকে। কারণ, এক সমাজতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক দেশ ছাড়া সব দেশেই সিনেমা বাণিজ্যিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। তাঁর মতে, ১৯৬১ সালে অর্থমন্ত্রকের অধীনে ফিল্ম

ফিন্যান্স কর্পোরেশন (এফ এফ সি) গঠিত হওয়ার পর থেকেই 'নতুন ধারা'র ছবি করা সেই অর্থে শুরু হয়। কিন্তু বাস্তবে তার অনেক আগে থেকেই সীমিতভাবে হলেও বাংলা চলচ্চিত্রে প্রথাগত রীতির বাইরে একটা সমান্তরাল মৌলিক প্রয়াস শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিনোদনের ক্ষেত্র থেকে একটা পরিণত রাজনৈতিক অবস্থানের ক্ষেত্র ক্রমশ তৈরি হচ্ছিল। ১৯৫১ সালে মুক্তি পেল নিমাই ঘোষের *ছিন্নমূল*। সম্ভবত *ছিন্নমূল* থেকেই বাংলা চলচ্চিত্রের মূল ধারার সমান্তরাল অন্য ধারায় বিবর্তিত হওয়ার একটা প্রাথমিক পর্যায়ের সূত্রপাত ঘটল। দেশভাগের মতো একটা প্রায় সমকালীন রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে নির্মিত *ছিন্নমূল* কিংবা ১৯৫২ সালে তৈরি ঋত্বিক ঘটকের *নাগরিক*-এর মতো ছবির সঙ্গে সঙ্গে নারী-চিত্রায়ণের ধারায়ও এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন চোখে পড়ল। এই ধরনের সিনেমার মধ্যে দিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রের দর্শক এবার প্রত্যক্ষ করল এক অন্য নারীকে— শ্রীহীন, রুক্ষ, আর্থসামাজিক টানাপোড়েনে বিধ্বস্ত, ছিন্নভিন্ন নারীর এ এক অন্য চেহারা। ১৯৬১-তে এফ এফ সি গঠনের অনেক আগে থেকেই সিনেমার মধ্যে মূল বাণিজ্যিক ধারার একটা ব্যাপার অবশ্যই নিশ্চিত করে যে এই নতুন ধরনের ছবির উদ্ভাবনার তাগিদ এসেছিল সামাজিক ও ব্যক্তিমানসের বাতাবরণের পরিবর্তনের অন্তঃস্তল থেকে। পঞ্চাশের দশক থেকেই অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ও তজ্জনিত মূল্যবোধ, বিশ্বাস, আদর্শ ও মানসিকতার ওলটপালট চলেছিল, অন্যান্য যে-কোনও সৃষ্টিশীল শিল্পমাধ্যমের মতো চলচ্চিত্রেও যে তার একটা প্রতিফলন ঘটবে সেটাই স্বাভাবিক। এই নতুন ধারার ছবিতে এক অন্য অনুভূতির জায়গা থেকে দেখা হল নারী ও নারী সম্পর্কিত সমস্যাগুলিকে। পরিবর্তিত আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে তার সামাজিক শোষণ, বঞ্চনা, শোক, হতাশা, যন্ত্রণার গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ '*গৃহলক্ষ্মী-মিথ*'-এর চিরায়ত ধারাকে ভেঙে এক অন্য মাত্রা যোগ করল নারীচিত্রণের ইতিহাসে। আমরা প্রত্যক্ষ করলাম কীভাবে এতদিন ধরে নির্মিত, সযত্নে সংরক্ষিত বাংলা চলচ্চিত্রের 'ভাল নারী, মন্দ নারী'র নির্দিষ্ট ইমেজকে সচেতনভাবে আঘাত করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ সত্যজিৎ রায়ের *দেবী* (১৯৬০), সেখানে আমরা দেখি ফিউডাল ধ্যানধারণায় লালিত/গঠিত নারীর 'দেবীরূপের' মধ্যে কীভাবে ক্রমশ একটা প্রাণ বিনষ্ট হয়। মাতৃকল্পনা যেখানে আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ভাবনার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ অধিকার করে থাকে, যেখানে প্রতিটি বাংলা ছবি এ যাবৎ নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করে এসেছে যে 'ভাল' নারী, আদর্শ নারী মানেই দেবীর এক রূপ; সেখানে সত্যজিৎ রায় এক সরল গ্রাম্য জমিদার বাড়ির গৃহবধূ দয়াময়ীর মধ্যে সেই দেবীমূর্তি মিথ একটু একটু করে তৈরি করেন, এবং তারপর ছবির ক্লাইমেক্স-এ এসে সেই মিথ ভেঙে যায় যখন দর্শক দেখেন মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে দয়াময়ী সেই বদ্ধ পরিবেশ থেকে পালিয়ে যেতে জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে, আর অদূরে পড়ে আছে বিসর্জিত দুর্গা প্রতিমার কাঠামো। নারী যে এক সাধারণ মানবী, দেবী নয়, তার ভার যে সে স্বেচ্ছায় নিতে চায় না, নিতে পারে না— এ যে দুর্বলের ওপর ক্ষমতাবান পিতৃতন্ত্রের অধিকার সিদ্ধ করবার একটা প্রয়াস মাত্র— এই তথ্য এত স্পষ্টভাবে বাঙালি দর্শকদের কাছে আগে কখনও পৌঁছয়নি। স্বভাবতই

নারীমুক্তির বৃহত্তর প্রশ্ন ও তাগিদ এখানে মুখ্য হয়ে ওঠে, সংসার-সাংসারিকতার মাত্রার মধ্যে নারীর সংজ্ঞা বা ভূমিকা এখানে কোনও প্রশ্ন নয়। দয়াময়ীর দেবীতে প্রতিষ্ঠায় ছবির ক্ষেত্রই বিস্তৃত হয়ে যায়।

আদর্শ নারীর গতিপথ নির্দিষ্ট— সংসার-স্বামী-পরিবার, তার থেকে তার স্খলন নেই। স্বামী ভিন্ন আর সকলের ক্ষেত্রেই তার সম্পর্কের একটাই ধরন— মাতৃসুলভ এক স্নেহের সম্পর্ক। বাংলা চলচ্চিত্রের মূল ধারার ছবিতে 'মাদার আর্কিটাইপ' নিয়ে আদিখ্যেতা একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিশেষত দেওর-বউদির সম্পর্ক, যেখানে বউদি বরাবর মাতৃসমা। এমনকী দিদি ও ভাইয়ের মধ্যেও দিদি মাতৃসমা। এমন অজস্র উদাহরণ রয়েছে— *রামের সুমতি, চাঁপাডাঙার বউ, না, ভাঙ্গাগড়া* ইত্যাদি। কিন্তু *চারুলতা*-য় (১৯৬৪) যখন একটি নির্দিষ্ট ধরন থেকে বেরিয়ে একেবারে ভিন্ন এক মনস্তাত্ত্বিক স্তরে অমল-চারুর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন সত্যজিৎ রায়, তখন স্পষ্ট ওই নারীচিত্রণে একটা অন্য দৃষ্টিকোণ তৈরি হয়। অমল-চারুর সম্পর্ক যেভাবে উপস্থাপিত তা কোনও প্রথাসিদ্ধ সামাজিক সম্পর্ক নয়, বাঙালি রক্ষণশীল সমাজ তাকে কখনওই স্বীকৃতি দেবে না— তবু চারুলতা কিন্তু এই ছবির দৃষ্টিকোণ থেকে একটা সমর্থন পায় যখন দর্শক দেখে শেষ দৃশ্যে চারু ভূপতির দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে 'এসো'। কণ্ঠে তার কোনও অপরাধবোধ নেই, বরং ভূপতির অভিব্যক্তিতেই কিছুটা পরাজয়ের গ্লানি, freeze shot-এ চারু তার ব্যক্তিত্ব নিয়েই প্রকাশিত।

সরাসরি প্রথাবহির্ভূত পেট্রেয়ার্কি বিরোধী নারী চরিত্রও দেখা যায় এই অন্য ধারার ছবিতে। বিমল রায়ের *উদয়ের পথে*-তে এর সূত্রপাত। পরে সত্যজিৎ রায়ের *কাঞ্চনজঙ্ঘা* (১৯৬২), শম্ভু মিত্র-অমিত মৈত্রের শুভ *বিবাহ*, সত্যজিতের *কাপুরুষ* (১৯৬৫) ছবিতে নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষের কাপুরুষতার তিরস্কার, *দেবী* ছবিতে সাধারণ জ্ঞানের অধিকারী বিচক্ষণ, যুক্তিবাদী একমাত্র নারী বড় পুত্রবধূ যিনি তাঁর স্বামী-শ্বশুরের বাধা সত্ত্বেও চিকিৎসক ডেকে আনেন তাঁর অসুস্থ পুত্রের চিকিৎসার জন্য— এমন অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। মূল ধারার ছবিতে নারীচিত্রণের নির্দিষ্ট ধারা থেকে এই departure যে সমান্তরালভাবে আর একটি ধারা তৈরি করে দিচ্ছে— এ তারই সাক্ষ্য।

নারীশিক্ষা বিস্তারের ফলে যে ক্রমশ পুরুষের প্রতিযোগিতার স্থলে নারীর অনুপ্রবেশ ঘটছিল, যদিও হয়তো তা খুবই সীমিত পর্যায়ে— তারও এক অসামান্য প্রকাশ দেখলাম *চারুলতা*-য়। অমলের প্রেরণায় চারুলতার যে যাত্রা শুরু, সেই পথে সে কত অবলীলায় অতিক্রম করে গেল অমলকে। অমলের লেখা যে বিশিষ্ট সাহিত্যপত্রিকা খারিজ করেছিল, সেই পত্রিকাতেই চারুলতার প্রথম লেখা ছাপা হয়। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই পরিবর্তন হয়তো সমাজে অনেক আগে থেকেই ঘটতে শুরু করেছিল, কিন্তু বাণিজ্যিক স্বার্থে এমন কাহিনি দৃশ্যায়নের সাহস চলচ্চিত্র আগে দেখায়নি। অন্য ধারার ছবি এই ক্ষেত্রটা প্রস্তুত করে দিয়েছিল।

বাংলা চলচ্চিত্রে বহুদিন ব্রাত্য ছিল উপার্জনরতা নারী। বহুদিন পর্যন্ত চলচ্চিত্রে উপার্জনরতা নারী মানেই ছিল বারবণিতা। কিন্তু দেশভাগ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অভিঘাতের পর যেভাবে বহু মেয়েদের চাকরি করাটা তাদের সংসার রক্ষার্থে বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ল,

তখন স্বাভাবিক নিয়মেই উপার্জনরতা নারীর একটা সম্মানজনক জায়গা তৈরি হল সিনেমায়। অন্য ধারার ছবিতে এক ভিন্ন সংবেদনশীলতায় ধরা পড়ল এঁদের গল্প। ঋত্বিক ঘটকের *মেঘে ঢাকা তারা*-য় (১৯৬০) পরিবর্তিত আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীশোষণের এক অন্য চিত্র দেখা গেল। দেশভাগে বিধ্বস্ত এক উদ্বাস্তু পরিবারের জ্যেষ্ঠা কন্যা নীতা কীভাবে তীব্র আর্থিক অনটন ও পারিবারিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে নিজের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রেম স্বপ্ন— সব কিছু বিসর্জন দিয়ে শেষ পর্যন্ত একদিন নিজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার পরিবারের আপনজনদের থেকে, তারপর একদিন তলিয়ে যায় একা, মৃত্যুর অতলে। এই ছবিতে পরিচালক ওই অতি সাধারণ এক মেয়ের মধ্যে একটা দেবীর প্রতিমূর্তি তৈরি করেছেন, যে তার সকল শক্তি নিয়ে আগলে রাখতে চায় গোটা পরিবারকে। সারা ছবি জুড়ে সংলাপে, গানে, দৃশ্যায়নে জগদ্ধাত্রী, উমার সঙ্গে নীতাকে মিলিয়ে একটা মিথ তৈরি হয়। কিন্তু শেষ দৃশ্যে যখন যক্ষ্মায় আক্রান্ত নীতা তার দাদার কাছে ভেঙে পড়ে বাঁচার আর্তি নিয়ে তখন এক মুহূর্তে সেই মিথ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। জগদ্ধাত্রীর ইমেজ ভেঙে বেরিয়ে আসে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, পরিচিত এক নারী। প্রকট হয় শোষণের এক নগ্ন চেহারা, যেখানে নীতা কোনও দেবী নয়, দেশভাগে বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক সামাজিক পরিস্থিতির এক মূর্ত প্রতীক। একদিক থেকে দেখলে ঋত্বিক ঘটক নানা ভাবেই বাংলা ছবির পুরাতন আদলের অনুসারী, তার মধ্য থেকেই যেমন নীতার সর্বংসহা পরিবারগতপ্রাণা সত্তা, তেমনই যন্ত্রণার মেলোড্রামাটিক ভাবের পর ভাব— প্রেমিকের বিশ্বাসঘাতকতা, বোনের স্বার্থপরতা থেকে যক্ষ্মার চূড়ান্ত পরিণতি। নীতার চিৎকৃত জীবনসাধও সেই মেলোড্রামাটিক যুক্তিপরম্পরারই অমোঘ নিষ্পত্তি।

সত্যজিৎ রায়ের *মহানগর* এই উপার্জনরতা নারীদের বিষয়টি একেবারে একটা অন্য স্তর থেকে বিশ্লেষণ করেছে। *মহানগর* দেশভাগ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী আর্থসামাজিক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এক গৃহবধূর পূর্ণ নারীতে রূপান্তরের কাহিনি। তীব্র এক আর্থিক প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে এক রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহবধূ আরতি চাকরি নেয়। চাকরি করতে যাওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে তার তীব্র মানসিক দ্বন্দ্ব, বৃদ্ধ শ্বশুরের প্রকাশ্য বিরোধিতা, শাশুড়ির নীরব অভিমান, ছোট্ট শিশুপুত্রের জন্য দুশ্চিন্তা, অপরাধবোধ— বিভিন্ন দৃশ্যে এই ছোটো ছোটো মুহূর্তগুলিতে দর্শক যেন নিজেদের বাস্তব পরিস্থিতিকেই আর একবার ফিরে দেখে। এই সব কিছু অতিক্রম করে চাকরিতে ঢোকে আরতি। সেখানে, সেই নতুন পরিবেশে তার যেন এক পুনর্জন্ম ঘটে। তার এই কর্মস্থল, সেখানকার প্রতিযোগিতা, সাফল্য— কখন ধীরে ধীরে বদলে দেয় সেই মধ্যবিত্ত পরিবারের অতি সাধারণ ভিতু দুর্বল মেয়েটিকে। অভাবের সংসারে তার নিয়মিত আর্থিক সংকুলান, সংসারের মধ্যেও তার প্রতিও একটা আলাদা মর্যাদা তৈরি হয়। একেবারে প্রারম্ভে তার শাশুড়ির যে বিরূপ মনোভাব ছিল তার চাকরি প্রসঙ্গে, তা ধীরে ধীরে অনেক সহজ হয়ে যায়। অন্য দিকে উচ্চস্তরের আইরনি সহ সত্যজিৎ রায় দেখান যে এই চাকরিতে প্রতিষ্ঠা আরতিকে পুরুষের চোখে (স্বামীর চোখেও) বদলে দেয়। নারীর এই স্বাধীন ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা মধ্যবিত্ত পুরুষের চোখে কখনও বরদাস্ত হয় না। তাই হঠাৎ একদিন সুব্রত আরতিকে চাকরি ছেড়ে দিতে বলে— কারণ দেখায়, 'তুমি

রোগা হয়ে যাচ্ছ'— অর্থাৎ তোমার গৃহনারী কল্যাণী রূপটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যা ধরে রাখা তার অন্যতম কর্তব্য। অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার জোরেই আরতির যে তার সমকক্ষ একটা জায়গা সংসারে তৈরি হয়ে যাচ্ছিল, তা সুব্রত মেনে নিতে পারে না। তাই যে সুব্রতর সমর্থনে ও উৎসাহে আরতি চাকরি নিয়েছিল, যে সুব্রত তার বৃদ্ধ শিক্ষক পিতাকে স্ত্রীর চাকরি নেওয়ার সমর্থনে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে 'change' আসে একটা 'necessity' থেকে, যে সুব্রত তার স্ত্রীর চাকরি করতে যাওয়ার মুহূর্তে তার মাকে চোখের জল ফেলতে দেখে বিদ্রুপ করেছিল— সেই সুব্রতই যখন আরতিকে বোঝায় তার চাকরি করা অনুচিত, কারণ— সে চায় না, বাবা-মা চান না, শিশুটিও চায় না— তখন মুহূর্তে সুব্রতর pseudo reformist চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে যায়। আরও স্পষ্ট হয় তার চেহারা যখন আবার সে স্ত্রীকে এক প্রকার চাকরি ছাড়ার মানসিক প্রস্তুতি তৈরি করে দিয়ে, পর মুহূর্তে নিজের চাকরি চলে যাওয়ার দরুন, নিছক survival-এর খাতিরে স্ত্রীকে টেলিফোন করে জানায়— 'চাকরি ছেড় না।' নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে লড়াই করতে করতে আরতির মধ্যে তার নিজের অজান্তে জন্ম নেয় এক অন্য নারী— সে *মেঘে ঢাকা তারা*-র নীতার মতো নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলে না, বরং ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানায়। আরতি চাকরি ছেড়ে দেয়, কিন্তু সুব্রতর কথায় নয়। এক অন্যায়ের প্রতিবাদে। তার প্রতিবাদ এমন এক নারীর স্বার্থে বাঙালি রক্ষণশীল পরিবারে যার কোনও স্বীকৃতি নেই। একটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে, তার সহকর্মী, বন্ধু এডিথ। তার প্রতি তার বসের অবিচারের প্রতিবাদে তার নিজের অত্যন্ত দুঃসময়েও সে চাকরিতে ইস্তফা দেয়। এই একটি ঘটনা সেই মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ গৃহবধূটিকে তার পরিবারের সীমারেখার বাইরে এনে মিলিয়ে দেয় এক বৃহৎ জগৎ-এর সঙ্গে। সুব্রতও এ ঘটনায় বিহ্বল হয়ে পড়ে, আরতির এই পদক্ষেপ তারও চেতনার উদয় ঘটায়— সে স্বীকার করে, আরতি অন্যায়ের বিরোধিতা করবার যে দুঃসাহস দেখিয়েছে, হয়তো সে তা পারত না। শেষ দৃশ্যে যখন আবার নতুন করে শুরু করবার অঙ্গীকার নিয়ে আরতির সঙ্গে সুব্রত পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মিশে যায় মহানগরের ভিড়ে, তখন নারীর স্বীকৃতির পরিধি যে ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে তারই যেন একটা প্রচ্ছন্ন আভাস থেকে যায় এর মধ্যে।

পঞ্চাশের দশকের শেষ, প্রধানত ষাটের দশকের গোড়া থেকেই বাংলা চলচ্চিত্রের মূল ধারা ও এই নতুন ধারার মধ্যবর্তী আর এক ধরনের চলচ্চিত্রের উদ্ভব হয়েছিল, যার উল্লেখ নারীচিত্রণের আলোচনায় যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। অন্য ধারা বা নিউ ওয়েভ সিনেমার দর্শক ছিল বরাবরই নির্দিষ্ট, সীমিত এক বুদ্ধিজীবী শ্রেণি। তাই নারীচিত্রণের ইতিহাসে এই পরিবর্তন খুব গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর শোনালেও সামগ্রিকভাবে দর্শকচেতনায় এর অভিঘাত কত দূর তীব্র হয়েছিল, তা প্রশ্নসাপেক্ষ। তাই মূল বাণিজ্যিক ধারার সঙ্গে এই অন্য ধারার এক সামঞ্জস্যপূর্ণ মেলবন্ধনে যে নতুন ধরনের চলচ্চিত্র সৃষ্টি হল, তা একটা বড় গোষ্ঠীর দর্শকদের নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করে। মূল ধারার বাণিজ্যিক ছবির দর্শক এবার নারীচিত্রণের দৃষ্টিকোণ পরিবর্তনের একটা ধারণা পায়। এই ধরনের ছবির মধ্যে দিয়েও অনেক গভীর, সংবেদনশীল বিষয়, সামাজিক জটিলতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু হয়েছিল। মূল ধারার বাণিজ্যিক ছবি থেকে বিষয়গত ও উপস্থাপনাগত একটা দূরত্ব থাকলেও,

ছবিগুলির মধ্যে দর্শক মনোরঞ্জনের ব্যাপারটিকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত। তাই অতি সহজেই অনেক গভীর বিষয় সহজ ভাষায় পৌঁছে যেত এক বৃহত্তর দর্শক গোষ্ঠীর মধ্যে। এই মিডলস্ট্রিম সিনেমার পরিচালক গোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তপন সিংহ, অসিত সেন, অজয় কর, রাজেন তরফদার, পার্থপ্রতিম চৌধুরী প্রমুখ। এই মিশ্রধারার ছবিতে নারীচিত্রণের একটা নিজস্ব ভঙ্গি তৈরি হয়েছিল, যা তার নিজের মতো করে মূলধারার স্টিরিওটাইপ আদর্শ নারীর image-কে খণ্ডন করে একটা non-conformist image তৈরি করতে সক্ষম হল। এর মধ্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ছবি পার্থপ্রতিম চৌধুরীর *ছায়াসূর্য* (১৯৬৩)। এই ধারার অন্যান্য ছবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য *জতুগৃহ* (১৯৬৪), *সাত পাকে বাঁধা* (১৯৬৩), *সপ্তপদী* (১৯৬১), *আপনজন* (১৯৬৮); সেখানেও ঠিক একই ভাবে আদর্শ নারী image ভেঙে একটা বিতর্কিত অন্য image তৈরি করা হয়েছে। এই ধারার মধ্যে এমন অনেক ছবি তৈরি হয়েছে যেখানে নারী এক পৃথক ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত। নারীমনস্তত্ত্ব আলাদা করে বিষয় হয়ে উঠেছে। পরিবর্তিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবেশে, অতি নাগরিক এক জীবন কীভাবে আরও জটিল করে তুলেছে নারীর অবস্থান— কাহিনির মধ্যে দিয়ে তার প্রতিফলন ঘটেছে। বাণিজ্যিক ছবির নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকেও যে ভাবে এই ছবিগুলি নারীর অবস্থানের চিত্রণকে পুনর্নির্মাণ করেছে এক বৃহৎ সাধারণ দর্শকগোষ্ঠীর কাছে— চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তার গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই একটা বিষয় উল্লেখ করা জরুরি। একদিকে যেমন এই ধরনের ছবির একটা বড় অনুপ্রেরণা এসেছিল নতুন ধারার ছবির থেকে, আবার তার সঙ্গে যুক্তও হয়েছিল আর একটা বাস্তব সত্য। পরিবর্তিত আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে মহিলাদের একটা বড় গোষ্ঠী যেমন পুরুষদের সঙ্গে উপার্জনের অংশীদার হয়েছে, মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সিনেমা-দর্শক নিয়ামকের ভূমিকারও একটা বদল ঘটছে। সমাজের মধ্যেই নারীর এই ভূমিকা স্বীকৃত হচ্ছে। আর এই স্বীকৃতিই সেই সময়ের মিশ্রধারার ছবির প্রযোজকদের উৎসাহিত করেছে এই ধরনের ছবিতে অর্থলগ্নি করতে, যার থেকে নারীচিত্রণের একটা অন্য মাত্রা যোগ হয়েছে।

জনপ্রিয় বা mass-media হিসেবে সমাজপরিবর্তনের সঙ্গে তথা জনরুচি বা জনচাহিদার রূপান্তরের সঙ্গে চলচ্চিত্রের ওতপ্রোত সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাত চলচ্চিত্রচর্চায় যে বহুমাত্রিক বিশ্লেষণের সুযোগ সৃষ্টি করে, তার অনেকটাই সমকালীন ফিল্ম স্টাডিজ-এ অবহেলিত থেকে যাচ্ছে। বস্তুত পশ্চিমবাংলায় আর্থরাজনীতিক পরিবর্তন যে দ্রুততায় ও অসম বিকাশের মধ্যে ঘটেছে তাতে এই বিন্যাসের যথার্থ বিশ্লেষণ ফিল্ম স্টাডিজ-এরই অন্য দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির বর্গগামিতা (mobility), দর্শকসমাজে এক একটি নতুন শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের (বা জেনডার-এরও) প্রবেশ, এই দুইয়ের চাহিদা মাথায় রেখে ছবির সামাজিক প্রেক্ষিতের নির্বাচন; বৃহত্তর চলচ্চিত্রীয় উৎপাদনের বাজারে প্রতিদ্বন্দ্ব ও আন্তর্জাতিক নান্দনিক মূল্যমানের দাবিদাওয়ার প্রভাব; সমাজে নতুন জেনডার-চেতনার সঙ্গে দেওয়া-নেওয়া; এই সবটা নিয়েই বাংলা ছবিতে নারীচিত্রণের স্বধর্ম বিচার করতে হবে। এই সমগ্র পট খুলে গেলে তার মধ্যে ডাইন্যামিজম-এর ব্যাপ্তি ও জটিলতা দূরচারী হতে বাধ্য।

চার

ঈপ্সিতা চন্দ

পণ্য-ঘাতক রহস্য: বিজ্ঞাপন, বিশ্বায়ন ও নারীবাদ

২০০০ সালে ২রা অক্টোবর ইউনাইটেড নেশনসের তরফ থেকে বিশ্ব অহিংসা দিবস বলে ঘোষণা করা হয়। এই লেখার যদি বিন্দুমাত্র কোনও ঐতিহাসিক মূল্য থাকে, সেই কথা মনে রেখে বলি, ২০০০ সালেই সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি প্রাপ্তবয়স্ক এক মহিলাকে তার বিধি-মাফিক-বিয়ে করা স্বামীর থেকে আলাদা করার জন্য সচেষ্ট হন তাঁর পরিবার এবং সেই পরিবারকে সাহায্য করেন রাজ্যের পুলিশ কর্মীরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ও বাদ-বিবাদ যখন তুঙ্গে, অর্থাৎ ওই ২রা অক্টোবরের কাগজেই, প্রথম পাতায় দেখি, আর একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাকে তাঁর বিধিমতো-বিয়ে করা স্বামীর থেকে আলাদা করে পুলিশকর্মীরা দাবি করেন যে সেই মহিলাকে তাঁরা উদ্ধার করেছেন। কত মহিলা গ্রাম থেকে শহরে এবং শহর থেকে অন্যত্র পাচার হয়ে যাচ্ছেন, কত কন্যাভ্রূণ-হত্যাকারীরা দিব্যি বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কত মহিলা অফিসে-বাসে-বাড়ির নিরাপদ চার দেওয়ালের ভিতরে যৌন হেনস্থার শিকার হচ্ছেন, সে সব পরিসংখ্যান পুলিশের কাছে চাইতে আমরা যাচ্ছি না। এই সব ক্ষেত্রে তাঁরা উদ্ধারকর্তা কিনা, তাও আমাদের জিজ্ঞাস্য নয়। আমরা শুধু এই ঘটনাগুলিকে প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছি— বিশেষ ভাবে লিঙ্গায়িত সমাজব্যবস্থায় অহিংসার প্রেক্ষাপট।

বিশেষভাবে লিঙ্গায়িত বলতে সরাসরি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বুঝি, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আরও দু'-একটি কথা যোগ করতে হয়— যথা, এই পুরুষতান্ত্রিক লিঙ্গ কাঠামোর একটি বিশেষ স্থানিক মাত্রা আছে। স্থান বলতে আমি এখানে ভৌগোলিক স্থানই বোঝাচ্ছি না, সামাজিক স্থানও বোঝাতে চাইছি। কারণ আমার বিচার্য বিষয় গণমাধ্যম। এবং নানা স্থানিক ও সামাজিক প্রেক্ষিতে বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রভাব স্পষ্ট। অর্থাৎ গণমাধ্যম কোনও একক নয়, আর জনপ্রিয় গণমাধ্যম তো নয়ই। এই লেখার সূচনাতে যে সমাজকে ধরার চেষ্টা করেছি, সেই সমাজে অবশ্য হিংসা-অহিংসা এবং তার সঙ্গে লিঙ্গায়িত স্বাভাবিক ব্যবহারের একটি সাধারণ মাত্রা ও একটি বিশেষ মাত্রা আছে। এই দুটি মাত্রাই অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্তরের উপর নির্ভরশীল। আমরা সাধারণ স্তরের আলোচনা দিয়েই শুরু করি,

যদিও দুটি স্তরের প্রেক্ষাপটই সমান। কেন, তা ক্রমশ প্রকাশ পাবে, আশা করি।

প্রেক্ষাপট নির্ধারণ করার কারণ, তার নিরিখে আমরা কোনও সাংস্কৃতিক পাঠ তৈরি করতে পারি। গণমাধ্যমের বিভিন্ন উপাদান, তা সে ছাপা হোক, দৃক্‌মাধ্যম হোক বা শ্রুত হোক, এই লিঙ্গায়িত সামাজিক কাঠামোর প্রেক্ষিতেই পড়তে হবে। তার থেকে যে অর্থ বেরোবে তা হয়তো এক প্রকার কাঙ্ক্ষিত অর্থ নয়। কিন্তু যদি কাঙ্ক্ষিত অর্থও হয়, তাতেও আমাদের মূল প্রতিপাদ্য পালটায় না। ২০০০ সালে বিশ্বায়িত পৃথিবীতে ভারতের মতো উন্নয়ন-সম্ভাবনা-উজ্জ্বল তৃতীয় বিশ্বের দেশে, নারীভাবনা শুধু নয়, লিঙ্গ ভাবনার কোন নিদর্শন আমরা জনপ্রিয় প্রচার মাধ্যমে দেখতে পাই? এই হল আমাদের বিচার্য বিষয়। এবার এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার কাজেই বাকি প্রবন্ধ ব্যয় করব।

এবং প্রথমেই যা বলেছি, সাধারণ স্তরের আলোচনা দিয়ে শুরু করছি। যথা, খবরের কাগজের প্রথম পাতায় প্রাপ্তবয়স্কা মহিলাকে স্বেচ্ছায় বেছে নেওয়া স্বামীর হাত থেকে উদ্ধার করতে তৎপর আইনরক্ষকদের স্বাভাবিক কার্যকলাপের পর পাতা উলটে দেখা যায় এ রকম বিজ্ঞাপন— ভেতরের গোটা ১৫ নম্বর পাতা জুড়েই বিজ্ঞাপন, কাগজটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি তথাকথিত জাতীয় দৈনিক। বলা বাহুল্য— কারণ, বাংলা ভাষাভাষী পাঠক বুঝতেই পেরেছেন— কলকাতার শিক্ষিত মহলে 'খবরের কাগজ' বলতে যা বোঝায়, এটা তাই। কলকাতা বললাম, কারণ যদিও শহরে এই ইংরেজি কাগজ স্বাধীনতাপূর্ব বাকি সব কাগজকে মাত করে এখন একচ্ছত্র আধিপত্য চালাচ্ছে, মফস্‌সলে কিন্তু তার বিশেষ রমরমা নেই— অথবা বলা ভাল, মফস্‌সলে কেউ তেমন ইংরেজি পড়েই না। বরং এটা সত্য যে গোটা পূর্বাঞ্চলের নগর ক্ষেত্রে কাগজটি প্রচারিত। সুতরাং কোন মানসিকতার পাঠকের হাতে কাগজটি পৌঁছেছে, কে এর কাঙ্ক্ষিত পাঠক, তা সুস্পষ্ট। পনেরো নম্বর পাতা দুটি ভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ, দু'জন বিজ্ঞাপনদাতা হয়তো একই অঙ্কের টাকা খরচ করেছেন। তলায় ভারত সরকারের 'মিনিস্ট্রি অব রিনিউয়েব্‌ল এনার্জি'-র তরফ থেকে মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস ও বিশ্ব-অহিংসা দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত বিজ্ঞাপন। বোঝাই যাচ্ছে, এই খাতে খরচ করার মতো টাকা প্রত্যেক মন্ত্রক আগে থেকেই বরাদ্দ রেখেছে— ২ অক্টোবরের কাগজ ভর্তি বিভিন্ন মন্ত্রকের একই মর্মে দেওয়া বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। "আজ রাষ্ট্র আমাদের রাষ্ট্রপিতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত করছে, তাঁকে সম্মান জানাচ্ছে" গোছের বাক্য, গান্ধীর সদাহাস্য মুখ, নেংটি পরা ছবি, কোণে মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর ছবি, তলায় তাঁদের তৈরি করা কিছু প্রকল্পের ছবি ও তাঁদের কাজকর্মের এবং সাফল্যের ফিরিস্তি।

এবার ওপর দিকে চোখ তুলুন। এই একই পাতায় অন্য বিজ্ঞাপনটি দেখুন। এখানে অন্ধকার ঘন কালো রঙের জমির উপর কিছু নরনারীর ছবি, তারা সকলেই সাদা-কালো মেশানো পোশাক পরে আছে। চারটি এরকম মানুষ এই বিজ্ঞাপনের পাত্র— কিন্তু ছবির কেন্দ্রে যে দু'জনকে আমরা দেখি তাঁদের বাদে এই বিজ্ঞাপনে যে আরও এক জোড়া মানুষ আছেন, তা বোঝা মুশকিল, কারণ তাঁরা ওই ঘন কালো প্রেক্ষাপটে প্রায় মিশে গেছেন, ছায়ামানবের মতো তাঁদের অবস্থান অন্ধকারে। কেন্দ্রে যে দু'জন মানুষ আছেন, তাঁদের

মধ্যে একজন পুরুষ, ছবিতে যতখানি আলো আছে তা সেই পুরুষের ঊর্ধ্বাঙ্গেই পুঞ্জিভূত। তিনি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর এগোনোর ভঙ্গিতে দর্প ও হিংস্রতা খুব পরিশীলিত অথচ বেশ প্রকট। তিনি কিন্তু গুণ্ডা-চোর-দুষ্কৃতকারী নন, দিব্যি ঝাঁকড়া চুল, পরিষ্কার শার্ট, কালো প্যান্ট পরিহিত সুন্দর সুপুরুষ এবং তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন কিছু একটা টানতে টানতে। কী সেটা?

একজন নারী। এই নারী বাঘছালের ছাপ দেওয়া কাঁধ-গলা-উন্মোচিত জামা পরেছেন, একটি হাত দিয়ে মনে হচ্ছে কিছু ধরে আছেন। আলো-আঁধারিতে চোখ বিস্ফারিত করে দেখলে দেখা যায়, তিনি আঁকড়ে ধরে আছেন দরজার একটি অংশ। হ্যাঁ, সামনের অন্ধকারকে প্রস্ফুটিত করার জন্য পেছনে দুটি দরজার মতো কী যেন— হয়তো লিফট-এর খোলা দরজা। দরজার ভেতরে যে অংশ, সেটা উজ্জ্বল লাল। যে-নারী মাটিতে ছড়িয়ে রয়েছেন, তাঁর একটা হাত ওই হয়তো লিফট-এর খোলা দরজা আঁকড়ে আছে; অন্য হাতটি পুরুষের শক্ত মুঠোয় ধরা। মনে হচ্ছে পুরুষটি লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে, মেয়েটিকে পেছনে টানতে টানতে এগিয়ে যাচ্ছে, মেয়েটি বাধা দেবার জন্য খুঁটি খুঁজতে গিয়ে লিফট-এর খোলা দরজা আঁকড়ে ধরেছে, সে মাটিতে পড়ে রয়েছে, আর এক হাত পুরুষটির মুঠোয়, অন্যটি দিয়ে দরজা ধরে সে নিজেকে... বাঁচানোর চেষ্টা করছে কি? কীসের থেকে বাঁচবে সে? পুরুষটির থেকে, যে তাকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে? পুরুষটি, আগেও বলেছি, বেশ ভদ্র সভ্য সুন্দর, আদৌ গুণ্ডা প্রকৃতির বলে তো মনে হয় না। মেয়েটিও কিন্তু খুবই আধুনিক পোশাক পরিহিত, হাই হিল জুতো পায়ে, প্রসাধন, চুল সব মিলিয়ে সুন্দরী তো বটেই, তার মুখে বিশেষ ভয় বা আতঙ্কের ছাপও দেখা যাচ্ছে না, যাতে করে বোঝা মুশকিল, এ ভাবে তাকে আলুর বস্তার মতো টেনে নিয়ে যাওয়াতে তার সমর্থন আছে কি না।

ঠিক এইখান থেকে কথা আরম্ভ করা যায়। এটি কীসের বিজ্ঞাপন, তা জেনে এই মুহূর্তে কাজ নেই, হয়তো পুরুষদের পোশাকেরই হবে— সে যাই হোক, তা কোথাও লেখা নেই। লেখা আছে একটি ব্র্যান্ডের নাম— কিলার, হত্যাকারী। তার তলায় ওয়ারশিপ দ্য নাইট— রাত্রিকে পুজো কর। এবং বিজ্ঞাপনের বাঁদিকের কোণে কালো জমির উপর সাদা দিয়ে, 'ওয়েন নাইট ফলস প্রেডেটার্স কাম আউট টু প্লে'— যখন রাত নামে, শিকারিরা বেরিয়ে আসে। তাও 'প্লে' শব্দটি আমি অনুবাদ করলাম না— 'শিকারিরা' শব্দটিও এখানে যথেষ্ট নয়, কারণ মূলে আছে 'প্রেডেটার্স' অর্থাৎ শিকারি জন্তু। তারা বেরিয়ে আসে খেলতে, রাতে।

রাতে শিকারি কী খেলাধুলো করে তাই বোধ হয় বিজ্ঞাপনে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। পুরুষটির মুখে এক ধরনের নির্লিপ্ত হাসি দেখি, যা হিংস্রতার চরম প্রকাশ, মেয়েটির মুখে ভয়ের চিহ্ন নেই, হয়তো কিছুটা কুণ্ঠা আছে, কিন্তু সেই কুণ্ঠার সঙ্গে পুরুষটির মুখভঙ্গি ও অঙ্গসঞ্চালনের ভঙ্গির যে অনায়াস হিংস্রতা ধরা পড়ে, তা একেবারেই মেলে না, বরং আশেপাশে আরও একজোড়া নরনারী যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের ধূসর ছায়ামূর্তির থেকেই এই দৃশ্যের আসল তাৎপর্য খুঁজে নিতে হয়। কালো ডোরাকাটা চামড়ার সঙ্গে লেপটে থাকা পোশাক পরা যে মহিলা দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর ভাবটা এমন যে তিনি

নিজেকে ওই সুপুরুষ-রূপী হিংস্র শিকারি জানোয়ারের পথ থেকে সন্তর্পণে সরিয়ে রাখছেন, পাছে পশুটি তাঁকেও শিকার হিসেবে চিহ্নিত করে। তাঁর সংকুচিত দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিতেই এই সতর্কতা স্পষ্ট। দ্বিতীয় একটি দরজার মতো খোপ থেকে আর একজন পুরুষ বেরিয়ে চলে যাচ্ছেন ছবির ফ্রেমের বাইরে, ডান দিকে। তিনি শিকারি পশুর শিকার করার দৃশ্যটির দিকে চোখ ফিরিয়ে রেখেছেন, কিন্তু দ্রুত অন্য দিকে প্রস্থান করছেন। তিনি কি অপেক্ষাকৃত কম বলশালী পশু বলেই পশুরাজের শিকারের সময় বাধা দেওয়ার দায় থেকে নিজেকে মুক্ত করতে তৎপর? পশুরাজের টেনে নিয়ে যাওয়া সুন্দর খাদ্যকে বাঁচানোর বা পশুরাজের সঙ্গে কোনও সংঘাতে যাওয়ার কোনও চেষ্টার মধ্যেই তিনি নেই। তাঁর ভূমিকা হচ্ছে অবস্থা বুঝে চটপট সরে পড়া। তিনি হয়তো অন্য কোনও শিকারের খাদক— আপাতত কিন্তু নিজের মান বাঁচিয়ে অদৃশ্য হওয়ার ভঙ্গিই তাঁর মুখে এবং অঙ্গ সঞ্চালনে স্পষ্ট।

এই হল বিজ্ঞাপনের ছবি। বলেছিলাম প্রাথমিক স্তর, অর্থাৎ প্রকাশ্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবের স্তর থেকে আমাদের যেতে হবে লিঙ্গায়িত সমাজে ব্যবহারের একটি বিশেষ মাত্রায়, যেখানে চিহ্নগুলি ঠিক কোনদিকে ইঙ্গিত করছে তা স্পষ্ট বোঝার চেষ্টা করা যাবে। দৃশ্য-বাস্তবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছি— এবার দেখা যেতে পারে, ছবিটির কী মানে দাঁড়াচ্ছে, এবং এই মানে কীভাবে সমাজের লিঙ্গ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত, কীভাবে এই ব্যবস্থাকে চিত্রায়িত করে, দর্শকদের মধ্যে এক ধরনের ভাবনার কাঠামোকে বহাল রাখতে সাহায্য করে, যাতে এই লিঙ্গ ব্যবস্থাই সমাজের স্বাভাবিক ব্যবস্থা হিসেবে বলবত থাকে। এই প্রক্রিয়ায় গণমাধ্যম যে সাহায্য করে, সেই ধারণা থেকেই এই লেখা শুরু।

আমরা যে-ছবিটি দেখছি 'কিলার' নামক কোনও পণ্য বস্তুর বিজ্ঞাপনে, সেই ছবিটি কীভাবে বুঝব? ছবিটিতে শিকারি জন্তু, প্রেডেটর, বা ঘাতক, কিলার কে? এবং সমাজে সেই জন্তু বা ঘাতকের স্থান কোথায়? শিকারির শিকার বা জন্তুর ভোজ্যই বা কে, তারই বা স্থান কোথায় সমাজে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর এতই স্পষ্ট যে, মনে হতে পারে, প্রশ্ন করাই বাহুল্য। কিন্তু আমি ঠিক এই স্বাভাবিক ধরে নেওয়াকেই প্রতিপাদ্য করতে চাইছি, চাইছি এই আপাত সরল সমীকরণের দিকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। পুরুষের ঘাতক পশুর ভূমিকা, নারীর সেই পশুর শিকারের ভূমিকা কেনই বা এত স্বাভাবিক হবে, কেনই বা এই বিজ্ঞাপনে লিঙ্গ-ভূমিকাগুলিকে নিয়ে প্রশ্ন করাটা অবান্তর মনে হবে, যা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তা কেনই বা কোনও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না? কেন সেটা এতটাই স্বাভাবিক হবে যে, বিজ্ঞাপনের স্রষ্টারা এই লিঙ্গ ভূমিকা, এই শব্দচয়ন, এই চিত্রায়ন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না, টাকা দিয়ে জায়গা কেনা হয়েছে বলে একটি রাষ্ট্রস্তরের আধুনিক সচেতন সংবাদপত্র তার পাতাকে পণ্যবস্তু ভেবে এ ধরনের বিজ্ঞাপন পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেবে সকালের চায়ের পেয়ালার সঙ্গে?

কারণ দুটি। এক, পুরুষ এবং নারীর এই খাদক-খাদ্যের ভূমিকা নতুন কিছু নয়, পাঠকের মনে থাকবে, লীলানন্দ স্বামীর অধীনে থেকেও যখন দামিনী তার নিজস্বতা বজায় রাখতে সোচ্চার, তখন রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

"কিন্তু কই, দামিনী তো ধরা দেয় না! গুরুজি ইহা লক্ষ করিয়া একদিন হাসিয়া বলিলেন, ভগবান শিকার করিতে বাহির হইয়াছেন, হরিণী পালাইয়া এই শিকারের রস আরো জমাইয়া তুলিতেছে; কিন্তু মরিতেই হইবে"। (রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪৫)।

তো এই হল আধুনিকতার জন্মলগ্ন— সেখানেও, অতীতের নারী-পুরুষ সম্পর্ককে পালটানোর চেষ্টা করে ননীবালা আত্মহত্যা করে, আর দামিনী মৃত্যুকালে শ্রীবিলাসের মতো স্বামী পেয়েছিল বলে স্বীকার করে যায় যে, স্বাদ মেটেনি, পরজন্মেও সে যেন শ্রীবিলাসকেই স্বামী রূপে পায়। এই স্বীকারোক্তিতে দামিনীকে উপনীত করে রবীন্দ্রনাথ একটি মাপদণ্ড তৈরি করেছিলেন, স্ত্রী স্বাধীনতার অভিধানে যার পরিভাষা উঠতে লেগে গেছে প্রায় এক শত বছর। কিন্তু তাও উঠেছে কি? কারণ জনপ্রিয় গণমাধ্যমে এই কিলার/ঘাতকের বিজ্ঞাপন কি আমাদের বুঝিয়ে দেয় না যে, দামিনীর মতো নারী বা রবীন্দ্রনাথের মতো নারীস্বাধীনতার ধারণা পোষণ করা শিল্পী আধুনিক পুরুষতান্ত্রিক লিঙ্গ ব্যবস্থায় ব্যতিক্রম ছাড়া আর কিছু নন?

আর একবার ফিরে যাই বিজ্ঞাপনটির দিকে। আধুনিক বেশভূষা-সমৃদ্ধ নারী পুরুষই বিজ্ঞাপনটির পাত্র-পাত্রী। তাঁরা এই প্রাগৈতিহাসিক দৃশ্যে অভিনয় করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি নিশ্চয়ই, না হলে বিজ্ঞাপনটি তৈরি হল কী করে! কেন তাঁরা কোনও দ্বিধা করেননি? তার কারণ কি ওই সংবাদপত্র যে কারণে জায়গা দিয়েছেন এই বিজ্ঞাপন প্রকাশ করার জন্য, সেটাই, অর্থাৎ অর্থ? না কি আধুনিক বেশভূষাই প্রগতিশীল চিন্তার চিহ্নক নয়? না কি প্রগতির অর্থ আমরা বুঝি এক ধরনের কামনা চরিতার্থ করা, যেটিকে পাশবিক বলে চিহ্নিত করলেও এক ধরনের মূল্যবোধ-জনিত মৌলবাদ চাপিয়ে দেওয়া হয়? স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর কামনা-প্রকাশে বহির্জগতের কি হস্তক্ষেপ করা উচিত? তারা যদি এভাবেই নিজেদের প্রকাশ করতে চায়, তাহলে তাতে বাধা দিয়ে বা তার সমালোচনা করে কি আমরা তাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছি না? পাঠক মনে রাখবেন, যে দিন এই বিজ্ঞাপনটি ছেপে বেরোয়, সে দিনের কাগজে প্রথম পাতায় প্রাপ্তবয়স্ক নবদম্পতিকে পুলিশকর্মীরা কীভাবে বলপূর্বক আলাদা করেছেন, সেই ঘটনার তীব্র সমালোচনা ছেপে বেরিয়েছে। তার কিছু দিন আগে থেকেই চলছে আর একটি বিবাহিত দম্পতিকে বলপূর্বক আলাদা করে মেয়েটিকে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্বশুরবাড়ি থেকে উচ্চবিত্ত পিত্রালয়ে ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নেওয়াতে পুলিশের সমালোচনা ও পুরুষটির সন্দেহজনক মৃত্যুকে ঘিরে জনমত গঠনের প্রক্রিয়া। ব্যক্তি স্বাধীনতায় যে সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলি একেবারে হস্তক্ষেপ করে না তা তো নয়— তা হলে?

এই 'তা হলে'-র উত্তর দেওয়া এক অর্থে খুবই সহজ। অর্থবলে কী না হয়। কিন্তু সেই উত্তরটাও যে খুব স্পষ্ট তা নয়। কারণ অর্থবলেই যদি সব কিছু হত, তা হলে মানুষের জীবনযাপন যান্ত্রিক হলেও ক্ষতি ছিল না— কিন্তু তা তো হয় না। মানুষ তো নিজেকে যন্ত্র ভাবে না, তার ভাবনাচিন্তা, বেছে নেওয়ার ক্ষমতা, স্বাধীনতার ধারণা, রক্তমাংসের জীবনযাপনে এসবই তার প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। যন্ত্রচালিত যে সে নয়, তাতে তো কোনও সন্দেহ

নেই। তা হলে সে কীসের বলে চলে? মানুষ হওয়া সম্পর্কে তার কি একটা ধারণা আছে, যা সে নিজের জীবনে চরিতার্থ করতে চায়? সেই ধারণাটা আসে কোথা থেকে?

সামাজিক আদর্শ বা মাপদণ্ড নির্মাণের প্রক্রিয়াটি আমরা যদি খুঁটিয়ে দেখি, তা হলে বোঝা যাবে, ক্ষমতাশালী পক্ষ তার নিজস্ব ক্ষমতা বহাল রাখার জন্য তার পছন্দ মতো একটি সামাজিক কাঠামোকে স্বাভাবিক মাপদণ্ড হিসেবে বলবত করে রাখতে চায়। এই সামাজিক কাঠামোটি বহাল থাকলে ক্ষমতাশালী পক্ষের ক্ষমতা বজায় থাকে। যেমন ধরা যাক, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বহাল রাখতে গেলে, নারীর শ্রমের তুলনায় পুরুষের শ্রমকে মূল্যবান হিসেবে দেখালেই পুরুষের সামাজিক অবস্থানকে নারীর সামাজিক অবস্থান থেকে উঁচুতে দেখানো সম্ভব। আবার পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায়, শ্রমের যে পুনরুৎপাদন লাগে, তার জন্য যদি পুঁজি ব্যয় করতে হয়, তা হলে লাভের অংশ কমে যায়। উৎপাদনের মূল্য এবং সেই উৎপাদন যে দামে বিক্রি হবে, সেই মুল্যের মধ্যে ফারাকটাই লাভ বা ক্ষতির অংশ। এবার শ্রমিকের কাজ করার ক্ষমতাকে প্রতিনিয়ত ফিরিয়ে দিতে লাগে তার খাদ্য, শুশ্রূষা, মনোরঞ্জন, কামনা-বাসনা পূরণ। সেগুলির পেছনে পুঁজি ব্যয় করলে তো উৎপাদনের মূল্য লাভের অংশে ভাগ বসাবে। অথচ এই কাজটি যদি পুরুষ শ্রমিকের পরিবার, অর্থাৎ তার সঙ্গে সামাজিক নিয়মানুসারে যুক্ত নারী করে দেয়, তা হলে তো এই খাতে কোনও অর্থই ব্যয় করার প্রয়োজন নেই। এবার যদি পুঁজিবাদী ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোকে যুক্ত করি, তা হলে দেখব, একটি অপরটির পরিপূরক। অর্থাৎ নারীর কাজের অর্থমূল্য যাতে না দিতে হয়, সেই জন্যই তার ক্ষেত্রে সংসারধর্মই হচ্ছে সর্বোচ্চ ধর্ম, সে সেই ধর্মাবলম্বী হলে শ্রমের পুনরুৎপাদনের জরুরি কাজটি বিনা অর্থব্যয়ে সম্পন্ন হয়, এবং উপরন্তু, যেহেতু তার কাজের কোনও অর্থমূল্য ধার্য করার প্রয়োজন নেই (ধর্মপালনের বিনিময়ে অর্থের কোনও ভূমিকা নেই) সুতরাং তার কাজকে শ্রম বলে গণ্য করার প্রয়োজনও নেই। তার কাজ যদি শ্রমের পর্যায়েই না গেল, তা হলে তার সামাজিক অবস্থান যে শ্রমজীবী অর্থোপার্জনকারী পুরুষের তুলনায় নিচু হবে, তা আর এমন আশ্চর্যের কী? পুঁজিবাদ ও পিতৃতন্ত্র একে অপরকে বহাল রাখতে সাহায্য করে। তবে লক্ষ করতে হবে, যে-নারী গৃহবন্দি হয়ে শুধুমাত্র সংসারধর্মই পালন করেন, তাঁর সঙ্গে যুক্ত পুরুষটির তাঁকে এবং নিজেকে এবং সন্তানদের অন্ন জোগানোর মতো ক্ষমতা থাকা চাই। অর্থাৎ তাঁর পরিবার পালন করার পারিশ্রমিক প্রয়োজন। সেটা ক'জন পারেন? মধ্যবিত্ত মানুষ নিশ্চয়ই পারেন— কিন্তু নিম্নবিত্ত মানুষ পারেন কি?

পারেন না, এবং পারার চেষ্টাও করেন না। নিম্নবিত্ত মহিলারা পুরুষদের মতোই শ্রমজীবী না হলে তাঁদের সংসার চলবে না। তাঁরা চিরকালই খেটে খান। কিন্তু ক্ষমতাশালী পক্ষের লিঙ্গ মতাদর্শই বহাল থাকে। সুতরাং নিম্নবিত্ত মহিলাদের দৈনন্দিন বাস্তবের সঙ্গে যতই সংঘাত ঘটুক, পিতৃতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সমাজে মহিলাদের লিঙ্গভূমিকা হল গৃহবধূর, তাঁদের শ্রমের মূল্য নেই, তাঁদের ধর্ম সংসার করা এবং সেই মাপদণ্ডের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারা না পারার উপর নির্ভর করে ভাল বা খারাপ মেয়ে হওয়া।

লিঙ্গ মতাদর্শ সুতরাং সমাজের বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থার ফসল অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সমাজকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত। এই অবস্থার বিরুদ্ধে নারীবাদী আন্দোলন গড়ে উঠলে প্রধান দাবি হিসেবে উঠে আসে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য, চাকরি করার অধিকার ও সমান বেতন পাওয়ার অধিকার। এই দাবি যে মহিলারা অর্জন করেন, তাতে ফল হয় অন্য রকম। প্রথমত, মহিলাদের হাতে অর্থ আসে— এর আগে তাঁরা আর্থিক স্বাধীনতা প্রাপ্ত ছিলেন না বলে ব্যয়ের ক্ষমতাও তাঁদের ছিল না। এবার চাকুরিজীবী হয়ে তাঁরা স্বাধীনভোক্তা হিসেবে সামাজিক স্থান দখল করেন। দ্বিতীয়ত, তাঁরা সংসারধর্ম পালন করার থেকে ছুটি পান না, অর্থাৎ অর্থোপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সংসার সামলানোর দায়িত্বেও বহাল থাকেন। অথচ তাঁদের আগের মতো সময়, সংসার করার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম বা মানসিকতা, কোনওটাই থাকে না, কারণ, তাঁদের এবার একটি নয়, দু'-দু'খানি কাজ পাশাপাশি করতে হয়— সংসার ও দপ্তর, ঘরে ও বাইরে। পিতৃতন্ত্র ও পুঁজিবাদ মহিলাদের এই সুযোগ করে দেয় বললে ভুল বলা হবে— মহিলারা লড়াই করে যখন এই অধিকার অর্জন করেন, তখন পিতৃতন্ত্র এবং পুঁজিবাদ নিজেদের কাঠামো পরিবর্তন করে রূপান্তরিত হয় পণ্যসংস্কৃতিতে— তাতে পুঁজির এবং পিতৃতন্ত্রের যে-বিশেষ বিন্যাস, লেখার এই পর্বে সেটিই আমাদের বিচার্য।

পুঁজিবাদী পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার লিঙ্গ কাঠামোতে যে-সব অসমতা চোখে পড়ে, নারীবাদী আন্দোলন সেইগুলিকে লক্ষ করেই সংঘটিত। তার ফলে মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার যে-দিকগুলি উন্মোচিত হয়, সেগুলির ফলে মেয়েদের ক্রয়ক্ষমতা যে বেড়ে যায়, তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এ ছাড়াও দেখেছি, বাইরের কাজে যুক্ত হয়েছে বলে যে মেয়েরা সংসারের কাজ থেকে ছুটি পাচ্ছে, তা নয়। সুতরাং বাড়ির কাজকে যন্ত্রায়িত বা 'সহজ' করার জন্য নানা পণ্যবস্তুর বাজার বাড়তে থাকে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ে গণমাধ্যমে সেই সব পণ্যবস্তুর প্রচার প্রক্রিয়া। পণ্যসংস্কৃতির অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, তাতে নারীবাদী আন্দোলনের প্রভাব। নারীবাদী আন্দোলনের দাবিগুলিকে পণ্যবস্তুভিত্তিক সমাজ মানব (এবং মানবী) জীবনের স্বাভাবিক অংশ হিসেবে ধরতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ মেয়েরা যে ঘর-বাহির সামলাবে, সেটাই স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়। স্বাধীন উপার্জন করার অধিকার যে নারীবাদী আন্দোলনেরই ফসল তা বলা বাহুল্য— কিন্তু পণ্যসংস্কৃতি সেই আন্দোলনের ফসলকে অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করে। অর্থনৈতিক ক্ষমতা (স্বাধীনতা তাকে বলা উচিত কিনা সেই তর্ক যদি আপাতত স্থগিত থাকে) অর্জন করে মেয়েরাও ভোক্তা হয়ে উঠছে— তাদের ঘর-বারের যাপন সহজ করার জন্য যে-সব পণ্যবস্তু উৎপাদিত হয়, সেগুলি কিন্তু মেয়েদের স্বাধীনতার দোহাই দিয়েই বাজারে প্রবেশ করে। অর্থাৎ, মেয়েরা যে বাইরে কাজ করছে, তার ফলে সংসারে তারা যথেষ্ট সময় দিতে পারছে না। আবার সংসারধর্ম পালন করাতে কোনও ত্রুটি থাকা পিতৃতান্ত্রিক লিঙ্গব্যবস্থায় নারীর আদর্শ ভূমিকা থেকে সরে আসা। পণ্যসংস্কৃতি কিন্তু পিতৃতন্ত্রে নারীর এই 'স্বাভাবিক' ভূমিকাটিকে এক মুহূর্তের জন্যও কোনও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে দিচ্ছে না। বরং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা-প্রাপ্ত নারী

কীভাবে ঘর-বারের দ্বিগুণ ভার সুষ্ঠুভাবে সামলাতে পারবে, পণ্যবস্তুর মাধ্যমে সেই পথ-নির্দেশ করার চেষ্টা করে। স্বাধীনতা মানে এই নয় যে নারী তার চিরাচরিত গৃহিনী-ভূমিকা থেকে মুক্তি পেল, ঘরের কাজ মেয়েলি ও বাইরের কাজ পুরুষালি, এই ধারণার অবসান হল বা নারীর গৃহশ্রমকে শ্রমের মূল্য ও সম্মান দেওয়া হল। স্বাধীনতার অর্থ, নারী অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করে তার ইচ্ছা ও চাহিদা মতো পণ্যবস্তু বেছে নিয়ে কেনার ক্ষমতা রাখেন। অর্থাৎ তাদের ক্রয়ক্ষমতা আছে, এবং ভোক্তা হিসেবে বাজারে তাদের সমাদর বেড়েছে। এবং তাদের ঘরে-বাইরের দায়িত্বভার সামলানোর যে চাপ, তার থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে সেই বাজার ভর্তি পণ্যবস্তুই, যেগুলি গৃহকর্মকে 'সহজ' করে দেয়। অর্থাৎ, স্বাধীনতা কোনও মানসিক প্রাপ্তি নয়, তা আন্দোলন লব্ধও নয়। বরং হাতে পয়সা থাকলেই পণ্য-বিপণী থেকে আপনি স্বাধীনতার বস্তুরূপ কিনতে পারেন। তা সে গৃহকর্মে আপনাকে সাহায্য করার মতো কোনও যন্ত্রই হোক বা ঘর-বারের ব্যস্ত জীবনেও সুন্দর আকর্ষণীয় থাকতে কোনও প্রসাধনই হোক। সুতরাং, স্বাধীনতাও পণ্যবস্তু, তারও মূল্য ধার্য আছে, এবং তা পাওয়া যায় সেই বিনিময় মূল্য ধরে দিলেই। পণ্যসংস্কৃতির অর্থনৈতিক ও লিঙ্গ কাঠামো বহাল রাখার জন্য এই বার্তাই পৌঁছে দেওয়া হয় গণমাধ্যমের দ্বারা।

পণ্যসংস্কৃতিতে গণমাধ্যমের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে— সেগুলি কীসের ভিত্তিতে নির্ধারিত তা আমরা আলোচনা করলাম। এবার দেখা যাক, এই বৈশিষ্ট্যগুলি ঠিক কী। কীভাবে গণমাধ্যম পণ্যসংস্কৃতির মূল ভাবগুলিকে, আক্ষরিক অর্থেই, বাস্তবায়িত করে।

পাঠকের হয়তো একটি বিজ্ঞাপন মনে থাকবে, মোটামুটি ১৯৯৯-২০০২ এই সময়ের মধ্যে ঘন ঘনই টেলিভিশনে দেখা যেত। তার আকর্ষণীয় বক্তব্য— 'জো বিবিসে করে প্যার ও প্রেসটিজ কৈসে করে ইনকার?' অর্থাৎ যে বৌকে ভালবাসে, সে কীভাবে প্রেসটিজ প্রেশার কুকার না কিনে থাকতে পারে? অথবা আই এফ বি-র একটি বিজ্ঞাপন, যেখানে আই এফ বি-র হোম অ্যাপ্লায়েন্স কিনে এনে তিনি পড়েছেন ঝামেলায়— ঘরের সব কাজ এতই তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে যে, মহিলার হাতে অফুরন্ত সময়। ফলে সেই বাড়তি সময়ে তিনি বেগুন দিয়ে পুডিং এবং এই ধরনের বিদঘুটে যত রেসিপি উদ্ভাবন করে রেঁধে ফেলেছেন, বেচারা স্বামী তা খেতে বাধ্য হচ্ছেন। হকিন্‌স-এর বিজ্ঞাপনেও, স্বামী সোহাগে ধন্যা হকিন্‌স রাঁধুনি স্ত্রীর গৃহকর্ম এমনই সহজ হয়ে গেছে যে তিনি আবার ভরতনাট্যম চর্চা আরম্ভ করেছেন— তাঁর স্বামী-কন্যা তাঁর শিল্পে মুগ্ধ। অথবা কপিল দেব অভিনীত এল জি-র বিজ্ঞাপনটিই মনে করুন। স্ত্রী বাড়িতে নেই, কিন্তু ফয়েলের ডিবেতে বন্ধ করে রেখে গেছেন ফ্রিজে সারা সপ্তাহের খাবার। কপিলের বাড়িতে অতিথি এলে, তিনি সেই ঢাকনা খুলে তাঁদের আপ্যায়ন করে একেবারে বাজিমাত— স্ত্রী না থাকাতেও এত সুন্দর ভোজন ব্যবস্থা পেয়ে অতিথি দম্পতি আহ্লাদিত। এমনকী অতিথি পুরুষকে তাঁর স্ত্রীর কাছে কপিলের মতো না হওয়ার জন্য দু'-এক কথা শুনতেও হয়েছে। বা হাল আমলের কাজল ও অজয় দেবগণ অভিনীত ওয়ার্লপুল হোম অ্যাপ্লায়েন্সের বিজ্ঞাপনই ভাবুন। কাজল তো ঘর-বাহির একত্রে সামলানোর ক্ষমতার প্রায় মূর্ত প্রতিমা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর ঘর সংসার, সন্তান

পালন ও পেশা সম্পর্কে কোনও খুঁটিনাটিই আমাদের জানতে বাকি নেই। তাই তিনি এখন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গার্হস্থ্য সমস্যার তুড়ি মেরে সমাধান করেন, যখন পরিচারকের মুখ খোলার আগেই তার ছুটির চাহিদা ধরে ফেলেন, তখন বাহবা দিতেই হয় হোম অ্যাপ্লায়েন্স-কে, যা কিনা তাঁর দৈনন্দিন জীবন এত সহজ করে দিয়েছে যে, হাজারটা কাজের মধ্যেও তিনি সব খুঁটিনাটি খেয়াল রেখে দশভুজা হয়ে আদর্শ আধুনিকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

এই ধরনের একঝাঁক বিজ্ঞাপনের কথা ভাবলেই আমরা স্বাধীনতার পণ্যায়নের যে-প্রসঙ্গ আলোচনা করেছি, তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রত্যেকটিরই লক্ষ্য, হোম অ্যাপ্লায়েন্স যে-সুবিধা করে দেয় সেই সুবিধে থেকে কীভাবে ব্যবহারকারীর জীবনের মান বাড়ে, তা চিহ্নিত করা। এই চিহ্নায়নের বৈশিষ্ট্যের উপরই নির্ভর করে ক্রেতা বিশেষ কোনও ব্র্যান্ডের রেফ্রিজারেটর বা ওয়াশিং মেশিন আলাদা করে চিনতে পারছেন কি না। তা না হলে, প্রযুক্তির দৌলতে এই ধরনের সব ক'টি যন্ত্রই কম বেশি একই ক্ষমতা সমৃদ্ধ। অথচ খোলাবাজারে একাধিক ব্র্যান্ড তো থাকবেই, এবং প্রত্যেকটিকেই লাভের হার বাড়াতে হবে, তা না হলে উৎপাদনের কোনও তাৎপর্য থাকবে না। আবার এও সত্য যে, আমরা কিছু কারণ ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি যার জন্য বাজারের বিস্তার হয়েছে। নতুন ক্রেতা তৈরি হয়েছে, এবং সেই ক্রেতার বিশেষ চাহিদা অনুযায়ী পণ্যবস্তুও তৈরি হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা চাহিদা বা উৎপাদন নিয়ে নয়, সমস্যা বিক্রি নিয়ে। বাজার বৃহৎ এবং জোগান প্রচুর থাকলেও, চাহিদা মেটানোর জন্যই মানুষ কিছু কেনে। একটি ফ্রস্ট-ফ্রি রেফ্রিজারেটরের সঙ্গে অন্যটির পার্থক্য কোথায়? অথচ পার্থক্য না থাকলে ক্রেতা প্রয়োজনে যে কোনও একটি কিনবে। উৎপাদক বিজ্ঞাপন সংস্থার কাছে এটাই দাবি করেন যে আমার রেফ্রিজারেটরের সঙ্গে এমন এক বিমূর্ত গুণাবলী যুক্ত করা হোক, যা ঠাণ্ডা রাখা বা বরফ জমানোর তুচ্ছ প্রয়োজনকে ছাপিয়ে জীবনদর্শন, জীবনবোধের পর্যায়ে চলে যায়। জো হুকুম— বিজ্ঞাপনশিল্পীরা সেই কারণেই বেছে নেন কোনও একটি উপাদান যা ঠিক সেই চাহিদাকেই মেটায়। হকিন্‌স কিনলে আপনার উপরি পাওনা সময়, যে সময়ে গৃহকাজের নিত্য নৈমিত্তিক ঝক্কি সামলেও আপনি নিজেকে প্রসারিত করার, নিজের ক্ষমতা সমৃদ্ধ করার সুযোগ পাবেন। নারী যে-গৃহকর্মের সঙ্গে শিকল দিয়ে বাঁধা, তা কিন্তু কোনও ভাবে পালটানোর কোনও প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। বরং লক্ষ্য, সেই শিকলগুলিকে কতটা সুদৃশ্য, কতটা আল্‌গা করা যায়, যাতে নারীর বিচরণভূমি বেড়ে যায়। তাকে শিকলমুক্ত করার কোনও তাগিদ কেউই অনুভব করছেন না। সহানুভূতিশীল স্বামী তো তিনিই যিনি কিনা শৃঙ্খলিত স্ত্রীর মন প্রসারিত হওয়ার সুযোগ করে দিতে কিনে আনেন হকিন্‌স। তাতে তাঁর নিজের রসনা তৃপ্তি তো ষোলো আনা বজায় থাকল, আর স্ত্রীর মনেও সংসারের ঘানি টেনে নিজের জীবন নষ্ট করার ক্ষোভ থাকল না। অর্থাৎ যে সমীকরণটা নারীবাদী আন্দোলনের আঘাতে একটু টলে গিয়েছিল, সেটাই আবার নতুন সাজে, আরও মজবুত হয়ে ফিরে এল। পণ্যসংস্কৃতিতে পুঁজি ও পুরুষতন্ত্রের বিন্যাসের সঙ্গে গণ্যমাধ্যম এত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত এই জন্য যে, এখন মানুষের চাহিদাগুলি শুধু রোটি-কাপড়া-মকান-এর থেকে পরিণত

হয়েছে— অবশ্য এটা ধরে নেওয়ার কারণ নেই যে রোটি-কাপড়া-মকান সকলের ভাগ্যে জুটেছে; বরং এটাই সত্য, পুঁজি এবার লগ্নি করার জন্য নতুনতর ক্ষেত্র খুঁজছে। খুঁজে দেখা যাচ্ছে যে মূল প্রয়োজনগুলির মধ্যেই নানা কায়দায় রকমফের এনে সেগুলিকে প্রয়োজনের স্তর থেকে জীবনযাপনের শৌখিন আচারে পরিবর্তিত করা যায়। মানুষের ক্রয়-স্পৃহাকে শুধুমাত্র প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত রাখলে তার সমস্যা অনেক। প্রয়োজন ফুরিয়ে না গেলেও, প্রয়োজন মেটানোর মধ্যে এক ধরনের গতানুগতিকতা আসতে পারে। প্রয়োজনে কাজ করা শুধুমাত্র মানুষের জাগতিক দিকটিকেই তৃপ্ত করতে পারে। তার সঙ্গে ভাব বা আবেশের জগৎ মিলিয়েই মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে। সেই ভাবের জগৎকে ছুঁতে পারে, প্রয়োজন-সিদ্ধির এমন এক উপস্থাপনা করলেই কিন্তু জাগতিক প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত হয় মানুষের নিজের ভাবনার পৃথিবী। এই যোগ সাধনের জন্যই গণমাধ্যম, বিশেষ ভাবে বিজ্ঞাপন, প্রয়োজন। পণ্যবস্তুর বাস্তব অবয়বের বাইরেও, সেই বস্তু কেনা ও ব্যবহারের সঙ্গে যদি যোগ হয় বিমূর্ত ভাবনা, চাহিদা, তৃপ্তি ও আকাঙ্ক্ষার মাত্রা, তা হলেই কিন্তু পণ্যবস্তুটি আর শুধুমাত্র বস্তু হিসেবে সীমিত নয়, হয়ে ওঠে জীবনবোধ ও যাপনের চিহ্ন। এই চিহ্নায়ন পদ্ধতিতে পণ্যসংস্কৃতির মূল আধার, এবং পণ্যসংস্কৃতির দ্বারা সৃষ্টও, এ যুগের গণমাধ্যম।

পুঁজি ও পিতৃতন্ত্রের যোগ, সুতরাং পণ্যসংস্কৃতির ঐতিহাসিক পর্যায়ও বহাল থাকছে, যদিও তা পুঁজির তথা বাজারের নতুন দিশায় প্রসারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, নতুন ভাবে বিন্যস্ত। এই পর্বে বিমূর্ত ধারণা বা ভাবনাকে যুক্ত করা হচ্ছে বস্তুর সঙ্গে, এবং বিজ্ঞাপন শিল্পীদের দায়িত্ব, এই ভাব বা ধারণাগুলিকে মূর্ত রূপ দেওয়া। সেই উদ্যোগেই, পণ্যবস্তু বিমূর্ত ভাবনার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত হয়। আবার বস্তুর সঙ্গে ভাবনার একটি কার্যকারণ সম্পর্কও স্থাপন হয়। পণ্যবস্তু ব্যবহার করলে যে সুবিধা হয়, সেই সুবিধা থেকে সময়, বিশ্রাম, শিক্ষা, প্রত্যয়, ভালবাসা, নৈকট্য— যে ভাবের উদ্রেকই হোক না কেন, বস্তুটি তখন সেই কাঙ্ক্ষিত উপলব্ধির চিহ্ন এবং কারণও বটে। বিমূর্ত ভাবনাকে, সুতরাং, পণ্যবস্তুতে পরিবর্তিত করে, ক্রয়-বিক্রয়কে এবার প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে উঠিয়ে জীবনবোধ বা জীবনদর্শনের স্তরে নিয়ে গেলেই, পণ্যসংস্কৃতি তার পরিণত অবস্থায় পৌঁছয়।

এবার পাঠক বলতে পারেন, যে জায়গা থেকে লেখা শুরু করেছিলাম, সেখান থেকে এত সরে এসেছি কি এই কারণে যে আমি গণমাধ্যমে নারী ও নারী-ভূমিকার চিত্রণের একটি গতিপথ নির্দিষ্ট করতে চেয়েছিলাম? আংশিক ভাবে এটি সত্যিই উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু স্বীকার করতেই হয় যে তা একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। এবং লক্ষ্যের বাকি অংশটা কী, লেখার শেষ পর্যায়ে সেই প্রসঙ্গেই আসা যাক।

আগেই বলেছি, ২ অক্টোবরের ইংরেজি খবরের কাগজ *দ্য টেলিগ্রাফ*-এর ১৫ নম্বর পাতায় ছিল দুটি বিজ্ঞাপন। উপরেরটি 'কিলার' বা ঘাতক নামে কোনও একটি পণ্যের। নীচেরটি 'মিনিস্ট্রি অব রিনিউয়েবল এনার্জি'-র দেওয়া গান্ধীর জন্মদিবস উপলক্ষে নিজেদের কাজের ফর্দ। একই পাতায়, ওপরের অংশে ঘাতক-নর শিকার-নারীকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিমণ্ডলে, কিন্তু না আছে ঘাতকের মুখে কোনও ঘৃণা বা বিদ্বেষ না

আছে শিকারের মুখে কোনও আতঙ্কের ছাপ। দু'পক্ষই অত্যন্ত নির্লিপ্ত, যেন যা ঘটছে তা একেবারেই স্বাভাবিক; পারিপার্শ্বিক, রং, পরিমণ্ডল— সব কিছু দিয়ে যে ভয়াবহতা তৈরি করার চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞাপন-শিল্পী, তা তাঁর কেন্দ্রীয় চরিত্রদের অনায়াস নির্লিপ্তি নির্মাণের পূর্বেই ধ্বংস করে দিয়েছে। ফলে কিলার/ঘাতক বিজ্ঞাপনে আমরা যা দেখছি, তা ভয়ানক আপত্তিকর মনে হচ্ছে না, চোখেও পড়ছে না, কারণ যাঁরা এই ভয়ের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করার দায়িত্বে আছেন, অর্থাৎ অভিনেতারা, তাঁরা কিন্তু কোনও ভাবেই এই ভয়কে অনুভব করেন না, সুতরাং তা ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতাও তাঁদের নেই। কেন তাঁরা এই ভয়কে অনুভব করেন না? সেটাই বিচার্য বিষয়। তার কারণ কি এই যে, তাঁদের কাছে পুরুষ ঘাতক ও নারী শিকার? এটাই কি তাঁদের পুরুষ-নারী সম্পর্কে সামান্য ধারণা? ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা কি তাই মনে করেন, নাকি অন্য কিছু? আর তাতে পৃথিবীর মাথাব্যথা থাকবে কেন? কারণ তাঁরা তো স্বাধীন ব্যক্তি, তাঁদের ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারও নেই। এই নির্লিপ্ত, অনায়াস হিংস্রতাই যদি আমার পছন্দ হয়, তাহলে আপনার কী অধিকার আছে আমার সেই পছন্দ করার স্বাতন্ত্র্যকে প্রশ্ন করার?

এখানেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে প্রেক্ষিত— সমাজ, সময়, সমষ্টি, ভাবনার কাঠামো। পাতার নীচের অংশে যে অহিংসার প্রতিভূর ছবি রয়েছে, তাঁর উত্তরাধিকার কী বিমূর্ত ভাবনার স্তরেই থেকে যায়নি, *লগে রহো মুন্না ভাই*-এর বিপুল সাফল্য সত্ত্বেও কি তা আমাদের যাপনে, বা আমাদের ভাবনার স্তরেও প্রবেশ করতে পেরেছে? করতই যদি, তা হলে আমরা কি একই পাতায় একটি হিংস্রতার প্রতিরূপকে তার পাশাপাশি রাখতে পারতাম? যদি এই সহাবস্থান আমাদের চোখে লাগত, যদি এই দুটি ছবির মধ্যে যে তীব্র বিরোধ আছে তা আমরা উপলব্ধি করতাম, তা হলে কি আমরা দুটিকে এভাবে একত্র করতাম? আমাদের যে এই বিরোধটাও আর চোখে পড়ে না, সেটাই 'ঘাতক'-এর বিজ্ঞাপনের পাত্রপাত্রীদের নির্লিপ্ত মুখচ্ছবি থেকে স্পষ্ট। অহিংসাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে যদি গান্ধী অসফল হতেন, তা হলে তার সাংস্কৃতিক বা ঐতিহাসিক মূল্য কী হত, তা বলা মুশকিল, কিন্তু সেটিই একদা জনমানসে কার্যকরী অস্ত্র হিসেবে রূপায়িত হয়েছিল। বোঝাই যাচ্ছে, সেই রূপায়ণের মূলে যে সমাজ-সংস্কৃতি-ভাবনা-বোধ ছিল, তা আজ অবলুপ্ত বললে কম বলা হবে। সেগুলির খোলগুলি পড়ে আছে, কিন্তু খোলে ভাবনা বা উপলব্ধির পদার্থ যা ছিল তা শুকিয়ে ক্ষয়ে নিঃশেষিত। খোলগুলি আদতে শূন্য, আমরা সেগুলিকে পদার্থের চিহ্নমাত্র বলেই জেনেছি, তাই পদার্থের বাস্তবতা জানা আমাদের হয়ে ওঠেনি। গণমাধ্যমের বৈশিষ্ট্য, তা খবর খোঁজে, চমক খোঁজে, সরলরৈখিক আখ্যানের একটি মুহূর্তকে তুলে ধরে সেটিকেই উপস্থাপিত করে। ফলে মুহূর্তটির নির্মাণকল্পে যে নানা বয়ান, নানা উপলব্ধি, নানা ইতিহাস লুকিয়ে আছে, যাকে কিনা সেই মুহূর্তটির 'পদার্থ' হিসেবে পরিভাষিত করেছি তা কিন্তু এই প্রকাশ-পদ্ধতিতে একেবারেই অবলুপ্ত। জীবনটা তখন এক একটি পদার্থহীন, ইতিহাসহীন মুহূর্তের সম্ভার হয়ে ওঠে— এবং ভাবের পদার্থ না পেয়ে মানুষ খোঁজে জাগতিক কোনও ঠোস পদার্থ। তার সেই অন্বেষণের পরিণতি, সে ভাবনা খুঁজে পায়

বস্তুতে— বস্তুই তার ভাব-ভাবনাকে ঠোস অবয়ব দেয়, বস্তুর সঙ্গেই যুক্ত হয় তার ভাবনার জগৎ, বস্তুই হয়ে যায় তার ভাবনার চিহ্নক। পণ্যসংস্কৃতির এটিই বৈশিষ্ট্য— এবং যেহেতু এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সব থেকে সহজে ঘটতে পারে গণমাধ্যমে, বিজ্ঞাপন দ্বারা— সেই কারণে, বিজ্ঞাপন পণ্যসংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প রূপে দেখা যায়।

তারই ফলের একটি নিদর্শন ২ অক্টোবরের খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন। এটা সত্য যে, অন্য কোনও তারিখে পাতার নীচের অংশের বিজ্ঞাপনটি আদৌ ছাপতই না। এবং সেই সত্যটি কিন্তু আমাদের সম্মুখের প্রশ্নগুলিকে আরও প্রকট করে তোলে। যদি ২ অক্টোবর বাধ্যতামূলক হয়, তা হলে সে দিন অহিংসার ব্রতীর স্মরণে বিজ্ঞাপন বার করতে হবে। সেটি যদি শুধুই বাধ্যতামূলক হয় এবং সেই ব্রতীর জীবনদর্শনে নিহিত ভাবনা বা উপলব্ধিগুলির যদি কোনও মূল্য না থাকে, তা হলে তো আমরা ২ অক্টোবরের খোল নিয়েই বেঁচে আছি। পুরুষ-ঘাতক ও নারী-শিকার নিয়ে যে লিঙ্গায়িত সমাজব্যবস্থা, সেই সমাজব্যবস্থায় অহিংসা যদি হয় শূন্য খোল, তা হলে হিংস্রতাও তার থেকে বেশি কিছু নয়। প্রথমটিকে বাদ দেওয়া যায়— সব ক্ষেত্রে অহিংসার ব্যবহার করতে গেলে কী হবে না হবে, তা বোঝাতে যাবেনই যদি, তা হলে মার্কিন সরকারের তৈরি আতঙ্কের বিরুদ্ধে জেহাদ আর অল্ কাইদার জেহাদের মধ্যে পার্থক্যে এসে আটকে যেতে হবে— তখন বিচার্য, আপনি এই দুটির মধ্যে কোন পক্ষে আছেন, অথবা কোন পক্ষের সমর্থক। সেই প্রশ্নের উত্তর যাই হোক, এটাতে কি দ্বিমত থাকতে পারে যে, হিংসাকে কোনও ভাবে— যে কোনও পক্ষ থেকে— সমর্থন করা যায় না? তাই যদি হয়, তা হলে হিংস্রতা ও অহিংসাকে একই রকম পণ্য হিসেবে একে অপরের পাশাপাশি দেখার অবস্থা তৈরি হয় কী করে? এ ভাবেই তৈরি হয় যে, 'ঘাতক' বিজ্ঞাপনের পাত্রপাত্রীরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করেন যেখানে অহিংসা বাধ্যতামূলক, শব্দমাত্র, উপলব্ধি বা ভাব নয়। সেই ধরনের পৃথিবীতে নারীস্বাধীনতা পণ্যবস্তুর সম্ভার মাত্র, কোনও লড়াই বা বিশ্বাসের ফসল নয়। সেই পৃথিবীতেই নারীকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেলেও তার মুখে সামান্য কুণ্ঠা ছাড়া অন্য কিছুই ধরা পড়ে না। যে পুরুষ নিয়ে যায়, তার কাছে এটা তার পৌরুষের অংশ মাত্র, যে-নারী যায়, সে এটিকে ব্যক্তিগত চয়ন-ক্ষমতার বা তার নারীত্বের চিহ্ন হিসেবেই দেখে। সেই পৃথিবীতেই দেখা যায় ঘাতক ও অহিংসার ব্রতী একই সঙ্গে, একই বাজারে, হয়তো একই মূল্যে, পণ্য।

'নারীবাদী আন্দোলন' কিন্তু শুধুমাত্র নারীর স্বাধীনতা অর্জন বা সত্তা স্থাপনের সংঘর্ষ নয়। এই দীর্ঘ আলোচনায় যেটুকু কথা বলার তা এটাই— ২ অক্টোবরের খবরের কাগজের ১৫ নম্বর পাতা আমাদের বর্তমান অবস্থা ও অবস্থানকে চিনিয়ে দিল। নারী সেই সমাজ-বহির্ভূত নয় বলেই এই প্রেক্ষিত, এবং তাতে পরিবর্তন সাধনের নিরন্তর চেষ্টাকেই একমাত্র 'নারীবাদী' আখ্যা দেওয়া যায়।

মুকুল মুখোপাধ্যায়

নারী ও প্রান্তিকীকরণ

'নারী মানবতার অর্ধাংশ। জগতে সামগ্রিক শ্রমভারের দুই-তৃতীয়াংশ বহন করে নারী; কিন্তু সে পায় সামগ্রিক পারিশ্রমিকের মাত্র এক-দশমাংশ এবং বিশ্বের সামগ্রিক স্থাবর সম্পত্তির মাত্র এক শতাংশ।'

রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি দলিল থেকে নেওয়া উপরের উদ্ধৃতিটি বিশ্বসমাজে নারীর অবস্থানের একটি চিত্র তুলে ধরে খুব স্পষ্ট ভাবে। গত দুই-তিন দশক ধরে মানবীবিদ্যা বা Women's Studies নামে নূতন জ্ঞানের ক্ষেত্রটির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নারীর জীবনধারার অনেকগুলি মাত্রা আমাদের গোচরে এসেছে। ক্রমশ আমরা উপলব্ধি করেছি, দেশকাল নির্বিশেষে নারী ও পুরুষের অসম অবস্থানের কারণে নারীর জীবনে যে প্রতিকূলতার সৃষ্টি হয়, সেই অসাম্য ও দ্বন্দ্বই অনেকাংশে তার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির নির্ধারক হয়ে দাঁড়ায়; তার প্রকৃত মূল্যায়ন ও তার প্রাপ্য মর্যাদাকে ব্যাহত করে প্রতি পদে।

নিজের জীবনচর্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা ও সক্ষমতা সমাজের সকল সদস্যেরই অন্যতম মৌলিক অধিকার বলে মনে করা হয়। নারীকে কিন্তু সচরাচর অধিকার ও সক্ষমতার যে কাম্য পরিমণ্ডল, তার প্রান্তেই দেখা যায়, কেন্দ্রস্থলে নয়। সে জন্যই যেন নারী ও প্রান্তিকীকরণ— এই সংজ্ঞা দুটি আমাদের মনে পাশাপাশি স্থান করে নেয়— বিশেষত ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষিতে। তাই নারীর প্রান্তিকীকরণ কী ভাবে ঘটে চলেছে তা বোঝার জন্য ভারতের চিত্রটিই আমরা সংক্ষেপে দেখার চেষ্টা করব।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই যে বিষমতার দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তা হল বহু দশক ধরে আমাদের জনসংখ্যায় পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যাল্পতা; অথচ প্রকৃতির নিয়মে নারী ও পুরুষ— জনসংখ্যার এ দুটি উপাদানের মধ্যে একটি সুষম বিভাজন থাকাটাই প্রত্যাশিত। আমাদের ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে প্রতি এক হাজার পুরুষের পাশাপাশি আছেন, এক হাজার অর্থাৎ সমসংখ্যক নয়, মাত্র ৯৩৩ জন নারী। তাই বর্তমানে ভারতে Sex Ratio (SR) বা লিঙ্গ অনুপাত হল ৯৩৩। ১৯৫১ সালে স্বাধীন ভারতের প্রথম জনগণনায়

এই অনুপাতটি ছিল ৯৪৬। অর্থাৎ আমাদের দেশে পুরুষের তুলনায় মেয়েদের উপস্থিতি ধারাবাহিক ভাবে হ্রাস পেয়েছে। শুধু তাই নয়, এই অস্বাভাবিক ও উদ্বেগজনক ধারাটি শিশুদের মধ্যেও সমান ভাবে প্রকট। ছ' বছর পর্যন্ত বয়স এমন শিশুদের মধ্যে ১৯৯১ সালে এক হাজার বালক প্রতি বালিকাদের সংখ্যা ছিল ৯৪৫। মাত্র দশ বছর পরে দেখা যাচ্ছে একই বয়সের শিশুদের মধ্যে লিঙ্গ অনুপাত বা Child Sex Ratio (CSR) কমে হয়েছে ৯২৭। মনে রাখতে হবে, সর্বভারতীয় স্তরের এই সূচকগুলির পিছনে লুকিয়ে আছে অঞ্চলভিত্তিক আরও উদ্বেগজনক চিত্র: ২০০৩ সালে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান ইত্যাদি বেশ কয়েকটি প্রদেশে SR নেমেছে ৯০০ অংকেরও নীচে। ১৯৯১ সালে ভারতের অন্তত ২১টি জেলায় অপেক্ষাকৃত সুস্থ মানের (১০০০-৯৪৭) CSR দেখা গিয়েছিল, কিন্তু ২০০১ সালে দেখা গেল এমন জেলার সংখ্যা মাত্র আটটি। অন্যদিকে, ৯০০-৯৪৭ স্তরের CSR সহ জেলা ১৯৯১ সালে ছিল ১৮১টি, দশ বছরের ব্যবধানে এই সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়ায় ২০৪-এ। এবং CSR ৮০০-রও কম এমন ১৬টি জেলা চিহ্নিত হয় ২০০১ সালে, যদিও দশ বছর আগে এমন নিম্নমানের CSR একটি জেলাতেও ছিল না। ১৯৯১ সালের পরিসংখ্যানে আরও দেখা যায়, ভারতে শিশু জন্মের পরে এক বছরের মধ্যে বালকদের মৃত্যুর সম্ভাবনা (Infant Mortality Rate/ IMR) থাকে প্রতি হাজারে ৭১; কিন্তু বালিকাদের ক্ষেত্রে সেটি দাঁড়ায় প্রতি হাজারে ৭৫। গ্রামাঞ্চলের শিশুকন্যা ও শিশুপুত্রের IMR আরও বেশি: যথাক্রমে ৮৫ ও ৭৯।

নানা সমীক্ষা ও গবেষণা থেকে এটুকু এখন পরিষ্কার যে CSR-এর নিম্নমুখী গতিপ্রকৃতি আসলে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে পুত্রসন্তান লাভের প্রতি পরিবারের দুর্দম স্পৃহার দ্বারা; এবং এই স্পৃহাকে নিয়ত পুষ্ট করছে Ultrasound পরীক্ষাপদ্ধতি সহ চিকিৎসা চক্রান্ত, প্রযুক্তির অপব্যবহার ও বহু পরিবারে কন্যা বিরোধী কার্যকলাপের কাছে কন্যার জন্মদাত্রী নারীর কার্যত অসহায় আত্মসমর্পণ। এই সমস্ত ঘটনাক্রম যে-সব অঞ্চলে কন্যাসন্তানের ও নারীর অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে, অধ্যাপক আশিস বোস সেগুলির নামকরণ করেছেন DEMARU Districts: 'Daughter eliminating male aspiring rage for Ultrasound'।[১]

এই ভাবে আমরা দেখতে পাই জন্ম থেকেই সাধারণত (এমনকী জন্মের আগেও) শিশুকন্যাদের জন্য যে-পরিমাণ অবহেলা ও বঞ্চনা সঞ্চিত হয়, উপরে বর্ণিত SR ও CSR-এর অস্বাভাবিক সূচকগুলি তারই পরিণতি, এবং বলা যায়, একই সঙ্গে নারীর প্রান্তিকীকরণের একটি রূপরেখা।

এবারে আসি আর একটি প্রসঙ্গে— যেখানে আবারও দেখা যাবে প্রান্তিকীকরণের আর একটি করুণ ছবি। সেই ছবিটি সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলাদের, যাঁরা হয়তো পরিবারের জন্য নিজ কর্মক্ষমতা নিঃশেষে ব্যয় করেছেন কিন্তু বর্তমানে নানা ভাবে অক্ষম ও নিঃসহায়। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের লেখা *দহন* উপন্যাসের বৃদ্ধা মৃণালিনীকে আমাদের মনে পড়ে। এক অর্থে ইনি 'সাধারণ' মহিলা নন কারণ তাঁর নিজস্ব টাকার সংস্থান আছে। কিন্তু তাও তিনি নাতনীকে বলেন, তাঁর মতো মহিলার জন্য সারা জীবনটাই একটা কারাগার— কারারক্ষীই

কেবল বদলায়; কখনও সে পিতা, কখনও স্বামী বা পুত্র। সাহিত্যের দর্পণে একাকীত্ব এবং বয়সের ভারে ন্যুব্জ, অনেক সময় পারিবারিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ, বয়োবৃদ্ধাদের অভাব নেই। এঁদেরই এখন আমরা বাস্তবের পটভূমিতেও দেখতে পাই কারণ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের (অর্থাৎ ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সের নারী পুরুষের) সম্বন্ধে নানা তথ্য সম্প্রতি উঠে এসেছে বেশ কয়েকটি জাতীয় স্তরের সমীক্ষার মাধ্যমে (প্রধানত, National Sample Survey-র বিভিন্ন রিপোর্টে এবং একাধিক National Family Health Survey-র রিপোর্টে)। এই তথ্যগুলি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে কীভাবে বৃদ্ধা মহিলাদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দানা বাঁধে প্রান্তিকীকরণের প্রক্রিয়া।

ভারতের স্বাধীনতার পরে একটি উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি হল প্রত্যাশিত গড় আয়ুর বৃদ্ধি (Expectation of Life at Birth: LEB)— পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই। ১৯৫১ সালের প্রায় ৩২ বছরের আয়ুসীমা থেকে মেয়েদের প্রত্যাশিত আয়ু এখন প্রায় ৬২ বছর এবং ৬০ বছর ও তার বেশি বয়সের মেয়েরা এখন ভারতের সকল নারীর প্রায় আট শতাংশ। সাম্প্রতিক জনগণনার তথ্য অনুসারে এই বয়সের মানুষদের মধ্যে লিঙ্গ অনুপাত ১০৭৫, যদিও সামগ্রিক ভাবে লিঙ্গ অনুপাত মাত্র ৯৩৩— অর্থাৎ বৃদ্ধদের মধ্যে মহিলাদেরই সংখ্যাধিক্য। কিন্তু ভাববার কথা এই যে, বর্ধিত আয়ু অনেক ক্ষেত্রেই মহিলাদের জন্য কল্যাণপ্রদ হয় না; বরং তাঁদের স্বয়ম্ভরতা খর্ব করে এবং জীবনের মূলধারা থেকে তাঁদের বিচ্ছিন্ন করে, বিভিন্ন কারণে।

প্রথমত, আর্থিক দৈন্য, যা বৃদ্ধ মহিলাদের মধ্যে বেশি প্রকট। ১৯৯০-এর দশকে National Sample Survey থেকে পাওয়া তথ্যে দেখি বয়স্কা (৬০ বছর +) মেয়েদের মধ্যে ৭০ শতাংশেরও বেশি সম্পূর্ণভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল; পুরুষদের মধ্যে এই শতাংশটি কিন্তু মাত্র ৩০। আরও দেখি, শতকরা ৬০ জন বৃদ্ধ সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন, তুলনায় বৃদ্ধাদের মধ্যে শতকরা মাত্র ২০ জন। শহরাঞ্চলে একদা কর্মরত বৃদ্ধাদের মধ্যে পেনশনভোগী ছিলেন মাত্র ১৫ শতাংশ। এবং গ্রামাঞ্চলে দেখা গেছে, বৃদ্ধাদের মধ্যে প্রায় তৃতীয়াংশ আর্থিক অনটনের কারণে তখনও গৃহের বাইরে কাজ করতে বাধ্য থাকছেন।

দ্বিতীয়ত, বৃদ্ধাদের দৈনন্দিন জীবনে জটিলতা সৃষ্টি করে কয়েকটি বিশেষ ধরনের অক্ষমতা: সম বয়সের পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি মাত্রায় বৃদ্ধ বয়সের ব্যাধির প্রকোপ এবং দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও চলাফেরা করার শক্তির অবক্ষয়। এ ছাড়া রয়েছে ব্যাপক নিরক্ষরতা: বৃদ্ধদের মধ্যে শতকরা ৬৬ হলেও, বৃদ্ধাদের মধ্যে শতকরা ৯০-এরও অধিক।

তৃতীয়ত, বয়স্কা মহিলাদের ক্ষেত্রে বৈধব্যের ভার তাঁদের জন্য অনেক সময়েই দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। ১৯৯০-এর National Sample Survey-তে আমরা দেখি ৬০-৭০ বছর বয়সের মেয়েদের মধ্যে বিধবা ছিলেন ৬০ শতাংশেরও বেশি এবং ৭০-৮০ বছর বয়স কালে এই শতাংশ ছিল ৯০-এরও বেশি। বৃদ্ধদের মধ্যে কিন্তু বিপত্নীক পুরুষের অনুপাত তুলনায় যথেষ্ট কম। বিধবা নারী শুধু যে নিঃসঙ্গ ও অর্থনৈতিক ভাবে পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন তাই নয়, প্রায়শই বৈধব্য আনে পারিবারিক ও সামাজিক অবমাননা। তাই অমর্ত্য সেন

আমাদের মনে করিয়ে দেন: 'জীবনসঙ্গী হারানোর অভিজ্ঞতা একান্তভাবে নারীরই অভিজ্ঞতা: কোনও বিপত্নীক পুরুষ সম অবস্থার মহিলার তুলনায় অনেক সহজে পুনর্বিবাহ করতে পারেন; সেই পুরুষের সম্পত্তির অধিকার এবং কর্মনিযুক্তির সুযোগ আরও বেশি— বিপত্নীক পুরুষদের অবস্থা যদি স্বামীহীনা মহিলাদের মতো হত, তা হলে হয়তো বৈধব্যের সমস্যার প্রতি আরও গভীর ভাবে মনোযোগ দেওয়া হত।'[২]

আমাদের সমাজজীবনের বিভিন্ন পরিসরে সাধারণভাবে নারীর যে প্রান্তিক ও বিপর্যস্ত অবস্থান, তার উপর আলোকপাত করেছে বহু ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। এই সমস্ত আলোচনায় একটি মূল কথা বারবারই উঠে আসে: আত্মসম্মানের সঙ্গে, পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে জীবননির্বাহ করার, অর্থাৎ প্রান্তিক অস্তিত্ব থেকে মূল স্রোতে উত্তরণের সম্ভাবনাটি উজ্জ্বল করে অর্থনৈতিক দিক থেকে নারীর সক্ষমতা ও স্বয়ম্ভরতা। তাই প্রশ্ন জাগে, স্বাধীনতার ছ'টি দশক অতিক্রম করার পর অর্থনৈতিক দিক থেকে মেয়েরা কতটা অগ্রসর হতে পেরেছেন?

ভারতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে দশ বছর অন্তর অন্তর জনগণনা বা সেন্সাস হয়ে আসছে এবং স্বাধীনতার পর থেকে নিয়মিত ভাবে National Sample Survey বা সর্বভারতীয় স্তরের সমীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। এই সব তথ্যের সাহায্যে আমাদের দেশে মেয়েদের কর্মনিযুক্তি তথা অর্থনৈতিক অবস্থান সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যেতে পারে। প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার, পুরুষ ও নারী পাশাপাশি কাজ করেন কৃষিক্ষেত্রে, গৃহ-উদ্যোগে, কলকারখানায়, বিভিন্ন পরিষেবায়। কিন্তু পুরুষ ও নারীর কাজের পটভূমিকায় দুটি বৈসাদৃশ্য বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। প্রথমত, পুরুষের তুলনায় নারীর কর্মভার প্রায়শই অধিক, কারণ পুরুষের তুলনায় নারীর কাজের ধারা বা শ্রম নিয়োজন চিরকালই বহুমুখী। ভোগ্যবস্তু উৎপাদন ও পরিষেবা সংক্রান্ত শ্রম ছাড়াও তাঁদের কাজের পরিধিতে থাকে দৈনন্দিন গৃহকর্মের শ্রম এবং সন্তানধারণ, সন্তান পালন ও পরিবারের বয়স্ক, রুগ্ন ও অক্ষম সদস্যদের দেখাশোনার দায়িত্ব। দ্বিতীয়ত, পুরুষের তুলনায় নারীর শ্রমের একটি বড় অংশ সমাজ লাভ করে বিনা মূল্যে কারণ তা কোনও পারিশ্রমিক বা বেতন ব্যতিরেকেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত।

নারীর কর্মনিযুক্তি এবং শ্রম যদিও এই ভাবে বহুধাবিস্তৃত, জনগণনায় বা অন্যান্য সমীক্ষায় কিন্তু তার পূর্ণাঙ্গ বা যথোচিত চিত্র পাওয়া যায় না। এই অসম্পূর্ণতার একটি প্রধান কারণ নিহিত থাকে 'কাজ' বা 'work' শব্দটির সংজ্ঞায়। প্রচলিত ধারণা অনুসারে যে ক্রিয়াকলাপগুলি দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষভাবে আয় বা পারিশ্রমিক উপার্জন করি, সেগুলি সাধারণত 'কাজ' বা 'work' আখ্যা পায় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি 'কর্মী' বা 'worker' আখ্যা পান। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, মেয়েরা সারাজীবন ধরে যে সমস্ত দায়িত্ব পালনে শ্রম ব্যয় করেন, অনেক ক্ষেত্রেই তা পারিশ্রমিকযুক্ত বলে চিহ্নিত করা যায় না। ফলস্বরূপ পরিসংখ্যানের জগতে নারীর কাজ বহুলাংশেই 'অদৃশ্য' থেকে যায় এবং নারীকে 'কর্মী' বলে গণ্য করা হয় না। নারীর প্রান্তিকতার একটি সূত্র এখানেই পাওয়া যায়, যদিও সংসারের অর্থনৈতিক ভিতটি ধরে রাখে নারীর এই অবৈতনিক শ্রম, বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারে

(যেমন প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের মাধ্যমে পানীয় জল, ভোজ্য, পশু খাদ্য ও জ্বালানির সংস্থান, গৃহপালিত পশু এবং গৃহ সংলগ্ন বাগানের পরিচর্যা ইত্যাদি)।

কর্মনিযুক্তি সংক্রান্ত বিবরণে একটি প্রধান সূচক হল কর্মী সংখ্যা— জনসংখ্যা অনুপাত (worker-population ratio) বা কর্মনিযুক্তির হার (work participation rate)— অর্থাৎ দেশের পুরুষ ও নারী অধিবাসীদের মধ্যে কতজন কর্মরত। একটি সারণিতে আমরা ২০০১ সালে সর্বভারতীয় স্তরে ও প্রাদেশিক স্তরে নারী ও পুরুষের কর্মনিযুক্তির প্রকার সম্বন্ধে কিছু বিবরণ দিয়েছি। জনগণনায় প্রাপ্ত এই তথ্যগুলি পুনর্বার নারীর অর্থনৈতিক প্রান্তিকীকরণের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমত, ভারতে পুরুষদের মধ্যে অর্ধেক মানুষই কর্মরত ছিলেন কিন্তু মেয়েদের মধ্যে শতকরা মাত্র ২১ জনকে 'কর্মী' বলে চিহ্নিত করা হয়। কোনও কোনও প্রদেশে আবার কর্মী-জনসংখ্যা অনুপাতটি আরও কম; যথা, উত্তরপ্রদেশে শতকরা ১৬ ও পশ্চিমবঙ্গে শতকরা মাত্র ১৮। দ্বিতীয়ত, আমাদের জনগণনায় কর্মীদের মধ্যে আবার দুটি ভাগ করা হয়। যাঁরা বছরে অন্তত ছয় মাস কাজ করেন তাঁরা হলেন 'মুখ্য কর্মী' (main worker) এবং যাঁদের কর্মসংস্থানের মেয়াদ বছরে ছ' মাসের কম তাঁরা 'প্রান্তিক কর্মী' (marginal worker)। বলাই বাহুল্য, মুখ্য কর্মীর তুলনায় প্রান্তিক কর্মীর আর্থিক পরিস্থিতি নিম্নমানের এবং চিন্তার কথা এই যে, পরপর কয়েকটি জনগণনায় দেখা যাচ্ছে নারী কর্মীদের মধ্যে প্রান্তিক কর্মীর অনুপাত তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি। ভারতে পুরুষ কর্মীদের মধ্যে প্রান্তিক কর্মী প্রায় ১৩ শতাংশ, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে তা ৪৩ শতাংশ। লিঙ্গভিত্তিক এই বিশাল ব্যবধান উত্তরপ্রদেশ, বিহার ইত্যাদি কয়েকটি প্রদেশে বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে। ২০০১ সালে পুরুষ প্রান্তিক কর্মীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৫ লক্ষ। কিন্তু মহিলা প্রান্তিক কর্মীরা সংখ্যায় ছিলেন ৫৪ লক্ষেরও বেশি।

সারণি

ভারত ও ভারতের দশটি রাজ্যে নারী ও পুরুষের কর্মনিযুক্তি

	মোট জনসংখ্যায় কর্মীর সংখ্যা (%)		মোট কর্মীর মধ্যে প্রান্তিক কর্মী (%)		মোট কর্মীর মধ্যে কৃষি শ্রমিক (%)	
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
ভারত	৫০.০	২০.৮	১২.৭	৪২.৮	২০.৮	৩৯.৪
অন্ধ্রপ্রদেশ	৪৭.৭	১৮.৮	১০.২	২৭.৮	২৯.৬	৫৬.২
বিহার	৫৫.০	২৮.০	১৪.৭	৫৩.৫	৪২.৭	৬৩.২
গুজরাট	৫০.৫	২৭.৩	৬.৭	৪৮.২	১৭.৩	৩৯.৮
কর্ণাটক	৫৬.৯	৩১.৯	৮.৭	৩৪.৪	১৭.০	৪৩.৮
কেরল	৫০.৪	১৫.৩	১৬.৮	২৯.৭	১৪.২	২২.০
মহারাষ্ট্র	৫৩.৫	৩২.৬	৯.১	২৬.১	১৮.৩	৪২.১
পঞ্জাব	৫৪.১	১৮.৭	৭.৬	৩৬.২	১৫.০	১৭.৯

তামিলনাড়ু	৫৮.১	৩১.৩	১০.০	২৪.০	২৩.৬	৪৫.৪
উত্তরপ্রদেশ	৪৭.৩	১৬.৩	১৬.৩	৬২.৫	২০.১	৪১.২
পশ্চিমবঙ্গ	৫৪.২	১৮.১	১২.৮	৫১.০	২২.৬	৩২.৪

তথ্যসূত্র: মুকুল মুখোপাধ্যায়, *A Situational Analysis of Women and Girls in West Bengal,* National Commission for Women, 2005

তৃতীয়ত, আমরা জানি কৃষিক্ষেত্রে যাঁরা দিনমজুরের কাজ করেন, তাঁরাই অর্থনৈতিক ভাবে সবচেয়ে দুর্বল, দারিদ্র্য সব চাইতে প্রকট কৃষি শ্রমিক পরিবারগুলির মধ্যেই। ১৯৬১ সালে কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিক হিসাবে জীবননির্বাহ করতেন নারী কর্মীদের মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশ। সারণিতে দেখা যাচ্ছে, ২০০১ সালে এই অংকটি প্রায় ৪০ শতাংশে পৌঁছেছে। আবার, বেশ কয়েকটি প্রদেশে এই ধরনের প্রান্তিকীকরণের মাত্রা আরও উদ্বেগজনক: বিহারের ও অন্ধ্রপ্রদেশের নারী কর্মীদের মধ্যে যথাক্রমে প্রায় ৬৩ ও ৫৬ শতাংশই অসুরক্ষিত কৃষিশ্রমিক।

একটি দেশের অর্থব্যবস্থাকে সাধারণত দুই প্রকার কর্মক্ষেত্রে ভাগ করা হয়: সংগঠিত ক্ষেত্র (Organised Sector) অর্থাৎ কলকারখানা ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ প্রতিষ্ঠান যা শ্রম কল্যাণ সংক্রান্ত সরকারি বিধিনিষেধের অন্তর্ভুক্ত এবং অন্যদিকে সুবিশাল অসংগঠিত ক্ষেত্র (Unorganised Sector)। এখানে দেখা যায় ক্ষুদ্র স্তরে উৎপাদন, পরিষেবা ও ব্যবসায়ে অসংখ্য প্রকার কর্মনিযুক্তি। এখানে সরকারি আইনকানুনের নিয়ন্ত্রণ খাটে না, শ্রমিক সংগঠন গড়ে তোলার সুযোগও পাওয়া যায় না। শতকরা নব্বই জনেরও বেশি নারীকর্মীর অবলম্বন কিন্তু এই সংগঠিত ক্ষেত্রের কোনও জীবিকা, যা অত্যধিক শ্রম ও ক্লেশের বিনিময়ে দেয় নামমাত্র উপার্জন। এই নারীদের আমরা অহরহ দেখি, কখনও 'কাজের মেয়ে' কখনও ইটভাটার মজুর কখনও বিড়ি শ্রমিক রূপে। ড. ফুলরেণু গুহর পরিচালনায় লিপিবদ্ধ ভারত সরকারের *সাম্যের পথে (Towards Equality)* রিপোর্টে ১৯৭৪ সালে বলা হয়েছিল, 'ক্ষুদ্র ব্যবসায়, ক্ষুদ্র হস্তশিল্প এবং ব্যক্তিগত পরিষেবার কাজে যুক্ত নারীদের মধ্যেই দেখা যাবে দারিদ্র ও অপুষ্টির চরম পরিদর্শন।' এই কথাগুলি আজকের দিনেও নির্মমভাবে সত্য।

বর্তমানে বিশ্বায়ন বা Globalisation একটি বহু চর্চিত বিষয়; বিশেষ করে বিশ্বায়নের ফলশ্রুতি নিয়ে নানা সংশয় দেখা দিচ্ছে। স্বভাবতই নারীর জীবন ও নারীর অবস্থানও এই ফলশ্রুতি দ্বারা প্রভাবিত। বিশ্বায়নের একটি দিক হল বাইরের জগতের সঙ্গে বা বৃহত্তর বিশ্বের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থার নিরন্তর বিস্তার। বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে আসে নানা ধরনের পরিবর্তন। তাই বিশ্বায়নের আর একটি দিক হল বিশ্ব জুড়ে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের এক জটিল ও সুদূরপ্রসারী প্রক্রিয়া।

উপরে উল্লিখিত দুটি কারণে, বিশ্বায়নের দরুন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বেড়ে চলেছে বাইরের জগতের প্রভাব। ক্রমশ, যেন বদলে যাচ্ছে আমাদের পরিচিত মূল্যবোধগুলি।

পণ্যসামগ্রীর সম্ভারে পুষ্ট হচ্ছে লোভ ও ভোগবাদিতা; সেই সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে আগ্রাসন ও সহিংসতার এক বিকৃত বাতাবরণ। এই রকম পরিস্থিতিতে আমাদের মতো দেশে সব চাইতে বেশি ক্ষতি বা বিপদ হচ্ছে মেয়েদেরই। ক্ষুণ্ণ হচ্ছে নারীর প্রাপ্য মানবিক অধিকার, নিরাপত্তা, মর্যাদা। মেয়েদের জীবনে যদিও এই সব দিকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, উপস্থিত আমরা নারীর কর্মজগতের দিকেই মনোযোগ দেব। এই প্রসঙ্গে বিশ্বায়নের কিছু প্রধান ফলশ্রুতি এই রকম— যা নারীর প্রান্তিকীকরণ দূর করে না, বরং ত্বরান্বিত করে:

১. ক্রমবর্ধমান কর্মচ্যুতি: নতুন নতুন প্রযুক্তি বা টেকনোলজি এবং নতুন উৎপাদন পদ্ধতির আবির্ভাব বিশ্বায়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমের পরিবর্তে পুঁজি ও যন্ত্রের ব্যবহার যেমন বাড়তে থাকে, সংশ্লিষ্ট বহু শ্রমিকের কর্মচ্যুতি ঘটে এবং বলাই বাহুল্য কর্মচ্যুত বা ছাঁটাই শ্রমিকের প্রথম সারিতে থাকেন মেয়েরাই। এ ছাড়াও, মন ভোলানো বিজ্ঞাপন সহ নিত্য নতুন ভোগ্যবস্তুর আবির্ভাবের ফলে প্রচলিত জিনিসপত্রের চাহিদা কমতে থাকে এবং সে জন্য অনেক শ্রমজীবী মানুষ, বিশেষত মেয়েরা কাজ হারান (যেমন, কেলগ কোম্পানির তৈরি রকমারি খাদ্যদ্রব্য যখন চিড়ে-মুড়ি-খই জাতীয় প্রচলিত খাবারের জায়গা দখল করে নেয়, গ্রামাঞ্চলের বহু মেয়ের জীবিকার সংস্থান নষ্ট হয়)। সম্প্রতি ১৯৯৯-২০০০ সালের National Sample Survey থেকে যা তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে আগেকার (অর্থাৎ ১৯৯৩-৯৪ সালের) সমীক্ষার তুলনায় মেয়েদের কর্মসংস্থানের অবনতি বেশ পরিষ্কার। এখানে মনে রাখতে হবে, একবার কর্মচ্যুতি ঘটলে মেয়েদের পক্ষে নতুন কর্মক্ষেত্র খুঁজে নেওয়া অনেক দুরূহ, কারণ তাদের প্রান্তিক অবস্থানের কারণে প্রতি পদেই থাকে পুঁজির অভাব, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি দক্ষতার অভাব।

২. অস্থায়ীকরণ (Casualisation): বিশ্বায়নের যুগে শিল্পপতিদের মুনাফা বাড়ানোর একটি প্রকৃষ্ট উপায় হল স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা যথাসম্ভব কমিয়ে এনে অস্থায়ী বা casual কর্মীদের সংখ্যা যথাসম্ভব বাড়ানো। কারণ, স্থায়ী শ্রমিকের জন্য আইনগত ভাবে অনেক রকম সুযোগ সুবিধা ব্যবস্থা রাখতে হয়; যেমন ন্যূনতম মজুরি, মাতৃত্বের জন্য সবেতন ছুটি, দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি। অস্থায়ী কর্মীরা, বলাই বাহুল্য, এই সমস্ত শ্রমকল্যাণমূলক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। আবারও, সাধারণভাবে অস্থায়ীকরণের প্রকোপ মেয়েদের উপরই বেশি পড়ে।

মেয়েদের কর্মনিযুক্তির বিষয়ে আর একটি কথা আজকের দিনে, অর্থাৎ বিশ্বায়নের যুগে খুবই প্রাসঙ্গিক। অনেকেই মনে করেন, উদীয়মান ও অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির বা IT-র ক্ষেত্রটিতে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় মেয়েদের যোগদান তাদের কর্মনিযুক্তিতে একটি নতুন ও আশাব্যঞ্জক মাত্রা এনেছে। এই ক্ষেত্রটির দ্রুত প্রসার এবং আর্থিক দিক দিয়ে লোভনীয় কিছু কিছু পেশায় মেয়েদের ভূমিকা সত্যই উল্লেখ্য (যেমন, Business Process Outsourcing/BPO বা 'কাজ চালান' সম্বন্ধিত পেশা)। তবে এ তথ্যও ভুললে চলবে না যে দেশের সামগ্রিক কর্মনিযুক্তির ক্ষেত্রে IT-র বা তথ্যপ্রযুক্তির অবদান হয়তো দুই শতাংশ বা আরও কম। তা ছাড়া, এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করার মতো বিশেষ শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ—

সমাজের একটি ক্ষুদ্র কিন্তু প্রাগ্রসর অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; সামগ্রিকভাবে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলের মহিলা কর্মীদের ক্ষমতায়নের উপর তা বিশেষ প্রভাব ফেলে না। IT-নির্ভর পেশাগুলিতে মহিলা কর্মীর স্থান আবারও এক অর্থে প্রান্তিক বলেই মনে হয়। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় যেমন ধরা পড়েছে, IT-নির্ভর পেশাগুলির সঙ্গে যুক্ত মহিলা কর্মীদের মধ্যে ৮০ শতাংশেরও বেশি কর্মীর বেতন সর্বনিম্ন তিনটি বেতন মানের বা Salary grade-এর মধ্যে আবদ্ধ এবং সর্বোচ্চ চারটি বেতনমান ভোগ করেন কেবল ছয় শতাংশ। বিপরীতে, ওই চারটি বেতন মান ভোগ করেন সম পর্যায়ের ২১ শতাংশ পুরুষ-কর্মী। কাজেই, বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে নারীর প্রান্তিকতার চিরাচরিত কাঠামোটির অবসান ঘটবে এমন আশা হয়তো সুদূর পরাহত।

যদি আমরা মনে করি, নারীর প্রান্তিকীকরণের সমাধান সূত্র পাওয়া যাবে নারীর ক্ষমতায়নে, তাহলে ক্ষমতায়নের সংজ্ঞাটি বুঝে নিতে হবে। অর্থনীতিবিদ গীতা সেন ক্ষমতায়ন বা empowerment কে দেখেছেন এই ভাবে: 'The process by which the powerless gain greater control over the circumstances of their lives. It includes both control over resources (physical, human, intellectual, financial) and over ideology (beliefs, attitudes, values).'[৪] ক্ষমতায়িত বা সক্ষম নারী আত্মনির্ভর, তিনি কোন পথে কীভাবে চলবেন তা স্থির করতে পারেন নিজেরই বিচারবুদ্ধির নিরিখে। এই ভাবে যখন আমরা ক্ষমতায়নের অর্থ বুঝতে চেষ্টা করি— তখন কিন্তু একটি কথা খুব স্পষ্ট হওয়া দরকার— ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্য অবশ্যই নিজের তথা নিজ পরিবার ও সমাজের সদস্যদের উন্নতিসাধন, কখনই অপরের পীড়ন নয়।

তা হলে ক্ষমতায়নের পথে পা দেওয়ার জন্য নারী হিসাবে আমরা কী চাইব? সর্বপ্রথমে অবশ্যই চাই শিক্ষা। নতুন আর্থিক নীতি ও অর্থব্যবস্থায় ও নিত্যনতুন আধুনিক প্রযুক্তির প্রেক্ষিতে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের চাবিকাঠি হল কর্মীদের শিক্ষা এবং কর্মকুশলতা বা skill। এখন যে কোনও আধুনিক উৎপাদন বা বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় স্থান পেতে হলে অন্তত অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা থাকা চাই। অথচ ২০০১ সালেও দেখি সর্বভারতীয় স্তরে মেয়েদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৪০ জন নিরক্ষর। ১৯৯০-এর দশকেও শ্রমজীবী মেয়েদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৪ জন নিরক্ষর ছিলেন; শতকরা মাত্র ১৬ জন প্রাইমারি স্তর পর্যন্ত শিক্ষা পেয়েছিলেন। শুধু সাধারণ শিক্ষাই এখন যথেষ্ট নয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে তার সঙ্গে চাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ। শিক্ষা যে কেবল কর্মকুশলতা বাড়ায় তাই নয়, শিক্ষিত নারীই জনমত গঠন করে তাঁদের প্রাপ্য অধিকারের দাবিতে ও প্রান্তিকতার প্রতিবাদে সোচ্চার হতে পারেন, সমাজকে জাগ্রত করতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, আমরা চাই প্রতিটি কর্মক্ষম এবং কর্মসন্ধানী নারীর উপযুক্ত কর্মনিযুক্তি। শহরে ও গ্রামে, কৃষিতে, উদ্যোগে, পরিষেবায়— বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে মেয়েদের জন্য উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সরকারি বা বেসরকারি সংস্থায় স্থায়ী চাকুরি এখন দুর্লভ; আমরা

আগেই দেখেছি কলকারখানাগুলিতে নতুন কর্মনিযুক্তির মাত্রা খুবই কম। তাই এখন স্বনিযুক্তি বা Self-employment-এর কথাই অনেক বেশি করে ভাবতে হবে।

তৃতীয়ত, নিজেদের সীমাবদ্ধ গণ্ডির বাইরে এসে মেয়েদের এখন সমবেত প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। তাঁদের সম্মিলিত হবার এবং নিজেদের স্বনির্ভরতা ও ক্ষমতায়নের জন্য অনেক ধরনের যৌথ প্রয়াস হতে পারে, যেমন স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা Self Help Group, যার একটি বিশেষ রূপ হল Micro Credit Group বা ক্ষুদ্র ঋণ গোষ্ঠী।

চতুর্থত, একটি সুস্থ ও হিংসারহিত সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে, যাতে ঘরে এবং বাইরে মেয়েদের সুরক্ষা কোনও ভাবে বিপন্ন না হয়।

পঞ্চমত, আমরা আগেই দেখেছি অধিকাংশ নারী কর্মী অসংগঠিত ক্ষেত্রের কোনও না কোনও জীবিকায় আবদ্ধ। এই ক্ষেত্রের সমস্যাগুলিও আমরা দেখছি। সে জন্য অসংগঠিত ক্ষেত্রের পরিস্থিতি সংশোধনের জন্য বিভিন্ন কমিশন/বিশেষজ্ঞমণ্ডলী যে সুপারিশগুলি প্রস্তুত করেছেন, তা শীঘ্র এবং আইনত কার্যকরী করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে National Commission on Employment in the Unorganised Sector দ্বারা প্রকাশিত রিপোর্টটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এলা ভট পরিচালিত SEWA সংগঠন (Self Employed Women's Association) মেয়েদের কর্মজগতে একটি প্রসিদ্ধ নাম। SEWA এবং SEWA-র অনুরূপ আদর্শে অনুপ্রাণিত সংস্থাগুলি যেভাবে অসংগঠিত নারী কর্মীদের সংঘবদ্ধ করেন ও তাঁদের জন্য প্রশিক্ষণ, ঋণ এবং বীমার ব্যবস্থা করেন, তা থেকে শিক্ষা নিয়ে আরও ব্যাপক ভাবে অসংগঠিত ক্ষেত্রের মেয়েদের অগ্রগতির জন্য প্রয়াসে গতি আনতে হবে।

পরিশেষে, অভিজ্ঞতায় দেখা যায় অনতিক্রম্য সাংসারিক দায় দায়িত্বের কারণে মেয়েরা অনেক সময় কর্মক্ষেত্রে তাঁদের যোগ্য স্থান অধিকার করতে বা রক্ষা করতে পারেন না। এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে হলে প্রাথমিক স্তরে চাই সংসারের সদস্যদের মধ্যে চিরাচরিত মানসিকতার পরিবর্তন, যাতে গৃহস্থালির চাহিদা পূরণে প্রত্যেকের সক্রিয় সহযোগিতা থাকে এবং প্রতিটি পরিবারে পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তান সমান যত্নে লালিত হয়। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ও আচার ব্যবহারের এই মৌলিক পরিবর্তনও কিন্তু নারীর সক্ষমতার জন্য অত্যন্ত জরুরি। একই সঙ্গে জরুরি সমাজের পক্ষ থেকে কিছু দৃঢ় পদক্ষেপ যাতে বহির্জগতে মেয়েদের অংশগ্রহণ অপেক্ষাকৃত সুগম হয়, যথা, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রের প্রসার, শ্রমিক সংগঠনগুলিতে নারীকর্মীর উপযুক্ত স্থান, শ্রমকল্যাণ সংক্রান্ত আইনগুলির যথাযথ রূপায়ণ ইত্যাদি।

আমরা আশা করব নতুন শতাব্দীতে মেয়েদের শিক্ষা, সচেতনতা, ও পারদর্শিতার দ্রুত বিকাশ ঘটবে ও সেই সঙ্গে বৃহত্তর সমাজে ইতিবাচক মূল্যবোধের বিকাশ নারীকে দেবে তার প্রাপ্য স্বীকৃতি, সম্মান এবং ক্ষমতায়ন। সেই সময়ের দিকে তাকিয়েই তসলিমা নাসরিনের আহ্বান প্রতিধ্বনিত হোক:

"...শেকল ছিঁড়ে একবার দাঁড়াও তুমি
উঠে দাঁড়াও নারী।
মেরুদণ্ড সোজা করে একবার দাঁড়াও।
তুমি হাঁটো। এই পথ তোমার।
এই শস্য ক্ষেত্র তোমার, আলপথ তোমার।
দিগন্ত অবধি যতদূর দেখ তুমি, সব তোমার..

শাশ্বতী ঘোষ

পরিবারের অর্থনীতি

পরিবার বললেই আমাদের মনে ভাসে আশ্রয়, ভালবাসা, মাথার উপরে ছাদ— আরও কত কী। কিন্তু পরিবার মানে শুধু তা নয়, পরিবার মানে আরও অনেক কিছু। পরিবার আমাদের নারী বা পুরুষ করে তোলে। সেই সঙ্গে পরিবার আর পারিবারিক পরিস্থিতি ঠিক করে আমি পড়ব না মাঠে কাজ করব, দিদিমনি হব কি নার্স হব, নাকি হব শুধুই ঘরের বউ। শুধু মেয়েদের ক্ষেত্রে নয়, পুরুষদের ক্ষেত্রেও পরিবারই এ সব সিদ্ধান্ত নেয়। দুয়েকজন দৃঢ়চেতা নারী বা পুরুষ থাকেন তো বটেই, যাঁরা তাঁদের পরিস্থিতিকে অতিক্রম করে একাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু তাঁরা ব্যতিক্রম-ই, নিয়ম নন। সাধারণের জন্য পরিবারই এ সব সিদ্ধান্ত নেয়।

পরিবারের আমি-তুমি

পরিবার বলতে অর্থনীতি বোঝায় সন্তানধারণ আর পালনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এক প্রতিষ্ঠান। তারা পরিবারের অর্থসংস্থান কীভাবে হবে, কে কী ভোগ করবে, কী কী দ্রব্য আর পরিষেবা বাজার থেকে কেনা হবে আর কী কী ঘরেই উৎপাদিত হবে, ঘরে-বাইরে কে কী কাজ করবে, কী কী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হবে, এক কথায়, অর্থনীতির পাঠ্যবইতে যে ভাবে 'সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার' বলা হয়, তার সীমানার মধ্যে পরিবার সেই সব সিদ্ধান্ত নেবে। কোনও শূন্য থেকে নয়, বরং এই সব সিদ্ধান্ত অবশ্যই গৃহীত হবে নারী-পুরুষের চলতি বিভাজন, চারদিকের সংস্কৃতি এ সবের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে জনবিন্যাসের বদল, আর্থিক পরিবর্তন এ সব স্থির করবে কোনও নির্দিষ্ট পরিবারের চেহারাটা ঠিক কী রকম হবে।

সাধারণভাবে পরিবার বলতে বোঝায় 'একদল মানুষ যাঁরা একত্রে থাকেন, উপার্জন এক জায়গায় জড়ো করেন, আর দিনে অন্তত একবার এক সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করেন'। যদিও এ সংজ্ঞা রাষ্ট্রসঙ্ঘের, কিন্তু আমাদের অনেক চেনা পরিবারই তা হলে আর পরিবারের সংজ্ঞায় পড়বে না। কারণ তারা একটা চৌহদ্দির মধ্যে থাকলেও হাঁড়ি-হেঁশেল

আলাদা, বিশেষত ছেলেদের সংসার আলাদা হয়ে যায়। আবার একাধিক বউ থাকলেও তাদের হাঁড়ি আলাদা। আবার আজকের দিনে কাজের সন্ধানে দূরদূরান্তরে যাওয়ার জন্য পরিবার বলতে হয়তো শুধু টাকা পাঠানোতেই সীমাবদ্ধ। অনেক সময় পরিবারের সব সদস্যরা যে উপার্জন একত্র করে কেনাকাটার সিদ্ধান্ত নেন তা নয়। এমনকী স্বামী আর স্ত্রী, দু'জনে উপার্জন করলেও কে পরিবারের জন্য কী কিনবেন, সে দায়িত্ব ভাগ করা থাকে। যেমন বাবার টাকায় হয়তো খাওয়া-পরা চলে, মায়ের উপার্জনে আসে ছেলের ইস্কুলের মাইনে বা টিউশনির খরচ।

আবার সব সময় যে পরিবার তার শ্রমসম্পদকে এক জায়গায় এনে ব্যবহার করবে তা নাও হতে পারে। যে ভাবে স্ত্রীর পক্ষে প্রায় বাধ্যতামূলক হয় স্বামীর বা শ্বশুরবাড়ির জমি চাষের দায়িত্ব নেওয়া, দরকার হলে অন্য কাজ ছুটি করে— সেভাবে স্ত্রীর জমিতে, প্রয়োজন পড়লেও, স্বামীরা কিন্তু শ্রম দেবেন না।

নারী-পুরুষের অসম অধিকারের ধারণাটা এতই স্বতঃসিদ্ধ যে পরিবারে নারী আর পুরুষের অধিকারের অসাম্য আমরা স্বাভাবিক বলে মেনে নিই। যেমন ভারতে বা এই উপমহাদেশের অন্যত্র, নতুন বৌটি বাড়ি আসলে সে শাশুড়ি আর পরিবারের অন্যদের কর্তৃত্বের আওতায় থাকবে এটা এতই স্বাভাবিক যে তার স্বামীর পরিবারে সম্পদ বণ্টনে তার যে কোনও সিদ্ধান্ত থাকতে পারে, এটা ভাবা হয় না, এমনকী তার বাড়ি থেকে আসা পণের টাকা কোথায় কীভাবে খরচ হবে, নাকি বিনিয়োগ করা হবে, এ সব বিষয়ে তার কোনও মন্তব্যের অধিকার থাকে না।

পারিবারিক নির্মাণ

পরিবার আমাদের নির্মাণ করে। আমাদের সচেতনভাবে নির্দেশ দেয় কী হবে আমাদের আচরণ, কী আমাদের থেকে প্রত্যাশা, আমরা কী দক্ষতা অর্জন করব, কী জানব। অপ্রত্যাশিত আচরণ করলে প্রয়োজনে আমাদের শাস্তি দিয়ে, অন্য সময় কাকে কীভাবে অনুসরণ করব তার নির্দেশ দিয়ে পরিবার এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে পরিবারের ধারাকে বহন করে নিয়ে চলে। আমরা লক্ষ করি, অনুসরণ করি, আমাদের চারিদিকের নারী আর পুরুষদের, এভাবে জানা-অজানার মধ্যে দিয়ে আমরা নারী বা পুরুষ হয়ে উঠি।

পরিবারের সম্পদ বণ্টনের সিদ্ধান্ত সেই নারী-পুরুষ বিভাজনে আরও মোটা করে দাগ বুলিয়ে দেয়। খাদ্য, স্বাস্থ্য, মনোযোগে সেই পার্থক্য চূড়ান্ত পর্যায়ে গেলে শিশুকন্যারা ভুগবে অপুষ্টিতে, ব্যহত হবে তাদের লেখাপড়া, নারী হিসেবেও তাঁরা ক্ষমতা অনুযায়ী উৎপাদনশীল হয়ে উঠতে পারবেন না। পার্থক্য এতটা চূড়ান্ত না হলেও মেয়ে হয়তো পড়বে কলা বিভাগে আর ছেলেরা যাবে বিজ্ঞানে— এ সিদ্ধান্ত তো অহরহই ঘটছে। মেয়ে সামলাবে ঘরের কাজ আর পরের ভাইবোনদের, প্রয়োজনে স্কুলের পড়া ছেড়ে দিয়ে— এ সিদ্ধান্তও পরিবারই নেয়। ভাইরা যাবে অর্থকরী কাজে, তেমন হলে যাবে মাঠে কাজ করতে, পরিবারের ভরণপোষণ যে তাকেই করতে হবে, এই মূল্যবোধ তাকে শৈশবেই শিখে নিতে হয়। আর

বাইরে কাজ করলেও মেয়েদের ঘরের কাজ করতেই হবে, এমনকী পশ্চিমি দেশেও, এমনকী তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নেও তার ব্যতিক্রম হত না। রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্টও তাই দেখায়।

নারী-পুরুষের কাজের এই বিভাজন খুব গুরুত্বপূর্ণ এজন্যই যে বিয়ের পরে মেয়েরা বাপের বাড়ি থাকবে না বলে তাদের বিয়ের আগে এখনও বেশি পড়াশুনা করানো হয় না, ছেলেদের জন্য সেই বিনিয়াগটা করা যায়, কিন্তু মেয়েদের জন্য করা মানে 'অন্যের বাগানে জল দেওয়া'। শিক্ষা-প্রশিক্ষণের অভাবে মেয়েদের কাজের সুযোগ আর অংশগ্রহণের হার-ও থাকে কম, উপার্জন হয় সীমিত, পরিবারের সম্পদ বণ্টন আর বিনিয়োগে বলার সুযোগ প্রায় থাকেই না।

শ্রমের বাজারেও বৈষম্য ন্যায়সঙ্গত বলেই সবাই মেনে নেন, এমনকী মেয়েরা নিজেরাও বিশ্বাস করেন, তাঁরা ছেলেদের তুলনায় কম উৎপাদনশীল, তাই তাঁদের কম মজুরিই পাওয়ার কথা। ঘরের কাজটাই তাঁর আসল কাজ, এমনকী উপার্জনশীল অধিকাংশ মেয়েও সে কথাই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। অর্থনীতির তত্ত্বও যেন বহুদিন নানা ভাবে তার যুক্তিই সাজিয়ে আসছিল, সে বিষয়ে আশ্চর্য সাদৃশ্য মার্কস আর তাঁর বিরোধীদের। এ লেখার পরিসর পরিবারে শ্রমবিভাজনের ব্যাখ্যার, সেটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকলাম।

শ্রমের বাজার, নারী-পুরুষ বৈষম্য ও অর্থনীতির তত্ত্ব

একই বা অনুরূপ কাজের জন্য মেয়েরা কম মজুরি পায়— এ তথ্য আজ আর বিতর্কের অবকাশ রাখে না। ব্যাপারটা যে শুধু তৃতীয় বিশ্বে সীমাবদ্ধ নয়, তা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সংবাদ, আলোচনা আর গবেষণা প্রমাণ করে দিয়েছে। তথাকথিত উন্নত পশ্চিমি দেশেও মেয়েরা সমান কাজে সমান মজুরি পায় না। এই বৈষম্য এতই গভীরে যে শিল্পোন্নত জাপানে মেয়েরা একই কাজে পুরুষের অর্ধেক মজুরি পায়। অবস্থাটা যেখানে সবচেয়ে ভাল, সেই সুইজারল্যান্ডে পায় পুরুষের ৯০ শতাংশ মজুরি। আধুনিক অর্থনৈতিক জাদুর দেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোরিয়া এই বলে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের প্রলোভন দেখায়, 'এখানে মেয়েদের নিয়োগ করলে পুরুষদের তুলনায় ১০ থেকে ২০ শতাংশ কম মজুরি দিলেও চলবে' (নিউ ইন্টারন্যাশনালিস্ট, ১৯৯৫)।

বৈষম্যের পর্যবেক্ষণ: দীর্ঘদিনের

অর্থনীতিকরা দীর্ঘদিন ধরেই সমান বা তুলনীয় কাজে মেয়েরা কম মজুরি পায়, এই পর্যবেক্ষণ এবং এর সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান করছেন। পরিবারের শ্রমবিভাজনের ধারণাই এজন্য দায়ী, তাকেই সাজিয়েগুছিয়ে তাত্ত্বিকভাবে পণ্ডিতরা উপস্থিত করেছেন। অর্থনীতির আলোচনায় অন্যতম সম্মানিত পত্রিকা *ইকনমিক জার্নালে* ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রী নেত্রী মিলিসেন্ট ফসেট 'সমান কাজে সমান মজুরি'র দাবি তোলেন (মার্চ, ১৯১৮)। তারও আগে শ্রীমতী ই. এফ. রথবোন বলেন, পুরুষদের বেশি মজুরির কারণ শ্রমিক সঙ্ঘ এবং পুরুষেরা পরিবারের

অন্নসংস্থান করে বলে পুরুষদের শ্রমিক সংগঠন নারীদের সংগঠনের তুলনায় বেশি সহানুভূতি পায় (মার্চ, ১৯১৭)।

এই আলোচনায় এর পরের অন্যতম উল্লেখ্য সংযোজন করলেন বাজার অর্থনীতির অন্যতম প্রবক্তা এজওয়ার্থ (ডিসেম্বর, ১৯২২)। তিনি বললেন যে, তারা যদি সমান মূল্যের বাজারজাত দ্রব্য উৎপাদন করে, তা হলে প্রতিযোগী সমাজে তাদের মূল্যও সমান হবে। কিন্তু "পুরুষ শ্রমিক সংগঠনদের চাপে মেয়েরা কয়েকটি পেশায় ভিড় করতে বাধ্য হয় এবং তার ফলে সেই পেশাগুলিতে তাদের মজুরি নেমে যায়। ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য এবং কুসংস্কার থেকেই পুরুষরা শ্রমিক সংগঠনে আধিপত্য কায়েম রেখেছে" (এজওয়ার্থ, পূর্বোক্ত)।

বৈষম্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে পরবর্তী সময়ে কেউ বললেন মেয়েদের উপর মানবিক মূলধনে (শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) বিনিয়োগ কম হয় বলে, কেউ বললেন চাকুরিদাতারা বৈষম্য করে তৃপ্তি বা উপযোগিতা বৃদ্ধিতে সমর্থ হয় বলে, কেউ বললেন মজুরির বৈষম্যের মাধ্যমে নারী ও পুরুষশ্রমিকদের মধ্যে বিভাজন জিইয়ে রেখে ধনতন্ত্র নিজস্ব শক্তিকে সংহত করে বলে শ্রমের বাজারে এই বৈষম্য বজায় রয়েছে। এখানে অর্থনীতির দুটি মূল ধারা, যথা: ক. নয়া ধ্রুপদী এবং খ. প্রাতিষ্ঠানিক বক্তব্য একে একে উপস্থিত করা হল।

বাজার অর্থনীতি: নয়া ধ্রুপদী ধারা

বাজার অর্থনীতির বিশ্লেষণের মৌলিক একক হল ব্যক্তি, যার নির্বাচনের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আছে। সেই ব্যক্তি বিচক্ষণ (র‍্যাশনাল) বলে তার লক্ষ্য হল প্রাপ্তব্য উপযোগকে সর্বাধিক করা। সে সীমাবদ্ধ সম্পদ বা আয়ে এবং বাজার-চলতি দামের সীমানার মধ্যে তার তৃপ্তিকে সর্বাধিক করার চেষ্টা করে।

বাজার অর্থনীতিতে দামই হল সেই নিয়ন্ত্রক যার মাধ্যমে পণ্য বা দ্রব্য ও সেবার ক্রেতা-বিক্রেতা এবং উৎপাদনের উপকরণের ক্রেতা-বিক্রেতা তাঁদের পছন্দগুলিকে জানান দেন। যেমন ক্রেতারা কোনও পণ্য পছন্দ করলে জোগানের তুলনায় সেটির চাহিদা বেশি হয়ে যাবে ফলে তার দাম বাড়বে। উৎপাদকরাও ক্রেতাদের পছন্দ বুঝতে পেরে ওই পণ্য উৎপাদনে উৎপাদনের উপাদানগুলিকে নিয়োগ করবে। একই ভাবে উৎপাদনের উপকরণও যেখানে সবচেয়ে ভাল দাম পাবে, সেখানে নিয়োজিত হবে। এ ভাবে অর্থনৈতিক কাজকর্মের সমস্ত প্রতিনিধি (এজেন্ট) যথা ক্রেতা-বিক্রেতা, উৎপাদক এবং উপাদানের জোগানদার তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে অভ্যনুকূল কাম্যতার (অপ্টিমাম) স্তরে আনলে তার যোগফল হিসাবে অর্থনীতিও সর্বাধিক কাম্যতার তথা কল্যাণের স্তরে পৌঁছবে।

এই তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে নয়া ধ্রুপদী অর্থনীতি আয় বা দাম বা সংশ্লিষ্ট পরিবর্তকে (ভেরিয়েবলে) পরিমেয়ভাবে ক্ষুদ্র (ইনফিনিটেসিমাল) বা যতটা ক্ষুদ্র পরিমাপ করা যায় ততটাই ক্ষুদ্র পরিবর্তন ঘটিয়ে তার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখিত ব্যক্তির আচরণে কী প্রভাব পড়বে তা বিশ্লেষণ করে। তার ফলে অঙ্কের পরিভাষায় ক্যালকুলাস ব্যবহার করা সম্ভব

হয়ে ওঠে। কোনও সম্ভাব্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, আদর্শগত পরিবর্তন ঘটে না ধরে নেওয়া হয়। আদৌ সে সব কোনও কিছুর যদি পরিবর্তন ঘটে, তবে তাকে 'রুচি' নামক এক অনির্দেশ্য ঝুলিতে পুরে বিশ্লেষণ চলাকালীন 'অপরিবর্তনীয়' সিলমোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়। ফলে আমরা পাই এমন এক ব্যক্তিকে যার অস্তিত্ব কোনও নির্দিষ্ট সময়ে নয়, অর্থাৎ শাশ্বত, শ্রেণিহীন, বর্ণহীন, সংস্কৃতিহীন, কিন্তু লিঙ্গহীন নয়, স্পষ্টত পুরুষ [অবশ্য কলেজস্তরের অন্যতম পাঠ্যপুস্তক হেন্ডারসন অ্যান্ড কোয়ান্ডট্ (১৯৮০)-এ পরিচ্ছেদগুলিতে পর্যায়ক্রমে নারী ও পুরুষ ধরা হয়েছে]।

এই বিচক্ষণ ব্যক্তিটি শ্রমের বাজারে ততটা শ্রম বিক্রয় করবে যেখানে চলতি মজুরির হারে তার উপযোগিতা সর্বাধিক হবে। অন্যদিকে, একজন নিয়োগকর্তা তাকে নিয়োগ করবে যতক্ষণ না ওই শ্রমিককে নিয়োগ করে যে বাড়তি বা প্রান্তিক উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছে তার বাজার দাম এবং তাকে নিয়োগ করার জন্য নিয়োগকর্তাকে যে বাড়তি মজুরি দিতে হচ্ছে, তা সমান হয়। এই ধরনের বিমূর্ত ছকে নারীশ্রম, বৈষম্য প্রবেশ করে কী করে? তার জন্য এই অনৈতিহাসিক, অ-সামাজিক ছকেও একটু ইতিহাস, একটু সমাজকে প্রবেশ করতে দিতে হল। কিন্তু তার আগে বাজার অর্থনীতিতে কী ভাবে কেউ শ্রমের জোগান নির্ধারণ করবে, তা একবার দেখা যাক।

শ্রম বনাম বিশ্রামের দ্বন্দ্ব

মজুরির সঙ্গে আয়ের সম্পর্ক বোঝাতে ধরে নেওয়া হয় একজন ব্যক্তির হাতে সময়ও একটা পর্যাপ্ত সম্পদ— যার নানা প্রতিযোগী ব্যবহার আছে। সময়কে কোনও ব্যক্তি আয়বৃদ্ধি (বেশি ঘণ্টা কাজ) বা বিশ্রামবৃদ্ধিতে (কম ঘণ্টা কাজে) নিয়োজিত করতে পারে— কারণ দুটোতেই তার কাম্য তৃপ্তি বা উপযোগিতা বাড়তে পারে। ফলে মজুরির হার বাড়লে তার দ্বিমুখী প্রতিক্রিয়া হতে পারে। সেই ব্যক্তি যদি আগের উপার্জনেই সন্তুষ্ট থাকেন, তা হলে তিনি কম ঘণ্টা কাজ করতে পারেন এবং বিনিময়ে বেশি বিশ্রাম চাইতে পারেন। ধরুন, আগে আপনার মজুরির হার ছিল ঘণ্টা পিছু ১০ টাকা, ফলে আপনি ৬ ঘণ্টায় পেতেন ৬০ (৬×১০) টাকা। এখন মজুরির হার যদি বেড়ে ঘণ্টাপিছু ১২ টাকা হয়, আপনি ৫ ঘণ্টাতেই ওই (৫×১২) টাকা উপার্জন করতে পারেন। এখন আয়বৃদ্ধির ফলে শ্রমসংক্রান্ত সিদ্ধান্তের উপর সম্ভাব্য প্রভাবকে বলা হয় 'আয়' প্রভাব। আবার আপনি আগে ১ ঘণ্টা বিশ্রাম নিলে তার দাম ছিল ১০ টাকা (অর্থাৎ ১ ঘণ্টা কাজ না করার ফলে সুযোগ মূল্য বা হাতছাড়া হওয়া আয়), এখন সেই বিশ্রামের দাম বেড়ে হয়েছে ১২ টাকা। ফলে আপনি এখন ১ ঘণ্টা বিশ্রামের পরিবর্তে ১ ঘণ্টা কাজ করতে চাইতে পারেন— কারণ বিশ্রাম এখন বেশি দামি। তুলনামূলক দামবৃদ্ধির ফলে শ্রমসংক্রান্ত সিদ্ধান্তে যে প্রভাব পড়ে, তাকে অর্থনীতির তত্ত্বে বলে 'পরিবর্ত' প্রভাব। সুতরাং মজুরি বাড়লে কারও কাজ করার প্রবণতা বাড়বে না কমবে সেটা নির্ভর করবে আয় ও পরিবর্ত প্রভাবের তুলনামূলক শক্তির উপর। যদি আয় প্রভাব বেশি শক্তিশালী হয়, তা হলে সে কম কাজ করবে, অর্থাৎ মজুরি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

শ্রমের জোগান কমবে। অন্য দিকে পরিবর্ত প্রভাব বেশি শক্তিশালী হলে সেই ব্যক্তি বেশি কাজ করতে চাইবে। ফলে সব মিলিয়ে শ্রমের জোগান বাড়তেও পারে, কমতেও পারে। অঙ্কের ভাষায় বললে মজুরি বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে জোগান রেখার ঢাল প্রথমে ধনাত্মক হবে। একটা পর্যায়ের পর মজুরি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রাম সংকোচন করে অতিরিক্ত উপার্জনের আকাঙ্ক্ষা কমতে পারে, ফলে মজুরি বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমের জোগান কমা সম্ভব। এই ঘটনা বা প্রপঞ্চটিকে বলা হয়— শ্রমের পিছনে-হেলানো (ব্যকওয়ার্ড বেন্ডিং) জোগান রেখা। অবশ্য এটি যথেষ্ট বিতর্কিত বিষয় সেটা জানিয়ে রাখা ভাল।

মিনসার: নারীর ঘরে-বাইরে কাজ

অবশেষে নয়া ধ্রুপদী বিশ্লেষণে ইতিহাস-সমাজ সব কিছু প্রবেশ করল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরের শ্রমে যোগদানের স্থানিক সারণির (ক্রস সেকশন বা একই বছরে বিভিন্ন স্থানে গৃহীত) পরিসংখ্যান দেখাল যে স্বামীদের আয় বাড়লে স্ত্রীদের চাকরি করার প্রবণতা কমছে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে স্ত্রীরা স্বনির্ভরভাবে নয় বরং স্বামীর আয়ের পরিপূরক হিসাবে চাকরি করেন, তবে এই ঘটনাকে পিছনে-হেলানো জোগান রেখার প্রতিফলন হিসাবে ধরে নেওয়া যেত। অর্থাৎ পরিবারের আয় বাড়লে স্ত্রীরা কাজের বদলে অবসর বেশি পছন্দ করছেন।

সমস্যায় ফেলল ১৮৯০ থেকে ১৯৬০ সালের কালিক সারণির (টাইম সিরিজ বা একই স্থানে বিভিন্ন সময়ে বা বছরে গৃহীত) পরিসংখ্যান। তাতে দেখা গেল ওই সময়ে ১৪ বছরের বেশি মেয়েদের কাজে যোগদানের হার ১৮ থেকে ৩৩ শতাংশ হয়েছে, কিন্তু বিবাহিতাদের ক্ষেত্রে তা ৫ থেকে ৩০ শতাংশ হয়েছে। অর্থাৎ বিবাহিতাদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার অনেক অনেক বেশি। স্থানিক সারণি এবং কালিক সারণির তথ্যের এই আপাতবিরোধিতার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা কী?

ব্যাখ্যা করার জন্য জেকব মিনসার (১৯৬২) বললেন, একজন পুরুষ তার সময়কে শ্রম (বাজার) ও বিশ্রাম (বাজার-বহির্ভূত)— এই দুটি কাজের যে কোনও একটিতে নিয়োগ করতে পারে। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে এই দুটির বাইরে তৃতীয় একটি ক্ষেত্র থাকে— গৃহকর্ম। সুতরাং বিবাহিতা নারীদের ক্ষেত্রে ওই বিষয়টিকেও বিশ্লেষণের আওতায় আনতে হবে।

পুরুষদের ক্ষেত্রে বিশ্রামের বিকল্প বা সুযোগ মূল্য (অপরচুনিটি কস্ট, যদিও মূল্য না বলে ব্যয় শব্দটার ব্যবহার প্রচলিত, কিন্তু সেটা আক্ষরিক অনুবাদ হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা ব্যয় নয়, মূল্যকে বোঝাচ্ছে) তার একমাত্র বিকল্প মজুরির হার দিয়ে নির্ধারিত হবে। কিন্তু মেয়েদের বিশ্রামের সুযোগ মূল্য শুধুমাত্র বাজার-চলতি মজুরির হার দিয়ে নির্ধারিত হয় না। গৃহভিত্তিক দ্রব্য ও পরিষেবার ব্যবস্থা গৃহিণীকেই করতে হয়, অর্থাৎ শিশুর লালন-পালন, খাবারের ব্যবস্থা, কাপড়-চোপড় ঘর-দুয়ার পরিষ্কার রাখা বা গৃহস্থালির কাজ তাকেই করতে হবে। এই দ্রব্য ও পরিষেবাগুলি বাজার থেকে কিনতে গেলে কত ব্যয় হবে, তার উপর স্ত্রীদের বিশ্রামের সুযোগ মূল্য নির্ভর করে।

ধরুন, আপনি একজন কর্মরতা স্ত্রী, কোনও উপলক্ষে বাড়িতে লোক নিমন্ত্রণ করেছেন। খাওয়ানোর ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আপনার, এটা অনুমান করে নিচ্ছি কারণ এটা বিশ্লেষণের একটা অন্তর্নিহিত অনুমান। কেনা মিষ্টি পাওয়া যায় না বা পাওয়া গেলেও এত দূরে এবং এত দামি যে গাড়িভাড়া দিয়ে ২০০ টাকা পড়বে। বাড়িতে ওই মিষ্টি বানালে উপকরণ নিয়ে খরচ পড়বে ১০০ টাকা এবং বানাতে গিয়ে একদিন ছুটি নিতে হবে বলে একদিনের মজুরি হাতছাড়া হবে— তার পরিমাণ ধরুন ৬০ টাকা। সুতরাং মিষ্টির দাম পড়ছে ১৬০ (=১০০+৬০) টাকা, তবু বাঁচবে ৪০ (=২০০-১৬০) টাকা। কিন্তু ওই মিষ্টিই যদি শস্তা হয়ে যায় (উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে বহু সময় দাম কমে) এবং আপনার বাড়ির পাশেই যদি দোকান খোলে, আপনি হয়তো ১০০ টাকাতেই ওই মিষ্টি পেয়ে যাবেন এবং আপনার একদিন চাকরি কামাই করার প্রয়োজন হবে না। অর্থাৎ মেয়েদের ক্ষেত্রে শ্রমের জোগান নির্ভর করবে ঘরে তৈরি দ্রব্য ও পরিষেবার দাম এবং প্রাপ্তির সুযোগের উপর। সেগুলির দাম বেশি হলে এবং পাওয়ার সুযোগ কম থাকলে মেয়েদের শ্রমের জোগান কমবে; কারণ মেয়েরা সেই গৃহস্থালির দ্রব্য ও পরিষেবার ব্যবস্থায় ব্যস্ত থাকবেন। বিপরীতে এগুলির দাম কমলে ও পাওয়ার সুযোগ বাড়লে মেয়েরা গৃহস্থালির কাজ থেকে মুক্ত হয়ে উপার্জনের জন্য শ্রমকে নিয়োগ করতে পারবেন।

এই অবস্থানের প্রেক্ষিতে স্থানিক ও কালিক সারণির পরিসংখ্যানের আপাতবিরোধিতার ব্যাখ্যা সহজ হয়ে যায়। স্থানিক সারণির তথ্যগুলি তুলনায় আগের। সে সময় স্বামীর মজুরির হার বাড়লে স্ত্রীরা মজুরিশ্রমে কম যোগ দিত। কারণ তখন গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও পরিষেবাগুলি কম পাওয়া যেত এবং পাওয়া গেলেও সেগুলির দাম বেশি হত। সুতরাং স্বামীর আয় বাড়লে স্ত্রীরা মজুরিশ্রমে অংশ না নিয়ে ঘরের কাজ করত। কোনও কারণে স্বামীর আয় কমে গেলে তবেই স্ত্রী নিজের মজুরি দিয়ে সেই ঘাটতি পূরণ করার চেষ্টা করত।

কালিক সারণির পরিসংখ্যানে দীর্ঘদিনের ব্যবধান আছে। ফলে, এর বিপরীতটাই দেখা যাওয়া স্বাভাবিক। স্ত্রীরা বাজার-সম্পর্কে বা মজুরি শ্রমে প্রবেশ করলে গৃহস্থালির কাজের— অর্থাৎ খাবার শিশুপালন প্রভৃতির বাজারি বিকল্পের চাহিদা বাড়ছে। এগুলির জোগান বাড়লে এদের প্রাপ্তির সুযোগ বাড়বে এবং মূল্য ক্রমশ কমবে। এর সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার মান বাড়ার ফলে প্রাপ্তব্য লক্ষ্যগুলি (অ্যাসপায়ার্ড টার্গেটস) বাড়ছে। যেমন, উদ্দিষ্ট সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু প্রকৃত আয় বেড়েছে তিন গুণ, সুতরাং জীবনযাত্রার মানও তদনুরূপ বেড়েছে বলে আশা করা যায়। তাই সব মিলিয়ে স্বামীর আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অধিক পরিমাণে মজুরিশ্রম অংশগ্রহণ আর কোনও ধন্দের সৃষ্টি করে না।

মিনসারের এই আলোচনাতে শ্রমের বাজারে নারীশ্রমের মূল্য কেন কম হবে, সে বিষয়ে কোনও আলোকপাত নেই। তা সত্ত্বেও এটা আলোচনা করলাম এই জন্য যে, শিকাগো ধারার অন্যতম প্রবক্তা মিনসারের এই আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের বাজারে নারীশ্রম নিয়ে আলোচনা 'অ্যাকাডেমিক' স্বীকৃতি পেল। হয়তো বা মিনসার একজন পুরুষ অর্থনীতিবিদ হওয়ায় এই আলোচনা স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্বও পেল।

নয়া ধ্রুপদী ধারার অন্যতম অনুমান হচ্ছে ব্যক্তির নির্বাচনের স্বাধীনতা আছে বলে নিজের সিদ্ধান্তের জন্য ব্যক্তি নিজেই দায়ী। শ্রমের বাজারে মেয়েরা পুরুষদের থেকে কম মজুরি পায় এবং মেয়েদের সারা জীবনের গড় আয় রেখা পুরুষদের গড় আয় রেখার নীচে থাকে এবং এর মধ্যে অন্যায় বা বৈষম্যের কিছু নেই। বরং এর কারণ হচ্ছে মেয়েদের নিজেদের উপর মানবিক মূলধনে স্বল্পতর বিনিয়োগ বা শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে স্বল্পতর ব্যয়ের সিদ্ধান্ত এবং ফলস্বরূপ স্বল্পতর উৎপাদনক্ষমতা। এঁদের মতে একই বয়স এবং একই শিক্ষাস্তরের নারী ও পুরুষদের উৎপাদনক্ষমতার পার্থক্য হয় দুটি কারণে:

প্রথমত, একজন নারী একজন পুরুষের তুলনায় গড়ে অনেক কম বছর মজুরিশ্রম ব্যয় করেন, সন্তানধারণ বা সন্তানপালনের জন্য তাঁদের মজুরিশ্রমে ব্যাঘাত ঘটে;

দ্বিতীয়ত, মেয়েরা যখন চাকরি করেন, তখন তাঁরা এমন চাকরি বেছে নেন যেখানে দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ কম। ফলে তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণের (অন-দি-জব ট্রেনিং) সুযোগ কমে যায়। অবশ্য মেয়েরা মূলত শিক্ষা, সেবা ইত্যাদি যে সমস্ত ক্ষেত্রে যুক্ত হন, সেখানে তাঁদের অভিজ্ঞতায় দক্ষতা অবশ্যই বাড়ে।

মানবিক মূলধনে বিনিয়োগের মাধ্যমে মেয়েদের এই 'স্বেচ্ছা নির্বাচনের' সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিলেন মিনসার এবং পোলাচেক (১৯৭৪)। তাঁদের মতে কর্মরত অবস্থায় প্রশিক্ষণ মানে কিছুটা আয় হাতছাড়া হওয়া। ফলে, যে সমস্ত মেয়েরা শ্রমের বাজার থেকে সরে যেতে চান, তাঁরা যদি এমন কোনও চাকরি নেন যেখানে ওই ধরনের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই, তা হলেই তাঁরা তাঁদের জীবনব্যাপী আয়কে সর্বাধিক করতে পারেন। যেমন ধরুন ডাক্তার হতে গেলে পাঁচ বছর ধরে এম.বি.বি.এস শেষ করার পরও ইন্টার্নি, হাউসস্টাফশিপে আরও সময় যাবে। সুতরাং কেউ যদি সারাজীবন উপার্জন করতে না চায় এবং প্রথম সুযোগেই (যেমন বিবাহের মাধ্যমে) চাকরির বাজার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চায়, সে কেন অত সময় ব্যয় করে (এবং আয়ের সুযোগ হাতছাড়া করে) প্রশিক্ষণ নেবে? তার পক্ষে অনেক বেশি আকর্ষণীয় হবে ন্যূনতম শিক্ষার পর কোনও চাকরি (যথা প্রাথমিক শিক্ষায়) নিয়ে নেওয়া। প্রশ্ন করবেন না, মনে রাখবেন, বাজার অর্থনীতি অনুমান করে নিয়েছে মেয়েরা চাইলেই ডাক্তার বা প্রাথমিক শিক্ষিকা— যে কোনওটাই হতে পারেন। কিন্তু তাঁদের উপার্জনের তাগিদটা (কমিটমেন্ট) কম বলে তাঁরা বেশি মূলধন বিনিয়োগ করে ডাক্তার হন না।

নিয়োগকর্তারাও মেয়েদের এই তাগিদের অভাবের কথাটা জানে। তারা জানে পুরুষশ্রমিকের উপার্জনের প্রতি দায়বদ্ধতা গড়পড়তা নারীশ্রমিকের তুলনায় বেশি। তাই নিয়োগকর্তারা তাদের মুনাফা সর্বাধিক করার জন্য দক্ষতাবৃদ্ধিকারী বেশি মাইনের পদগুলি পুরুষশ্রমিক দিয়ে পূরণ করে। এর ফলে হয়তো যে সমস্ত নারীর চাকরির প্রতি দায়বদ্ধতা পুরুষের সমান, নিয়োগকর্তারা তাদের প্রতিও বৈষম্য প্রদর্শন করে ফেলে। কিন্তু কোনও কর্মীর সম্বন্ধে ওই ব্যক্তিগত তথ্যসংগ্রহ এত ব্যয়সাপেক্ষ হতে পারে যে অর্থনীতিকদের

মতে নিয়োগকর্তাদের পক্ষে গতে বাঁধা ছবিকে গ্রহণ করা পুরোপুরি বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত।

এই বিশ্লেষণ সম্বন্ধে দুটো আপত্তি খুব স্বাভাবিক। প্রথমত, মেয়েরা যে মানবিক মূলধনে ব্যয় করেন না (যদিও সে ব্যাপারে মেয়েদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা কতটা থাকে তা প্রশ্নসাপেক্ষ)— সেটা বৈষম্যের ভিত্তি না বৈষম্যের ফসল? অর্থনীতির বাইরে বৈষম্যের সামাজিক পরিমণ্ডল মেয়েদের মানবিক মূলধনে বেশি নিয়োগের পথে বাধা হতে পারে। অর্থাৎ যদি তাঁরা জানেনই যে সমান বিনিয়োগ সত্ত্বেও সমান শিক্ষা-অভিজ্ঞতা-প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুরুষ শ্রমিক তাঁর তুলনায় বেশি মজুরি পাবে, তা হলে তিনি বিনিয়োগ করবেন কেন? ফলে কম বিনিয়োগ আবার কম প্রতিদান বা কম মজুরির কারণ হবে। এই বৃত্তাকার যুক্তির বাইরে কি অর্থনীতি আর কিছু বলতে পারে না?

দ্বিতীয়ত, মেয়েরা শ্রমের বাজারে অংশগ্রহণের থেকে তাঁদের পরিবারের ভেতরের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে তাঁরা স্বল্প দক্ষতার কাজগুলিতে ভিড় করেন— এটা এ-ধরনের বিশ্লেষণের অন্তর্নিহিত অনুমান। কিন্তু কেন একই ধরনের কাজের ক্ষেত্রেও মেয়েরা পুরুষের তুলনায় কম মজুরি পাবেন সে-ব্যাপারে এই বিশ্লেষণ আলোকপাত করেনি। তবে এক ধরনের ব্যাখ্যা এসেছে শিকাগো ধারার অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, ১৯৯৪ সালের অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী গ্যারি এস. বেকারের থেকে।

গ্যারি বেকার: বৈষম্যেই আনন্দ

প্রচলিত অর্থনীতি তত্ত্বে যে সমস্ত দ্রব্য ও পরিষেবা বাজার সম্পর্কের এবং বাজার সম্পর্কের মাধ্যমে উৎপাদন বা বিনিময় হত— তাই শুধু অর্থনীতির আওতায় আসত। যদি বাজার-সম্পর্ক-বহির্ভূত দ্রব্য এবং পরিষেবা কারও উপযোগিতা হ্রাসবৃদ্ধি করে এবং সুযোগ-মূল্যকে প্রভাবিত করে, তবে তাকেও বেকার বাজার সম্পর্কের আওতায় নিয়ে এলেন। অর্থাৎ, বেকারের মতে, যে কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে বাজারের বা দামের সম্পর্ক নেই, সে-সমস্ত কাজকেও বিশেষ যুক্তি পরম্পরায় সাজিয়ে অর্থনীতির গণ্ডির মধ্যে আনা যায়। যেমন, বিবাহ, বিচ্ছেদ, সন্তানধারণ সমস্ত কিছুর সঙ্গে উপযোগিতা এবং প্রাপ্ত অথবা হাতছাড়া আয়কে যুক্ত করে ব্যাখ্যা করা যায়। শ্রমের বাজারে বৈষম্য তথা বিবাহ প্রভৃতি নিয়ে বেকারের আলোচনাকে সংক্ষেপে রাখছি। বেকার নারী ও পুরুষকে দুটি উৎপাদনশীল একক বা আর্ম ধরে নিয়ে তাদের মধ্যে গৃহশ্রম ও মজুরির বিনিময়ের ভিত্তিতে তাঁর আলোচনার কাঠামো নির্মাণ করলেন। বেকারের মতেও সময় পর্যাপ্ত সম্পদ বলে নারী-পুরুষ উভয়ের কাছেই এর নানা প্রতিযোগী ব্যবহার আছে। বিবাহে নারী-পুরুষ যে সময় এবং অর্থ বিনিয়োগ করছে তার তুলনায় প্রতিদান বেশি পেলে বা বিবাহ না করার ফলে হাতছাড়া হওয়া আয় তুলনায় বেশি হলে তারা বিবাহ নামক চুক্তিতে প্রবেশ করবে। বিবাহে তারা উভয়েই বাজার সম্পর্কিত (যাতে আয় বা ব্যয় হয়) এবং বাজার বহির্ভূত (যাতে আয় বা ব্যয় না হলেও উপযোগিতা বাড়ে বা কমে) কাজের দায়িত্ব ভাগ করে নেবে। এই সমস্ত কাজ বা সিদ্ধান্তের মধ্যে আছে চাকরি করা বা না করা, যৌন সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, সন্তানধারণ, সামাজিক

জীবন প্রভৃতি বিষয়গুলি। যখন একজন দেখবে দেওয়ার তুলনায় পাওয়া কম হয়ে যাচ্ছে, সে এই সম্পর্ক ভেঙে দিয়ে চলে যেতে চাইবে। ফলত বিচ্ছেদ ঘটবে।

বিবাহে মেয়েদের ভূমিকাটা কী রকম? সাধারণ ভাবে মেয়েদের জীবনব্যাপী বা গড়পড়তা আয় পুরুষদের তুলনায় কম হয় কারণ বেকারের মতে (ক) মেয়েরা মানবিক মূলধনে বিনিয়োগ কম করেন এবং (খ) তাঁদের জৈবিক অক্ষমতা। তাই বাজারের চাহিদা ও জোগানের সূত্র অনুযায়ী তাঁরা কম মানবিক মূলধনের জন্য কম উৎপাদনশীল বলে কম মজুরি পাবেন। সুতরাং একজন সাধারণ মেয়ের বিবাহেই বেশি সুবিধা। আর স্বামীর আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই তুলনামূলক সুবিধা আরও বাড়ে। বিপরীতে, অ-সাধারণ কোনও নারীর পুরুষের অভাব হবে না এবং তাঁর বিবাহে তুলনামূলক সুবিধা কমও হতে পারে।

একটি বিশ্লেষণে বেকার ধরেই নিচ্ছেন (১৯৭১) চাকরির বাজারে পুরুষ বেশি মজুরি পাবে, যদিও আর একটি বিশ্লেষণে একই কাজে কম মজুরির একটি ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন (১৯৮১)। পুরুষ বেশি মজুরি পাবে বলে বিবাহে তার সুবিধা কারণ তা হলে সে ঘরের কাজের দায়িত্ব এড়িয়ে শুধুমাত্র মনোনিবেশ করতে পারে। বিবাহ এবং বিচ্ছেদের অর্থনীতির সঙ্গে সন্তানধারণকেও আলোচনার আওতায় এনে বেকার বললেন যে, শিশুরা একই সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য (কনস্যুমার্স ড্যুরাবল্‌স) কারণ তারা দীর্ঘদিন ধরে উপযোগিতা দেবে যেমন দেবে একটা বাড়ি, একটা গাড়ি, একটা ফ্রিজ এবং তারা দীর্ঘস্থায়ী বিনিয়োজ্য দ্রব্য (প্রোড্যুসার্স ড্যুরাবল্‌স)ও বটে। এখন তাদের উপর বিনিয়োগ করলে অবসর গ্রহণের পর থেকে তারা প্রতিদান দিতে শুরু করবে। কিন্তু ভবিষ্যতের থেকে বর্তমানের কথা ভাবলে সন্তান যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ একটি ব্যাপার। ফলে পরিবারের এবং বিশেষত নারীশ্রমিকের মজুরি যত বাড়বে, ততই সন্তানের আকাঙ্ক্ষা কমবে এবং মজুরি শ্রমে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়বে।

বিবাহ এবং সন্তান এই দুটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করার জন্য বেকার নারীশ্রমের মজুরিকে বিশ্লেষণের আওতায় আনলেন। কিন্তু তিনি কি মানবিক মূলধনের প্রবক্তাদের থেকে নতুন কিছু বললেন? তিনি ধরেই নিলেন যে, শ্রমের বাজারে নারী-পুরুষ মজুরি বৈষম্য এবং সংসারে নারী-পুরুষ শ্রমবিভাজন 'অপরিবর্তনীয়'। সুতরাং বিশ্লেষণে যতই চমক থাক না কেন, আমরা প্রচলিত অর্থনীতির অঙ্গন থেকে কোনও ব্যাখ্যা পেলাম না। বরং ব্যাখ্যা বলে যে বক্তব্যকে রাখা হল, তা প্রচলিত অসম ব্যবস্থাকেই নৈতিক সমর্থনজ্ঞাপন।

অন্য ধারার ব্যাখ্যায় যাওয়ার আগে বাজার অর্থনীতির প্রবক্তারা আরও এক ভাবে বৈষম্যকে ধরবার চেষ্টা করেছেন, সেটা একটু বলি। সাধারণভাবে বাজার অর্থনীতি বলে যে, কোনও নিয়োগকর্তা ন্যূনতম বাড়তি ব্যয়ে পণ্য উৎপাদন করতে পারলে মুনাফা সর্বাধিক করতে পারবে। বাজারে একই স্তরের দক্ষতা-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নারীশ্রমিক যদি পুরুষশ্রমিকের পূর্ণ পরিবর্ত (পার্ফেক্ট সাবস্টিট্যুট) হয়, তা হলে নারীশ্রমিকের বিরুদ্ধে বৈষম্য করে নিয়োগকর্তা তার মুনাফাকে সর্বাধিক করতে পারবে না। সুতরাং সেই আচরণকে কীভাবে অর্থনৈতিকভাবে বিচক্ষণ আচরণ বলা যাবে? আর তা যদি বলা না যায়, বিকল্প উত্তর কী? উত্তরের জন্য

আবার গ্যারি বেকারের কাছে যাওয়া যাক। বেকারের মূল বিশ্লেষণী কাঠামো (১৯৭১) মার্কিন শ্রমের বাজারে শ্বেতকায় এবং কৃষ্ণকায় শ্রমিকদের মজুরি বৈষম্য নিয়ে আলোচনা করেছিল। পরবর্তী সময়ে সেটিকে নারী-পুরুষের মজুরি বৈষম্যকে ব্যাখ্যা করার জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে (চিপলিন ও স্লোন, ১৯৭৪)। বেকারের কাঠামোতে নিয়োগকর্তা বা নিয়োজিত পুরুষশ্রমিক, কেউই নারীশ্রমিককে নিয়োগ করা 'পছন্দ' করে না। তাই নারীশ্রমিক যদি পুরুষ শ্রমিকের সমান মজুরি চায়, সেই মজুরির হারের সঙ্গে অপছন্দের মাশুলটিকেও (ডিস্ক্রিমিনেশন কোয়েফিসিয়েন্ট=বৈষম্য সহগ=বৈ) ধরতে হয়। অর্থাৎ পুরুষদের মজুরির হার যদি ঘণ্টাপিছু ১০ টাকা হয় তবে তার চোখে নারীশ্রমিকের ঘণ্টাপিছু মজুরি হবে (১০+১০×বৈ) টাকা, যেখানে বৈষম্য সহগ যে কোনও ধনাত্মক সংখ্যা। পুরুষশ্রমিক বা নিয়োগকর্তারা যদি মেয়েদের অল্প পছন্দ করেন, ধরা যাক ৫ শতাংশ, তা হলে নারীশ্রমিকদের মজুরি হবে (১০+১০×৫/১০০) টাকা বা ১০.৫ টাকা বা ১০ টাকা ৫০ পয়সা। আবার যদি বেশি পছন্দ করেন, ধরা যাক ৯০ শতাংশ, তা হলে নারীশ্রমিকের ঘণ্টা পিছু মজুরি হবে (১০+১০×৯০/১০০) টাকা বা ১৯ টাকা। আর অপছন্দ তো আরও বাড়তে পারে— সুতরাং পুরুষশ্রমিকদের চোখে নারীশ্রমিকদের ঘণ্টাপিছু মজুরি যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার ঠিক নেই। সুতরাং একজন নারীশ্রমিককে নিয়োগ করে যদি পুরুষশ্রমিকের সমান বাড়তি উৎপাদন (মার্জিনাল প্রোডাক্ট) না পাওয়া যায়, তা হলে বাস্তবে সে পুরুষশ্রমিকের সমান নয়, বাড়তি মজুরি পাচ্ছে। সেটা পুরুষশ্রমিক বা নিয়োগকর্তা, কারও কাছেই কাম্য হতে পারে না। সুতরাং উত্তর: নারীশ্রমিক পুরুষশ্রমিকের তুলনায় কম মজুরি নিলে তবেই তাকে নিয়োগ করা যাবে— কারণ তার মজুরির সঙ্গে ওই অপছন্দের মাশুল যোগ দিয়ে তবেই তার প্রকৃত মজুরি স্থির হবে। সুতরাং ৫ শতাংশ অপছন্দের ক্ষেত্রে ১০ টাকার সমতুল নারীশ্রমের মজুরি হবে ৯.৫২ টাকা আর ৯০ শতাংশ অপছন্দের ক্ষেত্রে তা নেমে হয়ে যাবে ৫.২৬ টাকা। এই বিশ্লেষণের মধ্যে প্রচলিত সামাজিক বৈষম্যমূলক ধারণাকেই শুধু গম্ভীর অর্থনৈতিক তত্ত্ব এবং সমীকরণের মধ্যে ভরে উপস্থিত করা হয়েছে তাই নয়, তাকে নৈতিক এবং অবশ্যম্ভাবী বলে সমর্থনও জানানো হয়েছে। এখনও সারা পৃথিবীতে অন্তত শিল্পক্ষেত্রে অধিকাংশ নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিক পুরুষ। বাস্তবে যে ক্ষমতার সম্পর্ক নারী ও পুরুষকে বিপ্রতীপ অবস্থানে রেখেছে, সেটাকে যদি আলোচনার আওতায় না আনা হয়, তা হলে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ প্রবলের অবস্থানকে, প্রভুর নির্বাচনের স্বাধীনতাকেই শুধু প্রচার করবে, তার 'পছন্দ'কেই সবার পছন্দ বলে জাহির করবে। কারণ যাই অনুমান করা হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে অধস্তন অবস্থানে থাকা নারী, কৃষ্ণাঙ্গ, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শ্রমিকদের কোনও দিনই নির্বাচনে স্বাধীনতা ছিল না, আজও নেই।

প্রাতিষ্ঠানিক ধারা: শ্রমের বাজারে বিভাজন

প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বের প্রবক্তারা বাজার অর্থনীতির সর্বব্যাপী শক্তি তথা ব্যক্তির চূড়ান্ত স্বাধীনতায় কখনওই বিশ্বাস করেননি। বরং তাঁদের মতে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষত নারী ও শিশু

শ্রমিকদের অবাধ শোষণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন। সমস্যার প্রকৃতি বা ব্যাখ্যা নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও তাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের বাইরে উৎপাদনের ধরন পরিবর্তন বা মার্কসবাদী ধারণার বিরুদ্ধে এককাট্টা। এঁদের মতে শ্রমিকরা নানা গোষ্ঠীগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভাজিত। এই বিভাজন ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা প্রভৃতির মাধ্যমে হতে পারে। কিছু কিছু বিশেষ কাজের সঙ্গে আমরা কয়েকটি গোষ্ঠীকে মনে মনে যুক্ত করে নিয়েছি। প্রচলিত বাজার অর্থনীতির জোগান-চাহিদা বা প্রান্তিক উৎপাদন-প্রান্তিক মজুরির বিশ্লেষণের ছকে এই ধরনের গোষ্ঠীর অবস্থানের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। গোষ্ঠীগত ব্যবহারের এই তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে তাঁরা বললেন, বাজার অর্থনীতি অনুমান করলেও বাস্তবে উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে শ্রম কোনও সমরূপ (হোমোজেনাস) উপাদান নয়, বরং বিভাজিত। এই বিভাজনের উৎস হিসাবে দুটি কারণের পিছনে এই ধারার প্রবক্তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলেন। একদল বললেন, প্রকৌশলের উন্নতি এই বিভাজনের কারণ— তাঁদের বলা হয় বিভাজিত শ্রমের বাজারের প্রবক্তা। অন্য দল বললেন যে, এই বিভাজনের কারণ পুঁজিপতিদের সচেতন প্রয়াস। তাঁদের বলা হয় র‍্যাডিকাল ধারার প্রবক্তা।

শ্রমের বাজারে বিভাজন

শ্রমের বাজারকে মজুরি, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদির ভিত্তিতে দুটি স্পষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়। এই বিভাজনকে কেউ বললেন, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক (কার, ১৯৫৪; ডোরিঙ্গার, ১৯৬৭), কেউ বললেন, মুখ্য ও গৌণ (রাইখ, গর্ডন ও এডওয়ার্ডস, ১৯৭৩)। কিন্তু নাম যাই দেওয়া হোক না কেন, বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে তাঁরা মোটামুটি একমত।

মুখ্য ও গৌণ শ্রমের বাজারের বৈশিষ্ট্য

মুখ্য শ্রমের বাজারে শ্রমশক্তির স্থিতিশীলতা একান্ত প্রয়োজন, কাজ করতে করতে প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়, মজুরি বেশি, চাকরির বাজারে কয়েকটি প্রবেশদ্বার আছে এবং প্রত্যেকটি প্রবেশদ্বারে নির্দিষ্ট পদোন্নতির সিঁড়ি আছে। মূলত পুরুষ, শ্বেতাঙ্গ ও অন্যান্য সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানে কাজ করেন।

গৌণ শ্রমের বাজারে স্থিতিশীলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না, মজুরি কম, বিনিয়োগ বা মূলধন অনুপাতে মোট আয় বেশি, পদোন্নতির সুযোগ কম। এগুলিতে মূলত নারী, অল্পবয়সী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা কাজ করেন।

শ্রমের বাজারে নারী-পুরুষ বিভাজনের ক্ষেত্রে বলা যায় কিছু কিছু কাজ মূলত পুরুষদের জন্য, কিছু কিছু কাজ মূলত মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট। যেমন মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষা, নার্সিং, রিসেপশন, টেলিফোন-অপারেটিং, অ্যাসেম্বলি লাইনের কাজ প্রভৃতিতে জড়ো হয়। মেয়েদের কাজগুলিতে সমতুল পুরুষদের কাজের তুলনায় মজুরি কম। যেখানে মূলত 'সেবার মানসিকতা' প্রয়োজন, সেই কাজগুলিতে মেয়েদের আবদ্ধ করে রাখা হয়। অন্য ব্যক্তি,

বিশেষত পুরুষদের প্রতি এই সেবার মানসিকতা প্রদর্শন করতে হয়। পরিবার এবং বিদ্যায়তন এই সেবার মানসিকতাকে আত্মস্থ করতে সহায়তা করে।

বিভাজিত শ্রমের বাজার

প্রচলিত বাজার অর্থনীতি শ্রম তথা শ্রমিককে একটি সমরূপ উপাদান বলে গণ্য করে এসেছে। ফলে তাত্ত্বিকভাবে যে কোনও শ্রমিক অন্য কোনও শ্রমিকের পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর সঙ্গে যে কোনও শ্রমিককে তার দরুন বাড়তি বা প্রান্তিক উৎপাদন এবং তাকে দেয় বাড়তি মজুরির হিসেবের ভিত্তিতে ইচ্ছেমতো কাজে নেওয়া বা ছাঁটাই করা যেতে পারে বলে মনে করা হত। অবশ্য এ-কথা ম্যানেজার প্রভৃতি উচ্চপদের কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তারা সব সময় স্থির উপাদানের মধ্যে পড়ে— যাদের স্বল্প সময়ে ইচ্ছেমতো ছাঁটাই বা নিয়োগ করা যায় না। বিপরীতে, যে উপাদান স্বল্প সময়ে ইচ্ছেমতো বাড়ানো বা কমানো যায়, তাকে অর্থনীতির ভাষায় পরিবর্তনশীল উপাদান বলে। শ্রমকেও (যা শুধু অদক্ষ শ্রমিককে বোঝাতে পারে) পরিবর্তনশীল উপাদান বলে গণ্য করা হত। কিন্তু কারিগরি প্রকৌশলের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের দক্ষতা (বা অন্তত বিশেষ যন্ত্রের প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত) তথা অভিজ্ঞতা জরুরি হয়ে উঠল। সেজন্য ষাটের দশক থেকে শ্রমকে আর পরিবর্তনশীল উপাদান না ধরে আধা-স্থির উপাদান ধরা শুরু হল। কারণ, শ্রমিককে কাজে নিয়োগ বা ছাঁটাই করতে, তাকে বিশেষ যন্ত্র ব্যবহারে প্রশিক্ষণ দিতে নিয়োগকর্তার ব্যয় হচ্ছে। এই বাড়তি ব্যয়ের জন্য শ্রমিককে আর খুশিমতো নিয়োগ বা ছাঁটাই করা চলবে না। বিনিময়ে শ্রমিকদের তরফেও স্থায়িত্ব প্রয়োজন। এভাবে ক্রমশ প্রকৌশলের প্রয়োজনেই স্থিতিশীলতা আবশ্যক হয়ে উঠেছে।

শ্রমিকের কাজ বদলানোর প্রবণতা হ্রাসের জন্য স্থায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্তব্য অন্যান্য সুযোগসুবিধা— যথা বাসস্থান, শিশুদের শিক্ষা-চিকিৎসা, বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হল। পরিবারে পুরুষ অন্যান্যদের খাওয়াবে ধরে নেওয়ায় এই স্থিতিশীল অভ্যন্তরীণ মুখ্য শ্রমের বাজারে মূল উপাদান হল পুরুষশ্রমিক। কারণ, নারী এখনও পারিবারিক দায়িত্ব, সন্তানধারণ ও পালন প্রভৃতির জন্য তার শ্রম জোগানে ছেদ আনে, ফলে তার থেকে প্রয়োজনীয় স্থিতিশীলতা পাওয়া যায় না। লক্ষণীয় এটাই যে, এখানেও কিন্তু পরিবারের মধ্যে ক্ষমতার বিপ্রতীপ সম্পর্ককে 'অপরিবর্তনীয়' এবং নারীর 'স্বেচ্ছাধীনতা' অনুমান করে নিয়েই বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

র‍্যাডিকাল তত্ত্ব: পুঁজিপতিদের সচেতনপ্রয়াস

শুধুমাত্র প্রকৌশলের বিকাশের উপর নির্ভরশীল না রেখে এই ধারা শ্রমবিভাজনের একটা আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট উপস্থিত করল। পুঁজিবাদ এবং কারখানা ব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো যে শিল্প-ভিত্তিক সংগঠন (ট্রেড গিল্ড) ছিল, সেগুলি ভেঙে যাওয়ার ফলে পুরনো সমাজে শিল্প দক্ষতার যে সংজ্ঞা বা পরিচয় ছিল— তা ভেঙে পড়েছিল। কারখানা

ব্যবস্থা শ্রমিকদের পুরনো দক্ষতার পদসোপান (হায়ারার্কি) ভেঙে দিয়ে সমস্ত শ্রমিককে সমান জমিতে টেনে নামাল। এই সমীকরণের (হোমোজেনাইজেশন) প্রক্রিয়ায় শ্রমিকের মধ্যে যে 'আমরা এক, আমাদের স্বার্থ এক' বলে শ্রেণিচেতনা জেগে উঠছিল, তা পুঁজিপতিদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠল।

বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯০৭ সালে রেল ধর্মঘট, ১৯০৯ এবং ১৯১৯ সালে ইস্পাত শিল্পে ধর্মঘট, ১৯০৮ সালে নিউইয়র্কের বস্ত্রশিল্পের নারী-শ্রমিকদের ধর্মঘট, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ও পরে কয়লাখনিতে এবং সমসাময়িক অন্যান্য অনেক ধর্মঘট এঁদের মতে একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে শ্রমের সংঘাতের ফসল। একই সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ও সমাজতান্ত্রিক দলগুলির সাফল্য, নিউ অর্লিনস এবং সিয়াটলে শিল্পভিত্তিক নয়, সাধারণ ধর্মঘট— শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দাবি নয়, বরং রাজনৈতিক দাবিগুলির প্রতি শ্রমিকশ্রেণির আনুগত্যকে স্পষ্ট করে তুলল (রাইখ, গর্ডন ও এডওয়ার্ডস, ১৯৭৩, রুবেরী, ১৯৭৮)। এই অভিন্নতার চেতনাকে আঘাত করতে পুঁজিপতিরা শিল্প-শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজন আনতে সচেতন প্রয়াস নিল। শ্রমের তথা শ্রমিকের বিভাজন তার অন্যতম। এক শ্রেণিকে সুযোগ-সুবিধা দিয়ে কর্মী করে তোলা হল, অন্য দল শ্রমিক হিসাবেই রইল— যাকে ব্লু বনাম হোয়াইট কলার সংস্কৃতির সৃজন বলা যায়। নানা ধরনের বিভাজনের একটি দিক হল নারী-পুরুষ বিভাজন।

এই বিভাজনের সংস্কৃতি একদিকে পুঁজিমালিকদের বিরুদ্ধে সব শ্রমিকদের এককাট্টা হওয়া থেকে বিরত রাখে, অন্যদিকে শ্রমিকের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখে। কারণ এই দেওয়াল কাজের ক্ষেত্রে থেকে শুরু হয়ে জীবনের, সমাজের সর্বস্তরে বিভাজন এনে দেয়। সেই বিভাজন এতই অমোঘ যে ব্লু কলার হোয়াইট কলারে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন পর্যন্ত দেখা বন্ধ করে দেয়। শ্রমের বাজারে বিভাজনের প্রাচীরের এদিক এবং ওদিকের সন্ততিরাও সেই বিভাজনের সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করেই বড় হয়ে ওঠে এবং এই বিভাজন প্রত্যেক প্রজন্মে পুনরুৎপাদিত হতে থাকে (রাইখ, গর্ডন ও এডওয়ার্ডস, ১৯৭৩)। একই বিশ্লেষণ নারী-পুরুষ সম্পর্কেও প্রযোজ্য— ভারতবর্ষে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন স্বপ্না মুখোপাধ্যায় (১৯৮১)।

আপত্তি: শ্রমিক শ্রেণি ও সংগঠনের ভূমিকা

বিভাজিত শ্রমের বাজার বা র‍্যাডিকাল তত্ত্ব উভয়েই পুঁজিপতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভাজনকে দেখছে। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণি এবং তার নিজস্ব সংগঠনেরও এই বিভাজনে নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে— সেটাকে উল্লেখ বা স্বীকার না করলে বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ হয়ে থাকবে, বললেন জিল রুবেরী (১৯৭৮)। তাঁর মতে, বাস্তবে শ্রমিকরা নিজেদের দরাদরির ক্ষমতাকে বাড়ানোর জন্য সংগঠনের মাধ্যমে শ্রমের বাজারে বিভাজনের সৃষ্টি করে। তারাও ওই পদসোপান সংস্কৃতিকে তাদের সম্মানের অংশ বলে মনে করে। রুবেরী বলেছেন যে দীর্ঘকালীন প্রভাবের কথা বিচার করলে শ্রমিক সংগঠন উচ্চ-মজুরি এবং উচ্চ উৎপাদনশীলতাকে বজায় রেখে

পুঁজিপতিদের স্বার্থকেই সহায়তা করে।

শ্রমিক সংগঠন মূলত পুরুষ শ্রমিকদের স্বার্থ দেখেছে কি না তা নিয়ে পশ্চিমি ইতিহাসকাররা অনুসন্ধান শুরু করেছেন। তাঁদের সেই অনুসন্ধান সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, উনিশ শতকের শেষ দিকে শ্রমিক সংগঠনরা, এমনকী সমাজতন্ত্র প্রভাবিতরাও নারীবিরোধী মূল্যবোধের জায়গা থেকে 'সমান কাজে সমান মজুরির' পরিবর্তে 'পুরুষ শ্রমিকদের জন্য পারিবারিক মজুরির' দাবি তুলেছিল। নারীশ্রমিকদের কম মজুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সে জন্য শ্রমিক সংগঠনের একটা সচেতন ভূমিকা আছে এ কথা বলা হয়তো অন্যায় হবে না। কারণ, শ্রমিক সংগঠনগুলিও নারীকে শ্রমিক বাহিনীর নিয়মিত ও সহযোগী অংশ বলে মনে করেনি— বরং প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়েছে। এমনকী ১৯৮৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে চটকলে সাধারণ ধর্মঘটের সময় ২৪টি দাবি সংবলিত সনদটির ২২তম দাবি ছিল 'সমান কাজে সমান মজুরি।'

নীতি বদলাই

তত্ত্ব, বিশ্লেষণ, যাই বলুক না কেন, বাস্তবে মেয়েদের ঘরে-বাইরে কাজ এখনও কমেনি। পরিবারের অসাম্যও অনেকটা মূল্যবোধপ্রসূত। কিন্তু আবার তা চেতন-অচেতন নীতির প্রয়োগেও ঘটে থাকে। সন্তানধারণের জৈবিক বিষয়টা বাদ দিলে বাকি সব কাজই নারী ও পুরুষ সবাইকেই শিখতে হয়, অধ্যয়ন করতে হয়, চর্চা করেই জানতে হয়। কেন এই বিভাজন এতটাই জোরালো, তার নানা যুক্তি ঘোরাফেরা করে। তাই তত্ত্ব আর বিশ্লেষণের সঙ্গে প্রয়োজন সচেতনভাবে নীতির পরিবর্তন। মূল্যবোধের লড়াইটা তো চলবে, কিন্তু সচেতনভাবে নীতি বদলানোর অনেক প্রয়াস শুরু হয়েছে। মূলত তিনটি দিক থেকে এই ধরনের নীতি বদলের প্রচেষ্টা চলছে:

১. **দামনীতিকে প্রভাবিত করা:** দ্রব্য বা পরিষেবার এককপিছু দাম কমলে দেখা গেছে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পুষ্টিতে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের সেই সব দ্রব্য বা পরিষেবার ব্যবহার বাড়ে, অর্থাৎ দাম যাই হোক না কেন ছেলেদের চিকিৎসা হবে, তারা ইস্কুলে যাবে, তারা সাধ্যমতো পুষ্টিকর খাদ্য পাবে। কিন্তু দাম কমলে তবেই পরিবার ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের জন্যেও সে সব পরিষেবা কেনার কথা ভাববে। কিন্তু দাম যে অনুপাতে কমে, তার তুলনায় বেশি অনুপাতে সে সবের ব্যবহার বাড়ে। তা হলে এসব পরিষেবার ব্যবস্থা যদি সস্তায় করা যায়, তা হলে যে অনুপাতে ব্যয় বাড়বে, তার চেয়ে বেশি অনুপাতে মেয়েদের এসব পরিষেবার ব্যবহার বাড়বে। এছাড়া পরিবারের আয় বাড়লেও মেয়েদের জন্য এসব পরিষেবার ব্যবহার বাড়ে না; যখন পরিবারটিতে অর্থের টানাটানি থাকে, তারা ছেলেটির জন্যই খরচ করতে চায়, আয় অনেক বাড়লেই তবে মেয়েদের জন্য খরচ করার কথা ভাবে।

২. **পরিষেবা প্রদানকে উন্নত করা:** স্কুল, স্বাস্থ্য, কৃষি সম্বন্ধে খবরাখবর, ঋণের ব্যবস্থা— এসব পরিষেবা মেয়েদের আরও কাছে নিয়ে যেতে পারলে তারা এসব ব্যবহার

আন্তরিকভাবেই করতে চায়। যেমন কাজের জায়গায় শিশুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে মায়েরা সহজেই সে পরিষেবা নেওয়ার কথা ভাবেন, বাচ্চা রাখার উন্নত ব্যবস্থা করলে বড় মেয়েটিকে স্কুল ছাড়িয়ে পরের বাচ্চাদের দেখতে হয় না, বাড়ির কাছে ইস্কুল হলে মেয়েটি পড়তে পারবে। বন্ধকির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতর পরিবর্তে দলগতভাবে ঋণ দিয়ে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ঋণে একটা দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে।

৩. **পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ:** পরিকাঠামোয় বিনিয়োগে নারী ও পুরুষ সমান ভাবে উপকৃত হবেন ধরে নিলেও সামাজিক শ্রমবিভাজনের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বিশেষভাবে মেয়েদের সহায়তা করে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জল আর জ্বালানির সুব্যবস্থা। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মেয়েদের বছরে প্রায় ৭০০ ঘণ্টা পর্যন্ত বাঁচতে পারে যদি এ দুটি সহজলভ্য হয়। এই দুটির ব্যবস্থা করা পরিবারে মেয়েদের কাজ বলেই ধরে নেওয়া হয়। এই সময়টা বাঁচলে সেই সময়ে শিশুকন্যা আর কিশোরীরা ইস্কুলে যেতে পারে, মেয়েরা অন্য উৎপাদনশীল বা অর্থকরী কাজে তা লাগাতে পারেন, নারীসংগঠন তৈরি করতে পারেন, এমনকী বিশ্রাম, যা কিনা দরিদ্র পরিবারে দুর্লভ, তাতেও ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া শুধুমাত্র শিশুকন্যা, কিশোরী এবং নারীরা পরিবারের যে সব দায়িত্ব বিশেষভাবে নিয়ে থাকেন, সেই সব দ্রব্য ও পরিষেবার যদি সুলভ বিকল্পের ব্যবস্থা করা যায়, তা হলেও মেয়েদের সময় বাঁচবে, যে সময় তাঁরা উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত করতে পারবেন।

নীতি আর গবেষণার পরিধি ছাপিয়ে...

নয়া ধ্রুপদী বা বিভাজিত শ্রমের বাজার— মূলধারার অর্থনীতির যে বিশ্লেষণী কাঠামো থেকেই একজন শ্রমের বাজারে নারী-পুরুষ মজুরি বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান শুরু করুক না কেন, শেষ পর্যন্ত পরিবার, পরিবারে নারী-পুরুষের বিপ্রতীপ সম্পর্ক, প্রভুত্ব-দাসত্বের, স্বনির্ভর-নির্ভরশীলের মূল্যবোধের প্রাত্যহিক আত্তীকরণ এবং পুনরুৎপাদন— এগুলিকে বিশ্লেষণে না আনলে শুধুমাত্র অর্থনীতির আঙিনা থেকে কখনওই উত্তর পাওয়া যাবে না।

শেষ করি মার্কস দিয়ে। মার্কস-এঙ্গেলস আমাদের মেয়েদের হয়ে অনেক কথা বলেও শেষ পর্যন্ত পুরুষশাসিত মূল্যবোধের অদৃশ্য গণ্ডিতে বাধা পড়েছিলেন। তাই তাঁদের স্বপ্নের সমতাও ছিল খণ্ডিত সমতা। তবে তাঁরা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ সম্বন্ধে মানবিক জীবনচর্যার যে মাপকাঠিটির কথা বলেছিলেন— সেটি হয়তো আমাদের আকাঙ্ক্ষিত। সেই মাপকাঠিটি বলে মজুরির শ্রমই তো দাসত্ব। শুধুমাত্র শ্রমের মজুরির সমতাই কি আমাদের কাম্য? সে তো হবে শৃঙ্খলের সাম্য, বন্ধনের সাম্য। না কি সেই সাম্যের দাবি থেকে শুরু করে তারও পরে, মজুরিদাসত্বহীন এক সমাজ আমাদের স্বপ্ন হওয়া উচিত? শুধুমাত্র অন্নসংস্থানের জন্য মজুরিশ্রম নয়, সেই সমাজে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ কাজ করবে নিজের ভাললাগা অনুযায়ী। হয়তো সেটাও এক কল্পস্বর্গ। কিন্তু স্বপ্নই যদি দেখি— তাকে সীমায়িত করব কেন?

জয়া মিত্র

পরিবেশ ও নারী
লাউফুল ও টিকে থাকার সাহস

আসানসোল থেকে কলকাতা আসবার বাস রাস্তায় শক্তিগড়ের একটু আগে রেললাইন ও বাসরাস্তা বেশ কাছাকাছি চলে আসে। দুই পাশে সেই দুই উঁচু জমির মাঝখানে যে খাঁজ, চোখে পড়ল তার মধ্যে একমুঠো কুঁড়েঘর। হয়তো কুড়ি বাইশটা। খড়ের দেওয়াল, মাটির চাল, বাঁশ কি কঞ্চির বেড়া দেওয়া। স্পষ্টতই এই বাইপাস রাস্তার ধাক্কায় ভেঙে যাওয়া কোনও গ্রামের কয়েকজন মানুষের ভেসে যাওয়ার আগে শেষবার আঁকড়ে ধরা ক'টি খড়কুটো। হয়তো এক দু'-টুকরো জমি আছে আশপাশে কোথাও। কিন্তু পৌষমাসের এই শুকনো ঠাণ্ডাতেও ঘরকটির কেমন সরস সবুজ চেহারা। ঘরের চালে লাউলতা সাদা ফুলে ভরা। চারপাশের ছোট ঘেরাগুলির মধ্যে সবুজ শাকপাতা। দু'-একটিতে এমনকী গাঁদা ফুলের আলো ফুটেছে। এখানে কোথায় জলের সংস্থান! দু'পাশে অহর্নিশি ভয়ংকর শব্দ ও দ্রুতিময় যানবাহন, হাজার জোড়া কৌতূহলী চোখের সামনে এই বেআব্রু মাঠে কোথায় বা 'মাঠ ফিরতে' যাবার জায়গা, কোথায় পুকুর কি মাঠের জলধারা। অথচ তারই মাঝখানে লতাপাতা ঘেরা এই গৃহস্থালি প্রতিষ্ঠা করেছেন ঘরের লক্ষ্মীরা, 'নারী ও পরিবেশ' বিষয়ে কথা শুরু করার এর চেয়ে স্পষ্ট কোনও প্রসঙ্গ আমি এই মুহূর্তে খুঁজে পাচ্ছি না।

'পরিবেশ' বলে ইদানীংকার এই বহু প্রচলিত শব্দটি চর্চায় এসেছে খুব সাম্প্রতিকে। আগে বলা হত প্রকৃতি। এই যেমন জল বাতাস মাটি গাছপালা ইত্যাদি। এই প্রকৃতির সঙ্গে পৃথিবীর মূল সম্পর্ক তার অস্তিত্ব। মানুষ নামে প্রজাতিটি তৈরি হয়েছে প্রকৃতির বিবর্তনে। সে বেঁচেও থাকে তারই মধ্যে— ওই জল বাতাস মাটি গাছপালা অন্য প্রাণিকুল। মানুষের যত জীবিকা, সবগুলিরই মূলগত উপাদান আসে প্রকৃতি থেকে। যে কারণে নীহাররঞ্জন রায় প্রাকৃতিক উপাদানকে বললেন 'প্রাকৃতিক ধনসম্বল'। প্রাকৃতিক সেই ধনসম্বলকে কোনও-না-কোনও ভাবে ব্যবহার করে মানুষ উৎপাদন করে। উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের এই যে সম্পর্ক একেই হয়তো বলা যায় মানুষের পরিবেশ। এই সম্পর্ক, প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মগুলির মতোই অতি জটিল, সূক্ষ্ম ও পরস্পরের সঙ্গে গভীর ভাবে

জড়ানো। মানবসৃষ্টির খুব প্রথম থেকে, যখন মানুষ প্রথম নিজের উদ্যোগে খাদ্য উৎপাদন, আগুন জ্বালা— এইসব ভাবে প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে পরিবর্তিত করতে শুরু করেছে তখন থেকেই, মানুষ ও প্রকৃতির এই পারস্পরিক সম্পর্ক। এই সম্পর্ক যখন থেকে পীড়াদায়ক হয়ে উঠল, বলা যায় তখন থেকেই প্রকৃতি ছেড়ে 'পরিবেশ' নিয়ে মানুষ মাথা ঘামাচ্ছে। বহু মানুষ চিন্তিত হয়ে উঠছেন। সরকার ও সরকারের পরামর্শদাতারা অনেক আলোচনাসভা, বইলেখা ইত্যাদির ব্যবস্থা করছেন। আগে গাছকাটা বা বন্যা কিংবা ধস হওয়ার যে সব সমস্যা গ্রামের লোকেরা নিজেরা সামলে নিতে পারতেন এখন সে সব সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য পৃথিবীর নানা দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ বৈঠক ডাকতে হয়। স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত 'পরিবেশ' নামে একটি বিষয় পাঠ্যতালিকায় ঢুকেছে। ছোটরা পরীক্ষায় নম্বর পাবার জন্য পরিবেশ-এর টিউটর রাখছে কিংবা পরীক্ষায় টুকলি করছে। বড়রা পরিবেশে ডক্টরেট পাচ্ছেন। কিন্তু নতুন নতুন চেকপোস্ট বসালে যেমন মেয়ে চালান বন্ধ হবে না তেমনই...। যতদিন মানুষ সহজে নিশ্বাস নিতে পারে ততদিন কেউ অক্সিজেন নিয়ে মাথা ঘামায় না। শ্বাসকষ্ট হলে তখনই কেবল অক্সিজেন সিলিন্ডারের খোঁজ পড়ে। পরিবেশ নিয়ে এত ভাবনাচিন্তাই একটা প্রমাণ যে প্রকৃতি আর মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের অবস্থা ভাল নয়।

মানুষের বিশেষ প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা তার ভাবনা, বিশ্লেষণ ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিজস্ব উৎপাদন করার বুদ্ধি ও প্রয়োগকৌশল। এই শক্তিবলে এক সময়ে মানুষ নিজেকে প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে বোঝা বন্ধ করেছে। নিজেকে সে ভাবতে শুরু করেছে প্রকৃতির কেন্দ্র, এমনকী প্রকৃতির মালিক বা প্রভু। প্রকৃতিকে 'জয় করা'র মধ্যে দিয়ে মানুষের সভ্যতার অগ্রগতি হবে— এ রকম ভেবেছে। ঠিক যেই ভাবে নারীর শরীর থেকে জন্ম নিয়েও পুরুষতন্ত্র নারীকে মনে করে বিজিত বা অধীনস্থ।

প্রাকৃতিক উপাদানগুলির অল্পবিস্তর পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষ নিজের জীবনযাপনের প্রয়োজন সাধন করেছে। নানা রকম ভাবে উৎপাদন করেছে। এই উৎপাদনের ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের পুরনো। গত দু'-তিনশো বছরে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এক অন্য ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়া। উৎপাদনের সঙ্গে প্রাকৃতিক উপাদানের এই নতুন সম্পর্কের ফলে প্রকৃতি অতি দ্রুত ভয়ংকর ভাবে ক্ষয়িত হয়ে চলেছে। মানুষ, অন্যান্য প্রাণসম্পদ এমনকী স্বয়ং পৃথিবীরই অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছে। উৎপাদনের এই দুটি ধরনের মধ্যেই হয়তো নিহিত রয়েছে পরিবেশের ও সমাজের সংকটের মূল জায়গাটি। খুব মোটা কথায় এই দুই উৎপাদনের ধরনকে বর্ণনা করা যায় এভাবে,

১. প্রকৃতির নিয়মগুলিকে লক্ষ করে, জেনে, সেই নিয়মগুলিকে মান্য করে প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করা, উৎপাদন করা। এই পদ্ধতি বহুদিন ধরে বহু মানুষ অভ্যাস করে এসেছে।

২. তার নিয়ম কিছুটা জেনে 'আমি পারি' জাতীয় অহংকার থেকে সেই মূল নিয়মগুলিকে পরিবর্তনের চেষ্টা করে উৎপাদন করা। দ্বিতীয়টির জন্য আমরা দেখেছি, বৃহৎ সংগঠন ও বলের প্রয়োজন হয়।

যেহেতু মানুষের সমস্ত রকম উৎপাদনের মধ্যে কৃষিই এখনও বৃহত্তম এবং ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেশি মানুষ কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত, এই দেশ সভ্যতার ইতিহাসে কৃষি সভ্যতার অতি প্রাচীন ভূমি বলে গুরুত্ব পায়, কৃষিকেই আমরা সংক্ষিপ্ত উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করে দেখি।

এ দেশের বিচিত্র ভূমিচরিত্র সূর্যতাপ বৃষ্টিপাত জমির উচ্চাবচতা ও উদ্ভিদবৈচিত্র্যের মতো প্রাকৃতিক বিভিন্নতার ওপর নির্ভর করে কৃষিকাজ হত। সর্বভারতীয় কৃষি বলে কিছু ছিল না, কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে প্রতিটি এলাকার ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থা অনুযায়ী সেখানকার মানুষরা নিজেদের কৃষিপদ্ধতি তৈরি করেছিলেন। সেই কৃষিচক্রনির্ভর, প্রাকৃতিক উপাদানসাপেক্ষ জীবনযাপনের ধরন এই বিরাট দেশের জীবনের বৈচিত্র্য তৈরি করেছিল। তার মধ্যে সচেতন গবেষণা ছিল, বাছাই ছিল। হাজার হাজার রকম বীজের মধ্যে কোনগুলো ব্যবহার করা হবে, মাটি প্রস্তুত হবে কেমন করে, কতটা সেচ দরকার, কীভাবে তা করা যাবে— এর প্রতিটি বিষয় নিয়ে ভাবনা প্রয়োগ জ্ঞানলাভ আবার প্রয়োগ— এই পদ্ধতি চলে এসেছে ক্রমাগত। আদিম কৃষি যে অবস্থায় ছিল বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত, দেশীয় কৃষি যে সেখানেই অপরিবর্তিত আছে এরকম নয়। অভিজ্ঞতা ও পরিবর্তিত বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী তার মধ্যে বহু পরিবর্তন হয়েছে। এই কৃষির মূল জায়গা ছিল খাদ্য সংস্থান।

উৎপাদনের দ্বিতীয় পদ্ধতির মূলমন্ত্র হল অধিক উৎপাদন। সেই অত্যধিক বা বৃহৎ উৎপাদনের উপায় আবিষ্কার ও প্রয়োগই নতুন উৎপাদন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। যেহেতু প্রকৃতিই কৃষি উৎপাদনের উপাদান, অত্যধিক উৎপাদনের ফলে তা দ্রুত ক্ষয় হতে হতে নষ্ট হতে থাকে। এই উৎপাদনের মূল চালিকাশক্তি হল উদ্বৃত্ত তৈরি করা। বাজারের জন্য উৎপাদন। পুঁজি তৈরির জন্য উৎপাদন। সেই পুঁজি রাষ্ট্র তৈরি করুক কি কর্পোরেট, প্রকৃতি একই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রকৃতির উপাদানগুলি খরচ করা হয় ভারসাম্য না মেনে এবং প্রাকৃতিক সময়চক্রকেও লঙ্ঘন করে। অধিক উৎপাদন করতে হলে দ্রুত উৎপাদন একটি আবশ্যিক শর্ত। বৃহৎ কৃষি উৎপাদনের জন্য দরকার বৃহৎ ব্যবস্থার ও যন্ত্রের। যন্ত্র অর্থে কেবল বাঁধ, পাওয়ার প্রজেক্ট, কলকারখানাই নয়, প্রচুর উৎপাদনের জন্য মাটিতে যে কৃত্রিম সার দেওয়া হয়, উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের সঙ্গে মিলেমিশে যে শস্য উৎপাদন তার বদলে অন্যান্য সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী ধ্বংস করে নিজের প্রয়োজনীয় ফসলটি তুলে আনবার জন্য ব্যবহৃত কীটনাশক, উদ্ভিদনাশকও আসলে যন্ত্রই। এই পদ্ধতিতে উৎপাদনের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত অর্থাৎ সম্পত্তি তৈরি হয়। সম্পত্তির কেন্দ্রীকরণই ক্ষমতা। এইভাবে সম্পদ রূপান্তরিত হয় সম্পত্তিতে। যত বেশি কেন্দ্রীকরণ তত বড় ক্ষমতা।

এই যে বৃহৎ ব্যবস্থা থেকে বৃহৎ উৎপাদন, এই বৃহৎ ব্যবস্থাটি তৈরি করা ও সচল রাখার জন্য দরকার আরও অর্থ এবং আরও ক্ষমতা। বৃহৎ পরিকাঠামোর যে কোনও উৎপাদনকে, কিংবা ব্যবস্থাকে চালিয়ে যাওয়া তখনই লাভদায়ক যখন তা বেশি ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ ভিন্নতাবিহীন এক রকম ব্যবস্থা বা উৎপাদনই ক্ষমতার পক্ষে সুবিধাজনক। এটা তখন আর

কেবল উৎপাদন পদ্ধতির প্রশ্ন থাকে না। সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি জীবন পদ্ধতি, দর্শন ও সংস্কৃতির প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। 'বৃহৎ' ক্রমশ পরিবর্তিত হয় এক নিঃসপত্ন 'একমাত্র'তে। তদনুযায়ী তৈরি হয় এক 'একমাত্র ভাল'র সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি, এই ব্যবস্থারই নাম 'পিতৃতন্ত্র'। প্যাট্রিয়ার্কি। যেখানে একটিমাত্র ক্ষমতাকেন্দ্র সমগ্র উৎপাদন বণ্টন ব্যবস্থা পরিচালনা করে।

যে কোনও ব্যবস্থাই তৈরি করে নিজের মতো এক সংস্কৃতি। পিতৃতন্ত্রও তার ব্যতিক্রম নয়। বহু-র, বিবিধের-অধিকারকে লঙ্ঘন করে এককেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করা— এটাই পিতৃতন্ত্রের নিয়ম। সুতরাং সে চায় রেজিমেন্টেশান। বৈচিত্র্যবিহীন একরৈখিকতা। মানুষের প্রকৃতিদত্ত যে প্রধান বৈশিষ্ট্য— তার ভাববার, ভালমন্দ নির্বাচন করার, অভিজ্ঞতার সার গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নেবার যে ক্ষমতা পিতৃতন্ত্র তার 'একমাত্র' বা 'মূলস্রোত' দিয়ে সেই বৈশিষ্ট্যের পথ রোধ করে। এই কর্তৃত্ব বা দখলে রাখাই পিতৃতন্ত্রের স্বভাব। পিতৃতন্ত্রের মূল সমস্যা প্রকৃতপক্ষে নারী-পুরুষের সমস্যা নয়, অন্যের ওপর আধিপত্যবিস্তার প্রচেষ্টার সমস্যা। সেই 'অন্য' নারী হতে পারে, দুর্বলতর পুরুষ হতে পারে, প্রকৃতি হতে পারে।

এই ব্যবস্থার মধ্যে তা হলে মেয়েদের বিশেষ জায়গাটি কোথায়? ওপরের আলোচনায় যে উৎপাদন ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল, কৃষির ক্ষেত্রে যাকে বলা যায় 'সুস্থায়ী কৃষি' তাতে প্রাকৃতিক উপাদানের ব্যবহার অনেক বেশি করে সমাজের নিজেদের হাতে থাকে। ব্যবহার করার ধরন হয় পরিমিত ও স্থায়িত্বশীল। জল-জমি-জঙ্গলের কাছাকাছি থাকবার দরুন সেই সমাজ পরিবেশের ক্ষতি সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন থাকে। তার রীতি-সংস্কৃতি আচার-নিয়ম অনেকখানি স্বাভাবিক ভাবেই প্রকৃতির সংরক্ষণ করে।

সেই সংস্কৃতিকে নতুন করে সচেতনভাবে বোঝা, বিশ্লেষণ করা ও গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে পিতৃতন্ত্র বা বাজারের বিপরীত সংস্কৃতি তৈরি হয়ে ওঠে।

সমাজসভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে মেয়েরা অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থেকেছে। কৃষি, যা কিনা আসলে ইপ্সিত খাদ্য বাড়ানোর উপায়, তার আবিষ্কার ও চর্চার সঙ্গে মেয়েরা জড়িত। নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে, পরিশ্রম দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে যারা প্রথম প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছিল তাদের মধ্যে প্রধান অংশ মেয়েরা। শারীরিক কারণে মেয়েরা এক একটি দীর্ঘ সময় এক জায়গায় থাকতে বাধ্য হত। সেই অবসরের নিরীক্ষণ ও অভিজ্ঞতাই হয়তো মেয়েদের এই কাজে সাহায্য করে। ধারাবাহিক নিরীক্ষণ ও পরীক্ষার ফলে মেয়েরা উদ্ভিতজাত খাদ্যের রহস্য ধীরে ধীরে ভাঙতে সমর্থ হয়।

ইতিহাস যেহেতু ক্ষমতার পক্ষ থেকে, পিতৃতন্ত্রের পক্ষ থেকেই লেখা হয়েছে তাই তা রয়ে গেছে his story, তাতে her-এর জায়গা কিছু নেই। সেখানে রাজা ও ধনিক শ্রেণির উপনিবেশ বিস্তারের জন্য সুন্দর ও বিচিত্র সভ্যতার মানুষদের নির্বিচার নৃশংস হত্যা, অত্যাচার, প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করার গৌরবময় নাম আমেরিকা আবিষ্কার, ভারতবর্ষ আবিষ্কার। অথচ অনেক রকম ঘাসবীজ থেকে বেছে নিয়ে কয়েকটিকে খোসা ছাড়িয়ে জলে সিদ্ধ করে নিলে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ডালভাত হয়, এই জ্ঞানটিকে কখনও আবিষ্কারের মর্যাদা

দেওয়া হয়নি। যত অবলীলায় আজ সারা পৃথিবী সামনে খাবারের থালাটি পায়, তার পিছনে লক্ষ করা, খোঁজা, পরীক্ষা করে দেখা, প্রয়োগ করার দীর্ঘ দীর্ঘ ইতিহাস— নিশ্চয়ই সেই ইতিহাসে অসম্ভব পরিশ্রম ছিল, অসুস্থ হয়ে পড়া, ডাইনি চিহ্নিত হওয়া, পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে মৃত্যুও ছিল, সে সব রয়ে গিয়েছে অ-সম্মানিত অস্বীকৃত অন্ধকারে।

নবজাতক থেকে পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির, পরিবারের, সমাজের জীবনধারণের যে ভিতরের দিক তা মেয়েরাই সামলেছে। বাধ্য হয়ে হোক বা স্বইচ্ছায়, সামলেছে যে তা অস্বীকার হওয়ার নয়। ফলে সেইখানে বঞ্চনা, অভাবের বিপদ ঘটলে স্বভাবতই সবচেয়ে আগে মেয়েরাই প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করে। পরিবেশ রক্ষা, তা সে গাছ বাঁচানোই হোক বা নদী কিংবা কৃষিব্যবস্থা, সরাসরি আন্দোলনে যোগ দিয়েছে বারে বারে বিপুল সংখ্যায় মেয়েরা। প্রায় চারশো বছর আগে তৎকালীন যোধপুর রাজের একটি তাম্রশাসনে আমরা পাচ্ছি খেজরালি গ্রামের অমৃতা দেবীর নাম। রাজার লোকেরা দুপুরবেলা ফাঁকা গ্রামে ঢুকে খেজড়ি গাছ কাটতে শুরু করলে অমৃতা দেবী নিজের বাচ্চাদের খেতে দেওয়ার কাজ ফেলে তাদের বাধা দিতে ছুটে যায়। 'খেজড়ি গাছরা আমার ভাই। এদের কাটতে দেব না' বলে গাছকে জড়িয়ে ধরে। রাজপুরুষদের উদ্ধত অস্ত্রের মুখে প্রাণ দেয় সে। তার তিন কন্যা। ক্রমে ক্রমে জড়ো হওয়া গ্রামের আরও তিনশো লোক। সেই আত্মদানের ফলে বন্ধ হয় রাজস্থানে খেজড়ি গাছ কাটা। বিশ্‌নই সম্প্রদায়ের সেই ঐতিহ্য আজও গাছদের রক্ষা করে।

গাড়োয়ালে সত্তর-আশির যে 'চিপ্‌কো' (জড়িয়ে ধরো) আন্দোলন টিহ্‌রি অঞ্চলের নির্ভীক মেয়েরা শুরু করেন, এ দেশের সংস্কৃতিতে তার প্রাচীন শিকড় ছিল। কোনও বৌদ্ধিক জায়গা থেকে নয়, মেয়েরা অরণ্য রক্ষার কাজে বারে বারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তাঁদের সেই জীবনযাপন জীবনধারণের স্বাভাবিক বোধ থেকে। জঙ্গল না থাকলে জঙ্গলের কাছাকাছির মানুষরা বাঁচতে পারবেন না। এই বোধের জায়গায়, এই বোধির জায়গায় একই ভাষায় কথা বলেন ১৮৫৬ সালের আমেরিকার সিয়াটল জনগোষ্ঠীর প্রধান: "আমরা তো এ পৃথিবীর মাটি, এই নদী অরণ্য কিছু তৈরি করিনি, তবে আমি একে বেচব কী করে! তোমরাই বা একে কিনবে কেমন করে?" আর ২০০০ সালে ওড়িশার কাশীপুর অঞ্চলে বক্সাইট খনি তৈরির প্রতিরোধ আন্দোলনের নেত্রী মুক্তা ঝোড়িয়া: "এই মাটি, জঙ্গল, আকাশ, এসব আমরা বানাইনি। ভগবান এইসব তৈরি করে শেষে মানুষকে বানাল। মানুষ শুধু রাখোয়াল। আমরা বেচাকেনার মালিক নই। তবে তোমরা কী করে এই আকাশ মাটি জঙ্গল কিনতে, দখল করতে চাও? আমরা তোমাদের এই সব কথা বুঝতে পারি না।" কেরালার আদিবাসী জনজাতির মেয়ে সি কে জানু তার আত্মকথায় বলছে, "জঙ্গল আমাদের মায়ের মতো। মায়ের চেয়েও বেশি। জঙ্গলে থাকলে খিদে কেমন আমরা জানতে পারতাম না।" ২০০৩ সাল। আর ওই একই সময়ে একই কথার সত্যতা বিপরীত দিক থেকে যাচাই হতে দেখি আমরা মেদিনীপুরের জঙ্গল ঘেঁষা গ্রাম আমলাশোলে। আমঝর্নায়। বাঁকুড়ার রানিবাঁধে। জঙ্গলে ঢুকলে গ্রামের লোককে 'মাওবাদী' বলে ধরছিল পুলিশ, সিআরপিএফ। প্রায় ১০-১২ বছর ধরে। মার খাচ্ছিল, ধর্ষিত হচ্ছিল জঙ্গলে যাওয়া মেয়েপুরুষ। একটু

একটু করে এই গ্রামের একান্ত জঙ্গলনির্ভর সংসারগুলিতে শুধু জ্বালানি নয়, নিজেদের খাদ্য বনজ ফল শাক কন্দ ইত্যাদির জোগানও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলত আমলাশোল। তিল তিল করে যন্ত্রণাদায়ক অনাহার মৃত্যু। এই ধ্বংস ঠেকাবার জন্য মেয়েরা যে বারে বারে নানা জায়গায় নানা রকম ভাবে জঙ্গল, তার জমি, জল রক্ষার জন্য আন্দোলন করবে এটাই মনে হয় সবচেয়ে স্বাভাবিক। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ মেয়েদের সাধারণত ঘরের মধ্যে আটকে রাখে অথবা একটানা শ্রম করে যাওয়ার ক্ষেত্রগুলিতে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বা অধিকার তাদের থাকে না। কিন্তু সেই ব্যবস্থাটি কৃত্রিম। ক্ষমতার ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কাঠামোর শাসন। যখনই সংকট দেখা দেয়, একটি ছোট বা বড় জনগোষ্ঠী সরাসরি অস্তিত্বের সংকটে পড়ে, বারে বারে দেখা গিয়েছে সামাজিক অনুশাসনের সেই কৃত্রিম শক্ত খোলাটি ভেঙে মেয়েরা প্রতিরোধের উজ্জ্বলতায় এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েরা ও অসুবিধেজনক জায়গায় থাকা পুরুষরাও।

বিহারের ভাগলপুরের কাছাকাছি কহলগাঁও থেকে পীরপৈঁতি পর্যন্ত গঙ্গায় মাছ ধরতে হলে ঠিকাদারকে খাজনা দিতে হত জেলেদের। অগ্রিম দাদন নিয়ে মাছ ধরে সে টাকা শোধ করে যেতে হত। অত্যন্ত দুর্দশায় থাকতেন জেলেরা। যথেষ্ট মাছ পাবার জন্য নৌকো নিয়ে পাটনা থেকে কাকদ্বীপ সাগর পর্যন্তও যাতায়াত ছিল। ১৯৭১-৭২ থেকে, ফারাক্কা বাঁধের কারণে একদিকে সেই যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল অন্য দিকে বর্ষার মুখে ইলিশ চিতল মহাশোল ইত্যাদি দামি মাছের উজানে যাবার পথও গেল বন্ধ হয়ে। যে প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার ওপর নির্ভর করে এই জীবনধারণ পদ্ধতি চলে আসছিল সেইখানে আঘাত লাগার দরুন এই কয়েক হাজার মানুষের অস্তিত্ব বিপদের মুখে পড়ে। ত্রিশ বছরের মধ্যে আরও লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন এবং শেষ পর্যন্ত স্বয়ং নদীটিরও অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়েছে। ১৯৮২ সালে কহলগাঁওয়ের তিনটি ছোট জেলেগ্রাম থেকে খাজনা না দেওয়ার যে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয় তা চলে দশ বছর। ১৯৯১ সালে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন যে, বিহারের কোনও জলাশয় থেকে মাছ ধরবার জন্য কাউকে খাজনা দিতে হবে না। এই দীর্ঘকাল ব্যাপী লড়াইয়ে সেই নিরক্ষরপ্রায় হতদরিদ্র গ্রামীণ মানুষদের মূল দাবি ছিল গঙ্গাকে মুক্ত করে দেওয়া। গঙ্গামুক্তি আন্দোলন নামেই আজও এই আন্দোলন পরিচিত। 'গঙ্গা কো অবিরল বহনে দো' (গঙ্গাকে বাধাহীন বয়ে যেতে দাও) এই ছিল শেষ পর্যন্ত দু'-আড়াই লক্ষে পৌঁছনো মানুষের এই আন্দোলনের মূল স্লোগান। গঙ্গামুক্তি আন্দোলনের মেরুদণ্ড ছিলেন জেলে মেয়েরা। প্রতিদিন প্রতিটি ঘটনায় ঘরে কি ঘরের বাইরে লড়েছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁরা। খালি পায়ে ঝোপঝাড় ভেঙে গঙ্গার পাড় ধরে তিন কিলোমিটার ছুটে গিয়ে আগে বেরিয়ে যাওয়া নৌকোকে লুকিয়ে থাকা ঠিকাদারের গুন্ডার খবর দিয়ে আসা থেকে শুরু করে নৌকো নিয়ে বাচ্চা কোলে নদী পার হয়ে এলাকার ত্রাস মাফিয়ার বাড়ি ঘিরে বসে থাকা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে মেয়েদের নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ পরিবারের হতাশ পুরুষদের মনোবল বাড়িয়েছিল। আন্দোলন খানিকটা এগিয়ে যাবার পর বহুবার এ রকম ঘটনা ঘটেছে যে কোনও কর্মীকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেলে মেয়েরা নিজেরাই সংগঠিত হয়ে

থানা ঘেরাও, অবস্থান ইত্যাদি করতে চলে যেতেন। প্রায় সবক্ষেত্রেই তারা পুলিশের হাত থেকে নিজেদের লোককে উদ্ধার করে আনতেন। এ রকম করতে গিয়ে একাধিক বার কেউ কেউ গ্রেফতারও হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে পরিবারের পুরুষের অনুমতি নেবার কোনও প্রশ্ন উঠত না।

একই ইতিহাস ১৯৭৯ থেকে শুরু হওয়া বোধগয়া আন্দোলনের। আশপাশের আঠেরোটি গ্রামের কোনও মানুষের এক কাঠা জমি ছিল না, সব জমির মালিক ছিল গয়া মন্দিরের মোহান্ত পরিবার। জমির মালিকানা ফিরিয়ে দেওয়া, চাষের ফসল কৃষকের ঘরে তোলা ও সামাজিক সাম্যের দাবিতে এই অঞ্চলে জোরালো আন্দোলন হয় সত্তরের দশকের শেষ দিকে। টানা দশ বছর চলে এই লড়াইও— জমির সঙ্গে ফসলের সঙ্গে কৃষকের সহজ প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনের দাবিতে। বোধগয়া আন্দোলন বিখ্যাত হয়ে রইল সেখানকার মেয়েদের ভূমিকার জন্য। বিহারের তৎকালীন প্রশাসন ও পুলিশের কাছে একটি ভীতিপ্রদ শব্দ হয়ে উঠেছিল 'বোধগয়া উইমেন'। এই প্রায় দশ বছর মহান্তর জমি চাষ করেননি গ্রামবাসীরা। চাষ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে অর্ধাহার ও অনাহারের ভবিষ্যৎ মেনেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সহজেই বোঝা যায় এই প্রতিরোধ শুরু হতে পারত না মেয়েদের সক্রিয় সিদ্ধান্ত ছাড়া। প্রশাসন ও পুলিশ কোনও আক্রমণের ভয়ে ভীত ছিল না বোধগয়া আন্দোলনের মেয়েদের দিক থেকে। ভয় ছিল তার চেয়ে অনেক গভীর অনেক দুর্বোধ্য বিষয়ে— বোধগয়া অঞ্চলের কৃষক মেয়েরা, মায়েরা আর ভয় পাচ্ছিলেন না শক্তিকে। কোনও শক্তিকে— পুলিশকে না, রাষ্ট্রকে না, দেবমন্দিরের ঠিকাদারকেও নয়। 'বৈসে ভী তো ভুখে মরব', কত আর রোজ রোজ বাচ্চাকে ঘরের লোককে ধুঁকে ধুঁকে মরতে দেখব তার চেয়ে এক বার আন্দোলন করে না হয় মরি। একটা নাম তো রয়ে যাবে— বলছিলেন তারা। এই অভয়াদের সামনে পিছু হঠতে হয়েছিল ক্ষমতাকে। দশ বছর পর ১৯৯০-এ সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সমস্ত চাষজমির মালিকানা পান সংশ্লিষ্ট কৃষকরা। আর সেই বিজয়ের সময়েও মেয়েদের নিজস্ব স্বভাবে কিছু জমির ফসল মহান্ত পরিবারের নামে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। "ওদেরও তো খেতে হবে। ওরা কোনও দিনও চাষ করেনি, চাষ করতে জানেও না কিন্তু ওদের বালবাচ্চা ভুখা থাকুক তা তো আমরা চাই না।" মেয়েদের এই মত মেনে নেয় আন্দোলন।

মেয়েরা যখন ক্ষমতার সঙ্গে লড়েন তাঁদের স্বকীয় ধরনে, সর্বদাই সামাজিক ভাবে, তখন তারা সামাজিক ভাবে, নিজেদের নিত্যদিনের সমাজের মধ্যেও একটা ভিন্নমাত্রার স্বীকৃতি, সম্মান পান। এই রকমের আন্দোলনে প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবেশে এক ধরনের সুস্থতা দেখা দেয়। মাতলামি, বউকে মারা ইত্যাদি বন্ধ হয়ে আসে। উৎপাদন-বন্টন বিষয়ে, নিজেদের সংস্কৃতি বিষয়ে অনেক নতুন চিন্তা তৈরি হয়। যেমন, গঙ্গামুক্তি আন্দোলনের সফলতার পর যে গঙ্গামুক্তি কার্যপরিচালন সমিতি হয় সেখানে প্রতিটি পদে একজন করে পুরুষ ও একজন করে মহিলা নির্বাচিত হন। কিন্তু কোষাধ্যক্ষ দুজনই মহিলা। 'মর্দলোক ফিজুলখর্চী বহুত হতে হ্যয়' (পুরুষমানুষেরা বড্ড বাজে খরচ করে) এই যুক্তি মেনেও নিয়েছিলেন সবাই। হ্যাঁ, পুরুষরাও। এক সময়ে

অন্যদের সঙ্গে কথা বলার অপরাধে, সময়ে খাবার না দেবার অপরাধে, নিতান্ত কেবল মেহরারু (মেয়েছেলে) বলে যারা বউকে পাড়া জানিয়ে মারধোর করতেন।

মেয়েদের স্বকীয় ধরন, তাদের লড়াইয়ের নিজস্ব মুদ্রার প্রসঙ্গে একটা বিশেষতার কথা বলা যায়। সেইসব ক্ষেত্রে আন্দোলনের মধ্যে, প্রতিরোধের মধ্যে কোথাও কোথাও এক রকম মেয়েলিপনার চিহ্ন রয়ে যায়। মেয়েলিপনা অর্থাৎ একটি মেয়ের যে স্বাভাবিক ভঙ্গি, স্বকীয়তা— যা দিয়ে সে 'মেনস্ট্রিম' থেকে ভিন্ন, তাকে আমি কোনও হীন শব্দ বলে বিশ্বাস করি না। সমাজে, পৃথিবীতে প্রত্যেক জনের ভিন্নতাকে সসম্মানে স্বীকার করে নেওয়া, যদি সেই ভিন্নতা অন্যের ভিন্নতাকে আঘাত না করে, যদি 'সভ্যতা'র আদর্শ চেহারা হয় তা হলে একজন বা অনেকজন মেয়ের নিজস্ব ধরনধারণ, স্বভাববৈশিষ্ট্যকে হীন হিসাবে দেখা হবে কেন? কোনও শব্দের সঙ্গে যদি কোনও শোষণ বা লাঞ্ছনার বাচ্যার্থ জড়িয়ে গিয়ে থাকে তা হলে তা সেই অর্থের সমস্যা, শব্দটির নয়। যে ব্যবস্থা ওই বাচ্যার্থ যোগ করেছে সমস্যা তার। তার বদল করতে হবে। ঠিক যেমন একজন শহুরে মানুষের প্রকাশভঙ্গি একজন অরণ্যবাসীর থেকে ভিন্ন, সে রকমই মেয়েদের প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন হতেই পারে। হওয়াই স্বাভাবিক। চিপ্‌কো আন্দোলনের মেয়েরা যেমন রাতারাতি ছুটে গিয়ে টিহরি বাঁধ অঞ্চলে আন্দোলনে ব্যস্ত থাকা গ্রামের বাকি লোকদের খবর দেন তাড়াতাড়ি গ্রামে ফিরে আসবার জন্য, যেমন জঙ্গল কাটতে আসা ঠিকাদারদের গাড়ি ঘিরে বসে থাকেন, একই সঙ্গে রাত-জেগে চরখায় লাল-হলুদ সুতো কেটে, সে সুতো পাকিয়ে রাখী তৈরি করেন 'গাছ-ভাই'দের শাখায় 'সে রাখী বেঁধে দেবার জন্য'। সেই 'রাখীবন্ধ ভাই'দের বাঁচাবার জন্য 'জান-কবুল' জড়িয়ে ধরেছিলেন। 'রাখীবন্ধ ভাই'য়ের যে সামাজিক প্রতিমা এই মেয়েদের মনের মধ্যে ছিল তাকে সঙ্গে নিয়েই গাছকে জড়িয়ে ধরা। না খেয়ে থাকা আর খেতে দিতে না পারার কষ্ট খুব ভাল জানেন বলেই যেন বোধগয়া আন্দোলনের মেয়েরা মহান্ত পরিবারের খাওয়াপরার কথাটা ভুলতে পারেন না। মেয়েদের নেতৃত্ব স্বীকার করে, মেয়েদের সামূহিক অংশগ্রহণের আন্দোলনগুলি প্রায় কোনও ক্ষেত্রেই কোনও রাজনৈতিক দলের আন্দোলন নয়। মূলত অধিকার রক্ষার আন্দোলন। এটা হয়তো একটা বড় কারণ যে-জন্য পরিবেশ আন্দোলনে, জল-জমি-জঙ্গল রক্ষার আন্দোলনে মেয়েদের ভূমিকা এত প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পেত্রা কেলি বা কারেন সিল্কউড-এর মতন নেত্রীদের যদি বাদও দিই, ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্সে বিপুল সংখ্যক মেয়ের যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলন, পরমাণু শক্তিকেন্দ্র বিরোধী লাগাতার আন্দোলনের কথাও যদি না বলি অন্তত এই দেশের, এই ভারতবর্ষের মেয়েদের আজ এই মুহূর্তে চলতে থাকা কয়েকটি আন্দোলনের উল্লেখ করা যায়।

ওড়িশার কাশিপুরে নব্বইয়ের শুরু থেকে বিভিন্ন ছোটবড় কোম্পানি এবং সরকারি এজেন্সি বক্সাইটের খনি করা ও বক্সাইট নিষ্কাশনের জন্য জড়ো হতে থাকে। বক্সাইট হল সেই খনিজ যা থেকে অ্যালুমিনিয়ম নিষ্কাশিত হয়। এরোপ্লেন ও যুদ্ধ বিমান এবং অন্যান্য অস্ত্রাংশ তৈরির জন্য অ্যালুমিনিয়ামের বিপুল চাহিদা। ওড়িশার কাশিপুর, কলিঙ্গনগর সহ

ভারতের যেখানে যেখানে মাটির তলায় বক্সাইট সঞ্চিত আছে তার প্রতিটিই ঘন অরণ্য এবং আদিবাসীদের বাসভূমি। এসব জায়গায় ভূমিজলও প্রচুর। আদিবাসীরা নিজেদের অভিজ্ঞতায় জানেন যে বক্সাইটের পাথর তুলে নিলে জলের স্তর শুকিয়ে যাবে। এছাড়া বক্সাইট নিষ্কাশনের সময়ে যে লালচে কাদা (red mud) বের হয় তা যতদূর জমিতে ছড়াবে সেখানে একটি তৃণও জন্মাবে না। মাটি জ্বলে যাবে। স্থানীয় আদিবাসীরা এই খননে বাধা দিতে থাকেন। ১৯৯৫ সাল থেকে বিভিন্ন অধিকার রক্ষা সংগঠনের কর্মীরা ওই অঞ্চলে যেতে শুরু করায় ওখানকার মানুষের আন্দোলনের কথা বাইরে আসে। আদিবাসী আন্দোলনকারীদের মধ্যে এক বড় অংশই মহিলারা। কাশিপুর জেলার কুচেপাদর, ডোঙ্গাসিল, হাতিগুড়া, মাইকাঞ্চ, কোডিপাড়ি— এই সব উৎখাত হতে বসা গ্রাম পঞ্চায়েতের মেয়েপুরুষরা গ্রামসভায় সিদ্ধান্ত নেন যে তারা নিজেদের অঞ্চলে কোনও খনি চান না। এই কথা জানিয়ে, নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সরকারি পরিকল্পনা জানতে চেয়ে তারা জেলা প্রশাসকের কাছে উদ্বিগ্ন হয়ে চিঠি পাঠান। তার কোনও জবাব আসে না, সশস্ত্র পুলিশ আসে। ১৯৯৬-এর শেষের দিকে। জোর করে জমি দখলের কাজ শুরু করেন সরকার। পুলিশ একদিকে আদিবাসী পুরুষদের দিশি মদের লোভ দেখায়, টাকার লোভ দেখায়, একজন দুজনকে একা পেলে থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে ধমক দিয়ে জমি বিক্রির দলিলে সই করিয়ে 'ক্ষতিপূরণ' ধরিয়ে দেয়, অন্য দিকে মারের ও গ্রেপ্তারের ভয় দেখায়। এই সময় থেকে, নেশা ও টাকার লোভে জমি হারানো থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ক্রমশ বিরাট সংখ্যায় আদিবাসী মেয়েরা জমি অধিগ্রহণের কাজে বাধা দিতে এগোয়। ছোট ছোট দল বেঁধে মেয়েরা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যায়, সেখানকার মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে। একদিকে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করার জন্য জড়ো হওয়া হাইড্রো, উৎকল অ্যালুমিনা, টাটার মতো বহুজাতিকদের সর্বতোভাবে সাহায্যকারী রাষ্ট্র, অন্য দিকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মুখে দাঁড়িয়ে অরণ্য পাহাড় জলকে রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আদিবাসীরা। যাঁদের অধিকাংশই ক্ষেতমজুর বা খুব ছোট চাষি। ১৯৯৯ সালে আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী মুক্তা ঝোড়িয়া ও তার কয়েক জন সাথীকে মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এতে আন্দোলন স্তিমিত হবার কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। ২০০০ সালের ডিসেম্বরে তিন প্লাটুন পুলিশ আনা হয় মালকাঞ্চ পঞ্চায়েত এলাকায়। সেখানে বক্সাইট নিষ্কাশনের প্রতিরোধে আদিবাসীদের এক শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ছিল। অত্যন্ত প্ররোচক ভাবে সমস্ত সমাবেশ ঘিরে রাখে পুলিশ ও কোম্পানির দালালরা। তিনটি জেলার পুলিশকর্তা ও প্রশাসকদের উপস্থিতিতে পুলিশ মেয়েদের কুৎসিত কথা বলতে থাকে। এক সময়ে এমন পরিস্থিতি দাঁড়ায় যে কমবয়েসি আদিবাসী মেয়েরা কেউ কেউ পুলিশের দ্বারা ধর্ষিত হবার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়। সভায় উপস্থিত মায়েদের এক দল পুলিশকে চ্যালেঞ্জ করে পোশাক খুলে দাঁড়ান। এরপর সমাবেশের ওপর লাঠি ও গুলি চলে। অন্তত তিনজন মানুষ খুন হন। এই ঘটনা মণিপুরের কাংলা দুর্গে মায়েদের বিক্ষোভের ঘটনার আগে। অসংখ্য নারী পুরুষ আহত, অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকেন। এলাকায় কার্ফু জারি করা হয়।

ঠিক চারদিন পর দশ হাজার আদিবাসী মানুষের এক জমায়েত হয়। আন্দোলনের নেতা নেত্রীরা একের পর এক নিজেদের সাথীদের ও দূরের মানুষদের কাছে বলেন তাদের ক্ষোভ ত্রাস ও ঘৃণার কথা। টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেলে সারা দেশ সেই বার্তা শোনে। সেইখানে এক অক্ষর লিখতে না পারা আদিবাসী মেয়ে মুক্তা উচ্চারণ করেন এই কথা "যা তোমার নয়, তা তুমি চাও কেন? মানুষকে ভগবান এই পৃথিবীর রাখোয়াল বানিয়েছে। তুমি এখানে খাটো খাও কিন্তু একে তুমি নষ্ট করতে পারো না। বেচাকেনা করতে পারো না। সেটা মানুষের কাজ নয়।"

এই দীর্ঘ ও কঠিন লড়াইয়ের ফলে ২০০১ সালে টাটা ও ১৯৯৯ সালে নরওয়ের কোম্পানি হাইড্রো এই প্রকল্প থেকে সরে যায়। উৎকল অ্যালুমিনা, যা মালিকানা পালটে এখন আদিত্য বিড়লার কোম্পানি তার কাজে কোর্টের নিষেধাজ্ঞা জারি হয় যদিও রাজ্য প্রশাসন 'জানতে পারছেন না' যে উৎকল অ্যালুমিনা ওই অঞ্চলে নানা রকম বাধার মুখে এখনও নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কালাহান্ডির কাছাকাছি বক্সাইট খনিতে বিপুল আন্দোলনের পর সেখানে বহুজাতিক 'স্টারলাইট' কোম্পানিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। 'স্টারলাইট' এখন 'বেদান্ত' নামে কাজ চালাচ্ছে এ কথা বাকি সবাই জানলেও ওড়িশার প্রশাসন জানেন না।

এই একই বক্সাইট উত্তোলন বিরোধী আন্দোলনের গল্প অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল অঞ্চলে। অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীর বাসভূমি এই পঞ্চম শিডিউলভুক্ত অঞ্চলে কোনও অ-আদিবাসীর খনি পত্তনের আইন নেই (5th Schedule Act. Samata Judgement 1997)। এই অরণ্য অঞ্চলের মাটির নীচে বক্সাইটের সঙ্গে আছে অভ্র, ল্যাটেরাইট, ক্যালসাইট। সুতরাং মাটি, প্রাচীন অরণ্য ও কয়েক হাজার নাগরিকের অস্তিত্ব তুচ্ছ করে, আইনের নিষেধ অগ্রাহ্য করে, সরকার ওই সমৃদ্ধ অঞ্চলের মাটি খুঁড়ে খনিজ উত্তোলনের অনুমতি দিয়ে দেন বিড়লাকে। আরব দেশের একটি বৃহৎ কোম্পানিকে। ২০০০ সালে জিন্দাল সাউথ ওয়েস্ট লিমিটেডের সঙ্গে সরকার mou সই করলেন। আদিবাসী মেয়ে ও পুরুষরা প্রবল বাধা দেন। নিম্মালাপাদু নামে ছোট গ্রামটি থেকে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হয়ে গ্রামের পর গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় আদিবাসী মানুষরা বহুবার স্থানীয় প্রশাসন থেকে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সর্বস্তরে চিঠি দিয়ে, আবেদন পাঠিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, জমি ব্যবহারের সবচেয়ে খারাপ উপায় হল খনি। এতে জমি ধ্বংস হয়ে যায়। মাটি এছাড়া অন্য বহু জীবিকা দিয়েছে যা অবলম্বন করে আদিবাসীরা নিজেরা বেঁচে থাকে, মাটির ওপরে বাস করা অন্যদের সঙ্গে মিলেমিশে। যেমন কৃষি, পূর্বঘাট পর্বতমালার গভীর জঙ্গলের মধ্যে অর্কিডের চাষ, কফি বাগিচা ইত্যাদি। কফি বাগিচার শ্রমিক মেয়েরা, প্রান্তিক চাষি ও ক্ষেতমজুররা প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষা করতে চান। শুধু এই কারণে নয় যে পরিবেশের সুস্থতার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাদের বেঁচে থাকার, তাদের বহুকালের জীবনযাপন পদ্ধতির মধ্যে, প্রকৃতি থেকে ন্যূনতম নিয়ে জীবনযাপন করার সংস্কৃতির মধ্যে জল মাটি অরণ্য, আশপাশে বসবাসকারী অন্যান্য প্রাণীসকলের প্রতি এক শ্রদ্ধা আছে। সহভাগের ভাবনা

আছে। এ কথা বনের আশপাশে বাস করা প্রায় সমস্ত জনগোষ্ঠী সম্পর্কেই সত্য। কিন্তু এই শান্ত সুরক্ষার প্রচেষ্টার জবাবে কি পান তাঁরা সরকারের কাছ থেকে? যে সরকারের লিখিত ও ঘোষিত দায়িত্ব হল দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা, দেশের নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়া যেন তারা নিরুপদ্রবে নিজেদের জীবনযাপন করতে পারেন, বিশেষত আদিবাসীরা, মেয়েরা যেন নির্দিষ্ট বিশেষ নিরাপত্তার অধিকার পান? লাঠি, জেল, ভীতি প্রদর্শন।

সম্পত্তির অধিকারের জন্য রাষ্ট্রের পিতৃতান্ত্রিকতা নিজেই নিজের সংবিধান লঙ্ঘন করে বারবার। আর সবচেয়ে দুর্বল পশ্চাৎপদ বলে চিহ্নিত জনগোষ্ঠীগুলি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশকে রক্ষা করবার জন্য আপ্রাণ, সত্যি সত্যিই আপ্রাণ, চেষ্টা করে যান।

এ ধরনের আন্দোলনের সংখ্যা এই মুহূর্তে দেশে সহস্রাধিক। কয়েক কোটি মানুষ এই জমি রক্ষার, নদী রক্ষার, বনভূমি রক্ষার লড়াইয়ে সামিল। আর যে কাজের জন্য তাঁদের পুরস্কৃত হবার কথা ছিল সেই সব প্রচেষ্টার উত্তরে তাঁরা পান পুলিশী অত্যাচার, লাঠি গুলি ধর্ষণ ভীতিপ্রদর্শন, অনাহার, উচ্ছেদ। বীরত্বের পুরস্কার দেওয়া হয় তাঁদের যারা হত্যা ও ধ্বংস সংগঠিত করেন। পিতৃতন্ত্রের এই সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত নাগরিক শিক্ষিত মানুষরা এই সম্পূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে উদাসীন।

কেন আমি এই সংগ্রাম ও আন্দোলনগুলিকে মেয়েদের আন্দোলন বলে চিহ্নিত করছি?

সমাজে যেমন মেয়েরা ও পুরুষরা একই সঙ্গে, পরস্পরের থেকে অবিচ্ছেদ্য ভাবে বাস করেন, এই সকল আন্দোলনের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ সময়ে তাই। জীবযাপনের মূল জায়গা নিয়ে যে সব আন্দোলন তাতে বারে বারে দেখা যায় মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন শুধু নয়, মেয়েদের যোগদান ও নেতৃত্ব আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। তেভাগা আন্দোলন, লবণ আন্দোলন ১৯৩০-এর দশকে মণিপুরে মেয়েদের নুপিলাল আন্দোলনের কথা মনে করি। মিলিটারিদের জন্য চাল মজুত করায় বাধা দিয়ে, সংগঠিত আন্দোলন চালিয়ে মিলিটারির গুলিতে নিহত হন মণিপুরের মেয়েরা। তাদের স্মৃতিবহ স্তম্ভ আছে এখনও ইম্ফল শহরে। বীরভূমের রামপুরহাট থানার গড়িয়া গ্রামে পাথর খাদান করার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে। তা এক পর্যায়ে সফলতা পেল ২০০১ সালে যখন আশপাশের গ্রাম সহ ওই অঞ্চলের আদিবাসী মেয়েরা হাতের কাছে যে যা পেলেন নিয়ে বেরিয়ে এলেন। বরাবর চুপ করে থাকা মেয়েদের সরাসরি রণমূর্তি ধরে বেরিয়ে আসা, 'আমাদের ই গাঁয়ে খাদান করতে দিব নাই, তোরা চলে যা' সিদ্ধান্ত নিয়ে সামনাসামনি হওয়াতে খনির সম্ভাব্য মালিকরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। মেয়েরা কী ভূমিকায় সুরক্ষা আন্দোলনে যোগ দেন, সেই যোগদান কীভাবে আন্দোলনকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয় তার গৌরবময় চেহারা আমরা গত এক বছর ধরে দেখলাম সিঙ্গুরে নন্দীগ্রামে।

ধানক্ষেতের লড়াই, ভাত দেবার লড়াই কেমন করে পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের অংশ হয়ে যায়? মেয়েদের নিজস্ব যে ভুবন, পিতৃতান্ত্রিক ক্ষমতাকেন্দ্রিকতার সংস্কৃতির অন্য পক্ষে সামূহিক সুরক্ষা দেওয়ার ভুবন, যা সংরক্ষণের, পুষ্টি ও লালনের— সেই সংসারের নিজস্ব সংস্কৃতিই খাদ্যের সঙ্গে, জীবনধারণ বিধির নিরাপত্তার সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশের অঙ্গাঙ্গী

সম্পর্কে জড়িত। এই লালনের সংস্কৃতি বারে বারে পিতৃতান্ত্রিকতার হাতে শোষণের যন্ত্র হয়ে ওঠে সত্য কিন্তু সে কারণে এই সমগ্র সংস্কৃতিকে অস্বীকার করার চেষ্টা পিতৃতন্ত্রের, বাজারের অন্য এক হাঁ-মুখের, গভীরতর কোনও ষড়যন্ত্র কি না সে এক স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়।

আর এখানেই সেই সাদা সাদা লাউ ফুলগুলি আবার দেখা দেয়।

আশির দশকের মাঝামাঝি নেলসন ম্যান্ডেলার মুক্তির দাবিতে আন্দোলনরত জোহানেসবার্গের ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর গুলি চালায় দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী সরকার। সেই পটভূমিতে একটি ফিল্ম তৈরি হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়— 'সারাফিনা'। স্বাধীনতা বিষয়ে অনেকগুলি মূল প্রশ্ন তোলা হয়েছিল ছবিটিতে। ক্লাস এইটের ছাত্রী সারাফিনা ও তার সহপাঠীরা ইতিহাসের নতুন পাঠ শেখে তাদের ইতিহাস শিক্ষিকার কাছ থেকে যতদিন না গ্রেফতার হন তিনি। সারাফিনার বাবা প্রাণ দিয়েছিলেন সাদা সরকারের বুলেটে। তার মা গ্রামে এক শ্বেতাঙ্গ পরিবারের গভর্নেস হয়ে, সন্তানদের প্রতিপালন করেছেন। সারাফিনা চায় বাবার মতো বীর হতে। সে, তার দেশে বহু মানুষেরই মতো, চায় শ্বেতাঙ্গ শাসন থেকে মুক্তি। মাকে সে ধিক্কার দেয় আত্মসম্মানজ্ঞান হীন, ভীতু বলে। বোথা সরকারের গুলিতে নিহত হয় সারাফিনারও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। খুন হন প্রিয় ইতিহাস শিক্ষিকা। পুলিশের টর্চার চেম্বারে ধ্বস্ত হয় সারাফিনা ও তার সাথীরা। বহু পথের পর, আরও পথের শুরুতে মায়ের কাছে আসে সারাফিনা। অভিজ্ঞতা অনেক বড় করে দিয়েছে তাকে। একই রকম ভাবে রুটি সেঁকতে থাকা, কাপড় ইস্ত্রি করতে থাকা, মুখের সামনে খাবারটুকু ধরে দেওয়া মাকে সে বলে, ''আমি বুঝতে পারছি তুমিই বীর। যা কিছুই আসুক না কেন, তুমি বিচলিত হও না। তুমি শুধু মনে রাখো যে তোমার রক্ষা করতে হবে, বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সব কিছুর মধ্যেও তুমি টিকে থাকো।''

এই সারাফিনার মায়ের মধ্যে আমি কোটি কোটি মেয়েকে দেখি যারা সমস্ত ধ্বংসের মধ্যে দাঁড়িয়েও, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ককে নষ্ট করে ফেলার উদ্‌ভ্রান্ততার মধ্যে দাঁড়িয়েও, নিজেদের জীবনকে, নিজেদের গৃহস্থালিকে, নিজেদের সংস্কৃতিকে একই ভাবে যাপন করে যান। বহুকাল ধরে অর্জিত, বহু প্রজন্মে পাওয়া পূর্বমাতৃকাদের জ্ঞানের ধারাবাহিকতাকে সহজ ভাবে তাঁরা বহন করেন যা প্রকৃত পক্ষে সমাজকে এক সুরক্ষার সংস্কৃতিতে ধরে রাখে।

সাধারণ সমাজের জীবনযাপনের মধ্যে, ঋতু ঋতুতে ভিন্ন খাদ্যাভাস, ভিন্ন ভিন্ন আচার নিয়ম, ভিন্ন পরিচ্ছদ, যত্ন ও পরিশ্রমের মূল্যবোধ, আনন্দ বিনোদন ও সার্থকতাবোধের ধারণা, এইসব প্রায়ই 'ইউজ অ্যান্ড থ্রো'র বিপরীত এক সংস্কৃতির কথা বলে। যে সংস্কৃতি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বিষয়ে অনেক বেশি যত্নশীল। যা সুস্থায়ী।

এই সংস্কৃতিকে আঘাত করা, এই সম্পর্কচক্রকে ছিন্ন করার এক জটিল ও সর্বব্যাপী চেষ্টা আছে। এখনও সমাজের প্রধানসংখ্যক মেয়ে সুস্থায়িত্বের পক্ষে। হয়তো শহুরে জীবনের চকঝমকে সেই অন্য মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। যাঁরা ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে আধুনিক সংসার সাজান তাঁদের মুখও নয় আর যাঁরা কিছুতেই নিজেদের জায়গায়, নিজেদের জীবনে টিকে থাকতে

না-পেরে 'আধুনিকতা'কে জায়গা করে দেবার ধাক্কায় শহরের ফুটপাতে এসে আছড়ে পড়েন, তাঁদের মুখও নয়। প্রতিবেশকে লুঠ করবার অতিকুশলী চেষ্টায় বাজার মানুষের গৃহস্থালিকে করে তুলছে তার উপনিবেশ। আর এই উপনিবেশ দখল করার সবচেয়ে কার্যকরী পথ হিসাবে সে বেছে নিয়েছে মেয়েদের মগজকে। সংসার-পরিবারের যে সংস্কৃতি মানুষের সমাজকে এক রকম স্বস্থতা দিয়েছিল, তা থেকে শোষণ বা হীনতার পুরুষতান্ত্রিক আবর্জনাগুলি একে একে খসিয়ে পরিবারকে পারস্পরিক যত্ন, সহযোগিতা ও সৌন্দর্যের জায়গায়, অহিংসা ও শমের জায়গায় নিয়ে আসার বদলে 'মুক্তনারী' 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য'-র মতো সুন্দর সুন্দর কথাকেও বাজার নিজের মতো বিকৃত ব্যাখ্যা করছে। শেষ পর্যন্ত যাতে বাজারের অতি-উৎপাদন ও তার দরুন প্রকৃতির দ্রুত ধ্বংসই মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ হতে চলেছে।

যা কিছু সহজ বিচিত্র অ-বৃহৎ অ-আগ্রাসী পিতৃতন্ত্র তার বিপক্ষে কারণ বৈচিত্র্যকে মেইনস্ট্রিমে ধরে না। প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে লক্ষ কোটি ক্ষুদ্র, সহনশীল, পরস্পরসংযুক্ত তন্ত্রের বৈচিত্র্য দিয়ে। এই সব তন্ত্র প্রকৃতিতে বিন্যস্ত আছে যেন তা খুব সহজ, সাবলীল। মেয়েরা তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারে প্রাকৃতিক পরিবেশের এই বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে মানানসই জীবনযাপনপদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। বাজারবাদের সুচতুর আগ্রাসন সেই দীর্ঘকাল অর্জিত, আচরিত বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতিকে শেকড়সুদ্ধ ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে। তার ফলে মানবসভ্যতার গঠনে ও বিকাশে মেয়েদের যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, মেয়েদের বিশেষ দক্ষতা সমূহ, সেই সকলও ভেঙে পড়ে। গুরুত্ব হারায়। ভোগবাদী এই উন্নয়ন-মডেল সভ্যতার কাছে মেয়েরা নিজেরাই হয়ে ওঠে বাজার ও পণ্যবস্তু।

একুশ-তলা ফ্ল্যাটের খাঁচায় যে মেয়েটি সর্বসম্পর্ক বিরহিত আধুনিকতার ফরমায়েশে জীবন কাটানো ক্রীতদাসী, যে গৃহিণীটি 'অন্যের মতো' অনেক বস্তু কিনে ফেলে ক্রেডিট কার্ডের আতঙ্কে দিন রাত্রি আরও অর্থ উপার্জনের চিন্তা করছেন, যে মায়ের সন্তানরা জাঙ্কফুড ফ্যাশন ডিজাইন আর তীব্র ডিপ্রেশানে ভুগছে, সহজে 'ফান্' ও দামি উপহার পাবার জন্য যে ছাত্রী তিন ঘণ্টার জন্য শরীর ভাড়া দিচ্ছে, যে গৃহবধূটি টাকা পেতে শয্যাসঙ্গী-সঙ্গিনীদের কুৎসিত আবর্তকে ব্ল্যাকমেইল করার উপায় ভাবতে পারছেন, এ রকম আরও অনেক মেয়ের বেঁকে দুমড়ে পঙ্গু হয়ে যাওয়া জীবনের ভয়ংকর অপচয়ে বাজারের কিছু যায় আসে না।

আমাদের যায় আসে।

যে মেয়েরা এই কুম্ভীপাকের বাইরে বাঁচার অধিকার চান তাঁদের আসে যায়। মানুষের সভ্যতার সংরক্ষকের ভূমিকা যাঁরা নেন, তাদের কাছে এই পৃথিবী আর তার সঙ্গে গভীর সংলগ্ন মানুষের জীবন বড় যত্নের। ইউক্যালিপটাসের পাঁচ বছরে কাঠ হিসাবে বিক্রি হবার অগ্রগতির চেয়ে যে মানুষ শতবর্ষে গন্ধ দেবার চন্দনচারা লাগানোয় বেশি বিশ্বাসী তিনি পরিবেশকে অনেক ভাল জানেন। তিনি শরীরলক্ষণে নারী হোন বা পুরুষ, মানবীচেতনার শিকড় তাঁরই চেতনাতলকে স্পর্শ করে বেঁচে থাকবে।

রুচিরা গোস্বামী

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় মানবাধিকার আইন ও নারী

একবিংশ শতাব্দীর আট বছর পেরিয়ে গেছে। শিল্পায়ন-বিশ্বায়নের হাত ধরে ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্ব জুড়ে এক 'উন্নয়নের' হাওয়া বইছে। বিশেষ করে আমাদের দেশে ক্রমবর্ধমান GDP, নতুন শিল্প স্থাপনের প্রতিশ্রুতি ও পরিকল্পনা ইত্যাদি নানান সূচক দিয়ে দেশ সমাজ এগিয়ে চলেছে এমন ঘোষণা মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন গণমাধ্যমে চোখে পড়ে। অথচ ২০০০-এর ৪ জানুয়ারি এক বিশেষ ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত একটি খবর অনুযায়ী ১৯৫৩ থেকে ২০০০-এ অন্যান্য অপরাধের তুলনায় ধর্ষণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে সব চাইতে বেশি (দ্য টেলিগ্রাফ, ৪/১/০৮)। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সমাজে নারীর অবস্থার সময়ের সাপেক্ষে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে এ কথা অনস্বীকার্য। অন্য দিকে নানান ধরনের পরিবর্তন সত্ত্বেও জাত, জাতি, ধর্ম, শ্রেণি নির্বিশেষে যৌন হিংসার ভয় সমস্ত নারীর জীবনে এক জ্বলন্ত বাস্তব হিসেবে রয়ে গিয়েছে। যদিও এই হিংসা ও নির্যাতনের চরিত্র নির্ধারণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমস্ত নারীর জীবন এক হিংসার সূত্রে বাঁধা। পৃথিবীর সব দেশে, বিশেষ ভাবে ভারতবর্ষের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে, অধিকাংশ নারীর জীবনে হিংসা তার দৈনন্দিন অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। জন্মের পূর্বেই কন্যাভ্রূণ অবস্থা থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনচক্রের প্রতিটি অধ্যায়ে নানান ভাবেই নানান চরিত্র নিয়ে মেয়েদের জীবনে হিংসা নেমে আসে। হিংসা শুরু হয় জন্মের আগেই কন্যাভ্রূণ হত্যার হাত ধরে। এর পর নবজাত শিশুহত্যা, বাল্যবিবাহ, মেয়ে বলে শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া, অপ্রাপ্ত বয়সে মা হওয়া, শিশুকন্যার ওপর যৌন হিংসা থেকে শুরু করে চলতেই থাকে মেয়েদের ওপর নির্যাতন। কৈশোরে ও প্রাপ্তবয়সে এই সবের সঙ্গে যুক্ত হয় বৈবাহিক জীবনে হিংসা— পণপ্রথা, পণের জন্য মেয়েদের মেরে ফেলা, গার্হস্থ্য নির্যাতন, ধর্ষণ ও অন্যান্য যৌন হিংসা যা প্রাত্যহিক ঘটনা। শেষ বয়সে সন্তানদের দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়া, প্রাত্যহিক লাঞ্ছনা, বৈধব্যের গ্লানি— এই চক্রব্যূহের মধ্যেই বেশির ভাগ নারীর জীবন কাটে।

পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই নির্যাতন অনেকাংশে সামাজিক ভাবে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও, ভারতে ও সমগ্র বিশ্বে নারী আন্দোলন যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। নির্যাতন ক্রমশ হয়ে উঠেছে একটি রাজনৈতিক বিষয়— এই হিংসা কোনও ব্যক্তিগত সমস্যা নয়। এটি একটি সামাজিক ব্যাধি। বর্ধিত সচেতনতা ও আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন— এই হল নারী আন্দোলনের মূলমন্ত্র। সমাজে নারীর এই অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে আইনের প্রণয়ন ও পরিবর্তনের দাবি বিভিন্ন সময়ে নারী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে উপস্থিত ছিল ও আছে। বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন, সতীপ্রথা বিলোপ আইন থেকে শুরু করে পণপ্রথা, পারিবারিক হিংসা, কন্যাভ্রূণ হত্যা প্রতিরোধ ইত্যাদি নানান আইন প্রণয়নের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক হিংসাকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রেক্ষিতে বিচার করবার এক প্রচেষ্টাও গত কয়েক দশক ধরে লক্ষণীয়।

এই প্রবন্ধে নারী আন্দোলন, আইনের সংশোধন ও রূপায়ণ এবং মানবাধিকারের সঙ্গে লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতনকে যুক্ত করার যে আন্তর্সম্পর্ক, তাকেই স্বল্প পরিসরে বুঝে নেবার এক প্রচেষ্টা। মানবাধিকার কী ও নারীর অধিকার ও মানবাধিকারের আন্তর্সম্পর্ক— প্রবন্ধের প্রথম ভাগের আলোচ্য বিষয়। দ্বিতীয় ভাগে ভারতবর্ষের দুটি সাম্প্রতিক আইনের ওপর আলোকপাত করে আমরা বোঝবার চেষ্টা করব আইনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে লিঙ্গ বৈষম্যের বিষয়টিকে কী রূপে ও কী মাত্রায় ধরা হয়েছে।

মানবাধিকার কাকে বলে

মানবাধিকার হল প্রতিটি ব্যক্তির মৌলিক ও 'প্রকৃতিদত্ত' অধিকার। শুধুমাত্র মানুষ হওয়ার দরুন প্রতিটি ব্যক্তি এই অধিকারের অধিকারী; কোনও রকম ধার্মিক বা জনগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে নয়। মানবাধিকার প্রতিটি মানুষকে দেয় সমান মর্যাদা। মানবাধিকার সর্বজনীন ও সহজাত অধিকার। মানবাধিকারের অস্তিত্ব রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র। রাষ্ট্রের ভূমিকা হল মানবাধিকার নিশ্চিত করা মাত্র, মানবাধিকারের উৎস রাষ্ট্র নয়। মানবাধিকারের দার্শনিক, নৈতিক, রাজনৈতিক সামাজিক ও সবশেষে আইনি মাত্রা আছে। আইনি ব্যঞ্জনায় আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত ও গৃহীত কিছু মূল্যবোধ, গৃহীত আদর্শ, মাপকাঠি (standards) ও নিয়মাবলী (guidelines) আছে যা রাষ্ট্রের তার নাগরিক ও অ-নাগরিকদের প্রতি আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানবাধিকার নির্ধারণ করে দেয় রাষ্ট্র কী কী করতে পারে না (নেতিবাচক অধিকার negative rights) ও রাষ্ট্রের কী কী করণীয় (ইতিবাচক অধিকার positive rights)।

মানবাধিকার নিয়ে আলোচনা ও তত্ত্ব যদিও বহু পুরনো, মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে রাষ্ট্রপুঞ্জ গঠনের পরে আন্তর্জাতিক আইনে মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্তি ঘটে। ১৯৪৮ সালে হয় Universal Declaration of Human Rights। তৎকালীন ঠাণ্ডা যুদ্ধের রাজনৈতিক বাতাবরণে সৃষ্টি হয় দুটি চুক্তি— International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)— বা নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং International Covenant on Economic, Social and Cultural

Rights (ICESCR) বা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি। দুটি চুক্তিই গৃহীত ও স্বাক্ষরিত হয় ১৯৬৬ সালে। আন্তর্জাতিক স্তরে কোন অধিকারসমষ্টি বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই নিয়ে বহু বিতর্ক আছে। আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন তথা অন্যান্য পশ্চিমি গণতান্ত্রিক দেশগুলির মতে রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উলটোদিকে তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া ও অন্যান্য কম্যুনিস্ট দেশগুলির মতানুযায়ী সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার হল বেশি প্রয়োজনীয়। পরবর্তীকালে উপনিবেশমুক্ত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি দাবি করে যে অধিকার শুধু ব্যক্তিমানুষের নয়— সমষ্টিরও অধিকার আছে (collective rights)। এই সব মতান্তরের অবসান ঘটে ১৯৯২ সালে ভিয়েনায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সম্মেলনে (World Conference on Human Rights) যেখানে ঘোষিত হয় যে অধিকারগুচ্ছগুলির মধ্যে কোনও একটি গুচ্ছ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। সব অধিকারগুলির মধ্যে আন্তর্সম্পর্ক আছে এবং তা অবিচ্ছেদ্য।

নারীর মানবাধিকার বলতে কী বুঝি

সব ক'টি আন্তর্জাতিক চুক্তিই নারী-পুরুষের জন্য সমান ভাবে প্রযোজ্য। ICCPR ও ICESCR— দুটি চুক্তিই বৈষম্যহীনতার আদিকল্পের (non-discrimination paradigm) প্রেক্ষিতে অবস্থিত। তবুও কেন আলাদাভাবে নারীর অধিকারের কথা বলতে হল? নারীবাদীদের মতে মানবাধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলিকে নারীদের অবস্থান ও অভিজ্ঞতার নিরিখে বিচার করলে তার সীমিত রূপ লক্ষণীয়।

মানবাধিকারের নারীবাদী পুনর্চরিত্রায়ণ

ব্যক্তি নারীর সীমাবদ্ধ পারিবারিক অস্তিত্ব ও ব্যাপক বহির্জগতের অস্তিত্বের মধ্যে যে সংঘাত ও দ্বন্দ্ব— নারীর মানবাধিকার বিচারের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক ভাবে বলা যেতে পারে যে নারীর মানবাধিকার হল সেই সব আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি যা শুধুমাত্র নারীকে নিয়ে বা নারীর জন্য। এই সব আইন আনুষ্ঠানিক বৈষম্যহীনতার (formal non-discrimination) মডেলের ওপর তৈরি। আন্তর্জাতিক আইনের এই বিবর্তন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু বিশ্ব জুড়ে নারীর অধস্তন অবস্থাকে যথাযোগ্যভাবে বিচার করবার জন্য তা মোটেই যথেষ্ট নয়। মূলস্রোতের মানবাধিকার আলোচনা থেকে নারীর মানবাধিকারের বিষয়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রয়ে গেছে বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তিক।

নারীর মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণ মানবাধিকারের সংগঠনগুলির তুলনায় এখনও অনেক দুর্বল। নারীর মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন ও নির্দেশাবলীর (International instruments) প্রয়োগের দায়বদ্ধতা ও প্রণালী অনেক বেশি দুর্বল। এই আইন প্রণয়ন ও পর্যবেক্ষণের প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক সঙ্গতি ও লোকবল তুলনায় সীমিত। রাষ্ট্রের তরফে এই দায়বদ্ধতা পালনের ব্যর্থতা যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে সমালোচিত হয় না। ('What are Women's International Human Rights' by Hilary Charlesworth in Rebecca Cook (ed.) *Human Rights of Women: National & International Perspectives)*

নাগরিকত্বের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ঐতিহাসিকভাবে নারীদের নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হত না। একমাত্র পূর্ণ নাগরিক হল পুরুষ। রাজনৈতিক মানবাধিকার একজন ব্যক্তির, অপরিসীম ক্ষমতাশীল রাষ্ট্রের সমস্ত রকম নিপীড়ন থেকে নিজেকে বাঁচানোর উপায়। রাষ্ট্রের সঙ্গে পুরুষের যোগাযোগ অনেক প্রত্যক্ষ। অধিকাংশ মেয়েদের জীবন কাটে ঘেরাটোপের অন্তরালে, পরিবারে বা ব্যক্তিগত পরিসরে— সেখানে আইনের অনুপ্রবেশ ক্ষীণ। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ দ্বারা ১৯৬৬ সালে গৃহীত ও স্বাক্ষরিত হয়। ব্যক্তির জীবনধারণের সহজাত অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিজীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এই চুক্তির অন্যতম শর্ত (*নাগরিক ও রাজনৈতিক বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি*, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা, বাংলাদেশ)।

এই চুক্তির ৬নং ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের বাঁচার সহজাত অধিকার রয়েছে। এই ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্র কোনও ব্যক্তির বেঁচে থাকার অধিকার ও স্বাধীনতা অকারণে ও অবাধে (arbitrarily) হনন করতে পারে না। কিন্তু নারীর জীবনের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে-স্বাধীনতাহীনতা ও মৃত্যুর আশঙ্কা— তা কোনও ভাবেই এই আইনে প্রতিফলিত নয়। একই ভাবে Convention Against Torture (নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদা হানিকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে কনভেনশন) অনুযায়ী রাষ্ট্র কোনও ব্যক্তির ওপর দৈহিক বা মানসিক যন্ত্রণা বা দুর্ভোগ বৃদ্ধি করতে পারে না। ফলত, নারীর ব্যক্তিজীবনের অন্দরমহলে প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া নির্যাতন এর আওতার বাইরে থেকে যায়।

একই রকম ভাবে 'অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার' বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি একটি গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। সমস্ত সমাজেই লিঙ্গভিত্তিক কাঠামোগত বৈষম্য বিরাজমান। কিন্তু এই আইন নারীর এই বিশেষ অবস্থাটিকে ধরতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ এই চুক্তির ১১নং পরিচ্ছদ/ধারা অনুযায়ী বাসস্থানের অধিকার একটি সর্বজনীন অধিকার। কিন্তু বাসস্থান হারানোর প্রভাব নারী ও পুরুষের ওপর ভিন্ন প্রতিক্রিয়া নিয়ে ব্যক্ত হয়। বাস্তুচ্যুত নারীর যৌন হিংসার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যা পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কোনও ভাবে এই আইনে এই লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের মাত্রা ধরা পড়ে না।

সমষ্টিগত ও সামাজিক অধিকারের একটি মৌলিক দিক হল কোনও একটি জনসমষ্টি বা জনসম্প্রদায়ের অধিকারকে সুনিশ্চিত করা। যেমন সংখ্যালঘু হিসেবে কোনও গোষ্ঠী তাদের বিশেষ সাংস্কৃতিক বা সাম্প্রদায়িক আচার পালন করার অধিকারী। কিন্তু নারীর জীবনের ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক। যেমন কোনও সম্প্রদায়ের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিকে আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটির সঙ্গে নারীর ওপর নির্যাতন বা বৈষম্যমূলক ব্যবহার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ফলে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে গিয়ে নারীর প্রতি বৈষম্যের বিষয়টি গৌণই থেকে গেছে।

এই সমস্ত নানাবিধ মানবাধিকার ও লিঙ্গবৈষম্য নিয়ে বিতর্ক মানবাধিকারের জন্মলগ্ন থেকেই নানান মাত্রায় চলেছে। নারীবিষয়ক মানবাধিকারকে কেন্দ্র করে Mexico, Nairobi, Copenhagen, Beijing-এ অনুষ্ঠিত সমাবেশে (Conferences and conventions) এই প্রসঙ্গগুলি নানান ভাবে উত্থাপিত হয়। মূলস্রোতের মানবাধিকারের শর্তগুলির ব্যর্থতাকে বোঝবার ও সংশোধন করবার উদ্দেশ্যে ১৯৭৯ সালে Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) বা "নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন" আয়োজিত হয়। এই কনভেনশনে রাষ্ট্রপক্ষ সমূহ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা ছাড়াও উপযুক্ত সব রকমের উপায় অবলম্বনে ও অবিলম্বে নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের একটি নীতি অনুসরণে সম্মত হয় (*নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ* কনভেনশন, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা, বাংলাদেশ)। ভারতবর্ষও নিজেকে এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করে।

ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে নারীর অধিকার

ভারতবর্ষের সংবিধানের মৌলিক অধিকার-এর ১৪, ১৫ ও ১৬ পরিচ্ছদ অনুযায়ী নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। তা ছাড়া নারীর অধিকার রক্ষার আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার কিছু প্রতিফলন দেখা যায় জাতীয় আইনে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কর্মক্ষেত্রে *যৌন হেনস্থা দূরীকরণের প্রচেষ্টা*। Vishaka Vs. State of Rajasthan, 1997, এর পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্ট যৌন হেনস্থা দূরীকরণের নির্দেশাবলী সমস্ত রকমের কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য জারি করে। বিশাখা মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন যে কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থা, সংবিধানের অন্তর্গত ১৬নং পরিচ্ছদ অনুযায়ী জীবনধারণের অধিকারের লঙ্ঘন। কর্মক্ষেত্রে নারীর যৌন হেনস্থার ভয় ও তার শিকার হওয়া শুধুমাত্র তার রোজগার করার পথেই অন্তরায় হয়ে ওঠে না, তার স্বাধীন জীবনযাপনকে বিপন্ন করে।

একদিকে ভারতবর্ষের আইন যেমন নারীর বহির্জগতে সুরক্ষার প্রচেষ্টা করে, অপর দিকে সাম্প্রতিক কালে ঘরের মধ্যে নির্যাতন ও হিংসার বিষয়টিকেও ধরবার চেষ্টা করেছে। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হল সাম্প্রতিক আইন— Protection of Women from Domestic Violence Act, 2000 বা গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধক আইন, পারিবারিক হিংসা থেকে নিজেকে বাঁচানোর একটি দেওয়ানি প্রতিকার দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়েছে এই আইনের মাধ্যমে।

বিবাহিতা, অবিবাহিতা, বিধবা বা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ না হওয়া দম্পতি— সব মেয়েরাই এই আইনের অন্তর্গত। দ্বিতীয়ত, নির্যাতন বা হিংসার সংজ্ঞাকে অনেক ব্যাপ্তিতে ধরা হয়েছে। শুধুমাত্র শারীরিক অত্যাচার নয়, মানসিক ও যৌন হিংসাকেও এর আওতায় আনা হয়েছে। এই আইনগুলির বিশদ বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। উল্লেখযোগ্য হল এই যে, ভারতবর্ষের তথা আন্তর্জাতিক আইন বহির্জগৎ ও অন্দরমহলের দ্বন্দ্বকে কমানোর বা অন্তত এই দ্বন্দ্ব বা ফারাককে ধরার চেষ্টা করেছে।

আমরা দেখলাম, মানবাধিকার আইন ও নারীর অধিকারের আন্তর্সম্পর্ক এবং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তার বিশেষ প্রয়োগ। কিন্তু যে গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক এই আলোচ্য বিষয়ে আপাতত উহ্য রাখা হয়েছে তা হল নারী আন্দোলনের সঙ্গে আইন প্রণয়ন বা পরিবর্তনের সম্পর্ক।

সেই আলোচনা দীর্ঘ এবং স্বতন্ত্র প্রবন্ধের দাবি করে। তবে বিশদ আলোচনায় না গিয়ে একটি কথা জোর দিয়েই বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে নানান আইনি প্রণয়ন ও পরিবর্তনগুলি নারী আন্দোলনের ফসল। বিশেষ করে সাম্প্রতিক ভারতবর্ষের যে উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট। কারণ এই আইনগুলি ওপর থেকে রাষ্ট্রের দ্বারা প্রণয়ন করা নয়, বরং নারী সংগঠন ও আন্দোলনকর্মীদের উদ্যোগেই মূলত সৃষ্ট।

জবা গুহ

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও লিঙ্গসমতা

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও লিঙ্গসমতা— এই রচনার বিষয়বস্তুটির অবতারণা কেন? আদৌ এর কোনও প্রাসঙ্গিকতা আছে কি? যদি ধরে নেই যে আমাদের সমাজে লিঙ্গভিত্তিক অসমতা আছে, তা অবাঞ্ছিত, এবং তার অবসান হওয়া কাম্য, তবু প্রশ্ন থেকে যায়— বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? কেউ বলতে পারেন যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তো নারী-পুরুষ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ, তবে লিঙ্গভিত্তিক অসমতার আলোচনায় এদের জড়ানো হচ্ছে কেন?

আসলে মানবজাতির কোনও চিন্তাভাবনাই একটি শূন্য পরিবেশে উদ্ভূত হয় না। তা একটি বিশেষ পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের মধ্যে তৈরি হয়— যে পরিমণ্ডলের মধ্যে রয়েছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ইত্যাদি নানা দিক। একটি বিশেষ স্থানে, একটি বিশেষ সময়ে, একটি বিশেষ অবস্থায়, এই পরিমণ্ডলের একটি বিশেষ রূপ আছে— তার মূল্যবোধ আছে, তার পক্ষপাতিত্বও আছে। যারা মানবজাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার তৈরি করেন, তাঁরা সাধারণ মানুষই হোন বা বিজ্ঞজন, সকলে এই পরিবেশ থেকেই উঠে এসেছেন— এইসব মূল্যবোধ, পক্ষপাতিত্ব নিয়ে। তাই তাঁরা কোন সমস্যাকে প্রাধান্য দেবেন ও তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করবেন, কেমন ভাবে চিন্তা করবেন, কাদের হয়ে চিন্তা করবেন— এ সবের ওপর সেই পরিমণ্ডলের ছাপ পড়ে। তাই মানবজাতির জ্ঞানের ভাণ্ডার তৈরি হবার প্রক্রিয়ার মধ্যে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক পরিবেশের প্রভাব থেকে যায়। সেই পরিবেশের দুর্বলতা ও শক্তি, তার মূল্যবোধ, তার পক্ষপাতিত্ব সব কিছু নিয়েই এই জ্ঞানের ভাণ্ডার তৈরি হয়— এই পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে নয়। শুধু তৈরির প্রক্রিয়াই নয়, উদ্ভূত জ্ঞান ও বিদ্যার বণ্টন কীভাবে হবে; এতে কাদের অধিকার থাকবে, কাদের থাকবে না; কাদের স্বার্থে এবং কীভাবে এই অর্জিত বিদ্যা ব্যবহার হবে; তাও অনেকটাই নির্ভর করে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর আপেক্ষিক অবস্থানের ওপর। যারা শক্তিশালী, যারা ক্ষমতাবান, তাদের স্বার্থেই এই সব প্রশ্নের সমাধান সূত্র তৈরি হয়। ক্ষমতাবান গোষ্ঠী বিদ্যাচর্চা ও তার ব্যবহারের ওপর কর্তৃত্ব রাখে, আবার এই কর্তৃত্বের ফলে সেই গোষ্ঠীর ক্ষমতা কায়েম থাকে। এই সম্পর্ক সব সময় সহজে চোখে পড়ে না,

কিন্তু তা আছে। একটু গভীরে ঢুকে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, আপাতদৃষ্টিতে যা নিরপেক্ষ বলে মনে হয়, সেই জ্ঞানভাণ্ডারও মৌলিক অর্থে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত— তার মূল্যবোধ, পক্ষপাতিত্ব থেকে সে-ও মুক্ত নয়। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। তা ছাড়া এও মনে রাখতে হবে যে অন্যান্য ফলিত বিদ্যার মতো বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকেও ব্যবহার করে মানুষ। সে সমাজে বাস করে এবং তার মানসিকতা পক্ষপাতদুষ্ট হতেই পারে। তাই, অন্যান্য অনেক কিছুর মতো, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিরও সামাজিক নানা ধরনের অসমতার সঙ্গে সম্পর্ক থাকা সম্ভব। আমাদের খুঁজে দেখতে হবে কী ধরনের সেই সম্পর্ক এবং কীভাবে অসমতার এই বিশেষ দিকটিকে নির্মূল করা যায়।

এখানে আমাদের আলোচনা লিঙ্গভিত্তিক অসমতাকে নিয়ে, যা পৃথিবীর সব দেশেই বর্তমান, শুধু এক দেশ থেকে আর এক দেশের মধ্যে তার কিছু রকমফের আছে এবং মাত্রার প্রভেদ আছে। আমাদের এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী-পুরুষের অবস্থান এক নয়। জীবনের নানা দিকে, নানা ভাবে, মেয়েরা অবদমিত ও বৈষম্যের শিকার। পুরুষের সঙ্গে একই সুযোগ সুবিধা তারা পায় না। পারিপার্শ্বিক বহু ঘটনা ও পরিবর্তনের প্রভাব নারী-পুরুষের ওপর এক রকম ভাবে পড়ে না। এই দিকগুলো, এবং তার সঙ্গে জড়িত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে হবে, সমস্যার স্বরূপ নির্ধারণ করতে হবে ও তার উৎস খুঁজে বার করতে হবে। তবেই সেই সমস্যার সমাধানসূত্র খোঁজার কাজে এগনো সম্ভব।

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এ রকমই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যেখানে নারীজাতি পিছিয়ে আছে এবং বিভিন্ন ভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। এর সুযোগ সুবিধা তারা পুরুষের সঙ্গে সমান ভাবে পাচ্ছে না এবং এর প্রভাবও নারী-পুরুষের ওপর এক ভাবে পড়ছে না।

এই প্রসঙ্গে মনে প্রশ্ন আসতেই পারে যে কলা বিভাগের কথা বলছি না কেন? (বাণিজ্য, আইন, চিকিৎসাবিদ্যা, এ রকম আরও বিভাগ আছে— তবে এই প্রতিবেদনে সেগুলো নিয়েও আলোচনা করা হচ্ছে না) এই বিভাগটি কি ফ্যালনা? মানবজীবনে এর কি তেমন কোনও গুরুত্ব নেই? যদি থাকে, তা হলে এ আলোচনায় কলা বিভাগের স্থান নেই কেন? তুলনামূলক বিচারের জন্য কলা বিভাগের কথা আমরা অবশ্যই বলব। তবে প্রতিবেদনের শিরোনামে শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উল্লেখ থাকাটাই যথেষ্ট অর্থবহ। দেখা যায় যে, লিঙ্গ-বৈষম্যের প্রেক্ষিতে কলা বিভাগের স্থান এক দিকে, যেখানে মেয়েরা ঝাঁক বেঁধে আছে; এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্থান অন্য দিকে, যেখানে মেয়েদের উপস্থিতি অনেক কম। বিদ্যালয়ের ক্ষেত্র থেকে রোজগারের ক্ষেত্র পর্যন্ত এই পার্থক্য নজরে পড়ে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রেও মেয়েরা নানা ভাবে বৈষম্যের শিকার। তাই লিঙ্গবৈষম্যের চিন্তায় বিজ্ঞান-প্রযুক্তিক্ষেত্রের সমস্যাগুলি একটি বিশেষ মাত্রা পায়। আর এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে এক সঙ্গে আলোচনায় আনা হয়েছে, যদিও এ দুটি ভিন্ন শাখা এবং কিছু কিছু ব্যাপারে তাদের নিজস্ব সমস্যা ও সম্ভাবনা আছে।

কলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এই তিনটি বিভাগের অবস্থান সমাজের চোখে এক নয়। কেউ বলতে পারেন— তিনটি বিষয় তো আলাদা, তাতে আর ক্ষতি কী? মেয়েরা যদি কলা

বিভাগে বেশি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগে কম থাকে তাহলে অসুবিধা কোথায়? আবার কেউ এও বলতে পারেন যে এটাই 'স্বাভাবিক'। 'স্বাভাবিক' কি না সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে পরে আসছি। এখন বলি যে, তিনটি বিভাগ যদি শুধু আলাদা হত তাহলে নিয়মিত ভাবে মেয়েদের উপস্থিতি কলা বিভাগে বেশি এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে কম হবার সমস্যার আকারটা এত বড় হয়তো হত না। কলা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি— মানবজীবনে এদের সব ক'টিরই প্রয়োজন আছে, গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন প্রত্যেকটিরই, শুধু রকম ভিন্ন। কিন্তু আজকের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোয় এই তিনটিকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় না, হয়তো দেওয়া যায়ও না। শুধু আলাদা নয়, এদের স্তরভেদ করা হয়েছে। কলা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি— এইভাবে যেন নিম্নস্তর থেকে ক্রমশ উচ্চতর স্তরে যাওয়া। বিজ্ঞজনেরা নিশ্চয়ই মৌলিকভাবে এই স্তরভেদ করেন না। অন্তত সজ্ঞানে ও সোচ্চারে করেন না। সকলেই জানেন যে কলা বিভাগের বিষয়গুলি— যেমন সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান (অর্থনীতি বিষয়টিকে আজকাল অনেক জায়গায় বিজ্ঞান শাখার অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে) ইত্যাদি— জীবনদর্শন তৈরি করা এবং মানবজীবনের মান উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু আজকের বাজার-অর্থনীতি এবং ভোগবাদী সমাজের দুনিয়ায় জনমানসে সাধারণ ভাবে এ বিষয়গুলির গুরুত্ব তুলনায় অনেক কম। বাজারদর ছাড়া আর কোনও মূল্যায়নের তো স্থান নেই আজকের মানসিকতায়। তাই দর্শন, যাকে সব বিদ্যার জননী বা উৎস বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল, বাজারদরের পরিপ্রেক্ষিতে তার মূল্য আজ বেশি নয়। আমরা প্রযুক্তির যুগে বাস করছি। প্রযুক্তির পরিবর্তনের হার এখন আগের তুলনায় অনেক বেশি। এমন সব যুগান্তকারী আবিষ্কারের কথা ভাবা যায় যা মানুষের জীবনযাপনের ধারায় আমূল পরিবর্তন এনে দিচ্ছে। আজকের ব্যবহারিক জীবনে, রুজিরোজগারের ক্ষেত্রে, সামাজিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উচ্চতর স্থান। তাই এই বিভাগে নিয়মিত ভাবে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের কম উপস্থিতি অবশ্যই চিন্তার কারণ।

কিন্তু বহুদিন ধরে, নিয়মিত ভাবে, প্রায় সব দেশে, এ রকম হয়ে আসছে কেন? এই আলোচনা আমরা করতে পারি দুটি দিক থেকে— বিদ্যালাভের ক্ষেত্র এবং কর্মক্ষেত্র। আমাদের দেশে স্কুলের দশম শ্রেণির পরীক্ষায় যারা বেশি নম্বর পায় তারাই পরবর্তী পর্যায়ে বিজ্ঞান পড়ার সুযোগ লাভ করে। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সময় পড়াশুনায় 'ভাল' এই সব ছেলেমেয়েরা, যারা স্কুলের বিজ্ঞান শাখায় পড়েছে, তাদের মধ্যে প্রথমে প্রযুক্তিবিদ্যায় অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তির চাহিদা; তারপর বিজ্ঞান (এর মধ্যে ফলিত বিজ্ঞানেরই চাহিদা, কারণ শুদ্ধ বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে চাকরির সুযোগ কম)। রোজগারের সুযোগ বেশি বলে অনেকেই বিজ্ঞান শাখা থেকে অর্থনীতি নিয়ে ভর্তি হয়। নিজের রুচি অনুযায়ী কিছু 'ভাল' ছেলেমেয়ে কলা বিষয় নিয়ে ভর্তি হয় ঠিকই, কিন্তু এরা ব্যতিক্রম— সংখ্যায় অত্যন্ত কম।

কলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এই তিন শাখায় আপেক্ষিক ভর্তির হারের একটি চিত্র দেওয়া হল সারণি ১-এ।

সারণি ১

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে লিঙ্গভিত্তিক ভর্তির চিত্র

(১৯৭০-৭১ থেকে ১৯৯১-২০০০)

বিভাগ	১৯৭০-১৯৭১			১৯৮০-১৯৮১			১৯৯০-১৯৯১			১৯৯৯-২০০০		
	ক	খ	গ	ক	খ	গ	ক	খ	গ	ক	খ	গ
কলা												
বি এ	৫৩	৮১	১৫৩	৬৯	৩০০	৪৩৫	১০২	২৪০	২৩৫	১৩৬	২৭৪	২০১
এম এ	৭৪	২৪৬	৩৩২	৯১	২১৯	২৪১	৮৩	৩২২	৩৮৮	১৪৭	৩৬৪	২৪৮
বিজ্ঞান												
বি এসসি	৭৯	৩৬	৪৬	৯৩	২৬	২৮	১৪৪	৩৯	২৭	১৬৯	৬০	৩৬
এম এসসি	৭৩	৩৮	৫২	৯৯	১৯	১৯	৯৮	৩৪	৩৫	১১০	৫০	৪৬
ইঞ্জিনিয়ারিং												
বি ই	৬৪	১০	৩	৪০২	৩৪	৯	৫৫০	৮৫	১৫	৭০৮	৭৮	১১
এম ই	১১৬	২	২	১৪২	৮	৬	১৬২	৩০	১৯	২১৫	৩১	১৪

ক — ছাত্র সংখ্যা খ — ছাত্রী সংখ্যা গ — $\frac{\text{ছাত্র}}{\text{ছাত্রী}} \times ১০০$

এই পরিসংখ্যান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক বছরের ভর্তির নথি থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এই সারণি থেকে আলোচিত তিনটি শাখায় নারী-পুরুষের ভর্তির হারের তফাত স্পষ্টই চোখে পড়ে। কিন্তু এর কারণ কি? তিনটি সম্ভাব্য কারণ নিয়ে একটু চিন্তা করা যাক।

১. মেয়েদের কি সাধারণ ভাবে বুদ্ধি বা সহজাত ক্ষমতা ছেলেদের তুলনায় কম, কিংবা প্রাযুক্তিক দক্ষতা ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবের অভাব, যার জন্য তারা বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যার পড়াশুনা করে উঠতে পারে না, তাই কলা বিভাগে ভিড় করে? না। দেখা যায় যে, যে মেয়েরা এসব শাখায় ভর্তি হয় তারা ছেলেদের থেকে কোনও অংশেই পিছিয়ে থাকে না। পরীক্ষার ফলও ভাল করে। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে যে এ তো মুষ্টিমেয় কিছু মেয়েদের কথা, যারা হয়তো মেয়েদের মধ্যে পড়াশুনায় ভাল, বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন অথবা সহজাত ভাবে প্রযুক্তিগত দক্ষতার অধিকারী। এদের দিয়ে তো আর সব মেয়ের বিচার করা চলে না। বেশির ভাগ মেয়েরা তো স্কুল থেকেই বিজ্ঞান শাখায় থাকে না। যারা থাকে তাদের মধ্যেও অল্প সংখ্যকই প্রযুক্তিবিদ্যা বা বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হতে পারে। এর থেকে কী সাধারণ ভাবে মেয়েদের বিজ্ঞান-প্রযুক্তিভিত্তিক পড়াশুনায় দুর্বলতা প্রকাশ পায় না?

২. আবার এও হতে পারে যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির তুলনায় কলা বিভাগের বিষয়গুলি মেয়েদের পক্ষে বেশি উপযোগী। কারণ মেয়েদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং পারিবারিক ভূমিকার সঙ্গে এর বেশি মিল।

৩. নাকি মেয়েরা কলা বিভাগের বিষয়গুলি বেশি পছন্দ করে, তাই স্বেচ্ছায় প্রথমে শিক্ষা ও পরে কর্মের ক্ষেত্রে এ দিকেই যেতে চায়?

এই তিনটি সম্ভাব্য কারণ থেকে যে ইঙ্গিতটি আসে, খোলাখুলিভাবে কিংবা প্রচ্ছন্নভাবে, তা এই যে সহজাত প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা ও কর্মের জায়গায় নারীর স্থান পুরুষের থেকে নীচে। কলা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্তরভেদটি স্থানান্তরিত হয় নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উচ্চতর স্থানের ধারণা এইবার নারী-পুরুষের স্তরভেদকে আরও স্ফীত ও জোরদার করে।

কিন্তু ব্যাপারটিকে একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। মেয়েরা যে কলা বিভাগে বেশি এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে কম আসে, তার আসল কারণ কী? কোথা থেকে এর উৎপত্তি? একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে যে এর উৎস নিহিত আছে সামাজিক লিঙ্গ বিভেদে, যা নারী-পুরুষ সকলের মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই বিভেদ প্রকৃতিগত নয়, সহজাত বা স্বাভাবিক নয়— পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মানুষের তৈরি, যার সাহায্যে নারীকে অবদমিত রাখা হয়েছে। একে 'স্বাভাবিক', 'কাম্য' আখ্যা দেওয়া হয়েছে যাতে এর ফলাফল নিয়ে কেউ প্রশ্ন না তোলে, মেনে নেয়। শিশু অবস্থা থেকেই কন্যা ও পুত্র সন্তানকে সামাজিক লিঙ্গ বিভেদ অনুযায়ী তাদের নিজ নিজ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকা কী হওয়া উচিত তা সম্বন্ধে বার বার নানা ভাবে সচেতন করানো হয়। পরিবারে, স্কুলে, সমাজের সর্বত্র যে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া চলে তার দ্বারা এই ধারণাগুলি 'স্বাভাবিক', 'অভিপ্রেত' এই সব আখ্যা নিয়ে তাদের মনে গেঁথে যায়, তাদের মানসিকতা শর্তাবদ্ধ হয়ে পড়ে। মেয়েরা স্ত্রী ও মা হিসাবে, সুগৃহিণী হিসাবে, তাদের জীবনের সার্থকতা খুঁজতে শেখে। সেই মতো শারীরিক ও চারিত্রিক গঠন, শিক্ষা অর্জন করতে সচেষ্ট হয়, যাতে নারীর 'উপযুক্ত' ভূমিকা তারা পালন করতে পারে। ছেলেরা শেখে যে তাদের রোজগার করতে হবে, পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হবে। সেই মতো শারীরিক ও চারিত্রিক গঠন ও শিক্ষা অর্জন তাদের লক্ষ্য। তাই যে শিক্ষা রোজগারের পথে বেশি সহায়ক হবে সেই শিক্ষা তার চাই। তার জন্য তাকে কোমর বেঁধে লেগে পড়তে হবে, জোরদার চেষ্টা চালাতে হবে, পারছি না বা ভাল লাগে না বললে চলবে না, কারণ এর ওপরে তার পুরুষসত্তার জয়-পরাজয় নির্ভর করছে। তাই, তার ব্যক্তিগত রুচিসম্মত না হলেও, তার ঝোঁক সেদিকে না থাকলেও, সে ধরনের শিক্ষা বা কাজের ক্ষেত্রে তার কিছু অক্ষমতা থাকলেও, সে প্রাণপণ চেষ্টা করে বিজ্ঞান বা বাণিজ্য শাখায় ভর্তি হতে, যাতে সে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ইত্যাদি হতে পারে, কারণ, তবেই সে রোজগারের জায়গায়, পরিবারে এবং সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করবে। মেয়েদের বেলায় চিত্রটি ঠিক উলটো। সে জানে পড়াশোনার শেষে তার বিয়ে হবে, সে মা হবে, সুগৃহিণী হবে। তার স্থান ঘরে— সাধারণ ভাবে তার রোজগার করার প্রয়োজন নেই। তার নিজস্ব পরিচয়, তার নিজের সত্তার বিকাশ, এসবকে গুরুত্ব দিতে তাকে শেখানো হয়নি। বরঞ্চ খানিকটা নিরুৎসাহই করা হয়েছে, কারণ মেয়েরা স্বাধীনচেতা হলে সংসারের অসুবিধা বলেই মনে

করা হয়। আর যদি সে বাইরের কাজে বেরোয় তা হলে আজও বেশির ভাগ মধ্যবিত্ত পরিবারে মনে করা হয় যে শিক্ষকতা বা গবেষণা বাড়ির মেয়ে-বউদের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত কাজ। এই মানসিকতা কিছু কিছু পালটাচ্ছে নিশ্চয়ই, তবে কাঠামোটা এখনও ভাল ভাবেই কায়েম আছে। তাই প্রায়শই মেয়েরা বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হবার জন্য বেশি পরিশ্রম বা চেষ্টা করার প্রয়োজনবোধ করে না। তার একটা ডিগ্রি হলেই চলবে— কলা বিভাগের হলেও ক্ষতি কিছুই নেই। বিয়ের জন্যও ডিগ্রির প্রয়োজন হয়। আর শিক্ষকতা বা গবেষণার কাজ করতে চাইলেও বিজ্ঞানের তুলনায় কলা বিভাগের সম্ভাবনা কিছু কম নয়। 'মেয়েরা অঙ্কে কাঁচা'— এই ভুল ধারণা শুধু আমাদের দেশে নয়, ধনী দেশেও আজও রয়েছে। এ কথা স্কুলের শিক্ষকরাও ছাত্র-ছাত্রীদের বলছেন। মেয়েদের নিরুৎসাহ করার আর কী নজির চাই? সামাজিক লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকার ছকে বন্দি না থেকে মেয়েরা যদি ছেলেদের মতো সমান উৎসাহ ও উদ্যম নিয়ে চেষ্টা করত, তা হলেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় মেয়েদের উপস্থিতি ছেলেদের তুলনায় কম হত এ কথা পরীক্ষা না করে বলা চলে না। এ সুযোগ বা পরিবেশ মেয়েরা পায়নি, তাই সহজাত বুদ্ধির অভাব কিংবা বৈজ্ঞানিক মনোভাবের অভাবের যুক্তি ধোপে টেকে না।

এরপরে আসে কলা বিভাগের বিষয়গুলি মেয়েদের পক্ষে বেশি উপযোগী হবার প্রশ্ন। মেয়েদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকা, আর তার সঙ্গে মিল রেখে বিদ্যালাভ এবং কর্মক্ষেত্রের ব্যাপারে লিঙ্গভিত্তিক উপযোগিতা ঠিক করল কে? সেই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। এই অনুশাসন থেকে বেরোতে পারলে মেয়েরা কলা বিভাগে থাকার চাপ থেকে মুক্তি পাবে এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যাবার উৎসাহ পাবে। তাই কলা বিভাগ মেয়েদের পক্ষে বেশি উপযোগী এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তি উপযোগী নয় এ ধারণাও সমাজের আরোপিত— মেয়েদের সহজাত কিছু নয়।

সবশেষে আসে পছন্দের কথা। সেখানেও সেই সামাজিক লিঙ্গ বিভেদ কাজ করছে। আমাদের পছন্দ বা রুচি তো সব সময় প্রকৃত অর্থে স্বাধীন বা সহজাত নয়। তা পরিবেশ, সামাজিকীকরণ দ্বারা প্রভাবিত। তাই প্রায়শই ছেলেরা বা মেয়েরা সেই ধরনের শিক্ষা, সেই ধরনের কাজ, সেই ধরনের জীবন 'বেছে নেয়' যা তাদের ছকবন্দি মানসিকতায় নিজ নিজ লিঙ্গসত্তার 'উপযুক্ত'। অতএব বলাই যেতে পারে যে মেয়েরা কলা বিভাগে ভিড় করে এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তি থেকে সরে থাকে এটা অনেক সময় তাদের স্বাধীন পছন্দ-অপছন্দের প্রকাশ নয়— সমাজের চাপিয়ে দেওয়া মানসিকতার আর একটা রূপ মাত্র।

তাই আমাদের এই লিঙ্গবৈষম্যদুষ্ট সমাজে, শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন শাখায় নারী-পুরুষের ভর্তির অনুপাত দেখে তাদের পছন্দ ও ক্ষমতা সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে আসে উচিত নয়। বরঞ্চ প্রত্যেকে যাতে প্রকৃত অর্থে সমান সুযোগ ও স্বাধীনতা নিয়ে শিক্ষা ও কর্মের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে তার দিকে নজর দেওয়া দরকার। শিশু অবস্থা থেকে যদি মেয়েরা ছক্‌বন্দি মানসিকতা নিয়ে বড় হয়ে ওঠে তা হলে আপাতদৃষ্টিতে ব্যবহারিক দিক থেকে সমান সুযোগ পেলেও সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

ভরসার কথা এই যে, অবস্থা ধীরে ধীরে হলেও পালটাচ্ছে। সামাজিক লিঙ্গ বিভেদের আগল কিছুটা শিথিল হচ্ছে। আগের তুলনায় বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় ভর্তির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের অনুপাত বাড়ছে। মেয়েরা এখন মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মতো বিষয় নিয়েও পড়াশোনা করছে।

কিন্তু চাকরির বাজারের অবস্থা কী? কিছুদিন আগেও পুরুষের প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্যের জায়গায় ঢুকতে গিয়ে মেয়েরা যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হয়েছে। চাকরির অভাব, চাকরি পেলেও ছেলেদের তুলনায় কম পারিশ্রমিক ইত্যাদি। আজকাল অবশ্য প্রযুক্তিবিদ্যায় ডিগ্রিপ্রাপ্ত মেয়েদের চাকরির সমস্যা ততটা নেই। তার কারণ, আজকাল ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে প্রযুক্তিবিদ্যায় পাশ করা সকলেই (তা সে যে কোনও বিষয় নিয়েই পাশ করে থাকুক) সফ্টওয়ার (Software)-এর ক্ষেত্রে চাকরি পাচ্ছে। ইনফরমেশন টেকনোলজি (I.T) ক্ষেত্রের রমরমা অবস্থার সুযোগ মেয়েরাও পাচ্ছে। এই কাজে সকলেই চাকরিকালীন অবস্থায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পাচ্ছে, তবে প্রযুক্তিবিদ্যার যা কিছু পড়েছিল তা বিশেষ কাজে লাগছে না। যদি কোনও সময় আই.টি ক্ষেত্রে তুলনায় মন্দা আসে তাহলে চাকরি পাবার ব্যাপারে মেয়েদের আবার বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে কিনা বলা যায় না। চাকরির সংখ্যা কমে গেলে লিঙ্গবৈষম্যজনিত সমস্যা মাথাচাড়া দিতেই পারে।

এতক্ষণ আমরা যে মেয়েদের কথা বলছিলাম তারা মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত পরিবারভুক্ত এবং মোটামুটি শহর অঞ্চলের। গ্রামের ছেলেমেয়েরা, বা শহর অঞ্চলেরও যারা নিম্নবিত্ত পরিবারভুক্ত, তারা ছেলেমেয়ে উভয়ই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় শিক্ষালাভ করার সুযোগ কম পায়। সেখানে মেয়েদের সমস্যা আরও অনেক বেশি। আজকাল ডিপ্লোমা পর্যায়ে প্রযুক্তির শিক্ষা দেবার কিছু কিছু ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু যে সব মেয়েরা কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পাশ করছে তাদের প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের গুরুতর সমস্যা। এখানে লিঙ্গ বৈষম্যের প্রকট রূপ। পরীক্ষায় ভাল করে, ইন্টারভিউ ভাল দিয়েও মেয়েটির চাকরি হল না। কারণ? 'আবার আলাদা করে মেয়েদের বাথরুম করতে হবে', সম্ভাব্য নিয়োগকর্তার উত্তর! কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে মেয়েদের বিরুদ্ধে এ রকম বৈষম্যমূলক আচরণের বহু নজির পাওয়া যায়। এই দিকে বিশেষ নজর দেবার প্রয়োজন। আশার কথা এই যে, উপযুক্ত সুযোগ পেলে মেয়েরা কারিগরি শিক্ষায় আসার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাচ্ছে। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণেরও কিছু কিছু সুযোগ মেয়েরা এখন পাচ্ছে, কিন্তু এখনও এখানে জোর রয়েছে নারীর 'উপযুক্ত' কাজের ওপর যেমন সেলাই, বোনা, খাদ্য সংরক্ষণ, বিউটিশিয়ানের কাজ ইত্যাদি। মেয়েদের রোজগারের ব্যবস্থার জন্য এ সবের প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু এখানেই থেমে থাকলে চলবে না। লিঙ্গভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও কাজের আওতা থেকে বেরিয়ে সব রকম কাজে আসার সুযোগ মেয়েদের করে দিতে হবে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তিসংশ্লিষ্ট বৃত্তিতেও মেয়েরা আসবে। শুধু মানসিক ও ব্যবহারিক বাধাগুলো দূর করার অপেক্ষা।

লিঙ্গভিত্তিক অসমতার আর একটি দিক খুলে যায় যখন আমরা নারী জীবনে প্রযুক্তির প্রভাবের কথায় আসি। প্রযুক্তির প্রভাব আমাদের দেহ-মন, চিন্তা-ভাবনা, আমাদের মানসিকতা,

অনুভূতি, সব কিছুকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে এ ব্যাপারে আমাদের বিচারবোধ অনেক সময়ই কাজ করে না, বিচার করার প্রয়োজনও বোধ হয় না। প্রযুক্তি যেন এক জাদুদণ্ড যার ছোঁয়ায় সমাজের উত্তরণ হয় দারিদ্র্য থেকে সমৃদ্ধিতে; স্থিতিশীলতা থেকে অগ্রগতিতে; দুর্বলতা থেকে শক্তিতে; দাসত্ব থেকে মুক্তিতে।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? সমাজের অগ্রগতির মানে কী? এর তো নানা দিক আছে। এমনকী অর্থনৈতিক উন্নতিই তো একমাত্র কথা নয়। তা ছাড়া সমাজে কত ধরনের দুর্বলতা আছে, কত ধরনের দাসত্ব আছে— কিছু খোলাখুলি ভাবে, কিছু পরোক্ষ ভাবে। এ সব কিছুর প্রতিকার কি প্রযুক্তির জাদু ছোঁয়ায় সত্যিই আছে? নাকি নতুনতর প্রযুক্তি আমাদের কিছু দুর্বলতা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে; কোথাও কোথাও নতুন নতুন দাসত্বের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে? তাই, নতুন প্রযুক্তি মানেই জাতির উন্নতি; এ কথা বলি কেমন করে? বিশেষ বিশেষ প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলাফল কী দাঁড়াল তা খতিয়ে দেখা দরকার। আজ যখন অগ্রগতির সংজ্ঞা নিয়ে নানা চিন্তাভাবনা হচ্ছে, তখন এই প্রশ্নগুলি এড়িয়ে চলা যায় না।

আরও মনে রাখতে হবে যে মানবসমাজ একটি সমমাত্রিক গড়ন (homogenous entity) নয়। এর মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী আছে— যেমন ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-বর্ণের মানুষ ইত্যাদি। সমাজ জীবনে সব গোষ্ঠীর অবস্থান ও ক্ষমতা সমান নয়। সামাজিক কোনও ঘটনা বা পরিবর্তনের প্রভাব সব গোষ্ঠীর ওপর সমানভাবে পড়ে না। তাই সামগ্রিক ভাবে দেশের কী উন্নতি হল, সমাজ কোন দিকে যাচ্ছে, মানবজাতির কী প্রয়োজন, শুধু এই আলোচনাই যথেষ্ট নয়; গোষ্ঠীভিত্তিক বিশ্লেষণেরও প্রয়োজন।

সার্বিকভাবে, নানা দিক থেকে, প্রযুক্তি আমাদের উন্নয়নে সাহায্য করেছে এ কথা অনস্বীকার্য। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা লিঙ্গবৈষম্য বাড়িয়েও তুলেছে। কখনও কখনও প্রযুক্তি নারী-শোষণ ও নারী-নির্যাতনের হাতিয়ারও হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর দু'-একটি উদাহরণ দেখা যাক।

যন্ত্রের প্রবর্তন হওয়ায় কৃষিকাজে এবং কলকারখানাতে উৎপাদনশীলতা বেড়েছে, উৎপাদন বেড়েছে, জিনিসের দামও কিছুটা কমেছে। কিন্তু একই সঙ্গে অনেক জায়গায় মেয়েদের কাজের সংস্থান কমে গেছে, তারা উৎখাত হয়ে গেছে। কেন এমন হচ্ছে? যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ালে একই কাজ করতে যেমন কম লোক লাগে, তেমনি নতুন কলকারখানা তৈরি হলে কর্মসংস্থান বাড়ে। আমাদের দেশে এই দুটি দিকের সামঞ্জস্য সব সময় ঠিকমতো না হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, বেকারত্বের সমস্যা বেড়েছে। তবে বিকল্প কাজ পাবার সুযোগ ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অনেক কম, তাই এই সমস্যার আকার মেয়েদের বেলায়, বিশেষ করে গ্রামে ও শহরে নিম্নবিত্ত পরিবারভুক্ত মেয়েদের ক্ষেত্রে, অনেক বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—

ক. চালের কল হবার ফলে মেয়েদের ধান ভানার কাজ বন্ধ হয়ে গেছে।

খ. হায়দ্রাবাদ অঞ্চলে তামাকের কারখানায় থ্রেশিং মেশিন আসার ফলে হাজার হাজার মেয়ে কর্মহীন হয়ে পড়ে।

গ. আমাদের দেশের মেয়েরা প্রথাগত ভাবে অনেক রকমের খুবই উচ্চমানের 'দক্ষ' কাজ করে এসেছে যাকে ক্রাফ্‌ট (Craft)-এর আওতায় ফেলা হয়। আজকের কলকারখানার যুগে এ গুলো প্রায় উঠেই যেতে বসেছে। এগুলো তৈরি ও বিক্রির তেমন কোনও ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। আবার মেয়েদের বিকল্প যন্ত্রনির্ভর দক্ষ কাজও শেখার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে যান্ত্রিকীকরণের ফলে এ ধরনের সমস্যা তো ছেলেদের ক্ষেত্রেও হতে পারে, হয়ও। তা হলে মেয়েদের জন্য আলাদা করে চিন্তিত হবার কারণ কী? কারণ এই যে বিকল্প কাজের ব্যবস্থা বা সুযোগ ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অনেক কম— প্রায়শ নেই বললেই চলে। নতুন কাজের জন্য ছেলেরা বাড়ির থেকে দূরে গিয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিতে পারে, কাজও করতে পারে। রোজগারের জন্য তারা বাড়ির বাইরে থেকে মাঝেমধ্যে বাড়ি থেকে ঘুরে গেলেই চলবে। মেয়েদের সে সুযোগ নেই। লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকার ছকে ঘর সামলানোর দায়িত্ব মেয়েদের— তাই অন্যত্র যাওয়া তাদের সম্ভব নয়। ঘরে থেকে যদি কোনও রোজগার করা যায় শুধু সেই সুযোগই তারা নিতে পারে। এবং এ রকম বিকল্প সুযোগ থাকে না বলে অনেক মেয়েরা কর্মহীন হয়ে পড়ে। গরিব ঘরের এই মেয়েদের সামান্য রোজগারের সুযোগও বন্ধ হয়ে যায়। এখানে আমরা শহরের উচ্চবিত্ত, শিক্ষিত মহিলাদের কথা ততটা বলছি না, যাদের অনুপাত আমাদের মতো গরিব দেশে খুবই কম। আরও দেখা যাচ্ছে যে যতদিন কোনও কাজ পুরোপুরি বা প্রায় অদক্ষ শ্রমিকের কাজ ছিল ততদিন মেয়েরা সেই কাজ করে এসেছে। এগুলো বেশির ভাগ অসংগঠিত ক্ষেত্রে পড়ে এবং পারিশ্রমিকও খুব কম। সেই সব কাজই যখন যন্ত্রনির্ভর, দক্ষ কাজ হয়ে যায়, তার পারিশ্রমিক বেড়ে যায়, অনেক সময় তা সংগঠিত ক্ষেত্রের আওতায় এসে যায়, তখনই মেয়েদের ছাঁটাই করে সেখানে ছেলেদের নেওয়া হয়। এই সব প্রযুক্তির ব্যবহার অনায়াসেই মেয়েদের শিখিয়ে নেওয়া যেত কিন্তু প্রায়শই তা করা হয় না। অন্যান্য অবদমিত গোষ্ঠীর মতো এই মেয়েদেরও সাধারণ ভাবে সব থেকে নীচের তলার, কম মাইনের, অদক্ষ কাজগুলোই করতে দেওয়া হয়। প্রযুক্তির ব্যবহারে সেই কাজের মান ও মাইনের উন্নতি হলেই তা মেয়েদের নাগালের বাইরে চলে যায়, কারণ তাদের প্রযুক্তিগত শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ দেওয়া হয় না। নারী-পুরুষের কাজের ভাগ স্পষ্ট ভাবে আলাদা করে রাখতে পারলে মেয়েদের কম এবং ছেলেদের বেশি মাইনে ও সুযোগ দিতে অসুবিধে হয় না। তাই এই ব্যবস্থা। এইভাবে কলকারখানায় প্রযুক্তিগত উন্নতির লাভ নারী-পুরুষ সমান ভাবে পায় না, বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রেই তাদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যবধান আরও বেড়েই যায়। এসবের জন্য দায়ী প্রযুক্তি নয়, দায়ী আমাদের লিঙ্গভিত্তিক পক্ষপাতদুষ্ট সমাজব্যবস্থা যেখানে সব ব্যাপারেই মেয়েদের ছেলেদের থেকে নীচে থাকাটাই 'স্বাভাবিক' ও 'কাম্য' বলে নারী-পুরুষ সকলকেই শিশু অবস্থা থেকেই বোঝানো হয়।

এ কথা সত্যি যে ইলেকট্রনিক্স শিল্পের মতো অতি আধুনিক প্রযুক্তির শিল্পে প্রচুর মেয়েরা কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ তৈরির কাজে নিযুক্ত হয়। কিন্তু কেন? কারণ এই সব কাজ তুলনায়

শ্রমনিবিড় (labour intensive), একঘেয়ে এবং অস্বাস্থ্যকর, যা করলে প্রায় অল্প সময়ের মধ্যে নানা রকম মারাত্মক ব্যাধির কবলে পড়তে হয়। প্রায়শই কম বয়সে কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। এসব কাজে মেয়েদের নিয়োগ করাই পছন্দ করেন শিল্প-মালিকরা। যুক্তি? 'স্বাভাবিক ভাবে' নাকি পুরুষের চাইতে নারীর ধৈর্য বেশি, তাই এই একঘেয়ে কাজের জন্য নারীই বেশি উপযুক্ত! এই সব শিল্পের উঁচুতলার কাজে কিন্তু পুরুষেরই প্রাধান্য এবং দেখা যাচ্ছে এখানেও নারীর লিঙ্গভিত্তিক শোষণ— শুধু একটু অন্য ভাবে। এখানেও সেই লিঙ্গ ভিত্তিক চারিত্রিক বিভাজনকে মেয়েদের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো হচ্ছে, মানুষের তৈরি এই ব্যাপারটিকে 'স্বাভাবিক' আখ্যা দিয়ে।

মেয়েদের ঘরকন্নার কাজের ভার লাঘব করার ব্যাপারে প্রযুক্তির অবদানের কথা ভাবতে গেলেই মনে আসে নানা বিচিত্র গ্যাজেটের কথা— বৈদ্যুতিক ইস্তিরি, রেফ্রিজারেটর, ওভেন, মাইক্রোওয়েভ, জামা-কাপড় কাচার যন্ত্র ইত্যাদি আরও কত কিছু! কিন্তু লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজনটি কায়েম রেখে এই সব গ্যাজেটের আগমন লিঙ্গভিত্তিক অসমতা আদৌ কমাবে কি? তা ছাড়া এ সব ব্যবহারের সুযোগ আমাদের মতন গরিব দেশে অত্যন্ত কম মেয়েরাই পেয়ে থাকে। কিন্তু আজও গ্রামের গরিব ঘরের মেয়েদের বহু দূর থেকে জল আনতে হয়। অনেক সময় তাও পাওয়া দুষ্কর হয়। দুঃখের কথা এই যে, আজও প্রযুক্তির জাদুদণ্ডকে ব্যবহার করে মানুষের এই ন্যূনতম প্রয়োজনের সমস্যার সমাধান করা যায়নি। করা যায়নি, নাকি করা হয়নি? গরিব লোকের সমস্যা এবং মেয়েদের সমস্যা (মানে মেয়েদের কাজ)— এই জন্যেই কি এই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন মেটানোর সমস্যাকে প্রাধান্য দেওয়া হল না? রান্নার জন্য জ্বালানির অভাব, কেরোসিন অগ্নিমূল্য, গাছ কাটার ফলে নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তাই একটি বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে রান্নার জন্য গোবর গ্যাসের ও 'সোলার' চুল্লির ব্যবহারের চেষ্টা চলছে। কিন্তু এই সব চুল্লি বিকল হলে ছোটখাটো সমস্যার কী করে সমাধান করা যায় তা মেয়েদের শেখানো হচ্ছে না। প্রযুক্তির ব্যবহার চালু করতে বলা হচ্ছে মেয়েদের, কিন্তু সেই প্রযুক্তির সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণের পদ্ধতি তাদের শেখানো হচ্ছে না। এই অবস্থায় সে আবার নতুন ভাবে পুরুষনির্ভর হয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছে। যে রান্নাঘরে ছিল তার অনায়াস অধিকার, সেখানেও পুরুষের কর্তৃত্ব এসে যাচ্ছে। রান্না এবং সংশ্লিষ্ট কাজের দায়িত্ব কিন্তু মেয়েদেরই থেকে যাচ্ছে। মেয়েরা যে সব কিছুতেই ছেলেদের থেকে পিছিয়ে আছে এবং থাকবেই— এই ভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার করলে এই ধারণাই সমাজের মানসিকতায় আরও বদ্ধমূল হবে— তার আরও একটা নজির স্থাপিত হবে। এই পরিণাম এড়াতে হলে সব শ্রেণির মেয়েদের প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দিতে হবে— প্রযুক্তি তৈরির প্রক্রিয়ায় মেয়েদের যুক্ত করতে হবে।

নারীজীবনে প্রযুক্তির ভয়াবহ অপব্যবহারের উদাহরণ হল এমনিওসেনটেসিস (amniocentesis)। এটি এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে গর্ভজাত শিশুর শারীরিক বিকার বা অসুস্থতা সম্বন্ধে জানা যায় এবং সম্ভব হলে গর্ভাবস্থাতেই শিশুটির চিকিৎসা শুরু করা যায়। যদি এর কোনও চিকিৎসা না থাকে এবং বিকার বা অসুস্থতা যদি গুরুতর হয়, তা

হলে প্রয়োজনবোধে ভ্রূণটিকে প্রসব করানো বা না করানো সম্বন্ধে ডাক্তার ও পরিবারের সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু আমাদের সমাজে এমনিওসেনটেসিস পদ্ধতিটি একটি পাশবিক কাজে লাগানো হচ্ছে। অনেক সময় গর্ভস্থিত ভ্রূণটি স্ত্রী না পুরুষ (sex determination)— শুধুমাত্র এই জানার জন্যই এমনিওসেনটেসিস করা হচ্ছে এবং স্ত্রী ভ্রূণ হলে তাকে হত্যা করা হচ্ছে। আইন করেও একে বন্ধ করা যাচ্ছে না— চাই মানসিকতার পরিবর্তন— চাই লিঙ্গভিত্তিক স্তরভেদের অবসান। না হলে এর পরে আরও উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে জিন-প্রযুক্তিবিদ (Genetic engineer)-রা যদি লিঙ্গ নির্বাচন (sex selection)-এ সক্ষম হয়ে ওঠেন, তা হলে আমাদের মতো দেশে, যেখানে নারী-পুরুষের অনুপাত এখনই স্বাভাবিকের থেকে অনেক কম, তা বিপজ্জনক ভাবে কমে যাবার সম্ভাবনা। এর জন্যেও দোষী প্রযুক্তি নয়, দোষী প্রযুক্তির ব্যবহার, যার পিছনে রয়েছে আমাদের লিঙ্গবৈষম্যযুক্ত সমাজব্যবস্থা— আমাদের পুত্রাকাঙ্ক্ষা।

আমাদের এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির 'উন্নতিই' লিঙ্গসমতা আনতে বা সেই দিকে আমাদের নিয়ে যেতে সক্ষম নয়। এর সুযোগ সুবিধা মেয়েরা অনেক কম পায়— শিক্ষা এবং কর্ম দুই ক্ষেত্রেই। তা ছাড়া, এদের ব্যবহারও প্রায়শই লিঙ্গ ভিত্তিক নানা ব্যবধান কমানোর বদলে বরঞ্চ বাড়িয়ে দেয়। তবে কি বিজ্ঞান-প্রযুক্তির থেকে সরে যাব? এর অপার সম্ভাবনা মানুষের কাজে লাগাব না? না, কখনওই তা নয়। শুধু খেয়াল রাখতে হবে যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি যেন সার্বিক ভাবে মানুষের কল্যাণসাধন করে, কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর নয়।

অন্যান্য নানা দিকের মতো বিজ্ঞান-প্রযুক্তিও যে লিঙ্গ অসমতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার জন্য দায়ী আমাদের লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজন, যার সঙ্গে মিশে আছে লিঙ্গভিত্তিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরও ছক। লিঙ্গের ভিত্তিতে সমাজ শুধু ছকবন্দি নয়। এই ছক এমনি যে তার আওতায় নারী-পুরুষ থাকবন্দি হয়ে আছে। নারী পুরুষের থেকে শুধু আলাদা নয়, নারীর স্থান পুরুষের নীচে। এর থেকেই পুত্রাকাঙ্ক্ষা, শিশু কন্যা ও নারীর প্রতি অবহেলা, নির্যাতন। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের এই নারীবিরোধী বৈষম্যদুষ্ট লিঙ্গবিভেদ, যা 'স্বাভাবিক' মোটেই নয়, তার অবসান ঘটানোর একান্ত প্রয়োজন। তার জন্য চাই সমতার জীবনদর্শন, মূল্যবোধ। এই সমতার পরিবেশ আনতে পারলে লিঙ্গসমতাও তার মধ্যে একটি, সমাজের অসমতা দূর করতে পারলে, তবেই বিজ্ঞান-প্রযুক্তির (আরও অনেক কিছুর মতো) প্রকৃত কল্যাণকর ব্যবহার সম্ভব। কিন্তু কীভাবে এই সমতার পরিবেশ আসবে?

মনে রাখতে হবে যে মানব সমাজের প্রকৃতি ও চরিত্র নিশ্চল, অনড় নয়— তা চলমান, গতিশীল। মানুষের চিন্তা-ভাবনা, জ্ঞান-বিদ্যা, কাজকর্ম যেমন তার দ্বারা প্রভাবিত হয় তেমনি মানব সমাজের পরিমণ্ডলও মানুষের চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়, বদলায়, নতুন করে তৈরি হয়। কিন্তু প্রথমটি যেমন সাধারণত মানুষের অজ্ঞাতসারেই হতে থাকে— এই প্রভাবের অস্তিত্বও প্রায় তার কাছে অজ্ঞাতই থেকে যায়; দ্বিতীয়টি কিন্তু অনেক সময় সজ্ঞান প্রচেষ্টার দ্বারা আনতে হয়। এর জন্য সমাজের ভিতরে থেকেও চিন্তনের ক্ষেত্রে

সমাজের বাইরে এসে, সেই সমাজকে দেখতে হয়, তার চরিত্র বুঝতে হয়, তার গুণাগুণ বিচার করতে হয়। যা কিছু কল্যাণকর তাকে ধরে রেখে, যা কিছু মন্দ, পশ্চাৎগামী তাকে সরাতে হয়। এই ভাল মন্দের বিচার করতে হলে সমাজ থেকে পাওয়া, শিশুকাল থেকে মনে গেঁথে যাওয়া, 'স্বাভাবিক'-এর ফাঁদ থেকে বেরিয়ে এসে অনুভব করতে হয়, বিচার করতে হয়, বদলাতে হয়। এই কাজের শুরু অনুভূতির স্তরে, বোঝার স্তরে, চিন্তার স্তরে— তা সে জ্ঞাতে, অজ্ঞাতে যেমন ভাবেই আসুক— এবং তারপর ব্যবহারিক স্তরে, কর্মক্ষেত্রে। শুধু বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বলে নয়, শুধু লিঙ্গসমতার জন্য নয়— সার্বিক ভাবে মানবসমাজের অসমতা দূরীকরণ এবং সব মানুষের প্রকৃত কল্যাণে অর্জিত বিদ্যাকে কাজে লাগানোর জন্য এই প্রচেষ্টার আশু প্রয়োজন।

রাজশ্রী বসু

নারী ও উন্নয়ন

উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনা, উন্নয়ন-বিদ্যা ইত্যাদি আজকের দিনে সমাজবিজ্ঞান-চর্চার একটি অপরিহার্য উপাদান হয়ে উঠেছে। বস্তুত, বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে মানব-উন্নয়নবিদ্যা বা Human Development Studies এম ফিল-স্তরে স্বতন্ত্র course হিসেবে পড়ানো হয়, এমনকী স্নাতকোত্তর পর্যায়েও অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ পত্র হিসেবে তা পড়ানো হচ্ছে। সুতরাং, উন্নয়ন-সম্পর্কিত আলোচনা বৌদ্ধিক চর্চার পরিসরে একটি নিজস্ব স্থান যে করে নিতে পেরেছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

প্রশ্ন হল, উন্নয়ন-বিদ্যা বলতে ঠিক কী বোঝায়। কোন কোন বিষয় এই চর্চার আঙিনার মধ্যে পড়ে? কাদের উন্নয়নের কথা সেখানে তুলে ধরা হয়? নারীদের উন্নয়নই বা একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে কেন?

প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমরা দেখি যে উন্নয়ন-বিদ্যা বিষয়টি সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা— যেমন ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, জনসংখ্যাচর্চা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, মানবীবিদ্যা, পরিবেশবিদ্যা প্রমুখ শাস্ত্রের চর্চা, অবদান প্রভাব ও সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। উন্নয়ন-বিদ্যার প্রধান আলোচ্য বিষয়, মানবোন্নয়ন বা মানুষের উন্নয়ন। যদিও স্বাভাবিকভাবেই এখানে একটি প্রশ্ন এসে যায়। মানব-উন্নয়ন বলতে আপামর জনগণের উন্নয়ন বোঝানো হচ্ছে তো, না কি, কোনও বিশেষ শ্রেণি, গোষ্ঠী বা জাতির উন্নয়নকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে?

বলে নেওয়া প্রয়োজন, বৌদ্ধিক শাস্ত্র হিসেবে উন্নয়ন-বিদ্যা সমস্ত জনগণের উন্নয়নের কথাই বলে। তবে যে-সব জনগোষ্ঠী উন্নয়ন কর্মযজ্ঞে চিরকালই প্রান্তিক থেকে গেছে, তাদের উন্নয়নের কথা এই শাস্ত্র সবিশেষ গুরুত্ব সহকারে বলে থাকে।

'উন্নয়ন' বিষয়টি আলোচনা করতে গেলে দুটি দিকের ওপর বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, মানবজাতির উন্নয়ন মুখ্য বিষয়বস্তু হলেও সমগ্র প্রাকৃতিক ও জৈব পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে কী ভাবে মানব-উন্নয়ন সম্ভব— আজকের দিনের উন্নয়ন-বিদ্যা তার উপরে নজর দেয়। দ্বিতীয়ত, 'উন্নয়ন' শব্দটিই একটি জটিল আবর্তের মধ্য দিয়ে

চলেছে। 'উন্নয়ন' বলতে ঠিক কী বোঝায়— শুধু মাত্র অর্থনৈতিক উন্নতি না কি অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতিও 'উন্নয়ন' প্রক্রিয়ায় জড়িত— তা আজ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। শুধু তাই নয়, অর্মত্য সেনকে অনুসরণ করে স্বাধীনতার (ব্যক্তিগত) প্রসার ও ব্যাপ্তিকেই উন্নয়ন বলা হবে, না কি, পশ্চিমি- শিল্পভিত্তিক উন্নয়নের পরিবর্তে পরিবেশ-ভারসাম্য রক্ষাকারী গান্ধীবাদী বিকল্প-উন্নয় জরুরি— এ সবই আজ 'উন্নয়ন-বিদ্যা'র বিতর্কিত বিষয়।

একটা সময় ছিল যখন উন্নয়ন-বিদ্যা মূলত অর্থনীতিবিদদের আলোচনার এক্তিয়ারে পড়ত এবং সম্ভবত সেই কারণেই অর্থনৈতিক উন্নতি, যেমন জাতীয় আয়বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি— এগুলিই উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে চিহ্নিত হত। কিন্তু ধীরে ধীরে বিভিন্ন শাস্ত্রের গবেষক ও আলোচকদের লেখালিখির প্রভাবে উন্নয়ন-বিদ্যা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য মাপকাঠি জাতিপুঞ্জ তার উন্নয়ন-সংক্রান্ত রিপোর্ট (Human Development Report)-এ ব্যবহার করে থাকে। সেই মাপকাঠির কিছু এখানে উল্লেখ করা হল, যা থেকে বোঝা যাবে, উন্নয়ন বলতে এখন মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই কেবলমাত্র নয়, তার সামগ্রিক উন্নয়ন বা Comprehensive development-কে বোঝানো হয়।

সারণী: ১

জাতিপুঞ্জ-ব্যবহৃত মানব-উন্নয়নের মানক (কয়েকটি)

শিশুশ্রম রদ (Abolition of Child labour)
সাক্ষরতার হার (Adult Literacy rate)
প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে শিশুর জন্ম (Births attended by skilled personnel)
কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমণ (Co_2 emission)
সেল-ফোনের ব্যবহার (Cell phone subscribers)
পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী (Children reaching grade 5)
বিপজ্জনক যৌনতা ক্ষেত্রে কন্ডোমের ব্যবহার (Condom use at high-risk sex)
শিক্ষা (Education)
নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড (Female economic activity/gross domestic produce)
নারীদের ক্ষমতায়নের মূল্য নির্ধারণ (Gender Empowerment measure by value)
এইচ. আই. ভি-র ব্যাপ্তি (HIV prevalence)
সামরিক খাতে ব্যয় (Military Expenditure)
সংসদে মহিলা প্রতিনিধিত্ব (Seats in parliament held by women)

উপরের সারণী (কিছু সংখ্যক মানক মাত্র) থেকে পরিষ্কার যে একদিকে 'উন্নয়ন' বলতে একটি ব্যাপক ও বিস্তৃত বিষয়কে বোঝানো হচ্ছে, এবং একই সঙ্গে 'নারীদের

উন্নয়ন' বিষয়টিকে একটি স্বতন্ত্র গুরুত্ব ও ভূমিকা দেওয়া হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই এখানে প্রশ্ন উঠে আসে: উন্নয়ন বলতে জৈবিক ও পরিবেশ ব্যবস্থার ভারসাম্য বজায় রেখে মানব-উন্নয়নকে যদি বোঝানো হয়, তা হলে নারীদের উন্নয়নকে স্বতন্ত্র গুরুত্ব ও ভূমিকা দেওয়া হচ্ছে কেন?

দুই

আগেই বলা হয়েছে যে সমগ্র জনগণের উন্নয়নই মানব-উন্নয়ন প্রক্রিয়ার এক্তিয়ারভুক্ত হলেও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, যারা মূল উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে পারে না, আধুনিক উন্নয়ন-কর্মকাণ্ড/প্রক্রিয়া/ব্যবস্থা তাদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এবারে দেখা যাক যে 'নারী' কীভাবে উন্নয়ন-সংক্রান্ত আলোচনায় বা কর্মযজ্ঞে স্বতন্ত্র গুরুত্ব পায়।

১৯৫০ এবং ১৯৬০-এর দশকে, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে, একদিকে পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে; অন্য দিকে অধিকাংশ সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলি উদারপন্থী শাসনব্যবস্থা ও জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি সমর্থন জানায়। সমাজতান্ত্রিকই হোক বা জনকল্যাণমুখীই হোক— উভয় ধরনের শাসনব্যবস্থাতেই সাম্য (equality), সমদর্শিতা (equity) ও ন্যায় (justice) গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ হিসাবে দেখা দেয়। নারী-পুরুষের সাম্য সব ধরনের শাসনব্যবস্থাতেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে। অনেক রাষ্ট্রের সংবিধানেই (যেমন ভারতে) সাম্যের অধিকারকে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নারী-পুরুষের সাম্যকে গুরুত্ব সহকারে বোঝানো হয়েছে। আশা করা গিয়েছিল যে একটি রাষ্ট্র যখন উন্নতির পথে এগোবে, তখন সেই রাস্তায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমগ্র জনগণই থাকবে।

বাস্তবে চিত্রটি সত্যিই কি তাই? এই ধরনের ভাবনা-চিন্তার মধ্য দিয়েই ১৯৭৫ সালে জাতিপুঞ্জের নেতৃত্বে মেক্সিকো সিটি (Mexico City)-তে নারীদের ওপর প্রথম আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মূলত বারোটি বিষয় এই সম্মেলনে আলোচিত হয় সেগুলি হল: দারিদ্র্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, হিংসা, সংঘাত, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যন্ত্রের ব্যবহার, মানবাধিকার, গণমাধ্যম, পরিবেশ ও শিশুকন্যা। এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় নারী-পুরুষ বৈষম্য প্রকট ও নারীরা পুরুষদের চাইতে সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে। নীচের সারণি থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

সারণি: ২

মেক্সিকো সিটি (১৯৭৫) মহাসম্মেলনের সময়ে নির্দিষ্ট বারোটি বিষয়ে নারীদের অনগ্রসরতা

দারিদ্র্য (poverty)	পৃথিবীর দরিদ্র জনগণের ৭০% নারী
শিক্ষা (education)	পৃথিবীর নিরক্ষর জনসংখ্যার ২/৩ নারী
স্বাস্থ্য (health)	প্রতি বছর মাতৃত্বজনিত অসুবিধার কারণে ৫ লক্ষ নারীর মৃত্যু

হিংসা (violence)	বিশ্বজনীন সমস্যা
সংঘাত (conflict)	পৃথিবীর সমস্ত শরণার্থীর ৭৫% নারী
অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ (Economic participation)	বেসরকারি সংস্থার পরিচালন-ব্যবস্থায় ৬ শতাংশ মহিলা
রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ (political participation & decision making)	প্রায় ১০০টি রাষ্ট্রের সরকারে কোনও মহিলা নেই
যন্ত্রের ব্যবহার (use of machinery)	উন্নতমানের যন্ত্র মহিলারা প্রায় ব্যবহারই করেন না
মানবাধিকার (Human Rights) ও গণমাধ্যম (Mass media)	নারীরা প্রয়োগ/উপভোগ করতে পারে না
পরিবেশ (Environment)	পরিবেশ দূষণের ফলে নারীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়; একই সঙ্গে পরিবেশ সচেতনতা তাদেরই বেশি
শিশুকন্যা (Girl Child)	শিশুপুত্রের তুলনায় শিশুকন্যারা কম সুযোগ-সুবিধা পায়

বস্তুত, এই সম্মেলনের আগেই পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রে জাতিপুঞ্জের অনুরোধে মহিলাদের অবস্থান নিয়ে সমীক্ষা হয়। ভারতেও ১৯৭২ সালে Committee on the Status of Women in India নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটি ১৯৭৪ সালে Towards Equality নামে তাদের রিপোর্ট পেশ করে, যা থেকে বোঝা যায় যে নারী-পুরুষের সাংবিধানিক সাম্য থাকলেও সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই মহিলাদের অবস্থান পুরুষদের তুলনায় অনেক নীচে।

লিঙ্গ-ভিত্তিক নারী-পুরুষ বৈষম্যের প্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালটি রাষ্ট্রপুঞ্জ আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ রূপে ঘোষণা করে; এবং একই সঙ্গে ১৯৭৫-৮৫ দশকটিকে আন্তর্জাতিক নারী দশক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার মূল লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন কর্মসূচি, নীতি ও ইতিবাচক পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে সমস্ত রাষ্ট্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা ও সমস্ত পর্যায়ে নারীদের মূলস্রোতে নিয়ে আসে।

এ ছাড়াও ঠিক হয় যে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এই বিষয়গুলিকে উদ্দেশ্য করে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রে নারীদের অবস্থার কতটা উন্নতি হয়েছে, তা খতিয়ে দেখার জন্য একটি করে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই ভাবনারই ফল হিসেবে ১৯৮০ সালে কোপেনহেগেনে, ১৯৮৫ সালে নাইরোবিতে এবং ১৯৯০ সালে বেজিঙে নারীদের ওপর মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৯০ সালের বেজিং মহাসম্মেলন কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীদের প্রগতি ও অগ্রগতির কথা স্বীকার করে। এই অগ্রগতির কাহিনি ছাড়াও নারী-পুরুষের বৈষম্য এই সম্মেলন তুলে ধরে এবং মানবজাতির সার্বিক অগ্রগতির পথে লিঙ্গজনিত বৈষম্যকে প্রধান অন্তরায়

হিসেবে চিহ্নিত করে। এই মহাসম্মেলনে বলা হয় যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে নারীদের পূর্ণ অংশগ্রহণই নারীদের ক্ষমতায়ন ও নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করার প্রধান হাতিয়ার। এই সব বক্তব্যকে একত্রিত করে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয় যা Beijing Declaration নামে পরিচিত। ২০০০ সালে জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় ২৩তম বিশেষ অধিবেশনে বেজিং ঘোষণাপত্রকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মসূচির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় যা বেজিং + ৫ (Beijing+5) নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে ঠিক হয় যে সোফিয়াতে ২০০০ সালে নারীদের ওপর পঞ্চম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে যার প্রস্তুতি হিসেবে সর্বস্তরের নারীদের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করার প্রয়াস চলছে।

এই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন, আলোচনা সভা, সেমিনার, গবেষণাপত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বোঝা যায় পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রে, সমস্ত ধরনের শাসনব্যবস্থায়, সমাজের প্রতিটি স্তরে নারীরা পুরুষদের চাইতে পিছিয়ে। একই সঙ্গে বলা প্রয়োজন যে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রে (হাতে গোনা কয়েকটি বাদ দিয়ে) ব্যক্তির সাম্যের অধিকার থাকলেও বা লিঙ্গ -ভিত্তিক বৈষম্য স্বীকৃত না হলেও, অধিকার উপভোগের ক্ষেত্রে নারীরা পিছিয়ে, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় নারীদের স্থান নগণ্য, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীরা উপযুক্ত সম্পদ-উপভোগ থেকে বঞ্চিত।

এই অংশটির থেকে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে যে, উন্নয়ন-সংক্রান্ত আলোচনায় 'নারীদের উন্নয়ন' কেন একটি স্বতন্ত্র বিষয়ের গুরুত্ব দাবি করে। আরও বোঝা যায়, উন্নয়ন সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের মতোই লিঙ্গ-নিরপেক্ষ কোনও বিষয় নয়; এটি সম্পূর্ণভাবেই একটি Gendered Concept.

তিন

১৯৭০-এর দশক থেকে একদিকে যেমন নারীদের উন্নয়ন সম্পর্কে জাতিপুঞ্জ ও বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি ভাবনা-চিন্তা শুরু করে, অন্যদিকে উন্নয়ন-সংক্রান্ত বৌদ্ধিক আলোচনায় 'নারীদের উন্নয়ন' শীর্ষক দৃষ্টিভঙ্গিও গড়ে ওঠে।

সাধারণভাবে নারীদের উন্নয়ন সংক্রান্ত আলোচনায় চারটি দৃষ্টিভঙ্গি পরিচিত। এগুলির মধ্যে প্রথম যেটি নজর কাড়ে সেটি Women in Development বা WID নামে পরিচিত। এই দৃষ্টিকোণ মনে করে যে সমদর্শিতা (equity) ও উন্নয়ন-সংক্রান্ত নীতিগুলিকে প্রভাবিত করা সম্ভব। এই ভাবে policy বা নীতির মাধ্যমে নারীদের সম্পদ-উপভোগ বাড়িয়ে তাদের উন্নতির কথা WID দৃষ্টিভঙ্গি বলে থাকে। বস্তুত, WID সামাজিক ন্যায় (Social Justice) ও সমদর্শিতা (equity)-র ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

WID দৃষ্টিকোণের পিছনে ছিল বিভিন্ন ঘটনা বা উপাদানের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। প্রথমত, নারীদের উপর প্রথম মহাসম্মেলন (মেক্সিকো সিটি), আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ (১৯৭৫), আন্তর্জাতিক নারী দশক (১৯৭৫-৮৫) ইত্যাদির প্রভাব। দ্বিতীয়ত, ১৯৭০-এর দশকে উন্নত পশ্চিমি দেশগুলিতে নানান ইস্যুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নারীবাদী আন্দোলন— বিশেষত

নারীর অধিকার, একই কাজের জন্য নারী-পুরুষের সমান অধিকার, নাগরিকের অধিকার ইত্যাদি বিষয়কে অবলম্বন করে এমন কিছু নারীবাদী আন্দোলন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দানা বেঁধেছিল যা WID দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে। তৃতীয়ত, নারীদের অবস্থান নিয়ে ৭০-এর দশকে যে সব গবেষণা ও বৌদ্ধিক চর্চা চলছিল WID সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেই সমস্ত গবেষণারও প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল।

এই গবেষণাগুলির মধ্যে ডেনমার্কের গবেষক Ester Boserup-এর Women's Role in Economic Development (১৯৭০) বইটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি ও শিল্প— এই দুই ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনা টেনে বোসরূপ বলেন যে প্রথাগত ধারণা অনুযায়ী সনাতনী কৃষিভিত্তিক ব্যবস্থাকে নারী প্রগতির বিরোধী ও আধুনিক যন্ত্রায়িত শিল্পভিত্তিক ব্যবস্থাকে নারীপ্রগতির সহায়ক বলা হলেও, বাস্তব অভিজ্ঞতা এই মত সমর্থন করে না। আফ্রিকায় ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক গবেষণার সাহায্যে এই মতকে নস্যাৎ করে বোসরূপ বলেন যে, আধুনিক যন্ত্রায়িত শিল্পভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নারীদের আরও প্রান্তিক (marginalised) করে তোলে। জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রের সমালোচনা করে বোসরূপ তাঁর অভিমত প্রকাশ করলেন যে নারীরা রাষ্ট্রের কাছে কেবলমাত্র 'সাহায্য প্রার্থী' বা needy beneficiary নয়; বরং তারা উৎপাদন-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী শ্রমজীবী মানুষ (labourers in the production system)।

এই চিন্তায় প্রভাবিত WID-দৃষ্টিকোণ মা ও স্ত্রী হিসেবে মহিলাদের চিরন্তন ভূমিকার সমালোচনা করে থাকে। যে-সব সরকারি নীতি নারীদের শুধু 'ভাল মা, ভাল স্ত্রী' গড়ে তোলার কথা বলে, WID তার সমালোচনা করে। উন্নয়নকে সার্বিক, সামগ্রিক হয়ে ওঠার জন্য নারীদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয় এই দৃষ্টিকোণ এবং নারীকেই উন্নয়নের 'missing link' হিসেবে চিহ্নিত করে।

১৯৮০-র দশকে উন্নয়ন-সংক্রান্ত আলোচনায় WID দৃষ্টিকোণ ধীরে ধীরে GAD (Gender and Development) দৃষ্টিকোণকে জায়গা করে দেয়। বিভিন্ন দিক থেকে WID দৃষ্টিকোণ সমালোচিত হতে থাকে। সমালোচনার মূল জায়গা ছিল দুটি। প্রথমত, বলা হয় যে নারীদের স্বতন্ত্রভাবে উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় দেখা উচিত নয়। স্বতন্ত্রভাবে নারীগোষ্ঠীর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নারী-পুরুষের সম্পর্ক বা Gender relations। বস্তুত, সেই সময়ে নারীবাদী চর্চায় Sex এবং Gender— এই শব্দ দুটির অর্থ, পার্থক্য, গুরুত্ব ও বিশেষত্ব আলোচিত হচ্ছিল। তারই প্রেক্ষিতে Gender (Women নয়) উন্নয়ন-প্রক্রিয়ায় গুরুত্ব পায়। দ্বিতীয়ত, WID-র যে বিষয়টি সমালোচিত হতে থাকে তা হল যে এই দৃষ্টিকোণ নারীকে একটি অবিভাজিত গোষ্ঠী হিসাবে দেখে। নারীদের মধ্যেও যে বহু স্তর রয়েছে— ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রামীণ-শহুরে, ইউরোপীয়-এশিয় ইত্যাদি ও আরও অনেক— তা WID আলোচনায় গুরুত্ব পায় না। এই সব আলোচনা ও সমালোচনার ভিত্তিতে ১৯৮১ সালে *Of Marriage and the Market* নামে একটি বই প্রকাশিত হয় (Ed by Kateyong, Wolkowitz, Mccullah) যার মাধ্যমে GAD দৃষ্টিকোণটি গড়ে ওঠে।

WID এবং GAD দৃষ্টিকোণ ছাড়া আছে মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ। সেখান থেকে 'নারী ও উন্নয়ন' বিষয়টিকে যে ভাবে দেখা হয় তা WAD বা Women and Development নামে পরিচিত। মার্কসীয় নারীবাদীরা মূলত এঙ্গেলস-এর বক্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বলেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব এবং বংশানুক্রমিকভাবে সেই সম্পত্তিকে কুক্ষিগত রাখার জন্য যে একগামী-বিবাহব্যবস্থা (Monogamous Marriage) চালু হয়, তার ফলেই সমাজে নারীদের অবনমন ঘটে। ধীরে ধীরে উৎপাদন-ব্যবস্থাটি পুরুষদের অধীনস্থ হলে পরে সেটি বহির্জগৎ বা Publc World নামে পরিচিত হয়। অপর দিকে, প্রজনন ও গৃহস্থালির কাজকর্ম নারীদের কাজ হিসেবে ক্রমে বিবেচিত হওয়ার ফলে সেটি ভিতর-জগৎ বা private world নামে পরিচিতি লাভ করে। এই ভাবে 'ভিতর-বাহির' বা 'private-public'-এর বিভাজন গড়ে ওঠে এবং নারীরা গৌণ বা গুরুত্বহীন নাগরিক (Citizens of Secondary importance) হিসাবে চিহ্নিত হতে থাকে। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা ভিতর-বাহিরের বিভাজনকে আরও প্রকট করে তোলে এবং এই ব্যবস্থায় নারীরা আরও বেশি প্রান্তিক হয়ে পড়ে। সুতরাং, WAD-দৃষ্টিকোণ মনে করে, উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিবর্তিত না হলে এবং শোষণহীন শ্রেণিহীন সমাজ তৈরি না হলে নারীমুক্তি ঘটবে না।

১৯৮৬ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে (Women in Development, liberalisation and Marxism-এ) A. Bandarage WID দৃষ্টিকোণের দুর্বলতাগুলি উল্লেখ করে বলেন যে এই দৃষ্টিকোণ আর্থ-সামাজিক অসাম্যের ওপর গুরুত্ব দেয় না। অপরদিকে, WAD দৃষ্টিকোণ অর্থনৈতিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় লিঙ্গ-বৈষম্যকে তুলে ধরে এবং নারীরা ধীরে ধীরে কীভাবে উন্নয়ন-প্রক্রিয়ার বাইরে চলে গিয়ে প্রান্তিক হয়ে পড়ে তা ব্যাখ্যা করে।

এই তিনটি দৃষ্টিকোণ ছাড়াও সাম্প্রতিক কালে WED নামে চতুর্থ একটি দৃষ্টিকোণ 'নারী ও উন্নয়ন' সংক্রান্ত আলোচনায় গুরুত্ব পাচ্ছে। এই দৃষ্টিকোণ Women and Environmental (Sustainable) Development নামে পরিচিত। এই দৃষ্টিকোণ নারীদের উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশগত উন্নয়নের একটি সম্পর্ক খোঁজে। এই দৃষ্টিকোণের প্রবক্তারা মনে করেন যে পরিবেশ-দূষণ বাড়লে ও পরিবেশ-ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে নারীরা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই দৃষ্টিকোণের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা বন্দনা শিবা বিভিন্ন সমীক্ষা-ভিত্তিক গবেষণার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যে অরণ্য-সম্পদ ধ্বংস হলে তুলনায় মহিলাদেরই ক্ষতি বেশি। যে কারণে এই দৃষ্টিকোণের সমর্থকেরা শুধুমাত্র উন্নয়ন বা development-এর কথা বলেন না, তাঁরা স্থিতিশীল উন্নয়ন বা sustainable development-এর কথা বলে থাকেন।

চার

বিগত ষাট বছরে বেশ কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষত খাদ্যসামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে, শিল্প ক্ষেত্রে, কিংবা তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারত যথেষ্ট উন্নতির সাক্ষর রেখেছে। কিন্তু লিঙ্গ-জনিত বৈষম্য দূরীকরণের প্রশ্নে অর্থাৎ নারী-পুরুষ সমানাধিকারের ক্ষেত্রে ভারতের উন্নতির হার কতখানি, কয়েকটি সারণীর মাধ্যমে তা দেখা যেতে পারে।

সারণী-৩

	ভোটাধিকার (শতাংশের হিসাবে)
নারী	৫৪.৪৬
পুরুষ	৬০.৫৬

সূত্র: ভারতীয় নির্বাচন কমিশন, ২০০৪ রিপোর্ট

সারণী-৪

রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

	বর্তমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য	বর্তমান লোকসভার সদস্য	বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার সদস্য	বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য
নারী	৬.৬৭%	৮.১%	৬.৮০%	৬.৮%
পুরুষ	৯৩.৩৩%	৯১.৯%	৯৩.২০%	৯৩.২%

সূত্র: www.webindia 123.com এবং http i/lww.wbgov.com

সারণী-৫

শিক্ষা

	নিরক্ষর	প্রাথমিক বিদ্যালয়	স্কুল-ছুট
নারী	৪৪%	৯৩%	৪৫.৮৯%
পুরুষ	৭২.৩%	১০০%	২৪%

সূত্র: www.thp.org/reports/indiawom.htm

সারণী-৬

নারী-পুরুষের আনুপাতিক হার

	১৯৮১	১৯৯১	২০০১
নারী-পুরুষের আনুপাতিক হার (FMR)/সর্বভারতীয়	৯৩৪	৯২৭	৯৩৩
পশ্চিমবঙ্গ	৯১১	৯১৭	৯৩৪

সূত্র: Census of India, 1981, 1991, 2001

সারণীগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ভোটাধিকার প্রয়োগ ছাড়া বাকি সব ক্ষেত্রেই নারীরা পুরুষদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। যে সব নির্ধারক উপরের সারণীগুলিতে দেখানো হয়েছে,

সেগুলি ছাড়াও অন্যান্য কিছু নির্ধারক যদি নেওয়া হয়, যেমন উচ্চমাধ্যমিক সফল ছাত্রছাত্রী, দৈনিক অবসর কাটানোর সময়, সম্পদের ওপর অধিকার প্রভৃতি— সে সমস্ত ক্ষেত্রেও মহিলারা পুরুষদের চাইতে সবেতেই পিছিয়ে।

এখানে মনে রাখা দরকার, ভারতীয় সংবিধান শুধুমাত্র সাম্যের অধিকারের মধ্য দিয়ে যে লিঙ্গ-জনিত বৈষম্য দূর করেছে তাই নয়, রাষ্ট্র বিভিন্ন সময়ে নারীদের সুরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কিছু আইন প্রণয়নও করেছে। এ প্রসঙ্গে হিন্দু-বিবাহ আইনের ক্ষেত্রে একগামী বিবাহ-ব্যবস্থা, পুত্র-কন্যা উভয়েরই সম্পত্তির অধিকার, পণ-বিরোধী আইন এবং সাম্প্রতিককালের ফৌজদারি আইনের ৪৯৮-এ ধারা ও গৃহে সংঘটিত হিংসা (বিরোধী) আইন উল্লেখযোগ্য। নারীদের এই ভাবে আইনি সুরক্ষা দেওয়া ছাড়াও রাষ্ট্র নারীদের উন্নতির জন্য কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপও (affirmative action) গ্রহণ করেছে, যেমন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে নারীদের জন্য পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যালিটি উভয় স্তরেই ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ, একমাত্র কন্যা সন্তানের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বৃত্তি, বেতন ছাড় ইত্যাদি। এদের মধ্যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে নারীদের জন্যে ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের বিষয়টিকে অনেকেই ভারতে নারী প্রগতির সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বা এমনকী 'বৈপ্লবিক পদক্ষেপ' বলেও উল্লেখ করেছেন। কারণ, এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তৃণমূল স্তরের বহু মহিলা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সামিল হতে পেরেছে।

অবশ্য, সার্বিক জনগণের উন্নয়ন শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি, কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ বা প্রকল্পের পক্ষে সম্ভব নয়। তার জন্য সুশীল সমাজ, বেসরকারি সংস্থা বা/এবং NGO-দের আরও অনেক সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। কেবলমাত্র সকলের সম্মিলিত প্রয়াসেই নারীদের অবস্থানের উন্নতি ঘটানো সম্ভব। তবে কথাগুলি বলা বা লেখা যতটা সহজ, বাস্তবে তাদের রূপায়ণ ততটাই দুরূহ। সব চাইতে বড় বিষয়— সমাজ-জীবনে, সামাজিক চেতনার স্তরে, সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা ও মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন ঘটানো— যা এক কথায় অত্যন্ত কঠিন। তবু, সকল নারীর মিলিত প্রচেষ্টায়, সুশীল সমাজের সমর্থনে এবং রাষ্ট্রের সহায়তায় এই কাজে সফল হওয়ার লক্ষ্যেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

পাঁচ

যশোধরা বাগচী

মাতৃত্ব ও পিতৃতান্ত্রিকতা

আমাদের সমাজে একই সঙ্গে মাতৃত্বের যে সম্মান এবং অবমাননা আমরা দেখতে পাই তা প্রায়শই মাতৃতান্ত্রিকতার সূচক। চট করে শুনলে আপাতবিরোধী মনে হলেও বিষয়টি খোলসা করে দেখলে এর সত্যতা উঠে আসে। মাতৃত্বের 'মিথ' বা 'অতিকথা' আমাদের জীবনের ওপরে যে প্রভাব ফেলেছে তার ফলে এটির একটি স্বাভাবিকীকরণ ঘটেছে। মাতৃত্ব সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত ধারণাগুলি আমরা যেভাবে আত্মস্থ করেছি, সেই প্রক্রিয়াটি অবিনির্মিত করবার প্রচেষ্টা করব।

'মাতৃত্ব'-ধারণাকে আমাদের মধ্যে যে রকমভাবে কাজ করানো হয়, তার মধ্যে যে সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া কাজ করে সেটিকে নিয়ে নারীবাদী চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল পশ্চিমি দুনিয়ায় বর্তমান পর্যায়ের নারীবাদী চিন্তার গোড়ার দিক থেকেই।

এই চিন্তনের একটি সংগত কারণ, লিঙ্গসচেতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে মাতৃত্বের নামে নারীকে যেমন নানা বিভূষণে ভূষিত করা হয়েছে, ঠিক তেমন ভাবেই তার নিজের শরীরের ওপরে তার নিজের নিয়ন্ত্রণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। মাতৃত্বের এই দ্বিমুখী সামাজিক রূপ নিয়ে খুব সংক্ষেপে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করছি।

এক

আমরা পৃথিবীর যে অংশটিতে বাস করি সেটি নদীমাতৃক দেশ। পলিমাটির উর্বরতায় পুষ্ট এই বাংলার মাতৃত্বকে বন্দনা করে উন্মেষিত করা হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী চেতনা। জন্মভূমিকে মাতৃত্বের সঙ্গে সমার্থক প্রতিপন্ন করে আমরা বলেছি—

> জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উত্তাপ কীভাবে *বঙ্গদর্শন*-এর পাতা ভর্তি করবার জন্য লেখা একটি গানকে জ্বালাময়ী করে তুলতে পারে, তার প্রমাণ বহন করে বেড়াচ্ছে;

বন্দে মাতরম্

সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাম্

মাতরম্।

পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়া মাকে উদ্দেশ করে বঙ্কিম যা লিখেছিলেন কলকাতা শহরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে সরলা দেবী চৌধুরানীর নেতৃত্বে একশোটি যুবক-যুবতীর সমবেত কণ্ঠে তা গর্জে উঠেছিল:

ত্রিংশ (সপ্ত) কোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে,
দ্বি-ত্রিংশ কোটি ভূজৈ-ধৃত খর করবালে।
অবলা কেন মা এত বলে...

গ্রিক দেবী মিনার্ভার মতো ভারতমাতাকে কল্পনা করে নিয়েছেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়:

যেদিন সুনীল জলধি হইতে
উঠিলে জননী ভারতবর্ষ
সেদিন বিশ্বে সে কী কলরব
সে কী মা ভক্তি সে কী মা হর্ষ!

জাতীয়তাবাদী প্রাণশক্তিকে গান দিয়ে উদ্বুদ্ধ করবার ব্যাপারে মাতৃমূর্তি চূড়ান্ত রূপ নিল ১৯৭১ সালে। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত মনোনীত হল রবীন্দ্রনাথের গানে:

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়নজলে ভাসি॥
আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।

মাতৃরূপ যেভাবে বাৎসল্য ও ভক্তিরূপের সঞ্চার করতে পারে নারীত্বের প্রায় কোনও রূপই এই ক্ষমতা রাখে না।

দুই

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে নারীবাদ যেমন প্রশ্ন তুলেছিল তার মধ্যে অবশ্যই উপস্থিত ছিল মাতৃত্বজনিত প্রশ্নগুলি। জৈবিক নিয়মে গর্ভধারণ করতে পারে একমাত্র নারী। কিন্তু সেই জৈবিক ঘটনাকে সাধারণগ্রাহ্য করে তোলার জন্য তৈরি হল 'মাতৃত্ব'। সামাজিক সম্পর্কগুলিকে বারে বারে তৈরি করার কাজে মাতৃত্ব হয়ে রইল এক অন্যতম হাতিয়ার। পৃথিবীর নানা দেশের মিথ বা অতিকথা, বিভিন্ন ঐতিহ্যের পরিমণ্ডল, কট্টর কেতাদুরস্ত বৈজ্ঞানিক মনোবিজ্ঞান— সর্বত্রই মাতৃত্ব হচ্ছে সামাজিক নবীকরণের অন্যতম প্রক্রিয়া। অর্থাৎ মায়ের গর্ভধারণের মাধ্যমে যেমন মনুষ্যপ্রজন্ম পুনরুৎপাদিত হয়,

সেই সঙ্গে নানা মাধ্যমের প্রক্রিয়াতে পুনরুৎপাদিত হয়— মাতৃত্বকেই বারে বারে নানা ভাবে সমাজের স্বাভাবিকীকরণের কাজে ব্যবহার করা যায়। সমাজের সম্পর্কগুলিকে নিজস্ব জায়গায় বহাল রাখার কাজে তাই মাতৃত্বের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। ১৮৮৪ সালে *On the Origins of Family, Private Property and State* নামক বহুল প্রচলিত লেখাটিতে এঙ্গেল্‌স মাতৃত্বের পরাজয়, পিতৃতন্ত্রের কাছে মাতৃতন্ত্রের হার স্বীকারকে নারীর বিশ্ব-ঐতিহাসিক পরাজয় বলে ঘোষণা করেছিলেন। পরিবারতন্ত্র এবং ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে তিনি এই পরাজয়কে একাত্ম করে দেখেছিলেন। জন্ম মায়ের গর্ভে হলেও সন্তানের বংশপরিচয় হয়ে গেল পিতার সূত্র ধরে।

এই থেকেই মাতৃত্ব বাঁধা পড়ে গেল পিতৃতান্ত্রিক অনুশাসনের নিগড়ে। যৌনতা ও শ্রম বিষয়ে ক্যাথরিন ম্যাক্‌কিনন নারীবাদী ও মার্কসবাদী তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে যা বলেছিলেন মাতৃত্বের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে অর্থবহ হয়ে উঠল— যা তার একান্তই নিজস্ব, সেটিই সব চাইতে অনায়াসে অন্যে ছিনিয়ে নিতে পারে। নিজের প্রজাতিকে তৈরি করবার তার যে প্রজনন ক্ষমতা, সেটিই হয়ে ওঠে তার দাসত্বের শৃঙ্খল। মাতৃত্বের আরাধনার পেছনে লুকনো থাকে এক অদৃশ্য মুখোশ, যা নাকি এই অমোঘ দ্বিমুখীনতারই আর এক রূপ।

১৮৫১ সালে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে ছাড়া পেয়ে Sojourner Truth যখন একটি মহিলা সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে শুনলেন যে মেয়েদের শারীরিক দুর্বলতার কারণে হেনস্থা করা হচ্ছে, তখন তিনি নিজের পেশিবহুল হাত দুটো সভার সামনে তুলে ধরে তাঁর বিখ্যাত প্রশ্নটি ছুড়ে দেন:

Ain't I a woman? (আমি কি নারী নই?)

এই ক্রীতদাসী, যাঁর মাতৃত্বও দাস প্রথার অন্তর্গত ছিল, কেন না এঁর গর্ভেই জন্ম নিত আরও দাসদাসী, এই শ্বেতাঙ্গ সভ্যসমাজের সামনে বলেন:

> আমাকে দেখো! আমার হাত দুটো দেখো! আমি চাষ করেছি, চারা পুঁতেছি, খামারে সব কিছু নিয়ে তুলেছি (পুরেছি), কোনও পুরুষই আমাকে ডিঙিয়ে যেতে পারেনি! তবে কি আমি মেয়ে নই? পুরুষের সমান পরিমাণ কাজ করতে পারি, খেতে পারি— অবশ্য যখন তা পেয়েছি— এবং চাবুক খেতে পারি। তবে কি আমি মেয়ে নই?

তারপরে তিনি তুলে ধরেন তাঁর নারীত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ:

> পর পর তেরোটি সন্তানের জন্ম দিয়েছি, এবং তাদের প্রত্যেককে বেচে দিতে হয়েছে ক্রীতদাস করে। এবং মা হয়ে আমি যখন সন্তানদের শোকে কেঁদে উঠেছি, যিশুখ্রিস্ট ছাড়া কেউ আমার কান্না শুনতে পায়নি! আমি কি তবে মেয়ে নই?

পুত্রের আশায় 'সাধ'ভক্ষণ করে উচ্চবিত্ত উচ্চবর্ণের হবু মায়েরা। পশ্চিমে বিজ্ঞাপনে দেখি যথাযথ পুষ্টিতে ভরপুর শ্বেতাঙ্গ মা এবং বাচ্চারা। সমাজের ক্ষমতার প্রতীক হিসাবেই মাতৃত্বকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরা হয়। সেইসব সময়ে তেরোটি ক্রীতদাস সন্তানের মা'র

কান্না আমাদের মনে করিয়ে দিতে পারে মাতৃত্বকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কীভাবে ব্যবহার করে থাকে।

পশ্চিমি নারীবাদী আলোচনা গোড়ার দিকে কিছু অসাধারণ সৃষ্টিশীল অথচ বিশ্লেষণী লেখার জন্ম দিয়েছিল। ১৯৭৭ সালে লেখা Adrienne Rich-এর *Of Women Born* মাতৃত্বের যন্ত্রণা এবং গরিমার একটি যুগপৎ রূপরেখা। তার পরের বছরেই আমরা পাই Nancy Chodorow-এর *Reproduction of Mothering*। মাতৃত্ব একটি নারীর পেলব স্বভাবগত প্রকাশ বলে যে আমাদের কেন ও কীভাবে বোঝানো হয়, তার খানিকটা প্রকাশ আমরা পাই। সম্পূর্ণ ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে লেখা এই বই দুটিতে ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে মায়ের ভূমিকাকে প্রাক্-সভ্যতাপর্বের নিছক প্রকৃতির দ্যোতক বলে মনে করা হয়ে থাকে। অন্য দিকে, বাবার মারফত পিতৃতান্ত্রিক সভ্যতায় উন্নীত হয় শিশু। দার্শনিক মেরি ও'ব্রায়ানের লেখায় মার্কসীয় তত্ত্বে প্রসবপ্রক্রিয়াকে ঐতিহাসিক উৎপাদনমুখীনতার বাইরে রাখার দরুন মাতৃত্ব কেবলমাত্র পুনরুৎপাদনের (reproduction) জায়গা বলে চিহ্নিত হতে থাকে। ব্যক্তিগত (Private) ও সমাজসমষ্টিগত (Public) যে পৃথকীকরণের ওপরে আমাদের পৃথিবীতে ধনতান্ত্রিক আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা, যেখানে মেয়েদের সব কিছু, গার্হস্থ্যশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃত্বও পর্যবসিত হয় পুনরুৎপাদন (reproduction) ব্যবস্থায় যা কিনা মনে হয় নিতান্তই ব্যক্তিগত 'অন্দর কী বাত'।

কিন্তু 'ব্যক্তিগত' ও 'সামাজিক'-এর এই মেরুকরণে সত্যিই মাতৃত্বকে 'ব্যক্তিগত' এলাকায় সীমাবদ্ধ রাখার কোনও যৌক্তিকতা দেখানো যায় কি? কেন না ঘরের কোণে, আঁতুড় ঘরের অস্পৃশ্যতায় অথবা হাসপাতালের মাতৃত্বের ward-এ ঘটলেও এর তাৎপর্য বিচার করা হয় সর্বাপেক্ষা সদরের হিসাবে— 'জনসংখ্যা' বা Population-এর হিসাবে। সুতরাং কোনটা ব্যক্তিসর্বস্ব এবং কোনটি সামাজিক, এ প্রশ্নে মাতৃত্ব বিষয়টি নানা রকম অন্তর্দ্বন্দ্বে ভরা। কারণ এক অর্থে বলা যায় যে এঙ্গেলস যথার্থই ধরেছিলেন যে মাতৃত্বের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা নিয়ন্ত্রণ পিতৃতান্ত্রিকতার একেবারে গোড়ার কথা। কাজেই একে তো একাধারে অন্দরের একান্ত জিনিস এবং অন্য দিকে সদরের প্রধানতম মানদণ্ড হিসাবে ধরাই যেতে পারে। ব্যক্তিগত (private) এবং সামাজিক (public) যে মেরুকরণের ওপরে ভিত্তি করে পিতৃতান্ত্রিক আধুনিকতা দাঁড়িয়ে আছে, মাতৃত্ব কিন্তু সেই বিভাজনকে প্রায় অস্বীকার করে তার মধ্য দিয়ে রাস্তা কেটে বেরিয়ে গেছে। এই মেরুকরণের মতাদর্শগত বিভাজনের মধ্যে তাকে আদৌ আটকে রাখা যায় না।

মাতৃত্বকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলি অবশ্যই নারীর প্রজননের ক্ষেত্রে তার নিজের মতামতের একটা জায়গা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রসম্মত গর্ভপাত আইন (Medical Termination of Pregnancy) মেয়েদের সুরক্ষার ব্যাপারে অবশ্যই সাহায্য করে থাকে। কিন্তু সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছি যে মেয়েদের নিজস্ব মতামতের ব্যাপারে সমাজের ভ্রুকুটি নানা রকম ভাবে কাজ করে থাকে। M.T.P. বা আইনসম্মতভাবে গর্ভপাত করানোর ব্যাপারে আমলাতান্ত্রিক বিধিনিষেধের বেড়াজাল এড়ানোর উদ্দেশ্যে,

অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য, বিবাহিত এবং অবিবাহিত মেয়েরা হাতুড়ে বৈদ্যর শরণাপন্ন হয়। খিদিরপুরের বস্তি অঞ্চলে মেয়েদের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি শরীরের ক্ষতি হবে জেনেও কীভাবে বিবাহিত মহিলারাও বন্ধুদের সঙ্গে গিয়ে 'wash' করে আসছে।

মাতৃত্বের ওপরে পুরুষতন্ত্রের সব চাইতে বড় আঘাত এসেছে গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় করে কন্যা ভ্রূণগুলিকে গর্ভপাত করানো। কেবলমাত্র পুত্রসন্তানই সংসারের সম্পদ এবং কন্যাসন্তান অবাঞ্ছিত আপদ— পিতৃতান্ত্রিক চিন্তার এই প্রকট রূপ আমরা দেখতে পাই এই ঘৃণ্য সামাজিক আচরণের মধ্য দিয়ে। প্রযুক্তির যে ব্যবহার্য দিকটির উদ্দেশ্য ছিল মা এবং গর্ভস্থ শিশুর নিরাপত্তা, সেটিকে পিতৃতন্ত্র এই ভাবে কবজা করে নিতে পারল, এটিই কি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় না, যে মাতৃত্বকে কীভাবে নারীর অবদমনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে?

সামাজিক ব্যাধির চেহারাটা একটু খুলেই দেখা যাক। পুত্রার্থে ক্রীয়তে ভার্যা— এই সনাতনি মনোভাবটি মোটেই ফেলে আসা অতীতের বিলীয়মান কোনও স্মৃতিচারণা নয়। আধুনিক সমাজের বাতাবরণে এই পুত্রেষণা নবজন্ম লাভ করেছে। পণপ্রথার অভিশাপ একে লালিত করেছে, কেন না কন্যাসন্তান জন্মানো মানেই হচ্ছে পরের আঙিনার গাছ বড় করে তোলার বিষম দায়। এবং পরের ঘরে যাওয়ার রাস্তাটি এমনই কন্টকাকীর্ণ যে কন্যাসন্তান হয়ে ওঠে পরিবারের আপদ। আলট্রাসোনোগ্রাফি ইত্যাদি অতি আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে এই আপদ নির্মূল করার কাজে নেমেছে আমাদের সমাজে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল পরিবারগুলি। প্রযুক্তির সাহায্যে গর্ভবতী মায়ের ভ্রূণের লিঙ্গনির্ধারণ করে কন্যাভ্রূণ সমূলে বিনষ্ট করার এই দানবীয় প্রক্রিয়ায় মাতৃত্বকে বাজি রেখে পিতৃতান্ত্রিকতার এক উগ্র মূর্তি ধারণ করেছে। কন্যাভ্রূণ বিনষ্টির এই মহাযজ্ঞে মাতৃত্বের নিরাপত্তা একান্তই গৌণ। কারণ ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়ের জন্য যতটা সময় চলে যায় তাতে নিরাপদ গর্ভপাতের সময়সীমা পেরিয়ে যেতে পারে। এর অর্থ এই যে পুত্রসন্তানের জন্য এই অবৈধ গর্ভপাতগুলি মাতৃত্বের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দেয়। নিজে মেয়ে হয়ে নিজেরই প্রজাতিকে ভূমিষ্ঠ না হতে দেবার জন্য পরিবার থেকে বিবাহিত মেয়েদের ওপর যে চাপ সৃষ্টি করা হয়, তাতে নারীর মানবিক অধিকারকে ধূলিলুণ্ঠিত করা হয়। গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গনির্ধারণপূর্বক কন্যাভ্রূণ মোচনের ঘটনাগুলি সমাজে পিতৃতান্ত্রিক বিশ্বাসের একটি চরমতম নিদর্শন।

লিঙ্গনির্ধারণ করে কন্যাভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে আন্দোলন চলছে। সেই আন্দোলনের পুরোধা নেত্রী, জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যা মালিনী ভট্টাচার্যের ভাষায়:

পুত্র এষণা
কন্যা এসো না।

আঁতুড় ঘরের ব্যক্তিগত চৌহদ্দিতে যে মাতৃত্ব সুরক্ষিত থাকার কথা, সামাজিক ব্যবস্থা (বা কুব্যবস্থা) তাকে টেনে এনেছে যে বাজারি আঙিনায়, সেখানে পুত্রেষণার মতো সনাতনী মনোবৃত্তি অনায়াসে গাঁটছড়া বেঁধেছে আধুনিকতম প্রযুক্তির সাথে। স্বর্গাদপি গরীয়সী জননীকে

নিজের লিঙ্গকে নির্মূল করতে এমন ভাবে বাধ্য করা হচ্ছে যে তার নিজেরই জীবনসংশয় হয়ে উঠছে।

মাতৃত্বের এই অবমাননা সমাজে নারী-পুরুষের আনুপাতিক হারের ভারসাম্য নষ্ট করে গোটা সমাজকেই ঠেলে দিচ্ছে মনোবিকারের পথে। লিঙ্গসাম্যের অভাব দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয় তার শাখাপ্রশাখা। পঞ্জাব, হরিয়ানাতে মেয়েদের অপ্রতুলতা তৈরি করে প্রজননের সমস্যা। নতুন প্রজন্ম আসবে কোথা থেকে, যদি জন্মদাত্রীর এত অভাব ইচ্ছে করে তৈরি করা হয়? তখন দেখা দেয় নারীর মৌলিক অধিকার হননের আর একটি উগ্র চেহারা—নারী পাচার। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ পশ্চিমবাংলা, বাংলাদেশ, ঝাড়খণ্ড ইত্যাদি জায়গা থেকে মেয়েদের চোরাচালান করা হয় বিয়ের নামে টাকাপয়সার বিনিময়ে। বিনা পণে বিয়ে দেবার নামে পরিবারের লোকেরাও নেচে ওঠেন। খাওয়াপরার বিনিময়ে এই মেয়েরা বিয়ের নামে যৌনসঙ্গ দিতে বাধ্য হয় বাড়ির সব পুরুষদের, তার সঙ্গে সবুজ বিপ্লবের দেশের খেতখামারের কাজ তো আছেই।

মাতৃত্বের তথাকথিত দেবীত্ব মুহূর্তে ভূলুণ্ঠিত হয়ে যায় যখন মায়েরা জন্ম দেয় কন্যাসন্তান। অনেক সময়ে ছেলের জন্ম না দিতে পারলে মায়েদের ভোগ করতে হয় লাঞ্ছনা, অর্থাৎ মানসিক অত্যাচার। সময় সময় তা পর্যবসিত হয় শারীরিক অত্যাচারে। সাম্প্রতিককালে হাওড়া জেলাতে কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য লাঞ্ছিত হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে দুটি শিশু কন্যাকে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলেছেন এক মা। প্রজননের ভার যে লিঙ্গের ওপর ন্যস্ত, সেই লিঙ্গের অবমাননার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দেশে মাতৃত্বের তথাকথিত বন্দনা।

তিন

আমাদের সমাজে জন্মদাত্রীর বেহাল অবস্থা নিয়ে চিন্তিত নীতি নির্ধারকেরা। নতুন সহস্রাব্দে যে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (Millenium Development Goal) তার সরকারি স্বীকৃতি মিলেছে ভারতবর্ষেও। এই লক্ষ্যমাত্রার পাঁচ (৫) নং ধারা বলছে যে মাতৃত্বের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে যে জন্ম দিতে গিয়ে মেয়েরা এমনই ঝুঁকির মধ্যে গিয়ে পড়ে, যে প্রায়শই তাদের জীবন বিপন্ন হয়। পশ্চিমবাংলায় নিরাপদ মাতৃত্ব বিষয়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জন্য একটি গবেষণাভিত্তিক সহায়িকা তৈরি করতে গিয়ে আমরা মাতৃত্বজনিত সমস্যার কিছু তথ্য একত্র করেছিলাম। সেখান থেকে আমরা প্রধানত যেটি লক্ষ করেছিলাম যে জন্ম দিতে গিয়ে পশ্চিমবাংলার ১৫ থেকে ৩৪ বছর বয়সের মেয়েদের যে অকালমৃত্যু, তার পেছনেও কাজ করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অবাধ লিঙ্গবৈষম্য। গরিব ঘরের মেয়েরা ছোটবেলা থেকেই অবহেলিত। পুষ্টি এবং যত্নের অভাবে রক্তাল্পতা নিয়ে বড় হয়ে ওঠা মেয়েদের পূর্ণ বয়সে পৌঁছবার আগেই কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতা বিয়ে দিয়ে মাতৃত্বের দিকে ঠেলে দিতে বাধ্য হন। অপুষ্ট মা তাঁর রক্তাল্পতা সংক্রমণ করেন মেয়ের শরীরে। একটা দুষ্টচক্রে মতো লিঙ্গবৈষম্যের বেড়াজালে আটকে পড়ে মেয়েদের মাতৃত্ব।

যে রক্তাল্পতা অবহেলিত মায়েরা তাদের কন্যাসন্তানের শরীরে ছড়িয়ে দেয়, যত্ন ও পুষ্টির অভাবে সেটি আরও জাঁকিয়ে বসে। গর্ভবতী অবস্থায় ট্যাবলেট খাইয়ে সে ত্রুটি পূরণ হয় না। দেখা যায় পশ্চিমবাংলায় মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর প্রায় ১৭ শতাংশ ঘটে রক্তাল্পতার জন্য।

সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যু হয় যে সব মায়েদের, তাদের মধ্যে ৭০ শতাংশ প্রসবের সময় অথবা প্রসবের দু'মাসের মধ্যে। অর্থাৎ নিরাপদ প্রসবের ব্যবস্থার অভাবেই এই সব মায়েরা অকালে প্রাণ হারান। মনে রাখতে হবে এই সব প্রাণ কৈশোর এবং যৌবনের তাজা প্রাণ। যেহেতু মাতৃত্বই মেয়েদের জীবনের চরম অন্বিষ্ট বলে মনে করা হয় সে হেতু এই অব্যবস্থার মধ্যে বহু মেয়ে মাতৃত্বের নামে মৃত্যুবরণ করে।

যে সমাজ মাতৃত্বকে এই ভাবে অবহেলা করে থাকে সেখানে পরিবারের মধ্যে তার রেশ থেকে যায়। দেখা গেছে মায়ের মৃত্যুর ফলে বহু শিশু বছর দুয়েকের মধ্যে প্রাণ হারিয়েছে। এই মাতৃহীন শিশুরাই স্কুলছুট হয় বেশি এবং ভবিষ্যৎ জীবনের মূলস্রোত থেকে তাদের হারিয়ে যাবার সম্ভাবনাও থাকে বেশি। পুরুষের শরীর থেকে যখন HIV AIDS মেয়েদের শরীরে সংক্রামিত হয়, তখন মাতৃত্বই হয় এর বাহক। গর্ভস্থ শিশুর মধ্যে এটি প্রবেশ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবন অভিশপ্ত করে তোলে। এই আক্রান্ত মায়েদের মৃত্যুর সম্ভাবনাও অনেক বেশি।

চার

ফরাসি নারীবাদী দার্শনিক *Second Sex* বইটিতে তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি করেন:

'আমরা মেয়ে হয়ে জন্মাই না, মেয়ে হয়ে উঠি।'

যে উচ্চ-বর্গ সংস্কৃতি দিয়ে আমাদের শ্রেণি নির্ধারিত হয়ে থাকে সেখানে এই 'মেয়ে হয়ে ওঠা'র প্রক্রিয়াতে মাতৃত্বকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। গোষ্ঠী হিসাবে আমরা মেয়েদের মায়ের জাত বলে অভিহিত করে থাকি। অনুরূপা দেবী-র *মা* থেকে এবং মহাশ্বেতা দেবীর *হাজার চুরাশির মা* পর্যন্ত আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল পরিব্যপ্ত হয়ে আছে মাতৃরূপের বন্দনা। মা'র কাছে কথা রাখার জন্য বিদ্যাসাগরের বর্ষার দামোদর সাঁতরে যাওয়ার মধ্যে রূপায়িত হয় তাঁর সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা। খুব সাম্প্রতিকভাবে, রিজওয়ানুর রহমান শিকার হলেন সম্প্রদায়, শ্রেণি ও সর্বোপরি লিঙ্গবৈষম্যের। গণমাধ্যম এই ট্রাজেডিকে দর্শকের গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য বেছে নিল রিজওয়ানুরের পুত্রশোকে আর্ত 'মা'য়ের চোখে জলভরা মুখটি। কয়েক সপ্তাহ ধরে 'স্টার আনন্দ' রাস্তার মোড়ে মোড়ে এই শোকার্ত মায়ের মুখটিকে পুঁজি করে রাখল। সাক্ষরতার বিজ্ঞাপনেও দেখি মাতৃত্বের ব্যবহার, সাক্ষর মায়ের ছেলেমেয়েরা কখনও নিরক্ষর থাকে না। স্বাধীন ভারতবর্ষের নেহরু অধ্যায়ের প্রতীক হয়ে রয়েছে নার্গিসের অনবদ্য অভিনয়ে *Mother India*!

আমাদের দেশে মায়ের দেবীমূর্তি ফিরে আসে প্রতি বছর দুর্গাপুজোর আড়ম্বরে। যতই ডাকের সাজ পরিয়ে সুসভ্য করার চেষ্টা হোক না কেন, নরমুণ্ডমালা বিভূষিতা উলঙ্গ নারীমূর্তি আমাদের মা কালী।

কিন্তু মায়ের নামে যে শক্তির আরাধনা হয় তা ধর্মীয় মতাদর্শের সাজপোশাকে মোড়া পিতৃতান্ত্রিকতার আর এক রূপ। বাৎসল্যের আসল লক্ষ্য পুত্রসন্তান। মেয়েদের আজও বলতে হয়—

ছেলে নই বলে
নই ত' ফেল্‌না
আমিও মানুষ
নই যে খেলনা।

(উগান্ডার কাম্পালাতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে শিশুকন্যাদের নাচের সঙ্গে গাওয়া গান।)

প্রশান্ত রায়

নারীত্বের নির্মাণ

শরীরের লিঙ্গচিহ্ন ও বয়স যার ওপর আমাদের হাত নেই, তাদের ওপর নির্ভর করে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ চিরকালের। এর কোনও ব্যতিক্রম নেই, যদিও ভেদাভেদের মাত্রার তারতম্য আছে। পার্থক্য-চিন্তা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। সামাজিক কারণে জরুরিও বটে। পার্থক্যবোধের বীজ আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিতে আছে। চোখে-কানে-নাকে-স্পর্শে আমাদের পার্থক্যজ্ঞান শুরু। লিঙ্গচিহ্ন ও বয়স, এ রকম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পার্থক্যের উদাহরণ। দুই-ই সাধারণত অপরিবর্তনীয়। সমাজ জীবনের শুরু থেকে বিবর্তনের সব পর্যায়েই এই দুই মাত্রার পার্থক্য শুধু প্রাকৃতিক পার্থক্য না থেকে সামাজিক পার্থক্যে রূপান্তরিত হয়েছে। যারা শক্তিমান— পুরুষ, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ, সম্পদের অধিকারী, সেনাপতি, ধর্মযাজক, শাসক— সবাই এই দুই পার্থক্য অপরিহার্য বলে সবাইকে বুঝিয়েছে। তারা শুধু পার্থক্য অপরিহার্য বলেই থেমে যায়নি। নানা প্রতিষ্ঠান দিয়ে তাকে রক্ষা করছে। পার্থক্যের হাত ধরে পুরুষ ও নারী, বয়স্ক ও কনিষ্ঠের মধ্যে অসাম্য এসেছে। অবজ্ঞা, প্রতিবাদ বা প্রতিরোধে যাতে অসাম্য ক্ষুণ্ণ না হয়, তাই তার রক্ষার আয়োজন সর্বজনীন। তিরস্কার ও পুরস্কারের ব্যবহার, ভয় দেখানো ও মগজ ধোলাই এই অসাম্য রক্ষার হাতিয়ার। তার ক্রম উন্নতি লক্ষণীয়।

জন্মলগ্নে পাওয়া অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক চিহ্ন সমাজের শ্রেণি-বিন্যাসের একমাত্র ভিত্তি নয়। এই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি অর্জিত বৈশিষ্ট্যও সামাজিক স্তরবিন্যাসের জন্ম দেয়। অর্থনৈতিক শ্রেণি এই আপাতমুক্ত স্তরবিন্যাসের উদাহরণ। জন্ম সময় পাওয়া সামাজিক অবস্থান ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় পরিবর্তন করতে পারে, তাই এই স্তরবিন্যাসকে 'মুক্ত' বলা হয়। জৈবিক চিহ্নের সীমারেখা অতিক্রম করা যায় না বলেই, সেই চিহ্ন অনুযায়ী মানুষের অবস্থান স্থির, জীবনের সম্ভাবনাও সীমিত— তাই তার ওপর বেড়ে ওঠা, স্তরবিন্যাস বদ্ধ। স্তরান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ অর্জন করার সুযোগ ও ক্ষমতা সব মানুষের থাকে না বলে, মুক্ত স্তরবিন্যাস ও উন্নতি বেশির ভাগ মানুষের কাছে চাওয়ার বস্তু হিসেবেই থেকে যায়। তাই তাদের অভিজ্ঞতায় তথাকথিত মুক্ত স্তরবিন্যাস বাস্তবে 'আপাত' মুক্ত।

প্রাত্যহিক জীবনে আরোপিত ও অর্জিত সত্তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দু'ধরনের সামাজিক অসাম্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বহু ক্ষেত্রেই আরোপিত বৈশিষ্ট্যের মাপকাঠিতে যে ধরনের মানুষকে নগণ্য বলে (যেমন নারী, বয়ঃকনিষ্ঠ, কৃষ্ণকায় মানুষ) ধরে নেওয়া হয়, তারা কোনও উপযুক্ত সম্পদ অর্জন করার সুযোগ পায় না যার মাধ্যমে শ্রেণি-উত্তরণের চেষ্টা করতে পারে। কিছু মানুষ একাধিক অসাম্যের শিকার হয়। এর সবচেয়ে মর্মান্তিক উদাহরণ, পুরুষ-প্রধান সমাজে নারীর অবস্থান। বিশেষত দুর্বল গোষ্ঠী বা শ্রেণির নারী। যে কোনও অর্থে প্রান্তবাসিনী অনেক বেশি হতভাগ্য।

নারীর নানা ধরনের শোষণ ও অবদমনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বোঝার জন্য নারীবিদ্যার জন্ম হয়েছে। বহু শাস্ত্র, বহু তত্ত্ব ও বহু গবেষণায় ক্রমাগত সমৃদ্ধ নারীজ্ঞানের নানা ধারা সংক্ষিপ্ত রচনায় আলোচনা করা একার পক্ষে অসাধ্য কাজ। শুধু মূল ধারার ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে। তাও সহজসাধ্য কাজ নয়। কারণ, তাত্ত্বিক অবস্থানগুলো পরস্পরের সঙ্গে বিতর্কে যুক্ত। কখনও তাত্ত্বিক ও গবেষকের কোনও এক নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দর্শন বা মতাদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতা, কখনও নিজ শাস্ত্রের উৎকর্ষ সম্বন্ধে অতি-বিশ্বাস, কখনও বা পছন্দের পদ্ধতির প্রতি মোহ— তর্ক-বিতর্কের সূত্রপাত করে। আবার, প্রত্যেকটি মতাদর্শ, শাস্ত্র ও পদ্ধতিবিদ্যার অন্তরেও নানা ভিন্নতা। এর সঙ্গে আছে, নারী আন্দোলনের বিচিত্র ইতিহাস। নারীর কথা কে বলবে, শাস্ত্রজ্ঞানী সহৃদয় পুরুষ, বুদ্ধিজীবী, নারী আন্দোলনের পোড়খাওয়া কর্মী না স্বতঃস্ফূর্ত সাধারণ নারী— তা নিয়েও অশান্তি। আসলে, নারীর শোষিত ও অবদমিত অবস্থা, তার সম্বন্ধে নারীর চেতনা ও মুক্তির সন্ধান ও মুক্তির পথে নানা প্রাতিষ্ঠানিক বাধার কোনও একটি বিশেষ তাত্ত্বিক অথবা পদ্ধতিগত অবস্থান দিয়ে বোঝা যাচ্ছে না— এই উপলব্ধি নতুন নতুন ভাবনার জন্ম দিচ্ছে। নারীবিদ্যা পশ্চিমি সংস্কৃতির ফল। পূর্ব ও পশ্চিমের বিভাজনের পরিপ্রেক্ষিতে, দেশজ পরিস্থিতি বোঝার জন্য বিজাতীয় নারীবিদ্যা কতটা সম্পূর্ণ উপযুক্ত তা নিয়েও প্রশ্ন আছে।

নানা তত্ত্ব-ভাবনা ও নানা গবেষণা মূলত নারীর নির্মাণে সংস্কৃতি ও ক্ষমতার নির্ধারণী প্রভাবের কথা বলে। 'নির্মাণ'-এর ধারণা বিদেশি। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ নারীবিদ্যার সূত্রপাত বিদেশে। স্ব-জাতীয় নারীবিদ্যার সূত্রপাতও পশ্চিমিবিদ্যার অনুপ্রেরণাতেই হয়েছে। 'নির্মাণ' কথাটায় পরিকল্পনা ও প্রযুক্তির সচেতন প্রয়োগের ধারণা আছে। তেমনি আছে ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যমের ধারণা। ব্যক্তিসম্পর্কে বা পারিবারিক আয়োজনে নারীর কোন বা কী ধরনের ভূমিকা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হবে, তা নিয়ে 'পরিকল্পনা' থাকে। সমাজের কল্যাণের মাপকাঠি অবশ্যই কিছু ক্ষমতাসীন মানুষ ঠিক করে। এই ক্ষমতার উৎস নানাবিধ: ব্যক্তিগত অথবা দলগত গায়ের জোর ও চাতুরী, মানুষের মনে বিশ্বাস সৃষ্টির প্রক্রিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ— তা আদিম জাদুবিদ্যা, ধর্ম, আধুনিক বিজ্ঞান ও রাজনৈতিক মতাদর্শ বা উত্তর-আধুনিক প্রতিরূপের বিন্যাসের মাধ্যমে কোনও কোনও ক্ষেত্রে হোক, অথবা প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্বের ওপর দখল। সেই কর্তৃত্ব হয় রাষ্ট্রের বা বাজারের বা ধর্মীয় সংগঠনের।

'নির্মাণ' কথায় যে কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতা আছে, তা আমাদের 'মানুষ করা' কথায় নেই। তার কারণ 'নির্মাণ' কথাটা বুদ্ধিজাত, 'মানুষ করা' কথাটা দৈনন্দিন জীবনের প্রক্রিয়া থেকে উঠে এসেছে। 'মেয়ে মানুষ করা' কথাটা সম্বন্ধেও এই পর্যবেক্ষণটি ঠিক। এই আটপৌরে কথাটার তাৎপর্য গভীর। ছোটদের বড়রা মানুষ করবে, এটাই স্বাভাবিক— এই সর্বজনগ্রাহ্য কথাটা প্রশ্নাতীত হয়ে গেছে। মানুষ করার প্রক্রিয়ায় যে নানা ক্ষমতার ও প্রতিষ্ঠানের পরস্পর সংযুক্তি আছে, তা সহজে চোখে পড়ে না। যেন গা-সওয়া হয়ে গেছে।

মানুষ করা, মানুষ হওয়া স্বাভাবিক,— এ ধারণার শুরু নবজাতকের জীবন রক্ষার প্রবণতায়। প্রকৃতির দাবি কী করে মেটাতে হবে তা তার জানা প্রয়োজন। প্রকৃতি থেকে আহরণ করে পরিবেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার মাধ্যমে আত্মরক্ষা ও আত্মবৃদ্ধির শিক্ষার তাগিদেই শিশুকে বয়স্ক-নির্ভর হতে হয়। সেই তার মানুষ হওয়া, বা নির্মিত হওয়া শুরু। যেহেতু তাকে সমাজ জীবনেও থাকতে হবে, তার কাছে সমাজের প্রত্যাশা কি, তাও তাকে জানতে হবে। কোনও ব্যক্তিই যেহেতু সম্পূর্ণ স্বনির্ভর জীবনযাপন করতে পারে না, সম্পর্কের বাইরে তার সামাজিক অস্তিত্ব নেই। তাই সামাজিক জীবনযাপনের গ্রাহ্য ধারা তাকে শিখতেই হবে। তাকে মানুষ হতে হবে। সম্পূর্ণ বিদ্রোহ, কল্পনার কথা।

সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করাই মানুষ হওয়ার চাবিকাঠি। তাতে আত্মজ্ঞান হয়। নিজের অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে যে-বোধ হয়, তার নির্দেশেই ব্যক্তি উপযুক্ত আচরণ ও ভাবনার সিদ্ধান্ত নেয়। জন্মের পর থেকেই আমরা টের পেয়ে যাই, যা কিছু করার স্বাধীনতা নেই। বড় হতে হতে বুঝতে পারি, আমরা কি করতে পারি না পারি তাই নিয়ে বাবা-মা, পরিজন, শিক্ষক, ধর্মগুরু, শ্রমিক নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ-উপদেশ, অনুশাসন-অনুনয়ের পেছনে এক আপাত নৈর্ব্যক্তিক দীর্ঘস্থায়ী সংস্কৃতি আছে। তারাও সেই সংস্কৃতির দাস। রীতিনীতি, প্রথা, ধর্ম, আইন, ফ্যাশন— নানা নিয়মের বিন্যাসে সংস্কৃতির পরিচয়। শরীর-মন, কামনা-বাসনা, কুসংস্কার-যুক্তিবাদ— ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কের এমন কোনও মাত্রা নেই যা সংস্কৃতি-মুক্ত। একান্ত নিজস্ব কোনও ভাবনা ও আচরণ নেই। সবই গোষ্ঠী-নির্দিষ্ট, গোষ্ঠীর আকার-প্রকার, অবস্থান যে রকমই হোক। গোষ্ঠীটি কাল্পনিক হওয়াও একদম অসম্ভব নয়।

মানুষের নান্দনিক ক্রিয়াকলাপও সংস্কৃতি বলে পরিচিত। হাতে আঁকা ছবি, ক্যামেরায় তোলা ছবি, কম্পিউটারে আঁকা ছবি, কণ্ঠে গান, যন্ত্রে গান, সাহিত্যের নানা রূপ, আর এ সব কিছুর অন্তরালে মানুষের সৌন্দর্যবোধ— সব মিলিয়েই নান্দনিক সংস্কৃতি। এতে শিষ্টতা, সুরুচিবোধের প্রকাশ হয়। দৃশ্যমান সম্পর্কের ভিত্তিমূল আমাদের মনোভাবে, শিষ্টতা ও সুরুচি যার অংশ। নান্দনিক সংস্কৃতিই এই শিষ্টতা ও সুরুচি তৈরি করে। বলে নেওয়া ভাল, এই সংস্কৃতি শুধু তথাকথিত 'মার্জিত' সমাজাংশের নয়। এটা সর্বজনীন। জন্মানোর পর থেকেই মানুষের জীব-প্রকৃতির ওপর সংস্কৃতির দখল প্রতিষ্ঠার লড়াই শুরু হয়ে যায়। জৈবিক প্রয়োজন মেটানোর সব দিকই— কখন, কীভাবে, কোন সম্পর্কের মাধ্যমে ও কী উদ্দেশ্যে— সংস্কৃতি-নির্ধারিত। সাধারণত মানুষ অবাধ্য হয় না। দু'ধরনের কারণ আছে। এক, কোন সম্পর্কের জন্য কখন কোন আচরণ যথাযথ তা সংস্কৃতি বলে দেয়। তাতে

ব্যক্তির সুবিধা হয়। অবশ্য এই সুবিধাবোধ, সংস্কৃতিই মানুষের মনে তৈরি করে। দুই, সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য নিশ্চিত করতে শুধু তা যথেষ্ট নয় বলে, নানা ক্ষমতার প্রয়োগ বা প্রয়োগের ভয় দেখানো হয়। এ কথা সব সামাজিক জীবন সম্বন্ধেই সত্যি। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, এক ঘরে করা, মিথ্যা ভয় দেখানো, দৈহিক নির্যাতন, কয়েদ জীবন, অঙ্গহানি-জীবনহানি, মানুষের দীর্ঘ শাস্তির ইতিহাসে আর যা কিছু আছে, তার জোরেই সংস্কৃতি বেঁচে থাকে। সংস্কৃতির বেঁচে থাকা ও বাঁচিয়ে রাখা শুধু সংস্কৃতির স্বার্থে নয়। প্রত্যেক ধরনের সমাজেই ক্ষমতার অসম বন্টন বজায় রাখার স্বার্থেই তা করা হয়। এর মানে অবশ্যই এই নয় যে, কোনও একটি নির্দিষ্ট ক্ষমতার বিন্যাস বা সংস্কৃতির দখলদারি পালটায় না। সেই বিন্যাসে যারা শোষিত ও অসহায় শুধুমাত্র তাদের প্রতিবাদী বা বিপ্লবী রূপান্তরে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়, তা নয়। একাধিক, কখনও বা আপাত বিচ্ছিন্ন কার্যকারণে পরিবর্তন আসে। তাই ক্ষমতার বিন্যাস কম বেশি পালটায়, পালটায় সংস্কৃতির অন্তঃকরণও। কিন্তু কোনও সমাজই কখনও ক্ষমতা বা সংস্কৃতি মুক্ত হয় না।

পুনর্কথন হলেও, সাধারণ সূত্রটির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আর একবার করা যেতে পারে: নারীর অসম অবস্থানের ব্যাখ্যা মূলত সংস্কৃতি ও ক্ষমতার কার্যকারণেই। তাই সংস্কৃতি নিয়ে দু'কথা বলা হল। অবশ্য ওই ব্যাখ্যা অন্য ধরনের অসাম্য বুঝতেও সাহায্য করে। অন্য ধরনের অসাম্যের ভিত্তিমূল একই, এই কথা বলার প্রয়োজন আছে। কারণ, বর্ণ অসাম্য, জাতি অসাম্য, শ্রেণি অসাম্য ও লিঙ্গ অসাম্য আংশিক ভাবে সমাপতিত থাকে। এক অপরকে গভীর ও জটিল করে।

নারীবিদ্যার নানা তত্ত্বের ও নানা গবেষণার সারাংশ যদি সূত্রাকারে বলা যায়, এই মাত্রা যা বলা হল তবে কেন এত তত্ত্বচিন্তার জন্ম, সে প্রশ্ন উঠে আসে। তার উত্তর এই যে, সংস্কৃতির কোন উপাদানটি ও ক্ষমতার কোন বিন্যাসটি নারীর সামাজিক অবস্থান বুঝতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে, তাই নিয়ে তাত্ত্বিকদের মধ্যে অনৈক্য। শোষিত ও অবদমিত অবস্থান থেকে নারীর উত্তরণের সঠিক পথ কোনটি সে প্রশ্নেও মতপার্থক্য আছে।

এই নানা তত্ত্বের নানা নাম আছে। নারীর অবস্থানের কোন বিষয়টিতে একটি তত্ত্বের প্রধান আগ্রহ, দৃষ্টিভঙ্গি, নারীমুক্তির জন্য করণীয় কর্মসূচি ও দার্শনিক ভিত্তি, তা তত্ত্বের নামকরণে চিহ্নিত হয়ে আছে। কয়েকটি নামকরণের উদাহরণ দেওয়া যাক: উদারনৈতিক নারীবাদ, ফ্রয়েডীয় নারীবাদ, অস্তিত্ববাদী নারীবাদ, কৃষ্ণকায় সত্তা উপযোগী নারীবাদ, ফরাসি নারীবাদ ও উত্তর-আধুনিক নারীবাদ।

সব তত্ত্বের কেন্দ্রে আছে লিঙ্গ নির্মাণের প্রশ্ন। সেই প্রক্রিয়াটি কী ভাবে নানা তাত্ত্বিকের কাছে ধরা পড়েছে, তা আলোচনা করার আগে লিঙ্গসত্তার ধারণার উল্লেখ প্রয়োজন।

'পুরুষত্ব' ও 'নারীত্ব' সংস্কৃতি-নির্মীত, এ কথাটা বোঝানোর জন্যে.'জেন্ডার' বা লিঙ্গ সত্তা কথাটি ১৯৭০-এর দশকের শুরু থেকে প্রসিদ্ধ হয়। এ শুধু জৈবিক যৌন পার্থক্যের কথা বলে না, যদিও দেহজ যৌনতা ও যৌন সত্তা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা-নির্ভর লিঙ্গ সত্তার বহুমাত্রিক অনুসন্ধানের প্রায় সবটা জুড়েই আছে নারীবিদ্যা।

তাতে অবশ্য পুরুষত্বের প্রসঙ্গটি বাদ পড়ে না। কারণ, নারীবিদ্যায় নারীত্বের ধারণা পুরুষত্বের সংজ্ঞা নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে। পুরুষপ্রধান সমাজে সংস্কৃতি পুরুষ-নির্মিত ও পুরুষের স্বার্থই রক্ষণাবেক্ষণ করে— নারীবাদের এই বিশ্বাস নারীবিদ্যায় পুংলক্ষণের আলোচনা জরুরি করেছে।

নারীসত্তা সংস্কৃতি নির্ধারিত, এই যুগান্তকারী দাবির আকর্ষণ নানা কারণে। প্রথমত, 'নারী-পুরুষের ভিন্নতা প্রকৃতি নির্ধারিত ও তাই অপরিবর্তনীয়'— বহু সময়কালের এই ধারণা নিয়ে জোরালো প্রশ্ন তোলা শুরু হল নারীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে। দ্বিতীয়ত, যে সংস্কৃতির অনুশাসনে নারীর নিম্নবর্গীয় অবস্থান 'স্বাভাবিক', 'সঙ্গত' ও 'বৈধ', সেই পুরুষ-স্বার্থ-কেন্দ্রিক সংস্কৃতির পুনর্নির্মাণ সম্ভব— এই বিশ্বাস নারীবাদী আন্দোলন ও নারীবিদ্যার কেন্দ্রবিন্দু। সংস্কৃতি যেহেতু প্রকৃতিদত্ত বা দেবদত্ত নয়, যেহেতু তা মানুষের প্রয়োজন-কেন্দ্রিক মিথষ্ক্রিয়ার ফল, ভিন্ন সংস্কৃতির নির্মাণ কষ্টসাধ্য হলেও সম্ভব, এই আশা খুব স্পষ্ট।

'একজন নারীসত্তা নিয়ে জন্মায় না, মানুষ হওয়ার মাধ্যমে নারী হয়'—১৯৪০-এর দশকে Simone de Beauvoir-এর এই কথায় (*The Second Sex*, 1949) নারীবিদ্যার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। শুধু সহজাত শারীরিক চিহ্ন লিঙ্গসত্তা নির্ধারণ করে না, এ কথা নারীবিদরা বললেও, তাঁরা শারীরিক চিহ্নকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করতে পারেননি। যেমন পারেননি লিঙ্গ ও প্রজননের সম্পর্ক ও প্রজননে নারী ও পুরুষের ভূমিকার ভিন্নতা অস্বীকার করতে। কিন্তু লিঙ্গসত্তা নির্ধারণে প্রকৃতি ও সংস্কৃতির আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে বিতর্ক। শারীরিক পার্থক্য-চিহ্নের বনিয়াদের উপর সংস্কৃতি কি লিঙ্গসত্তা নির্মাণ করে? না, যৌনচিহ্ন ও লিঙ্গ সত্তার সম্পর্কটি খুব জটিল। সংস্কৃতি-নির্ধারিত লিঙ্গসত্তা কি জৈবিক যৌনতা সম্বন্ধে ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে না? শারীরিক নারী ও শরীর-মন নিয়ে নারীর মূল্যহানির জটিল পারস্পরিক সম্পর্ক কি লিঙ্গসত্তার ধারণায় সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়ে? লিঙ্গসত্তা শেষ অব্দি সংস্কৃতি-নির্ধারিত, এই বিশ্বাসে কি 'পুরুষই প্রধান' মতবাদের অযাচিত স্বীকৃতি নেই? লিঙ্গ সত্তা ধারণাটির সীমাবদ্ধতা নিয়ে অসন্তোষ এই নির্বাচিত প্রশ্নগুলির মধ্য দিয়ে যেমন প্রকাশ পাচ্ছে, তেমনই আছে মাত্রাহীন অনুসন্ধানের আগ্রহ। তত্ত্বের মূল ধারাগুলি অনুসরণ করলে লিঙ্গসত্তার নানা ধারণা আমরা জানতে পারি।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে মুক্তচিন্তা উদারনীতির জন্ম হয়। তারই আবহাওয়ায় গড়ে ওঠা নারীবাদ-নারীবিদ্যার চোখে নারীর পুরুষের কাছে দাসত্বই ধরা পড়েছে। নারীকে নির্মাণ করা হয়েছে পুরুষের দাসী হিসাবে, যার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য পুরুষকে আরাম, সুখ, সন্তুষ্টি দেওয়া। তাই নারী ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি দিয়ে পরিচালিত হবে, যুক্তি দিয়ে নয়। বস্তুত, যুক্তিতে নারীর অধিকার নেই, শিক্ষাতেও নেই। ঘরের বাইরে স্ব-পরিচয়-এ আত্মপ্রতিষ্ঠার অনুমতিও নেই। মানুষ করার ধরনটিই মেয়েদের পুরুষের দাসে পরিণত করে। পুরুষকেন্দ্রিক সংস্কৃতি আত্মস্থ করাই মেয়েদের বড় হওয়া। এই সংস্কৃতির অনেকটা জুড়েই আছে ধর্মের অনুশাসন। পাপ-পুণ্যের ভয়-প্রলোভনে নারীকে পুরুষের অধীনস্থ

করাই এই সংস্কৃতির অভিসন্ধি। শিক্ষার অধিকার না দিয়ে, অন্তঃপুরে ঘরের কাজ ও সন্তানের মা হওয়াকেই ধ্যানজ্ঞান করতে শেখানো হয়। নানা শাস্তির মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে অন্যায়গুলো মুখ বুজে মেনে নেওয়া ভাল। ঘর-সংসারে ও সমাজে তাদের অধঃস্থানের ভিত্তিমূল যাতে তারা কখনও বুঝতে না পারে তার জন্যে চোখ খুলে দেখা, মন খুলে ভাবনার যাবতীয় সম্ভাবনা নির্মূল করাই এই সাংস্কৃতিক নির্মাণের উদ্দেশ্য। 'সুন্দর-স্নিগ্ধ-অনুগত-আত্মবিস্মৃত' নারী-নির্মাণে পরিবারের শ্রমের বিভাজন, রাষ্ট্রের আইন, পুরোহিতের নির্দেশ হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে। সংস্কৃতির ভূমিকা প্রসঙ্গে Mary Wollstonecraft (*A Vindication for the Right of Woman*, 1792) ও Sarah Grimke (*Letters on the Equality of the Sexes and the Condition of Women*, 1838) একই সঙ্গে নারীর পুনর্নির্মাণের কথাও বলেন যাতে নারী যুক্তিবাদী, দায়িত্বশীল, মুক্ত ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর উদারনৈতিক ভাবনায় নারীকে যুক্তিহীন করে রাখার সমালোচনার পাশাপাশি রাজনৈতিক অধিকারের জন্য আন্দোলনের উপযোগিতার কথা বলা হয়েছে। একই সময় নারীবিদ্যার আর একটি ধারা সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের আমূল পরিবর্তনের দাবি করেছে। এই কারণে এই দ্বিতীয় ধারাটি সংস্কৃতি-আশ্রয়ী নারীবিদ্যা বলে পরিচিত। এর মূল বক্তব্য হল যে নিজস্ব ভাবনা ও সিদ্ধান্ত দিয়ে পরিচালিত না হয়ে অন্য (পুরুষ) দ্বারা পরিচালিত হওয়ার দরুনই নারীর অবদমিত অবস্থান। মানুষ করার প্রক্রিয়াই এর জন্য দায়ী। প্রশ্ন উঠতে পারে এই দুটি তত্ত্বেই নারীর নির্মাণের ব্যাখ্যা একই রকমের। তা হলে তত্ত্ব দুটির ভিন্নতা কোথায়? প্রথম তত্ত্বটি ইউরোপীয় যুক্তির যুগে রচিত বলে নারীকে মানুষ করার নামে কী করে যুক্তি চিন্তার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়, তার ওপর বিশেষ দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় তত্ত্বটিও বঞ্চনার কথা বলে, মুক্ত অনুভূতির জীবন উপভোগ করার সুযোগ থেকে বঞ্চনা। Margaret Fuller-এর মতে নারী চরিত্রে 'তড়িৎ' শক্তি আছে, যা তাকে উজ্জীবিত করতে পারে। কিন্তু গার্হস্থ্য জীবন নিয়ে প্রাত্যহিক ব্যস্ততা ও দায়িত্ব সেই শক্তিকে অপচয় করে। নারীর ব্যক্তিসত্তার অনিষ্ট করে। Elizabeth Cady Stanton-এর লেখায় (*The Woman's Bible*, 1895 & 1899) ধর্মের ভূমিকার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। Matilda Joslyn Gage চার্চের হাতে নারী নিগ্রহের বিবরণ দিয়েছেন (*Woman, Church and State: A Historical Account of the Status of Women through the Christian Ages,* 1983)। একই সঙ্গে, 'নারী পুরুষের কামনার সঙ্গী' এই জোরালো বিশ্বাস তৈরির কথাও বলেছেন। কীভাবে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাব ও অসহায়তা বোধ তার মনে হীনম্মন্যতার জন্ম দিয়েছে, তা জানিয়েছেন। Charlotte Perkins Gilman তাঁর বিশ্লেষণে (*Woman and Economics,* 1898; *The Home,* 1903; *The Man-Made World;* or, *Our Androcentric Culture*, 1911) নারীমনে কুণ্ঠা সৃষ্টি করে এই রকম কিছু কার্যকারণের কথা যোগ করেছেন। যেমন, শরীরের পূর্ণ বিকাশ হতে না দেওয়া, সংসারে ছোটখাটো কাজে আটকে রাখা, যুক্তিহীন আবদ্ধ করা, নির্দিষ্ট পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে বাধ্য করা, সৃষ্টিমূলক কাজ— যাতে মানসিক উত্তরণের সম্ভাবনা আছে— তাতে বাধা দেওয়া।

গৃহজীবনে গণতন্ত্রের অভাব, যা পুরুষতন্ত্রের কারসাজি, নারীকে সহজেই পুরুষের সম্পত্তিতে পরিণত করেছে।

Karl Marx-এর লেখায় (*The German Ideology*, 1846) এই সম্পত্তির প্রসঙ্গটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কথায়, স্ত্রী স্বামীর দাস, তার শ্রম ক্ষমতা স্বামীর সম্পত্তি। মার্কসে অনুপ্রাণিত নারীবিদ্যা তাঁরই সূত্র অনুসরণ করে কী করে নানা ভ্রান্ত ধারণা ও পুরুষপন্থী মতাদর্শ নারীর মন দখল করে আছে, তা বিশ্লেষণ করেছে। Frederick Engels-এর মতে (*The Origin of the Family, Private Property and the State*, 1848), অর্থনীতির বিকাশের কোনও এক মুহূর্তে নারীর অবস্থানের আমূল পরিবর্তন হয়। 'নারীর ঐতিহাসিক পরাজয়' ও পুরুষের নারী-নির্মাণের ক্ষমতার শুরু, যখন পুরুষের 'বিনিময়ের জন্য উৎপাদন' নারীর 'ব্যবহারের জন্য উৎপাদন'-কে অর্থনৈতিক গুরুত্বে ছাপিয়ে যায়। বস্তুবাদী বিশ্লেষণের আদলে Elizaretsky-র আলোচনায় (*Capitalism, the family* and *Personal Life*, 1976) ধরা পড়েছে কী করে নারী হৃদয়হীন উৎপাদনে অসহায় পুরুষের আবেগের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠল। পুরুষের শরীরের তৃপ্তি জোগানোর পাশাপাশি মনের চাহিদা মেটানো, নারীর দায়িত্বে পরিণত হল। নারী গৃহবন্দি হল। পরিবার নবজাতকের মানুষ করার প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র, সে আবিষ্কার আগেই হয়ে গিয়েছিল। তারপর সমাজতান্ত্রিক নারীবিদ্যা প্রতিপন্ন করল যে মানুষ করার নিগূঢ় অর্থ হল মতাদর্শ অনুযায়ী নারীমন নির্মাণ করা। পুরুষ প্রধান এই মতাদর্শে প্রতিযোগিতামুখী, যুক্তিবান, চতুর ও কর্তৃত্বপ্রবণ পুরুষই শ্রেষ্ঠ। সুষ্ঠু উৎপাদন প্রক্রিয়ার তাগিদে পুঁজিবাদ এই রকমটিই চায়। অন্যদিকে, নারীর আবেগপ্রবণতা ব্যক্তিসম্পর্কে প্রয়োজনীয় হলেও, তার গুরুত্ব উৎপাদন ব্যবস্থায় নগণ্য। Sandra Harding নারীত্ব নির্মাণে লিঙ্গসত্তার মতাদর্শের অবদান দেখিয়েছেন (*Is Science Multicultural? Post-Colonial Feminism, and Epistemology*, 1998)। Max Horkheimer বুঝিয়ে দিয়েছেন কী করে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা নারী/মাতার শিশুপালনের মধ্য দিয়ে উপযুক্ত শ্রমিকের জন্ম দেয়। এতদ্‌সত্ত্বেও, নারীর অবমূল্যায়ন সর্বজনীন। নারী শুধু সংসারের বিনা-পারিশ্রমিকের কর্মী নয়, অনেকের সঙ্গে থেকেও সে নির্জন জীবনযাপন করে। তার ছোট বয়সের মানুষ হওয়ার অভিজ্ঞতা তাকে বুঝিয়ে দেয়, তার এই রকম জীবনই স্বাভাবিক। Sigmund Freud (*Three Contributions to the Theory of Sex*, 1905; *On Natcissim*, 1914)- অনুপ্রাণিত নারীবিদ্যা স্বাভাবিকভাবেই নারীমন গঠনের সূত্রপাত পরিবার জীবনেই খুঁজে পেয়েছে। Nancy Chodorow পরিবারে মানসিক সম্পর্কে— বিশেষত মা ও শিশুর মধ্যে— লিঙ্গ-নির্ভর ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্ম দেখেছেন (*The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender*, 1978)। নারীত্বের নির্মাণ প্রক্রিয়া শুরু হয় মা-মেয়ের সম্পর্কে: তাদের যৌন পরিচয় অভিন্ন বলে তাদের মানসিক ঘনিষ্ঠতা স্বাভাবিক ও দীর্ঘস্থায়ী। পুরুষ সন্তান সেই গণ্ডি থেকে বেরিয়ে পড়ে অনেক আগেই। মা ও পুরুষ সন্তানের যৌন ভিন্নতা এই প্রক্রিয়াকে সহজ ও অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তার নিজস্বতা বোধের সূত্রপাত ও জোর সেখানেই। মা'র থেকে মেয়ের মুক্তি সেই তুলনায় 'অস্বাভাবিক' ও অসম্পূর্ণ।

ভবিষ্যতে বৃহত্তর সমাজজীবনে ভূমিকার ধরনই নির্ধারণ করে দেয় পুরুষত্ব ও নারীত্বের লক্ষণ: পুরুষকে হতে হবে স্বাধীন ও তুলনামূলক ভাবে আবেগহীন; নারীকে পরনির্ভর ও অনুভূতিপ্রবণ। পুঁজিবাদী উৎপাদনে পুরুষকে যথাযোগ্য হতে হবে। আর, পুরুষতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে নারীকে প্রজনন ও প্রযত্নে দর হতে হবে। নারীর ভূমিকা ঘরে, পুরুষের বাইরে। লিঙ্গভিত্তিক শ্রমের বিভাজন ও লিঙ্গসত্তা একে অপরকে মদত দেয়। পরিবার বা বিশেষত মা'র সঙ্গে সম্পর্কে উদ্ভূত সন্তান ও সন্ততির আত্মপরিচয়, বৃহত্তর অর্থনৈতিক আয়োজনের শ্রমের দাবি মেটানো সহজ করে দেয়।

বৃহত্তর সামাজিক আয়োজন, পরিবার যার অন্তর্গত, তার আর একটি বহু পরিচিত রূপ হল পুরুষতন্ত্র। তার সংস্কৃতির কেন্দ্রে আছে পুরুষ: সেই-ই সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, ইতিবাচক ও মূল্যায়নের মাপকাঠি। তার তুলনায় নারী তার বিপরীত, তার 'অপর'। তবে, নারী স্ব-ইচ্ছায় 'অপর' হয়নি, হতে বাধ্য হয়েছে। এই অপর-ত্বে শুধু গ্লানিই আছে। পিথাগোরাসের চোখে, নারী, অন্ধকার ও বিশৃঙ্খলতা সমতুল। এই দর্শন এখনও সজীব। Simone de Beauvoir-এর মতে মেয়েদের শরীর, বিশেষত প্রজনন ক্ষমতা, তাদের অপর-ত্বের সহজ শিকার করেছে। পুরুষ এই শরীরী জীবনের নানা দাবি থেকে মুক্ত, তাই তার আত্মসন্ধান সহজ। পুরুষ অগ্রসর হয়, নারী অপেক্ষা করে। নারী-পুরুষের আত্মবোধের এই ভিন্নতা বুঝতে অস্তিত্ববাদী দর্শন সাহায্য করেছে। Hegel-Sartre বিশ্লেষণে চেতনার দুই সত্তা: একটি উত্তরণের আকাঙ্ক্ষায় সঞ্জীবিত, অপরটি নির্দিষ্ট ও আত্মস্থ। একটির অস্তিত্ব ও পরিচয়ের জন্য অপরটির প্রয়োজন। পরস্পরের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অবিরত। তবে সত্তা দুটি অসম। একটি নির্ধারণ করে, অপরটি নির্ধারিত। অস্তিত্ববাদী নারীবিদ্যা নারী-পুরুষের অসম সম্পর্ক এই ভাবেই বিশ্লেষণ করে।

বৃহত্তর জন-জীবনের রাজনৈতিক মতাদর্শ, সাধারণ মূল্যবোধ ও দার্শনিক চিন্তা নারীর অবস্থানের অনুসন্ধানে পথ দেখিয়েছে। নারীবিদ্যার চিন্তার গড়ন তাদের আদলেই হয়েছে। এরই পাশাপাশি, নারীবাদী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা প্রচলিত নারীবিদ্যার নানা অপূর্ণতা দেখিয়ে দেয়। নারী-নির্মাণের আলোচনাও তার অঙ্গ। কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

আধুনিক নারী-পুরুষ সম্পর্কে প্রথাগত বাধা-নিষেধ অমান্য করে প্রেম ও যৌন আচরণের স্বাধীনতা নারীকে মুক্ত করেছে, এই ধারণা ভুল। বরঞ্চ, দুই-ই তাদের পুরুষ-প্রধান সম্পর্কের জালে ধরে রাখে। আপাত স্বেচ্ছায় প্রেমের জীবনে নারীর ভূমিকার কোনও আমূল রূপান্তর ঘটে না; নারী-পুরুষের আধুনিক সম্পর্কেও নারী দ্বিতীয় ব্যক্তিই থাকে। পুরুষ প্রেমিকের চোখে সে নির্ভরশীল হবে। নানা দুর্বলতা— প্রেমিক যেন পরিত্যাগ না করে, সেই দুশ্চিন্তা— সব কিছুই তার মনকে এ রকম আচ্ছন্ন করে রাখে যে, তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের বিকাশের সুযোগ ও সময় থাকে না। যৌন আচরণের 'স্বাধীনতা' নারীকে পুরুষের কাছে আরও সহজলভ্য করে তোলে।

আপাত স্বাধীন প্রেমের সম্পর্ক ও প্রেম-অপ্রেমে স্বাধীন যৌন আচরণ— এই দুই-এর অন্তরালে পুরুষ-প্রাধান্যের মতাদর্শই কাজ করে। মার্কসবাদী Louis Althusser ও Antonio

Gramsci-র চিন্তার সূত্র ধরে Kate Millet (*Sexual Politics*, 1970), এই মতাদর্শ যে সমাজ ও সংস্কৃতির পরতে পরতে ঢুকে গেছে, তার ওপর জোর দিয়েছেন। পুরুষকে তৃপ্ত করতে হবে, এটাই নারী জীবনের ধ্যান-জ্ঞান ও আচরণের একমাত্র নির্দেশিকা। যৌন জীবনের ঘনিষ্ঠতাও 'রাজনীতি'-মুক্ত নয়। কারণ সেখানেও ক্ষমতা ও মতাদর্শের প্রয়োগ, পরাধীন করে রাখার বিভিন্ন আয়োজন। শিশুকন্যার পা-বাঁধা, পূর্ণাঙ্গ নারীর জন্য পর্দা, ধর্ষণ, অপমান ও গ্লানির জীবন— সবই পুরুষের দেহ ও মনকে সন্তুষ্ট করার জন্য। সাহিত্যে নারীর দেহ, অনুভূতি ও চরিত্র লঙ্ঘনের কাহিনিও পুরুষ পাঠকের সূক্ষ্ম তৃপ্তির উৎস। শ্রেণি, শিক্ষা নির্বিশেষে পর্নোগ্রাফির প্রতি পুরুষের সর্বজনীন আকর্ষণ তো বলাই বাহুল্য। Shulamith Firestrone-এর মতে (*The Dialetic of Sex: The Case for Feminist Revolution*, 1970) নারী যে তার শরীরের জীবন ও মনের জীবন পুরুষের মতো বিচ্ছিন্ন করতে পারছে না, সেই কারণেই যৌন-রাজনীতিতে সে হেরে যাচ্ছে। গ্লানিকর, ক্লান্তিকর হলেও, প্রেম ও সেবার বিনিময়ে তাই সে নিরাপত্তা খোঁজে। সাহিত্যে, শিল্পে তার অবদানের সময় কোথায়? নারীর শরীরই তার বহুমাত্রিক সর্বনাশের কারণ। Ti-Grace Atkinson (*Amazon Odyssey*, 1974) প্রশ্ন করেছেন যে, নারীরা মুক্ত হলে কি তাদের প্রেমের প্রয়োজন হত? শরীরের নারী-চিহ্নই তার দুর্বলতা ও অধীনতার একমাত্র কারণ নয়। কালো চামড়া অধীনতা ও শোষণের আর এক মাত্রা এনে দেয়। Gloria Joseph (*Common Differences: Conflicts in Black and White Feminist Perspectives*, 1981), Cherrie Moraga (*This Bridge Called My Back*: Writings by Radical Women of Color, 1981), Pauli Myrray (*Jim Crow and Jane Crow*, 1972)-র মতো লেখিকারা নারীত্বের নির্মাণে বর্ণের ভূমিকার কথা বলেছেন।

দেহ-মনের অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অনেক ধরনের নির্ধারণের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর অবস্থান ও অস্তিত্ব তার ভাবনার জগৎ ও ভাবনার পদ্ধতির জন্ম দেয়। বিশেষ চেতনা, নীতিবোধ, সৌন্দর্যধারণা ও জ্ঞান নারীমনকে বিশেষ রূপ দেয়। যা কিছু তার সামাজিক পরিবেশে আছে, যা কিছু তার দৈনন্দিন জীবনে নিয়ম করে ঘটে, তা তার কাছে প্রশ্নাতীত। তাকে মেনে নেওয়া, তার প্রতি সম্ভ্রম দেখানো, নারী মনের ধর্ম। জীবন যেমন, তাকে স্বীকার করে নেওয়াই নারীর নীতি। দুর্বলের এ ছাড়া কোনও উপায় নেই। কারণ অন্যথায় শাস্তি, বিপদ। এই জীবনের একটি অবধারিত ঘটনা হল সন্তানের জন্মদান। সেই সূত্রে মা'র প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ অবশ্যম্ভাবী। তারই মোকাবিলা করতে করতে নারী মাতৃসুলভ ভাবনার অধিকারী হয়। তার কাজ শুধু জীবন সৃষ্টি করা নয়, তাকে রক্ষা করাও। প্রজননকে ঘিরে নীতি-ভাবনা, তার সামগ্রিক জীবনের নীতি-ভাবনায় পরিণত হয়। যে কোনও নির্দিষ্ট বিষয় বিচার করার সময় সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতের দিকে নজর রাখা, নারী মনের স্বাভাবিক ঝোঁক। তার আচরণও নির্ভর করে এর ওপর। জীবন ও সম্পর্ক বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা নারীর বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য অবশ্য স্ব-উপার্জিত নয়।

নানা ধরনের নারীবিদ্যা ও নারীবাদী আন্দোলন শুধু নারীত্বের নির্মাণ প্রক্রিয়া বুঝতে চেষ্টা করেনি, শোষিত ও অধীনস্থ অবস্থান থেকে নারীমুক্তির দিশাও খুঁজেছে। একাধিক পথের কথা ভাবা হয়েছে, তাদের আপেক্ষিক কার্যকারিতা নিয়ে বিতর্কও উঠেছে। বিভিন্ন কারণে বিতর্কের সুযোগ হয়েছে। যেমন, রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য। উদারনৈতিক নারীবিদ্যা ও মার্কসীয় নারীবিদ্যার ভেতর মতের অমিল হবে, এটাই স্বাভাবিক। কোন শ্রেণির বা বর্ণের নারীর মুক্তি সন্ধান করা হচ্ছে, তার সঙ্গে মুক্তির পথ নির্বাচনের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। যে-কোনও বিতর্কের মতো এই বিতর্কও নারীর অবস্থান ও অস্তিত্বের নানা সমস্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

ইউরোপীয় আলোকপ্রাপ্তির সময়, নারীবিদরা নারীমুক্তির পথ হিসেবে নারীকে স্বাধীন যুক্তিচিন্তার শিক্ষা ও সুযোগদানকে বেছে নিয়েছিলেন। Mary Wollstonecraft-এর ভাবনায়, যুক্তিসম্মত চিন্তার দীক্ষা ও অধিকার নারীকে আত্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগ করে দেবে। ঘরের বাইরে বেরিয়ে জনজীবনে অংশগ্রহণের অধিকারও তাকে স্বাধীন হতে সাহায্য করবে। তাকে প্রশ্ন করতে শেখাবে, পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা তৈরি করবে। Elizabeth Cady Stanton-এর রচনায় তাই নারীর অধিকারপ্রাপ্তির প্রশ্নটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এ ধরনের ভাবনায়, পরিবারের বিষয়টি বাদ পড়ে গিয়েছে, যেমন গিয়েছে ধর্ম ও বিবাহ। তাই প্রাতিষ্ঠানিক পরিমণ্ডলের আমূল নির্মাণ, নতুন মুক্ত নারী-নির্মাণের প্রধান পূর্বশর্ত হয়ে দাঁড়ায় সংস্কৃতির বিশ্লেষণ-নির্ভর নারীবিদ্যায়। তার বক্তব্য: নারীকে তার প্রাকৃতিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে, তবে শুধু অধিকার ভোগ করার জন্য নয়। অধিকার হবে নিজেকে ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানকে পুনর্গঠন করার হাতিয়ার। মেয়ে মানুষ করার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি পুরুষতন্ত্রের অনুশাসন থেকে বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত করতে হবে। স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও তার আদেশ নারীবাদী আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে। Matilda Joslyn Gage ও Elizabeth Cady Stanton-এর লেখায় বাইবেলের জোরালো সমালোচনা। তারই সঙ্গে পিতৃতন্ত্রের বদলে মাতৃতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যে কাম্য, তা তাঁরা বুঝিয়ে দিয়েছেন। এটা শুধু নারীমুক্তির তাগিদেই নয়। সমাজ জীবনও তাতে উপকৃত হবে, কারণ নারীমন জীবন ও সম্পর্ক সম্বন্ধে ইতিবাচক চিন্তা করে। হৃদয়হীন উপযোগিতার সন্ধান, তার স্বাভাবিক ধর্ম নয়। Chatlotte Perkins Gilman-এর আবেদন, পুরুষ-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি থেকে সরে আসার জন্য। পরিবার, তার শ্রম-বিভাজন ও নারীর গৃহস্থালি কাজও ঢেলে সাজাতে হবে, যাতে নারীত্বের আত্মবিকাশের জন্য সময়, সুযোগ ও সহমর্মিতা সে পায়।

মার্কসবাদী/সমাজতান্ত্রিক নারীবিদ্যায় নারীকে সর্বহারার সমতুল বলা হয়েছে। তার মুক্তির জন্য নারীকে বুঝতে হবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও তার মতাদর্শকে, তাদের অবদমিত অবস্থান সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা দূর করতে হবে। পরিবারের বাইরে উৎপাদনের কর্মকাণ্ডে যোগ দিলে, সঙ্গত চেতনার উন্মেষ হবে। নারীর শোষণের কারণ পুঁজিবাদী অর্থনীতিও। তাই সর্বহারার মুক্তি ও নারীর মুক্তি, দুই-ই বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর সমাজ ও পরিবার পুনর্নির্মাণের মধ্য দিয়ে আসবে। পরিবারের বিলোপও কাম্য। কারণ, পরিবারের

শ্রম বিভাজনে নারী ও শিশুর ওপর পুরুষের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই নারীর শ্রমের কোনও মূল্য নেই, কোনও উপার্জনও নেই। যে পারিবারিক শ্রম বিভাজনে এই বঞ্চনা সম্ভব হচ্ছে তার সঙ্গে পুঁজিবাদের যোগ আছে। এতে পুঁজিবাদের উপকার হয়। লক্ষণীয়, এই পারিবারিক শ্রম বিভাজন সঙ্গত ও ন্যায্য— নারীমনে এই ধারণা তৈরি করার মাধ্যম সেই পরিবারই, বিশেষত নারীরাই। Heidi Hartman, Sandra Harding ও Nancy Chodorow এই প্রসঙ্গে মা-র ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনিই পুরুষ সন্তানকে এমন ভাবে মানুষ করছেন যাতে সে প্রতিযোগিতামনস্ক, যুক্তিবান ও আধিপত্যপ্রিয় হয়। সে ভাবে তিনি কিন্তু কন্যা-সন্তানকে মানুষ করেন না। এই দুই ধরনের নির্মিত ব্যক্তিত্ব ভিন্ন ভিন্ন কারণে পুঁজিবাদকে সম্ভব করে। তাই পুঁজিবাদের বৈপ্লবিক ধ্বংস নারীমুক্তির পূর্বশর্ত।

ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের অনুপ্রেরণায় রচিত ফরাসি নারীবিদ্যা অবশ্য স্বতন্ত্র নারীবিপ্লব চায়। তার মাধ্যমেই মাতৃতন্ত্রের ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। নারী আর পুরুষতন্ত্রের হাতিয়ার থাকবে না। মুক্ত নারীত্বের প্রকাশ হবে। অনেক দিনের পুরুষ-তত্ত্বাবধানের সুবিধাভোগ নারীকে এক অর্থে সন্তুষ্টি দিয়েছে। নারীকেই এর ঘোর কাটিয়ে উঠতে হবে। মুক্তির আশায় বা প্রতীক্ষায় থাকলে চলবে না। মুক্তির সন্ধান করতে হবে। সত্তার পুনর্নির্মাণে সচেষ্ট হতে হবে। নিজেকে পুরুষের 'অপর'— দীর্ঘ সময়ের এই বোধ ও গৃহকর্মের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে পূর্ণ জীবন যাপন করতে হবে। পুরুষ-নির্ধারিত পুরুষ-নির্ভর অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করে নারীকে তার নিজের অস্তিত্বের দায়িত্ব নিতে হবে। নারীর বোধ-বুদ্ধি ও সংগঠন ক্ষমতার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র নারী বিপ্লবের প্রয়োজন। কারণ অন্য কোনও আন্দোলন বা বিপ্লবের শরিক হয়ে নারী বুঝতে পারছে যে তাতেও পুরুষ-প্রাধান্যের শিকার হতে হয়। Roxanne Dunbar-এর মতে (*Female Liberation as a Basis for Social Revolution,* 1968), বিশ্বজুড়ে এক অসাম্যের আয়োজন আছে যার ওপর দিকে পশ্চিমি শ্বেতকায় পুরুষ, আর নিচে ঔপনিবেশিক সমাজের অ-শ্বেতকায় নারী। এর পুনর্নির্মাণের জন্য প্রয়োজন আত্মার মুক্তি, বুদ্ধির স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার, আর নানা অপমানকর কটূক্তি থেকে মুক্তি— শুধু যৌন আচরণের স্বাধীনতা নয়। যৌন জীবনের পুনর্নির্মাণের কর্মসূচিতে সব চেয়ে বড় প্রশ্ন প্রজনন প্রক্রিয়াকে শারীরিক যৌন সংসর্গের বাইরে নিয়ে যাওয়া। নারীর বদ্ধ জীবনের কারণ তার প্রজনন ক্ষমতা ও সন্তান মানুষের দায়িত্ব— যা তার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ওপর নির্ভর করে না। একই সঙ্গে নারীকে তার নিজস্ব ব্যক্তিসত্তার অহমিকা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পুরুষের উপনিবেশ হিসাবে নারীর ব্যক্তি ও সমাজজীবন থাকলে নারীসত্তার মুক্তির সম্ভাবনা নেই। Shulamith Firestone, Anne Koedt (*Radical Feminism,* 1973), Diane Crothers (*Politics of the Ego: A Manifesto For N. Y. Radical Feminists,* 1970) Cellestine Ware (*Woman Power: The Movement for Women's Liberation,* 1970), Barbara Burris (*The Fourth World Manifesto*, 1971), Kate Millet (*Sexual Politics,* 1970), Susan Brown Miller (*Against Our Will: Men, Women, and Rape,* 1975) সমস্বরে এ কথা বলেছেন।

ইতিহাসের প্রথম শোষিত শ্রেণির (দ্র. Ti-Grace AtKinson) মুক্তির দাবি তাঁদের রচনায় আছে। সেই মুক্তির সন্ধানে অগ্রগণ্য স্থান মনের মুক্তির। অনুভবের মুক্তির। অনুভূতির প্রকাশ যেহেতু ভাষানির্ভর, যেহেতু নারীকে নিয়ে কটু ও ব্যঙ্গাত্মক বাক্য প্রত্যেক ভাষাতেই আছে, আর যেহেতু সেই ভাষা শুনেই নারী নিজের সম্বন্ধে ধারণা তৈরি করে, ভাষারও আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। শুধু নতুন ভাষা নির্মাণের প্রস্তাব করে Mary Daly (*Beyond God the Father: Toward a Philosophy of Women's Liberation*, 1973) থামেননি। নারীর বা পুরুষের চোখে নারীর অধঃপতনের যত রূপ আছে, তাকে তিনি প্রশংসনীয় বলেছেন। কারণ, যা কিছু স্বাভাবিক বলে প্রচারিত তাকে ধ্বংস করার ক্ষমতা 'পতিতা'র আছে। সেই অর্থে সমকামী নারী, অবাধ্য ও প্রেমহীন নারীই পুরুষের যৌন প্রাধান্যের মোকাবিলা করতে পারবে। Martha Shelley-র ভাবনায়, সমকামী নারীই স্বাধীন নারী (*Lesbianism and the Women's Liberation Movement*, 1970)।

মুক্ত হবার নানা উপায়, যা বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক অবধি ভাবা হয়েছিল, তা হয়েছিল মূলত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক অবস্থানের দৃষ্টিকোণ থেকে। সেই তত্ত্বভাবনাগুলি আধুনিক পশ্চিমি মননের ফল। নানা পার্থক্য সত্ত্বেও তারা 'নারী বনাম পুরুষ' ধরে নিয়ে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করেছে। উত্তর-অবয়ববাদী ও উত্তর-আধুনিক তত্ত্বকথা 'নারী অভিন্ন নয়', এই অবস্থান থেকে নারীমুক্তির শর্তের অনুসন্ধান শুরু করেছে। তার দু-একটি উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন।

John Rawls-কে অনুসরণ করে Susan Moller Okin (*Justice, Gender and the Family*, 1989) রাজনৈতিক সমাজের সুবিচারের নীতি পারিবারিক, বিশেষত নারী-পুরুষের সম্পর্কেও কার্যকরী করতে হবে, এই দাবি করেছেন। বস্তুত, পরিবারে যদি সাম্য ও সুবিচার অস্বীকৃত হয়, তবে রাজনৈতিক সমাজে নারী সাম্য ও সুবিচারের অধিকার ভোগ করতে পারবে না। পরিবারকে সাম্যবাদী হতে হবে। অনুরূপ কথা Carole Pateman ও Elizabeth Gross-এর লেখায় (*Feminist Challenges*, 1986)। নারীর নিজস্ব সমস্যা আছে। তাই 'নাগরিক হিসাবে (পুরুষের) সমান' বা 'আইন লিঙ্গ-ভিন্নতার ঊর্ধ্বে'— এই ধরনের বক্তব্যে তাঁদের আপত্তি। নারীত্বের বি-নির্মাণ ও পুনর্গঠন সম্ভব হবে না যদি নারীকে নারী হিসাবে বিচার না করা হয়। নারী নারীর মতো বাঁচবে, ভাববে, লিখবে— তবেই নারীর মুক্তি। 'আইনের চোখে সমান'— এই উদারনৈতিক বিচারশাস্ত্রীয় অবস্থান নিজেই অন্ধ: আইন পার্থক্য দেখতে চায় না, কারণ তাতে (জোর করে) সবাইকে সমান ভাবে দেখার প্রশাসনিক সুবিধা থাকে। এটা রাষ্ট্রের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। তাই প্রচলিত আমলাতন্ত্রের অবলুপ্তি দরকার। Kathy Ferguson-এর এই বিশ্লেষণে (*The Feminist Case against Bureaucracy*, 1984) Michel Foucault-র প্রভাব স্পষ্ট।

দ্বিতীয় সাম্প্রতিক সংযোজন, পরিবেশ-মুখী নারীবিদ্যা। বলে নেওয়া ভাল যে, পরিবেশের প্রশ্নটি নারীবিদ্যার গোড়ার কথায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল না। আজকের ভাবনার বৈশিষ্ট্য হল, প্রকৃতির ওপর আধিপত্য ও নারীর অবদমন, দুই-ই পুরুষতন্ত্রের কু-ফল। পুরুষের

চোখে পুরুষত্ব এই সমতুল আধিপত্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। Marilyn French (*Beyond Power*, 1985), Carolyn Merchant (*Death of Nature,* 1980), Susan Griffin (*Woman and Nature,* 1978) ও Marti Kheel (*Ecofeminism and Deep Ecology*, 1990) এই মতবাদের প্রতিনিধি। পরিবেশের যত্ন ও পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গটি মাঝখানে রেখে এঁরা চাইছেন সামগ্রিক পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক: নারী ও পুরুষ, মানুষ ও প্রকৃতি একে অপরকে রক্ষা ও সমৃদ্ধ করবে। নারীত্বের নির্মাণ/বি-নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া হলে কখনই সফল হবে না।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় নারীবিদ্যার বৈচিত্র্যের প্রতি সুবিচার করা যায়নি। মূল ও সজীব ধারাগুলিকে শুধুমাত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। এর ভিত্তিতে অনুমান করা শক্ত নয় যে, নারীর নির্মাণ/বি-নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ-এর বিষয়টি জটিল। কোন ব্যাখ্যাটি সঠিক ও কোন কার্যক্রমটি নারীমুক্তি সম্পূর্ণ করবে, তা বলা অসম্ভব। সম্পূর্ণ মুক্তির ধারণাটি পরিপ্রেক্ষিত-নির্ভর, তাই চঞ্চল। নারীর বি-নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ একটি বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া নয়। সমতালে যদি প্রতিষ্ঠানের বি-নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ সম্ভব না হয়, তা হলে নারীর মুক্তির প্রয়াস অসফল হবে। এই দুই প্রক্রিয়াকে সংযুক্ত করা, সব সময় সব ক্ষেত্রে প্রয়াস-সাধ্য নয়। ইতিহাসের ধারায় যে মুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া চলে, যা বেশির ভাগ ব্যক্তি-নারীর অগোচরে ঘটে, তার সঙ্গে ব্যক্তি-নারীর প্রাত্যহিক জীবনের স্বল্প পরিসরে নির্দিষ্ট পুরুষের /পুরুষদের সঙ্গে স্বাধীনতার লড়াই মিলিয়ে দেওয়া সহজ নয়। নারীবিদ্যার তত্ত্বকথায় বদ্ধ জীবনের ব্যাখ্যা আছে। নারীবাদী আন্দোলনের কর্মসূচিতে মুক্তির দিশা আছে। কিন্তু সজ্ঞান ব্যক্তি-নারী কি তাঁর পরিসীমিত পুরুষের জগৎ দু' হাতে সহজেই ভাঙতে গড়তে পারেন? সম্পর্কের বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে স্পষ্ট তত্ত্বচিন্তা ও বলিষ্ঠ স্লোগান কি যথেষ্ট?

পরেশ চট্টোপাধ্যায়

নারীবাদী মার্কস ও এঙ্গেলস

গত কয়েক দশক ধরে নারীদের পিতৃতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন আজকের বিভিন্ন গণ আন্দোলনের মধ্যে অতি সংগতভাবেই একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। পিতৃতন্ত্রের বিরোধিতার ব্যাপারে 'মার্কসবাদী'দের অতীতের ভূমিকা মোটেই শ্লাঘনীয় নয়— কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম: ক্লারা ৎসেট্‌কিন, রোজা লুক্সেমবুর্গ, আলেকজান্দ্রা কল্লনটাই। বিশেষ করে এই ব্যাপারে তথাকথিত 'সমাজতান্ত্রিক' দুনিয়ার কর্মকাণ্ড। এই দুনিয়ার সমাজ ভূমণ্ডলের বাকি অংশের পুঁজির সমাজের মতোই শেষ অবধি পিতৃতান্ত্রিক রয়ে গেছে, যেখানে নারীর স্থান কোনও মতেই এই শেষোক্ত অংশের তুলনায় উচ্চতর ছিল না, বরং ছিল কোনও কোনও ক্ষেত্রে নিম্নতর। 'মার্কসবাদে'র যদি এই হাল হয় তা হলে এহেন 'মার্কসবাদের' বিরুদ্ধে নারীবাদী(বাদিনী)দের সমালোচনা নিঃসন্দেহে সংগত এবং সমর্থনযোগ্য। সমস্যা দেখা দেয় তখনই যখন এই সমালোচনায় মার্কস (এবং এঙ্গেলস)-কেও 'মার্কসবাদী'দের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আসল কথা এই যে অন্যান্য প্রায় সমস্ত সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ের মতোই নারীর বিষয়ে মার্কস (এবং এঙ্গেলস)-এর দৃষ্টিভঙ্গি মার্কসবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বহুলাংশে পৃথক এবং অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত।

'মার্কসবাদে'র বিরুদ্ধে নারীবাদী(বাদিনী)দের যে-সব অভিযোগ সেই সবের বর্শামুখের লক্ষ্য ব্যক্তি হিসেবে মার্কস, এঙ্গেলস নন। সমাজে নারীর স্থান প্রসঙ্গে মার্কসের লেখা পরিমাণে এঙ্গেলসের লেখার তুলনায় বৃহত্তর, ১৮৪০ দশকের গোড়া থেকে ১৮৮০ দশকের গোড়ায় প্রায় মৃত্যুকাল অবধি বিভিন্ন রচনায় ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। এঙ্গেলসের আলোচনায় প্রায় গোটাটাই তাঁর *পরিবার, একান্ত মালিকানা এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি* (১৮৮৪, ১৮৯১) গ্রন্থে নিবদ্ধ।[১] এঙ্গেলসের এই রচনাটির ভিত্তি মহান মার্কিন বিজ্ঞানী মর্গ্যান-এর গ্রন্থ *প্রাচীন সমাজ* (১৮৭৭) হলেও তিনি এই শেষোক্ত গ্রন্থ প্রসঙ্গে মার্কস লিখিত মন্তব্যবহুল এক দীর্ঘ পাণ্ডুলিপি (১৮৮০-৮১) থেকেও বহু মালমশলা জোগাড় করেন। এঙ্গেলস-এর বিখ্যাত *প্রতিডিউরিং (অ্যান্টিডিউরিং)*-এ নারীর অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা একেবারেই সংক্ষিপ্ত।[২] সমাজে নারীর স্থান সম্পর্কে এঙ্গেলসের আলোচনার পরিধি মার্কসের তুলনায় সংকীর্ণতর।

তথাপি এই সংকীর্ণ পরিধির মধ্যেও শ্রেণিসমাজের পরিপ্রেক্ষিতে পিতৃতন্ত্র এবং সেই সঙ্গে এক বিবাহ পরিবারে নারীর দাসত্বের বিরুদ্ধে এঙ্গেলস-এর আক্রমণ অতি শাণিত। মার্কসের আলোচনা এবং সমালোচনা বহুমুখী, বিস্তৃততর; তা ছাড়া পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ আক্রমণের বাইরেও নারীর পরিস্থিতির বিশেষ বিশেষ দিক নিয়ে মার্কস তাঁর বক্তব্য রেখেছেন।

মার্কসের (এঙ্গেলসের) বিরুদ্ধে সাধারণ বক্তব্য এই যে, যৌনতা, বিবাহ এবং পরিবার সম্পর্কিত সমস্যাগুলির সমাধান কেবল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো পালটাবার পরেই হতে পারে এই ভেবে তাঁরা এই সমস্যাগুলিকে অবহেলা করেছেন। তথাকথিত 'একান্ত পরিসর'— যা নারীনিপীড়নের প্রাথমিক স্থল— মার্কসে এবং এঙ্গেলসে অনালোচিত রয়ে গেছে। অবশ্য এটা সঠিক যে, মার্কস এবং এঙ্গেলসের মতে এই সমস্যাগুলির সত্যিকারের সমাধান শ্রেণিসমাজে সম্ভব নয়, অতএব মানুষের ক্রমবিবর্তনে শেষ সমাজ— পুঁজিতন্ত্র— বিনষ্ট না হওয়া অবধি এই সমস্যাগুলির যথার্থ সমাধান অসম্ভব। কিন্তু তাই বলে এই বক্তব্যকে বর্তমান সমাজে যৌনতা, বিবাহ এবং পরিবার-বিষয়ক সমস্যাগুলির ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়তার যুক্তি হিসেবে তাঁরা ব্যবহার করেননি। বরং এই সমস্যাগুলি কী কী পরিস্থিতিতে দেখা দিয়েছে এবং তাদের চরিত্র কী ধরনের তা নিয়ে তাঁরা দীর্ঘকাল বিশ্লেষণ ও সমালোচনা চালিয়ে গেছেন পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের গতিসূত্রের অঙ্গ হিসেবেই।

তরুণ মার্কস তাঁর একটি প্রথম দিককার লেখায় বলেন: "মানুষের সঙ্গে মানুষের তাৎক্ষণিক, স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় সম্পর্কের প্রকাশ নারীর প্রতি পুরুষের আচরণে। তা থেকেই বোঝা যাবে পুরুষের স্বাভাবিক ব্যবহার কতটা মনুষ্যোচিত হয়েছে। মানুষের ক্রমবিবর্তনের পর্যায়কে এই ব্যবহার দিয়ে বিচার করা যেতে পারে"[৩] (*অর্থনৈতিক ও দার্শনিক পাণ্ডুলিপি*, ১৮৪৪)। এক বছর পরে "বর্তমান সমাজে নারীর পরিস্থিতি"কে "অমানুষিক" আখ্যা দিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের যৌথ রচনায় সমাজতন্ত্রের অন্যতম পূর্বসূরি শার্ল ফুরিয়ে (Charles Fourier)-কে উদ্ধৃত করেন: "কোনও সমাজের সার্বজনিক মুক্তির মান নির্ধারিত হবে সেই সমাজে নারী কতোটা মুক্তিলাভ করেছে তা দিয়ে"[৪] (*পূত পরিবার*, ১৮৪৫)। বছর খানেক পরে মার্কস এবং এঙ্গেলস তাঁদের এক যৌথ রচনায় (এই রচনার অধিকাংশটাই মার্কসের লেখা) লেখেন যে, "শ্রম এবং মালিকানার গুণগত এবং পরিমাণগত অসম বণ্টনের প্রথম রূপ দেখা দেয় পরিবারে, যেখানে নারী এবং সন্তান পুরুষের দাস"[৫] (*জার্মান মতাদর্শ*, ১৮৪৬)। ওই একই বছরে ফরাসি বুর্জোয়া পরিবারের অভ্যন্তরে নারী নির্যাতনের দৃষ্টান্ত হিসেবে মার্কস ফরাসি পুলিশ ইনসপেক্টারের 'আত্মহত্যা' সম্পর্কে কোনো দলিল থেকে একটি ঘটনা বেছে নিয়ে তার উপর মন্তব্য করেন: "(আত্মহত্যার পূর্বে) দুর্ভাগিনী নারীকে অসহ্য দাসত্বের ভার বহন করতে হয়। স্বামী তার দাসাধিপত্যের অধিকার খাটায়, যাকে ধারণ করে আছে ন্যায় সংহিতা (সিভিল কোড) এবং মালিকানার অধিকার। এই ন্যায় সংহিতা এবং মালিকানার অধিকারের ভিত্তি সেই সামাজিক অবস্থা যেখানে মনে করা হয় যে প্রেমিক প্রেমিকার স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমানুভূতির সঙ্গে প্রেমের কোনো সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে সেই একই সামাজিক অবস্থা থেকে ঈর্ষাপরায়ণ স্বামী

অনুমতি পায় স্ত্রীকে শেকলে বেঁধে রাখতে, কৃপণের স্বর্ণভাণ্ডার সংরক্ষণের মতো, যেহেতু স্ত্রী তার সম্পত্তির তালিকার একটি অংশ মাত্র"[৬] (*আত্মহত্যা প্রসঙ্গে*, ১৮৪৬)।

এঙ্গেলস তাঁর প্রসিদ্ধ *পরিবার, একান্ত মালিকানা এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি* গ্রন্থে আধুনিক বিবাহ এবং বর্তমান সমাজে নারীর স্থান প্রসঙ্গে অতি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন যে, আজকের একবিবাহ পরিবারের ভিত্তি নারীর প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন পারিবারিক দাসত্ব। ক্যাথলিক এবং প্রটেস্টান্ট বিবাহের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, এই উভয় ক্ষেত্রেই বিবাহের নির্ধারক বর-কনের শ্রেণিগত অবস্থান এবং সে দিক থেকে এই বিবাহ নেহাত সুবিধেবাদী বিবাহ। এই সুবিধেবাদী বিবাহ প্রায়শ স্থূল বেশ্যাবৃত্তিতে পরিণত হয় স্ত্রীর ক্ষেত্রে, যার সঙ্গে রাজসভার রূপোপজীবিনীর পার্থক্য এই যে সে ক্ষণকালের জন্যে নিজের দেহ ভাড়া দেয় না, দাসী হিসেবে সে নিজেকে বেচে দেয় চিরকালের জন্যে। প্রাচীন সাম্যতন্ত্রী সংসারে— যেখানে বহু সংখ্যক দম্পতি তাদের সন্তান সন্ততি নিয়ে সহবাস করত— সাংসারিক শাসনের ভার পড়ত নারীর উপরে, সেই শাসনের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা সমাজ খোলাখুলি ভাবেই মেনে নিত। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের পত্তন থেকেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হল, বিশেষ করে একবিবাহ পরিবারের আরম্ভ থেকে। তখন থেকেই স্ত্রী সামাজিক উৎপাদন থেকে বহিষ্কৃতা হয়ে দেখা দিল পরিবারের চাকরানী হিসেবে। শুধু আধুনিক বৃহৎ শিল্প আবার তাকে সামাজিক উৎপাদনের পথ খুলে দিল, কিন্তু এমন ভাবে যে, যদি সে তার পারিবারিক কর্তব্য পালন করে তা হলে সে সামাজিক উৎপাদনের বাইরে থেকে যাবে এবং তার পক্ষে কোনও কিছু উপার্জন করা সম্ভব হবে না। পক্ষান্তরে, যদি সে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনে অংশ নিতে চায় এবং স্বাধীন ভাবে রোজগার করতে চায় তা হলে তার পক্ষে পারিবারিক কর্তব্য পালন করা সম্ভব হবে না। আধুনিক যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ পরিবারের অন্নদাতা, ফলে পরিবারের উপর তার আধিপত্যকে স্বাভাবিক বলেই সমাজ মেনে নেয় এবং এই আধিপত্যের অনুমোদনের জন্য কোনও বিশেষ আইনের প্রয়োজন হয় না। পরিশেষে এঙ্গেলস বলেন যে, "বর্তমান একবিবাহ পরিবারে পুরুষ বুর্জোয়ার এবং নারী মজুরিশ্রমিকের স্থান নিয়েছে।"[৭]

এবার মার্কসে ফিরে আসা যাক। পরিবারের অভ্যন্তরে নারী-পুরুষের মধ্যে যে মামুলি শ্রমবিভাগ রয়েছে তাকে মার্কস ব্যক্তির দাসত্বের মতোই ('মজুরি দাসত্ব' সহ) কখনই 'স্বাভাবিক' এবং 'চিরনির্দিষ্ট' বলে মেনে নেননি। *সাম্যবাদী ইস্তাহার* তথাকথিত 'পারিবারিক মূল্য' সম্পর্কে বুর্জোয়া শ্রেণির লম্বা-চওড়া বাতকে নিছক 'ভণ্ডামি' বলে অভিহিত করে, যেহেতু "বৃহৎ শিল্প শ্রমিকদের সমস্ত পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করে দেয় এবং নারীকে নেহাত উৎপাদন যন্ত্রে পরিণত করে।"[৮] লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাগকে চিরায়ত বলে গ্রহণ করা তো দূরের কথা, পক্ষান্তরে মার্কস বলেন যে, "খ্রিস্টীয়-জার্মান পরিবারের রূপকে পরম বলে ভাবা যেমন হাস্যকর, তেমনি হাস্যকর প্রাচীন রোম এবং গ্রিসের পরিবারের বা বিগত দিনের প্রাচ্যপরিবারের রূপকে পরম রূপ বলে গণ্য করা" (*পুঁজি*, প্রথম খণ্ড, 'যন্ত্র এবং বৃহৎ শিল্প' অধ্যায়)।[৯] উৎপাদনে মেশিনের প্রবর্তনের ফলে মানুষের নিছক পেশির ক্ষমতা

অনাবশ্যক হয়ে যায় এবং পুঁজি নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের পেছনে ধাওয়া করে। এই ভাবে, "বয়স এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে গোটা পরিবারটাকেই পুঁজি তার চাবুকের অধীন নিয়ে আসে।" শুধু তাই নয়, পুঁজির অধীনে বহু ক্ষেত্রে পুরুষ-শ্রমিকের তুলনায় যে নারী-শ্রমিকের শোষণ তীব্রতর, এই বক্তব্য মার্কস পরিষ্কার ভাবে রাখেন বিশেষ করে *পুঁজির* প্রথম খণ্ড-র 'শ্রম দিবস' অধ্যায়ে। তৎকালীন বিলেতে শিল্পের কোনও কানুনি সীমা ছিল না। সরকারি পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে মার্কস দেখান যে সেই সব বিভাগেই নারী এবং কিশোর-কিশোরীদের নিয়োগ করা হয় যেখানে পুঁজির মালিকেরা শ্রমদিবসকে যথাসম্ভব প্রলম্বিত করে থাকে। এমনকী যখন সেই সব বিভাগকে কারখানা আইনের অধীনে নিয়ে আসা হয় তখনও এই লিঙ্গভিত্তিক শোষণের বিভিন্নতা ঘোচেনি। এই প্রসঙ্গে মার্কস রেশমের কারখানার উল্লেখ করেন। এই সব কারখানায়— বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে— কাজ চলত অসম্ভব রকমের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এবং যার ফলে বিশেষত নারী-শ্রমিকেরা ফুসফুসের রোগে ভুগত। আলোচনা প্রসঙ্গে মার্কস দেখান এই রোগে পুরুষের তুলনায় নারীর মৃত্যুর হার অনেক উঁচুতে। মার্কস মন্তব্য করেন, "বৃহৎ শিল্প নারী এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক-বয়স্কাদের শোষণকে অপরিহার্যতায় পরিণত করেছে" ('যন্ত্র ও বৃহৎ শিল্প' অধ্যায়, *পুঁজি*, প্রথম খণ্ড)।[১০] মৃত্যুর তিন বছর আগে মার্কস ফরাসি শ্রমিক পার্টির কর্মসূচির খসড়ায় প্রস্তাব করেন যে, বিদ্যমান আইনে যে-সব ধারা নারীকে নিম্নতর স্তরে দাবিয়ে রেখেছে সেই সব ধারাকে বরবাদ করা হোক এবং তার সঙ্গে একটি বিশেষ ধারা তিনি ওই কর্মসূচিতে যোগ করে দেন, 'নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমান শ্রমের জন্য মজুরিও সমান হতে হবে।'[১১]

পিতৃতান্ত্রিক পরিবারকে 'স্বাভাবিক' এবং 'চিরস্থায়ী' বলে মেনে নেওয়া তো দূরের কথা, বরং মার্কস এই প্রতিষ্ঠানকে মানুষের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার একটি 'ব্যতিক্রম' বলে ভেবেছেন। মর্গ্যানের সঙ্গে একমত হয়ে মার্কস মর্গ্যানের বক্তব্যকে শব্দান্তরিত করে লেখেন, 'এক বিবাহ পরিবারকে [যা সাধারণত পিতৃতান্ত্রিক] সমাজের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে যেতে হবে এবং সমাজ যেমন পালটাবে একেও সে রকম পালটাতে হবে, অতীতে যেমনটি হয়ে এসেছে। ভাবাই যেতে পারে যে, এর আরও উন্নতি হবে *যতদিনে না নারী এবং পুরুষের মধ্যে সম্পূর্ণ সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়* (*নৃকুলবিদ্যা সম্পর্কে নোটবই*, ১৮৮০-৮১, গুরুত্বসূচক বাঁকা হরফ মূলে)। ওই একই পাণ্ডুলিপিতে মার্কস লেখেন: '*ক্রীতদাস* এবং *ভূমিদাস*— এই উভয়েরই বীজ আধুনিক পরিবারে বর্তমান। সমাজে এবং রাষ্ট্রে বহু প্রসারিত সমস্ত রকম বৈরিতার অতি ক্ষুদ্র প্রতিলিপি আধুনিক পরিবার তার অভ্যন্তরে ধারণ করে আছে"।[১২] একই রচনায় মার্কস মন্তব্য করেন যে মাতৃতন্ত্র থেকে পিতৃতন্ত্রে পরিবর্তন নারীর অবস্থিতি এবং অধিকারের দিক থেকে অতি অনিষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। যে-ক্লাসিক্যাল গ্রিক সভ্যতাকে মার্কস অতি উচ্চস্তরে স্থান দেন নারীর প্রশ্নে, সেই সভ্যতাকে কঠোর সমালোচনা করতে তিনি কসুর করেননি: "সভ্যতার উচ্চতম শিখরে পৌঁছেও গ্রিকরা নারীর প্রতি আচরণকে বর্বরতার পর্যায়ে বজায় রাখে। শেষ অবধি গ্রিক নারী নিজেই সমাজে তার নিম্নতর স্থান স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়।" একই নোটবইতে মার্কস হেনরি

মেইন-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেন: "মানুষের যৌথ পরিবারের উৎপত্তি এক আদি পিতৃতান্ত্রিক কোষ থেকে।" এ সম্পর্কে মার্কস মন্তব্য করেন, "এই গণ্ডমূর্খ ইংরেজ পিতৃতন্ত্র দিয়ে আলোচনা শুরু করেছে, কিছুতেই তার মাথা থেকে বিলিতি একান্ত পরিবারকে নামাতে পারছে না। রোমের পিতৃতান্ত্রিক পরিবারকে সে বহন করে নিয়ে গেছে মনুষ্য সমাজের একেবারে শুরুতে।"[১৩]

পক্ষান্তরে নারীর সামাজিক উন্নতিকে সাদরে অভ্যর্থনা করেছেন মার্কস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক ইউনিয়নে নারী শ্রমিক এবং পুরুষ শ্রমিকের মধ্যে পূর্ণ সমতার সম্পর্ক বিদ্যমান লক্ষ করে তাকে 'বৃহৎ প্রগতি' হিসেবে চিহ্নিত করে বন্ধু কুগেলমান্‌কে লেখা এক চিঠিতে (১২.১২.১৮৬৮) একই সঙ্গে ইংরেজ এবং ফরাসি শ্রমিক সংগঠনে এই সমতার অভাবকে মার্কস সমালোচনা করেন। ওই একই চিঠিতে তিনি গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন যে (প্রথম) শ্রমিক আন্তর্জাতিকের সর্বোচ্চ স্তরে অর্থাৎ 'সাধারণ পরিষদে' এক জন নারী মনোনীত হয়েছেন।[১৪] পুরুষ-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে আন্তর্জাতিকের ফরাসি মহিলা শাখা সংগঠনের উদ্দেশ্যে মার্কস তরুণী এলিজাবেত ডিমিট্রিয়েভাকে প্যারিসে পাঠান। প্যারিস কমিউনে (১৮৭১) এই তরুণীর ছিল নেতৃস্থানীয় ভূমিকা। কমিউনের অধীনে 'নারী সংঘের' অন্যতম সংগঠিকা এলিজাবেত ডিমিট্রিয়েভা এই সংঘের নামে সমাজতন্ত্রের সারবস্তু অতি সুন্দর সরল ভাষায় প্যারিসীয় পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের কাছে প্রচার করেছেন। এখানে আমরা দেখি নারীদের নিজস্ব স্বতন্ত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠায় মার্কস ছিলেন কতখানি আগ্রহী।

মার্কসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয় যে, তিনি তাঁর পূর্বসূরি ক্লাসিক্যাল অর্থশাস্ত্রবিদ্‌দের অনুসরণে তাঁর 'অর্থশাস্ত্র সমালোচনায়' খালি বিনিময় মূল্যকেই স্থান দিয়েছেন, ব্যবহার মূল্যকে অবহেলা করেছেন। ফলে বিনিময় মূল্যের উৎপাদক শ্রমের বাইরে অন্য ধরনের উপযোগী শ্রম— যেমন নারীদের গৃহ শ্রমকে অবহেলা করেছেন যার থেকে তাঁর পিতৃতান্ত্রিক ঝোঁক পরিষ্কার। অবশ্যই মার্কসের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। এই অভিযোগ বরং বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের (ক্লাসিক্যাল সহ) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রে যদিও পণ্য ব্যবহার-মূল্য এবং বিনিময়-মূল্য এই উভয়েরই ধারক তথাপি পণ্যের স্রষ্টা যে শ্রম তার বেলায় এই দ্বৈত রূপকে সেখানে অগ্রাহ্য করা হয় এবং একমাত্র পণ্যের উৎপাদক শ্রমকেই খালি 'শ্রম' হিসেবে গণ্য করা হয়। পক্ষান্তরে মার্কস দেখান যে, ব্যবহার মূল্যের উৎপাদক শ্রম এবং বিনিময় মূল্যের উৎপাদক শ্রম সম্পূর্ণ দুই ধরনের। এই দুই ধরনের শ্রমকে মার্কস যথাক্রমে 'মূর্ত' (কন্‌ক্রিট) এবং 'বিমূর্ত' (অ্যাবস্ট্রাকট) আখ্যা দেন। এই মূর্ত শ্রমকেই মার্কস 'উপযোগী উৎপাদক শ্রম' বা 'প্রকৃত শ্রম' হিসেবে গণ্য করেন এবং যে উৎপাদন প্রক্রিয়া স্থিত ব্যবহার মূল্যের সাহায্যে নূতন ব্যবহার মূল্য উৎপাদন করে সেই প্রক্রিয়াকে 'প্রকৃত শ্রম প্রক্রিয়া' আখ্যা দেন (*অর্থশাস্ত্র সমালোচনা প্রসঙ্গে*, ১৮৫৯, প্রথম অধ্যায়; 'প্রত্যক্ষ উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফলাফল' পাণ্ডুলিপি ১৮৬৩-৬৭)।[১৫] এটা পরিষ্কার যে ব্যবহার মূল্য এবং তার স্রষ্টা শ্রমকে খাটো করে দেখা তো দূরের কথা, মার্কস বরং তাদের উঁচু আসনেই বসিয়েছেন। নারীর (বা পুরুষের) গৃহশ্রম বিনিময় মূল্য উৎপাদন করে না, এই শ্রম ব্যবহার মূল্যের স্রষ্টা। তাই

বিনিময় মূল্যের আলোচনায় তার কোনও স্থান নেই। পুঁজিতন্ত্রের কারবার শুধু বিনিময় মূল্যকে নিয়ে, তার গোটা অস্তিত্বটাই নির্ভর করছে বিনিময় মূল্যের উৎপাদন এবং বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদনভিত্তিক মুনাফার অবাধ প্রসারের উপর। মার্কসের মহান গ্রন্থের স্বঘোষিত উদ্দেশ্য 'পুঁজির গতিসূত্রের উদ্ঘাটন' (*পুঁজি*, প্রথম খণ্ড, 'মুখবন্ধ'), অতএব বিনিময় মূল্য এবং তার উৎপাদক বিমূর্ত শ্রমের বিশ্লেষণই সেখানে প্রাসঙ্গিক। পিতৃতন্ত্রবিরোধী মার্কস যে নারীর গৃহশ্রমকে অবহেলা করেননি তা তো উপরে আলোচিত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এবং পরিবারে নারীর স্থান প্রসঙ্গে মার্কসের কঠোর বক্তব্য থেকেই পরিষ্কার। পুঁজিতন্ত্রে নারীর গৃহশ্রমের যে কী দশা হয়েছে সে সম্পর্কেও মার্কস আলোচনা করেছেন। মজুরি শ্রমিক হওয়ার আগে "পরিবারের মায়েরা পরিবারের ভোগ্য বস্তুর উৎপাদনে প্রয়োজনীয় শ্রম দান করতেন, সেই গৃহশ্রম পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখতো।" পুঁজি এসে "মায়েদের দখল নিয়ে তাঁদের মজুরি শ্রমিকে পরিণত করেছে, পরিবার থেকে আত্মসাৎ করা গোটা উদ্বৃত্ত মূল্যকে বাড়ানোর উদ্দেশ্যে" (*পুঁজি*, প্রথম খণ্ড, 'যন্ত্র ও বৃহৎ শিল্প' অধ্যায়)'।[১৬]

মার্কসের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ এই যে, তিনি নারীর গৃহশ্রমকে 'অনুৎপাদক' শ্রম বলে ভেবেছেন। আমরা উপরে দেখেছি যে, ব্যবহার মূল্যের উৎপাদক শ্রমকে মার্কস 'প্রকৃত শ্রম' হিসেবে গণ্য করেছেন। গৃহশ্রম শুধু ব্যবহার মূল্য সৃষ্টি করে, সে হিসেবে নারীর (বা পুরুষের) গৃহশ্রম 'প্রকৃত শ্রম' বা 'যথার্থ শ্রম'। অতএব দেখা যাচ্ছে যে এই 'যথার্থ শ্রম'-কে মার্কস অনুৎপাদক শ্রম বলে ভেবেছেন এই অভিযোগ একেবারেই আজগুবি। মার্কসের প্রকাশিত কোনও রচনাতেই এই ধরনের বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। তথাপি ব্যাপারটাকে একটু তলিয়ে দেখা যেতে পারে। সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে দেখা যায় যে শ্রমপ্রক্রিয়ার উৎপন্ন দ্রব্যের উপরই নির্ভর করে মানুষের বেঁচে থাকা, যেখানে শ্রম ব্যবহার-মূল্যের স্রষ্টা। এই শ্রমপ্রক্রিয়া সর্বকালের সর্ব সমাজের ভিত্তি। এখানে কাল এবং সমাজ নির্বিশেষে গোটা শ্রমই উৎপাদন-শ্রম। কিন্তু উদ্বৃত্ত মূল্য-মুনাফাভিত্তিক পুঁজিতন্ত্রে উৎপাদক শ্রমের এই সাধারণ রূপায়ণ অপ্রতুল (*পুঁজি*, প্রথম খণ্ড, 'শ্রমপ্রক্রিয়া' অধ্যায়)।[১৭] তাঁর *১৮৫৭-৫৮*-র *পাণ্ডুলিপিতে* মার্কস লেখেন যে, "উৎপাদক শ্রম হলো [শেষ পর্যন্ত] সেই শ্রম যা পুঁজি উৎপাদন করে।"[১৮] শ্রম এবং তার উৎপন্ন বস্তুর মধ্যে যে সহজ সম্পর্ক, সেই সহজ এবং প্রত্যক্ষ সম্পর্কভিত্তিক শ্রমকে উৎপাদক শ্রম হিসেবে গণ্য করতে পুঁজি আদপেই রাজি নয়। পুঁজির সমাজ স্বভাবতই পণ্যাশ্রয়ী সমাজ, উৎপাদনের উদ্দেশ্য ব্যবহার মূল্য নয়, প্রধানত বিনিময় মূল্য এবং পুঁজিপতির অন্তিম লক্ষ্য বিনিময় মূল্য-নিহিত উদ্বৃত মূল্যকে মুনাফা হিসেবে আত্মসাৎ করা। অতএব বিনিময়মূল্য-উদ্বৃত্তমূল্যের স্রষ্টা যে-শ্রম একমাত্র সেই শ্রমই উৎপাদক শ্রম বলে পুঁজির শাসনে গ্রাহ্য। কোন শ্রম উৎপাদক এবং কোন শ্রম অনুৎপাদক তার নির্ধারণ হবে পুঁজিপতির দিক থেকে, পুরুষ বা নারী শ্রমিকের দিক থেকে নয় (মার্কস, *উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্বাবলী*, ১৮৬১-১৮৬৩, প্রথম খণ্ড)।[১৯] উৎপাদক শ্রমের একমাত্র কাজ উদ্বৃত্ত মূল্যের সৃষ্টি এবং তার অবাধ বর্দ্ধিত পুনরুৎপাদন। এক কথায় বলতে গেলে, "এই সমাজে একমাত্র মজুরি শ্রমই উৎপাদক শ্রম" (*উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্বাবলী*, প্রথম খণ্ড)।[২০]

যেহেতু পুঁজির চোখে পুরুষ বা নারী শ্রমিক উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টির যন্ত্র মাত্র, এই সমাজে 'উৎপাদক শ্রমিক [পুরুষ বা নারী] হওয়া দুর্ভাগ্যের লক্ষণ, সৌভাগ্যের চিহ্ন নয়' (*পুঁজি*, প্রথম খণ্ড, 'পরম এবং আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য' অধ্যায়)।[২১] এই সমাজে শুধু ব্যবহার মূল্যের স্রষ্টা অবৈতনিক গৃহ শ্রমকেই অনুৎপাদক শ্রম বলে গণ্য করা হয় না, ঘরের বাইরে বহু ধরনের বেতনভোগী শ্রমকেও একই শ্রেণিতে ফেলা হয়। যেমন ডাক্তার, উকিল, সরকারি এবং বেসরকারি আমলা, শিক্ষক (যাদের সংখ্যাগুরু অংশ এখনও পুরুষ) ইত্যাদির শ্রম। বলা বাহুল্য, এই উৎপাদক-অনুৎপাদক শ্রম বিভাজন পুঁজির এবং পুঁজির মুখপাত্র বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের সৃষ্টি, মার্কসের নয়। 'পুঁজির গতিসূত্র উদঘাটন' প্রসঙ্গে মার্কস শুধু পুঁজির অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবেই এই বিভাজনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন মাত্র।

মার্কসের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হল যে, শ্রম শক্তির মূল্য নির্ধারণের আলোচনায় মার্কস সেই শক্তির উৎপাদনে গৃহশ্রমের অর্থাৎ মূলত নারীর পারিবারিক শ্রমের ভূমিকা অবহেলা করেছেন। এই অভিযোগ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। বুর্জোয়া অর্থ শাস্ত্রে 'শ্রম' এবং 'শ্রম ক্ষমতা'র মধ্যে কোনও পার্থক্য স্বীকার করা হয় না (এখানে পুঁজিতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে)। এই পৃথকীকরণ মার্কসের কীর্তি। উৎপাদনের উপায় (কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) থেকে বিচ্ছিন্ন বা বিযুক্ত হয়ে নারী-পুরুষ শ্রমিকেরা পুঁজিপতির কাছে বিক্রি করে তাদের আয়ত্ত একমাত্র পণ্য অর্থাৎ শ্রমক্ষমতাকে। এই পণ্যটির বৈশিষ্ট্য এই যে এর ব্যবহার মূল্য শুধু পণ্যটির উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদনের খরচই জোগায় না, তার বাইরেও স্পষ্ট করে পুঁজির মুনাফার ভিত্তি বাড়তি মূল্য (উদ্বৃত্ত মূল্য)। অন্য যে কোনও পণ্যের মূল্য যে-ভাবে নির্ধারিত হয় মোটামুটি সেই ভাবেই এই বিশেষ পণ্যটির মূল্যও নির্ধারিত হয়, অর্থাৎ শ্রমক্ষমতার উৎপাদনে যতটা শ্রম-সময়ের প্রয়োজন সেই সময় দিয়ে। এই 'প্রয়োজনীয় শ্রম সময়' ব্যক্তি নির্ধারিত নয়, সমাজ-নির্ধারিত, অর্থাৎ এই শ্রম-সময় "(গড়পড়তা) সামাজিক প্রয়োজনীয় শ্রম সময়" এবং এই শ্রম সময়কে প্রচলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে। বলে নেওয়া ভাল, 'সামাজিক' মানে এখানে এই নয় যে সমাজ সচেতন ভাবে এই শ্রম-সময়কে নির্ণয় করছে, যা কিনা পুঁজিতন্ত্রের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় অসম্ভব। এই ব্যবস্থায় পণ্যের সামাজিক অনুমোদনের একমাত্র নির্দেশক বাজারে পণ্যটির সদর্থক চাহিদা। সমাজের চোখে চাহিদার অনটন পণ্যের উৎপাদক শ্রমসময়ের অপচয়ের সূচক। মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে যে, শ্রমক্ষমতার অধিকারী/অধিকারিণীর বেঁচে থাকার জন্যে এবং তার বংশবৃদ্ধির জন্যে— অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণির পুনরুৎপাদনের জন্যে— যে সব উপাদানের (ভোগ্য বস্তুর) প্রয়োজন (প্রকৃতির অবদানের বাইরে) সে সব উপাদানের মূল্যই শ্রমক্ষমতার মূল্যের ভিত্তি। সেই উপাদানগুলি অবশ্যই পণ্য এবং তাদের মূল্য নির্ধারিত হয় 'সামাজিক (গড়পড়তা) প্রয়োজনীয় শ্রমসময় দিয়ে।' এই আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনে গৃহশ্রম যে বিভিন্ন দ্রব্য তৈরি করে তাদের 'মূল্য রূপ নেই' (মার্কসের ভাষায়), তাদের ব্যবহার মূল্য আছে কিন্তু বিনিময় মূল্য নেই। সেই শ্রম, মার্কসের ভাষায়, 'যথার্থ' বা 'প্রকৃত শ্রম'

অর্থাৎ 'মূর্ত শ্রম', 'বিমূর্ত শ্রম' নয়। এবং সেই শ্রম 'সামাজিক নির্ধারিত শ্রমসময় নয়।' অতএব এই শ্রম 'শ্রমক্ষমতা' নামক পণ্যটিকে সৃষ্টি করে না। মোদ্দা কথা এই যে, এক বিশেষ পরিমাণ শ্রমসময় কোনও বস্তুকে উৎপাদন করলেই সেই বস্তুটি পণ্যে রূপান্তরিত হয় না। "গমের ব্যবহার মূল্য একই থাকে, তার স্রষ্টা ক্রীতদাসই হোক বা ভূমিদাসই হোক বা স্বাধীন নারী বা পুরুষ শ্রমিকই হোক। সে তার ব্যবহার মূল্য হারাবে না তুষারের মতো আকাশ থেকে পড়লেও" (মার্কস, *পাণ্ডুলিপি*, ১৮৫৭-৫৮)।[২২] পক্ষান্তরে, ব্যবহার মূল্যের স্রষ্টা গৃহশ্রম লিঙ্গ-নিরপেক্ষ, স্রষ্টা পুরুষও হতে পারে, শুধু নারীই নয় (যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনও নারী)। পণ্যরূপী শ্রমক্ষমতার উৎপাদনে শুধু সেই সব ব্যবহার মূল্যই ধর্তব্য যেগুলি 'সামাজিক প্রয়োজনীয় সময়ের' সৃষ্টি এবং বিনিময় মূল্যের বাহক। এই প্রসঙ্গে সেই শ্রমই গ্রাহ্য যে-শ্রম বিনিময়মূল্য উৎপাদন করে। পুঁজিতন্ত্রের এটাই নিয়ম, 'বুর্জোয়া ধন এবং গোটা বুর্জোয়া উৎপাদনের লক্ষ্য বিনিময়মূল্য, ব্যবহারমূল্য নয়' (*পাণ্ডুলিপি* ১৮৫৭-৫৮)[২৩], সেই ব্যবহারমূল্য মানুষের সুস্থ জীবনধারণ এবং অগ্রগতির জন্য যতই প্রয়োজনীয় হোক না কেন। প্রকৃতি বা মানুষের বাস্তব পরিবেশের প্রতি পুঁজির আচরণ সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। মানুষের সুস্থ জীবন এবং তার পুনরুৎপাদনে প্রকৃতির মহান অবদানকে পুঁজি একেবারেই গ্রাহ্য করে না, যেহেতু প্রকৃতির এই প্রক্রিয়ায় মুনাফার প্রশ্ন নেই। (প্রসঙ্গত, মানুষের জীবনে প্রকৃতির অবদান এবং প্রকৃতি সম্পর্কে পুঁজির বিনাশক কর্মকাণ্ড নিয়ে মার্কস তাঁর রচনার বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করেছেন)।

১৮৬৫ সালে এক ইংরেজ শ্রমিকবৈঠকে মার্কস বলেন: "যখন কোনও ব্যক্তি তার তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে কোনও বস্তু উৎপাদন করে এবং নিজেই তাকে ভোগ করে সেই সৃষ্ট বস্তুটি একটি উৎপন্ন দ্রব্য কিন্তু পণ্য নয় এবং ব্যক্তিটির শ্রম সামাজিক শ্রম নয়", (*মূল্য, দাম ও মুনাফা*, ১৮৬৫)।[২৪] অভিযোগ করা হয়েছে যে, মার্কস শুধু পণ্য উৎপাদনের শ্রমকেই 'সামাজিক শ্রম' বলে গ্রাহ্য করেছেন, অর্থাৎ মার্কসের চোখে গৃহশ্রম— যে-শ্রম প্রধানত নারীর— সামাজিক শ্রম নয়। আমাদের নিবেদন এই যে, এই অভিযোগটি মার্কসের বক্তব্যের একপেশে উপস্থাপনা। কী অর্থে মার্কস পণ্যোৎপাদক শ্রমকে সামাজিক শ্রম আখ্যা দিয়েছেন? এই শ্রম 'সামাজিক' যেহেতু এই শ্রম সমাজে স্থিত শ্রম-বিভাগের উপর নির্ভরশীল, এই শ্রম সমাজ-নির্ধারিত গড়পড়তা শ্রম (সময়) অর্থাৎ 'সামাজিক প্রয়োজনীয় শ্রম (সময়)' (উপরে আলোচিত) এবং এই শ্রমের প্রয়োগ সমাজের কোনও নির্দিষ্ট চাহিদা মেটাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু মার্কস আরও বলেছেন যে "(পণ্যোৎপাদনের শ্রম) সাধারণ অর্থে সামাজিক নয়, এই শ্রম এক বিশেষ অর্থে সামাজিক। এই সামাজিকতা এক বিশেষ ধরনের সামাজিকতা" (*অর্থশাস্ত্র সমালোচনা প্রসঙ্গে*, ১৮৫৯)।[২৫] এই সামাজিকতা পরোক্ষ সামাজিকতা, উৎপাদক/উৎপাদিকার ইচ্ছা এবং চেতনা-নিরপেক্ষ সামাজিকতা। পক্ষান্তরে পণ্যহীন সমাজেও সামাজিক শ্রম থাকতে পারে। তার দুটো দৃষ্টান্ত দিয়েছেন মার্কস। প্রথম দৃষ্টান্ত দেখি গ্রামীণ পিতৃতান্ত্রিক একান্নবর্তী পরিবারে। এখানে পরিবারের সভ্য/সভ্যারা তাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের উপাদানসমূহ উৎপাদনের জন্যে পরিবারে স্বাভাবিক ভাবে

উদ্ভূত শ্রমবিভাগের অভ্যন্তরে যে-সব বিভিন্ন ধরনের শ্রম প্রয়োগ করে, সেই বিবিধ শ্রম সামাজিক শ্রম, যদিও পরিবারের সীমার মধ্যে সামাজিক, যেমন একই ভাবে উৎপন্ন দ্রব্যগুলিও পরিবারের সীমার মধ্যে সামাজিক উৎপন্ন দ্রব্য (এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে পরিবারটি স্বয়ংসম্পূর্ণ)। (দ্র. *অর্থশাস্ত্র সমালোচনা প্রসঙ্গে* ১৮৫৯; *পুঁজি*, প্রথম খণ্ড, প্রথম অধ্যায়)।[২৬] অতএব দেখা যাচ্ছে যে, এখানে গৃহশ্রম যুগপৎ এবং প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক শ্রম। মার্কসের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পুঁজি-উত্তর ভাবীকালের মুক্ত পরিমেল, অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজ (মার্কসীয় অর্থে, ১৯১৭-র পরবর্তী যুগে প্রতিষ্ঠিত পাশবদ্ধ 'সমাজতন্ত্রের' অর্থে নয়)। এখানে প্রথম থেকেই উৎপাদন যৌথ, সেই যৌথ উৎপাদনে ব্যক্তিগত শ্রম সমষ্টিগত শ্রমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং প্রত্যক্ষভাবে সামাজিক। "এখানে ব্যক্তির শ্রম শুরু থেকেই সামাজিক শ্রম হিসেবে স্থিত" (মার্কস, *পাণ্ডুলিপি*, ১৮৫৭-৫৮)।[২৭]

এই বারে উপসংহারে আসা যাক। পিতৃতন্ত্র সম্পর্কে এবং সাধারণ ভাবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর স্থান সম্পর্কে মার্কসের (এবং আংশিকভাবে এঙ্গেলসের) বিরুদ্ধে নারীবাদী/বাদিনীরা যে সব অভিযোগ করেন সেই অভিযোগগুলি বরং মার্কস-উত্তর স্বঘোষিত 'মার্কসবাদী'দের বেলায় প্রযোজ্য (দু'-চারটি ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে), মার্কস (এঙ্গেলস) সম্পর্কে নয়। এই মার্কসবাদীদের তত্ত্বীয় আলোচনায় সমাজে নারীর বিশেষ বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা বিরল, এই ব্যাপারে এদের অনুশীলনের দিকটা আরও ভয়াবহ। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিকের এবং বিভিন্ন 'মার্কসবাদী' পার্টির নেতৃত্বে মূলত পিতৃতন্ত্র রয়ে গেছে। তথাকথিত 'সমাজতান্ত্রিক' শাসনেরও একই হাল। পুঁজি-পূর্ব সমাজের তুলনায় যদিও এই সমাজে নারীর স্থান নিঃসন্দেহে উন্নত, তথাপি তুলনামূলক বিচারে বুর্জোয়া গণতন্ত্রে নারীর স্থান কোনও কোনও অংশে তথাকথিত 'সমাজতন্ত্রে'র নারীর তুলনায় উন্নততর, অন্তত বুর্জোয়া গণতন্ত্রে নারীদের বিভিন্ন অধিকারের সপক্ষে নির্বাধ প্রকাশ্য আন্দোলনের সুযোগ বর্তমান, যে-সুযোগ 'রুদ্ধকণ্ঠ, ভয়ার্ত, শৃঙ্খলিত' পার্টি-রাষ্ট্রে অচিন্ত্যনীয়। (ইতিহাসের কী নিষ্ঠুর পরিহাস! মার্কস-এঙ্গেলস কি ধরে নিয়েছিলেন না যে পুঁজি-উত্তর সমাজ গণতন্ত্র সহ বুর্জোয়া সমাজের তুলনায় একটি উন্নততর সমাজ হবে, যা হবে একটি 'মুক্ত অনুষঙ্গ' যেখানে "একের মুক্ত সম্প্রসারণ হয়ে উঠবে সবার মুক্ত সম্প্রসারণের শর্ত"? দ্র. *সাম্যবাদী ইস্তাহার*)।[২৮] পক্ষান্তরে, সমাজে নারীর সমস্যা সম্পর্কে মার্কসের বক্তব্য সামাজিক অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্যের মতোই পুরোপুরি বিপ্লবাত্মক এবং মুক্তির দ্যোতক। তাঁর 'নেতিত্বের ডায়ালেকটিক' (১৮৪৪) নীতি অনুসরণ করে মার্কস দেখিয়েছেন যে, পুঁজি তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে পুঁজিপতির ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবেই বর্তমান পরিবারের তুলনায় এক উচ্চতর, নতুন ধরনের পরিবারের ভিত্তিগঠন করে। নিজের উদ্বৃত্ত মূল্য বৃদ্ধির গরজেই পুঁজি মামুলি পরিবারের সংকীর্ণ গণ্ডিকে ধ্বংস করে নারীকে গৃহের বাইরে নিয়ে এসে উৎপাদনে নিযুক্ত করে। পুঁজির সংগঠিত উৎপাদন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সমষ্টিগত শ্রমে নারীকে অংশ নিতে বাধ্য করে। সমষ্টিগত উৎপাদনে নারীর এই বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ ব্যক্তির ইচ্ছা নিরপেক্ষ ভাবেই যুগপৎ একটি সদর্থক দিক খুলে দেয়, অর্থাৎ এক উন্নততর ধরনের পরিবারের নয়া ভিত্তি স্থাপন করে।

সবশেষে আর একটি কথা। মার্কস সমাজ বিপ্লবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে নারীর ভূমিকার উপর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বন্ধু কুগেলমানকে এক চিঠিতে (১২.১২.১৮৬৮) তিনি লেখেন: ‘ইতিহাস সম্বন্ধে যারই কিছু মাত্র জ্ঞান আছে সেই জানে যে নারীসমাজের আলোড়ন ভিন্ন কোনও মহান সামাজিক বিপ্লব কখনো সম্ভব হতে পারে না।’’[২৯]

সলিল বিশ্বাস

অধিকারের আন্দোলনে পাশ্চাত্যের নারী: উনিশ শতক

I affirm, that woman never was given to man.

Angelina Grimké (1837)[১]

Oh, I want an end to patriarchy! Passionately!

Joan Kelly (1982)[২]

আমরা কি আদৌ কোনও বিশেষ একটি যুগকে চিহ্নিত করে বলতে পারি যে কোনও একটি সামাজিক আন্দোলনের সেখানেই সূত্রপাত? আদৌ কি কোনও এমন যুগ আছে, যখন কেউ না কেউ প্রতিবাদে মুখর হননি কোনও না কোনও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে? করিন্থের মহিলাদের কাছে মেদেয়ার উক্তি মনে করা যেতে পারে— পৃথিবীর সমস্ত জীবিত আর চিন্তাশীল প্রাণীর মধ্যে সব চাইতে ভাগ্যহীন হল নারী। ইউরিপিডি এই কথা মেদেয়ার মুখে বসিয়েছিলেন নিশ্চয় কোনও সামাজিক তাগিদে, মেয়েদের উপরে চিরন্তন নিপীড়নের কথা মনে রেখে। স্যাফোর কবিতায় নারীর যৌন স্বাধীনতার যে কথা আমরা পাই তাকে নারীবাদী চিন্তা আখ্যা না দেওয়ার কোনও কারণ নেই। পঞ্চদশ শতকে লিখছিলেন মারজারি কেম্প। প্রায় এই সময়েই লিখছিলেন ক্রিশ্চিন দ্য পিসান। পিসান সম্ভবত প্রথম মানবী যিনি তাঁর *দ্য বুক অব দ্য সিটি অব লেডিজ* ও *দ্য ট্রেজার অব দ্য সিটি অব লেডিজ*-এ নারীর অধিকার ও দায়িত্ব নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করেন।[৩] সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে যাঁরা নারীবাদী চিন্তনে বিশেষ অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন র‍্যাচেল স্পেট, এসথার সাওয়ারনাম, সারা এগারটন, নাটককার এফ্রা বেন ও মেরি অ্যাস্টেল। সপ্তদশ শতকে আমরা নারীর প্রথম জঙ্গি রাজনৈতিক আন্দোলন দেখতে পাই যখন ১৬৪২ সালে বিভিন্ন কাজে যুক্ত মহিলারা একজোট হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে লন্ডনে আসেন হাউস অব লর্ডস এবং কমনসের কাছে নারী শ্রমিক হিসেবে সমান অধিকারের দাবিতে আবেদন নিয়ে। তাঁদের নিয়ে বিদ্রূপ করা হলে প্রায় চারশো মহিলা ডিউক অব রিচমন্ডকে আক্রমণ করেন এবং তাঁর ক্ষমতার প্রতীকী দণ্ডটি ভেঙে দেন।[৪]

নারীবাদের উৎপত্তির একটা তারিখ বেঁধে দিলে পূর্বসূরিদের প্রতি অন্যায় করা হয় ঠিকই, কিন্তু সুবিধার জন্যে নারীবাদকেও কিছু ঐতিহাসিক যুগে ভাগ করা প্রয়োজন। বলা যেতে পারে, অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে আত্মসচেতন এবং সুসংবদ্ধ নারীবাদী চিন্তনের সূত্রপাত। তারপর, উনবিংশ শতকে নারী আন্দোলন এবং তার তাত্ত্বিক ভিত্তি ক্রমশ পরিপূর্ণ অবয়ব পেতে থাকে। এই সময়ের বিবিধ ধারাকে কালক্রম অনুসারে বিধৃত করা স্বল্পপরিসরে প্রায় অসম্ভব। আমরা তাই নারীবাদী চেতনার উন্মেষ ও আন্দোলনের ইতিহাসের কিছু বিশেষ মুহূর্ত, কিছু অগ্রণী মানুষের ভূমিকার কথা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

উনবিংশ শতকের গোড়ায় ইউরোপ ও আমেরিকায় (এবং পৃথিবীর কোথাও) নারীর প্রায় কোনও অধিকারই ছিল না। লিঙ্গ বৈষম্যই ছিল সামাজিক নিয়ম। আজকের পশ্চিমি দুনিয়ায়, এমনকী অনেক ক্ষেত্রে এদেশেও, প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সমস্ত আইনি, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকার মেয়েদের নাগালের বাইরেই ছিল। নারীর ভোটাধিকার ছিল না, মামলা করার অধিকার ছিল না (মেয়েদের বিরুদ্ধেও কেউ আদালতে যেতে পারত না, কারণ আইন আলাদা করে নারীর অস্তিত্বই স্বীকার করত না), বিবাহের পরে নারীর নিজস্ব সম্পত্তি বলে কিছু থাকত না, কিছু উপার্জন করলে তা স্বামীর হাতে তুলে না দেওয়া ছিল দণ্ডনীয় অপরাধ, বিবাহবিচ্ছেদ হলে তাকে সন্তানহারা হতে হত, উচ্চশিক্ষার সব পথ তার বন্ধ থাকত। স্বামীর সব হুকুম ও অত্যাচার তাকে মাথা পেতে মেনে নিতে হত। জীবিকানির্বাহের পথও ছিল সীমিত। প্রয়োজনে তাকে হতে হত সামান্য মাইনের গৃহভৃত্য অথবা কারখানায় নিম্নস্তরের শ্রমিক। একই পরিমাণ কাজ করেও মেয়েরা মাইনে পেত কম। খুব যারা ভাগ্যবান, তারা হতে পারত কোনও উচ্চবিত্ত মহিলার সঙ্গিনী অথবা কোনও বাড়িতে গৃহশিক্ষক বা 'গভার্নেস'। শেষ অবধি খোলা থাকত দেহোপজীবিনীর জীবন। সব ঐতিহাসিকই বলবেন, উনবিংশ শতাব্দী ছিল চরম লিঙ্গবৈষম্যের যুগ।

তবুও, এরই মধ্যে অনেক নারী— বিশেষ করে মধ্যবিত্ত পরিবারের নারী— নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং নানা ভাবে নিজেদের ও কম ভাগ্যশালী ভগিনীদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে, সাধারণ মানুষকে আরও সংবেদনশীল করে তুলতে, দাবি আদায়ের আন্দোলনে সামিল হতে সচেষ্ট ছিলেন। এঁরাই এই শতককে নারীসমাজের অগ্রগতির শতকে পরিণত করছিলেন।

'নারীবাদ' কথাটি উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে ব্যবহার হতে শুরু করে। অক্সফোর্ড অভিধান ১৮৯৪ সাল থেকে শব্দটিকে গ্রহণ করে। ১৮৯৪ সালের আগে অবশ্যই নারীবাদ কথাটি ব্যবহার হত। তা না হলে অভিধানে তার অন্তর্ভুক্তি ঘটত না নিশ্চয়। যদিও 'নারীর অধিকার' (Women's Rights) কথাটাই বেশি প্রচলিত ছিল আগে। এই অধিকারের দাবিকেই রানি ভিক্টোরিয়া বলেছিলেন: নষ্টমতি, সমাজবিরোধী।[৫] এই অধিকার অর্জনের লড়াই, নারীর সামাজিক অবস্থান নির্ধারণ, নিজের শরীর এবং যৌন চেতনা বিষয়ে সম্যক অবহিত হওয়া ও অন্যের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়া, পুরুষের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কে নারীর নিজস্ব স্থান বোঝা, জানা আর সেখানে তার অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রের আর কর্মস্থলের আর দৈনন্দিন

জীবনের দেওয়া-নেওয়ার সমস্ত স্তরে লিঙ্গভেদ প্রসঙ্গে সামগ্রিক সচেতনতা বাড়িয়ে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টাকে যদি নারীবাদী আন্দোলনের মূল ঝোঁক মনে করা হয়, তা হলে উনবিংশ শতককে নারী আন্দোলনের আরম্ভের সময় বলে মনে করা যেতে পারে।

পিতৃতান্ত্রিকতা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম, এই ধারণা জন স্টুয়ার্ট মিলের *সাবজেকশন অব উইমেন* (১৮৫৯) গ্রন্থেও সঠিক বলে ধরে নেওয়া আছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে এই ধারণা পালটাতে থাকে। প্রধানত শিক্ষিত মধ্য ও উচ্চবিত্ত নারীরা পিতৃতন্ত্রের অযৌক্তিক ভাবনা এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রদর্শনের দ্বারা মেয়েদের দমিত করে রাখার চেষ্টাকে আক্রমণ করতে শুরু করলেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। অ্যাবিগেইল অ্যাডামস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি জন অ্যাডামসের স্ত্রী, লিখলেন, মনে রাখতে হবে সুযোগ হলে সব পুরুষই চায় স্বেচ্ছাচারী শাসক হয়ে উঠতে। লিখলেন, মহিলাদের প্রতি যদি যথাযথ দৃষ্টি দেওয়া না হয়, তা হলে তাঁরা বিদ্রোহী হবেন এবং এমন কোনও আইন মানতে তাঁরা বাধ্য থাকবেন না যে আইনের প্রণয়নের সময়ে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশের অধিকার নেই, কোনও প্রতিনিধিত্ব নেই।[৬] ১৭৯০ সালে ক্যাথারিন মেকলে লিখেছিলেন *লেটারস অন এডুকেশন*। তিনি বলেছিলেন, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের কোনও প্রাকৃতিক কারণ নেই। নারীর শরীর ও মনকে বিকৃত করে অবদমিত রাখা হয়েছে কেবল পুরুষের আধিপত্য কায়েম রাখার জন্য, যৌন আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার তাগিদে। ছেলে এবং মেয়ে, উভয়কেই সম মানের শিক্ষা দিতে হবে। কী বিষয় পড়ানো হবে তা নিয়েও কোনও ভেদাভেদ রাখা চলবে না।[৭]

১৭৯২ সালে নারীবাদী ভাবনায় নতুন বিকাশ ঘটিয়ে প্রকাশিত হল *এ ভিনডিকেশন অব দ্য রাইটস অব উওমান উইথ স্ট্রিকচারস অন মরাল অ্যান্ড পলিটিকাল সাবজেকটস*। তাই উনিশ শতকের নারীবাদ প্রসঙ্গে যে কোনও আলোচনা শুরু করতেই হবে মানবীবিদ্যার প্রথম দার্শনিক মেরি ওলস্টনক্রাফটকে নিয়ে, যদিও তারিখের হিসেবে মেরি আগের শতকের মানবী। তাঁর মৃত্যুই হয় ১৭৯৭ সালে।

উনবিংশ শতকে *ভিনডিকেশন* খুব জনপ্রিয় হয়নি। প্রাথমিক ভাবে বইটি আলোচকদের কাছে নারীশিক্ষা বিষয়ে মেরির বিভিন্ন প্রস্তাবের জন্যই সমাদর পেয়েছিল। অবশ্য নারীশিক্ষা সম্পর্কে নানা ভাবনাচিন্তা অনেকেই করেছিলেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে কাউকেই নারীবিদ্বেষী বলা যেত না। বার্ক-বিরোধীরা বইটিকে সাদরেই গ্রহণ করেছিল। পুরুষ ও নারীর সমান অধিকারের প্রশ্নে মেরির বক্তব্য তাদের কাছে অবাস্তব মনে হলেও, মেরির শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে তাদের বিরোধ ছিল না। নারী শিক্ষিত হলে, যুক্তিপূর্ণ হলে তারা স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে উঠতে পারবে, কাজেই তাদের শিক্ষিত করে তোলাই উচিত।[৮] কিন্তু মেরির 'স্মৃতিকথা' (*মেমোয়ারস অব দ্য অথর অব এ ভিনডিকেশন অব দ্য রাইটস অব উওমান*— লিখেছিলেন উইলিয়াম গডউইন, অলঙ্করণ করেছিলেন মেরি) প্রকাশিত হতেই দেশ জুড়ে প্রবল শোরগোলে জমে উঠল মেরির প্রথাবিরোধী জীবনের রসালো আলোচনা। 'অবৈধ' সন্তানধারণ, একাধিক পুরুষের (চিত্রকর হেনরি ফুসেলি, লেখক গিলবার্ট ইমরে)

সঙ্গে প্রেমের কাহিনি, মেরিকে 'নারীবাদী ব্যভিচারের' প্রকৃষ্ট উদাহরণে পরিণত করল। মারিয়া এজওয়ার্থ থেকে শুরু করে ফ্যানি বারনি, বিভিন্ন লেখকরা তাঁদের রচনায় নানা হাস্যকর চরিত্রের সৃষ্টি করে মেরিকে ব্যঙ্গ করলেন। হোরেস ওয়ালপোল তাঁর নাম দিলেন, 'দ্যাট হায়েনা ইন পেটিকোটস'।[৯] মেরির লেখার চাইতে তাঁর জীবন নিয়ে আলোচনা চলল বেশি। গডউইন হয়তো চেয়েছিলেন স্ত্রীর প্রতি মমত্ববোধ ও ভালবাসা এবং মুক্তচিন্তার প্রতি মেরির দৃঢ় বিশ্বাসকেই প্রকাশ করতে।[১০] কিন্তু ফল হল বিপরীত। দু'-এক জন আমেরিকান নারীবাদী ছাড়া আর কেউ সে সময়ে তেমন ভাবে মেরির চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হননি। অবশ্য কারও কারও মনে মেরির প্রতি সহানুভূতি ছিল না তা নয়। যেমন, কবি উইলিয়াম ব্লেক একটি কবিতায় মেরির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন।[১১] বিংশ শতাব্দীতে ষাট ও সত্তরের দশকে, *ভিনডিকেশন* গ্রন্থের নতুন মূল্যায়ন আরম্ভ হয়। ভারজিনিয়া শ্যাপিরোর মতো নারীবাদী গবেষকরা দেখিয়েছেন, বোধ (সেনসিবিলিটি), শিক্ষা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তা এবং মেরি ওলস্টনক্রাফটের চিন্তার মধ্যে কত সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। মেয়েদের প্রতি ইসলামি নিষেধাজ্ঞার একজন কট্টর সমালোচক অয়ান হির্সি আলি (Ayaan Hirsi Ali) সম্প্রতি লিখেছেন: মেরি ছিলেন এমন একজন নারীবাদী যিনি প্রথম মেয়েদের বুঝতে শেখান যে তারা চিন্তনের ক্ষমতায় পুরুষের সমকক্ষ এবং সব কিছুতেই পুরুষের সমান অধিকার পাওয়ার যোগ্য।[১২]

মেরি নিজের জীবনে সে যুগের বিচারে অতুলনীয় বিদ্রোহী মনোভাব দেখিয়েছিলেন, কিন্তু অন্য কোনও নারী যে সে যুগে এমন সাহসিকতার পরিচয় দেননি তা নয়। উল্লেখ করা যায় মিলের সঙ্গিনী ও পরবর্তীতে স্ত্রী হ্যারিয়েট টেলর অথবা চার্লস ডিকেনসের সঙ্গিনী এলেন টেরনানের নাম। কিন্তু প্রথারহিত মুক্ত বিশ্বাসের প্রতি মেরির অবিচলিত দায়বদ্ধতার সমপর্যায়ে বোধহয় অন্য কেউ পৌঁছতে পারেননি।

১৭৯০ সালে মেরি লেখেন *এ ভিনডিকেশন অব দ্য রাইটস অব উওমান*। ফরাসি বিপ্লবকে আক্রমণ করে রাজতন্ত্রের সমর্থনে এডমান্ড বার্কের বক্তব্যকে খণ্ডন করে এই বইতে মেরি কেবল যে প্রজাতান্ত্রিক রাজনীতিকে সমর্থন করেন তাই নয়, তিনি এও স্পষ্ট বলেন, যে সামাজিক অসাম্যের প্রবক্তা বার্ক তার ভিত্তিই হল নারীর সহায়হীন নিষ্ক্রিয়তা। নিজের সময়ের উচ্চবিত্ত মহিলাদের তারল্যকে প্রবল আক্রমণ করলেও মেরি মানেননি যে পুরুষের তুলনায় নারী কম চিন্তাশীল, স্বল্পবুদ্ধি, দুর্বল ও চপল। তিনি এও স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে, এই তথাকথিত 'মেয়েলিপনা' বস্তুত একটি সামাজিক নির্মাণ যা নারীর মানসিকতাকে বিকলাঙ্গ করে রাখে।[১৩] শিশুকাল থেকে মেয়েরা শিখে আসছে, তাদের সব চাইতে বড় সম্পদ হল দৈহিক সৌন্দর্য। কিন্তু তবুও তারা কেবল রূপচর্চা আর পোশাক-আশাকের প্রতি অন্ধভাবে আকৃষ্ট এ কথা ঠিক নয়। রুশোকে ব্যঙ্গ করে মেরি বলেন: আমি বোধহয় জে জে রুশো অপেক্ষা বেশি সংখ্যক নারীকে দেখেছি, আমি জানি মেয়েরা বাস্তবে কী হতে পারে।[১৪] নারী ও পুরুষ উভয়েই ঈশ্বর প্রদত্ত চিন্তাশীলতার অধিকারী এবং উভয়কেই একই ধরনের শিক্ষা দিতে হবে যাতে সেই বুদ্ধিবৃত্তি সমানভাবে বিকশিত হতে

পারে। সে সুযোগ না দিয়ে বলা হয়ে থাকে, নারীরা চপলমতি ও যুক্তি বোঝে না। এর চাইতে অন্যায় আর কি হতে পারে। নারীকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে, নিছক দাসী বানিয়ে রেখে তাদের কাছে উচ্চতর চিন্তাশীলতা আশা করাই অন্যায়।[১৫] পুরুষ ও নারী একই মানের মানসিক ক্ষমতার অধিকারী, সুতরাং তাদের সামাজিক অবস্থানও এক হতে হবে, মৌলিক অধিকারও সমান হতে হবে। *রাইটস অব উওমান* গ্রন্থে জাতীয় শিক্ষানীতি গড়ে তোলার কথা বলেন মেরি। একপেশে শিক্ষা পুরুষ-নারী উভয়ের মধ্যেই নানা চারিত্রিক ত্রুটির জন্ম দেয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি উচ্চ মেধাকে অনবরত লালন করলে তা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। শিক্ষা হবে সকলের জন্য সমান, সহশিক্ষামূলক বিদ্যায়তনেও পাঠ্যবস্তুর লিঙ্গভিত্তিক নির্ধারণ বন্ধ করতে হবে।[১৬]

শিক্ষিত নারী যুক্তিনির্ভর স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেবে, এই অধিকারের দাবি তোলা বোধহয় *রাইটস অব উওমান* গ্রন্থের সব চাইতে বড় অবদান।[১৭] মেরি চেয়েছিলেন, নারীর সামনে জীবিকানির্বাহের বিবিধ পথ খুলে যাক; মেয়েদের যেন নিতান্ত বাঁচার তাগিদে বিবাহে বাধ্য হতে না হয়; নারীকে যেন স্বামীর সদিচ্ছার উপরে নির্ভর করে বাঁচতে না হয়।

ইংল্যান্ড ও আমেরিকার অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের নারীবাদী ভাবনায় বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল ফরাসি দার্শনিক সেন্ট সিমোন, ফুরিয়ের ও ইংরেজ রবার্ট ওয়েন প্রভৃতি ইউটোপিয়ান সোসালিস্টদের বক্তব্য। তাঁরা মনে করতেন, সমাজে ও পরিবারে নারী-পুরুষের সমান অধিকার সমাজবিপ্লবের মাধ্যমে আসবে তা নয়। এই সাম্য সমাজপরিবর্তনের একটি পূর্বশর্ত। এঁদের চিন্তায় প্রাণিত হয়ে সে যুগের নারীবাদীরা বিভিন্ন বিতর্ক সভার আয়োজন করতেন। সেই সব সভায় বিতর্ক হত জোরদার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পুলিশের বন্দোবস্ত রাখতে হত।

ওলস্টনক্রাফট ও অন্যান্য সংস্কারপন্থী নারীবাদীরা যে সমস্ত ভাবনার পত্তন করেছিলেন তারই পূর্ণাঙ্গ রূপ এঁদের লেখায় (এবং কিছু স্বল্পস্থায়ী বাস্তবায়নে) দেখা গেল। এঁরা বললেন: বর্তমান সমাজের সংস্কার নয়, তার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নারীর স্বাধীনতা আসবে। সমস্ত ধরনের কাজেই পুরুষ ও নারীকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে এবং গৃহকর্মে পুরুষকেও সমান ভাবে যোগ দিতে হবে। পরিবার নামক সামাজিক নির্মাণটিকে তাঁরা প্রবল আক্রমণ করে বলেন, এখানেই পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতা-কেন্দ্র নিহিত থাকে। তথাকথিত পারিবারিক মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ করে তাঁরা নারীর যৌন স্বাধীনতাকে মুক্তির অন্যতম শর্ত বলে চিহ্নিত করেন।[১৮] ইউটোপিয়ান সোসালিস্টদের আশা ছিল তাঁদের যুক্তিপূর্ণ আদর্শ জনসমর্থন পাবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটল না। ইংল্যান্ডে[১৯] ও আমেরিকায়[২০] তাঁদের প্রতিষ্ঠিত তিনটি মুক্ত জনগোষ্ঠীর কোনওটিই শেষ অবধি টিকতে পারেনি। ইউটোপিয়ান সোসালিস্টদের সকলেই যে নারীবাদী ভাবনার সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করতেন তা নয়, কিন্তু তাঁদের মতাদর্শে বিশ্বাসী বহু নারী খাদ্য আন্দোলন, ধর্মঘট প্রভৃতি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় ছিলেন।

এই সময়ে কাজের সন্ধানে মেয়েরাও বেরিয়ে পড়ায় এখানেও লিঙ্গভিত্তিক প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। পুরুষ উপার্জন করবে আর নারী সংসার দেখবে, এই ধারণা জনপ্রিয় হওয়ায়,

মেয়েরা ক্রমশ শ্রমিক সংগঠনগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তবুও, ব্রাইসনের মতে, কেবল মাত্র এই সময়েই সাম্যবাদী ও নারীবাদী চিন্তা এক স্রোতে মিশেছিল এবং এ কথা স্পষ্ট হয়েছিল যে ব্যক্তিজীবনকে পরিবর্তন করেই কেবল বৃহত্তর রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক জীবনে পরিবর্তন আনা সম্ভব। এই ধারণার স্পষ্ট অভিব্যক্তি ঘটে উইলিয়াম টমসনের রচনায়। আনা হুইলার নামক সোসালিস্ট নারীবাদী বক্তার সহযোগিতায় লেখা এই বইয়ের নাম ছিল *অ্যাপিল অব ওয়ান হাফ অব দ্য হিউম্যান রেস, উইমেন, এগেনস্ট দ্য প্রিটেনশনস অব দ্য আদার হাফ, মেন, টু রিটেইন দেম ইন পলিটিক্যাল, অ্যানড দেন্স ইন সিভিল অ্যান্ড ডোমেস্টিক স্লেভারি*। টমসন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া নারীর কখনও মুক্তি নেই এবং সে মুক্তি আসতে পারে কেবল ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং সমাজে ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিলোপ সাধনের মধ্য দিয়ে।

আমেরিকাতে উনবিংশ শতকের গোড়ায় নারীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে দাসপ্রথা বিলোপের আন্দোলন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। দাসপ্রথা বিলোপ আন্দোলনের কর্মী ছিলেন দুই বোন অ্যাঞ্জেলিনা ও সারা গ্রিমকে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, দাসপ্রথা আর নারীর পুরুষ-দাসত্ব একই শোষণের দুই রূপ। ১৮৩৮ সালে একটি জনসভায় অ্যাঞ্জেলিনা বলেন: যে পুরুষরা ক্রীতদাসদের শাসন করে, তারাই দেশে কর্তৃত্ব করে। সেই তারাই নারীর উপরে অত্যাচারের প্রতিবাদে আমাদের সরব হতে দেয় না।[২১] দু'জনেই সমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের কথা সোচ্চারে বলেন। ফলে, সর্বত্র তাঁদের বিরুদ্ধে শোরগোল ওঠে। ধর্মযাজকরা তাঁদের অ-মহিলাসুলভ আচরণের নিন্দা করতে থাকে।[২২] আরও শোরগোল ওঠে যখন তাঁরা ক্রীতদাসীদের উপরে শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের যৌন নির্যাতনের কথা খোলাখুলি বলে কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসী আর শ্বেতাঙ্গ নারীদের মধ্যে অন্তর্লীন সাদৃশ্যের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন। তাঁদের দুটি বিশেষ পরিচিত বইয়ের নাম হল *লেটার্স অন দ্য ইকোয়ালিটি অব সেকসেস* (১৮৩৮) এবং *লেটারস টু ক্যাথারিন ই বীচার* (১৮৩৭)।[২৩]

মেয়েরা ঘরের কাজ করবে আর ছেলেরা বাইরের, এই ধারণার বহুল প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা (মেয়েদের মধ্যেও), উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নারীবাদী চিন্তার বিকাশের পথে ছিল সব চাইতে বড় বাধা। এই ধারণা না মানলেই সমাজের সব বাঁধন আলগা হয়ে যাবে, দেশ উচ্ছন্নে যাবে, এই বিশ্বাসের সব চাইতে জোরালো প্রকাশ ঘটেছিল ম্যাথু কেরি নামে ফিলাডেলফিয়ার একজন প্রকাশকের লেখা *রুলস ফর হাজব্যান্ডস অ্যান্ড ওয়াইভস* পুস্তিকায়। তিনি লিখেছিলেন, স্ত্রী যতক্ষণ তার সব কথা শুনে চলবে, পতিদেবতাকে তুষ্ট করে চলবে এবং স্বামীর কর্মক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবে না, ততক্ষণ স্বামী স্ত্রীকে যথাযথ মর্যাদা দেবে, তার মতামত নেবে। সব চাইতে বড় কথা হল, স্ত্রীর কোনও রকম 'মেজাজ' (স্পিরিট) দেখানো চলবে না।

এই সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নারীবাদী দাবিগুলি ক্রমশ রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে মিশে যেতে থাকে। শিক্ষার অধিকার, আইনি ও রাজনৈতিক অধিকারের সংস্কারের দাবি আদায়ের আন্দোলনগুলি উচ্চতম রূপ পায় সর্বজনীন ভোটাধিকারের জঙ্গি

লড়াইয়ে। দাবিদাওয়ার ধরন থেকে সংস্কারপন্থী মনে হলেও ঊনবিংশ শতকের নারীবাদ যথেষ্ট জঙ্গি ছিল। নারীবাদীরা মনে করতেন, বৃহত্তর সমাজে পরিবর্তন আনতে হলে ব্যক্তিগত জীবনে, বিশেষ করে যৌন স্বাধীনতার প্রশ্নে, নতুন ধারা নিয়ে আসতে হবে। এই সময়েই প্রথম নারীবাদীরা নারীকে একটি পৃথক সামাজিক বর্গ হিসেবে, আবার কেউ কেউ নিজেদের একটি স্বতন্ত্র 'শ্রেণি' হিসেবেও, দেখতে শুরু করেছিলেন, যে শ্রেণির স্বার্থ পুরুষস্বার্থের বিপরীত। এই দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক বা ভুল যাই হোক, এর ফলে নারীবাদী ভাবনায় এক বিশেষ পরিবর্তন আসে। এরই ফলে নারীর পারস্পরিক সংহতি ও বন্ধুত্বের বন্ধনও গুরুত্ব পেতে থাকে। সেই দিক থেকে বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের 'সিসটারহুড' ধারণার পূর্বসূরি ছিলেন তাঁরা। তার মানে এই নয় যে পিতৃতন্ত্র সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে তত্ত্বগত স্বচ্ছতা ছিল, কিন্তু লিঙ্গকেন্দ্রিকতার (ফ্যালোসেন্ট্রিক) সঠিক মূল্যায়ন তখনই আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল।[২৪] নারীর যৌন অধিকার নিয়ে তখন যে কেবল লেখা হচ্ছিল তাই নয়, মেয়েরা সরাসরি আন্দোলনে নেমে চেষ্টা করছিলেন সচেতনতা বাড়াতে এবং বিভিন্ন বৈষম্যমূলক আইন রদ করতে। অনেকেই তখন ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন, কেবলমাত্র সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের রদবদলের মধ্য দিয়ে নারীর মুক্তি আসবে না, নারীকে তার শরীরের উপরেও নিজস্ব অধিকার দিতে হবে।

সার্বিক ভাবে দেখলে এই শতকে নারীবাদী ভাবনার অজস্র ধারা নজরে আসবে। গ্রিমকে ভগিনীদের কথা বিশেষ করে বলা হয়েছে কারণ তাঁরা একই সঙ্গে দু'ধরনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। অ্যাঞ্জেলিনা যথেষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন কবিও ছিলেন। কিন্তু আরও অনেকের অবদানের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ইংল্যান্ডে বারবারা লে স্মিথ বোডিকন লিখেছিলেন *উইমেন অ্যান্ড ওয়ার্ক*। নারীর আইনি অধিকারের লড়াইয়ে *ম্যাট্রিমোনিয়াল কজেস অ্যাক্ট* প্রণয়নে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই আইনের প্রণয়নে বিবাহবিচ্ছেদ সহজতর হয় এবং সম্পত্তির অধিকারে নারীর দাবি মান্যতা পায়। জোসেফাইন বাটলার লিখেছিলেন *দ্য এডুকেশন অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট অব উইমেন ও উইমেনস ওয়ার্ক অ্যান্ড উইমেনস কালচার*। সেনাদলে যৌনরোগের ব্যাপকতা রোধ করতে প্রচলিত ছিল *দ্য কনটেজিয়াস ডিজিজেস অ্যাক্ট*। এই আইন অনুসারে সেনা ছাউনি অঞ্চলে বসবাসকারী যে কোনও নারীকেই যৌনরোগী বলে ধরে নিয়ে জোর করে তার ডাক্তারি পরীক্ষা করানো যাবে। ধরেই নেওয়া হয়েছিল, তথাকথিত 'পতিতা' নারীর কোনও আইনি অধিকার থাকতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রেই এই পরীক্ষা হত অত্যন্ত অমানবিক এবং তাকে বলা হত 'ডাক্তারি ধর্ষণ'। 'সতী' নারীর সঙ্গে 'পতিতা' নারীর কোনও যে তফাত নেই তা যৌনরোগের প্রসার দেখলেই বোঝা যায়, বললেন অনেকে। স্ত্রী এবং দেহোপজীবিনী উভয় নারীর শরীরের উপরেই পুরুষআধিপত্য কায়েম থাকে। এই নারীবিরোধী আইন তুলে দেবার আন্দোলনে জোসেফাইন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৮৮৬ সালে এই আইন নাকচ হয়। হ্যারিয়েট মার্টিনো আমেরিকা ঘুরে ইংল্যান্ডে ফিরে লেখেন *সোসাইটি ইন আমেরিকা* যার একটি পরিচ্ছেদের নাম তিনি দেন *দ্য পলিটিকাল নন-এগজিসটেনস অব উইমেন*। আমেরিকায়

মার্গারেট ফুলার লিখেছিলেন *অ্যাট হোম অ্যান্ড অ্যাব্রড* এবং *লাইফ উইদাউট অ্যান্ড লাইফ উইদিন*, সুসান অ্যান্টনি সম্পাদনা করেছিলেন চার খণ্ডে *দ্য হিস্ট্রি অব উওমান সাফ্রেজ*। এঁরা কেউই কেবল গ্রন্থ রচয়িতা ছিলেন তা নয়, প্রত্যেকেই কোনও না কোনও ভাবে সক্রিয় নারী আন্দোলনের শরিক ছিলেন।

পুরুষ নারীবাদীদের মধ্যে অগ্রণী জন স্টুয়ার্ট মিল হিতবাদী (ইউটিলিটারিয়ানিজম) মনন থেকে নারীবাদে পৌঁছেছিলেন, নাকি লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য বিরাগ তাঁকে এই অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার করেছিল, এ আলোচনার চাইতে উনবিংশ শতকে নারীবাদী আন্দোলনে, বিশেষ করে নারীর ভোটাধিকার অর্জনের লড়াইয়ে, তাঁর *দ্য সাবজেকশন অব উইমেন* গ্রন্থের অবদানের কথা স্মরণ করাই উচিত মনে হয়।

মিলের সঙ্গে হ্যারিয়েট টেলরের যখন প্রথম দেখা হয়, তখন হ্যারিয়েট বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জননী। অচিরেই দু'জনের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হ্যারিয়েটের স্বামী জন টেলর এই সম্পর্কে বাধা দেননি। ক্যানসার রোগে জনের মৃত্যু হলে মিল এবং হ্যারিয়েট বিয়ে করেন। দু'জনেই নারী পুরুষের ভেদাভেদ নিয়ে নিজস্ব ধরনে চিন্তা করেন। এই সমস্যার প্রকৃতি সম্বন্ধে দু'জনেরই মত ছিল অনেকাংশে এক।[২৫] দুটি রচনা, *অন এনফ্র্যানচাইসমেন্ট অব উইমেন* (১৮৫১) এবং *অন দ্য সাবজেকশন অব উইমেন* (১৮৬৯), নারীর অধিকার সম্বন্ধে তাঁদের ভাবনাকে প্রকাশ করে। দ্বিতীয় গ্রন্থটির খ্যাতি প্রথমটিকে খানিকটা ম্লান করে দিলেও, প্রধানত হ্যারিয়েট রচিত *এনফ্র্যানচাইসমেন্ট* ওলস্টনক্রাফটের বক্তব্যকেই আরও বিস্তার দিয়েছে। নারীর সম মানের শিক্ষা পাওয়ার, আইনের চোখে সমান অধিকার পাওয়ার, জীবিকানির্বাহের ক্ষেত্রে কোনও ভাবে বৈষম্যের শিকার না হওয়ার অধিকার প্রভৃতির দাবিতে হ্যারিয়েট সোচ্চার হয়েছেন এই বইতে। তিনি একথা মানেননি যে কর্মরত নারীরা মায়ের ভূমিকা পালনে বা গৃহস্থালিতে অক্ষম হবে। কোন কোন সামাজিক কারণ মেয়েদের সমান অধিকার অর্জনের পথে বাধা হয়ে আছে, তার বিশদ বিবরণ দেন হ্যারিয়েট।

সাবজেকশন গ্রন্থে মিল নারীর অধিকারের সপক্ষে অনেকগুলি অকাট্য যুক্তি তুলে ধরেন। মিলের মতে, পুরুষরা নারীকে কর্মক্ষম হতে দিতে চায় না। কিছু কাজে মেয়েদের দক্ষতা কম বলে সেই কাজে তাদের যুক্ত করা হবে না, এই যুক্তি মিল মানেননি। যে কাজ মেয়েরা কখনও করেইনি, তাতে তারা দক্ষ কিনা, একথা জানা গেল কী করে? তাই, কোনও কাজের সুযোগ থেকেই মেয়েদের বঞ্চিত করা চলবে না। মেয়েদের সব রকম সুযোগ দিয়ে দেখতে হবে তারা কোন কোন কাজ করতে সক্ষম। মেয়েদের চিরদিন শেখানো হয়েছে তারা দুর্বল, ভাবপ্রবণ এবং পুরুষের বশ্যতায় অভ্যস্ত। কিন্তু সমান সুযোগ দিলে দেখা যাবে, এই কথাগুলি ভুল। সমান সুযোগ পেলে তারা 'বাধ্য হয়ে পুরুষের আদেশ পালন করে চলার দুঃখ থেকে মুক্তি পাবে।'[২৬] সমস্ত জীবিকায় নারীর অবাধ প্রবেশের অধিকার দিতে হবে। তাতে সমাজের সার্বিক উপকার হবে এবং ফলে পুরুষও লাভবান হবে। কারণ, মুক্তমনা, শিক্ষিত স্ত্রী স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে উঠতে পারবে। বিবাহ সংক্রান্ত আইনগুলিকে আক্রমণ করে মিল বললেন, 'প্রতিটি গৃহের গৃহিণীদের বাদ দিলে,

বৈধ ক্রীতদাস আজ আর কোথাও নেই।'[২৭] বলেন, গৃহের বাইরে নারীকে কাজ করতে যেতে দিতে হবে; উত্তরাধিকার আইন পালটে তাকে সম্পত্তিতে অধিকার দিতে হবে; তাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় সক্ষম করে তুলতে হবে। নারীর ভোটাধিকারের প্রশ্নে মিল একেবারে দ্ব্যর্থহীন। সমাজের অর্ধেক মানুষ নারী, দেশের শাসননীতি তাদের জীবনকেও প্রভাবিত করে, কাজেই তাদের 'ভোটাধিকার না দেওয়ার সামান্যতম কারণও নেই।'[২৮] মেয়েরা জ্ঞান বুদ্ধি মনন, সব কিছুতেই পুরুষের সমকক্ষ, সুতরাং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাও থাকা স্বাভাবিক। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে সুযোগ পেলে মেয়েরা সব কিছুতেই ছেলেদের সমান হতে পারে। উদাহরণ অনেক আছে।

পার্লামেন্টে নির্বাচিত হওয়ার পরেই মিল ১৮৬৭ সালের রিফর্ম আইনে 'ম্যান' শব্দটির ব্যবহার বন্ধ করে তার জায়গায় 'পারসন' শব্দটি আনা হোক, এই মর্মে একটি সংশোধনী আনেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়নি, কিন্তু কোনও পুংলিঙ্গবাচক শব্দ মেয়েদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য হবে কিনা সে নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত করে এই সংশোধনী।[২৯]

সাবজেকশন প্রকাশিত হওয়ার পর সারা পৃথিবীর শিক্ষিত নারীদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। আমেরিকাতে বইটিকে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে পড়তে থাকেন নারীরা। ৭৯ বছর বয়সে অ্যাঞ্জেলিনা গ্রিমকে ম্যাসাচুসেটসের গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বইটি ১৫০ কপি বিক্রি করেন। পরবর্তীকালে নারীবাদীরা মিলের মতামতে সংস্কারবাদী ভাবনার সমালোচনা করলেও, তাঁর রচনার যুগান্তকারী অবদানকে কেউই অগ্রাহ্য করতে পারেননি।[৩০]

সামাজিক সাম্যের একটি মাপকাঠি হতে পারে সেই সমাজে নারীর অবস্থান, এই কথা মিলের পর থেকেই সাধারণ ভাবে একটি গৃহীত ধারণা হয়েছিল। মার্কস সরাসরি নারীর সমস্যা নিয়ে বিশেষ কিছু না লিখলেও মার্কসবাদের সাধারণ সূত্রগুলি নারীর অবদমনের বিরোধিতাই করে। ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত হয় *ক্যাপিটাল*-এর প্রথম খণ্ড এবং ১৮৮৪ প্রকাশিত হয় *দ্য অরিজিন অব্ দ্য ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড দ্য স্টেট*। এঙ্গেলস স্পষ্টই বলেন, আধুনিক পরিবার ব্যবস্থায় চিরন্তন কিছু নয়। বহুগামী আদিম মানুষ এক সময়ে পরিবার এবং বিবাহ ব্যবস্থায় নিজেদের পরিবর্তিত করে। আদিম সমাজের ভিত্তি ছিল সাম্য, যদিও কাজের ভাগাভাগির ভিত্তি ছিল লিঙ্গভেদ। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবের পরে এই সাম্যবাদী ব্যবস্থা ভেঙে যায়। পুরুষ ক্রমশ ধন আহরণ করে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল এবং পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সর্বত্র প্রভুত্ব বিস্তার করতে লাগল। পরিবারের ভিতরেও সে প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে নারীকে ক্রীতদাসী ও সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত করল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন ঘটলে এই আধিপত্যবাদও শেষ হবে এবং নারী আবার স্বাধীন হবে। স্বাধীনতা আসবে সমাজ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে।

এই বিশ্লেষণ অনেকটাই সরলীকৃত। পুরুষই শুধু সম্পত্তি বা ধন আহরণ করেছে বা কাজের বিভাগ লিঙ্গভিত্তিক হলেও এই অবস্থাকে সাম্যবাদী বলা, লিঙ্গভিত্তিক মজুরি-বৈষম্যকে আক্রমণ না করা, যৌনতা সম্পর্কে নানা রকম ভুল অবস্থান নেওয়া প্রভৃতি ধারণা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু পরিবারতন্ত্রকে পুরুষতন্ত্রের সঙ্গে একীভূত করে

এঙ্গেলসের চিন্তা এক নতুন ধারার জন্ম দিল, যে ধারা পরবর্তীকালে নারীস্বাধীনতার তত্ত্বকে এক নতুন চিন্তনে উপনীত করবে। উনবিংশ শতকে এই ভাবনা সে-যুগের নারীবাদীদের খুব কিছু নাড়া দেয়নি যদিও।

এই আলোচনায় কালানুক্রম বজায় রাখা হয়নি, আগেই বলা হয়েছে। একটু পিছিয়ে গিয়ে আমরা আমেরিকায় সংঘটিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথায় আসছি। মূলত যাঁর উদ্যোগে সেনেকা ফলস্ কনভেনশন সম্ভব হয়েছিল তাঁর নাম এলিজাবেথ কোডি স্ট্যানটন। তাঁর কাজ নৈতিক সংস্কারের অঙ্গ হিসেবে দেখা হতে পারে, কিন্তু আমেরিকা তথা গোটা পৃথিবীর নারীবাদী ভাবনায় এবং আন্দোলনে স্ট্যানটনের অবদান স্মরণীয়।

ইংল্যান্ডের মতো আমেরিকাতেও স্ত্রীকে স্বামীর সব অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে হত, কেন না বিবাহিত জীবনে দৈহিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাদের কোনও আইনি নিরাপত্তা ছিল না।[৩১] মদ্যপানবিরোধী মহিলা সংগঠনগুলি স্বামীর মদ্যপ আচরণের বিরুদ্ধে স্ত্রীদের নিরাপত্তা দাবি করল এবং তার সঙ্গে দাম্পত্য জীবনে অত্যাচারিত হলে সেই বিবাহ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার অধিকারও। নারীর সঙ্গে ক্রীতদাসদের অবস্থানগত নৈকট্য ছিল খুব স্পষ্ট। তাই নারীর উপরে এবং ক্রীতদাসদের উপরে অত্যাচার আমেরিকান সংবিধানের বিরোধী বলে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা সরব হয়েছিলেন। যে মহিলারা ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করাকে নৈতিক কর্তব্য মনে করতেন, তাঁরা দেখলেন কেবলমাত্র নারী বলে কর্তব্য পালন থেকে তাঁদের বিরত থাকতে হচ্ছে। গ্রিমকে ভগিনীদের কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁদের মতোই স্ট্যানটন যোগ দিলেন ক্রীতদাস মুক্তি আন্দোলনে। কিন্তু, বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ স্ট্যানটন দেখলেন, তাঁকে এবং অন্যান্য মহিলা আন্দোলনকারীদের বাদ দিয়েই ১৮৪০ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দাসপ্রথা বিলোপ সম্মেলন। যাঁরা এই সম্মেলনে মহিলাদের ডাকতে চেয়েছিলেন, তাঁদের প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে।

এই অপমান এবং স্ট্যানটনের ব্যক্তিগত পারিবারিক চাপজনিত বীতরাগ থেকে জন্ম নিয়েছিল পৃথিবীর প্রথম নারীবাদী সম্মেলন সংগঠিত করার প্রেরণা। ১৮৪৮ সালে অনুষ্ঠিত হল 'সেনকো ফলস্ কনভেনশন'। স্ট্যানটন বলেছিলেন, এই সম্মেলন 'এমন এক বিদ্রোহের সূচনা ঘটাল যার সমতুল্য কোনও কিছু পৃথিবী দেখেনি।'[৩২] সম্মেলনে নিমন্ত্রিত ছিলেন সমস্ত সাফ্রাজেট[৩৩] নারীরা এবং আগ্রহী পুরুষরা। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে সাধারণ সব মানুষই যোগ দিতে পারবেন এই ঘোষণা করা হয়।[৩৪]

মূল ভাষণে স্ট্যানটন বলেন, যতক্ষণ তোমরা ক্ষমতা আর কামুকতার জাঁতাকলে মায়েদের পিষবে, ততক্ষণ তাদের কাছে জ্ঞান বা মহত্ত্ব আশা কোরো না। এই সম্মেলনেই আমেরিকার 'ডিক্ল্যারেশন অব ইনডিপেনডেনস'-কে খানিকটা ব্যঙ্গ করে রচিত হল নারীর স্বাধীনতা ঘোষণার দলিল: "ডিক্ল্যারেশন অব সেনটিমেন্টস অ্যান্ড রেসল্যুশনস।"[৩৫] অনেক ঐতিহাসিক বলেন, 'সেনকো ফলস্ কনভেনশন' হল নারীবাদী আন্দোলনের 'প্রথম লহরী'— 'ফার্স্ট ওয়েভ'— যা শুরু হয়েছিল নারীর ভোটাধিকারের, বা 'সাফ্রেজ'-এর দাবি দিয়ে। বস্তুত এই সম্মেলনের ঘোষণা থেকেই আমেরিকার সাফ্রেজ আন্দোলনের সূচনা।

ভোটাধিকার অর্জনের লড়াই বিনা ঘোষণায় ১৮৩২ সালে শুরু করেছিলেন মেরি স্মিথ। তিনি পার্লামেন্টের কাছে আবেদন করেন, সম্পত্তির অধিকারী সব নারীকেই ভোটাধিকার দেওয়া হোক। পার্লামেন্ট তাঁর কথা হেসে উড়িয়ে দেয়। ১৮৬৫ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে ভোটাধিকারের দাবি আদায়ের আন্দোলন সংগঠিত করার জন্যে একটি অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়। এই আন্দোলন ক্রমশ লন্ডন, বার্মিংহাম ও ব্রিস্টলে ছড়িয়ে পড়ে। লিডিয়া বেকারের লেখা একটি পুস্তিকা ১০ হাজার কপি ছেপে বিলি করা হয় সর্বত্র। ১৮৮৯ সালে এমেলিন প্যাঙ্কহার্স্ট গঠন করেন 'উইমেনস ফ্র্যানচাইজ লিগ'। ১৮৯৭ সালে মিলিসেন্ট ফসেট, 'ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব উইমেনস সাফ্রেজ' গঠন করেন। মিলিসেন্ট শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বিশ্বাস করতেন। তিনি ধৈর্য ধরে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে ভোটাধিকার অর্জনের আশা রাখতেন। ১৮৬৯ সালে নারীরা ইংল্যান্ডে পৌরসভায় ভোটাধিকার পেয়েছিলেন। তার পরে স্কটল্যান্ডেও সেই অধিকার পান মেয়েরা। ১৮৮০ সাল থেকেই এমেলিন প্যাঙ্কহার্স্ট ধৈর্য সহকারে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে পার্লামেন্টের সদস্যদের নানা ভাবে বুঝিয়ে নারীর ভোটাধিকার অর্জনের প্রচেষ্টায় ব্রতী ছিলেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা স্বভাবতই ব্যর্থ হয়েছিল।

১৯০৩ সালে ডাক দেওয়া হয় সরাসরি আন্দোলনের। নীতি হল, 'কথা নয়, কাজ'। ১৯০৮ সালে এমেলিন গ্রেপ্তার হলেন দাঙ্গাবাজির অভিযোগে। শাস্তি ছ'সপ্তাহের নিঃসঙ্গ কারাবাস। পরবর্তী দীর্ঘ আন্দোলনের দিনগুলোতে বহু মহিলাকে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে যেতে হয়।

১৯০৬ সালে তিন শতাধিক নারী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হেনরি ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যানের কাছে লক্ষাধিক সাফ্রাজিস্ট নারী-পুরুষের প্রতিনিধি হিসেবে দৌত্য নিয়ে আসেন ভোটাধিকারের দাবিতে। ব্যানারম্যান তাদের দাবির সঙ্গে ঐকমত্য জানান। কিন্তু এও বলে দেন যে তিনি কিছু করতে পারবেন না। উপদেশ দেন, নারী জাতির স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য সহকারে 'জ্বালাতন' করা চালিয়ে যেতে।[৩৬] তাঁর এই উক্তিতে শ্রোতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। লিটন স্ট্র্যাচি লিখলেন, এই মূর্খ মন্তব্য এক বিরাট বিদ্রোহের জন্ম দিল।[৩৭]

সাফ্রাজেটদের কাছে স্পষ্ট হল, নরমপন্থায় কাজ হবে না। সকলকে চমকিত করে তাঁদের দাবি সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে। সকলেই যে এই পদ্ধতি মানতেন তা নয়। দুটি স্পষ্ট বিভাজন দেখা দিল। মিলিসেন্ট গ্যারেট ফসেট-এর নেতৃত্বে 'ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব উইমেনস সাফ্রেজ সোসাইটিজ' জঙ্গি আন্দোলনের পক্ষ নিল। এমেলিন ও সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্টের নেতৃত্বে 'উইমেনস সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিকাল ইউনিয়ন' আইনি পথে চলতে চাইল। এমেলিনরাও অবশ্য প্রচারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেন।

১৯০৮ সালে তিন শতাধিক মহিলা গ্রেপ্তার হলে সাফ্রাজেটরা সরাসরি হিংসাত্মক পদ্ধতি নিতে বাধ্য হলেন। বারে বারে এমেলিন গ্রেপ্তার হন। জেলে এমেলিন দশ বার অনশন ধর্মঘট করেন। ১৯১১ সালে আন্দোলন আরও জঙ্গি হয়ে উঠল। পাথর থেকে শুরু করে আগুনে বোমা ছোড়া চলল, টেলিফোনের তার কেটে, বাক্স ভেঙে, চিত্রপ্রদর্শনীতে ছবি নষ্ট করে, সরকারি ভবনগুলিতে বোমা ছুড়ে, মেয়েরা সারা দেশ তোলপাড় করে তুললেন।

যে সাফ্রাজেটরা গ্রেপ্তার হতেন, জেলে তাঁদের অনশন ধর্মঘট ভাঙার জন্য জোর করে খাওয়ানো চলত। সেই অত্যাচারের বিবরণ সংবাদপত্র মারফত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পার্লামেন্টে সদস্যরা প্রতিবাদ করেন। ১৫০-এর বেশি স্থানীয় কাউন্সিল ভোটাধিকার দেওয়ার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯১০ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে ভোটাধিকারের পক্ষে শক্তিশালী জনমত তৈরি হয়।

১৯১০ আর ১৯১৩ সালে জনমতের চাপে নারীর ভোটাধিকার প্রসঙ্গে দুটি খসড়া প্রস্তাব আনা হয়। দু'বারই পার্লামেন্ট তা নাকচ করে। ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লয়েড জর্জের বাড়ি বোমায় উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হয়। জুন মাসে এমিলি উইলড়িং ডেভিসন রাজার ঘোড়ার সামনে ঝাঁপ দিলে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনিই সাফ্রাজেট আন্দোলনের প্রথম শহিদ। নভেম্বর মাসে পার্লামেন্টের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে আসেন সাফ্রাজেটরা। পুলিশ তাদের থামাতে চেষ্টা করলে ছ'ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ চলে। পুলিশের হাতে বহু নারী নিগৃহীত হন। সারা দেশ এই আক্রমণের বিরুদ্ধে সরব হয়।

১৯১৮ সালে রিফর্ম বিল শেষ অবধি তিরিশ বছরের অধিক বয়সি নারীর ভোটাধিকারের দাবি স্বীকার করে নেয়। এই স্বীকৃতির পিছনে একটি বড় ভূমিকা পালন করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। কিন্তু নারীরা যদি জোটবদ্ধ এবং আক্রমণাত্মক আন্দোলন না চালাতেন, তা হলে এই অধিকার অর্জন হতে অনেক বেশি সময় লাগত সন্দেহ নেই।

১৯১৮ সালের আগে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছিল নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যান্ড এবং সোভিয়েত রাশিয়ায়।

এর পরে বিভিন্ন দেশে নারীরা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নেবার অধিকার পেতে থাকেন। কানাডা, লুক্সেমবুর্গ, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, জার্মানি, পোল্যান্ড, সুইডেন, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে মেয়েদের ভোটাধিকার আসে। আমেরিকায় মেয়েরা ভোটাধিকার পান ১৯২০ সালে। ১৯২৮ সালে ইংল্যান্ডে একুশ বছর বয়সি মেয়েরা ভোটদানের অধিকার পান।

নারীবাদী আন্দোলনের গোড়াপত্তনের মুহূর্তে, স্বতন্ত্র সামাজিক বর্গ হিসেবে নারীর ন্যূনতম অধিকার অর্জনের জন্যে রাষ্ট্রশক্তির মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস দেখানোর ফলে অবর্ণনীয় দমন-নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল পথিকৃৎদের। যদিও, আজও, সর্বত্র প্রতিবাদী মেয়েদের উপরে আক্রমণের হিংস্র চেহারা একথা স্পষ্ট করে যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চেতনা বদলায়নি।

ঊনবিংশ শতকের অন্তিমে এবং বিংশ শতকের গোড়ায় নারীর ভোটাধিকার অর্জনের আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুরুষতন্ত্রের দমননীতির একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। সময়টা বাছা হয়েছে এই নিবন্ধের বিষয়ের কথা মাথায় রেখে। নইলে, সেই প্রাচীন যুগ থেকে, ইউরোপীয় নবজাগরণের দিনগুলোর মধ্যে দিয়ে ঊনবিংশ শতকে এমন উৎপীড়নের অজস্র ঘটনার কথা বলা যায়। উল্লেখ করা যায় ডাইনি শিকারের ভয়ংকর সব কাহিনি, যে ডাইনি শিকারকে বলা হয়েছে 'মুক্ত নারীদের পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করার অন্যতম প্রচেষ্টা।'[৩৮] উল্লেখ করা যায় মার্গারেট পোরেতকে পুড়িয়ে মারার কথা। তাঁর অপরাধ ছিল ভ্রাম্যমান এক নারী সম্প্রদায় 'বেগেন'-এর সদস্য হয়ে, *দ্য মিরর অব দ্য সিমপল সোলস* নামক পুস্তকে, সব

সামাজিক অনুশাসন উপেক্ষা করে ধর্মীয় রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে কথা বলা।[৩৯] জোন অব আর্কের মৃত্যু কি কেবল রাজনৈতিক ঘটনা?

সাফ্রাজেট মেয়েরা গ্রেপ্তার হলে জামিন নিতেন না। সে সময়ে রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে স্বীকৃতি এবং জেলে তাঁদের সঙ্গে মানবিক আচরণের দাবিতে ১৯০৯ সালে প্রথম অনশন ধর্মঘট করেন ম্যারিয়ন ওয়ালেস ডানলপ। সরকার তাঁর দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

প্রথম প্রথম অনশনকারীদের জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করা হত। ১৯১২ সালে মেরি লে নামক একজন বন্দি লিখেছেন, "চার জন মহিলা ওয়ার্ডার আমাকে চেপে ধরল একটা টেবিলের উপর। তারপর একজন ডাক্তার একটা দু'ফুট পাইপ আমার গলার মধ্যে দিয়ে পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। আমার গলায় এবং বুকে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল, কান ফেটে যাবে মনে হচ্ছিল। একটা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে সেই ডাক্তার নল দিয়ে দুধ আর ডিমের গোলা আমার পেটে চালান করতে লাগল। খানিক বাদে ডাক্তারের মনে হল, খাবার ঠিকমতো নামছে না। তখন সে আমার নাক টিপে ধরে গলাতে চাপ দিতে লাগল। সমস্ত গোলাটা পেটে ভরে দেবার পর একবার আমার হৃৎস্পন্দন পরীক্ষা করে তারা বেরিয়ে গেল অন্য কাউকে জোর করে খাওয়াতে। এর ফলে আমার কানে, গলায়, বুকে অসহ্য যন্ত্রণা হতে থাকে।"[৪০] এই জাতীয় ঘটনাগুলির কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়ে পড়ায় মানুষের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। কিন্তু পার্লামেন্টে বসে খবর শুনে সদস্যরা হাসিতে ফেটে পড়েন।

জনমতের চাপে এর পর হেনরি হারবার্ট অ্যাসকুইথের সরকার অন্য কৌশল নেয়। ব্যবহার করা হয় কুখ্যাত 'বেড়াল ইঁদুর আইন', যার আসল নাম ছিল 'প্রিজনারস (টেমপোরারি ডিসচার্য ফর ইল হেল্‌থ) অ্যাক্ট' ১৯১৩। এই আইনের জোরে পরবর্তীতে, কোনও 'সাফ্রাজেট' মহিলা অনশন করলে তাঁকে চূড়ান্ত দুর্বল হয়ে না পড়া পর্যন্ত অনাহারে থাকতে দেওয়া হত এবং তারপর ছেড়ে দেওয়া হত যখন বাইরে বেরিয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার মতো কোনও ক্ষমতাই আর থাকত না। সুস্থ হলেই, তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করা হত।

সাফ্রেজ আন্দোলনের বিরোধিতাও অবশ্য করেছিলেন কয়েক জন নারী। তাঁদের মধ্যে গ্রেস ডাফেল্ড গুডউইনের কথা উল্লেখযোগ্য। তাঁর বক্তব্য ছিল, নারী ভোট দিতে গেলে মাতৃত্ব, পারিবারিক শান্তি তো নষ্ট হবেই, সঙ্গে সঙ্গে গোটা সামাজিক কাঠামোও ভেঙে পড়বে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে নারীবাদীদের বহু দাবি বাস্তবায়িত হয়েছিল, একথা অনস্বীকার্য। সমস্ত স্তরে মেয়েদের জন্যে শিক্ষার সুযোগ অনেক বেড়ে যায়। যদিও তখনও সেই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল উপযুক্ত 'বউ' তৈরি করা। কিন্তু একথা ঠিক যে শিক্ষা আর পুরুষের সার্বভৌম এলাকা ছিল না। সামাজিক অবস্থান বিশেষ না বদলালেও, জীবিকার ক্ষেত্রে অনেক পথ মেয়েদের কাছে সুগম হয়েছিল। তখনও মনে করা হত মেয়েরা বেশি লেখাপড়া করে চাকরি করলে তাদের নারীসুলভ গুণাবলি হ্রাস পায়। মেয়েরা অনেক রকমের আইনি স্বাধীনতাও অর্জন করতে পেরেছিল। 'কভারচার' (Coverture) আইন অনুযায়ী স্বামীকে

বাদ দিয়ে নারীর কোনও আইনি অস্তিত্ব ছিল না। মধ্য-উনবিংশ শতকে বিবাহিত নারীরা সম্পত্তির উপরে অধিকার অর্জন করেছিল, নিজের রোজগার আর তাকে স্বামীর হাতে সমর্পণ করতে হত না। বিবাহ ভেঙে গেলে মা সন্তানকে নিজের কাছে রাখার পক্ষে আইনি সমর্থন পেয়েছিলেন। স্বামীর দ্বারা দৈহিক নির্যাতনের বিরুদ্ধেও খানিকটা নিরাপত্তা পাওয়া যাচ্ছিল। নারীর উপরে পুরুষের স্বেচ্ছাচারী যৌন অধিকার অনেকটাই খর্ব হয়েছিল। ১৮৯০-এর দশকে আবির্ভাব 'নতুন নারী'র, যে শিক্ষিত, অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় ও চিন্তায় মুক্ত। মেয়েরা সব কাজেই এগিয়ে আসছিল। বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত নারীরা নিজেদের সংগঠিত করে তুলছিলেন। ইংল্যান্ডে 'উইমেনস কোঅপারেটিভ গিল্ড' এর সদস্য সংখ্যা তখন ছিল ১৪ হাজারের বেশি। আরও অন্যান্য সংগঠন সচেতন ভাবে 'নারীবাদী' না হলেও, প্রচার করা, সংগঠিত হয়ে ওঠা, চাঁদা তোলা আর বাগ্মিতায় সুপটু বহু নারীর জন্ম দিয়েছিল। মেয়েরা দেখিয়ে দিচ্ছিলেন, স্বামী সংগ্রহ এবং সংসার চালানোর চাইতে আরও অনেক বেশি কিছু করার ক্ষমতা রাখেন তাঁরা।[৪১]

পুরুষতন্ত্র নারীর স্বাধীনতার লড়াইকে কোনও দিনই সম্ভ্রম দেখায়নি। যে স্বাধীনতা নারী অর্জন করেছে, তা আবার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা আজও অব্যাহত। নারীবাদীদের প্রথম থেকেই অসচ্চরিত্র ও সমকামী বলা হয়ে আসছে। ১৯০১ সালে আমেরিকান মনস্তত্ত্ববিদ উইলিয়াম লি হাওয়ার্ড একটি উপন্যাস লিখে বলেন, নারীবাদীরা বিকৃতকামী। ১৯১১ সালে এডওয়ার্ড কার্পেন্টার নারীবাদীদের নিন্দা করেন পুরুষালি বলে। জার্মানিতে ড. এবেরহার্ড ১৯২৭ সালে দাবি করেন নারীবাদে নিহিত সমকামিতা পশ্চিমি সভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনবে।[৪২] এই জাতীয় ভাবনা এখনও বহুল প্রচার পেয়ে থাকে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় নারীবাদী আন্দোলনের যে শক্তিশালী রূপ মানুষের সামনে প্রকাশিত হয় তা পরবর্তীতে এক বিরাট স্রোতের জন্ম দিয়েছে যা আজ নতুন, বহুধাবিস্তৃত, আত্মসচেতন একটি স্বতন্ত্র জীবনচর্যার পত্তন ঘটিয়েছে। সমাজে আজ আর এমন কোনও দিক নেই, যেখানে নারীবাদী চিন্তন নিজের জায়গা করে নেয়নি। সমান অধিকারের দাবি, নবগঠিত বিভিন্ন নারী সংগঠন, নারী শিল্পী, আলোকচিত্রী এবং বিভিন্ন পেশায় নারী কর্মীদের স্বচ্ছন্দ প্রবেশ সমাজের পিতৃতান্ত্রিকতার দুর্গের দরজা ভেঙে দিয়েছে সারা পৃথিবীতে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সব ধরনের কাজেই মেয়েরা জায়গা করে নিতে পেরেছিলেন। পুরুষ অধ্যুষিত সমস্ত পেশাতেই নারীরা সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সর্বজনস্বীকৃত হল নারীকেন্দ্রিক বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ এবং চিন্তাভাবনা। প্রায় সারা পৃথিবীর সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রতিটি এলাকায় এই স্বীকৃতি পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকায় এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন নিয়ে এল। গৃহকর্মের গণ্ডি ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বের কর্মজীবনে অংশগ্রহণকারী নারীর সংখ্যা ১৯২০-র দশকের পর থেকে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বর্তমানের চিত্র আরও অনেক আশাপ্রদ।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নারীরা সব চাইতে বেশি সক্রিয় ছিলেন লেখক ও শিল্পী হিসেবে। যত দিন গেল, নারীদের রচিত সাহিত্যে বিষয় এবং শৈলীতে আরও বিরাট পরিবর্তন

দেখা দিল। চিত্রকল্পে এবং বিষয়বস্তুতে নারীর প্রাধান্য ইতিপূর্বের নারীর চিরাচরিত ভূমিকাকেও সম্পূর্ণ অন্য মাত্রা দিতে সক্ষম হল। বিভিন্ন পুরুষ লেখকরাও পুরুষ দৃষ্টিকে (Male gaze) ত্যাগ করতে লাগলেন এবং নারীর মন, শরীর, সামাজিক অবস্থানকে নতুন আলোয় উপস্থাপিত করতে লাগলেন। নারী নিজের অস্তিত্বকে রূপান্তরিত করতেও অনেকাংশে সফল হল।

নারীবাদ আজ বহুমুখী। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, তাত্ত্বিক, দার্শনিক— পশ্চিমি দুনিয়ায় এই সব জগতেই নারীবাদ একটি বিশেষ জীবনচর্যার রূপ নিতে পেরেছে।

বিংশ শতাব্দীকে নারীবাদী তত্ত্বের উদ্ভব ও প্রসারের যুগ বলা যায়। এই তত্ত্ব নারীবাদকে তাত্ত্বিক-দার্শনিক সুগঠিত ভাবনায় রূপান্তরিত করেছে। নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, মনঃসমীক্ষণ (psychoanalysis), ইতিহাস, অর্থনীতি, মানবীবিদ্যাচর্চা, সমালোচনা সাহিত্য এবং দর্শন ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে নারীবাদী বিশ্লেষণকে নানা ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। এইসব তত্ত্বই লিঙ্গবৈষম্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ, নারীর অধিকার, লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতাবিন্যাস এবং যৌনতার চরিত্র নির্ধারণে নারীর নিজস্ব জগৎকে প্রাধান্য দিয়ে আলোচনা চালিয়েছে। দেখিয়েছে কীভাবে শিল্পে, সাহিত্যে নারীর এক ছকে বাঁধা অস্তিত্বকে স্থায়িত্ব দেবার চেষ্টা হয়েছে, কীভাবে নারীর যৌনতাভিত্তিক পণ্যায়ন ঘটেছে। সব চাইতে বড় কথা, পিতৃতন্ত্রের চরিত্র, ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ নিয়ে গবেষণা চালিয়েছে নারীবাদী তত্ত্ব। নারীবাদী তত্ত্বের রূপায়ণ ঘটেছে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়।

অংশুমান কর

বিংশ শতাব্দীর নারীবাদী সাহিত্যসমালোচনা: একটি রূপরেখা

১৯৯৮ সালে প্রকাশিত থিয়োরির একটি হ্যান্ডবুকে (*Literary Theory: An Anthology*) জুলি রিভকিন আর মাইকেল রায়ান নারীবাদ এবং তার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের সম্পর্ক নিয়ে চমৎকার একটি মন্তব্য করেছিলেন। তাঁরা লিখেছিলেন:

> If the student of literature in the early 1970s was moved to ask why is there not a *feminist* criticism, the student of literary theory in the late 1990s might well be moved to shift the emphasis and ask but why is there not *a* feminist criticism?

ছোট্ট এই মন্তব্যটি থেকেই স্পষ্ট 'নারীবাদ' বললে নির্দিষ্ট করে একটিই তত্ত্বকে বোঝানোর যুগ আমরা পেরিয়ে এসেছি। নারীবাদী তাত্ত্বিক একাধিক। ভিন্ন ভিন্ন তাঁদের মতামত, কখনও কখনও পরস্পরবিরোধীও। এ কারণেই সম্ভবত মারিয়েন হার্স আর ইভলিন ফক্স কেলার ১৯৯০ সালে প্রকাশিত তাঁদের বইয়ের নাম রেখেছিলেন *Conflicts in Feminism*। নারীবাদ আজ আর এক নয়, নারীবাদ বহু। তাই স্যান্ড্রা কেম্প আর জুডিথ স্কোয়ারস-এর সম্পাদিত একটি বইয়েরও নাম হয়ে যায় *Feminisms* (১৯৯৭)। এই এক থেকে 'বহু' নারীবাদে উত্তরণের প্রক্রিয়াটি শুরু এবং শেষ হয়েছে আগের শতাব্দীতেই। এই প্রবন্ধে নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনার অভ্যন্তরে বিংশ শতাব্দীতে ঘটে যাওয়া বহুমুখী এবং বহুবিধ পরিবর্তনগুলিরই একটি রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় এ রকম বেশ কয়েকটি আলোচনা রয়েছে। সেগুলিতে first wave, second wave, third wave বা নারীবাদী সাহিত্যসমালোচনার প্রথম তরঙ্গ, দ্বিতীয় তরঙ্গ, তৃতীয় তরঙ্গ— এভাবে নারীবাদের বিবর্তনকে অঙ্কনের চেষ্টা হয়েছে। এই বিভাজন পাঠক-বান্ধব হলেও নারীবাদের জটিল ক্রমবিবর্তনকে সামগ্রিকতার নিরিখে বিচার করতে সম্পূর্ণ সক্ষম— এমনটা বলা যাবে না। সে পথে তাই এ লেখা হাঁটবে না।

বিংশ শতাব্দীতে নারীবাদী সাহিত্যসমালোচনার বিবর্তনের যে কোনও আলোচনাই যাঁকে নিয়ে শুরু হওয়া উচিত তিনি ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌। উল্‌ফ্‌ যে অত্যন্ত সফল এবং নতুন ধারার একজন ঔপন্যাসিক ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন এক প্রকৃত চিন্তক। মেয়েদের সমস্যা সংক্রান্ত তাঁর লেখালেখি নিয়ে পরবর্তী সময়ে অন্য সমালোচকরাও নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক করেছেন। এতটাই প্রভাবশালী এবং গভীর ছিল উল্‌ফ্‌-এর পর্যবেক্ষণ যে এই ২০০০ সালেও উল্‌ফ্‌কে বাতিল করা যায় না। দুটি গ্রন্থের জন্য নারীবাদের অঙ্গনে উল্‌ফ্‌ আজও জীবন্ত। তার প্রথমটি, *A Room of One's Own* প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৯ সালে। তুমুল জনপ্রিয় এই বইটি বাংলা সহ অন্যান্য নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বইটি উল্‌ফ্‌ লেখেন ১৯৩৮ সালে। নাম *Three Guineas*। যে সময় উল্‌ফ্‌ এই বই দুটি লিখেছেন সে সময় গোটা পৃথিবী জুড়েই প্রয়োজনীয় বেশ কিছু অধিকার মেয়েদের দেওয়া হয়নি। মাতৃত্ব-ভাতা থেকে ডিভোর্সের নিয়মকানুনের পরিবর্তন নিয়ে তাই যেমন উল্‌ফ্‌কে কথা বলতে হয়েছে, তেমনই মহিলাদের জন্য কলেজ, মেয়েদের নিজস্ব ম্যাগাজিন-খবরের কাগজ প্রকাশের দাবিও তাঁকে তুলতে হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর আগের শতকের অনেক নারীবাদী তাত্ত্বিকদের মতোই উল্‌ফ্‌কে অনেকটাই ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল মেয়েদের প্রতিদিনের জীবনের একান্ত বস্তুবাদী সমস্যাগুলি নিয়েই। তাই হয়তো পরবর্তী সময়ে নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা মেয়েদের সমস্যাগুলির জটিল দর্শনগত ব্যাখ্যা (যা কখনও কখনও বা খানিকটা অ্যাবস্ট্রাক্ট, খুব বেশি থিয়োরি-নির্ভর) যেভাবে দিয়েছেন, উল্‌ফ্‌ ঠিক সেভাবে দেননি। বরং অনেক বেশি জোর দিয়েছেন সামাজিক-অর্থনৈতিক লিঙ্গ-সাম্য প্রতিষ্ঠার ওপর। নিজে ছিলেন একজন মহিলা লেখক, মহিলা লেখকদের সমস্যা নিয়েও তাই কথা বলেছেন তিনি। বলেছেন মহিলারা যখন কলম হাতে তুলে নিচ্ছেন তখন পুরুষদের সমস্যার সঙ্গে কোনও তুলনামূলক বিচারের মাপকাঠিতে নয়, মহিলাদের সমস্যা নিয়ে তাঁরা কথা বলুন সেগুলিকে একান্তভাবে মেয়েদের সমস্যা হিসেবে বিচার করেই। এ কাজে অবশ্য বাধা অজস্র। প্রথম দুটি বাধাই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক। অনেক ক্ষেত্রেই একজন লেখক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য যে পাঠঅভিজ্ঞতা প্রয়োজন, মেয়েরা তা থেকে বঞ্চিত হন। উল্‌ফ্‌ যেমন আক্ষেপ করেছেন তাঁর ভাইদের শেখানো হলেও, তাঁকে গ্রিক ভাষাটি শেখানো হয়নি। পুরুষতন্ত্রের প্রতাপ এমনই! মহিলা লেখকদের সমস্যা নিয়ে উল্‌ফ্‌-এর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ হল 'Professions for Women'। উল্‌ফ্‌-এর নিজের সাহিত্যজীবন, এই প্রবন্ধে উল্‌ফ বলেছেন, পূর্ণতা পায়নি মূলত দুটো কারণে। ভিক্টোরিয়ান সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্র এবং ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে মহিলাদের সম্পর্ক নিরূপণ করতে গিয়ে মহিলাদের গৃহবন্দি করেছিল সুকৌশলে। মহিলা মানেই 'গৃহলক্ষ্মী'— 'Angel in the House'— এমন একটা ধারণা সমাজের মূল পর্যন্ত চারিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অন্যান্য মহিলা লেখকদের মতোই 'এটা করা যাবে' আর 'এটা করা যাবে না'— বিধিনিষেধের এই লক্ষ্মণগণ্ডি অতিক্রম করে নিজস্ব লিখনভঙ্গি অর্জন করতে বেশ কষ্ট করতে হয়েছিল উল্‌ফ্‌কে। যে সময়ে বেড়ে উঠছেন উল্‌ফ্‌ সে সময়ে যৌনতা, বিশেষত মেয়েদের শরীর

এবং বাসনা সংক্রান্ত যে কোনও শব্দই ছিল নিষিদ্ধ। সমসাময়িক পুরুষ লেখকরা যেসব বিষয়ে দ্বিধাহীন ভাবে লিখতে পারতেন (একবার স্মরণ করুন ডি. এইচ. লরেন্সের সাহসী উপন্যাসগুলি) সেখানে একজন মহিলা লেখক ওই সব বিষয়ে হয় কথা বলছেনই না, নয়তো কথা বলছেন চুপিসাড়ে, ফিসফিস করে। আসলে তাঁরা কথা বলতে চাইলেও সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হয়ে উঠছে সমাজই। উল্‌ফ্ তাই মনে করতেন একজন মহিলা লেখক একজন পুরুষ লেখকের চাইতে পৃথকভাবে লিখতে বাধ্য হন কারণ সমাজে তাঁর অবস্থানটি পুরুষ লেখকের অবস্থানের থেকে আলাদা। মহিলাদের 'মহিলা' করে তোলে আসলে সমাজই— একথাও বলেছিলেন উল্‌ফ্। বলে কয়েক বছর পরেই বোভোয়া যে কথা বলবেন তাকেই সমর্থন জানিয়ে গিয়েছিলেন।

পুরুষতন্ত্রের এই সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে কীভাবে পরিত্রাণ সম্ভব? উল্‌ফ্-এর সমাধানটি বেশ নতুন এবং বিতর্কসঞ্চারী। 'Feminist'— এই শব্দটিতে খুব বেশি আস্থা ছিল না উল্‌ফ্-এর। ব্লুমসবেরি গ্রুপের আদর্শ 'androgyny'কেই বরং আঁকড়ে ধরেছিলেন তিনি। স্বপ্ন দেখেছিলেন এমন এক সমাজব্যবস্থার যা হবে 'androgynous'— উভলিঙ্গ উল্‌ফের এই অবস্থানকে পরবর্তীকালে কড়া সমালোচনায় বিদ্ধ করেছেন আমেরিকান তাত্ত্বিক এলেন শোঅল্টার। তাঁর মত— উভলিঙ্গসমাজের কল্পনা করে উল্‌ফ্ আসলে লড়াইয়ের ময়দান থেকে পালিয়েই এসেছেন। পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে একবগ্গা লড়াই চালানোর পরিবর্তে উল্‌ফ্ নিয়েছেন নরম এক অবস্থান— মহিলা এবং পুরুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী এক ব্যালেন্সের খেলা খেলতে চেয়েছেন তিনি। টোরিল মই অবশ্য শোঅল্টারের এই মত মেনে নেননি। দুই লিঙ্গের মধ্যে ব্যালেন্সের খেলা খেলতে উল্‌ফ্ চাননি। মই মনে করেছেন 'androgyny'-র ধারণা দিয়ে উল্‌ফ্ আসলে চেয়েছেন লিঙ্গ-সচেতনাকেই সম্পূর্ণ অতিক্রম করে যেতে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে androgynous সমাজ লিঙ্গসাম্যের সমাজ নয়, বরং লিঙ্গ-উত্তীর্ণ এক সমাজ। আসলে পুরুষতন্ত্রের মোকাবিলায় কোনও জঙ্গি নারীবাদে ঠিক আস্থা ছিল না উল্‌ফ্-এর। তিনি চাননি নারীবাদ হয়ে উঠুক মেল শভেনিজমের উলটোপিঠ।

উল্‌ফ্-এর পর দ্বিতীয় যে নামটি বিংশ শতাব্দীর নারীবাদের আলোচনায় চলে আসে তা হল সিমোন দ্য বোভোয়া। বোভোয়ার *The Second Sex* বইটি প্রকাশ পায় ১৯৪৯ সালে। বিপুল প্রভাবশালী এই বইটিকে আজও কেউ কেউ মনে করেন নারীবাদের 'বাইবেল'। ব্যাপ্তিতে, গভীরতায় এই বইটি আজও অনন্য। বাইবেল, ক্লাসিকাল মিথ থেকে সাম্প্রতিকতম সাহিত্য কিছুই বাদ যায়নি বোভোয়ার আলোচনায়। মনে রয়ে গেছে সেই কথাটিই যে সমাজের কেন্দ্রে পুরুষ, প্রান্তে নারী। বইটির শুরুতেই বোভোয়া লিখছেন:

> A man would never set out to write a book on the peculiar situation of the human male. But if I wish to define myself, I must first of all say: 'I am a woman'...(p. 15)

বোভোয়া আক্ষেপের সঙ্গে আরও লিখেছেন পুরুষ কখনও একটি বিশেষ লিঙ্গের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে পরিচিত করে না। তাকে বলতে হয় না— 'I am a man'। বলতে হয় না, কারণ সমাজ পুরুষতান্ত্রিক, তার কেন্দ্রে পুরুষ। পুরুষই যেন মাপকাঠি, যে মাপকাঠিতে ফেলে স্থির করা হয় প্রান্তিক নারীর লিঙ্গ:

> She is defined and differentiated with reference to man and not he with reference to her; she is the incidental, the inessential as opposed to the essential. He is the Subject, he is the Absolute— she is the Other. (p. 16)

জীববিদ্যা থেকে মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস থেকে মিথ ঘেঁটে বোভোয়া প্রমাণ করতে চেয়েছেন তাঁর সিদ্ধান্ত ভুল নয়। আদমের নিঃসঙ্গতা কাটাতেই ঈশ্বর তৈরি করেছিলেন ইভকে। বিভিন্ন সময়ে সাহিত্যে, পুরাণে, সাধারণ ধারণায় নারীকেও দেখা হয়েছে হয় ভার্জিন মেরি নয়তো ইভ হিসেবে। বোভোয়া লিখলেন, "She is healing presence and sorceress; she is man's prey, his downfall, she is everything that he is not and that he longs for, his negation and his *raison d'être* (p. 175)"

বই হিসেবে *The Second Sex* অবশ্য কেবলই অতীতচারী নয়। পাঁচ বিখ্যাত কবি-লেখকের রচনা বিশ্লেষণ করে তিনি নারীদের প্রতি এঁদের দৃষ্টিভঙ্গিও কতখানি লিঙ্গ-বৈষম্যের সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাই দেখাতে চেয়েছেন। মনথারল্যান্ট, লরেন্স, ক্লডেল, ব্রেঁতো আর স্টেনডাল— বোভোয়ার ক্ষুরধার লেখনীর শিকার হয়েছেন এঁরা সকলেই। অবশ্য *The Second Sex* বইটির মূল কৃতিত্ব নিহিত অন্যত্র। এই বইটিতেই প্রথম বোভোয়া 'sex' এবং 'gender' এই দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট করে দেখান। পুরুষ এবং নারীর মধ্যে sexual difference বা যৌন পার্থক্য স্বাভাবিক জীববিজ্ঞানের নিয়ম— এটি সম্পূর্ণ ভাবেই biological। নারী-পুরুষের লিঙ্গ পার্থক্য কিন্তু স্বাভাবিক জৈবিক পার্থক্য নয়— এটি বরং সমাজ-সংস্কৃতি নির্মিত। বোভোয়া যা বলতে চাইছিলেন সেটি অনেকটা এরকম— জন্মের সময় যে পার্থক্য নিয়ে শিশুদের জন্ম হয়, সে পার্থক্য নেহাতই যৌন পার্থক্য। ধীরে ধীরে সমাজই একটি ছোট্ট মেয়েকে 'নারী'-তে রূপান্তরিত করে। 'নারী' ধারণাটির সঙ্গে তাই নারী দেহটির যত না সংযোগ, তার চেয়ে অনেক বেশি সংযোগ সেই দেহটিকে কেন্দ্রে রেখে জন্ম নেওয়া আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিয়মকানুন, বিধিনিষেধের। 'নারী' হয়ে তাই কেউ জন্মায় না, এসবের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতেই মেয়েরা এক সময় 'নারী' হয়ে ওঠে। বোভোয়া লিখলেন:

> One is not born, but rather becomes, a woman. No biological, psychological, or economic fate determines the figure that the human female presents in society; it is civilization as a whole that produces this creature, intermediate between male and eunuch which is described as feminine. (p. 295)

বোভোয়ার বইটি নারীদের নিয়ে অনেক পুরনো ধারণা আর মিথকে যেমন আক্রমণ করেছিল, তেমনই লিঙ্গবৈষম্য আসলে সমাজনির্মিত— এই সত্যের উন্মোচনে বিশ্বাস জুগিয়েছিল সমকালীন ও পরবর্তীর অনেক নারীবাদী তাত্ত্বিক সমালোচকদের।

বোভোয়ার *The Second Sex* (১৯৪৯)-এর প্রায় ১৫ বছর পর ১৯৬৩ সালে গুরুত্বপূর্ণ যে বইটি আমেরিকায় প্রকাশ পায় তার নাম *The Feminine Mystique*। লেখক বেটি ফ্রাইডান। ফ্রাইডান কেবল একজন তাত্ত্বিক ছিলেন না, ছিলেন একজন সমাজকর্মীও। ১৯৬৬ সালে তিনি তৈরি করেছিলেন NOW বা National Organzation of Women। তাঁর বইতে ফ্রাইডান সাদা চামড়ার মধ্যবিত্ত আমেরিকান মহিলাদের হতাশা আর অসহায়তার ছবি আঁকেন। তাঁর বই আর সামাজিক কাজকর্মের তরঙ্গাভিঘাতে মেয়েদের সমস্যা আমেরিকার জাতীয় রাজনীতির আঙিনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। *Feminine Mystique*-এর কয়েক বছরের মধ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশিত হয়— পৃথিবী জুড়েই নারীবাদের চর্চা ক্রমশ অন্য এক মাত্রা নিতে থাকে। ১৯৬৮-তে প্রকাশ পায় মেরি এলম্যানের *Thinking About Women*। ১৯৭০-এ একই সঙ্গে জার্মেন গ্রিয়ারের *The Female Eunuch,* ইভা ফিজের *Patriarchal Attitudes* এবং শুলামিথ ফায়ারস্টোনের *The Dialectic of Sex*। ১৯৬৯ সালে, এরই মাঝে, প্রকাশ পায় কেট মিলেটের *Sexual Politics*। উল্‌ফ্‌ এবং বোভোয়ার পরে মিলেট তাঁর এই বইটি দিয়েই জোর ধাক্কা দেন পুরুষতন্ত্রকে। বিষয়ে, ভাষায়, আঙ্গিকে মিলেট এই বইতে অসম সাহসী। পুরুষতন্ত্রকে মিলেট দেখেছেন একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এক করে। ক্ষমতা এবং আধিপত্য, রাজনৈতিক সম্পর্কের মতোই, পুরুষ-নারীর সম্পর্কেরও মূলে প্রোথিত। পুরুষতন্ত্রের মাধ্যমে পুরুষ চায় ক্ষমতার নিগড় নিজের হাতে রাখতে। তাই প্রয়োজন হয় লিঙ্গ-নির্মাণের। নারীকে 'নারী' করে তোলার। নারীকে 'নারী' করে তোলার এই প্রক্রিয়ায় সমাজের অঙ্গ হিসেবেই অংশ নেয় পরিবারও; পুরুষের মতোই নির্দিষ্ট কতগুলো লিঙ্গ-নির্ধারক ভূমিকায় আজীবন অভিনয় করে যেতে নারীকে উৎসাহ জোগায় নারীরাও। আর এসব মিলেই গড়ে ওঠে মিলেট যাকে বলেছেন *Sexual Politics,* সেই লিঙ্গ-রাজনীতি।

লিঙ্গ-রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে মিলেট তাঁর বইতে স্পষ্ট কিছু কথা বলেছেন। সে সব কথায় যেমন উল্‌ফ বা বোভোয়ার মতো পূর্বসূরিদের ছায়া আছে কখনও কখনও, তেমনই কখনও আবার মিলেট আশ্চর্যজনক ভাবে নতুন। সামাজিক ভাবে নারীত্বের নির্মাণে যে সাহিত্যের জগতে পুরুষ-নির্মিত মূল্যবোধ এবং প্রথানুগতারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তা মিলেট স্পষ্ট করে দেখান। আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসেন 'পুরুষপাঠকের' ধারণাটিও। পুরুষ লেখক সাহিত্য রচনাই করেন যেন পুরুষপাঠককে সন্তুষ্ট করতে; পাঠকও তাঁর পুরুষ সত্তাকে জাগ্রত রেখেই সে সাহিত্যের স্বাদ নেন। এই সিস্টেমের বিপদ হল এটাই যে পুরুষপাঠকের জন্য পুরুষ-রচিত সাহিত্যে অভ্যস্ত হয়ে নারীও এক সময় নিজের সত্তা ভুলে পুরুষপাঠকের চোখ দিয়েই সাহিত্য আস্বাদ করতে থাকে। নারীপাঠক তখন জৈবিক ভাবে নারী, কিন্তু পাঠাভ্যাসে পুরুষ। নারীপাঠককে এই পুরুষপাঠক বানিয়ে তোলার

রাজনীতির বিরুদ্ধে, নারীপাঠকের চেতনাকে আঘাত করতেই সম্ভবত মিলেট তাঁর বইতে লরেন্স, মিলার, মেলার এবং জেনেটের মতো পুরুষ ঔপন্যাসিকদের রচনায় পুরুষতন্ত্রের প্রাধান্যকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। লরেন্সের মতো কারও কারও রচনায়, মিলেট বলেছেন, নারী, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, পর্যবসিত হয়েছে যৌন সামগ্রীতে। মিলেটের এই আক্রমণ এবং আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে কেবলমাত্র পুরুষ লেখকদের নির্বাচনকে অবশ্য ভাল ভাবে নেননি অনেকেই। বাস্তব এবং কল্পনার মধ্যে যে দোলাচলে নির্মিত হয় উপন্যাস, বর্ণিত বাস্তবকেই সম্পূর্ণভাবে উলটে দেওয়ার যে ক্ষমতা রাখে উপন্যাস, অনেকেই বলেছেন, সে কথা বিস্মৃত হয়েছেন মিলেট। কোরা কাপলান যেমন তাঁর একটি প্রবন্ধে ('Radical Feminism and Literature: Rethinking Millett's *Sexual Politics*' ১৯৭৯) এমনকী দ্বিচারিতার অভিযোগ তুলেছেন মিলেটের বিরুদ্ধে। পুরুষ-রচিত উপন্যাসে পুরুষতন্ত্রের যে প্রতিফলন তাকে মিলেট 'সত্য' বলে গ্রহণ করছেন, অথচ সেই একই উপন্যাসে নারী-চিত্রায়ণকে 'অসত্য' বলছেন— কাপলানের মূল অভিযোগ এটাই। পাঠকের সঙ্গে ঔপন্যাসিকের লুকোচুরি খেলাকে ধরতে অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছেন মিলেট— এমনটাই মত কাপলানের। মিলেটের বিরুদ্ধে এই সমালোচনা সত্ত্বেও *Sexual Politics* ক্ষমতা করায়ত্ত করার পুরুষতন্ত্রের রাজনীতিকে যে অনেকটাই বেআব্রু করে দিয়েছিল এ নিয়ে সন্দেহ নেই।

এটা সম্ভবত ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যে সমস্ত তাত্ত্বিকদের কেন্দ্র করে এ আলোচনা আবর্তিত হয়েছে এতক্ষণ, মূলত তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়েছেন পুরুষ লেখকরাই। সম্ভবত তাই গত শতাব্দীর সাতের দশকের দ্বিতীয় অর্ধ থেকে মহিলা লেখকদের লেখালেখির একটি ট্র্যাডিশন নির্মাণের চেষ্টা শুরু হয়। পুরুষদের লেখালেখিতে নারীদের চিত্রায়ণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে মহিলা লেখকরা মহিলাদের কীভাবে উপস্থিত করছেন তা, মহিলাদের লেখনীতে কীভাবে ধরা পড়ছে মহিলাদের সমস্যা। সাহিত্যের ইতিহাসও অনেকটাই লিঙ্গ-বৈষম্যের ইতিহাস। পুরুষের আধিপত্যে সেখানে অনেক সময়ই ব্রাত্য হয়ে গেছেন মহিলা লেখকেরা। এই ব্রাত্য মহিলা লেখকদের প্রসঙ্গই বারবার উঠে আসতে থাকে এই সময়ের তাত্ত্বিকদের কথাবার্তায়। ১৯৭৬ সালে এলেন মোর্য়েস প্রকাশ করেন এই ধারারই একটি বই *Literary Women*। বইটির নামটি থেকেই স্পষ্ট, পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যের বিপ্রতীপে বিস্মৃতপ্রায় মহিলা লেখকদের আলোচনার কেন্দ্রে আনতে চেয়েছেন মোর্য়েস। এই ধারার সবচেয়ে বিখ্যাত বইটি অবশ্যই এলেন শোঅন্টারের, *A Literature of their Own: British Women Novelists from Brontë to Lessing*। শোঅন্টারের বইয়ের শিরোনামে স্পষ্ট যে মহিলাদের লেখালেখির যে সমস্যাগুলির কথা উল্‌ফ বলেছিলেন সেগুলিকে তিনি একটু অন্যভাবে দেখবেন। বইটি রচনার উদ্দেশ্যও শোঅন্টার গোপন রাখেননি। স্পষ্ট করেছেন এই ভাষায়:

> This book is an effort to describe the female literary tradition in the English novel from the generation of the Brontës to the

present day, and to show how the development of this tradition is similar to the development of any literary subculture.

মহিলাদের লেখালেখিকে প্রায় একটি পৃথক জঁর-এর মর্যাদা দিতে চাইছেন শোঅল্টার। নির্মাণ করতে চাইছেন মহিলাদের লেখালেখির এক ট্র্যাডিশন। সেই ট্র্যাডিশন নির্মাণে ব্রিটিশ মহিলা লেখকদের লেখালেখিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করতে চেয়েছেন তিনি। ১৮৪০ থেকে ১৮৮০ পর্যন্ত ব্যাপ্ত প্রথম পর্যায়টির শোঅল্টার নাম দিয়েছেন 'feminine' phase। এলিজাবেথ গ্যাসকেল বা জর্জ এলিয়টের মতো মহিলা লেখকরা এই পর্যায়ে পুরুষ লেখকদের অক্ষম অনুকরণ করার চেষ্টা করে গেছেন। পুরুষের তৈরি করে দেওয়া নিয়মকানুন আর নিষেধের বেড়াজালেই আবদ্ধ এঁদের মহিলা চরিত্রগুলিও। দ্বিতীয় পর্যায়টি শোঅল্টার নাম দিলেন 'feminist' phase। ১৮৮০ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত ব্যাপ্ত এই পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে পুরুষতন্ত্রের কাছে নিজেদের প্রায় সমর্পণই করেছিলেন মহিলা লেখকরা— দ্বিতীয় পর্যায়ের মহিলা লেখকরা কিন্তু প্রতিবাদী। এলিজাবেথ রবিনস এবং অলিভার স্ক্রিনারের মতো লেখকরা পুরুষতন্ত্রের মূল্যবোধকে আক্রমণ করেই থেমে থাকেননি, পুরুষতন্ত্রের বিপরীতে বিচ্ছিন্নতার ধারণাকে লালন করে সাফ্রাজেট সিস্টারহুডের কথাও বলেছেন। তৃতীয় পর্যায়টির শুরু ১৯২০-তে। এই তৃতীয় পর্যায়টির শোঅল্টার নাম দিয়েছেন 'female phase'। এটি আসলে মহিলা লেখকদের পূর্ণতা প্রাপ্তির সময়। নিছক প্রতিবাদে আটকে না থেকে মহিলা লেখকরা এ সময় নারীত্বের প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কারে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। রেবেকা ওয়েস্ট, ক্যাথরিন ম্যানসফিল্ড আর ডরোথি রিচার্ডসন এই পর্যায়ের প্রথম দিকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিক। জয়েস বা প্রুস্তের সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিয়েই এঁরা উপন্যাসের ফর্ম নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নারীত্বের নতুন সংজ্ঞা নির্মাণে রত হয়ে ওঠেন। ডুব দেন নারীমনের গহন নির্জনে। সেই ট্র্যাডিশনই, শোঅল্টার বিশ্বাস করেন, ঈষৎ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই সঞ্চারিত হয়ে গেছে উল্ফ্ বা আরও পরের ব্যাট, ডাবেল বা ব্রফির মধ্যে। যেহেতু একজন পুরুষ লেখককেও আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করেননি শোঅল্টার এবং তাঁর টার্গেট রিডারশিপও মুখ্যত মহিলাতেই সীমাবদ্ধ, শোঅল্টারের সমালোচনার ধারাকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'গাইনোক্রিটিসিজম' (gynocriticism) এই শিরোনামে। মহিলাদের লেখালেখির ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা নির্মাণে আর একটি বইয়ের কথা না বললেই নয়। বইটি হল স্যান্ড্রা গিলবার্ট আর সুসান গুবারের লেখা *The Madwoman in the Attic*। প্রকাশ পায় ১৯৭৯ সালে। গিলবার্ট এবং গুবার তাঁদের বইতে বলেছেন জেন অস্টেনের সময় থেকেই মহিলা লেখকরা এক দ্বৈত কণ্ঠের অধিকারী। পুরুষতন্ত্র-নির্ধারিত মহিলাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যকে এক দিকে মেনে নিয়েছেন, অন্য দিকে প্রশ্ন করেছেন এই সব ঔপন্যাসিকেরা। শার্লট ব্রন্টির *Jane Eyre* উপন্যাসটিকে এই প্রসঙ্গেই নতুন করে পড়েছেন গিলবার্ট এবং গুবার। এই উপন্যাসটির ওপর ভিত্তি করেই নির্মাণ করেছেন নিজেদের বইয়ের শিরোনাম।

গত শতাব্দীর সাতের দশকের দ্বিতীয় অর্ধ থেকেই অ্যাংলো-আমেরিকান নারীবাদী সমালোচকদের পাশাপাশি বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ফ্রেঞ্চ নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা। অ্যাংলো-আমেরিকান নারীবাদী সমালোচকদের সঙ্গে ফরাসি নারীবাদী তাত্ত্বিকদের অবশ্য একাসনে বসাতে রাজি নন অনেকেই। এই দুই ধারার মধ্যে দর্শনগত, প্রয়োগগত পার্থক্য প্রচুর। টোরিল মই সম্ভবত সে কারণেই তাঁর *Sexual/Textual Politics* (১৯৮৫) বইতে দুটি মূল পর্যায় রেখেছেন— একটি 'Anglo-American Feminist Criticism' এবং অন্যটি 'French Feminist Theory'। মই যেন স্পষ্ট করে বলতে চাইলেন অ্যাংলো-আমেরিকান নারীবাদীদের রচনাকে 'সমালোচনা' বলা গেলেও 'তত্ত্ব' বলা যাবে না। 'তত্ত্বের' জটিলতা ওঁদের রচনায় অনুপস্থিত। বাস্তবিকই অ্যাংলো-আমেরিকান সমালোচকদের তুলনায় ফরাসি তাত্ত্বিকেরা অনেক জটিল— অনেক নিঃসংকোচ নারীবাদের আলোচনায় অন্যান্য তত্ত্ব এবং তাত্ত্বিকদের ব্যবহারেও। গত শতাব্দীর পাঁচের দশক থেকে সাহিত্য সমালোচনার জগতে যেসব তত্ত্ব তাদের অনিবার্য উপস্থিতি নিয়ে হাজির হয় তাদের অনেকগুলিকেই এই সমস্ত ফরাসি তাত্ত্বিকেরা নিজেদের লেখালেখিতে বারবার ব্যবহার করেছেন। ভাষাতত্ত্ব থেকে মনস্তত্ত্ব, অবয়ববাদ (Structuralism) বা উত্তর-অবয়ববাদ কোনও কিছুই এঁদের রচনায় অপাংক্তেয় নয়। এই তাত্ত্বিকদের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিশু (Cixous), ক্রিস্টেভা আর ইরিগারে।

শিশু, ক্রিস্টেভা আর ইরিগারের রচনায় যাঁর প্রভাব খুব স্পষ্ট, যাঁকে অনেক সময়ই বলা হয় 'ফ্রেঞ্চ ফ্রয়েড' তিনি মনস্তাত্ত্বিক লাকাঁ। লাকাঁ-পরবর্তী সময়ে নারীবাদী আলোচনার কেন্দ্রে বারবার চলে এসেছে ভাষা। পুরুষতন্ত্র তার আধিপত্য কায়েম রাখতে কীভাবে ব্যবহার করে ভাষাকে— সেটাই হয়ে উঠেছে আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য। মানবচেতনা গঠনের ওপর লাকাঁর তত্ত্ব থেকেই পুরুষতন্ত্রের অস্ত্র ভাষাকে আক্রমণে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন ফরাসি নারীবাদীরা। মানবচেতনা গঠনের তত্ত্বে লাকাঁ তিনটি মূল পর্যায়ের কথা বলেছেন— Imaginary, Symbolic আর Real। বলেছেন Mirror Stage-এর কথাও। Imaginary পর্যায়ে একটি শিশুর চেতনা গঠিত হয় না, তৈরি হয় না লিঙ্গ-পার্থক্যের ধারণাও। মায়ের সঙ্গে তখন শিশুটির নিবিড়, অবিচ্ছেদ্য যোগ। তারপর দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে সে, এক জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ৬-৮ মাসের মাথায় সে ক্রমশ প্রবেশ করে ভাষার সাম্রাজ্যে— Symbolic World-এ। এ জগৎ-টি ভীষণ ভাবেই লিঙ্গ অসাম্যের জগৎ। সস্যুরকে ব্যবহার করে লাকাঁ দেখালেন ভাষার মাধ্যমেই একটি শিশুর দীক্ষা হচ্ছে লিঙ্গ অসাম্যে। যে ভাষা সে শিখছে তা ভীষণ ভাবেই পুরুষতন্ত্রের ধারণার বাহক। গোটা Symbolic Worldটিই প্রতীকী অর্থে পুরুষাঙ্গের— phallus-এর— দাস। Symbolic Worldটি তাই একটি phallogocentric world যেখানে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত ধ্যানধারণার বাহক ভাষা। শিশুর জন্মের আগে থেকেই সে ভাষা আছে, Symbolic World আছে। জন্মের ৬-৮ মাসের মাথায় শিশু কেবল প্রবেশ করে সেই জগতে, রপ্ত হয়ে ওঠে পুরুষতন্ত্রের ভাষায়, খুঁজে পায় নিজের অবস্থান, হ্যাঁ অবস্থান। এ এমন এক জগত যেখানে সত্তা নেই,

সত্তার পূর্ণ অনুভব নেই, আছে অবস্থান (Subject position), অবস্থান সচেতনতা। এই অবস্থান সব সময়ই নারীকে কেবল পুরুষের বিপ্রতীপেই রাখে না, রাখে নীচুতেও। Real Worldটি এসব থেকে মুক্তই শুধু নয়, ঊর্ধ্বেও। তবে তার নাগাল মেলা ভার।

বলা বাহুল্য লাকাঁর পর নারীবাদীদের আক্রমণের বিষয় হয়ে পড়ে পুরুষ নির্মিত ভাষা। ডেল স্পেনডারের লেখা একটি বইয়ের শীর্ষনামই হয়ে যায় *Man Made Language* (১৯৮০)। শিশু, ক্রিস্টেভা বা ইরিগারে— এঁদের প্রত্যেকেরই অন্বেষণের বিষয় হয়ে ওঠে এমন এক ভাষার নির্মাণ যে ভাষা পুরুষতন্ত্রের প্রাধান্যসূচক নয়, phallogocentric world-এর প্রতাপের বাইরে যার অবস্থান। শিশু (Cixous) যেমন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'The Laugh of the Medusa' (১৯৭৬)-য় জোর সওয়াল করেছেন নারীদের নিজস্ব এক ভাষা নির্মাণের পক্ষে। শিশু বলেছেন মহিলারা যদি বেশি বেশি করে লেখেন নিজেদের শরীর নিয়ে, অনুবাদ করেন এমন কিছু অনুভূতি, অভিজ্ঞতা যা একান্ত ভাবে মেয়েলি, কেবলমাত্র তাহলেই phallogocentric world-কে অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব, নির্মাণ করা সম্ভব 'écriture féminine' বা নারীদের নিজস্ব লিখনভঙ্গিমা। উত্তর-অবয়ববাদের তত্ত্ব, বিশেষত দেরিদার 'différance' (ডিফাঁরস)-এর প্রভাব শিশুর অবস্থানে স্পষ্ট। লাকাঁর Imaginary Stage-এ পুত্র বা কন্যা সন্তানের সঙ্গে মায়ের যে অবিচ্ছেদ্য যোগ, মায়ের শরীরের প্রবাহের সঙ্গে শিশুটির যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তাকে যদি অনুবাদ করা যায় ভাষায় তা হলে, শিশু বিশ্বাস করেন, নির্মাণ সম্ভব সেই ভাষার যে ভাষা পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যের ঊর্ধ্বে থাকে। 'écriture féminine'-এর নির্মাণ সম্পর্কে শিশুর ভাবনা অনেকটাই ইউটোপিয়ান— বাস্তবে Imaginary Stage-এর প্রবাহকে ভাষায় কতখানি অনুবাদ করা সম্ভব সে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। ক্রিস্টেভা এই ক্ষেত্রে বরং অনেক বাস্তবানুগ। ক্রিস্টেভার তত্ত্বের মূলে রয়েছে দুটি পর্যায়ের বিভাজন: Semiotic এবং Symbolic। ক্রিস্টেভার Semiotic প্রায় অনেকটাই লাকাঁর Imaginary-র সমতুল আর Symbolic তো প্রায় পুরোটাই লাকাঁরই Symbolic— সেই জগৎ, ভাষা যেখানে পুরুষের অধীন। এই প্রাধান্য নষ্ট করতে চান ক্রিস্টেভাও, তবে তাঁর পথটি শিশুর থেকে পৃথক। প্রি-ইডিপাল পর্বে একটি শিশু তার মায়ের সঙ্গে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত থাকে। এই সময়ে একটি শিশুর অনুভবে ভাষায় ঘনসংবদ্ধতা বা যুক্তিকাঠামো হয়তো থাকে না, কিন্তু যা থাকে তা এক রকমের ভাষাই। যুক্তির ভাষা, সংযোগের যে ভাষায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ি, যে ভাষা পুরুষতন্ত্রের এজেন্ট, সেই ভাষার বিপরীতে রাখা যেতে পারে প্রি-ইডিপাল পর্বের Semiotic phase-এর অর্থহীনতার ভাষাকে। ক্রিস্টেভা বললেন মহিলাদের নিজস্ব ভাষা নির্মাণ করতে গেলে যুক্তির ভাষায় জায়গা দিতে হবে ওই যুক্তিহীনতাকে, ছিঁড়ে ফেলতে হবে কার্যকারণ সম্বন্ধের জটিল নিগড়। যুক্তির, কার্যকারণ সম্পর্কের এই ভাষাকে ক্রিস্টেভা বললেন 'phenotext' আর যুক্তিহীনতার, কার্যকারণ সম্পর্ক অতিক্রম করে যাওয়ার ভাষাকে তিনি বললেন 'genotext'। একটি আর একটির চাইতে সম্পূর্ণ পৃথক নয়— বরং সম্পর্ক আছে উভয়ের— phenotext-এর মধ্যেই কখনও কখনও দেখা দেয় 'genotext'— ভেঙে পড়ে যুক্তির অর্গল, পুরুষের প্রাধান্যসূচক কার্যকারণ

সম্পর্কে আবদ্ধ ভাষার উলটো দিকে জন্ম নেয় মহিলাদের ভাষা। ক্রিস্টেভা আরও বললেন মহিলাদের এই মুক্তির ভাষা হতে পারে কবিতা। গদ্যের যুক্তির পৃথিবী সে প্রায়ই হয় ভেঙে ফেলে নয়তো অতিক্রম করে যায়। কবিতার মাধ্যমেই এক পুরুষ কবিও তাই পারেন পুরুষতন্ত্রের ছোঁয়া-মুক্ত স্বাধীন এক মহিলাদের ভাষা নির্মাণ করতে। ক্রিস্টেভা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে তাঁর কবিতায় মালার্মে পেরেছিলেন সে রকমই এক ভাষা নির্মাণ করতে। শিশুর আদর্শবাদের পাশাপাশি ক্রিস্টেভার কবিতার প্রতি এই পক্ষপাত বেশ বাস্তবসম্মত মনে হয়। ফরাসি নারীবাদী ত্রয়ীর তৃতীয়জন অর্থাৎ ইরিগারে অবশ্য অনেকটাই শিশুপন্থী। শিশুর অবস্থানের সঙ্গে খুব বেশি পার্থক্য নেই ইরিগারের অবস্থানের।

বলা বাহুল্য, এখনও পর্যন্ত এ আলোচনায় সাদা চামড়ার তাত্ত্বিকদেরই আলোচনা করেছি আমরা, থেকেছি পাশ্চাত্যমুখী। পাশ্চাত্যজাত এবং সাদা পৃথিবী নির্মিত নারীবাদের এই সমস্ত তাত্ত্বিক অবস্থানের সঙ্গে উত্তর-ঔপনিবেশিক নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা যে একমত হয়েছেন এমনটা নয়। বরং এ রকম একটা কথা উঠে এসেছে যে প্রথম বিশ্বের চোখ দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের মেয়েদের সমস্যা বোঝা যাবে না। উপনিবেশ নির্মাণ করেছেন যাঁরা তাঁরা কি করে বুঝবেন উপনিবেশবাসীর সমস্যা? একজন পরাধীন ঔপনিবেশিক নারীর সঙ্গে প্রথম বিশ্বের নারীকে একাসনে বসানোও যাবে না। পিটারসেন এবং রাদারফোর্ড ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত তাঁদের বইয়ে ব্যবহার করলেন 'double colonization'— এই শব্দবন্ধটি (*A Double Colonisation: Colonial and Post-Colonial Women's Writing*)। জানালেন যে ঔপনিবেশিক নারী আসলে দু' দু'বার নিষ্পেষিত হয়— ঔপনিবেশিক শাসক এবং দেশীয় পুরুষতন্ত্র— এই দুই নিষ্পেষণ যন্ত্রের কোনওটির থেকেই রেহাই নেই তার। সাদা চামড়ার একজন নারীকে ঔপনিবেশিক শোষণের শিকার হতে হয়নি কখনও— তাই তার অভিজ্ঞতা দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের ঔপনিবেশিক নারীর অভিজ্ঞতাকে মাপতে যাওয়াও মূর্খামো। ঔপনিবেশিক নারীর স্বর, ফলত, ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে নারীবাদী তত্ত্বে। আর বাঙালিরা গর্ববোধ করতে পারেন এই ভেবে যে উত্তর-ঔপনিবেশিক নারীবাদী তাত্ত্বিকদের মধ্যে এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিখ্যাত তাত্ত্বিক একজন বাঙালি— আমাদের ঘরের মেয়ে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। স্পিভাকের 'Can the Subaltern Speak?' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ তো প্রায় মিথ হয়ে গেছে। এই প্রবন্ধে গায়ত্রী প্রশ্ন করেছেন সাবঅল্টার্নের পক্ষে কি নিজের কণ্ঠে কথা বলা আদৌ সম্ভব? মহিলা সাবঅল্টার্নের পক্ষে তা বোধহয় আরও অসম্ভব। স্পিভাকের অবস্থান নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন উঠেছে বিস্তর। স্পিভাকই বা কথা বলছেন কার পক্ষ নিয়ে, কোন অবস্থান থেকে উঠেছে এসব প্রশ্ন। প্রশ্নের মুখে পড়েছে তাঁর সর্পিল ভাষাও। এসব সত্ত্বেও, উত্তর-ঔপনিবেশিক নারীবাদী আলোচনায় স্পিভাকের অবদান অনস্বীকার্য। স্পিভাকের মতোই আর একজন ভারতীয় উত্তর-ঔপনিবেশিক নারীবাদী তাত্ত্বিক চন্দ্রা তালপাড়ে মহান্তিও এক হাত নিয়েছেন প্রথম বিশ্বের নারীবাদী দর্শনকে। এই দর্শন, মহান্তি বলেছেন, সব সময় চেয়েছে তৃতীয় বিশ্বের মহিলাদের প্রথম বিশ্বের মহিলার 'অপর' 'other' হিসেবে চিত্রায়িত করতে।

উত্তর-ঔপনিবেশিক নারীবাদীদের মতোই ব্ল্যাক ফেমিনিস্টরাও প্রথম বিশ্বের নারীবাদী দর্শনকে 'রেসিস্ট' বলেছেন। বলেছেন কালো মেয়ের কান্না শোনার জন্য প্রথম বিশ্ব তৈরিই হয়নি। কালোদের প্রতিবাদী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রথম বিশ্ব গুরুত্ব দিয়েছে পুরুষের প্রতিবাদকে। ব্ল্যাক ফেমিনিস্টরা তাই তত্ত্ব নির্মাণ করেই থেমে থাকেননি। বর্ণবৈষম্যের সমাজে কী যন্ত্রণায় একজন কালো চামড়ার মহিলার জীবন কাটে তাও লিপিবদ্ধ করার জরুরি দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন নিজেদের কাঁধেই। মায়া অ্যাঞ্জেলুর মতো কারও কারও রচনা পড়লে কালো মেয়েদের অবর্ণনীয় কষ্টের জীবনকে সত্যিই অবাস্তব বলে মনে হয়। মায়াকে ধর্ষণ করেছিল তাঁর মায়ের বন্ধু; চৌর্যবৃত্তি থেকে বেশ্যাবৃত্তি— সব কিছুকেই পেশা করতে চেয়েছিলেন মায়া, জড়িয়ে গিয়েছিলেন নেশাড়ুদের দলে। পরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে সে সবই লিখেছেন মায়া। *I Know Why the Caged Bird Sings* (১৯৭০) বা *The Heart of a Woman* (১৯৮১) গ্রন্থে রচনা করেছেন এমন এক জগৎ সাদা চামড়ার নারীবাদীদের কাছে যা আশ্চর্য আর অবিশ্বাসের। মায়া যদি কাহিনির মাধ্যমে ধাক্কা দিতে চেয়েছেন প্রথম বিশ্বের নারীবাদকে, তা হলে অ্যালিস ওয়াকারের মতো কেউ কেউ ঝরঝরে গদ্যে *In Search of Our Mothers' Gardens: Womanist Prose*-এর মতো বইতে ব্ল্যাক ফেমিনিস্ট রচনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। ওয়াকার অবশ্য 'ফেমিনিস্ট' শব্দটি ব্যবহার করেননি। তার পছন্দের শব্দ 'ওমানিস্ট'— নারীত্বের পূর্ণতার গন্ধ যেমন এতে আছে, তেমনই পুরুষের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াও নেই। পুরুষদের থেকে একেবারেই মুখ ফিরিয়ে নিতে অবশ্য চাইছেন সাম্প্রতিক সময়ের কোনও কোনও নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা। এঁরা আসলে সমকামিতায় বিশ্বাস করেন। বিশ্বাস করেন সমকামী নারীরাই কেবল বুঝতে পারেন নারীদের সমস্যা। যে নারী পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী, তিনি নারীদের সমস্যা বুঝবেন কীভাবে? জুলিয়া পেনিলোপী এবং সুমান জে. উল্‌ফের বই *Sexual Practice, Textual Theory: Lesbian Cultural Criticism* আলো ফেলেছে নারীবাদী তত্ত্বের সঙ্গে সমকামিতার সম্পর্কজাত এই সব জটিল প্রশ্নের ওপরে। বলা বাহুল্য, মার্কসবাদী নারীবাদীরাও নারীবাদের প্রধান পাশ্চাত্য দর্শনকে বিনা প্রশ্নে মেনে নেননি। তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন শ্রেণিচেতনার ওপর, গুরুত্ব দিয়েছেন নারীর বস্তুবাদী অভিজ্ঞতার ওপর। গৃহশ্রমকে যথার্থ মূল্য চোকানোর দাবিতেও অনড় থেকেছেন তাঁরা। শ্রেণিচেতনার সঙ্গে মেয়েদের সম্পর্কটি ঠিক কী হবে তা নিয়ে আবার এঁদের মত মেলেনি সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী বা সোসালিস্ট ফেমিনিস্টদের সঙ্গে। এই পার্থক্য সত্ত্বেও এ নিয়ে কোনও সন্দেহই নেই যে মার্কসবাদী নারীবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী— এঁরা সকলেই পাশ্চাত্যের প্রধান নারীবাদী দর্শন এবং তার বিশ্বজনীনতাকে প্রশ্ন করেছেন, নির্বিবাদে মেনে নেননি।

পাশ্চাত্যের প্রধান বা মেজর নারীবাদী দর্শন এভাবে গত শতাব্দীর শেষের দিক থেকে ভীষণ ভাবে আক্রান্ত হচ্ছে অপ্রধান বা মাইনর দর্শনগুলির দ্বারা। মেজর দর্শনটিও আর একমুখী নেই, হয়ে গেছে বহুমুখী— বহুস্বর আজ প্রথম বিশ্বের নারীবাদের অভ্যন্তরেও। শোঅল্টারের 'গাইনোক্রিটিসিজমের' বিপ্রতীপে যেমন অ্যালিস জার্ডিন হাজির করেছেন

তাঁর 'গাইনেসিস' (Gynesis)-এর তত্ত্ব। নারী আজ আর রক্তমাংসের মহিলা নন বরং একটি 'reading effect'— পাঠপ্রভাব। মেরি জ্যাকোবাস তাই বলেছেন গাইনেসিস-উত্তর যুগে 'Sexuality of the text' (এতদিন নারীবাদী সমালোচকরা এটির নির্মাণেই ব্যস্ত থাকতেন)-এর চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে 'textuality of sex'। জুডিথ বাটলারের মতো কেউ কেউ আবার লিঙ্গ-পরিচয়কে দেখেছেন একটি 'সিগনিফাইং প্র্যাকটিস' ('Signifying practice') হিসেবে। গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে 'পারফরম্যান্স' আর 'ডুয়িং' (doing)-এর ভূমিকা। ডোনা হারাওয়ের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'A Manifesto for Cyborgs' (১৯৮৫) প্রকাশের পর পাশ্চাত্যের প্রধান নারীবাদী আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছে সাইবর্গ (Cyborg)— যা কিনা postgender যুগের এক নির্মাণ। তাত্ত্বিকেরা বাস্তবিকই বলতে শুরু করেছেন ফেমিনিজম-এর চৌকাঠ ডিঙিয়ে আমরা ঢুকে পড়েছি পোস্ট-ফেমিনিজমের অঙ্গনে। পোস্ট-ফেমিনিজমকেও দেখা শুরু হয়েছে দু'ভাবে। কেউ কেউ ফেমিনিজমেরই ধারাবাহিক বিবর্তন হিসেবে পোস্ট-ফেমিনিজমকে দেখছেন (এঁরা অবশ্য 'পোস্ট' এবং 'ফেমিনিজম'— এই শব্দ দুটির মধ্যে, সঙ্গত কারণেই, হাইফেন ব্যবহারে ইচ্ছুক নন), তো কেউ কেউ আবার পোস্ট-ফেমিনিজমকে দেখছেন ফেমিনিজমের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ('backlash' against feminism) হিসেবে। তর্কে-বিতর্কে জমে উঠেছে নারীবাদের অঙ্গন।

এই তর্ক আর বিতর্ক, যুক্তি আর প্রতিযুক্তির মধ্যে ডুবে যেতে যেতে মাঝে মাঝে ভয় হয় সব কিছুর শেষে নারীবাদের যে মূল উদ্দেশ্য সেই লিঙ্গ-সাম্যের পৃথিবী নির্মাণের কাজটিই অবহেলিত হচ্ছে না তো? কোনও সন্দেহ নেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ব হিসেবে নারীবাদ পরিশীলিত হয়েছে, অন্য তত্ত্বের সঙ্গে আদানপ্রদানে, নিজের ভেতরের দ্বন্দ্বের নিরসনের চেষ্টায় ঋদ্ধ হয়েছে। ভয়টা অন্যত্র। তত্ত্বের এই কচকচির সঙ্গে জীবনের সংযোগ হচ্ছে তো? মেধা চর্চার জগতে, এমন আশঙ্কাও তো করছেন কেউ কেউ যে নারীবাদ আজ 'পণ্যে' পরিণত হয়েছে। আলোচনা সভায় আর বিতর্কের আসরে এক 'বাজার' তৈরি হয়েছে নারীবাদের। সেই পণ্যের বাজারযোগ্যতার কথা মনে রেখে নারীবাদী সমালোচকরাও আলোচনা সভায় 'পেপার' পড়ার জন্য নিছক কথার পিঠে কথা সাজাচ্ছেন না তো? যে কোনও আলোচনা সভায় মেয়েদের সমস্যা নিয়ে পঠিত 'পেপার'-এর সংখ্যাবৃদ্ধি যেমন আনন্দের, তেমনই আশঙ্কারও নয় কি? এ প্রশ্নের উত্তর হয়তো এখনই পাওয়া যাবে না। তবে এটুকু বলা যায় তত্ত্ব ও জীবন, তাত্ত্বিক এবং কর্মীদের মধ্যে সেতুবন্ধন করাই বোধহয় নারীবাদের আশু কর্তব্য হয়ে পড়েছে।

রাখকৃষ্ণ দে

প্রসঙ্গঃ পিতৃতন্ত্র

শুরুর কথা

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষ করে ৬০-এর দশকে ইউরো-আমেরিকায় নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বে এবং ৮০-র দশকে মানবীবিদ্যাচর্চার বিকাশ পর্বে, নারীর সামাজিক অবস্থান, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা, বৈষম্যমূলক আচরণ, নিয়ন্ত্রণ, নির্যাতন প্রভৃতি বিষয়গুলিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে না দেখে সামগ্রিকভাবে, এক সংহত সুনিশ্চিত কাঠামোর অংশীভূত রূপ হিসাবে দেখা শুরু হয়। পণপ্রথা থেকে বধূহত্যা, ভ্রূণহত্যা থেকে ধর্ষণ, পারিবারিক সন্ত্রাস থেকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস— সমস্ত ঘটনাই পিতৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্র নামক এক সমাজব্যবস্থা তথা রাষ্ট্রকাঠামোরই বহিঃপ্রকাশ হিসাবে বিবেচিত হতে থাকে (প্রসঙ্গত, হিন্দু দর্শনে পুরুষ শব্দটি লিঙ্গগত অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে নরনারী উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে পুরুষ শব্দটি নারীর বিপরীত লিঙ্গগত অর্থে ব্যবহৃত হয়)। নারীমুক্তির প্রয়োজনে এই প্রতিষ্ঠানটির বর্জন, ধ্বংস বা বিলোপের দাবি ওঠে। এবং তারই জন্য বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন, সমাজসংস্কার, প্রশাসনিক সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ প্রাক-নারীবাদী আন্দোলন পর্বে বা আন্দোলনের প্রথম পর্বে (উনিশ শতক থেকে শুরু করে বিশ শতকের প্রথম দুই দশক) প্রাধান্য পায়। কিন্তু এটাও ক্রমশ অনুভূত হতে থাকে যে বৃহত্তর পুরুষতান্ত্রিক (পারিবারিক থেকে রাষ্ট্রীয়) কাঠামোর মধ্যে এই ধরনের কর্মসূচির বাস্তবায়ন পুরোপুরি কখনও সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন নারীর অধস্তন অবস্থানের জন্য দায়ী যে-পুরুষতন্ত্র তার ধ্বংস সাধন। স্বাভাবিক ভাবে, নারীর নির্যাতন ও অবনয়নের ধারক-বাহক সেই পিতৃতন্ত্র নামক প্রতিষ্ঠানটি, তার গড়ে ওঠার কারণ, বিভিন্ন সমাজকাঠামোয় তার ধরনধারণ, কার্যকারিতা প্রভৃতি বিষয়গুলিই নারীবাদীদের কাছে এবং মানবীবিদ্যাচর্চায়, অন্যতম আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। বর্তমান নিবন্ধের সীমিত পরিসরে পিতৃতন্ত্রের অর্থ, উদ্ভব, ধরন, বিকাশ ইত্যাদি প্রাথমিক বিষয়গুলি আলোচিত হবে।

ইংরাজি প্যাট্রিয়ার্কি (Patriarchy) শব্দটির অর্থ নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে নানা মত। গ্রিক শব্দ Patria, যার অর্থ পরিবার/গোষ্ঠী এবং arkhis, অর্থাৎ শাসন থেকে প্যাট্রিয়ার্কি শব্দটির উদ্ভব। একই ভাবে ল্যাটিন patriarchalis শব্দটি থেকে patriarchal এবং patriarchis শব্দটি থেকে patriarchy শব্দটির উদ্ভব। ল্যাটিন pater শব্দটির অর্থ পিতা। এদিক থেকে patriarchy-র অর্থ পিতার শাসন। প্রসঙ্গত বলা যায় প্রাচীন গ্রিসে পরিবার বলতে শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী-সন্তান সন্ততিকেই বোঝাত না, ক্রীতদাস/ক্রীতদাসীরাও ছিল পরিবারের অন্তর্গত। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (খ্রি. পূ. ৩৮৪-৩২২) পরিবারের উদ্ভবকে পুরুষ ও নারীর জৈবিক সম্পর্ক, মালিক-ক্রীতদাসের অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে পিতা-মাতার আবেগজনিত সম্পর্কের উপর গড়ে ওঠা এক স্বাভাবিক সংগঠন বলে অভিহিত করেন এবং মনে করেন পিতা যেমন পরিবারের স্বাভাবিক শাসক, পরিবারেরই সম্প্রসারিত রূপ, রাষ্ট্রেরও একজন স্বাভাবিক শাসকের প্রয়োজন। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি দার্শনিক জাঁ বোদাঁ (Jean Bodin, 1530-1596) তাঁর *Six Books on the State* গ্রন্থে রাষ্ট্রের সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে পরিবার-প্রধান পিতা বা pater familias-এর কথা বললেন। পরিবারে পিতার কর্তৃত্ব পরিবারের সদস্যদের মধ্যকার বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। একই ভাবে রাষ্ট্রেরও ভিত্তি হল কর্তৃত্ব ও বৈষম্য। *দ্য নিউ শর্টার অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারিতে* প্যাট্রিয়ার্কি বলতে বোঝানো হয়েছে সমাজ সংগঠনের এমন এক ধরনকে যেখানে পিতা অথবা বয়োঃজ্যেষ্ঠ কোনও পুরুষ পরিবারের অথবা গোষ্ঠীর প্রধান এবং তাকে কেন্দ্র করেই বংশধারা প্রবাহিত হয়। সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে রবার্ট ফিলমার (Robert Filmer, 1588-1653) তাঁর কল্পিত রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপায়ণে পিতৃতন্ত্রের প্রসঙ্গ আনেন যেখানে পরিবারে স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির উপর কর্তার কর্তৃত্বের মতন প্রজাদের উপর রাষ্ট্র-শাসক তার শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। উনিশ শতক পর্যন্ত পিতৃতন্ত্রের এ ধরনের সংজ্ঞাকেই সাধারণত ইউরোপে স্বীকৃত সংজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

বিশ শতকের শুরু থেকেই সমাজবিজ্ঞানীদের একাংশ এবং বিশেষত নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা পিতৃতন্ত্রের এমন সংজ্ঞাকে অত্যন্ত সংকীর্ণ বলে মনে করতে থাকেন। পরিবর্তে তাঁরা শব্দটির উপর ব্যাপকতর অর্থ আরোপ করে বলেন, পিতৃতন্ত্র হল সেই ধরনের সমাজকাঠামো যেখানে নারীর তুলনায় পুরুষরা অনেক বেশি ক্ষমতা ও সুযোগ ভোগ করে। এ-জাতীয় সংজ্ঞা অনুসারে যে কোনও ধরনের সমাজ-সংস্কৃতিতে, বিশেষত যাদের লিখিত ইতিহাস রয়েছে সেখানে, পিতৃতন্ত্র নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার এক ব্যবস্থাপনা মাত্র। দৈহিক ক্ষমতা প্রয়োগ থেকে আইনগত বিধিনিষেধ, বৌদ্ধিক কাঠামো, ধর্মীয় অনুশাসন, অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা, সাংস্কৃতিক কাঠামো, যৌন সম্পর্ক, মতাদর্শগত অবস্থান, সামাজিক ব্যবস্থাপনা, রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ— সমস্ত কিছুর ভিতরে আছে এই পুরুষ-কর্তৃত্বের ফল্গু স্রোত। ফার্গুসন (Ann Ferguson, 1981) পিতৃতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠানগত এবং মতাদর্শগত এক বিশ্বধারণা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রতিষ্ঠানগত ভাবে পিতৃতন্ত্র বলতে পরিবার, রাষ্ট্রব্যবস্থা,

ধর্ম, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাব্যবস্থা এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে পুরুষের প্রাধান্যকে বোঝায়। নারী-পুরুষের এই সম্পর্ক নারীর মনস্তত্ত্বে এক ধরনের অধীনতা, পুরুষকে মেনে চলা, সেবা করার মানসিকতা তৈরি করে, পিতৃতন্ত্র বিশ্বজগৎ সম্পর্কেও এক বিশেষ ধারণার জন্ম দেয়— পুরুষকেন্দ্রিক জ্ঞানতত্ত্ব রচনা করে, যেখানে পুরুষ ও নারীর ভিন্নতাকে স্বাভাবিক বলে মনে করা হয় এবং যুক্তি, সহনশীলতা, বিষয়ীভাবকে পুরুষের এবং আবেগ, দেহ, বিষয়ভাবকে নারীর অন্তর্লীন বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। (দ্র. Helen Tierney, ed., 1999, *Women's Studies Encyclopedia* Vol 2)। মেরি ডালি (Mary Daly) বা কেট মিলেট (Kate Millett)-এর মতন নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা পিতৃতন্ত্রকে ব্যাপক অর্থে এবং সর্বজনীন ধারণা হিসাবে প্রয়োগ করতে আগ্রহী। মিশেল রোসাল্ডো (Michele Rosaldo) এবং অ্যালিসন জ্যাগার (Allison Jagger)-এর মতন নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা প্যাট্রিয়ার্কি শব্দটি ব্যাপক ও সর্বজনীন, অর্থাৎ সর্বার্থজ্ঞাপক বা blanket term হিসেবে ব্যবহার করার বিরোধী। কারণ, তাঁরা মনে করেন বিভিন্ন সমাজ-কাঠামোয় এর প্রয়োগ-প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ মোটেই যথেষ্ট বা সুস্পষ্ট নয়। তৃতীয় এক দল আছেন যাঁরা প্যাট্রিয়ার্কি শব্দটিই পুরোপুরি পরিহার করার পক্ষপাতী কারণ তাঁদের মতে বর্তমানে শব্দটির অতিমাত্রায় রাজনীতিকরণ ঘটেছে এবং নারীবাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে। পরিবর্তে, তাঁরা পুরুষপ্রাধান্য, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য ইত্যাদি তুলনামূলক ভাবে নিরপেক্ষ শব্দ ব্যবহার করতে চান। অন্য অনেকের কাছে আবার এই শব্দটি পরিহার্য, কারণ বিশেষত বিশ শতকের আগে পর্যন্ত এর ব্যবহার মানবজীবনে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই এক স্বাভাবিক ব্যাপার বলে বিবেচিত হত। কাজেই, তাঁদের মতে, শব্দটির প্রতি অতিরিক্ত বৌদ্ধিক মনোসংযোগের কোনও প্রয়োজন নেই (দ্র. Merry E Wiesner Hanks, 2001, পৃ. ১৫-২৩)। বলা বাহুল্য, বর্তমানে প্যাট্রিয়ার্কি শব্দটির ব্যাপকার্থে প্রচলন, বিশেষত নারীবাদী চর্চায় লক্ষ করা যায়।

পিতৃতন্ত্রের নানা তত্ত্ব

পিতৃতন্ত্রের উদ্ভবের কারণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে তাত্ত্বিকদের বক্তব্যের ভিন্নতাকে কেন্দ্র করে যে-সমস্ত তত্ত্ব গড়ে উঠেছে তাদের মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: সারবাদী তথা প্রকৃতিবাদী তত্ত্ব, বিবর্তনবাদী তত্ত্ব এবং নির্মিতিবাদী তত্ত্ব।

প্রকৃতি তথা সারবাদী তত্ত্বে পিতৃতন্ত্রকে প্রকৃতিসঞ্জাত এক স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা হয়। পুরুষ ও নারী সেখানে প্রকৃতি বা জৈবিক কাঠামোগত ভাবে ভিন্ন; প্রকৃতিগত ভাবেই নারীদের ধরে নেওয়া হয় দুর্বল, অনুগত, আবেগপ্রবণ এবং সেই কারণেই তুলনায় কম বুদ্ধিসম্পন্ন। বলা হয়, এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলি নারীর জৈবিক কাঠামোর মধ্যেই নিহিত। সারবাদী এই তত্ত্বটিকে পুষ্ট করে তুলেছে জীববিজ্ঞানী ব্যাখ্যা, জীবসমাজবিজ্ঞানী ব্যাখ্যা, ধর্মীয় তত্ত্ব এবং বিভিন্ন দার্শনিকদের বক্তব্য।

জীববিজ্ঞানী ব্যাখ্যা

১৯৭৩ খ্রি. প্রকাশিত *The Meritability of Patriarcy* গ্রন্থে স্টিভেন গোল্ডবার্গ (Steven Goldberg) মন্তব্য করেন যে মানুষের হরমোন কাঠামোর মধ্যেই পুরুষের প্রাধান্য লুকিয়ে রয়েছে। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া পুরুষের আধিপত্য এবং নারীর সেবামূলক বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট করে মাত্র— সৃষ্টি করে না। অনেক জীববিজ্ঞানী মস্তিষ্ক সম্পর্কিত গবেষণা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছেন যে, পুরুষের তুলনায় নারীর মস্তিষ্কের সম্মুখ ভাগ (যা বৌদ্ধিক ক্ষমতার আধার হিসাবে গণ্য করা হয়) আকৃতিগতভাবে ছোট ও কম বিকশিত এবং এই কারণে পুরুষের তুলনায় নারী কম বুদ্ধিসম্পন্ন, অনেক বেশি সহনশীল, আবেগধর্মী, গৃহমুখী, শান্তিপ্রিয়। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লুয়ান ব্রিজেনডাইন (Luan Brizendine) তাঁর *Female Brain* গ্রন্থে নারীর মস্তিষ্কের গঠন সম্পর্কে যে গবেষণা করেন তার থেকে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে পুরুষের তুলনায় নারী কম বুদ্ধিসম্পন্ন। ১৮৬৭ খ্রি. প্রসিদ্ধ জীবসমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) মন্তব্য করেন, উচ্চশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত মহিলাদের প্রজনন ক্ষমতার স্বল্পতার অন্যতম কারণ হল তাদের মস্তিষ্কের উপর অত্যধিক চাপ। ই. ও. উইলসন (E. O. Wilson, 1975) ব্যক্তির সামাজিক আচরণের পিছনে জৈবিক ভিত্তি অন্বেষণ করতে গিয়ে নারীপুরুষের আচরণগত ভিন্নতার জন্য জিন-ঘটিত কারণকে উল্লেখ করেন। উইলসনের মতে, পুরুষ প্রকৃতিগত ভাবেই (জিন ঘটিত কারণে) একে অপরের প্রতি, বিশেষত প্রজনন কালে, আক্রমণাত্মক; প্রকৃতির মধ্যেই পুরুষ প্রাধান্য লুকিয়ে— সর্বজনীন পুরুষ-প্রাধান্য প্রকৃতিরই একটা ঘটনা (উদ্ধৃত, অ্যালিসন অ্যাসিটার, ১৯৯৬)। ভ্যান ডেন বার্ঘে এবং বারাশ (Van den Berghe and Barash)-ও মনে করেন, সন্তান সন্ততিদের প্রতিপালনে পুরুষ ও নারী হিসাবে যথাক্রমে বাবা ও মায়ের ভূমিকা জৈবিকভাবেই নির্ধারিত, প্রকৃতির এই সাধারণ/স্বাভাবিক বিধান থেকে স্তন্যপায়ীদের/মানবপ্রজাতিকে ব্যতিক্রমী ভাবার কোনও উপায় নেই। ডকিন্স (Richard Dawkins, 1976) তাঁর জনপ্রিয় *The Selfish Gene* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, মানবপ্রজাতি অন্ধ ভাবে ছককাটা পথে চলার এক যন্ত্র মাত্র, যে জিন নামক স্বার্থপর জৈব অণুগুলিকে বহন করে চলে। তাঁর মতে, পুরুষ ও নারী তাদের ব্যক্তিগত জিন-এর প্রজননসামর্থ্যকে সর্বাধিক করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। এই ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবলম্বন পুরুষ ও নারীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি তৈরি করে। পুরুষ যেহেতু দিনে লক্ষাধিক শুক্রাণু পুনরুৎপাদন করতে পারে তাই সে চায় তার জিনের সর্বাধিক উৎপাদনে শুক্রাণুকে সর্বাধিক পরিমাণে সিক্ত করতে অর্থাৎ বহু নারীর সঙ্গে যৌন সংযোগ করতে। তুলনায় কোনও নারীর পক্ষে বিনিয়োগের পরিমাণ কম। নারী যেহেতু এক সময় একটি মাত্র ডিম্বাণু পুনরুৎপাদন করতে পারে এবং বছরে একটি মাত্র সন্তানের জন্ম দিতে পারে সেই হেতু নারী ডিম্বাণু সংরক্ষণে অনেক বেশি যত্নশীল। প্রকৃতিগত কারণেই উদ্বর্তনের জন্য পুরুষ ও নারী এ ধরনের ভিন্ন আচরণ করে। পুরুষ হয় আগ্রাসী, বহুগামী; নারী লজ্জাশীলা, অন্তর্মুখী, সাবধানি এবং জিনের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে এক সঙ্গীর সঙ্গে দীর্ঘকালীন সম্পর্কের প্রতি আস্থাশীল। সম্প্রতি

কানাডার অন্টারিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে. ফিলিপ রাস্টন (J. Philip Raston) এবং ডগলাস এন জ্যাকসন (Douglas N Jackson) নারীর ভিন্ন প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পুনরুৎপাদনে নারীর ভূমিকার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

নারীর প্রকৃতি ও সামাজিক ভূমিকার সঙ্গে জৈবিক উপাদান তথা জিন-এর সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা, জিন-এর নির্ধারক ভূমিকা প্রভৃতি সম্পর্কে জীব-সমাজবিজ্ঞানীদের উপরের বক্তব্য নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়। তাত্ত্বিক রুথ ব্লেয়ার (Ruth Blair, 2001), অ্যালিসন অ্যাসিটার (Alison Assiter, 1996) জীবসমাজবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণে বেশ কিছু ত্রুটি তুলে ধরেন। রুথ ব্লেয়ার-এর মতে, প্রথমত, এই তাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণে পদ্ধতিগত ত্রুটি রয়েছে যথেষ্ট। প্রাণীজগতে প্রাণীদের আচরণ চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা নিজেদের মতের সমর্থনে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে কোনও প্রাণীকে বাছাই করেন এবং বিপরীত আচরণযুক্ত প্রাণীদের সুকৌশলে বাতিল করেন। যেমন বেশ কিছু স্ত্রীপাখির মধ্যে বহুগামিতা লক্ষ করা যায়। পুরুষপাখি অনেক সময় বাসা বাঁধা এবং ডিম রক্ষণাবেক্ষণ ও শাবককে প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করে। পুরুষ পেঙ্গুইন ডিমটিকে সযত্নে রক্ষা করে এবং স্ত্রী পেঙ্গুইন খাবারের সন্ধানে বের হয়। জীবসমাজবিজ্ঞানীরা এই সমস্ত প্রাণীদের আচরণ সযত্নে এড়িয়ে যান এবং নিজেদের মতের সমর্থনে কিছু প্রাণীর আচরণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তা সর্বজনীন বলে প্রচার করেন। তা ছাড়া, ব্যক্তি-আচরণের সঙ্গে প্রাণীজগতের অন্যান্য প্রাণীর বা উদ্ভিদের আচরণের সাদৃশ্য কল্পনা করে সেই আচরণকে প্রকৃতিসঞ্জাত বলে ব্যাখ্যা করা সমীচীন নয়। বস্তুত গবেষক যখন অন্যকে (লিঙ্গগত, শ্রেণিগত, সংস্কৃতিগত, বংশগত ভাবে ভিন্ন কাউকে) ব্যাখ্যা করতে চান তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি নিজস্ব প্রকৃতি, ধ্যানধারণা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হন। নারীর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গবেষকের যে-প্রকৃতিটি ফুটে উঠেছে তা পশ্চিমি শিল্প-নির্ভর পুঁজিবাদী বিশ্বের শ্বেতকায়, প্রাধান্যকারী পুরুষের প্রকৃতি। এ ধরনের কাঠামোয় (গবেষকের) সামাজিক সম্পর্কের যে প্রতিযোগিতা ও প্রাধান্যের (লিঙ্গগত, শ্রেণিগত, বর্ণগত) সম্পর্ক ও আচরণ সেই সম্পর্ক/আচরণকেই সর্বজনীনভাবে ব্যক্তি আচরণের (এমনকী প্রাণীজগতের মধ্যকার প্রাণীদের আচরণের) প্রকৃতি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, জিনের বিকাশে, ব্যক্তি আচরণে পরিবেশগত প্রভাবকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, ব্যক্তিগত উদ্যোগ, আগ্রাসন, প্রাধান্য প্রভৃতি বিষয়গুলি জীবসমাজবিজ্ঞানীরা ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রকৃতিগত আচরণ হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু এই ধরনের প্রকৃতি, আচরণের সঙ্গে সংস্কৃতি, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট প্রভৃতি বিষয়গুলির সম্পর্ককে যথাযথ ভাবে তুলে ধরেন না। তৃতীয়ত, জীবসমাজবিজ্ঞানীরা জিনের সঙ্গে ব্যক্তি আচরণের সম্পর্ক বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে পারেননি। উদাহরণস্বরূপ যদি ধরে নেওয়া হয় পুরুষের আধিপত্য তার জিনের মধ্যেই রয়েছে, তা হলে তা কীভাবে সঞ্চারিত হয়? এটা কি অতিসক্রিয় জীবনীশক্তি? অথবা, অতিসক্রিয় অ্যাড্রিন্যাল গ্ল্যান্ড এবং তা থেকে নিঃসৃত রস (হরমোন) যা রক্তের মধ্যে থেকে দেহরস সঞ্চালন এবং অনৈচ্ছিক পেশিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে? এটা কি অতিবুদ্ধি ও সৃজনক্ষমতার চাপ? অথবা,

সামগ্রিকভাবে শরীরের সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যকার সমস্বর-সহযোগিতা? আদিম সমাজে শিকারি হিসাবে পুরুষের এবং সংগ্রাহক হিসাবে নারীর যে ভাবে চিহ্নিতকরণ হয় তা থেকে পুরুষকে আধিপত্যকারী ও শক্তিশালী, এবং সংগ্রাহক ও কৃষিব্যবস্থার উদ্ভাবক নারীকে অধিকতর বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। একই ভাবে বলা যায়, পুরুষের ক্ষেত্রে বহুগামিতা এবং নারীর ক্ষেত্রে অধিকতর আয়সম্পন্ন অর্থাৎ অধিকতর নিরাপত্তা দিতে সক্ষম পুরুষকে বিবাহ করার প্রবণতাকে জিনগত বলে ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত নয়। অ্যালিসন অ্যাসিটার (Allison Assiter, 1996) মনে করেন, জীববিজ্ঞানীরা যে-যুক্তিতে নারী ও পুরুষের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করেন, সেই একই যুক্তিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন সিদ্ধান্তে আসাও সম্ভব। যেমন, বলাই যায় যে, নারী বহুগামী এবং পুরুষ একগামী হতে পারে। কেন না, নারী তার অমূল্য ডিম্বাণুকে সিক্ত করার সর্বাধিক সুযোগ লাভের জন্য, পুরুষের প্রজনন অক্ষমতার আশঙ্কা থেকে, কোনও ঝুঁকি না নিয়ে সর্বাধিক সংখ্যক পুরুষের সঙ্গে মিলিত হতে চাইবে। তা ছাড়া, নারী বহুগামী হতে চাইবে কারণ তার যত পুরুষ সঙ্গী থাকবে ততই তার সন্তানের নিরাপত্তা ও যত্ন নেওয়া সম্ভবপর হবে। যদিও এই যুক্তিধারা অ্যাসিটার মেনে নেননি। তিনি একে শুধু কাজে লাগিয়েছেন জীবসমাজবিজ্ঞানীদের যুক্তিকে খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে।

ধর্মীয় ব্যাখ্যা

বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ধর্মব্যবস্থায় পিতৃতন্ত্রকে ঈশ্বরের অভিপ্রেত ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করা হয়। খ্রিস্ট ধর্ম অনুযায়ী, প্রকৃত অর্থে পিতৃতন্ত্র বলতে ব্যক্তির আধিপত্য নয়, বোঝায় পরিবারের প্রধান হিসাবে পিতার মাধ্যমে ঈশ্বরের আধিপত্য। আদি মানব অর্থাৎ আদম-এর একাকিত্ব দূর করা এবং তার সুখ সম্ভোগের ব্যবস্থার জন্যই আদি নারী ইভ-এর সৃষ্টি। তা ছাড়া আদি পাপ (Original Sin) যেহেতু ইভ-এর প্ররোচনাতেই আদম ঘটিয়েছিল তাই নারীকে প্ররোচনাকারী, লোভ-লালসার প্রতীক হিসাবে গণ্য করে সাধন মার্গে তাকে বর্জন করাই শ্রেয় বিবেচনা করা হয়। বিবিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও নারীর মূল ভূমিকাকে স্বীকার করা হয়নি। আবার অধিকাংশ ধর্মীয় ব্যবস্থাপনাতেই ঋতুস্রাবকে দেখা হয় ঈশ্বরের অভিশাপ হিসাবে এবং সেই কারণে নারীকে অপবিত্র মনে করে ঈশ্বর উপাসনার মূল দায়িত্ব থেকে সরিয়ে রাখা হয়।

হিন্দু ধর্মেও নারীকে কাম-এর প্রতীক হিসাবে দেখা হয় এবং কামিনী ও কাঞ্চন থেকে আত্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি (অবশ্যই পুরুষ)কে দূরে থাকতে উপদেশ দেওয়া হয়। সন্তান পুনরুৎপাদনের জন্যই ভার্যার প্রয়োজন। নারীকে ক্ষেত্র এবং পুরুষকে বীজ হিসাবে গণ্য করা এবং বীজকে উৎপাদনে অগ্রাধিকার দেওয়ার মধ্য দিয়ে পুরুষপ্রাধান্যই স্বীকৃতি পায়। তা ছাড়া নারীর যেহেতু বিবেচনা বোধ কম, চপল স্বভাব, সে অবলা— তাই সব সময়ে সর্ব ক্ষেত্রে তার পুরুষের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। মনুর মতে শয়ন, উপবেশন, অলংকার প্রীতি, কাম-ক্রোধ, কুটিলতা, পরনিন্দা, মন্দ আচরণ— এই সমস্ত স্বভাবগত ভাব

দিয়েই স্রষ্টা নারীকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং, "গৃহে বালিকা, যুবতী বা বৃদ্ধা নারী স্বাধীনভাবে কিছু করবেন না। নারীকে কুমারী জীবনে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্র রক্ষা করে। নারী স্বাধীনতার যোগ্য নয়।" মনু অবশ্য নারীকে রক্ষা করা পুরুষের অন্যতম দায়িত্ব, কর্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, "পুরুষগণ কর্তৃক নারী সম্মানিত হলে দেবগণ প্রীত হন। যেখানে এঁরা সম্মানিত হন না, সেখানে সকল কর্ম নিষ্ফল হয়।" বলা বাহুল্য, নারীর প্রতি পুরুষের বহুবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বলা হলেও গুরুত্ব সর্বত্র দেওয়া হয়েছে নারীর পুরুষকে অনুসরণ ও মান্য করারই ওপর।

অন্যান্য ধর্মের মতন ইসলাম ধর্মও পিতৃতন্ত্র দ্বারা সুরক্ষিত। বিভিন্ন সামাজিক আচরণে বা ধর্মীয় ব্যবস্থাপনায় সেখানে পুরুষের প্রাধান্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। বিবাহ ব্যাপারে পুরুষ ও নারীর সমান ক্ষমতা তথা পছন্দের বিষয়টি স্বীকৃত হলেও 'মুতা' বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষেরই প্রাধান্য। তা ছাড়া, একজন পুরুষ ভিন্নধর্মাবলম্বী নারীকে বিবাহ করতে পারে, কিন্তু একজন নারী ভিন্নধর্মাবলম্বী পুরুষকে বিবাহ করার অধিকারী নয়। সর্বোপরি, পুরুষের ক্ষেত্রে বহুবিবাহ (চারটি স্ত্রী রাখার) ব্যবস্থা অনুমোদিত হলেও নারীর পক্ষে একাধিক স্বামী রাখার বিষয়টি স্বীকৃত নয়। বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারেও পুরুষ-প্রাধান্য। তিনবার উচ্চারণের মধ্য দিয়ে একজন পুরুষ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে সাধারণত তিনটি ঋতুপর্ব অতিক্রান্ত না হলে তালাক চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয় না। এই পর্বটিকে বলা হয় ইদ্দত (Idaat)। এই সময়টিকে নেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট মহিলা গর্ভবতী কি না তা জানার জন্য। এই ইদ্দত পর্বে নারীর পক্ষে অন্য বিবাহ-সম্পর্কে যাওয়া যায় না। কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে তেমন কোনও বিধি-নিষেধ নেই। তা ছাড়া নারীকে যৌথ উপাসনায় অংশগ্রহণ করা বা কবরস্থানে প্রিয় মৃত ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া বা শেষকৃত্য সম্পাদন করা থেকে বিরত রাখা হয়। পর্দা বা অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে নারীর পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়, পুরুষের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সেই রকম কিছু করা হয় না। সম্পত্তি অর্জন বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়েও লিঙ্গবৈষম্য লক্ষ করা যায়।

বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যা: অনেক তাত্ত্বিক আছেন যাঁরা পিতৃতন্ত্রকে জীবকোষ-নির্ধারিত বা ঈশ্বর-অভিষ্ট কিছু বলে গণ্য না করে সমাজবিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্বের সৃষ্টি মনে করেন। তাঁদের মতে পিতৃতন্ত্র কোনও সর্বজনীন/স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান নয়, সমাজবিকাশের আদি পর্বে পিতৃতন্ত্রের কোনও অস্তিত্বও ছিল না। সমাজ ছিল কম বেশি সমভোগী। সমাজবিকাশের কোনও এক বিশেষ পর্বে এসে আর্থ সামাজিক ঘটনা প্রবাহে পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ। জে. জে. বেকোফেন (J. J. Bachofen) ১৮৬১ খ্রি. প্রকাশিত *Das Mullerrech/Mother Rights* গ্রন্থে মন্তব্য করেন, আদিম সমাজে পিতৃতান্ত্রিক ধারণা গড়ে ওঠেনি। বরং সন্তান জন্ম দেবার ঘটনাটিকে অতিপ্রাকৃত বা দৈব ঘটনা অর্থাৎ নারীর ম্যাজিক/ইন্দ্রজাল ক্ষমতার প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হত। এর থেকে বেকোফেন এই সিদ্ধান্তে আসেন যে আদিম সমাজকাঠামো ছিল মাতৃতান্ত্রিক এবং মা ও সন্তানের সম্পর্কই ছিল সংস্কৃতি, ধর্ম ও সমাজকাঠামোর অন্যতম উৎস। কিন্তু যেহেতু কৃষিকার্যে

অধিকতর শ্রম প্রয়োজন এবং সেই শ্রম সরবরাহ করে পুরুষ, তাই সমাজ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পিতা-পুত্রের সম্পর্কই প্রধান বলে বিবেচিত হতে থাকে এবং ফলে উদ্ভূত হয় পিতৃতন্ত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, রবার্ট ব্রিফল্ট (Robert Briffault) তাঁর *The Mothers* (১৯২৭) গ্রন্থটিতে প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে আধুনিক পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মধ্যকার পার্থক্যকে শুধুমাত্র লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য বলে মনে করেননি। তাঁর ধারণা, প্রাচীন মাতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রাধান্যের ধরন ছিল গুণগত ভাবে ভিন্ন। কারণ, সেই সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। আধুনিক নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় মাতৃতন্ত্র, মাতৃবংশধারা এবং মাতুলগৃহে বাস-এর মধ্যে পার্থক্য করা হয় এবং মনে করা হয়, প্রাচীন যুগে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ বলতে নারীর অধীন পুরুষকে (অর্থাৎ আধুনিক কালে যে অর্থে পুরুষ বা পিতৃতন্ত্র বলতে পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন নারীকে বোঝায় সে রকম) বোঝায় না। মূলত পুরুষই কর্তৃত্বের তথা সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী ছিল, কিন্তু সন্তানের বংশধারা মায়ের বংশধারাকে অনুসরণ করে হত।

প্রসিদ্ধ নৃবিজ্ঞানী মর্গান (L. H. Morgan) ১৮৭৭ খ্রি. প্রকাশিত *Ancient Society* গ্রন্থে মাতৃতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশকে মানব প্রজাতির শৃঙ্খলাবদ্ধ বিকাশের এক স্তর হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। মর্গান-এর বিশ্লেষণে ইরোকুইস ইন্ডিয়ান (Iroquis Indian)দের কৃষিভিত্তিক উৎপাদনব্যবস্থায় মাতৃতান্ত্রিক ধারাকে ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু, মর্গানের মতে, পরবর্তীকালে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের আগমনে কৃষি উৎপাদনব্যবস্থায় ও সমাজজীবনে পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নারীর ভূমিকার অবনতি ঘটে। মর্গান-এর গবেষণাকে অনুসরণ করে সম্প্রতি লিকক (Eleanor Burke Leacok, *Myths of Male Domination*, 1981) বর্তমান কানাডার অন্তর্গত Montagnais Naskapi এস্কিমোদের সমাজে পিতৃতন্ত্রের প্রসারে উপনিবেশিকতা কীভাবে কাজ করেছে সে বিষয়ে গবেষণা চালান। তাঁর মতে, ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের অনুপ্রবেশের আগে উপরোক্ত এস্কিমো সমাজে পশুশিকারী, মৎস্যশিকারি এবং সংগ্রাহক সমাজ-সংস্কৃতি ছিল মূলগতভাবে সাম্যবাদী, অর্থাৎ লিঙ্গগতভাবে সমমর্যাদা সম্পন্ন। বসবাসগত ভাবে সমাজব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক হওয়ায় বরঞ্চ নারীরাই পুরুষের তুলনায় কিছু সুবিধাভোগ করত। কিন্তু সপ্তদশ শতক থেকে ফরাসি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজব্যবস্থার রূপান্তর ঘটতে থাকে এবং সমাজে পুরুষ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। গণক্ষেত্র (public sphere) এবং ব্যক্তিক্ষেত্র (private sphere)-এর মধ্যে পার্থক্য ঘটতে থাকে। উৎসব-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য সব জায়গায় ওই গোষ্ঠীর ব্যাপক রূপান্তর দেখা যায়। সমাজ ক্রমশ পিতৃতান্ত্রিক হয়ে ওঠে। ঔপনিবেশিকতাবাদ সচেতন ভাবে এবং সুস্পষ্ট রূপে পুরুষের হাতে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়াকে কার্যকর করে তোলে এবং প্রক্রিয়াটি ইউরোপীয় মিশনারিদের মাধ্যমে প্রচারিত পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের কল্যাণে আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। একই প্রক্রিয়া আফ্রিকা এবং অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশগুলিতেও, যেখানে যেখানে ইউরোপীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছে, লক্ষ করা যায়।

ইউরোপে পিতৃতন্ত্রের গড়ে ওঠার ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নৃতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক উইসনার হ্যাঙ্কস (Merry E. Wiesner Hanks) পিতৃতন্ত্রের বিকাশের ইতিহাসকে তিনটি

পর্বে ভাগ করেন— এক. প্রাচীন যুগে পিতৃতন্ত্রের উদ্ভবপর্ব; দুই. পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকে পশ্চিমি ইউরোপে পিতা-কেন্দ্রিক পিতৃতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকতা; তিন. অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে উদারনৈতিক বিপ্লব এবং উনবিংশ শতকে বৈপ্লবিক সামাজিক আন্দোলনে পিতৃতন্ত্রের প্রতি চ্যালেঞ্জ। হ্যাঙ্কস-এর মতে, প্রাচীন যুগে পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে এক জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। সেখানে যে কোনও একটিকে একমাত্র কারণ (যেমন মার্কসবাদীরা মনে করেন) হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। সম্পত্তির মালিকানা, শ্রম বিভাজন, বিবাহ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা, আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় ধারণা— প্রভৃতি বিষয়গুলি পিতৃতন্ত্রের উদ্ভবে সাহায্য করেছে। বিপরীত ভাবে, পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্ববিন্যাস উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলিকে আরও পুষ্ট করে তুলেছে।

পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে সমাজ বিকাশের এক বিশেষ পর্বে সৃষ্ট, সে ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস (Frederick Engels), তাঁর *The Origin of the Family, Private Property and the State* (1884) গ্রন্থে। বেকোফেন ও মর্গান-এর রচনায় প্রভাবিত এঙ্গেলস বন্ধু কার্ল মার্কস-এর রেখে যাওয়া কিছু নোটের ভিত্তিতে তৈরি করেন বিখ্যাত গ্রন্থটি। উপরোক্ত তাত্ত্বিকদের মতো এঙ্গেলসও মনে করেন সমাজ বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্বে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোর রূপান্তর ঘটিয়ে পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব। মাতৃতন্ত্র থেকে পিতৃতন্ত্রের এই বিকাশে তিনি দুটি বিবর্তনের কথা বলেন। মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্পদের মালিকানা ছিল যৌথ। কিন্তু কৃষি ও পশুপালনের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ ফসল, গৃহপালিত পশু ও জমির মালিকানা দাবি করতে থাকে এবং এভাবে ব্যক্তিগত মালিকানার (পিতৃতন্ত্রের) বিকাশ ঘটে। ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকারী হওয়ার মুহূর্ত থেকে পুরুষ তার সেই সম্পত্তিকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করার বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে। তার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে নারীর যৌন জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ, যাতে করে সে সুনিশ্চিত হতে পারে যে, সন্তানটি বৈধ, অর্থাৎ তারই ঔরসজাত। এরই ফলে উদ্ভূত হয় একগামিতা (যদিও পুরুষের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম লক্ষণীয়), পিতার কর্তৃত্বসম্পন্ন পরিবার এবং তারই সম্প্রসারিত রূপ রাষ্ট্র— যেখানে নারীর উপর পুরুষের মালিকানা/আধিপত্যের বৈধকরণ বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থায়, ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পুরুষকেন্দ্রিক সমাজে, নারী অর্থনৈতিক উৎপাদন ও সন্তান পুনরুৎপাদনের এক যন্ত্রে পরিণত হয়। নারীর এই অধীনতাকে এঙ্গেলস এক বিরাট ঐতিহাসিক পরাজয় বলে মনে করেন। ১৮৪৮ খ্রি. প্রকাশিত *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো*-তেও কার্ল মার্কস ও ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব ও নারীর অবনমনের ব্যাপারে একই মত ব্যক্ত করেন এবং বিবাহ ব্যাপারে একগামিতা থাকা সত্ত্বেও পুরুষের বহুগামিতার বিষয়টি তুলে ধরেন। নারীর এই অবনমনকে সতীত্ব/নারীত্ব এবং ভালবাসার বিবিধ মোড়কে সঙ্গত ও কাঙ্ক্ষিত বলে ভাবা হলেও বাস্তবে তা ছিল পুরুষ-স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে এক সংগঠিত ভণ্ডামি। মার্কসবাদীরা মনে করেন, পিতৃতন্ত্রের ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাও উপকৃত হয়। কারণ, নারীকে গৃহের এবং গৃহস্থালির কাজের মধ্যে আবদ্ধ রেখে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে প্রতিদিন সুস্থ ও সবল শ্রমিক

(পুরুষ) সরবরাহ করা এবং প্রজনন ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমিক সরবরাহ অব্যাহত রাখা সম্ভবপর হয়। তা ছাড়া জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে যখন শ্রমিকের ঘাটতি দেখা যায় তখন নারীরা সংরক্ষিত এবং স্বল্প মজুরিভোগী শ্রমিক হিসাবে কাজে লাগে। মার্কসবাদীরা মনে করেন, ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটিয়ে শ্রমিক শ্রেণির চূড়ান্ত বিজয়ই একমাত্র এই দূরবস্থা থেকে নারীর প্রকৃত মুক্তি ঘটাতে পারবে।

নির্মিতিবাদী ব্যাখ্যা: নির্মিতিবাদী তত্ত্বে পিতৃতন্ত্রকে এক স্বাভাবিক প্রকৃতিসঞ্জাত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য না করে তাকে সমাজনির্মিত ভাবা হয়। বিষয়টি ব্যাখ্যার জন্য যৌন (sex) এবং লিঙ্গ (gender)— এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। মনে করা হয়, যৌন বিষয়টি প্রকৃতিগত, কিন্তু লিঙ্গ, তথা নারী-পুরুষের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কিত তত্ত্ব ও ধারণাগুলি সমাজ সৃষ্টি করে থাকে। নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা নির্মিতিবাদী তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা হলেও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা: প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud 1856-1937) পিতৃতন্ত্রকে স্বাভাবিক বা জীবপ্রকৃতি থেকে উদ্ভূত কিছু বলে ভাবেন না। তাঁর মতে পুরুষাঙ্গের (phallus) নির্মাণ (যা প্রকৃতিগত নয়) পিতৃতন্ত্র ও ক্ষমতার প্রতীক হিসাবে কাজ করে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের এক বিশেষ পর্যায়ে (তৃতীয় পর্যায়ে) পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব। ব্যক্তিত্ব বিকাশের এই পর্বটিকে ফ্রয়েড পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। প্রথম দুটিতে শিশুর মনে যৌন ভিন্নতা সম্পর্কে কোনও ধারণা থাকে না এবং নিজেকে সে মায়ের সঙ্গে একাত্ম বলে মনে করে। কিন্তু তৃতীয় পর্বে অর্থাৎ লিঙ্গ পর্বে (বয়সকাল ৩ থেকে ৬) শিশু তার জননেন্দ্রিয় সম্পর্কে সচেতন হতে থাকে এবং যৌন ভিন্নতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। এই পর্বটিকে ফ্রয়েড যৌনতা এবং ব্যক্তিস্বরূপ সূচনার এক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব বলে উল্লেখ করেন, কারণ এই পর্বেই পিতৃতান্ত্রিক ধারণার উদ্ভব হয়। এই পর্বে শিশুর সত্তা/অহম নিজেকে মায়ের সত্তা/অহম থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়, মাকে প্রচণ্ডভাবে পেতে চায় এবং পিতার প্রতি এক ধরনের আক্রোশ গড়ে তোলে। কিন্তু মায়ের সঙ্গে পিতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের (একত্রে শয্যাগ্রহণ ইত্যাদির) কথা ভেবে সে ভীত থাকে। আশঙ্কা, সন্তানের ইচ্ছা, ঈর্ষা, ঘৃণা প্রভৃতি প্রকৃত অনুভূতিগুলি জেনে ফেলে, ফলস্বরূপ তিনি হয়তো পুত্রের মুষ্কচ্ছেদ (castration) করতে পারেন। এই পর্বটিকেই ফ্রয়েড অভিহিত করেছেন 'ইদিপাস কমপ্লেক্স' (Oedipus Complex) হিসেবে (ইদিপাস— গ্রিক পুরাণের সেই থিব্‌স-এর রাজা, অজান্তে যিনি পিতাকে হত্যা করে নিজেরই মাকে বিবাহ করেছিলেন) পুত্র অবশ্য এই সংকট অতিক্রম করে মায়ের প্রতি তার আকাঙ্ক্ষাকে পরিত্যাগ করে এবং পিতার পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্বের সঙ্গে সাদৃশ্য কল্পনা করতে থাকে। মায়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থেকে কন্যার মনেও একই সংকট সৃষ্টি হয়, কিন্তু সে উপলব্ধি করে যে মায়ের মতো তারও পুরুষ যৌনাঙ্গ (penis) নেই। ফ্রয়েড একে বলেছেন 'পুরুষ যৌনাঙ্গ-ঈর্ষা' বা 'ঘাটতি তত্ত্ব' (Theory of Lack), যা নারীর যৌনতা বোধ ও মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি তৈরিতে সাহায্য করে এবং যা কন্যার মনে সারা জীবন ধরে টিকে থাকে। এক্ষেত্রে কন্যা এই সমস্যার সমাধান করে এই ভাবে যে, যেহেতু তার মা'র

ক্ষেত্রেও এই ঘাটতি আছে তাই সে মায়ের পরিবর্তে বাবার প্রতি আসক্ত হয় এবং তার ইচ্ছাকে পূরণ করতে চায় সন্তান লাভের মধ্য দিয়ে। ফ্রয়েডের এই বিশ্লেষণকে পরবর্তীকালে সম্প্রসারিত করেন জ্যাক লাকাঁ (Jaques Lacan, 1901-1981)। ফ্রয়েডের মতো জ্যাক লাকাঁ-ও মনে করেন, পুরুষাঙ্গ (phallus)-কে এক সাংস্কৃতিক নির্মাণ হিসাবে দেখা উচিত, যা জৈবিক পুরুষলিঙ্গ (penis)-এর প্রতীকী ক্ষমতারই বিশিষ্ট রূপ। পুরুষাঙ্গের এই সাংস্কৃতিক নির্মাণ ঘটে ইদিপাস পর্বে (ফ্রয়েডের বিশ্লেষণে তৃতীয় তথা লিঙ্গ পর্বে), যখন শিশুটি মায়ের সঙ্গে সন্তোষ মগ্ন আত্মিক/অভিন্ন সম্পর্ককে ভেঙে ফেলে প্রতীকী জগতে তথা ভাষার জগতে প্রবেশ করে এবং স্বতন্ত্র বিষয়ী (Subject) হয়ে ওঠে। ভাষা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে শিশু ক্রমশ ভিন্নতা/পার্থক্যকে বুঝতে শেখে; ভাষাধিকারী 'বিষয়ী' শিশুটি বলতে শেখে 'আমি' এবং 'তুমি' এবং এভাবেই সে ভিন্নতা দিয়ে নিজস্ব সত্তা/অহম গড়ে তোলে। সুতরাং বলা যায়, ভাষা ঘাটতিকে চিহ্নিত করে অর্থাৎ ভাষা ঘাটতির উপর গড়ে ওঠা এক ব্যবস্থাপনার মধ্যস্থতায় কাজ করে এবং প্রতিটি শব্দ তথা চিহ্নায়ক (signifier) কোনও নিখোঁজ বিষয় বা চিহ্নিতের (signified-এর) জায়গা নেয়। উপরন্তু, পিতার উপস্থিতি তথা প্রভেদের প্রতিনিধিত্ব করে পুরুষাঙ্গ (phallus), যা পিতারই দখলে থাকা ক্ষমতার এক প্রতিবিম্ব এবং যা মায়ের দৈহিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে এক বিভাজন ও ঘাটতি বলে মনে হয়। পুরুষাঙ্গ সেই ঘাটতিরই চিহ্নায়ক— তার প্রকৃত বাস্তব অঙ্গ নয়। এ ক্ষেত্রে লাকাঁ পুরুষ লিঙ্গ (penis)কে জৈবিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এবং পুরুষাঙ্গ (phallus)-কে ক্ষমতার প্রতীক হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। একজন পুরুষ পুরুষলিঙ্গের অধিকারী হলেও পুরুষাঙ্গের অধিকারী নাও হতে পারে; অর্থাৎ ক্ষমতার অধিগম্যতা তার নাও থাকতে পারে। পিতৃতন্ত্র এই পুরুষাঙ্গের তথা ক্ষমতারই তন্ত্র।

অধিকাংশ নারীবাদী তাত্ত্বিকই, যেমন ইভা ফিগেস (Eva Figes, 1970), শুলামিথ ফায়ারস্টোন (Shulamith Firestone, 1970) এবং জার্মেন গ্রিয়ার (Germaine Greer, 1970) উপরোক্ত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকে বিশেষত নারীত্ব, নারীর যৌনতা, মুষ্কচ্ছেদন (castration), পুরুষাঙ্গ-ঈর্ষা (স্তন ইর্ষা নয় কেন?) প্রভৃতি ফ্রয়েডের ধারণাগুলির কঠোর সমালোচনা করেন এবং মনে করেন ফ্রয়েডের তত্ত্ব আসলে পিতৃতন্ত্রের সমর্থনের তত্ত্ব, যা নারীকে অবচেতনভাবে অসম্পূর্ণ, মনস্তাত্ত্বিকভাবে নিকৃষ্ট এবং ঈর্ষাপরায়ণ জীব বলে গণ্য করে। কেট মিলেট (Kate Millett, 1970) ফ্রয়েডের তত্ত্বকে আরও কঠোর ভাবে সমালোচনা করে বলেন, ফ্রয়েডের তত্ত্ব নারী ও পুরুষের ঈর্ষাজনিত সম্পর্ককে বৈধতা দান করে, ভূমিকা ও স্বভাবের ভিন্নতাকে তুলে ধরে। কিন্তু নারীবাদী তাত্ত্বিকদের একাংশ, যেমন জুলিয়েট মিচেল (Juliet Mitchell, 1971) মনে করেন, প্রথম পর্বের নারীবাদী তাত্ত্বিকদের ফ্রয়েড-পাঠ ভুল। কারণ, পুরুষের তুলনায় নারী জৈবিকভাবে নিকৃষ্ট— এটা দাবি করা ফ্রয়েডের লক্ষ্য নয়। বরঞ্চ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীকে এভাবে নির্মাণ করা হয় কেন সেটা বোঝার জন্য ফ্রয়েড এক বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা হাজির করেছেন। এক কথায়, ফ্রয়েডের তত্ত্ব পিতৃতন্ত্রের সমর্থনে নয়; পিতৃতন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচনের। জুলিয়া ক্রিস্তেভা (Julia Kristeva,

1979) বা লুসি ইরিগারে-র (Luce Irigaray) মতো নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা জ্যাক লাকাঁ-র তত্ত্বে প্রভাবিত হলেও লাকাঁ-র তত্ত্বকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি। লাকাঁর এই তত্ত্বকে ক্রিস্তেভা মেনে নেননি এই কারণে যে, ইদিপাস তথা প্রতীকী স্তরে মানুষ যখন ভাষা রপ্ত করে যুক্তিবাদী জীবের ভূমিকা নেয় তখন পিতৃতন্ত্র এক দমনমূলক রাজনৈতিক কাঠামো হিসেবে কাজ করে। পুরুষত্বের তথা পিতৃতন্ত্রের এই বিষয়ী অবস্থান সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভাবেই নির্মিত হয় এবং নারী ও পুরুষের ভিন্নতাকে সূচিত করে। এর সঙ্গে জৈবিকতার বা নৈতিকতার কোনও সম্পর্ক নেই। লুসি ইরিগারেও মনে করেন, পিতৃতন্ত্র পুরুষের স্বার্থ/ক্ষমতাকেই তুলে ধরে, যেহেতু পুরুষাঙ্গ এক সুবিধাভোগী চিহ্নায়ক যা ভাষা ও আকাঙ্ক্ষার প্রকাশকে চিহ্নিত করে। কিন্তু এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কীভাবে পিতার কাছ থেকে পুত্রের কাছে সঞ্চারিত/সংক্রামিত হয় সে সম্পর্কে ইরিগারে যথেষ্ট সমালোচনাত্মক, পরিবর্তে ইরিগারে বুঝতে চেয়েছেন সেই উপেক্ষিত মা-কে যিনি অধিবিদ্যক নির্মাণের ফলে আড়ালে থেকে যান। ইরিগারে এই কারণে সংস্কৃতির এক নারীপাঠের পক্ষপাতী এবং সেটা করতে গিয়ে তিনি প্রাক্-ইদিপাস প্রতিবিম্বনস্তরে, ভাষারপ্ত পর্বেরও আগেকার প্রাক্-পিতৃতান্ত্রিক অবস্থানে ফিরে যেতে চান। নারীর আত্মপরিচয় সম্পর্কে আগ্রহী নারীবাদী তাত্ত্বিক হেলেন শিশু (Helene Cixous)-ও প্রাক-পিতৃতান্ত্রিক পর্বে মায়ের সঙ্গে কন্যার প্রতিবিম্ব-সম্পর্কের মধ্যে নারীর কণ্ঠস্বর (women's voice) খুঁজে নিতে আগ্রহী (*The Newly Born Women*, 1975)।

নারীবাদী বিশ্লেষণ: পিতৃতন্ত্র সম্পর্কে তত্ত্ব রচনা করতে গিয়ে নারীবাদী তাত্ত্বিকেরা মার্কসীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন সব চাইতে বেশি। মার্কসীয় তাত্ত্বিকদের মতো নারীবাদী তাত্ত্বিকেরাও মনে করেন, নারীর বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক বঞ্চনা প্রকৃতিগত নয়— সমাজের সৃষ্টি। সমাজবিকাশের এক নির্দিষ্ট স্তরেই এর জন্ম। তবে নারীবাদীরা মনে করেন, পিতৃতন্ত্রের বিশ্লেষণে মার্কসীয় তত্ত্ব অপূর্ণ, অপর্যাপ্ত এবং অনেকের মতে, ভ্রান্ত। মার্কসবাদীরা শোষণের চিহ্ন (marker) হিসাবে শ্রেণিকে গুরুত্ব দেন কিন্তু লিঙ্গও যে শোষণের চিহ্ন হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সে সম্পর্কে নীরব থাকেন। মার্কসবাদীদের বক্তব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে অবশ্য সব নারীবাদী একমত নন। উদাহরণ স্বরূপ, পিতৃতন্ত্রের উৎস খুঁজতে গিয়ে লার্নার (Gerda Lerner, 1986) মূলত এঙ্গেলস-এর ধারাকে অনুসরণ করে বলেন, সমাজ বিকাশের এক নির্দিষ্ট স্তরে পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব। কিন্তু তিনি মনে করেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ও শ্রেণিবিভক্ত সমাজ গড়ে ওঠার আগেই নারীর যৌনতা ও পুনরুৎপাদন ক্ষমতার উপর পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। নারী হল পুরুষের প্রথম সম্পত্তি— বিবাহ (স্ত্রী), বেশ্যা ও ক্রীতদাসী ব্যবস্থার মাধ্যমে তার বহিঃপ্রকাশ। তা ছাড়া, এঙ্গেলস-এর মতো লার্নার পিতৃতন্ত্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনকে যুক্ত করলেও অবস্তুগত বিষয়গুলি, যেমন ধর্ম ও দর্শনের মাধ্যমে প্রতীকের ও প্রতীকী অর্থের সৃষ্টি ও ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। লার্নার মনে করেন, ১. ব্যক্তিগত সম্পত্তি-ভিত্তিক শ্রেণি-সমাজ গড়ে ওঠার আগেই নারীর যৌনতা ও প্রজনন ক্ষমতার উপর পুরুষের দখল প্রতিষ্ঠিত হয়। ২. পিতৃতন্ত্রের

আঙ্গিকেই প্রাচীনকালের রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। সুতরাং রাষ্ট্রের সূচনাপর্ব থেকেই পিতৃতান্ত্রিক পরিবার রক্ষা এর অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ৩. নিজ পরিবার/গোষ্ঠীর নারীর উপর কর্তৃত্ব প্রদর্শনের পূর্বতন অভ্যাস থেকেই পুরুষ অন্যান্য মানুষের উপর তার ক্ষমতার প্রয়োগ ও বিন্যাসের ব্যবস্থা গড়ে তোলে। ৪. নারীর যৌনতার উপর পুরুষের আধিপত্য প্রাচীনকালে বিভিন্ন প্রথা, রীতিনীতি, আইনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় এবং রাষ্ট্রের সর্বাত্মক শক্তি তাকে বলবৎ করে। ক্ষমতা প্রয়োগ, পরিবারের পুরুষ-প্রধানের উপর আর্থিক নির্ভরশীলতা, অধীনস্থ শ্রেণির নারীর তুলনায় উচ্চ শ্রেণির নারীর শ্রেণিগত সুযোগ সুবিধা, নারীদের মধ্যে কৃত্রিম ভাবে মর্যাদা ও অ-মর্যাদাসম্পন্ন শ্রেণি বিভাজন— প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি নারীদের সহযোগিতা আদায় করে নেওয়া হয়। ৫. মার্কসবাদী শ্রেণি-বিশ্লেষণ মূলত উৎপাদন উপকরণের সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক বিশ্লেষণ। উৎপাদন উপকরণের মালিক এক শ্রেণির পুরুষ সেই সমস্ত পুরুষদেরই উপর প্রাধান্য স্থাপন করে যাদের উৎপাদন উপকরণের কোনও মালিকানা নেই। নারীর কাছে এই শ্রেণি-ধারণা সংশ্লিষ্ট এমন কোনও পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সংক্রামিত হয় যে তাকে বস্তুগত সম্পদ ভোগের সুযোগ করে দেয়। এবং এই সুযোগের ভিন্নতা থেকেই মর্যাদা ও অমর্যাদার ভিত্তিতে নারীর শ্রেণি-বিভাজন হয়ে থাকে। ৬. যৌনগত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে নারীর এই অধীনতা ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন, ঈশ্বরের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক ভাবনা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়। এভাবেই প্রধান ধারণা সমূহ, প্রতীক-রূপক-সমৃদ্ধ নারী-পুরুষ সম্পর্কের ভিন্নতা তথা নারীর অধীনতাকেই তুলে ধরে।

পিতৃতন্ত্রের রাজনৈতিক দিকটির সবিস্তার আলোচনা করেছেন বিশিষ্ট নারীবাদী তাত্ত্বিক কেট মিলেট (Kate Millett), তাঁর ১৯৬৯ খ্রি. প্রকাশিত (*Sexual Politics*) গ্রন্থে। লিঙ্গ রাজনীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মিলেট রাজনীতিকে সংকীর্ণ অর্থে রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করে সমাজসম্পর্কের যে-কোনও ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন এবং পিতৃতন্ত্রকে লিঙ্গ রাজনীতির ধারক ও বাহক হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, পিতৃতন্ত্র হল মানব সমাজে এক লিঙ্গ (পুরুষ)-এর হাতে অন্য লিঙ্গ (নারী)-র নিয়ন্ত্রণ, যা সর্বজনীন, শাশ্বত এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। পিতৃতন্ত্রে তিনি দু'ধরনের নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন। প্রথমটি নারীর উপর এক বর্গ হিসেবে অন্য বর্গ পুরুষের নিয়ন্ত্রণ এবং দ্বিতীয়টি বয়ঃকনিষ্ঠ পুরুষের উপর বয়োঃজ্যেষ্ঠ পুরুষের নিয়ন্ত্রণ (পৃ. ৩৪)। পিতৃতন্ত্র যে-সমস্ত মাধ্যমগুলির সাহায্যে কাজ করে বা বলা যায় পিতৃতন্ত্রের সমর্থকেরা যে সমস্ত যুক্তি হাজির করেন সেই সব যুক্তির বিশ্লেষণে তিনি অগ্রসর হন। সেগুলি হল যথাক্রমে মতাদর্শগত (Ideological), জৈবিক (Biological), সমাজতাত্ত্বিক (Sociological), শ্রেণি (Class) সংক্রান্ত, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত ((Economic and Educational), বলপ্রয়োগ (Force) বিষয়ক, নৃতাত্ত্বিক: অতিকথা ও ধর্ম সংক্রান্ত (Anthropological: Myth and Religion) এবং মনস্তাত্ত্বিক (Psychological)। মিলেট-এর মতে লিঙ্গ রাজনীতি উভয় লিঙ্গেরই সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়ে টিকে থাকে। স্বভাব (পুরুষ আক্রমণাত্মক, বুদ্ধিমান, ক্ষমতাবান; নারী নিষ্ক্রিয়,

অজ্ঞ, আবেগপ্রবণ ইত্যাদি), ভূমিকা (পুরুষ ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি গণক্ষেত্রের সঙ্গে আর নারী পরিবারের মধ্যে সন্তান প্রজনন, প্রতিপালন, সেবা ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত) এবং পদমর্যাদা (নারীর তুলনায় পুরুষ শ্রেষ্ঠ/উৎকৃষ্ট)— ইত্যাদি বিষয়ে পিতৃতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি সামাজিকীকরণের মাধ্যমে সম্মতি আদায় করে। মিলেট মনে করেন, পদমর্যাদা (রাজনৈতিক), ভূমিকা (সমাজতাত্ত্বিক) এবং স্বভাব (মনস্তাত্ত্বিক) পরস্পর সম্পর্কিত ও একই সূত্রে গ্রথিত, এবং তা সামগ্রিকভাবে নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য তথা পিতৃতন্ত্রকেই পুষ্ট করে।

১৯৭০-এর দশকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে নারীর শ্রম নিয়ে বস্তুবাদী, সমাজতন্ত্রী ও মার্কসবাদী নারীবাদীদের মধ্যে এক তাত্ত্বিক বিরোধ লক্ষ করা যায়। ডেলফি-র (Christine Delphy, 1984) মতন বস্তুবাদী নারীরা পরিবার-শ্রমকে সুবিধাভোগী পুরুষের হাতে লুণ্ঠিত অবৈতনিক শ্রম হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। অন্যদিকে মার্কসবাদী নারীবাদীরা মনে করেন পরিবারে দেওয়া নারীর শ্রম শুধু যে পরিবারের পুরুষেরই কাজে লাগে তা নয়, প্রতিদিনের তরতাজা শ্রমশক্তির জোগান দিয়ে এবং প্রজনন ব্যবস্থার মাধ্যমে ভবিষ্যতের শ্রমিক সরবরাহ করে সামগ্রিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই তা অব্যাহত রাখে। জুলিয়েট মিচেল (Juliet Mitchell, 1971)-এর মতন সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীদের বক্তব্য হল, পুঁজিবাদ ও পিতৃতন্ত্র পরস্পর নির্ভরশীল এবং এই কারণে নারীর শোষণের প্রকৃত চিত্র উদঘাটন করতে গেলে শ্রেণি এবং লিঙ্গ— উভয় ধারণারই বিশ্লেষণ প্রয়োজন। মিচেল-এর মতে নারীর অবস্থান চারটি কাঠামোর উপর নির্ভর করে: ১. উৎপাদন— শ্রমের জোগানদার হিসেবে; ২. পুনরুৎপাদন— সন্তান প্রজননের মাধ্যমে; ৩. সামাজিকীকরণ— সন্তান প্রতিপালনের মাধ্যমে; ৪. যৌনতা— যৌন বিষয়/সামগ্রী হিসাবে। এ কারণে মিচেল শুধুমাত্র পুঁজিবাদী কাঠামো থেকে মুক্তির বদলে পরিবার সহ সমস্ত কাঠামো থেকেই নারীর মুক্তির কথা বলেন। পরিবার ব্যবস্থা বিলোপের জায়গায় মিচেল সম্পর্কের বহুত্বের উপর দাঁড়ানো এক সমাজের কথা বলেন, যেখানে নারী শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বা যৌন সামগ্রী নয়। হার্টম্যান (Heidi Hartmann, 1997)-ও মনে করেন নারীর অধীনতা পুঁজিবাদ ও পিতৃতান্ত্রিকতার যুগ্ম ফসল, অর্থাৎ একটি ব্যবস্থা অন্য ব্যবস্থাটিকে সাহায্য করে চলে। হার্টম্যান মন্তব্য করেন, নারীবাদী বিশ্লেষণ সেই পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শকে তুলে ধরে যা যে-কোনও সমাজেরই পুরুষের প্রাধান্যকে এবং নারীর অধীনতাকে জৈবিক ভিন্নতার দোহাই দিয়ে এক ঐতিহাসিক ভিত্তি দিতে চায়। পিতৃতন্ত্রের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পিতৃতন্ত্র এক ধরনের সামাজিক সম্পর্কের কাঠামো/সাজানো ব্যবস্থা (set) যার একটা বস্তুগত ভিত্তি আছে এবং যা ক্রমোচ্চ স্তরবিন্যস্ত হলেও, পুরুষদের মধ্যে এক ধরনের পরস্পর নির্ভরশীলতা বা ঐক্য গড়ে তোলে এবং নারীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সাহায্য করে। যে বস্তুগত ভিত্তির উপর পিতৃতন্ত্র দাঁড়িয়ে থাকে তা হল নারীর শ্রমক্ষমতার উপরে পুরুষের নিয়ন্ত্রণ। পরিবারের মধ্যে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র নারীশ্রম নিয়ন্ত্রিত হয় না; সমাজ কাঠামোর প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীশ্রমকে পুরুষরা নিয়ন্ত্রিত করে। এই নিয়ন্ত্রণকে কার্যকরী করা হয় অর্থনৈতিকভাবে

উৎপাদনশীল সম্পদে নারীর অধিগম্যতা রোধ করে এবং নারীর যৌনতাকে সীমিত করে। এভাবে নারীকে তার অর্থনৈতিক ভাবে উৎপাদনমূলক সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে পুরুষ পুঁজির সঙ্গে এক ধরনের গাঁটছড়া বাঁধে। এর অন্যতম প্রমাণ হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশ এবং তার সমস্যা মোকাবিলায় রক্ষণমূলক আইন প্রণয়ন এবং পারিবারিক মজুরির দাবি উত্থাপন। এই দু'ধরনের ব্যবস্থাকেই পুরুষ শ্রমিকেরা তাদের সুবিধার জন্য সমর্থন করে, যাতে নারীদের পরিবারে আবদ্ধ রেখে তাদের সেবা আদায় করা যায় এবং তাদের যৌনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

মার্কসবাদী তাত্ত্বিকেরা অবশ্য নারীবাদীদের মতন পুঁজিবাদ এবং পিতৃতন্ত্রকে পৃথক/স্বতন্ত্র/পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিষয় হিসাবে দেখতে নারাজ। লিন্ডসে জার্মান (Lindsey German, 1981) এ ব্যাপারে মার্কসবাদীদের বক্তব্য উপস্থাপন করে বলেন, প্রথমত, পুঁজিবাদ সমাজের ভিত্তি হিসাবে এবং পিতৃতন্ত্র উপরিসৌধ হিসাবে কাজ করে এবং পিতৃতন্ত্রের প্রকৃতি ও অস্তিত্ব নির্ভর করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রকৃতি ও অস্তিত্বের উপর। যে কারণে উভয় ব্যবস্থা পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র নয়। এবং পিতৃতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবেই পুঁজিবাদ কাজ করে। দ্বিতীয়ত, পুরুষের চক্রান্তে বা ইচ্ছার ফলে পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেনি। পিতৃতন্ত্রের মূল সুবিধাভোগীও পুরুষ নয়। পিতৃতন্ত্রের উদ্ভব ও নারীর অবনয়ন ঘটেছে ব্যক্তিমালিকানার উদ্ভবে এবং পুঁজিবাদ সেই মালিকানাকে সম্প্রসারিত করেছে। পিতৃতন্ত্রের ফলে পুঁজিবাদ তাই উপকৃত হয় এবং শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অস্তিত্ব ও ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। তৃতীয়ত, সমস্ত পুরুষকে একটি শোষণকারী বর্গ এবং সমস্ত নারীকে অপর একটি শোষিত বর্গ হিসাবে না দেখে উৎপাদন উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে শোষণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করাই কাম্য। ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকারী মুষ্টিমেয় কিছু পুরুষ (এবং হয়তো বা নারীও) শোষক এবং বাকি সকলে শোষিত (যার মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয়ই আছে)। লেনিন (V. I. Lenin) এক্ষেত্রে নারী দু'ভাবে (এক, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কারণে এবং দুই, স্বামীর হাতে) শোষিত হয় বলে উল্লেখ করেছেন এবং তার জন্য পুঁজিবাদীশোষণমুক্তিকেই নারীমুক্তির অন্যতম শর্ত বলে মনে করেন। চতুর্থত, মার্কসবাদীরা পরিবারব্যবস্থাকে (এবং অর্থনৈতিক কাঠামোকে) স্থায়ী অপরিবর্তনীয় বিষয় হিসাবে যেহেতু দেখেন না তাই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীর (এবং পুরুষেরও) আন্দোলনকে অর্থনীতি-নিরপেক্ষ হিসাবে ব্যাখ্যা করারও পক্ষপাতী তাঁরা নন। প্রাক্-পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পরিবারের নারী ও পুরুষ উভয়েই উৎপাদনে অংশ নিত যেহেতু উৎপাদনব্যবস্থা ছিল অনেকাংশে পরিবারনির্ভর। সম্পত্তির মালিকানা পুরুষের হাতে থাকায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পুরুষের হাতেই ছিল। পুরুষের দায়িত্বও ছিল পরিবারের সকলকে নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করা এবং নিরাপত্তা বিধান করা। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশে (যেমন ব্রিটেনে) পারিবারিক উৎপাদনব্যবস্থার ধ্বংস ঘটিয়ে কারখানাব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং এখানে পুরুষ ও নারী উভয়েই (শিশুও) শ্রমদানকারী হিসাবে যোগ দেয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অবশ্য শ্রমজীবী পুরুষ ও নারীর মধ্যে এক ধরনের সমতা সৃষ্টি করে। কারণ অধিকাংশ পুরুষ তাদের সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে

বঞ্চিত হয়ে শ্রমিক শ্রেণিতে পরিণত হয়। এই কারণে এঙ্গেলস শ্রমিক পরিবার ও বুর্জোয়া পরিবারের মধ্যে পার্থক্য করেন এবং কার্যত অস্তিত্বহীন শ্রমিক পরিবারের কথা বলেন। শ্রমিক পরিবারে পুনরুৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন চোখে পড়ে। শিশু মৃত্যুর হার বাড়ে এবং পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে ম্যানচেস্টারে এক বছরে ন' বছর বয়সি এক লাখ শিশুর মধ্যে ২৬১২৫ জন শিশু মারা যায়। নারী শ্রমিকের স্বল্প বেতন, শ্রম-সময়, গর্ভাবস্থায় শ্রমদান প্রভৃতি বিষয়গুলি নারী শ্রমিকের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে। এরই ফল হিসাবে উন্নতমানের জীবনযাত্রা, নারী (এবং শিশু) শ্রমিকের শ্রম-সময় হ্রাস, গর্ভাবস্থায় সুযোগ সুবিধা দান, শিশুশ্রম নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়মবিধি চালু করা হয় এবং তা একমাত্র পুরুষের প্রয়োজনেই নয়।

তা ছাড়া, পুঁজি তথা পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পুরুষ কয়েকটি কর্মক্ষেত্র থেকে নারীকে অপসারিত করেছে বলে হার্টম্যান যে দাবি করেন, মার্কসবাদী তাত্ত্বিক লিন্ডসে জার্মান তারও বিরোধিতা করেন। লিন্ডসের মতে, দক্ষ শ্রমিকের জন্য (যে দক্ষতা রপ্ত করা তৎকালীন পরিস্থিতিতে নারীর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না) পুঁজিবাদ (অর্থাৎ তার বাহক বুর্জোয়া পার্লামেন্ট) শুধুমাত্র নারীকেই বঞ্চিত করেনি। শ্বেতাঙ্গ দক্ষ পুরুষশ্রমিক অদক্ষ নারীকে (শ্বেতাঙ্গ, অশ্বেতাঙ্গ নির্বিশেষে), শিশুকে, বহিরাগত শ্রমিককে (নারী পুরুষ নির্বিশেষে) এবং এমনকী দক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিককেও বঞ্চিত করেছে। বঞ্চিত পুরুষশ্রমিকরা তখন, হার্টম্যান-কল্পিত সংগঠিত, একশৈলিক (monolithic) শ্রেণি ছিল না। অধিকাংশ শ্রমিক কোনও সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত ছিল না যাতে করে তারা সংগঠিতভাবে দাবি উত্থাপন করতে বা আন্দোলন করতে পারে। তারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও তার অনুসারী প্রাধান্যকারী মতাদর্শকেই (যেমন নারীর অবস্থান সম্পর্কে পিতৃতান্ত্রিক ধ্যানধারণা) মেনে নিয়েছে। সে সময় সন্তান পুনরুৎপাদন জীবনের এক স্বাভাবিক (কখনও ঈশ্বর অভিপ্রেত) ঘটনা বলে মনে করা হত এবং এই রকম পরিস্থিতিতে নারী ও পুরুষ উভয়েই নারীকে সংরক্ষিত অবস্থায় রাখাটাই কাম্য বলে মনে করত। বিবাহের পর নারীকে গৃহে আবদ্ধ রাখা বা কারখানায় শ্রমদান থেকে বিরত করাকে পুরুষের চক্রান্ত হিসাবে না দেখে তৎকালীন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বিচারই বাঞ্ছনীয় বলে লিন্ডসে মনে করেন। এটা ঘটনা যে, উপরোক্ত পরিস্থিতি নারীর অধস্তন সামাজিক মর্যাদা থেকে সরে আসার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। পুঁজিবাদ সাম্যের প্রতিশ্রুতি দিলেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সেই সাম্যের বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শ্রমক্ষমতার পুনরুৎপাদনের স্বার্থে নারীকে বিচ্ছিন্ন এবং গৃহবন্দি করে তাদের শ্রমকে পরিবারের প্রতি, স্বামী-সন্তানের প্রতি শ্রম হিসাবে দেখা হতে থাকে। নারীকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থেকেও বঞ্চিত করা হয়। এই অবস্থা অবশ্য সকল নারীর বাস্তব চিত্র নয়। অনেক নারীই মজুরীশ্রমের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু প্রাধান্যকারী পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ সেই সমস্ত নারীর মনে এই ধারণারই জন্ম দেয় যে পরিবার এক পবিত্র প্রতিষ্ঠান এবং গতানুগতিক ভূমিকা পালন করাই নারীর অন্যতম কর্তব্য। তবে, জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ব্যাপক ব্যবহার, মজুরিশ্রমে নারীর যোগদান, নারীবাদী আন্দোলন ইত্যাদির ফলে নারীর প্রতি পুরুষের এবং

নারীদের মধ্যকার মানসিকতার এক বড় পরিবর্তন ঘটেছে। বস্তুগত পরিবর্তন মননজগতেও বড় রকম রদবদল এনেছে। তাই পিতৃতন্ত্রের প্রকৃতি পুরোমাত্রায় একই অপরিবর্তনীয় অবস্থায় রয়েছে— এ ধরনের যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয় বলেই লিন্ডসে মন্তব্য করেন।

হার্টম্যান দাবি করেন যে, পরিবারে নারীর শ্রমে পুরুষেরাই সুবিধা ভোগ করে। নারীর কাজ শ্রেণি, নৃকুল গোষ্ঠী ও ধর্মভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই সুবিধাভোগী শ্রেণি হল পুরুষ। নারীর তুলনায় পুরুষেরই ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার, বিশ্রাম তথা অবসরবিনোদন এবং ব্যক্তিগত সেবা গ্রহণের সুযোগ অনেক বেশি। লিন্ডসের মতে, এটা ঘটনা যে সন্তান প্রজনন, প্রতিপালন এবং গৃহকর্মের বোঝা নারীরাই মূলত বহন করে। কিন্তু এর থেকে কি এ কথা প্রমাণিত হয় যে, সেই নারীশ্রম থেকে একমাত্র লাভবান পুরুষেরাই? কারখানার ও পরিবারের কাজের মধ্যে এক ধরনের শ্রেণী বিভাজন রয়েছে। পরিবারের কাজের তুলনায় কারখানায় একাধিক ধাতুকে আগুনে পিটিয়ে জোড়া লাগানোর কাজ অনেক বেশি সুখের না কষ্টের— এ ধরনে দেখাটা পুরোপুরি বিষয়ীগত (subjective) বা অযৌক্তিক ভাবে দেখা। অবসর বিনোদন সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কারখানায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শ্রম দানের বাধ্যবাধকতা ও তজ্জনিত বিবিধ রোগ, দুর্ঘটনা, চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা, ক্লান্তি, হতাশা, কর্মক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা শ্রমিকের ক্ষেত্রে (যার অধিকাংশই পুরুষ) যেমন সত্য, তেমনি পরিবারে নারীর শ্রমের অমানবিক মূল্যায়ন, মর্যাদাহীনতা, নিরাপত্তাহীনতা, অধস্তন অবস্থান, তার শারীরিক অসুস্থতার প্রতি অবহেলা, যৌন লাঞ্ছনাও একই ভাবে সত্য। কিন্তু নারীর ওই অবস্থাকে পুরুষের সুবিধার জন্য পুরুষেরই তৈরি বলে গণ্য করলে নারী-পুরুষের যুগ্ম প্রচেষ্টায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ভাঙার পরিবর্তে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই এক অর্থে আড়াল করা হয়।

লিন্ডসের মতে, ১৯৬০-এর দশকে পিতৃতন্ত্র সম্পর্কে নারীবাদী তত্ত্ব গড়ে উঠেছিল এমন এক পরিস্থিতিতে যখন শ্রমবাজারে, শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে নারীর বঞ্চনার উপর প্রতিষ্ঠিত পুরনো পিতৃতান্ত্রিক ধ্যানধারণার সংঘাত বাধে। বস্তুত সুবিধা লাভ বা বঞ্চনার সমস্যা তখনই ওঠে যখন নারী-পুরুষ শ্রমবিভাজনের গতানুগতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। শ্রমবাজারে নারীর ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের ফলে পরিবারের বাইরে শ্রম প্রদানকারী নারীকে একই সঙ্গে পরিবারে শিশুপালনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও শ্রম দিতে হয় বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রত্যাশার সম্মুখীন হতে হয়। এদিক থেকে শ্রমিকনারীর তুলনায় শ্রমিকপুরুষটি অধিকতর সুবিধা ভোগ করে। পরিবার-শ্রমকে পুরুষ ও নারীর মধ্যে ভাগাভাগি করে নেবার অর্থাৎ পুরুষের দিক থেকে নারীর পারিবারিক ভূমিকার অংশীদার হবার যে কথা বলা হয় তা বর্তমান পুঁজিনির্ভর পিতৃতান্ত্রিক দুনিয়ায় শুধু সীমিত সংখ্যক কিছু মানুষের ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হতে পারে যেখানে নারী (স্ত্রী) তার স্বামী (পুরুষের) তুলনায় বেশি বা প্রায় কাছাকাছি রোজগার করে। এবং সে ক্ষেত্রেও সমাজের মূল মতাদর্শ অর্থাৎ লিঙ্গবৈষম্যের প্রতীক পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ থেকে বেরিয়ে আসা অত্যন্ত কঠিন।

অন্যান্য অধিকাংশ পরিবারের ক্ষেত্রে পুরুষ-শ্রমিক নারীর পারিবারিক ভূমিকা সম্পাদন করছে— এই রকম কিছু নিছক কষ্ট কল্পনা বলে লিন্ডসে মনে করেন।

বস্তুত, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তার বিকাশের প্রতিটি স্তরেই বেশ কিছু কাঠামো তৈরি করে যা তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে সহায়ক। পরিবার এমন একটি কাঠামো যা নারীকে শিল্প-উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে/বৃহত্তর বহির্জগতের সমাজব্যবস্থা থেকে সরিয়ে বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ রাখে। স্বামীর আয়ের উপর নির্ভরশীল স্ত্রীর পক্ষে এই ধারণা দৃঢ় হতে থাকে যে, যে-কোনও ধরনের সামাজিক পরিবর্তন তার পরিবার ও নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। ব্যক্তিগত ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিরাপত্তায় উদ্বিগ্ন পুরুষকেও যে কোনও আন্দোলনে যোগ দেবার আগে দু'বার ভাবতে হয়। বরং, পুরাতন পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামোকে টিকিয়ে রাখা বেশি নিরাপদ বলে মনে করে সে।

সাম্প্রতিক কিছু প্রশ্ন

পিতৃতন্ত্রের আলোচনায় যে প্রশ্নগুলি সম্প্রতি উঠে এসেছে তার মধ্যে অন্যতম হল, বর্তমানে পিতৃতন্ত্র কী ক্রমশ বিলুপ্তির পথে? না কি, পুরাতন পিতৃতন্ত্র নতুন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে মানানসই নতুন আঙ্গিকে আবার ফিরে এসেছে? বলা বাহুল্য, বর্তমানে সমস্ত নারীবাদী তাত্ত্বিক সহ নির্বিশেষে সব তাত্ত্বিকই স্বীকার করেন যে, পিতৃতন্ত্র এক সর্বজনীন, শাশ্বত প্রতিষ্ঠান হলেও অপরিবর্তনীয় নয়। সমাজ, স্থান ও সময় ভেদে পিতৃতন্ত্রের ধরন ও প্রকৃতির ভিন্নতার কথাও সকলেই স্বীকার করেন। যেমন, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের পিতৃতন্ত্রের ধরন বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পিতৃতন্ত্রের ধরন থেকে ভিন্ন, আবার ইউরোপীয় সমাজের পিতৃতন্ত্রের প্রকৃতি ভারতীয় সমাজের পিতৃতন্ত্রের প্রকৃতি থেকে আলাদা। শ্রেণিগত দিক থেকেও ভারতীয় সমাজের উচ্চবিত্ত পরিবারের পিতৃতন্ত্রের ধরন ভারতীয় সমাজের আদিম জনগোষ্ঠীর বা নিম্নবিত্ত পরিবারের পিতৃতন্ত্রের ধরন থেকে অন্য রকমের। কৃষিভিত্তিক সমাজের পিতৃতন্ত্রের অবস্থান শিল্পসমৃদ্ধ সমাজের পিতৃতন্ত্রের অবস্থান থেকে পৃথক। প্রতিটি সমাজকাঠামো এবং/অথবা ঐতিহাসিক পর্ব পিতৃতন্ত্রের ধরন, কার্যসম্পাদনের প্রকৃতি, ক্ষমতা বিন্যাসের ব্যবস্থাপনা, মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আচরণবিধি নিয়ন্ত্রণ/নির্ধারণ করে। বিশ শতকে নারীশিক্ষার প্রসার, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নারীর অনুপ্রবেশ, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ এবং উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে আইনগত ভাবে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য হ্রাস, সরকারি পরিচালন ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ, বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, গর্ভের উপর অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে নারীর স্বকীয় বিবেচনার সুযোগ, পণপ্রথা, ধর্ষণ, নারী-লাঞ্ছনা প্রভৃতি বিষয়গুলিকে অপরাধমূলক বিষয় হিসাবে ঘোষণা ও তার জন্য শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা, অন্দরমহল ক্ষেত্র (Private Sphere) এবং গণক্ষেত্র (Public Sphere)-এর মধ্যে পার্থক্য হ্রাস— প্রভৃতি বিষয়গুলির কারণে মান (Michael Man 1986)-এর মতন তাত্ত্বিকেরা মনে করেন, বর্তমানে পিতৃতন্ত্রের অবসান ঘটেছে এবং পরিবারে কর্তার পূর্বতন কর্তৃত্ব প্রয়োগের যুগও গত হয়েছে।

মান-এর এই বক্তব্যকে অবশ্য অনেক তাত্ত্বিকই মেনে নিতে পারেননি। ১৯৯১ খ্রি. প্রকাশিত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি প্রতিবেদনে (*The World's Women 1970-1990: Trends and Statistics*) দেখা যায় উত্তর ও পূর্ব ইউরোপ, উত্তর আমেরিকার উন্নত দেশগুলি বাদ দিলে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই নারীর অর্থনৈতিক কাজকর্মে যোগদানের মাত্রা খুবই কম। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার গ্রামাঞ্চলগুলিতে নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সন্তান প্রতিপালন, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের হারও অত্যন্ত সামান্য। পুরুষের তুলনায় নারীর বেতন ও অন্যান্য অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা কম, জীবনযাত্রা নিম্নমানের।

কোরিয়ায় জন লি (John Lie, 1996) কৃষিভিত্তিক পিতৃতন্ত্র (agricultural patriarchy) থেকে পিতৃতান্ত্রিক পুঁজিবাদী (patriarchal capitalism) সমাজে উত্তরণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। কোরিয়ায় প্রাক-পুঁজিবাদী কৃষিভিত্তিক পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পিতৃতন্ত্র মূলত সক্রিয় ছিল পরিবারের গণ্ডির মধ্যেই। পরিবারভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গেও নারীরা যুক্ত ছিল। উচ্চশ্রেণির নারীরা অবশ্য ছিল এর বাইরে। পরিবারের মধ্যে পিতার/কর্তার নিয়ন্ত্রণে নারী ও পুরুষের সামাজিক ভূমিকা ছিল সুনির্দিষ্ট। কিন্তু শিল্পায়নের ফলে নারীরা পরিবারের বাইরে শ্রম (সস্তায়) দিতে শুরু করে। পারিবারিক শ্রমের সঙ্গে পরিবারের বাইরেও শ্রম-শোষণ শুরু হয়। লিঙ্গভিত্তিক শোষণের নতুন সামাজিক ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। পিতৃতান্ত্রিক পুঁজিবাদ নারীর উপর আধিপত্যের নতুন মাত্রা যোগ করে। ওয়ালবির (Sylvia Walby, Theorising Patriarchy, Oxford, 1996) বিশ্লেষণে আমরা অন্দরমহল পিতৃতন্ত্র (Private Patriarchy) এবং গণক্ষেত্রে পিতৃতন্ত্র (Public Patriarchy)-র মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করি। ওয়ালবি-র মতে, শিল্পায়ন, নগরায়ণ, শ্রমিকীকরণ অন্দরমহল পিতৃতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে গণপিতৃতন্ত্রের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। অন্দরমহল পিতৃতন্ত্রের ভিত্তি হল পারিবারিক উৎপাদন ব্যবস্থা, যেখানে পুরুষ নারীকে ব্যক্তিগত ও প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। গণক্ষেত্রগুলি থেকে নারীকে বিচ্ছিন্নও রাখা হয়। গণপিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা (যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সৃষ্টি করে ও প্রসার ঘটায়) পরিবার ছাড়াও সমাজের অন্যান্য কাঠামোর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে, যদিও পরিবার পিতৃতন্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসাবে থেকে যায়। গণপিতৃতন্ত্রে নারীরা গণক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের সুযোগ পায় কিন্তু অন্দরমহল ও গণক্ষেত্র— উভয় জায়গাতেই নারীর উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে এবং এই নিয়ন্ত্রণ সমষ্টিগতভাবে সম্পাদিত হয়। বস্তুত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এক ধরনের দাতা-গ্রহীতা (patron-client) সম্পর্ক তৈরি করে। পুরুষ-নারী সম্পর্কের প্রতিটি ক্ষেত্রেই (অর্থনৈতিক, সামাজিক, যৌন সম্পর্ক) এই দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। স্বাধীনোত্তর ভারতে নারীর অবস্থানকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লীলা কস্তুরি (Leela Kasturi, 1996) উল্লেখ করেছেন, উন্নয়ন চিন্তা, পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণে পুরুষকেন্দ্রিকতা এখানে নারীমুক্তির পথে শুধু অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই না, পণপ্রথা, ভ্রূণহত্যা, পণপ্রথা-জনিত বধূ নির্যাতন/হত্যা, শিশু/নারী পাচার, ধর্ষণ প্রভৃতি ঘটনাগুলিও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ শতকের প্রথম দিকে জার্মানি, ইতালিতে যথাক্রমে হিটলার, মুসোলিনির নেতৃত্বে 'নতুন পিতৃতন্ত্রের' জন্ম। অন্যান্য সমাজ সংগঠনে পিতৃতন্ত্রের

হ্রাস ঘটিয়ে রাষ্ট্রনেতাকে জাতির পিতা হিসাবে ব্যাখ্যা করা কিংবা 'সন্তান জননী' হিসাবে নারীর প্রশংসা করা— ইত্যাদি এই নতুন পিতৃতন্ত্রের কয়েকটি দিক মাত্র। বিশ শতকের বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে, নৃকুল গোষ্ঠী আন্দোলনে, রাজনৈতিক দলগঠনে, ধর্মীয় মৌলবাদের ক্ষমতা বিশ্লেষণে, অন্যান্য ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট পথে চালনার ক্ষেত্রে নতুন আঙ্গিকে পিতৃতন্ত্রের প্রকাশ ঘটেছে। বস্তুত শিল্পায়ন, নগরায়ণ, গণতন্ত্রের প্রসার, নারী সমাজে শিক্ষার বিস্তার, চাকুরিক্ষেত্রে, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ ক্ষেত্রে নারীর অনুপ্রবেশ, আইনগতভাবে যে কোনও ধরনের লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস, আইনের দৃষ্টিতে সমতা প্রভৃতির যেমন প্রসার ঘটেছে, তেমনি পাশাপাশি নারী-নির্যাতনের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে। চাকুরিক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য, শিক্ষা ও চাকুরিক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীর অনগ্রসরতা, স্বল্প বেতন, ভ্রূণ হত্যা, যৌন লাঞ্ছনা, পণপ্রথা জনিত হত্যা/আত্মহত্যা, ধর্ষণ (বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে যা প্রাধান্য বিস্তারের এক রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে) এবং নারী পাচারের মাত্রাও বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উদারনৈতিক, কল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থায় নারীর উন্নয়নের পন্থা ও পদক্ষেপগুলি পিতৃতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই আবদ্ধ থাকায় সেগুলি ফলপ্রসূ হতে পারেনি। পরিবর্তে রাষ্ট্র ও তার মতাদর্শ পিতৃতন্ত্রকে, বিশেষ করে গণক্ষেত্রে, প্রয়োগ করতে ও টিকিয়ে রাখতে প্রয়াসী হয়েছে। এক কথায়, পিতৃতন্ত্রের নবরূপায়ণ ঘটেছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল, পিতৃতন্ত্র যদি লিঙ্গবৈষম্যের, নারীর অবনয়নের অন্যতম কারণ বলে বিবেচিত হয় তা হলে এর বিকল্প কী হতে পারে? পিতৃতন্ত্রের বিকল্প হবে এমন এক সমাজকাঠামো যেখানে কোনও লিঙ্গ-বৈষম্য/নির্যাতন থাকবে না; নারী-পুরুষ সকলের স্বতন্ত্র আত্মপরিচয়ের স্বাধীনতা থাকবে।

উদারনৈতিক তাত্ত্বিকেরা অবশ্য পরিবার ব্যবস্থা বিলোপের বদলে পরিবারে নারী-পুরুষের ভূমিকার পরিবর্তন চান। প্রথম দিকের উদারনৈতিক নারীবাদী তাত্ত্বিক মেরি উলস্টোনক্রাফট (Mary Wollstonecraft, 1759-97) আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকারের সমতা সৃষ্টি, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, রাজনীতি, শিক্ষা, কর্মক্ষেত্রে নারীর অনুপ্রবেশ, বিভিন্ন কল্যাণকর কর্মসূচি গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর জোর দেন। বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বের উদারনীতিবাদী নারীবাদী তাত্ত্বিক বেটি ফ্রিডান (Betty Friedan, 1963) ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে 'নাউ' (National Organization for Women)-এর প্রতিষ্ঠাপর্বের ভাষণে ঘোষণা করেন, সুযোগ সুবিধা ও দায়িত্বে পুরুষের মতো নারীরাও যাতে সত্যকারের সম-অংশীদার হতে পারে তার জন্য কর্মসূচি গ্রহণই আমাদের লক্ষ্য (R. Eatwell and A. Writ, 1999, p. 214)। নয়া উদারনীতিবাদী তাত্ত্বিক জন রল্‌স (John Rawls, 1971)-এর রচনায় প্রভাবিত রিচার্ডস (Radcliff Richards, 1982) পরিবার ব্যবস্থার মধ্যেও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে চান, যেখানে নারী ও পুরুষ প্রত্যেকে তার সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারবে। রল্‌স-এর মতো তিনিও বৈষম্যকে পুরোমাত্রায় অস্বীকার করেননি; কিন্তু সেই বৈষম্য যাতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানোর পথে অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকার কথা বলেছেন।

কিন্তু এখানে যে প্রশ্নটি থেকেই যায় তা হল, পুঁজিবাদীব্যবস্থার পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোয় কি নারী-পুরুষের মধ্যে প্রকৃত সমতা আনা সম্ভব? যদি পরিবার ব্যবস্থাকে নারী ও পুরুষের ভিতরকার বিবাহ-নামক এক চুক্তির ফলে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান (C. Pateman, 1988) বলে ধরে নেওয়া হয় তা হলে এই অসমচুক্তি (যেহেতু এবং যে ক্ষেত্রে নারী অর্থনৈতিক ভাবে পরাধীন এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে পুরুষের উপর নির্ভরশীল) সমাজজীবনে সমতা আনতে পারে না। এ ধরনের অসম চুক্তিতে পুরুষেরাই প্রাধান্যকারীর ভূমিকায় থাকবে। লিঙ্গ-সমতার পরিবর্তে দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। নারীর পারিবারিক কাজগুলিকে যদি অর্থনৈতিক মূল্যসাপেক্ষে বিচার করা হয় তা হলে এই মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রেও পুরুষেরাই আধিপত্য বিস্তার করবে এবং নারীরা প্রতিযোগিতায় আরও বেশি লাঞ্ছিত/শোষিত হবে। পুরুষটি চাইবে সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা আদায় করতে। অন্য দিকে, যে পুরুষটি অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, শারীরিক ভাবে অক্ষম, অবিবাহিত পুরুষ বা নারী, সমকামী, সহবাসকারী পুরুষ-নারী যারা প্রান্তিক মানুষ হিসাবে চিহ্নিত তাদের অবস্থান হয়ে উঠবে আরও অমানবিক। সর্বোপরি, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পরিবারের বাইরেও গণক্ষেত্রগুলিতে যে পিতৃতন্ত্র সৃষ্টি ও পুষ্ট করে সেই ক্ষেত্রগুলি থেকে নারীকে (এবং পুরুষকেও) রক্ষা করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আবার চরমপন্থী নারীবাদীরা মনে করেন, ভিন্নলিঙ্গগামী (Heterosexual) পরিবারব্যবস্থা ও মাতৃত্ব যেহেতু পিতৃতন্ত্র তথা নারীর অবনয়নের অন্যতম কারণ তাই উপরোক্ত পরিবার কাঠামো ধ্বংস ও মাতৃত্বের বিষয়টি বন্ধ না করা পর্যন্ত পিতৃতন্ত্রের অবলুপ্তি ঘটবে না; নারীও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে না। ফিগেস (Eva Figes, 1970) নারীর অধস্তন অবস্থার জন্য পিতৃতান্ত্রিক সমাজকাঠামো ও মতাদর্শকে দায়ী করেছেন। কেট মিলেট (Kate Millett, 1969, 1970)-এর মতে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারব্যবস্থা যেহেতু লিঙ্গ সমতা/রাজনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থার ধ্বংস না ঘটিয়ে নারীমুক্তি সম্ভবপর নয়। ফায়ারস্টোন (Shulamith Firestone, 1970) মনে করেন, সন্তানের মা হওয়া নারীর অধস্তন অবস্থার অন্যতম কারণ। সুতরাং, নারীমুক্তির অন্যতম শর্ত হল মা না হওয়া। অ্যাটকিনসন (T. Atkinson, 1970) এই কারণে মন্তব্য করেছেন, 'নারীবাদ হল তত্ত্ব, সমকামিতা হল অনুশীলন'। অবশ্য চরমপন্থী নারীবাদীদের একাংশ মনে করেন, মাতৃত্বের অধিকারী হওয়া, সেবাপরায়ণতা, সহযোগিতা ইত্যাদি নারীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলি পুরুষের বৈশিষ্ট্য থেকে ভিন্ন। সুতরাং পুরুষকে অনুসরণ না করে বা পুরুষতান্ত্রিক বিশ্ব তথা পিতৃতন্ত্রের কাছে নতিস্বীকার না করে নারীবাদের উচিত উপরোক্ত উন্নত নারী-বৈশিষ্ট্যগুলির চর্চা করা, নারী হয়ে ওঠা। ফায়ারস্টোন মনে করেন, বর্তমান উন্নত প্রযুক্তির যুগে কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থার মাধ্যমে নারীকে গর্ভধারণের কষ্টকর বোঝা থেকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব।

মার্কসবাদী তাত্ত্বিকেরা মনে করেন, নারীর ঐতিহাসিক পরাজয় ও পিতৃতন্ত্রের/রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভবের ফলে। সুতরাং ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান না ঘটলে প্রকৃত নারীমুক্তি সম্ভবপর নয়। শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল, শ্রমিক শ্রেণির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন এবং ব্যক্তিগত মালিকানার

অবসান ঘটিয়ে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ও রাষ্ট্রকাঠামোর ধ্বংস বা অবলুপ্তি আনবে। কিন্তু নতুন সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক কী হবে সে বিষয়ে মার্কসবাদীরা একমত নন। কার্ল মার্কস-এর বক্তব্য ছিল, ভবিষ্যৎ প্রজন্মই ঠিক করবে নারী-পুরুষের সম্পর্কের ধরন কী হবে। সমাজতন্ত্রী নারীবাদী তাত্ত্বিক জুলিয়েট মিচেলের বক্তব্য এই আলোচনায় আগেই এসেছে। মিচেল (Juliet Mitchell, 1971) মনে করেন, নারীর অবস্থান চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে: ১. উৎপাদন— বস্তুগত, ২. পুনরুৎপাদন— সন্তান প্রজনন, ৩. সামাজিকীকরণ— সন্তান প্রতিপালন এবং ৪. যৌনতা। এই চারটি ক্ষেত্র থেকেই নারী মুক্ত না হলে প্রকৃত নারীমুক্তি ঘটবে না। পরিবার নামক কোনও সংগঠন শেষ পর্যন্ত থাকবে কি না সে সম্পর্কে এঙ্গেলস-এর বক্তব্যও ছিল অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী। এক দিকে কার্ল মার্কস, ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস এবং প্রথম দিকের মার্কসবাদীরা মনে করতেন পরিবার যেহেতু ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত, তাই ব্যক্তিমালিকানাহীন সমাজকাঠামোয় পরিবার বলে কোনও সংগঠন থাকবে না। অন্যদিকে এঙ্গেলস *The Condition of the Working Class in England* গ্রন্থে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিধ্বস্ত শ্রমিক পরিবারের কথা বলেছেন এবং ভবিষ্যতে সুস্থ শ্রমিক পরিবার গড়ে তোলার সপক্ষে রায় দিয়েছেন। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের প্রশ্নে লেনিনের নেতৃত্ব কলকারখানায় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীর অনুপ্রবেশকে উৎসাহিত করে, শ্রমিকসংগঠনে যোগদান ও পৃথক শ্রমিকসংগঠন করার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। আলেকজেন্দ্রা কোল্লোনতাই (Alexandra Kollontai, 1872-1952), যিনি লেনিনের নেতৃত্বে সদ্য প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থায় সমাজবিষয়ক কমিশনার ছিলেন, গতানুগতিক পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ধ্বংসের ব্যাপারে মত প্রকাশ করে পারিবারিক কাজগুলির সম্পাদনে, সন্তান প্রতিপালনে যৌথ দায়বদ্ধতার জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ দাবি করেন। কোল্লোনতাই-এর প্রচেষ্টায় নারীর জন্য দিনে আট ঘণ্টার শ্রম সময়, সামাজিক বীমা, সন্তান জন্মানোর আগে এবং পরে দু'-মাস ছুটির ব্যবস্থা, কাজের সময়ে প্রয়োজনে সন্তানকে দুগ্ধ পানের জন্য অবসর দেওয়া, রাত্রিকালীন সময়ে শ্রমদান থেকে রেহাই প্রভৃতি বিষয়ে আইন জারি হয়। বিপ্লবের প্রথম দিকে স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে সমতা, পারিবারিক সমদায়বদ্ধতা, বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে বাসস্থান সহ সমস্ত সম্পত্তির সমানাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে আইন তৈরি করা ছাড়াও বলশেভিক প্রচেষ্টায় ১৯২০ খ্রি. প্রথম কমিউনিস্ট নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামাঞ্চলগুলিতে পিতৃতান্ত্রিক কর্তৃত্বের উপর চরম আঘাত আসে ১৯৩০-এর দশকে, যখন স্তালিন কৃষির সমীকরণ ও অর্থনীতির শিল্পায়নের ব্যাপারে দৃঢ় ও কঠোর পদক্ষেপ নেন। পূর্বতন পরিবারব্যবস্থার পত্তন ঘটিয়ে স্বামী-স্ত্রীর সমানদায়বদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে 'সমাজতান্ত্রিক পরিবার' ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সোভিয়েত রাশিয়ায় এই মডেলটি কম বেশি অনুসৃত হতে থাকে পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলিতে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে নারীর অনুপ্রবেশ (১৯৮০-র দশকে সোভিয়েত রাশিয়ায় নারীশ্রমিকের হার ছিল নারীর ৯০ শতাংশ) ঘটলেও সেই অর্থে গৃহকর্মের সামাজিকীকরণ ঘটেনি। ফলে নারীকে গৃহের বাইরে শ্রম

দানের সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্মও সম্পাদন করতে হত। ১৯৭৭ খ্রি. ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে পার্টি সভাপতি ব্রেজনেভ খেদোক্তি করে বলেন, "আমরা পুরুষরা নারীকে গৃহের এবং গৃহের বাইরে কার্য সম্পাদনের দ্বৈত বোঝা থেকে মুক্ত করতে পারিনি" (Gail Lapidas, 1985 p. 14)। ১৯৯০-এর গ্লাসনস্ত এবং পেরেস্ত্রৈকার পরিস্থিতিতে এই দ্বৈত দায়িত্বে ক্লান্ত নারীদের একাংশ গৃহের কাজকর্মের মধ্যেই আবদ্ধ থাকাকে পছন্দ করেন। ১৯৮০-র দশক থেকেই বিবাহের স্বল্প হার, বেশি বয়সে বিবাহ, জন্মহারের হ্রাস, বিবাহ বিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি, শিশু অপরাধপ্রবণতা প্রভৃতি ঘটনাগুলির কারণ হিসাবে পরিবারব্যবস্থার ভাঙনকে দায়ী করা হতে থাকে। *পেরেস্ত্রৈকা* (উদ্ধৃত, Moghadam, p. 339) গ্রন্থে গর্বাচেভ রাশিয়ার সামাজিক সমস্যার জন্য পরিবারব্যবস্থার ভাঙনের ভূমিকাই প্রধান বলে মনে করেন। বাজারধর্মী অর্থনীতির প্রসার নারীপুরুষের ভূমিকারও রূপান্তর ঘটাতে থাকে। ফলস্বরূপ উত্তর-কমিউনিস্ট দেশগুলিতে ফের পিতৃতন্ত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। মোঘাদাম (Moghadam 1996, p. 349)-এর মতে, এই পরিবর্তন থেকে দুটি শিক্ষা, তত্ত্বগত এবং রাজনৈতিক, নেওয়া যেতে পারে। এক. সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের/পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় লিঙ্গ-ভূমিকার ব্যাপারটি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত যেহেতু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠনে লিঙ্গভিত্তিক পরিণাম রয়েছে। দ্বিতীয়ত, নারীমুক্তি, পিতৃতন্ত্রের অবসান এবং লিঙ্গসাম্যের জন্যে উৎপাদনক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণই যথেষ্ট নয়। প্রজনন ও প্রতিপালনক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান দায়বদ্ধতা থাকা জরুরি। সন্তান ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের যত্ন নেওয়া, রান্না থেকে শুরু করে ঘরদোর পরিষ্কার, বাজার এবং অন্যান্য গৃহস্থালির টুকিটাকি কাজ করার ক্ষেত্রে ও মূল্যায়নে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ সম্পর্কিত ধারণার বৈপ্লবিক পরিবর্তন দরকার। তা না হলে নারীকে দ্বৈত বোঝা মেনে নিতে হবে এবং পিতৃতন্ত্রের পুনরায় অনুপ্রবেশ ঘটবে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, তথাকথিত প্রকৃতি বা পুরুষের বিধান মনে করে নারীর পক্ষে পুরুষের আজ্ঞাবহ হয়ে জীবন কাটানো অথবা প্রতিকার হিসাবে পিতৃতন্ত্রের ধারক ও বাহক, সুবিধাভোগী পুরুষকে বর্জন করে সমকামী (যেহেতু পুরুষমাত্রই আধিপত্যকারী, লম্পট, ধর্ষক) হয়ে ওঠা— উভয় সিদ্ধান্তই চরম একপেশে। পুরুষ বা নারীর অধিপত্যের পরিবর্তে প্রয়োজন আত্মপরিচিতি, আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে বিকশিত হয়ে ওঠা। পুরুষের পরিবর্তে পুরুষতন্ত্রের (এবং যা পরিবারের গণ্ডির বাইরে সমাজ-সংগঠনগুলিতে, দলীয় নেতৃত্বে, রাষ্ট্রীয় কাঠামোয়, মতাদর্শগত ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত সক্রিয়) অবসান ঘটিয়ে একে অপরের পরিপূরক হিসাবে নর-নারীর সুস্থ সম্পর্কই কাম্য। তা না হলে ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হয়ে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী/শত্রু হয়ে ওঠা পরোক্ষভাবে বৈষম্যমূলক (শ্রেণিগত, লিঙ্গগত, ধর্ম, বর্ণ, জাতগত) সমাজকাঠামোকেই টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করবে। পুঁজিবাদী দেশগুলির তুলনায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে (স্বল্পায়ু হলেও) নারীর আত্মপরিচয়, শিক্ষা, স্বাধীনতা,

স্বাস্থ্য, আত্মপ্রত্যয় ছিল অনেক বেশি। কিন্তু সমাজতন্ত্রের অপরিণত বিকাশ পরিবারের ক্ষেত্রে পিতৃতন্ত্রের প্রাধান্যের হ্রাস ঘটালেও রাষ্ট্রকাঠামোয় দলীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে পিতৃতন্ত্রের জন্ম দিয়েছিল। বর্তমানে অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলিতে নারীশিক্ষার প্রসার, চেতনার বিকাশ, বিভিন্ন বাজারধর্মী কাজে যোগদান, অবিবাহিত, বিবাহ বিচ্ছিন্ন মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি, সামাজিক সংগঠনগুলিতে অংশগ্রহণ নারীর মর্যাদার যেমন বৃদ্ধি ঘটিয়েছে, অন্য দিকে রাষ্ট্রীয় আধিপত্য, সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, নারী পাচার, নারীকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করার প্রবণতাও বেড়েছে। ভারতের মতো নয়া উপনিবেশিক দেশগুলিতে, যেখানে ধনবৈষম্য, বর্ণ ও ধর্ম বৈষম্য অত্যন্ত প্রবল,— পিতৃতন্ত্রের প্রকৃতি সেখানে সব ক্ষেত্রে এক রকম নয়। উচ্চবিত্ত বা অর্থনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত মহিলারা পারিবারিক পিতৃতন্ত্রের কঠোরতা থেকে অনেকাংশে মুক্ত হলেও বাজারমুখী উৎপাদনের কাজের সঙ্গে জীবনধারণোপযোগী ন্যূনতম উৎপাদন (subsistence production— যা মূলত প্রাক পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য এবং যার মধ্যে সন্তান প্রজননও পড়ে) দায়িত্বও পালন করতে হচ্ছে। এছাড়াও বয়ে চলতে হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শের বোঝা। বাজারধর্মী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত নন এমন উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীদের ক্ষেত্রে পিতৃতন্ত্রের ফাঁস অনেক বেশি। দরিদ্র শ্রমজীবী পরিবারের বা আদিবাসী ও অন্ত্যজ গোষ্ঠীর নারীরা যাঁরা কোনও না কোনও অর্থনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা এই পিতৃতান্ত্রিক নিয়ম শৃঙ্খলার কঠোরতা থেকে তুলনামূলক ভাবে মুক্ত— যদিও সব ক্ষেত্রেই নারীকে পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ, রাষ্ট্রীয় ও সমাজ সংগঠনের, দলীয় নেতৃত্বের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোকে হয় মেনে দিতে হচ্ছে, নতুবা পারিবারিক হিংসার বলি হতে হচ্ছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে পিতৃতন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পিতৃতন্ত্রের অবসান না ঘটলে প্রকৃত অর্থে নারীমুক্তি (এবং একই সঙ্গে পুরুষমুক্তি) কখনওই ঘটবে না। এবং তা এই বিদ্যমান সমাজকাঠামোকে টিকিয়ে রেখে, শুধু মাত্র সদুপদেশ দিয়ে বা নারীনির্যাতনবিরোধী কিছু আইন-প্রণয়ন করে সামগ্রিক ভাবে করা নিতান্তই এক অসম্ভব ব্যাপার।